মোনাজাতউদ্দিন রচনাসমগ্র ১

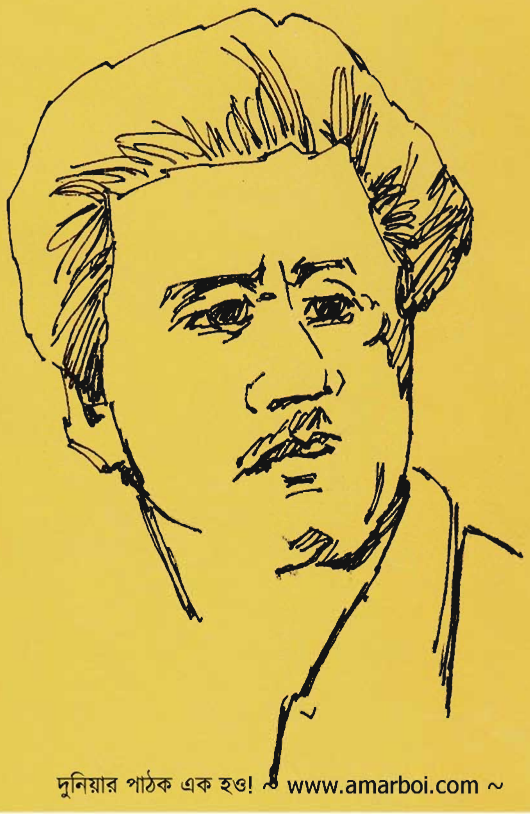

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা প্রতিবেদন পড়ে প্রথমে লজ্জায় কিংবা বেদনায় মাথা নিচু করেন এবং শেষ অব্দি শিরদাঁড়া টানটান হয়ে ওঠে–প্রতিবাদে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। এখানেই একজন সচেতন মানুষ হিসেবে, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে মোনাজাতউদ্দিনের সফলতা।

তাঁর মত পেশার প্রতি এত বেশি আন্তরিক সাংবাদিক দ্বিতীয়জন খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। প্রায় সার্বক্ষণিক সংবাদকর্মী হিসেবে কেবল সংবাদ প্রেরণ বা প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। সংবাদ-উপকরণ, সংবাদের পেছনের মানুষজন ও সংবাদশিল্পের সার্বিক কল্যাণ ছিল তাঁর একান্ত বিবেচনায়। এ-মন্তব্যের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান তাঁর প্রকাশিত পথ থেকে পথে, সংবাদ নেপথ্য, কানসোনার মুখ, পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ, নিজস্ব রিপোর্ট, ছোট ছোট গল্প, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন গ্রামীণ পর্যায় থেকে, চিলমারীর একযুগ, শাহা আলম ও মজিবরের কাহিনী, লক্ষ্মীটারী ও কাগজের মানুষেরা গ্রন্থে। ব্যক্তিত্ব-অভিজ্ঞতা, জীবনদৃষ্টির গভীরতা, ভাষার ঐশ্বর্য ও নিপুণ উপস্থাপনগুণে এসব সংবাদবিষয়ক গ্রন্থ যেন সংবাদসাহিত্য হয়ে উঠেছে। সৃজনশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও প্রভূত সম্ভাবনা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত আছে তাঁর প্রকাশিত স্বল্পসংখ্যক গল্প, ছড়া ও নাটকে।

ড. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন

মোনাজাতউদ্দিন

জন্ম: ২৭ জুন, ১৯৪৫, মৃত্যু: ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৫
বাড়ি: ধাপ, রংপুর, মা: মতিজান নেছা
বাবা: মরহুম আলিমউদ্দিন আহমেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে মোনাজাতউদ্দিন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক, যাঁর কর্মপ্রেরণার শেকড় সঞ্চারিত ছিল গ্রামীণ সমাজ-জীবনের তলদেশ অবধি। পেশাগত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়; স্বীয় সাধনা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মপদ্ধতিগুণে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। মফস্বল সাংবাদিকতার নামে যে উন্নাসিক মানসিকতা ছিল নগরবাসী মানুষের, তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় তা দূর করতে সক্ষম হন। বস্তুত, মফস্বলের সংবাদও যে গুরুত্বের ভিত্তিতে সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ হতে পারে তারই দৃষ্টান্তস্থাপক মোনাজাতউদ্দিন। তিনি একজন সৎ, সাহসী ও শ্রমনিষ্ঠ সাংবাদিক। তাঁর পেশা ও নেশা ছিল পথে পথে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করা। এ-পথে প্রধানত উত্তর বাংলার জনপদ, যদিও সমগ্র বাংলাদেশই ছিল তাঁর সংবাদ আহরণের ক্ষেত্র। মাটির উর্বরতার চেয়ে রুক্ষতা ও শস্যহীনতার দিকেই তাঁর নজর ছিল বেশি। মানুষের তৈলাক্ত পোশাকি চেহারার ভেতরের কদর্য ও কঙ্কালসার নিরন্ন নির্যাতিত জনমানুষের জীবনবৃত্তান্তই তাঁর হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সমাজ-জীবনের দগদগে ঘা, প্রশাসনের ঘাপলা, সুবিধাভোগীর দাপট, ভূমিহীন-গৃহহীন ভাসমান মানুষের বাঁচার লড়াই, আশ্চর্য দক্ষতায় ও ঋজু ভাষায় তিনি পাঠকের কাছে কমিউনিকেট করতে পারতেন। পাঠক তাঁর সংবাদ

▶

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ISBN 984 70156 0152 2

মোনাজাতউদ্দিন রচনাসমগ্র ১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোনাজাতউদ্দিন
রচনাসমগ্র ১

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান সম্পাদক
ড. আতিউর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ সদস্য
ড. সৌমিত্র শেখর
দীনেশ দাস
নাসিমুজ্জামান পান্না
ম. হাসান

মাওলা ব্রাদার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© নাসিমা মোনাজাত ইতি

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলোবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gamil.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলোবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
ছয়শত টাকা মাত্র

ISBN 984 70156 0152 2

MONAJATUDDIN RACHANASAMAGRA 1 (Complete works of Monajatuddin). Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers. 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price. Taka Six Hundred only.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

যাঁদের নিয়ে মোনাজাতউদ্দিন
সারাজীবন ভেবেছেন, কাজ করেছেন
সেইসব মেহনতি ও প্রান্তিক মানুষের উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৯
সম্পাদকীয় ১১

পথ থেকে পথে ১৭
সংবাদ নেপথ্য ১২৯
কানসোনার মুখ ২৭৫
নিজস্ব রিপোর্ট ৩২৭
পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ ৪০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চারণসাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিনের (১৯৪৫—১৯৯৫) গৌরবময় অবদান আজ প্রায় সকল মহলে স্বীকৃত। বগুড়া বুলেটিন, দৈনিক আওয়াজ, দৈনিক রংপুর, দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে তিনি প্রান্তিক মানুষের সুখদুঃখের গাথা-প্রতিবেদন রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'পথ থেকে পথে', 'সংবাদ নেপথ্য', 'কানসোনার মুখ', 'পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ', 'নিজস্ব রিপোর্ট', 'ছোট ছোট গল্প', 'শাহা আলম ও মজিবরের কাহিনী', 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন গ্রামীণ পর্যায় থেকে', 'চিলমারীর একযুগ', লক্ষ্মীটারী', 'কাগজের মানুষেরা' গ্রন্থসমূহ। এর বাইরেও রয়ে গেছে তাঁর রচিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, নাটক ও ছড়া। মোনাজাতউদ্দিনের রচনাগুলো একসঙ্গে প্রকাশিত হলে সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের তো বটেই সাধারণ পাঠকদের কাছেও আদরণীয় হবে।

আমি জানি যে, মোনাজাতউদ্দিনের মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত 'চারণসাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন স্মৃতি সংসদ' প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে মোনাজাতউদ্দিনের স্মৃতি ও আদর্শ লালন ও প্রসারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। স্মৃতিসংসদ যে তিনটি কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছে, তা হলো চারণসাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার প্রদান, চারণসাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন স্মারক বক্তৃতা আয়োজন এবং সমুন্নয়-মোনাজাতউদ্দিন গবেষণা ফেলোশিপ প্রদান। তিনটি কাজই এই সংসদ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় চারণসাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন স্মৃতিসংসদ মোনাজাতউদ্দিনের রচনাসমূহ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। সেই সঙ্গে এই রচনাসমগ্রের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করায় স্মৃতি সংসদের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর প্রফেসর ড. আতিউর রহমানকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোনাজাতউদ্দিন রচনাসমগ্র' প্রকাশিত হলে দেশের সংবাদকর্মী এবং সাধারণ পাঠক উপকৃত হবেন। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের সহায়ক-পাঠ হিসেবেও এই গ্রন্থ কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি তাই এই রচনাসমগ্র প্রকাশের আয়োজনকে স্বাগত জানাই।

মোনাজাতউদ্দিনের যতগুলো রচনা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আমার ধারণা এর বাইরেও অনেক সংবাদ ও ফিচার জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলো থেকেও কিছু রচনা হয়তো গ্রন্থাকারে প্রকাশযোগ্য। হয়তো কোনো গবেষক সেই কাজটি একদিন করবেন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম। আপাতত যে-ক'টি গ্রন্থ ও বিচ্ছিন্ন রচনা উদ্ধার করে এই রচনাসমগ্র প্রকাশিত হচ্ছে, আমার বিবেচনায়, সেটি অনেক বড় কাজ। মোনাজাত কেবল সাংবাদিক নন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পরিচয়টিও এখানে বিধৃত। এই গ্রন্থ সকল মহলের মনোযোগ লাভ করুক, সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন হয়ে উঠুন সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রিয় লেখক—এই আমার প্রত্যাশা।

গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশের প্রতিটি পর্যায়ে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলের, বিশেষ করে গ্রন্থের প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হকের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

জানুয়ারি ২০১০

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদকীয়

রুশ লেখক মায়াকোভস্কিকে লেখাপড়া না-জানা এক দল শ্রমিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি যে মেহনতি মানুষের পক্ষে লেখেন তার প্রমাণ কী? মুখে কোনো উত্তর দেননি মায়াকোভস্কি। ফর্সা হাত দুটোর কজি থেকে শার্টের বোতাম খুলে গুটিয়ে তাঁদের দেখিয়েছিলেন কড়া-পড়া প্রায় কালো হয়ে যাওয়া নিজের কনুই দুটো। পরে বলেছিলেন, তিনি বিদ্যা-শ্রমিক। মায়াকোভস্কির মতোই বলেছেন সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন : "আমি শ্রমিক, লিখে খাই। কর্তৃপক্ষ কিছু টাকার বিনিময়ে আমার শ্রম কেনেন। আমি এটা বুঝি। তবুও 'সিনসিয়ার' হবার চেষ্টা করি" (পথ থেকে পথে : ১৯৯১ : পৃ. ১১১)। এই যে 'সিনসিয়ার' হবার চেষ্টা — একেই বলে দায়বদ্ধতা। দায়বদ্ধতার বিবেচনায় মায়াকোভস্কির সঙ্গে মোনাজাতের তুলনা হতেই পারে। তবু পার্থক্য আছে দুজনের। আদর্শের পুথিগত বুনিয়াদ ছিল মায়াকোভস্কির; মোনাজাতের এই বুনিয়াদ সম্ভবত পুথিগত নয় — ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জারণে তিলে তিলে অর্জিত। সে-দিক থেকে মোনাজাত 'সেল্ফ মেড'। একান্তই স্বনির্মিত।

স্বনির্মিত মানুষের কর্ম-আচরণও অন্যদের থেকে খানিকটা আলাদা হয়; মোনাজাতেরও তাই ছিল। তাই বলে তিনি সংসারক্ষুব্ধ বিদ্রোহী ছিলেন না। বরং পিতার মৃত্যুজনিত কারণে সাংসারিক দায়িত্ব নিজের তরুণ বয়স থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। পরে সংসারীও হয়েছেন নিজে। কিন্তু ঝিনুকে সেই যে শুক্তির দহন — মোমের নরম আলোর মতো জ্বলতে থাকা বুকের মধ্যে নতুন কিছু করার প্রেরণা— সেটাই তাঁকে নিয়ে এলো সাংবাদিকতার বিশাল ভুবনে। স্থানীয় পত্রিকার প্রদায়ক থেকে আঞ্চলিক দৈনিকের সম্পাদক। সেখান থেকে জাতীয় দৈনিকের আঞ্চলিক প্রতিনিধি। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলকে সংবাদক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে মোনাজাত প্রমাণ করে দিয়েছেন গ্রাম বা অঞ্চলই হতে পারে গ্রাম-প্রধান বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ভিত্তি। রাজধানীভিত্তিক সাংবাদিকতা বা একে শুধু শহরের মানুষের মধ্যে আটকে রাখার প্রবণতা অনেকটাই যে রঙিন ফানুসের মতো মোনাজাতউদ্দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সংবাদ পত্রিকার পাতায় তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com

এনে সে-কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উত্তরাধুনিকতার যে-ধারণা আজ সর্ববিস্তারী, সেখানে প্রান্তিককেই কেন্দ্র বানাবার প্রণোদনা চোখে পড়ে। মোনাজাতের বিচরণ সেই প্রান্তিকে, প্রান্তজনে। আমি তাঁর একটি গ্রন্থের (চিলমারীর একযুগ : ১৯৯৫) মুখবন্ধে লিখেছিলাম : 'তিনিই প্রথম সংবাদপত্রকে উন্নয়ন সচেতনতার একটি কার্যকরী বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন।'—এই বাক্যটি আমি আবার উদ্ধৃত করছি এ-কারণে যে, দরিদ্র ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষই উন্নয়ন-পদক্ষেপের মুখ্য শর্তপূরণ-উপাদান। সমাজে দারিদ্র্য ও কুসংস্কার রেখে দেশকে উন্নয়নের পথে যাঁরা নিয়ে যেতে চান, তাঁদের বিবেচনায় বড় গলদ আছে অথবা তাঁরা জেনেশুনে বিভ্রান্ত করেন মানুষকে। সংবাদ-মাধ্যম দেশের বাস্তবচিত্র তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করতে পারে তখনই যখন সংবাদ-মাধ্যম স্বাধীন থাকে। মোনাজাত যে-সময় সাংবাদিকতা করেছেন সে-সময় দেশে সামরিকশাসন আর খুঁড়িয়ে-চলা গণতন্ত্রের মধ্যে তথাকথিত 'উন্নয়নের রাজনীতি'র গাল ভরা বুলি শোনা গেছে। বিদেশ থেকে অর্থ ও সাহায্য আনা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা পৌঁছেনি গরিব মানুষের কাছে। আসলে তখন এ হিসেবটাও করা হয়নি যে, গ্রামে দুবেলা খাবার নেই কত ঘরে, কত শতাংশ মানুষ শিক্ষা-বঞ্চিত, জমি নেই কত ভাগ লোকের ইত্যাদি। আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা মুখে মুখে বলা হলেও আসলে দেয়া হয়েছে এর গলায় অদৃশ্য ফাঁস। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এই চাপান-উতোরকালে দেশের গ্রামীণ মানুষের প্রকৃত খোঁজ না-নিয়েই 'উন্নয়নের রাজনীতি'—দেশের এ-অবস্থায় মোনাজাতউদ্দিন তাঁর সংবাদ-প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে গ্রামকে কথিত সভ্যসমাজের সামনে তুলে আনেন সেখানে দেখা যায় উন্নয়নের ছোঁয়ামাত্র লাগেনি। 'উন্নয়নের রাজনীতি'র নামে নেতারা ছিলেন আত্ম-উন্নয়নে ব্যস্ত। মোনাজাতের প্রতিবেদনে জানা যায়, সামান্য জমিটুকু হারিয়ে ডিমলার গ্রামীণ যুবক নুরুদ্দিনের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে কীভাবে, কুড়িগ্রামের গ্রামে ক্ষেতমজুরের দিনমজুরি হয় দিনে মাত্র তিন টাকা, ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষক জয়নারায়ণ সন্তান কামনা করে বট-পাকুড়ে বিয়ে দেয়, রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে রোগমুক্তির আশায় তরুণী নুরেজা খাতুনের বিয়ে দেয়া হয় জিগা গাছের সঙ্গে, নীলফামারীর ডালিয়ায় দুধের লিটার চার টাকা, ভুরুঙ্গামারীতে ডিমের হালি চার টাকা, লালমনিরহাটে মোটা চাল বার টাকা কেজি কিন্তু দিনমজুরি চার টাকা ইত্যাদি নানা বাস্তবচিত্র। এসব চিত্রে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক করুণ দশা যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি প্রকাশ পায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণজীবন। নুরুদ্দিনের সামান্য জমিটুকু হারানোর নেপথ্যে যে একটি শোষণ কার্যকর, তা-ও পরিষ্কার বোঝা যায়। যে-সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল শুধু কথামালায় সীমাবদ্ধ সে-সময় মোনাজাত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে যে প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করেন তাতেই প্রথম কথিত রাজনীতিবিদদের 'উন্নয়নের রাজনীতি' চ্যালেঞ্জবিদ্ধ হয়। অন্যভাবে বললে, এই প্রতিবেদনগুলো থেকেও শুরু হয় প্রকৃত উন্নয়ন-পদক্ষেপভাবনা। আজ সংবাদপত্র বা বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়াকর্মীরা যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরছেন কৃষিসহ নানা সংবাদ, কৃষকের সুখ-দুঃখগাথা — বাংলাদেশে এর পথিকৃৎ তো মোনাজাতউদ্দিন।

একজন লেখককে জানতে হয় কোথায় তাঁকে থামতে হবে; একজন রিপোর্টারকে জানতে হয় চারিদিকে ঘটে যাওয়া এত ঘটনার মধ্যে কোন ঘটনাটি সংবাদ হবে। মোনাজাতউদ্দিন জানতেন। তিনি জানতেন কোনটি সংবাদ হবে এবং কোথায় তাঁকে থামতে হবে দুটোই। এ-কারণে তিনি প্রকৃত সাংবাদিক এবং লেখক। একটি গ্রন্থের ভূমিকায় মোনাজাত নিজেও লিখেছেন : সব ঘটনা 'রিপোর্টের' বিষয় হয় না (নিজস্ব রিপোর্ট : ১৯৯৩)। যেমন, উত্তরাঞ্চলে শীতকালে মৃত্যু-ঘটনায় ঢাকার সংবাদপত্রগুলো যখন পাল্লা দিয়ে প্রায় উৎসব ও প্রতিযোগিতা করে মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করছে এবং নিউজ এডিটর টেলিফোনে রিপোর্টারকে ধমক দিচ্ছেন এই বলে : 'আজই শীতে মারা যাবার খবর পাঠান একটা, এন্ড ডোন্ট মিস ইট' (ছোট ছোট গল্প : ১৯৯৩ : পৃ. ৩৮)। মোনাজাতউদ্দিন মনে করেন, শীতে মানুষের মৃত্যু — এটা প্রথম দিকে করুণ ও দারুণ সংবাদ হলেও প্রতিদিন এই মৃত্যুর তালিকা প্রদান সংবাদ নয়। সংবাদ সেটি, কী না-পেয়ে শীত নিবারণ করতে পারেনি শীতার্ত মানুষ, কেন পারেনি, কোথাও কি কোনো গলদ হয়েছে? — এ রকম হাজারো প্রশ্নের ভিত্তিতে অনুসন্ধান। আবার 'সামান্য' বিষয় তাঁর কাছে বড় প্রতিবেদন হিসেবে এসেছে। নওগাঁর মজিবর নামের এক যুবক জীবনের প্রথম ঢাকায় যাবে বলে বাসের টিকেট কিনেছে। যে বাসে মজিবর ঢাকায় যাবার কথা সে বাসটা এমন দুর্ঘটনায় পড়ল যে নিহত যাত্রীদের লাশ চিহ্নিত করাই প্রায় অসম্ভবের ব্যাপার হলো। অনেক কষ্টে মজিবরের লাশ শনাক্ত করে পরিবারের লোকজন। বাড়ির আঙিনায় কবরও দেয়া হয়। কিন্তু কয়েক দিন পর ঢাকা থেকে ব্যাগ হাতে বাড়িতে ফিরে আসে মজিবর। পরিবারের লোকদের আনন্দ দেখে কে! মোনাজাত এই রিপোর্টের নাম দেন : 'বিষাদে হরিষ'। আসলে নির্দিষ্ট বাসে সময় মতো উঠতে না পারায় পরের বাসে মজিবর ঢাকায় যায়। টিকিটে মজিবরের নামে যাত্রী থাকায় সে-সূত্র ধরে প্রচার হয়ে যায় মজিবরের মৃত্যু-সংবাদ।—এখানেই থেমে থাকেননি মোনাজাত। তিনি গেছেন রিপোর্টের গভীরে : 'তবু প্রশ্ন থেকে যায় মজি হিসেবে শনাক্ত করে যার লাশ আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামবাসীরা সে-দিন দাফন-কাফন করেছিলো, সেটি কার ছিলো? তার জবাব আজো মেলেনি। মজির ঘরের পাশেই যাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, আজো জানা যায়নি তার পরিচয়' (শাহা আলম ও মজিবরের কাহিনী : ১৯৯৫ : পৃ. ৬২)। আসলে অনুসন্ধানের সূত্র সবসময় প্রয়োগ করেছেন মোনাজাত। স্থানে থেকেও স্থানীয় সংবাদ জানতেন না প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। আসলে জানতে চাইতেন না। তাই কোনো জেলা বা থানাতে মোনাজাতকে দেখলেই নড়েচড়ে বসতেন আধিকারিকগণ। জামালপুরে মোনাজাতকে দেখে তাই তৎকালীন জেলা প্রশাসক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'আপনি? জামালপুরে? কিছু একটা ঘটলো নাকি?' (পথ থেকে পথে : পৃ. ১২)। পরে সত্যি জানা গেল, তিতপল্লা গ্রামের ইজ্জত আলির ছেলে মারা গেছে অনাহারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোনাজাত সাংবাদিকতার সেই 'সিনসিয়ারিটি' থেকে বিচ্যুত হননি মুহূর্তকালের জন্য। বিক্ষিপ্ত রিপোর্ট লেখা বা পাঠানোই শুধু তাঁর কাজ ছিল না; তিনি প্রায়ই সিরিজ-রিপোর্ট করতেন। শুধু সিরিজ-রিপোর্টই করতেন না, সেই রিপোর্ট ছাপার পর এর প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবিধান কতটুকু হয়েছে তা জানবার জন্য তিনি 'ফলো-আপ' রিপোর্ট করেছেন নির্দিষ্ট সময় পার করে। মোনাজাত ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে সিরাজগঞ্জের কানসোনা গ্রামে গিয়ে সেখানকার নানা বিষয়ে ১৯ কিস্তির প্রতিবেদন লিখে প্রকাশ করেন সংবাদ পত্রিকায়। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি মোনাজাত। ১৯৯১ সালের মার্চে আবার সে গ্রামে গিয়ে তৈরি করেন 'ফলো-আপ' প্রতিবেদন। ৮ কিস্তিতে সংবাদ-এ ছাপা হয়। এই 'ফলো-আপ' প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ৪ বছরে গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে, কয়টি পরিবার বা ব্যক্তির অবস্থা কীভাবে পাল্টেছে — সম্ভাবনা কতটুকু ছিল। এর আগে ১৯৮২ সালে গিয়েছিলেন চিলমারীতে, লিখেছিলেন ধারাবাহিক প্রতিবেদন। ১২ বছর পর, ১৯৯৪ সালে আবার তিনি চিলমারী গিয়ে লিখেছেন 'ফলো-আপ' প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে তিনি তুলে ধরেন এক যুগ হলেও কতটুকু বদলেছে চিলমারী। আসলে বলতে দ্বিধা নেই, বাংলাদেশের সংবাদপত্রের জগতে 'ফলো-আপ' প্রতিবেদনের এই ধারার প্রবর্তক মোনাজাতউদ্দিন।

AMARBOI.COM

মোনাজাতের কাজকে 'মফস্বল সাংবাদিকতা' আর তাঁকে 'মফস্বল সাংবাদিক' বলেছেন অনেকে। তাঁকে 'চারণ সাংবাদিক'ও বলা হয়। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি খণ্ডিত, অংশত অবজ্ঞাজাত, দ্বিতীয়টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মোনাজাতকে আমি বলি বাংলাদেশের সংবাদপত্রের জগতে প্রান্ত ও কেন্দ্রের যোগসূত্র আবিষ্কারক ও স্থাপক সাংবাদিক। এই পদ্ধতি তিনি শুধু আবিষ্কারই করেননি, নিজে যোগসূত্র স্থাপন করে দেখিয়েছেনও। এই যোগসূত্র শুধু ভৌগোলিক, তা নয়— সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিকও বটে। তাছাড়া শুধু মফস্বলের কেন, ঢাকাসহ বিভিন্ন নগর-শহরের বিস্ময়কর সব খবর বেরিয়ে এসেছে তাঁর কলম থেকে। ফার্মগেট ওভারব্রিজে কুষ্ঠরোগী সেজে মুক্তিযোদ্ধার ভিক্ষাবৃত্তি (সংবাদ নেপথ্য : পৃ. ১৬৮), রেডিও-র ট্রান্সক্রিপশন ভবনের স্টোরে ২০ বছর পড়ে থেকে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজ-টেপ ভর্তি ৩টি ট্রাঙ্ক—এসব খবর দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল একানব্বইয়ের বিজয়ের মাসে (সংবাদ নেপথ্য : পৃ. ১৫৬)। তাঁর ভেতরে একটি শিশু-প্রাণ ছিল বলে আবেগাপ্লুত তিনি হয়ে যেতেন প্রায়ই। আর্থিক কষ্টটাও তাঁকে পীড়িত করত। কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। জাহান্নামের আগুনে বসেও যে শেষ পর্যন্ত পুষ্পহাসি হাসা সম্ভব অনেকের পক্ষে — মোনাজাতউদ্দিন তার প্রমাণ। কেউ কেউ আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সংগ্রাম ও সৃষ্টির সঙ্গে মোনাজাতের এ-অবস্থার সাদৃশ্য কল্পনা করেন। এ কল্পনা অমূলক নয়। আসলে শতপ্রতিকূলতা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন মোনাজাতউদ্দিন — তাঁর যুদ্ধ প্রকাশ্যে দৃশ্যযোগ্য বা দু-চার বছরের ছিল না— আজীবন এক অদৃশ্য-সংগ্রাম ছিল তাঁর নিয়তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবেদনশীল সংবাদ সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত। সে-দিক থেকে মোনাজাতের সংবাদ-প্রতিবেদনগুলোর প্রায় সবই সাহিত্যগুণসম্পন্ন—সেগুলোতে গল্পের ভঙ্গি ও ভাষা। এই বিশেষ ভঙ্গি ও ভাষা তিনি অনেক ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছেন। একটি গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন : 'আমি গল্পকার নই। তবু গল্পের মতো করেই বিভিন্ন চরিত্র এবং তাঁদের কাহিনী পরিবেশনের চেষ্টা করলাম' (নিজস্ব রিপোর্ট : ১৯৯৩)। আসলে তাঁর দেখা গ্রামের জীবন্ত চরিত্রাবলির যাপিত কঠিন বাস্তবতা তিনি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন নিজস্বরীতি। সংবেদনশীল এই রীতি সাংবাদিকতার বিদ্যায়তনিক মানদণ্ডে কোন মূল্য পাবে তা জানি না। তবে পাঠকের মনোরাজ্যে যে এর আসন অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে তা নিশ্চিত। যে-কারণে সংবাদপত্রপাঠক মোনাজাতের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। তাঁর লেখায় প্রায়ই ব্যবহার হতো তুলনা; সাহিত্যে যাকে উপমা বলে। যেমন : 'ডিমের কুসুম রঙের ভুট্টার দানা প্রখর রৌদ্রের ছটায় যেনো সোনার মতো জ্বলছে।' বা 'শাকের পোকার মতো ছেলেটি, গোলাম মোহসিন, চিলমারী থানার পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, হকচকিয়ে ওঠে' (চিলমারীর একযুগ : পৃ. ১৯ ও ২১)। এই ভাষাকে কবিত্বময় বলতেই হয়। মোনাজাত যখন প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যত্র লেখেন : 'শিয়রে টিমটিমে কুপির সলতে কেরোসিন শুষে খেতে খেতে ক্লান্ত, একটু একটু লাফাচ্ছে শিখাটা, বোধ হয় এক্ষুনি নিভে যাবে, কামরাটা গিলে খাবে অন্ধকার' (লক্ষ্মীটারী : ১৯৯৬ : পৃ. ১২)। তখন না-বলে উপায় থাকে না, সংবাদ সংগ্রহ না-করে মোনাজাত যদি কাব্যচর্চা করতেন তা হলে বড় কবি হতে পারতেন।

এক কথায় বলা চলে, মোনাজাতউদ্দিন সংবাদকে সাহিত্যের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে একে করে তুলেছিলেন সংবাদসাহিত্য। তিনি কলম দিয়ে সংবাদচিত্র এঁকেছেন; এখানেও সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন অন্য আর দশজন থেকে আলাদা।

মোনাজাতউদ্দিনের প্রকাশিত ১১টি গ্রন্থকে দুই খণ্ডে সংকলিত করে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর রচনাসমগ্র। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্প-নাটক-ছড়া সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ, চিঠিপত্রও স্থান পেয়েছে এ সংকলনে।

কাজটি ছিল যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ ও দুরূহ। এ কাজে সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও যাঁরা আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন : ড. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, কাজল রশীদ শাহীন, মানিক সরকার মানিক, বিপ্লব প্রসাদ, আসাফা সেলিম, সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, আশরাফ কায়সার, শামসুজ্জামান হীরা ও নাসিমা মোনাজাত ইতি। তাঁদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স. আরেফিন সিদ্দিককে যিনি শতব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হককে ধন্যবাদ জানাই সমগ্রটি প্রকাশ করবার জন্য।

সময়স্বল্পতার কারণে গ্রন্থটিতে মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।

আশা করি মোনাজাতউদ্দিন রচনাসমগ্র পাঠকমহলে সমাদৃত হবে, বিশেষ করে যাঁরা সাংবাদিকতা ও গবেষণাকর্মে নিয়োজিত তাঁদের কাজে আসবে।

জানুয়ারি ২০১০

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ থেকে পথে

উৎসর্গ

আলিমউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)
মতিজান নেছা
মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান
আজিজা সুলতানা
আমার জীবনের ঘনিষ্ঠ এই চারজনকে

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯১ প্রকাশক : লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনমিনে কণ্ঠে বললাম, 'একটা চাকরি'

'৭৬ সালের মে মাস। ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা মিছিল বেরুবে রাজশাহী থেকে। ১৬ তারিখে মিছিল, আমি তার দু'দিন আগে রাজশাহী শহরে আস্তানা গাড়লাম। 'সংবাদ'-এ তখনও আমার চাকরি হয়নি তবে খবর-সবর পাঠাই, প্রায় প্রতিদিন তা নামে ছাপা হয়। বার্তা সম্পাদক ছিলেন তখন সন্তোষদা, মানে এখানকার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ও 'অনিরুদ্ধ' নামের প্রখ্যাত কলামিস্ট শ্রীসন্তোষ গুপ্ত। 'আজাদ' যখন বন্ধ, অনেকের মতো বেকার, একটি কীটনাশক ওষুধ কোম্পানিতে চাকুরি করি, সন্তোষদাকে চিঠি লিখলাম একটি চাকরি পাওয়া যায় কি-না! সন্তোষদা পোস্টকার্ড পাঠালেন কয়েক লাইনের, যার অর্থ দাঁড়ায় : 'সংবাদ'-এর জন্যে উত্তরাঞ্চলভিত্তিক খবর ও ছবি পাঠাতে পারেন, ভালো হলে তা ছাপাও হবে, কিন্তু চাকরির ব্যাপারে আমি কোনো সুপারিশ করতে পারব না, আপনার নিজের কাজের যোগ্যতায় যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আদায় করতে পারেন, করুন। পরে শুনলাম, 'সংবাদ'-এ এখন কোনো পদ-ই খালি নেই, পত্রিকা বন্ধ থাকবার পর কেবলি খুলেছে, পুরাতনদেরই অনেককে এখন পুনঃনিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

তবু কাজ করে যেতে লাগলাম। রোজ রোজ খবর আর ছবি-ফিচার পাঠাই, বেশ গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়। নিয়োগপত্র না থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি 'আইটেম' সন্তোষদা 'লিড' (প্রধান শিরোনাম) হিসেবে ছাপালেন। উৎসাহ বেড়ে গেল, কাজের যোগ্যতা দেখিয়েই 'সংবাদ'-এ ঢুকতে হবে। পকেটের পয়সা খরচ করে এদিকে-ওদিকে ট্যুর শুরু করলাম। ব্যাপারটা জেদের মতো হয়ে দাঁড়ালো। এমন সব খবর আর ছবি পাঠাব, সংবাদ যেন ছাপাতে বাধ্য হয়। এজন্যে অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে, পত্রিকাটি কী ধরনের নিউজ চায়, তার পলিসি কী।

ফারাক্কা মিছিলের খবর শুনে এসে পৌছুলাম রাজশাহী শহরে। কিন্তু নিয়োগপত্র ছাড়া একজন সাংবাদিক, কোথায় পাত্তা পাব? তা ছাড়া 'সংবাদ' থেকে দুজন ঝানু রিপোর্টার আর দুজন ফটোগ্রাফার ইতোমধ্যেই রাজশাহীতে পাঠানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে মিছিল কাভার করার জন্যে। তাদের সাথে কথা বলাও মুশকিল, পাত্তা দিতে চায় না। ঢাকা থেকে আসা নামিদামি সাংবাদিকদের সাথে ওঠা-বসা, কথাবার্তা, ভীষণ এক ব্যাপার! আমি তাদের পাশে পাশে ঘুরতাম, ভয়ে ভয়ে, বিনয়ের সাথে। তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম আর অবাক হয়ে যেতাম! আহ্, কী-রকম সুন্দর এই ঢাকার সাংবাদিক! কী-রকম কায়দা করে হাঁটে, কী-রকম কথা কয়! আমি যদি এইরকম হতে পারতাম!

'সংবাদ' থেকে আসা একজন রিপোর্টার, পরে যিনি আমার সহকর্মী হয়েছিলেন, আমাকে বলেন দোকান থেকে সিগারেট কিনে আনতে। আনি। পান আনতে বলেন। আনি। ফটোগ্রাফার জানতে চান, রাজশাহী শহরে 'ইয়ে' কোথায় পাওয়া যায়। হাত ইশারা করে বেঁটে-খাটো বোতলের আকার বোঝান তিনি। বুঝতে পারি। বিনয়ের সাথে দেখিয়ে দিই। আরেকজন, হাতের তালু গোল করে জানতে চান, এখানে 'ইয়ে' পাওয়া যায় না? বুঝতে পারি তিনি কী চান। মনে মনে বলি, সাংবাদিকতা করতে এসে মদ-বেশ্যার দালালি করতে হবে নাকি? কিন্তু মুখে বিনয়ী থাকি। প্রতিবাদ করলে যদি মাইন্ড করে? ঢাকায় গিয়ে যদি বলে দেয় যে, ছেলেটি কথা শোনে না। আমার তো সবার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। চাকরি চাই, নিয়োগপত্র পেতে হবে।

১৬ মে মিছিল শুরু হয়। মিছিলের আগে মাদ্রাসা ময়দানে জনসভা। ভাসানী এলেন নীল গাড়িতে চেপে। জনসমুদ্র গর্জে উঠল। খুব অল্প সময়ের জন্যে তিনি বক্তৃতা করলেন। বহু সাংবাদিক, বহু ফটোগ্রাফার। এরই ভেতর কোনোরকমে কয়েকটি ছবি তুললাম মঞ্চের নিচে থেকে। মঞ্চে ওঠার চেষ্টা করেছিলাম, উঠতে দেয়নি, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে নিচে। আপনি কোন্ পত্রিকার? পরিচয় দিতে পারি না। নিয়োগপত্র নেই, নেই পরিচয়পত্র।

মঞ্চে ভাসানীর বক্তৃতার পর চলে এলাম রাস্তায়। এই রাস্তা ধরেই ভাসানী এগিয়ে যাবেন, অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে মিছিলটি শুরু হবে। আমার ছবি তোলার আদৌ প্রয়োজন নেই, তার ওপর ছোট্ট ভাঙা ক্যামেরা। তবু ছবি তুলছি একের পর এক। কী হবে জানি না, তবু তুলে রাখি। আসলে নিছক একটা খেয়াল কাজ করছিল।

ভাসানী মঞ্চ থেকে রাস্তায় নামলেন। ফটোগ্রাফাররা দৌড়ে গিয়ে উঠলেন একটা হুডখোলা জীপের ওপর। এই জীপটি মিছিলের আগে-আগে যাবে। জীপ থেকেই মিছিলের ছবি তোলা হবে। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম। জীপের ড্রাইভার ভুলে নাকি অজ্ঞতাবশত গাড়িটির মুখ ঘুরিয়ে নিল পূর্ব দিকে। অর্থাৎ মিছিল যেদিকে যাচ্ছে, তার ঠিক উল্টোদিকে। ফটোগ্রাফাররা সব লাফালাফি শুরু করে দিল গাড়ির পাটাতনেই। তারা 'গাড়ি ঘোরাও', 'গাড়ি ঘোরাও' বলে চিৎকার জুড়ল। কিন্তু মিছিলের মানুষ বানের তোড়ের মতো ধেয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ। প্রচণ্ড ভিড় আর চাপ। জীপ ঘোরানো অসম্ভব। কী আর করে তারা! জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে মিছিলের অগ্রভাগে ছুটল, কিন্তু মানুষের বানে এগোনো অসম্ভব ব্যাপার। আর ভাসানীকে সামনে নিয়ে মিছিলটি ইতোমধ্যে এগিয়ে গেছে সামনে, আধ মাইলের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দেখলাম ভাসানীকে সামনে রেখে ছবি পাওয়া আমাদের ফটোগ্রাফারদ্বয়ের পক্ষে অসম্ভব। অথচ, এইরকম ছবি তোলা আছে আমার ক্যামেরায়। ভাসানী মঞ্চ থেকে নামবার সাথে সাথেই ভাসানীসহ মিছিলের ছবি তুলে রেখেছি। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম এই ছবি নিয়ে এক্ষুনি ঢাকার পথে রওনা হব। রাত বারোটার আগে পৌছুতে পারলেও ছবিটি হয়তো ধরানো যাবে। মিছিল এগুতে লাগল, আর আমি মাদ্রাসা ময়দান থেকে সোজা চলে এলাম উল্টোদিকে, নাটোর বাসস্ট্যান্ডে। নাটোর থেকে ঈশ্বরদী যাব দুটোর 'রকেট' ধরে, তারপর আবার বাসে করে পাবনা হয়ে নগরবাড়ি ঘাট। পকেটে মাত্র পঞ্চাশটি টাকা। আমি মোটামুটি একটা ধারণা করে নিলাম যে, পরিস্থিতি যা সৃষ্টি হয়েছে তাতে 'সংবাদ'-এর ফটোগ্রাফার দুজনের মধ্যে কারোরই সম্ভব নয় ছবি বা ফিল্ম ঢাকায় পাঠানো (অবশ্য, অন্যান্য পত্রিকায় ফিল্ম গেছে বিবিসি প্রতিনিধির গাড়িতে)।

নাটোর বাসস্ট্যান্ডে আসবার সাথে সাথেই দেখি একটা লোকাল বাস ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চেপে বসলাম। ঠিক দুটোয় নামলাম নাটোর স্টেশনের পাশের রাস্তায়। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেইসাথে ঝোড়ো বাতাস। তাকিয়ে দেখি, রকেট ট্রেনখানা প্ল্যাটফরম থেকে কেবলি ছেড়ে দিয়েছে। এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। স্পীড নেবে। মহা মুশকিল। এই ট্রেন ধরতে না পারলে ঈশ্বরদী পৌছানো অসম্ভব, আর কোনো উপায় নেই। কী করি! সোজা এসে দাঁড়ালাম রেললাইনের ওপর। ইঞ্জিনখানা এগিয়ে আসছে, ড্রাইভারের মুখ দেখা যায়, তিনি মুখখানা কাত করে আমাকে দেখছেন। আমি একেবারে বেপরোয়ার মতো দাঁড়িয়েছি, যেন ট্রেন থামাতেই হবে। এই অবস্থায়, আমি ইঞ্জিনের সামনে দুহাত জোড় করে দাঁড়ালাম। কাঁধের ক্যামেরাটি উঁচিয়ে দেখলাম তাঁকে। ড্রাইভার সাহেব, পরে পরিচয় হলো, ননবেঙ্গলি, পার্বতীপুরে বাড়ি, তাঁর এক ছেলে আমাদের সাথে পড়ত, তিনি, লক্ষ করলাম গাড়ির গতি কমিয়ে এনেছেন। লাইন থেকে সরে দাঁড়ালাম। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে পড়ল। লাফিয়ে উঠলাম ইঞ্জিনে, ড্রাইভার সাহেবের আঁটো ঘরটিতে। 'কেয়া হুয়া?' বাংলা-উর্দুতে কোনোরকমে বোঝালাম আমার পরিচয় আর ঈশ্বরদী যাবার প্রয়োজনীয়তা। ভাসানীর কথা শুনে ড্রাইভার সাহেব খুব খুশি। একবার ভাসানী গিয়েছিলেন পার্বতীপুরে, মিটিং করেছিলেন, সেখানে নাকি হাজির ছিলেন ইব্রাহিম নামের ঐ ড্রাইভার। ট্রেন চালাতে চালাতে সেই গল্প শোনালেন। আমার মাথায় তখনও ঝড় বইছে। যেভাবেই হোক, রাত বারোটার আগে ঢাকা পৌছুতে হবে।

ঢাকায় পৌছুলাম এগারোটায়। অফিস তখন বংশালে, সেখানে যেতে যেতে সাড়ে এগারোটা বাজল। দেখি, সন্তোষদা তাঁর টেবিলে বসে আছেন দুহাতে মাথা গুঁজে। রাজশাহী থেকে ছবি তো পাননি, কোনোরকম খবরও এসে পৌছায়নি।

আমি আদাব জানালাম। ফিরে তাকালেন সন্তোষদা। আমাকে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, জড়িয়ে ধরলেন বুকে। বললেন, আমি ঠিকই ধারণা করেছিলাম, আপনি আসবেন। ছবি এনেছেন? ফিল্মটা দিন, আপনি বসুন। আমি আপনার খাবারের ব্যবস্থা করি। এই বলে, নিজেই অফিসের বাইরে চলে গেলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষদা। একটু পরেই নান আর গরুর মাংস এলো। আর চা। আমি লিখতে বসলাম। লেখার পর খাওয়া।

পরদিন 'সংবাদ'-এর প্রথম পাতায় ফারাক্কা মিছিলের লিড নিউজ এলো ছয় কলাম জুড়ে। খবরটি ছাপা হলো নামে। দুটি ছবিও ছাপা হলো নাম দিয়ে। রাতে, অফিসেই পত্রিকার ফাইলের ওপর শুয়ে থাকলাম। আনন্দে ঘুম আসে না।

সকালবেলাই টেলিফোন। সন্তোষদা বাসা থেকে ফোন করেছেন। জানালেন, আহমদুল কবির সাহেব আমার সাথে কথা বলতে চান। ঠিক এগারোটায় অফিসে আসবেন তিনি। আমি যেন হাজির থাকি।

অপেক্ষা করছি। সময়মতো এলেন কবির সাহেব। ডাকলেন কামরায়। দরজা ঠেলে ঢোকার সাথে সাথেই প্রথম কথা, 'তোমার কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি। কী চাও তুমি?' এই শুনে, হাঁটু বুক গলা তিন-ই কেঁপে উঠল আমার। মিনমিনে কণ্ঠে বললাম, 'একটা চাকরি।'

(বগুড়া থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন 'স্পর্ধা'য় লেখাটি ছাপা হয় ফেব্রুয়ারি '৯০তে।)

তিতপল্লার অ্যাসাইনমেন্ট

AMARBOI.COM

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর একটা সিরিজ প্রতিবেদনের কাজে ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম। কেবলই কাজে হাত দিয়েছি, এসময় ঢাকা থেকে মনজুরুল আহসান বুলবুলের মারফত মেসেজ এলো : কী একটা জরুরি ব্যাপারে বজলু ভাই খুঁজছেন, টেলিফোনে তাঁর সাথে কথা বলতে হবে। বজলু ভাই মানে বজলুর রহমান, সংবাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক।

৪ এপ্রিল, উননব্বই। রাত দেড়টার দিকে বজলু ভাইয়ের সাথে টেলিফোনে কথা হলো বাসায়। অফিস থেকে কেবলই তিনি বাসায় ফিরেছেন। খুব ঠাণ্ডাভাবে তিনি অ্যাসাইনমেন্ট বুঝিয়ে দিলেন। ময়মনসিংহের কাজ আপাতত রেখে ভোরবেলা আপনাকে জামালপুর যেতে হবে। সেখান থেকে তিতপল্লা নামের একটি গ্রামে। ঐ গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুর ইজ্জত আলীর ছেলে অনাহারে মারা গেছে। ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে স্টোরি পাঠাতে হবে তাড়াতাড়ি। অনুসন্ধানমূলক লেখা চাই, ছবি চাই, কিন্তু কাজ করতে হবে সাবধানে। প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠ হওয়া চাই। বাকি রাতটুকুর ঘুম হারাম হলো। কোথায়, কতদূরে তিতপল্লা গ্রাম? কোথায় ইজ্জত আলীর বাড়ি? কীভাবেই বা তার ছেলেটি মারা গেল? কে সংবাদ-এ ব্যাপারটি জানালো? তিতপল্লার যোগাযোগ-ব্যবস্থা কী? কাজ শেষ করে কবে ফিরতে পারব ময়মনসিংহে? নাকি ফিরে যেতে হবে ঢাকায়? এইরকম হাজারো চিন্তাভাবনায় রাত কাবার হলো। ভোরে উঠেই জামালপুর যাত্রা।

৫ এপ্রিল। জামালপুর। স্টেশন থেকে প্রথমে গেলাম উৎপলদার বাসায়। উৎপল-কান্তি ধর আমাদের সংবাদ-এর জামালপুর প্রতিনিধি, ইচ্ছে ছিল তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে তিতপল্লা গ্রামের খোঁজে বেরুব। কিন্তু তিনি শহরে বেরিয়েছেন। বাজার করে দিয়ে কোথায় যেন যাবেন। তাই চলে গেলাম জেলা প্রশাসকের অফিসে। সেখানে তিতপল্লা গ্রামের দিক-নির্দেশনা অন্তত পাওয়া যাবে। জেলা প্রশাসক খবরটি পেয়েছেন কি না, পেলে কীভাবে পেয়েছেন তাও জানা যাবে। জেলা প্রশাসক, আবদুর রশিদ সাহেব আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। জামালপুরের আগে মাদারীপুরে ছিলেন। ৪/৫ বছর আগে দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা-পরবর্তী খাদ্য-পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট করতে গিয়েছিলাম, তখন পরিচয়। জামালপুরে আসবার পরেও তার সাথে বেশ কবার দেখা হয়েছে। রশিদ সাহেবের কামরায় ঢুকে দেখি অনেক লোকজন। জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসার। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' পালনের ওপর একটি মিটিং হবে, তারই প্রস্তুতি চলছে। আমাকে দেখে রশিদ সাহেব অবাক। আপনি? জামালপুরে? কিছু একটা ঘটল নাকি?

কামরায় অন্যান্য সবার সাথে পরিচয় হলো। খুচরো আলাপসালাপের সাথে ধূমায়িত চা আর বিস্কিট। কথাবার্তা শুনে মনে হলো না এই জেলার কোথাও কিছু ঘটেছে। খাদ্য-পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বলা হলো, খুব নিশ্চিত বক্তব্য—'সব ঠিক হ্যায়'। শুনে বললাম, তিতপল্লা গ্রামটা কোথায়? উপস্থিত সবাই চিনলেন। তিতপল্লা শুধু একটা গ্রাম নয়, বিরাট একটা ইউনিয়ন। সেখানে অনেক গ্রামের মধ্যে তিতপল্লা নামের একটি গ্রামও আছে। তিতপল্লা জামালপুর শহর থেকে ৮/৯ মাইল দূরে, জামালপুর-টাঙ্গাইল পাকা সড়কের ধারেই। কিন্তু হঠাৎ তিতপল্লা গ্রামের খোঁজখবর কেন? কী ঘটেছে ওখানে? সিরিয়াস কিছু? রশিদ সাহেবের এতসব প্রশ্নের মুখে আমি বললাম, ঐ গ্রামের ইজ্জত আলী নামে এক দিনমজুরের ছেলে অনাহারে মারা গেছে। ব্যাপারটা ঠিক কি না জানতে সেখানে যাব। শুনে উপস্থিত সবাই আমার কথা প্রায় উড়িয়ে দিলেন। দূর, ওসব বাজে কথা। অনাহারে কেউ মারা গেলে আমরা ঠিকই রিপোর্ট পেতাম। তিতপল্লার ইউপি চেয়ারম্যান গতকালও এসেছিলেন, তিনি কিছুই জানাননি। উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও এঁরাও কিছু জানেন না। 'না না, এ তিতপল্লায়ই যাব' এই বলে আমি উঠলাম। রশিদ সাহেব বললেন, 'একটু দাঁড়ান, আমি একজন অফিসার দিই। ব্যাপারটা সত্যি হলে তিনিও দেখে আসবেন।' তিনি টেলিফোনে সদরের ইউএনওকে ডাকলেন। এক্ষুনি তিতপল্লা রওনা দাও, ফিরে এসে আমাকে রিপোর্ট করো। তৎক্ষণাৎ একটা গাড়ি জোগাড় হলো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা রওনা হলাম।

তিতপল্লা বিরাট ইউনিয়ন এলাকা। অনেকগুলো গ্রাম। ইজ্জত আলী নামের লোকের সন্ধান পাওয়া গেল জনা পাঁচেক। কোন্ ইজ্জত আলী দিনমজুর? কার ছেলে অনাহারে মারা গেছে? খোঁজ খোঁজ।

ঘণ্টাখানেক এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে শেষ পর্যন্ত দিনমজুর ইজ্জত আলীর সন্ধান মিলল। তার একটি ছেলে মারা গেছে কদিন আগে। গ্রামের নাম ছাইতানী পাড়া। রওনা দিলাম সেখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইজ্জত আলীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটা ছোট্ট বাজারে দাঁড়িয়েছি। দিনমজুরের সন্তান মারা যাবার প্রসঙ্গে কজন বলল, লোক মরনে না ক্যান ছার? চাউল আটার যেই দাম! মানুষ কিনব কী কইর‍্যা?

: কত করে চাল?

: বিশ টাকা। আটা নয় টাকা।

বিশ টাকা চাল! বলে কী! এ তো কেউ বলেনি এতক্ষণ? আসলেই কি চাল আটার দাম এত চড়ে গেছে? সঙ্গে সঙ্গে গেলাম বাজারে চাল আটার দোকানদারদের কাছে। আমদানি খুব কম। ক্রেতাও তেমন নেই। সামান্য কিছু চাল আটা সাজিয়ে বসে আছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। কথা বলে জানা গেল চালের সের সত্যি সত্যি বিশ টাকায় উঠেছে। লাল রঙের আটা নয় টাকা। শুনে গায়ে যেন কাঁপুনি ধরল। এইরকম পরিস্থিতির খবর প্রশাসনের কাছে এখনও পৌছায়নি! কেন? লোকজন বলল, এ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে দশ-বারো দিন আগে থেকে।

ছাইতানী পাড়া গ্রামে গেলাম। বেকার দিনমজুর ইজ্জত আলী বাড়িতেই ছিল, তার সাথে আলাপ হলো। তার সাত ছেলেমেয়ে, এদেরই একজন খালেক, মারা গেছে অনাহারজনিত অপুষ্টির শিকার হয়ে। সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার পর কিছু ছবি তোলা হলো। তারপর সোজা জামালপুর শহর। ইজ্জত আলীর ছেলেটি মারা যাবার ঘটনাটি ঢাকায় পাঠানোর আগে চাল আটার মূল্যবৃদ্ধির খবরটি জানানো দরকার।

উৎপলদার বাসায় এসে নামলাম। ইতোমধ্যে তিনি ফিরেছেন এবং আমার আসার খবর পেয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাও করেছেন। দাদা বললেন, রিপোর্টটি পরে লিখুন, তার আগে কিছু মুখে দিয়ে নিন। আসলে সকাল থেকে একটানা ঘোরাঘুরি, কাজ আর টেনশনে খুবই ক্ষুধার্ত, অসুস্থবোধ করছিলাম। খাওয়া এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু মাথায় ঝড় বইছে। সন্ধ্যার আগেই রিপোর্ট ঢাকায় পৌছাতে হবে।

নিরিবিলি একটা টেলিফোন পাওয়া গেল। এন. ডব্লিউ. ডি.-তে ঘুরিয়ে খুব সহজে সংবাদে লাইন মিলল। 'রিং ব্যাক' করতে বললাম। মিনিট কয়েকের মধ্যে টেলিফোন বাজল এবং আমাদের সাব-এডিটর ফরহাদ মাহমুদের কণ্ঠস্বর। খুব ধীরেসুস্থে রিপোর্টটি লিখে নিলেন তিনি। আধঘণ্টার মতো সময় লাগল পুরো বিবরণটি পাঠাতে।

তিন কলাম লিড হিসেবে পরদিন খবরটি ছাপা হলো, 'জামালপুরের গ্রামাঞ্চলে চালের সের বিশ টাকা'। আমি তখন আর জামালপুরে নেই, ভোরবেলাতেই একটা ট্রেনে চেপে ময়মনসিংহ শহরে চলে এসেছি। প্রশাসনের লোকজন আমাকে খুঁজছেন। কিন্তু পাবেন কোথায়?

তারপর জামালপুরে বাণিজ্যমন্ত্রী। খাদ্যমন্ত্রী। 'জামালপুরে কি হইতেছে?' ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়। খাদ্য বিভাগের লোকজনদের ঘন-ঘন জামালপুর যাত্রা। খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে চাল দেওয়া হলো। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে ৫০ লাখ মণ চাল বরাদ্দ হলো। অবশ্য সরকারি প্রচার-মাধ্যমে বারবার বলা হচ্ছিল, দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদ্য-পরিস্থিতি সন্তোষজনক। সন্তোষজনক হলে আবার খোলাবাজারে চাল বিক্রি করতে হয় কেন?

ময়মনসিংহে গিয়ে আবার মূল অ্যাসাইনমেন্টের কাজ শুরু করেছি। ইচ্ছে ছিল অ্যাসাইনমেন্টের ফাঁকে ফাঁকে জামালপুরের অন্যান্য প্রতিবেদনগুলো লিখে পাঠাবো। বিশেষ করে ইজ্জত আলীর ছেলেটি কীভাবে মারা গেল, সেই বিবরণটি। কিন্তু হলো না। সংবাদ থেকে আবার মেসেজ এলো ঢাকা যেতে হবে। আমাদের সম্পাদক আহমদুল কবির সাহেব ডেকেছেন, জরুরি কিছু বলতে চান।

সেইদিন 'পদ্মা' ধরে রওনা হলাম ঢাকার পথে। আবার কেন তলব? আবার কি নতুন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট?

(মিডিয়া, ১৬ অক্টোবর '৮৯। সম্পাদক : ফারহিম ভীনা)

মনতলার পথে—

হাঁটছি। পথ-রাস্তা-সড়ক বলতে সাধারণত যা বোঝায় আমাদের সামনে তা নেই, যতদূর চোখ যায় শুধু বালুচর। ভরাট-প্রায় এবং শুকিয়ে-যাওয়া ব্রহ্মপুত্রের চরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা দুজন : আমি আর রিভু নামের এক তরুণ। ওর বাড়ি চিলমারী সদরে।

সঙ্গে ব্যাগ, টুকিটাকি জিনিসপত্র, লুঙ্গি-গামছা, পেস্ট, টুথব্রাশ, ওষুধ, ক্যামেরা, ফিল্ম, ডায়েরি। কিন্তু একটা ছাতা নেওয়া উচিত ছিল। সকাল এগারোটার রোদে চারিদিক যেন ঝলসে যাচ্ছে, পায়ের নিচে মোটা দানার বালু তেতে উঠেছে, কপালের ঘাম চুয়ে চুয়ে পড়ছে চোখে, জ্বালা করছে। একটা রুমালও নেই। সূর্যের তাপ থেকে সাময়িক রক্ষা পাবার জন্যে লুঙ্গি এবং গামছা বের করে দুজনে মাথায় দিলাম। দুপুরে যে কী অবস্থা হবে কে জানে! আমরা কেবল চার-পাঁচ মাইল হেঁটে এসেছি, সামনে আরও দশ-এগারো মাইল। যাব আমরা মনতলা গ্রামে। ব্রহ্মপুত্র-পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর কিছু তথ্য সংগ্রহ করব। প্রধানত আমরা দেখতে চাই, কুড়িগ্রামের মতো একটি অবহেলিত জেলার অভাবী চিলমারী (উপজেলা) সদর থেকে পনেরো-ষোলো মাইল দূরের একটি গ্রাম-জনপদে তথ্যশূন্যতার ব্যাপারটি কীরকম। সেখানে বিদ্যুৎ-সুবিধা পৌঁছেনি, টেলিভিশন চলে না। থাকতে পারে ব্যাটারিচালিত টেলিভিশন, কিন্তু তা কেনার সাধ্য আছে কারও? কেউ কিনেছে? গ্রামে রেডিও ট্রানজিস্টার আছে কজনের ঘরে? পত্রিকা কি যায়? লোকজন পড়ে? প্রত্যন্ত এলাকার লোকজন তা হলে দেশ-দুনিয়ার খবরাখবর রাখে কী করে? সরকারের দেওয়া কোনো 'মেসেজ' তারা কী করে পায়?

আরেকটা বিষয় ছিল অনুসন্ধানের। তা হলো : চলমান রাজনীতি সম্পর্কে ঐ গ্রামের লোকজনদের ধারণা কী? রাজনীতির কতটা খবর রাখে তারা? কোন্ দলের কত নেতাকর্মী-সমর্থক? রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে তারা কতটা জানে? নির্বাচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে কীভাবে তারা ভোট দেয়? কীভাবে ভোট কেনা-বেচা হয়? স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কীভাবে ভোট ও ভোটারদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে? ক্ষমতার উৎস বলতে কী কিংবা কাকে বোঝায় সেখানকার মানুষ?

হাঁটছি তো হাঁটছি। এ পথের যেন শেষ নেই। বালুর ওপর স্যান্ডেল পরে হাঁটা ভীষণরকম সমস্যা, একেই পা পিছিয়ে আসে, পায়ে-পায়ে গরম বালু ঢোকে পায়ের পাতায়। একবার কিছুক্ষণের জন্যে স্যান্ডেল খুলে হাতে ঝোলালাম, কিন্তু হাঁটা অসম্ভব, বালু এতই তপ্ত হয়ে উঠেছে যে যেন ফোস্কা পড়বে পায়ের পাতা আর গোড়ালিতে। আবার স্যান্ডেল গলিয়ে নিতে হলো। আসলে, ভুল হয়েছে আমাদেরই। কেড্‌স্ জাতীয় কিছু পরে আসা উচিত ছিল। দরকার ছিল বিস্কিটের মতো হালকা খাবার, পানি, চা। কিন্তু অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে এখন এইসব ভুলভ্রান্তি ভেবে লাভ কী? জীবনের যাবতীয় হিসেব যার ভুলে ভরা, সহজ অঙ্কটিও মেলে না যার খাতায়, নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে দোষ দেওয়া ছাড়া কী আর সে করতে পারে এইসব বিড়ম্বনার মুহূর্তে? তবুও, ভাবলাম, চিলমারীতে থাকতেই এইসব সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবা উচিত ছিল এবং আমি আর রিভু একমত হলাম, মনতলা থেকে ফিরব আমরা রাতের বেলা। পানি এবং হালকা খাবারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পথ দেখানোর জন্যে একজন লোকের ব্যবস্থা করতে হবে। রাতে কি এখন চাঁদ থাকে? হ্যাঁ, এখন শুক্লপক্ষ। তবু একটা টর্চ এবং লাঠি হাতে রাখতে পারলে ভালো।

একটু ছায়া কোথাও নেই। সামনে পাওয়া গেল ছড়ার মতো একটা বদ্ধ খাল। স্বচ্ছ পানি। পা ডুবিয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণ। কিন্তু পানিতে প্রথম পা ফেলতে-না-ফেলতেই রিভু লাফিয়ে সরে এলো। পানি প্রচণ্ড গরম। পানিতে পা ডুবিয়ে রাখব কী, খাল পেরুতেই চিন্তা। স্যান্ডেল খুলে প্যান্ট গুটিয়ে খপাং-ঝপাং করে দুজনে পেরুলাম বিশ-পঁচিশ হাত প্রস্থের খালটি। এইরকম খাল কি আরও আছে সামনে? কে জানে!

এতক্ষণে দেখা মিলল একসাথে কয়েকজনের। প্রায়-উলঙ্গ ছজন কিশোর-কিশোরী। ছেলেদের পরনে ইজের প্যান্ট, একজনের হাঁটু পর্যন্ত তোলা লুঙ্গি। দুজন কিশোরীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়টির পরনে প্যান্ট, কিন্তু ফ্রক নেই, একখানা অতি ছেঁড়া-বিবর্ণ গামছা বুকে জড়িয়ে আছে। ছোট মেয়েটি, বয়স পাঁচ-ছয় বছর, শাড়ি-ছেঁড়া এক টুকরো ত্যানায় কোমর-উরু প্যাঁচানো। আমরা যতই কাছাকাছি আসছি, লক্ষ করলাম ওরা সরাসরি সামনে না এগিয়ে বাঁ দিকে সরে সরে যাচ্ছে। রিভুকে বললাম, ওদের ডাকেন, ছবি তুলব, কথা বলব।

স্থানীয় ভাষায় রিভু ডাক দিল ওদের হাত-ইশারা করে। ওরা কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, তারপর কী ভেবে একযোগে সবাই দিল ছুট। বালুর ওপর দিয়েই দৌড়ুচ্ছে। কী ব্যাপার? রিভু বলল, ভয় পেয়েছে বোধহয়।

মাথার মধ্যে হঠাৎ কী খেয়াল চাপল, আমিও হঠাৎ দৌড় দিলাম ওদের দিকে। লম্বা পা, বালুতে খসাখস, শব্দ হচ্ছে বিচিত্র। পেছনে ফিরে দেখি রিভুও কী ভেবে দ্রুত পা ফেলে আসছে। রোদজ্বলা ব্রহ্মপুত্রের চরে বিচিত্র এক অঙ্গভঙ্গিতে আমরা যে যার উদ্দেশ্যে দৌড়ুচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের একজনের হাতে ছিল ভাঙা একটা ডালি, তিনজনের হাতে চটের বস্তা, বাকি দুজনের হাতে কাস্তে। আমাদের সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পারল না। প্রথমে বুকে গামছা প্যাঁচানো কিশোরীটি বালুর ওপর বসে পড়ল। তারপর মুখ হাঁ করে কান্না জুড়ে দিল। দাঁড়িয়ে পড়ল অন্যান্যরাও। হতভম্ব। চোখেমুখে আতঙ্ক। অজানা অচেনা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে ওরা খুব অসহায়, যেন নিজেদের সমর্পণ করেছে ভীষণ কিছু ঘটে যাবার মতো পরিস্থিতির কাছে।

পরে, আলাপ যখন জমল, তখন জানলাম ওরা নাকি ভেবেছিল আমরা ওদের ধরে ধরে 'ইনজেকশন' দেব। কিন্তু তার বদলে প্রত্যেকে পেল পাঁচটি করে টাকা। খুব খুশি। কোথায় বাড়ি, কোথায় যাচ্ছি, এইসব নানা প্রশ্ন। যে-কিশোরীটি এতক্ষণ কাঁদছিল, সে দেখি বেশ মুখরা। গড়গড় করে বলল ওদের নিজেদের কথা। ওরা ডানির চরে থাকে, এখান থেকে যাচ্ছে মূল ব্রহ্মপুত্রের ধারে। কেউ খড় কাটবে, কেউ জংলা ডালপাতা কুড়াবে, বস্তাবন্দী করে ফিরে যাবে নিজ গ্রামে, সন্ধ্যার আগেই। কাল সকালে সেসব বিক্রি করতে নিয়ে যাবে মনতলা হাটে। সেখানে হাটের দিন সকালবেলা বাজার বসে। প্রতি বোঝা জ্বালানি বিক্রি হবে চার-পাঁচ টাকায়।

সকালে তোমরা কী খেয়েছ? দুপুরে খাবে কোথায়? কী খাবে? ওরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল। যেন কোনো অদ্ভুত কথা শুনছে।

পরে জানা গেল, ছজনের মধ্যে তিনজন কাল রাতে খেয়েছে ভাত, দুজন খেয়েছে দুটুকরো করে রুটি আর গুড়, একজন খেয়েছে শুধু একমুঠো ছোলাভাজা। আজ সকালে ছ'জনের মধ্যে একজন খেয়েছে পান্তা, একজন খেয়েছে শুকনো রুটি একখণ্ড, একজন একমুঠো মুড়ি। বাকি তিনজন এখন পর্যন্ত কিছুই খায়নি। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে গিয়ে যে যা পাবে, তা-ই খাবে। জানে না ওরা কী খাওয়া 'কপালে লেখা' আছে ওদের।

AMARBOI.COM

ওদের ছবি তুললাম। ডায়েরিতে অনেক বৃত্তান্ত। তারপর, আবার আমরা হেঁটে চলেছি সামনে। আমরা যাব মনতলা।

(খবরের কাগজ, ১৪ ডিসেম্বর '৮৯)

আনসার আলী

আজকের লেখায় আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব আনসার ব্যাপারীর সাথে। নিজ এলাকায় কারও কারও কাছে তিনি 'আনসার চেয়ারম্যান' নামেও পরিচিত।

আনসার আলী, বয়স হবে ৬৭/৬৮ বছর। সহজ-সরল-বিনয়ী স্বভাবের বেঁটে-খাটো মানুষটি আমার অতি অন্তরঙ্গ। থাকেন তিনি কুড়িগ্রামের চিলমারীতে, রমনা বাজারের কাছে। একসময় পাটের ব্যবসায়ী ছিলেন বলে তিনি 'ব্যাপারী' হিসেবে পরিচিত হন। পরে হলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ছিলেন। এখন মানসিক সমর্থন থাকলেও বয়সের কারণে রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন; বছর দুতিন আগে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন, তাও বন্ধ। জমিজমা যা ছিল, বিক্রি করে খেতে খেতে নিঃশেষ-প্রায়। এখন তাঁর দিনকাল কাটছে খুব অর্থ-সংকটের মধ্য দিয়ে। বড় ছেলেটি বিয়ে করেছে, কিন্তু বেকার। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কিছু-একটা চাকুরির জন্যে ঘুরছে।

তাঁর ছেলের কথা থাক, বলি আনসার আলীর কথা। আপনাদের অনেকের জানার কথা নয় যে, আজকের বৃদ্ধ এই আনসার ব্যাপারী কিংবা আনসার চেয়ারম্যান বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রকাশিত দুটি সাড়া-জাগানো ছবির নেপথ্য নায়ক। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় ইত্তেফাকে চিলমারীর বাসন্তী-দুর্গাতিদের যে ছবি ছাপা হয়, তা তুলেছিলেন কিছুদিন আগে ঢাকায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আলোকচিত্রী আফতাব আহমদ। বাসন্তীর জালপরা ছবিটি সে-সময় দেশ-দুনিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু চিলমারীর ঐ জেলে বসতিতে আফতাব আহমদকে নিয়ে গিয়েছিলেন কে? ঐ আনসার আলী। আফতাব আহমদ যে নৌকায় করে ঐ গ্রামে যান, তার পথনির্দেশক ছিলেন আওয়ামী লীগের গ্রামকর্মী আনসার আলী। নৌকায় আরও ছিলেন তৎকালীন রংপুর জেলা প্রশাসনের একজন জুনিয়র কর্মকর্তা। তিনি এখন উত্তরাঞ্চলের একটি জেলার ডেপুটি কমিশনার। আনসার আলীই যে তাঁদের নৌকাটিকে বাসন্তী-দুর্গাতিদের বসতিতে ভিড়িয়েছিলেন তা আজও তাঁর মনে আছে।

আনসার আলীর সাথে তখনও (১৯৭৪) আমার পরিচয় হয়নি, তবে নাম জানতাম। পরিচয় হলো '৭৮ সালের শেষদিকে। খাদ্যসংকটের ওপর সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরির জন্যে চিলমারী গেলাম। আমার সঙ্গে গণকণ্ঠের তৎকালীন রংপুর প্রতিনিধি মুকুল মোস্তাফিজ (যে এখন দৈনিক খবরের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)।

রংপুর থেকে কুড়িগ্রাম, পরে কুড়িগ্রাম থেকে ট্রেনে চেপে রমনা বাজার স্টেশন। প্ল্যাটফরম বলে কিছু নেই, পাদানি বেয়ে বালুর উপর নামতে হলো। কিছুটা এগিয়ে রমনা বাজার : টিনের চালার কয়েকটি পাটগুদাম, ছোট মুদিখানা, মনিহারি দোকান, চাটাইয়ের বিকৃত আয়না-ঝোলানো সেলুন, ভাঙা-নড়বড়ে বেঞ্চপাতা চায়ের দোকান। কিছু ব্যবসায়ী, পাটের দালাল, ফড়িয়া, বেকার যুবক, কোমর বাঁকা কর্মহীন মানুষ বসে আছে এলোমেলো। ব্যবসায়ী-দালাল-ফড়িয়ারা চায়ের দোকানে, যুবকেরা পাটগুদামের আড়ালে দলা হয়ে বসে কেউ ষোলো পাইতা খেলছে, কেউ বিড়ি-সিগারেট ফুঁকছে। বেকার মজুরেরা বসে আছে ঘাসের ওপর মাজা পেতে। অর্থাৎ বসে আছে যে যার অবস্থানে।

আমরা দুজনে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। লোকজন সহসা সচকিত, চোখে-মুখে প্রশ্ন ঝুলিয়ে কেউ সরে বসল, নিজেদের আলাপ-আলোচনা থামিয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল শহর থেকে আসা অচেনা দুজনকে।

আপনারা? যাবেন কোথায়? কোথা থেকে এলেন? এইসব প্রশ্ন যিনি প্রথম উচ্চারণ করলেন তিনিই আনসার আলী। পরিচয় হলো। চা খেতে খেতে নানান আলাপ। খাদ্যাভাবের প্রসঙ্গ উঠলে আনসার আলী কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু থেমে গেলেন হঠাৎ কী কারণে। চোখের ইশারা করলেন তিনি, দোকানের কোণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসা একজনকে দেখালেন, তারপর দ্বিতীয় ইশারায় জানিয়ে দিলেন, এখানে নয়, দোকানের বাইরে যেতে হবে।

চায়ের বিল মিটিয়ে বাইরে এলাম আমরা তিনজন। আনসার আলী থামলেন না, কোনো কথা বললেন না, হন হন করে হাঁটতে থাকলেন সামনের দিকে। আমি আর মুকুল মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে তাঁর পিছু হাঁটতে থাকলাম। বেশিদূর হাঁটতে হলো না। তিনি রাস্তার বাঁয়ে একটা বাসার বারান্দায় উঠলেন। এটাই আমার বাড়ি, বললেন তিনি।

বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে। আমাদের চেয়ারে বসতে দিয়ে তিনি নিজে বসলেন একটা খালি চৌকির কোণায়। তারপর যা জানালেন, তাতে গা শিউরে উঠল। চিলমারীর পরিস্থিতি এইরকম হয়ে উঠেছে তা আমরা ধারণাও করিনি।

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো আনসার আলীর বাড়িতেই। এখান থেকেই আমরা রওনা হলাম রমনার চরের উদ্দেশে। গিয়ে দেখি, আশ্চর্য ব্যাপার, সেখানে বন্যার পর কোনোরকম রিলিফ পৌঁছেনি, এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের খোঁজখবর নিতে আসেনি কেউ। প্রকট খাদ্যাভাব। চরের বালুতে নেমে প্রথম যে-লোকটিকে পেলাম, সে তার বানবিধ্বস্ত ঘরের ধারে বসে 'মধুয়ার' নিচের দিকের অংশ আখের মতো করে চিবোচ্ছে। 'মধুয়া' ঘাস-খড় জাতীয় থোকা-থোকা গাছ। চালা-বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মধুয়ার ডাঁটার অংশ দিয়ে ছিপের ফাতনা হয় ভালো। গোড়ার দিকে চিবুলে মৃদু মিষ্টি রস পাওয়া যায়। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির মানুষ তা-ই চিবিয়ে চুষে খাচ্ছে।

ছবি তোলা হলো। অসংখ্য স্ন্যাপ। কথাবার্তা। বিবরণ সংগ্রহ। মনে ভীষণ উত্তেজনা, যত তাড়াতাড়ি হয় শহরে ফিরতে হবে। বানের পানি সরে যাবার বেশ কদিন বাদেও উপদ্রুত এলাকায় খাদ্য পৌঁছেনি, মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খাচ্ছে।

রমনার চর থেকে রমনা বাজার। তারপর স্টেশন। কুড়িগ্রাম। রংপুর শহর। ছবি এবং প্রতিবেদন পাঠানোর কাজ করা হলো দ্রুত। বন্যাদুর্গত এলাকার একটি মানুষ খড়ের 'মোথা' (গোড়ার অংশ) চিবিয়ে খাচ্ছে। এই ছবি ও প্রতিবেদন যখন ছাপা হলো 'সংবাদ'-এ, তখন বুঝতেই পারেন কী অবস্থা! রংপুর শহরে সংবাদ পৌঁছানোর আগেই ইনকোয়ারি টিম গঠিত হলো তিনটি। রংপুরের ডেপুটি কমিশনার ছুটলেন ঘটনাস্থলে। আমি ঢাকায় ফোন করে জানলাম, সকালবেলা একটা গাড়ি এসে অফিসে যাকে পেয়েছে তুলে নিয়ে গেছে বিশেষ জায়গায়। তাদের মধ্যে তৎকালীন বার্তা সম্পাদক সন্তোষ গুপ্তও আছেন, আছেন অপর কয়েকজন কর্মকর্তা-সাংবাদিক। আমাকে বলা হলো আপনি সরে থাকুন। তৎক্ষণাৎ রংপুর শহর ছাড়লাম। ট্রেনে চেপে পার্বতীপুর হয়ে কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া থেকে আবারও টেলিফোন করে জানলাম, সন্তোষদাসহ অন্যদের বিশেষ জায়গা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে (তবে কী কী কথাবার্তা হয়েছে তা এখানে বললাম না)।

কুষ্টিয়া থেকেই খবর পেলাম ছবি ও প্রতিবেদনে কাজ হয়েছে। বিস্তর ত্রাণ পাঠানো হয়েছে রমনার চরে। ডিসি সাহেব নিজের হাতে চাল, আটা ও কাপড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে দিয়ে খড়-খাওয়া ঐ লোকটিকে বলেছিলেন, তুমি বলো এটা সাজানো ছবি। তুমি মধুয়া খাচ্ছিলে না, তোমাকে খেতে বলা হয়েছে, তারপর ফটো তোলা হয়েছে। কিন্তু না, গ্রামের সহজ-সরল দরিদ্র মানুষটি বন্যায় সব হারিয়েও ত্রাণের লোভের কাছে পরাজিত হয়নি। সে ডিসিকে বারবার একই জবানবন্দী দিয়েছে, 'স্যার উপরে আল্লা, নিচে মাটি, আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না।'

অনেকদিন পরে আনসার আলীর সাথে আবার দেখা হয়েছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, আনসার ভাই, '৭৮ সালের ছবিটার কথা বাদ দেন, সে-সময় আর আওয়ামী লীগ সরকার নেই। কিন্তু '৭৪-এর ছবিটার জন্যে আপনি ফটোগ্রাফারকে বাসন্তী-দুর্গাতিদের গ্রামের পথ দেখিয়েছিলেন কেন? জালপরা ছবিটি ছাপা হবার ফলে তো তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারই পরোক্ষভাবে নাজুক অবস্থায় পড়েছিল! আওয়ামী লীগের একজন শিকড় পর্যায়ের নেতা হিসেবে এটা করা কি আপনার ঠিক হয়েছিল?

আনসার আলী প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন, 'দেখেন মোনাজাত ভাই, অন্য সবার কথা জানি না, তবে আমি রাজনীতি করি শুধু দলের জন্য নয়, আমার রাজনীতি দেশের জন্য, দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য। সেই মানুষগুলোর দুর্গতি চাপা দিয়ে রাখব কেন?

এ জবাব শুনে আমি আর দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করিনি। তাঁর এই ভাষ্যের বিপরীতে কী আর বলব আমি?

(খবরের কাগজ, ৪ জানুয়ারি '৯০)

AMARBOI.COM

সিংড়া–১

সিংড়া। নাটোরের একটি উপজেলা। ২০৬ বর্গমাইল এলাকাটাই চলনবিলের মধ্যে। বর্ষায় থৈথৈ চারদিক, বাতাস আর বিশাল ঢেউ। শীত মৌসুমে অন্যরকম চেহারা, যতদূর চোখ যায় বোরো ধানের সবুজ সমাহার। সাড়ে ৩৫ হাজার কৃষক ৬০ থেকে ৬৫ হাজার একর জমিতে বোরো আবাদ করে বছরের খাবার ঘরে তোলেন। এখানকার প্রধান ফসল বলতে ঐ বোরো। শুকনো মৌসুমে হয় কিছু সরিষা আর শাকসবজি।

বেশ ক'টি নদী। আত্রাই, গুরনই, বারনই, বানগঙ্গা, নাগর, আর আছে শ দুয়েক ভরাটপ্রায় খাল। নদীগুলোরই-বা কী অবস্থা! এই নাগর নদীর ধারে বসে (পতিসর) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে' কবিতাটি। বৈশাখ অনেক দেরি, এখন কেবল মাঘ, এখনই নাগরে পানি নেই। মূলধারা ক্ষীণ, প্রশস্তে এমন হয়েছে যে, মনে হয় খুব জোরে লাফ দিলে পার হয়ে যাওয়া যাবে। ক্ষীণধারার ধারে বোরো ধানের বীজতলা পাতা হয়েছে। বৈশাখ নয়, মাঘেই হেঁটে এপার-ওপার করছে মানুষজন। ফুড ফর ওয়ার্কের অধীনে সিংড়া কম গম পায়নি, অধিকাংশই লোপাট করেছে দো-পায়া জানোয়ার। কোনো নদী কিংবা খাল গভীর করা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগর নদীর ব্রিজ পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ড। উপজেলা প্রশাসন চত্বরে ঢোকার মুখে কিছু দোকানপাট। বাস থামবার সাথে সাথে হোটেলের কর্মচারীরা 'গরম ভাত' 'গরম ভাত' বলে চিৎকার জুড়ে দেয়। মোটা বোরোর চালের ভাত, খোলা গামলা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। পাশে সারিবদ্ধ পাত্রে আলু-বেগুন-মুলোর ঘন্ট, মরিচ-মশলায় সয়লাব ঝোলে ডোবা ইলিশ, বকরি, মুরগি কিংবা হাঁসের ডিম। হাটবারে বেচা-বিক্রি হয় খুব। ট্রাকের লাইন পড়ে যায় বগুড়া-নাটোর পাকা সড়কের দুধারে। মহাজন ব্যবসায়ীরা ধান কেনে আর বস্তাবন্দী করে ট্রাকে তোলে। উদ্বৃত্ত সিংড়ার ধান চালান হয়ে যায় খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর ও যশোরের ঘাটতি এলাকাগুলোতে।

ভাতের ভাপে ক্ষুধার নাড়িতে টান পড়ে। বিচিত্র এক অনুভূতির মধ্যে, দেখি, জনাসাতেক যুবক মজুর একটা ভাঙাপ্রায় দোকানঘরের বেড়ার ধারে শরীরে পড়ন্ত দুপুরের রোদ নিয়ে গোল হয়ে বসেছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মোয়া। বলল, এটাই ওদের দুপুরের খাবার। সকালে খেয়েছে একখণ্ড করে শুকনো রুটি। রাতে কোথায় কী খাবে ওরা জানে না। ওরা সাতজন যুবক ট্রাকে চেপে রাতে এসে পৌঁছেছে সিংড়ায়। সিরাজগঞ্জের চরগিরীশে বাড়ি। বোরো ধান লাগানোর কাজ পাবে, এই আশায় এখানে আসা। এভাবে এসেছিল গতবার, এই সময়ে। ওরা জানালো, দুপুরের এই 'খাওয়াদাওয়া' সেরে ওরা রওনা দেবে গ্রামের পথে, যাবে ছাতারদীঘি। ওখানে কাজ মেলে ভালো, মজুরিও মেলে নগদানগদ।

মোয়ায় কামড় দিতে গিয়ে গুড়মাখা মুড়ির একটুখানি দলা ঘাসের ওপর পড়ে গেল একজন মজুরের ঠোঁট থেকে। ঘাড় নিচু করে তৎক্ষণাৎ খুঁটিয়ে নিল তা, মুখে পুরল। মোয়াতে কামড় দিলে খড়খড় করে একটা আওয়াজ হচ্ছে, চিবুনোর সময় ঘসর ঘসর, যেন ছন্দের মতো। ঐক্যতান। এই দেশে, খাবারের নামে কী-রকম অপচয়ই না হয়ে থাকে! যে-শ্রেণীটি বিপুল প্রাচুর্য-বিলাসে গা ভাসান, তাদের লাঞ্চ কী-রকম, আর এই সিংড়ায় কাজ করতে আসা সাত যুবক কী খাচ্ছে দুপুরে! অথচ, এরাই দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এদেরই হাতের আদর-যত্নে চারাগাছ লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে, থোড়ে থোড়ে শিষ আসে, শস্যে ভরে ওঠে ভূস্বামীর উঠোন কিংবা গোলা। শহর সভ্যতা গড়ে ওঠে এইসব মজুরের রক্তঘামের লেপনে; কিন্তু রুটি, ছোলাভাজা, যবের ছাতু, কালাইয়ের রুটি, চিড়া-মুড়ি-খৈ-মোয়া কিংবা খুব জোর মরিচঘষা পান্তা খেয়ে কাটে ওদের পরিশ্রমের দিন। রোদপোড়া শরীর, চোয়াল ভেঙে গেছে, চোখের চারদিকে গর্ত, গলার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। এই হলো এ দেশের ক্ষেতমজুরদের চেহারা। শীতে ও অপুষ্টিতে পায়ের গোড়ালি ফেটেছে, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, পরনে ছেঁড়া মলিন লুঙ্গি। সাতজনের মধ্যে একজনের গায়ে ইংরেজিতে 'লাভ' লেখা কোঁকড়ানো গেঞ্জি : বিদেশ থেকে আমদানি-করা পুরাতন পোশাক। দুজনের গায়ে হাফহাতা জামা, কাঁধ ও পিঠে তালি মারা। বাকি ৪ জনের বুকে-পেটে ক্রসের মতো করে রাখা সুতির বিবর্ণ আলোয়ান। এতে শীত কাটে কী করে? কাল রাতে এরা কোথায় কীভাবে শুয়েছিল? যে-মজুরটির নাম মহব্বত, দাঁত উঁচু, স্বাভাবিক থাকলেই মনে হয় হাসছে, সে প্রশ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে সত্যি সত্যি এবার হাসল। বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল আমি কে, এইসব কেন জানতে চাই। পরে জানালো, কাল রাতে ওরা কেউ ঘুমায়নি, আশপাশে থেকে খড় আর গাছের শুকনো ডাল জোগাড় করে এনে আগুন জ্বালিয়ে তাপিয়েছে এখানে, এই খোলা আকাশের নিচে। সকালে রুটি খাবার পর কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে নিয়েছিল চারজন, বাকি তিনজনের মধ্যে একজন শোয়নি আদৌ, দুজন শুয়েছে কিন্তু ঘুম আসেনি। বললাম, ঐ তো উপজেলার অফিস, বারান্দায় গিয়ে তো আপনারা বসতে পারতেন। অন্তত কুয়াশা থেকে বাঁচতেন। ওখানে শোয়াও যেত!

এইসব প্রশ্ন, অযাচিত সহানুভূতির কথা, আপনি আপনি করে সম্বোধন, ওরা বোধকরি সহজভাবে নিতে পারল না, নিজেদের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দুজন গেল বিড়ি কিনতে, একজন নিচু জায়গায় নামল প্রস্রাব করতে। অপর একজন, লাভ-লেখা গেঞ্জি-পরা যুবক আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে গা-ঝাঁকুনি দিল এবং লুঙ্গির ওপর দিয়েই খুব লম্বা টানা হাতে তার তলপেট এবং আরও নিচের দিকে চুলকাতে লাগল। কেন জানি মনে হলো, সে আমাকেই তার দৃশ্যত অশোভন আচরণটি দেখাচ্ছে নেহায়েত কোনো আক্রোশে। বাকি তিনজন পানি খেতে লাগল দোকান থেকে চেয়ে-আনা দুমড়ানো একটি জগ থেকে এবং খানিক পরে আবার সবাই একত্রিত হলো, কিছু বলাবলি করল, তারপর হাঁটা দিল প্রধান সড়ক ধরে, পশ্চিমের দিকে। চলে যাবার আগে, দাঁত-উঁচু সেই যুবকটি, মহব্বত যার নাম, সামনে এসে এমন ভঙ্গিতে কথা বলল যেন কোনো অপরাধের স্বীকারোক্তি করছে। সে জানালো, গতরাতে ট্রাকের ওপর থেকে নেমে আশ্রয়ের সন্ধানে ওরা কাছারির (উপজেলা অফিস) দিকেই প্রথম যায়। অফিসের বারান্দায় উঠবার আগেই তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় একজন পুলিশের দ্বারা। পুলিশটি তাদের নানারকম জেরা করে এবং একপর্যায়ে জামার পকেট এমনকি কোমরে লুঙ্গির প্যাঁচ পর্যন্ত পরীক্ষা করে। দুজনের কাছ থেকে পাওয়া পাঁচ-তিনে আট টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর পুলিশটি তাদের ছেড়ে দেয় বটে, কিন্তু উপজেলার অফিসের ধারেকাছে কোথাও না থাকার হুঁশিয়ারি জানায়। মহব্বত আপত্তি জানিয়েছিল, কাজ হয়নি, বরং ধমক খেয়েছে। মহব্বত পুলিশটিকে বলেছিল রাতের আশ্রয় তাদের প্রয়োজন নেই; তাদের ঐ আট টাকা ফেরত দেওয়া হোক। কাজ ও মজুরির টাকা না পাওয়া পর্যন্ত এই টাকায় তাদের খেতে হবে। কিন্তু পুলিশটি তা শোনেনি। মহব্বতের নিতম্বে একটা ডাণ্ডার বাড়ি মেরে চলে গিয়েছে। অতঃপর ওরা সাতজন, বারান্দার আশ্রয়ের লোভ এবং টাকা হারিয়ে চলে আসে পাকা সড়কের ধারে। এখানেই কেটে যায় সারাটা রাত।

টাকা তো পুলিশে নিয়ে গেল, আপনারা সকালে রুটি খেলেন কী দিয়ে? দুপুরের এই মোয়া?

মহব্বত এবার উঁচু দাঁত ছড়িয়ে ভীষণরকম চালাকির হাসি উপহার দিল। সে জানালো, দুজনের কাছ থেকে আট টাকা হাতিয়ে নিলেও মহব্বতের কাছে থাকা দশ টাকার একমাত্র নোটটি সে নিতে পারেনি। পুলিশটি যখন একজনের পকেট সার্চ করছিল, তখন বিপদ টের পেয়ে মহব্বত তার কোমরের খুঁট থেকে দশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকার নোটটি হাতিয়ে বের করে এবং টুস করে নিচে ফেলে পায়ের পাতা দিয়ে ঠেসে রাখে। পুলিশ চলে যাবার পর তা সে তুলে নেয়। ঐ দশ টাকাতে তাদের সাতজনের দুবেলা খাবার চলেছে। সবাই কথা দিয়েছে, মজুরির টাকা পেলেই যার যার খাবারের ভাগের টাকা ওরা মহব্বতকে শোধ দেবে।

ওরা রওনা দিল গ্রামের পথে। নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে। আমি এবার উপজেলা প্রশাসন চত্বরের দিকে এগুলাম। এখানকার কাজ শেষ করে আজই ফিরতে হবে নাটোরে। এই সিংড়া এমন একটি উপজেলা যেখানে নাকি কৃষকেরা চাষাবাদের কাজে আধুনিক কিছু প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছেন। আমি এখানে তারই বিবরণ সংগ্রহ করতে এসেছি।

(খবরের কাগজ, ১৮ জানুয়ারি '৯০)

সিংড়া–২

সিংড়া উপজেলার প্রশাসনিক ভবনচত্বর। অনেকগুলো বন্দুক। একনলা, দোনলা। কারোটা খাপের ভেতর, কারোটা খোলা। কেউ পিঠে ঝুলিয়েছেন, কেউ হাত ধরে রেখেছেন, কেউ-কেউ আবার শিকার-সন্ধানীদের মতো করে কাঁধের ওপর লম্বালম্বিভাবে ধরে রেখেছেন : মনে হচ্ছে বন্দুকের নল যেন নাদুসনুদুস মানুষগুলোর কাঁধে একেকটা রেফ। অনেকেই সঙ্গে এনেছেন বাহক। বাহকের কাঁধে বন্দুক রেখে আয়েশে সিগারেট ফুঁকছেন।

জানা গেল, তামাম সিংড়ার বন্দুক-মালিকরা উপজেলা সদরে এসেছেন লাইসেন্স রিনিউ করতে। উপজেলা সৃষ্টির আগে এই কাজটির জন্যে যেতে হতো নাটোর শহরে, এখন এখানেই লাইসেন্স রিনিউ হয়। তবে প্রতিটি বন্দুকের জন্যে উপজেলার এল. আর. ফান্ডে চাঁদা দিতে হয় কমপক্ষে ৫০ টাকা করে। কোনোরকম রসিদ-টসিদ নেই। এল. আর. ফান্ডটি অডিটও করা হয় না। বিভিন্ন উপজেলায় এভাবে হাজার হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ, ফুড গ্রেন লাইসেন্স, ঠিকাদারদের বিভিন্ন কাজ, যাত্রাগান কিংবা প্রদর্শনীর অনুমতি দেওয়ার সময়। কিন্তু হিসাব-নিকাশ নেই। যে যেমন পারেন আদায় করছেন কিংবা খরচ করছেন। আসলে এই ফান্ডের টাকা বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজে ব্যয় হবার কথা। মেধাবী অথচ গরিব ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার জন্যে অর্থসাহায্য পাবে, বেওয়ারিশ কিংবা সাধ্যহীন গরিব মানুষের লাশের সৎকার হবে, কারও ঘর পুড়ে গেলে নতুন আশ্রয় গড়ে তোলার জন্যে সাহায্য পাবে। কিন্তু তার বদলে শহর থেকে আসা কর্তাব্যক্তিদের তুষ্টির জন্যে এল. আর. ফান্ডের টাকা ব্যয় হচ্ছে, কিছু হচ্ছে মারিং-কাটিং। গত ৪/৫ বছর ধরে এ নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন লিখেছি সংবাদে। কোথাও ফান্ডে টাকা তোলা বন্ধ হয়েছে, কোথাও একাউন্ট ক্লোজ করা হয়েছে ব্যাংকের। দুয়েক জায়গায় উচ্চপর্যায় থেকে তদন্তও চলেছে। কিন্তু জড়িত কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বড়জোর এক জায়গা থেকে অন্যখানে বদলি হয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক জায়গায় এল. আর. ফান্ডের চাঁদা তো একরকম জোর করেই আদায় করা হয়ে থাকে। চাঁদা আগেই জমা দিতে হয়, নইলে কাগজে সাহেবের সই হয় না। মানুষ আর করে কী! পঞ্চাশ এক শ যা-ই খসুক কাজটা অন্তত দিনে-দিনে হয়ে যাক! চাঁদা গুনে দেয় তারা। টাকা কীভাবে খয়-খরচা হয় তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি তো জানি চাঁদার টাকায় জেলা কিংবা উপজেলা সদরে কর্তাদের ভূরিভোজ হয়েছে, কোথাও পারিবারিক পিকনিক হয়েছে, গানের জলসা বসেছে, কর্তাব্যক্তির বাসার জন্যে শৌখিন আসবাবপত্র ও অফিসার্স ক্লাবের জন্যে টেলিভিশন কেনা হয়েছে। অতদূর কেন, সিংড়া উপজেলাটি যে-জেলার অন্তর্গত, সেই নাটোরের কথাই ধরা যাক। জেলা সদরে এল. আর. ফান্ডের জন্যে আদায় করা টাকায় কী হয়েছে! সাহেবদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে এরই টাকায় ঢাকা থেকে আনা হয়েছে রজনীগন্ধা, গালিচা কেনা হয়েছে, বগুড়া থেকে দৈ এসেছে, খুলনা থেকে গলদা চিংড়ি আনা হয়েছে রাতারাতি। এর টাকায় ঝুড়িকে-ঝুড়ি ফল ভেট দেওয়া হয়েছে। একবার যদি সরকার তদন্ত করে দেখতেন এল. আর. ফান্ডের নামে নাটোরে এ পর্যন্ত কত টাকা আদায় হয়েছে আর কত টাকা কোন্ খাতে ব্যয় হয়েছে!

সিংড়ায় ফিরে আসি। আলাপে আলাপে জানলাম, এই উপজেলার ৪৪৬টি গ্রামে অবস্থাপন্নদের ঘরে প্রায় ১ হাজার বন্দুক রয়েছে। এ ছাড়াও আছে বেশকিছু রাইফেল, রিভলবার আর পিস্তল। যাদের এইসব অস্ত্র কিনবার সাধ্য নেই তাদের ঘরে বানানো হয়েছে বল্লম, তরবারি, রামদা। লাঠিসোঁটা তো অজস্র। চলনবিল এলাকায়, চারিদিকে যখন থৈথৈ পানি, তখন ভীষণরকম উৎপাত বাড়ে ডাকাতদের। নৌকায় চেপে আসে ওরা গৃহস্থ বাড়িতে, ধান চাল সোনাদানা টাকাপয়সা লুটে নিয়ে যায়। থানা-পুলিশে খবর দিলে লাভ হয় না, ইনকোয়ারি করতে যেতে যেতে একই বাড়িতে দ্বিতীয়বারের মতো হামলা চলে ডাকাত দলের। এর হাত থেকে বাঁচতে প্রতিটি গ্রামের জোতদার ও বড় কৃষক লাইসেন্সধারী আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছেন। বানিয়েছেন বর্শা বল্লম লাঠি। নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়েছেন ওঁরা নিজেরাই। এতে লাভ হয়েছে। বড় ধরনের ডাকাতির সংখ্যা-হার কমেছে সিংড়া উপজেলার গ্রামগুলোতে।

ডাকাতি কমেছে। জোতদাররা নিজেদের গোলা নিয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সেই জোতদার, ঘরে যাদের আগ্নেয়াস্ত্র আর ধানের পাহাড় আছে, তারা যখন টাকা কিংবা ধান দেয় চড়া সুদ গোনে নিয়ে, যখন তারা ক্ষুদ্র একজন কৃষককে ভূমিহীন করে, উদয়াস্ত পরিশ্রমী মজুরকে মজুরিতে ঠকায়, তখন তাদের রুখবে কে? কারা শান দেবে কোন্ অস্ত্রে? পারে না। পারে না বলেই জোতদারের গোলাঘর সম্প্রসারিত হয় আর অনাহার-অর্ধাহারে থাকে কামলা-কিষান : মেহনতি মানুষ। বোরোধান বিক্রির টাকায় অনেক কৃষক আরও আবাদি জমি কেনে, কেউ বাস ট্রাক কিনে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে ছাড়ে, কেউ নাটোর, রাজশাহী কিংবা বগুড়া শহরে পাকাবাড়ি বানায়। কিন্তু অর্ধেক ভূমিহীন মানুষ যারা কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার সামান্য উন্নতিও হয় না। তাদের পাঁজর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁকা, কাঁধ সামনে ঝুলে পড়েছে, চোখ কোটরাগত, চোয়াল ও গলার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

উপজেলার কৃষি অফিসে বসলাম। কৃষি অফিসার ছেলেটিকে অনেক আগে থেকেই চিনি। কথা বলে বেশি, কিন্তু কাজও করে খুব। এদেশে সাধারণত যাঁরা বেশি কথা বলেন তাঁরা কাজ করেন কম, এই ছেলেটির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। তার অতিদ্রুত এবং স্বর-চড়ানো কথা মুখে যতটা বিরক্তি ধরল, ততটা ভালো লাগল কাজের কথা শুনে। জানলাম, এই সিংড়া এদেশের এমন একটি উপজেলা যার ১২টি ইউনিয়নে বোরো ধান আবাদে সাফল্য এসেছে। ৪ বছর আগেও এখানে ৫২ হাজার একর জমিতে বোরো হতো, এখন আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে ১২/১৩ হাজার একর। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো : উপজেলা এলাকার প্রতিটি জমিতে লাইন করে ধানগাছ লাগানো হয়, ক্ষেত নিড়ানি দেওয়া হয় 'উইডার' দিয়ে, ধান মাড়াই গরু দিয়ে হয় না, হয় তা প্যাডেল থ্রেসারে। শ্যালো মেশিন আছে ৭ হাজার মতো এবং সবগুলোই চালু। শুনে ভালো লাগল, তবে দমে গেলাম এ কারণে যে, এত সত্ত্বেও বোরোর একরপ্রতি উৎপাদন এখানে কমে যাচ্ছে। ৪ বছর আগে ৬০-৬৫ মণ ধান পাওয়া যেত প্রতি একরে, এখন ফলে গড়ে ৪৮ মণ। কারণ কী?

বাইরে রোদে এসে দাঁড়ালাম। এদিকে ওদিকে আগাম সরিষার ক্ষেত। সরিষা তুলে বোরো রোয়া হবে। খণ্ড খণ্ড বীজতলা। দোলা জমিগুলোতে চাষ দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি অফিসের পাশেই উপজেলা চেয়ারম্যানের কামরা। চেয়ারম্যান সাহেব অফিসে নেই। এখানে টয়লেট আছে? কৃষি অফিসার প্রায় টেনে নিয়ে গেল চেয়ারম্যানের কামরায়।

দরজা ভেজানো ছিল। খুলতেই দেখি প্রায়-অন্ধকার ঘরের দেয়ালে, ঠিক সামনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফ্রেমে বাঁধানো বিরাট ছবিটি যেন জ্বলজ্বল করছে। পাশে রাষ্ট্রপতিরও ছবি।

সিংড়ার উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে দেখা হলো না। শুনলাম তিনি শিক্ষকতা করতেন। এবারে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, প্রশাসন ছেড়ে ফিরে যাবেন আবার স্কুলে। তিনি নাকি এ পর্যন্ত কোনোরকম করাপশন করেননি। বিশ্বাস করা কঠিন। তবে এটা বোঝা গেল, রাজনীতির কেন্দ্রভূমি রাজধানীতে কোনো কোনো মহলে বঙ্গবন্ধুর ছবিটিও যখন অসহ্য, তখন, শিকড় পর্যায়ের একজন অন্ধ সমর্থক, শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাঁর ছবিটি অফিসের দেয়ালে ধরে রেখেছেন!

অফিসের দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানোর ব্যাপার নিয়ে নাকি বেশ চাপ এসেছিল। হুমকি-ধমকি দেওয়া হয় প্রভাবশালী মহল থেকে, একটি পার্টির পক্ষ থেকে। কিন্তু চেয়ারম্যান নাছোড়বান্দা, শোনেননি কারও আপত্তি। তাঁর একই কথা, 'তোমরা আমাকে চেয়ার থেকে সরাও, তখন সরবে বঙ্গবন্ধুর ছবি, তার আগে নয়।'

(খবরের কাগজ, ১ ফেব্রুয়ারি '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হা উন্নয়ন!

নাটোর থেকে রাজশাহী। বিভাগীয় শহর। প্রায়ই আসতে হয় এখানে। এবার নিয়ে গত দুমাসে এখানে এলাম পাঁচবার। ভালো একটা থাকবার জায়গা আছে এখানে। মলয়দার বাসা। মলয়দা মানে মলয় ভৌমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। সংবাদের রাজশাহী প্রতিনিধি, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত। নিউজ-সেন্স খুব শার্প, রাজনীতি সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা, অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করেন। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তাঁর অমায়িক ব্যবহার আর প্রতিবাদী সাহস। রাজশাহী থেকে কিছুদিন আগে বাঘমারার গ্রামের জাতীয় পতাকা পোড়ানোর ঘটনাটি যেভাবে 'সংবাদে' তুলে ধরেছেন তাতে অবাক হয়ে যেতে হয়। বিভিন্নমুখী চাপ এসেছিল, কিন্তু টলেননি। সত্য তিনি প্রকাশ করবেনই। এর আগে রাজশাহী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী রাজনৈতিক তৎপরতা তুলে ধরতে গিয়ে কয়েক দফা বিপদের মুখে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়, ফাঁসির দাবি জানায় জাতির চিহ্নিত শত্রুরা। পরিস্থিতি তখন এমন হয়ে উঠেছিল যে আমি হলে হয়তো রাজশাহী ছেড়ে পালাতাম। কিন্তু মলয়দা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন সব। তিনি বলেন, যা হয় হবে, যাবে নাহয় প্রাণটা, তবু সত্য কথা প্রকাশ করব। কত মানুষ তো এদেশে মরছে। অসুখে-বিসুখে, দুর্ঘটনায়, অনাহারে-অপুষ্টিতে, গুলিতে, দাঙ্গায়, এমনকি এই শীতে। যাবে নাহয় সে-রকম একটা জীবন। তবু নিউজ বন্ধ হবে না। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে হবে।

তাঁর এই জেদের কথা শুনে ভালো লাগে বটে। নিজে কাজ করবার উৎসাহ ও সাহস পাই। সাংবাদিকতার পরিবেশ এখন অনেক ক্ষেত্রে দূষিত হয়েছে। টেলিফোনের নির্দেশে শুধু খবর বন্ধ হয় না, সেলফ সেন্সরশিপও হচ্ছে। খবর চেপে রাখার ব্যাপারটি নিয়ে প্রকাশ্যেই আজকাল আপস হয়ে যাচ্ছে। সে-সময় আমাদের মলয় ভৌমিকের সত্য প্রকাশ করবার জেদ ভালো লাগে। তবে চিন্তা হয় বৌদির জন্যে, একমাত্র কন্যা প্রিয়াংকার জন্যে। সাহসী সাংবাদিকতার জন্যে মলয়দাকে কোনো চড়া মূল্য দিতে হলে এদের কী হবে?

গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। রাকসু ভবনে মলয়দার লেখা একটা নাটকের রিহার্সেল হচ্ছে, তা-ই দেখতে। নাটকের নাম এখনও ঠিক হয়নি, কবে মঞ্চে উঠবে তাও বলা যাচ্ছে না, এখন শুধু সংলাপ আউড়ে যাচ্ছেন শিল্পীরা। দলের নিয়মকানুন খুব কড়া। দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে হাজিরা, রীতিমতো হাজিরা-খাতায় সই করতে হয় ঘড়ির সময় উল্লেখ করে। টয়লেটে কিংবা থুথু ফেলতে বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে অনুমতি লাগে। রিহার্সেল শেষ হবার আগে কারও ছুটি নেই। কেউ অনুপস্থিত থাকলে কিংবা শহরের বাইরে গেলে আগের দিন অনুমতি নিতে হয়। অনুশীলন নাট্যদল প্রযোজিত নাটকটির নির্দেশক নাট্যকার নিজেই। তাঁর এ গুণের কথা আগে জানা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব বলিষ্ঠ কাহিনী। আটকেপড়া পাকিস্তানিদের একটি নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি। নাটকের সেট ঐ একটাই। অধিকাংশ সংলাপ উর্দুতে। সম্পত্তি-সম্প্রসারণবাদী এক প্রভাবশালী ব্যক্তি, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের দালাল ছিল, সে এখন আটকেপড়া পাকিস্তানিদের বস্তির জায়গা-জমি গ্রাস করতে চাইছে। এই লোকটি নাটকের প্রধান চরিত্র, সংলাপ বলছে ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ এলাকার মিশ্র আঞ্চলিক ভাষায়। প্রতিটি দৃশ্য ও সংলাপে গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল, অজান্তেই চোখে পানি এলো বারকয়েক। ভালো অভিনয় করতে পারলে এ নাটকটি খুব সাড়া জাগাবে তাতে সন্দেহ নেই। ভালো হতো যদি এটি ঢাকার মহিলা সমিতি কিংবা গাইড হাউসে মঞ্চস্থ করা যেত, লুফে নিতেন রাজধানীর দর্শকরা! কিন্তু তা সম্ভব হবে কি? মলয়দাকে বলতেই তিনি হে হে করে বিচিত্ররকম হাসলেন। কী যে বলেন! এই নাটক আবার ঢাকায়! এখানেই কী হয় দেখেন!

রাকসু ভবনের ছোট্ট কামরাটায় রিহার্সেলের সুবিধে হচ্ছিল না। প্রস্তাব এলো মূল ভবনের একটা ছাদে যাবার। চারতলা ভবন, বিরাট ছাদ। সেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত মতিহারের সবুজ চত্বর দেখা যায় উঁচু রেলিঙের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে। চারতলার ছাদ পর্যন্ত সিঁড়ি ভাঙতে কয়েকটি ছেলের তো হাঁপ ধরল প্রথম দিনেই। কারও নাকি কোমর টনটন করছে, কারও পা ব্যথা করছে। ওরে বাপ্, অবস্থা কাহিল, এত লম্বা সিঁড়ি রোজ রোজ বেয়ে উঠতে হবে, মরে যাব বাবা! বলল কেউ-কেউ। হলের ডালের পানিতে বেড়ে-ওঠা নিম্নবিত্ত ঘরের এইসব ছেলেরা জীবনের সুদীর্ঘ সিঁড়ি ভাঙবে কী করে! সাহস জোগানোর জন্যে বললাম, আমার তো এই বয়সে মনে হচ্ছে একটানা বিশতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারব, আপনাদের এতেই পায়ে ব্যথা ধরল! মিছা কথায় বোধকরি কিছুটা উপকার হলো। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি টপকাতে লাগল কেউ-কেউ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। ডানে বাঁয়ে দেয়ালের গায়ে অজস্র লিখন। জনৈকা সেলিনা'র নামটি কে যেন লিখেছে বহুবার। তিনতলার পর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে এলো। নানা অশ্লীল ছবি ও কথা। চক কিংবা ইটের টুকরো ঘষে আঁকা হয়েছে ছোটবড় আকারের শিশ্নের নকশা। পাশে তীরচিহ্ন দিয়ে আঁকা প্রকাণ্ড জননেন্দ্রিয়। এখানে কী করে নাট্যচর্চা করবে ছেলেমেয়েরা? মলয়দা, মনে হলো সহজভাবেই নিয়েছেন ব্যাপারটি। বললেন, কী আর করা যাবে! ওরা লিখেছে, আমরা মুছব। কালই মোছার ব্যবস্থা করব। কিন্তু এইসব আঁকল কারা? কোন্ অসভ্য জানোয়ার?

সোডিয়াম বাতি-জ্বলা শহরে ফিরে এলাম সন্ধ্যার পর। হলুদ আলোতে বিচিত্র দেখাচ্ছে মানুষের চেহারা। মনে হচ্ছে সবার গায়ে হালকা করে কাদা মেখে দিয়েছে কেউ। শহরে শপিং সেরে কিংবা সিনেমা দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছেলেমেয়েরা হুডখোলা রিকশায় ফিরছে, তারা মনে হচ্ছে র‍্যাগডের রংমাখা চেহারা নিয়ে এসেছে কোথাও থেকে। ছাদ-ঠাসা যাত্রী নিয়ে যেন উড়ে যাচ্ছে মিনিবাসগুলো। ট্রাকের ধোঁয়া, কুয়াশা, কনকনে সাইবেরিয়ান হাওয়া। রিকশাওয়ালাদের এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা, হৈহল্লা, দিনমান কাজশেষে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে খেটে-খাওয়া মানুষজন : কুলি-মজুর-মিনতি। কয়েকটি গরু দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে প্রধান রাস্তার ওপর, কোনোমতেই নড়ে না, বাস-ট্রাক-কার-রিকশার জট। পদ্মার বাঁধের ওপর, ঠিক যেন আমাদের মাথার ওপরই, দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছে একটি বালক। ছোট্ট লুঙ্গিটি দুহাতে তুলে ধরেছে বুকের ওপর। পেচ্ছাবশেষে বারকয়েক কোমর ঝাঁকালো সে, তারপর হাঁটা দিল পশ্চিমে, আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকে। বালকটি চিৎকার করে গান জুড়ল : হাওয়া ... হাওয়া।

সোডিয়াম আলো এবং সাইবেরিয়ান হাওয়ার ভেতর দিয়ে এসে পৌঁছুলাম রাজশাহীর রেলস্টেশনে। 'বরেন্দ্র' আন্তঃনগর ট্রেনের একখানা আগাম টিকিট কাটা দরকার। আর প্ল্যাটফরমে পত্রিকা দেখা যাবে, চা হয় এখানে খুব ভালো।

কোনো ট্রেন নেই, সুমসাম প্ল্যাটফরম। এদিক-ওদিক দুয়েকজন যাত্রী বেঞ্চের ওপর, ফেরিওয়ালা, শীতে গুটিশুটি লোম-ওঠা কুকুর। ওপাশের প্ল্যাটফরমে সিমেন্টের বেঞ্চের ওপর কুপি জ্বালিয়ে ষোলগুটি খেলছে জনাচারেক যুবক।

প্ল্যাটফরমের বাইরে টায়ার পোড়ানোর প্রকট দুর্গন্ধ। আগুন তাপাচ্ছে দুটি অর্ধ-উলঙ্গ কিশোরী। আমাদের ডানদিকে, রাস্তার ধারে ইতোমধ্যেই শুয়ে পড়েছে সারি সারি মানুষ। ধুলোর ওপর পাতা খড় কিংবা ছেঁড়া মাদুরের বিছানা। ওরা গায়ে দিয়েছে চট, ছেঁড়া কাঁথা, খড়ের বানানো লেপ। একটি মেয়ে, যুবতী, তার শাড়িটিই একমাত্র বস্ত্র এবং শীতবস্ত্র, কুঁকড়ে বসে আছে একটা ঠেলাগাড়ির নিচে, আলোর টুকরো তার ঠোঁটে, বিড়ি ফুঁকছে।

হাঁটলাম অনেক দূরে। শত শত মানুষ। পথের ধুলোয় সারিবদ্ধ শোয়া। কাশছে কেউ-কেউ। কে একজন কথা বলল। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা।

বাড়ি কোন্টে বাহে?

ন্যালফামারী।

নিলফামারীর কোন্টে?

ডোমার।

আজশাই কোন্দিন আচ্ছেন বাহে?

এক বছর হইল্ বা।

করেন কী?

ভিক্কা করি।

শুনলাম, ওরা থাকত স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। গ্রাম থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষ। অধিকাংশই ভিক্ষে করে, কেউ আশপাশের হোটেলে কাজ করে, কেউ কুলি, যুবতী মেয়েরা সস্তায় দেহ বেচে। কিন্তু শীতের শুরুতে এদের আশ্রয় ভেঙে দিয়েছে স্টেশনের কর্তারা। প্ল্যাটফরম নোংরা হয় বলে তাড়িয়ে দিয়েছে ওদের। পথের ধুলো এখন ঠাঁই।

প্ল্যাটফরম থেকে রাস্তা। রাস্তায় হলুদ সোডিয়াম। উন্নয়নের বিকৃত আলো ঠিকরে পড়েছে সারি সারি শুয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর গায়ের ওপর। হা আলো! হা উন্নয়ন!

(খবরের কাগজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯০)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই নেত্রীর সঙ্গে

ফেব্রুয়ারির তিন তারিখ।

যাবার কথা দিনাজপুরে। দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, বোদা, তেঁতুলিয়া। গোছগাছ শেষ, বাস ধরব ভোরে, মধ্যরাতে একজন বিএনপি কর্মী খবর দিয়ে গেল : খালেদা জিয়া আজ রাতে রংপুরে এসে পৌঁছেছেন, তিনি খোঁজ নিতে বলেছেন আমি রংপুরে আছি কি না। থাকলে যেন সকাল আটটার আগেই সার্কিট হাউসে দেখা করি।

ব্যাগ গোছানোই থাকল, দিনাজপুরের সফর বাতিল। বাসস্ট্যান্ডে যাবার বদলে পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় সার্কিট হাউসে। প্রথমেই ফরিদা হাসানের সাথে দেখা, তিনি বললেন, ম্যাডাম নাকি বেশ কয়েকবার বলেছেন আমার কথা : এবারের উত্তরাঞ্চল সফরের অধিকাংশ মিটিং হবে প্রত্যন্ত এলাকায়, সেখানে সংবাদের স্থানীয় প্রতিনিধি কেউ আছে কি না ঠিক নেই, সেক্ষেত্রে অসুবিধা না থাকলে আমি যেন মিটিংগুলো কভার করি। ফরিদা হাসান বসতে দিলেন তাঁর ঘরে, হাতে দিলেন চায়ের পেয়ালা, আদরের পুরাতন স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বললেন, একটুখানি বসো ভাই, ম্যাডাম কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুবেন, তোমার সাথে কথা বলবেন তিনি। এই বলে নেত্রীর দরজায় টোকা দিলেন তিনি, উচ্চস্বরে জানালেন আমার আসবার কথা। দরজা খুলে গেল, সামনেই বেগম খালেদা জিয়া হালকা ঘিয়ে রঙের শাড়িতে উজ্জ্বল। টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো খাবার, ত্রিকোণ আকৃতির পরোটা, পাতলা রুটি, সবজি, ডিম, মাংস, কমলা। আসুন নাস্তা করি আগে। আপনি আমাদের সাথে যাচ্ছেন তো? আপনাকে রংপুরে পাওয়া যাবে, ভাবিনি। আজ বোনারপাড়ায় মিটিং, চলুন ঘুরে আসি।

ধন্যবাদ। নাস্তার পর্ব আগেই শেষ করেছি, আর নয়, চলতে পারে শুধু চা। ফরিদা হাসান আরেক প্রস্থ চা তুলে দিলেন হাতে। খেতে খেতে এটা-ওটা আলাপ। এবারের ট্যুরের উদ্দেশ্য জানালেন তিনি : এমন সব এলাকা বেছে নিয়েছেন যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থা খুব খারাপ, সহজে কোনো নেতা-নেত্রী যেতে পারেন না, সেখানেই যাচ্ছেন বক্তৃতা করতে, লোকজনদের সাথে সরাসরি কথা বলতে। সাধারণ মানুষ কি আন্দোলন সম্পর্কে হতাশ? শহর এলাকায় এইরকম বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু বিএনপি নেত্রী সেটা সরেজমিনে যাচাই করে দেখতে চান। সফরের শেষদিনে জনসভা করবেন তিনি রংপুর শহরে, তার আগের দুদিন ঘুরবেন গাইবান্ধার বোনারপাড়া, শাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ, দিনাজপুরের হাকিমপুর, হিলি।

অনেকদিন পর খালেদা জিয়ার সাথে দেখা। লক্ষ করলাম আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজ হাসিখুশি আর আলাপি তিনি। একসময় ছিল, অন্তত উত্তরাঞ্চলে সফরে এলে দেখেছি, অনেক নেতা তাঁর কামরায় ঢোকা তো দূরের কথা, হঠাৎ করে কথা বলার সাহস পেতেন না তাঁর সাথে। উনিশ-বিশ হলে ধমক খেতেন। অথচ, এখন নেত্রী বিশ্রামের সময়ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাক্ষাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছেন, খুব হাসিখুশি মেজাজে কথা বলছেন। দুপুরের খাবার বিকেলে, রাতের খাওয়া এগারো বারোটায়। বিশ্রামের সময়টুকু আগের মতো বাঁধা নেই। পথে যেতে গাড়ি থামিয়ে সরাসরি কথা বলছেন রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো গ্রামের নারী-পুরুষদের সাথে। গেলেন যেদিন দিনাজপুরের হিলি এলাকায়, ছিল জনসভা, খালেদা জিয়া উৎফুল্লভাবে হেঁটে গেলেন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত লাইন পর্যন্ত। সরাসরি হাত মেলালেন ভারতীয় এলাকার মেয়েদের সাথে। মেয়েরা তো 'দিদি, দিদি' বলতে অস্থির। 'দিদি আসুন বসুন চা খান' বলতে বলতে আসন নিয়ে এলেন ভারতীয় এলাকার সিঁদুর-পরা গৃহবধূরা। খালেদা জিয়া বসলেন না, কিন্তু খুব হাসিখুশির সাথে কুশল বিনিময় করলেন, বললেন, 'যে-কোনো মূল্যে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।' তিনি হাতব্যাগ থেকে বের করলেন লজেন্স, বেঁটে দিলেন শিশু-কিশোরদের মধ্যে। বিএসএফ. সদস্যরা হতবাক, তাঁরা দুহাত বুকে কিংবা কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন খালেদা জিয়াকে, বিনিময়ে নেত্রী হাত কপালে তুলে জানালেন সালাম।

খালেদা জিয়ার এইরকম সীমান্তসফর মনে করিয়ে দিল শেখ হাসিনার তেঁতুলিয়া সফরের কথা। সেটা বোধকরি '৮৬ কি '৮৭ সাল, নওগাঁ থেকে শুরু হলো আওয়ামী লীগ নেত্রীর উত্তরাঞ্চল সফর। জনসভাগুলো কাভার করার জন্যে আমি সঙ্গে ছিলাম সেবার। নওগাঁ থেকে সড়কপথে বগুড়া-রংপুর হয়ে ঠাকুরগাঁও, তারপর পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া। তেঁতুলিয়ায় জনসভার আগে শেখ হাসিনা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাবান্ধা এলাকাটা দেখতে যাবেন তিনি। বাংলাদেশের মানচিত্রে খাড়াখাড়ি উপরে উটের মাথার আকারের যে অংশটুকু, সেটাই বাংলাবান্ধা। তেঁতুলিয়া ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে সড়কটি চলে গেছে প্রায় ১২ মাইল। কিছুটা সুড়কি-ঢালা, কিছুটা মাটির। শেখ হাসিনা বি. ডি. আর. চেকপোস্ট ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন আরও ভেতরে, একেবারে নো ম্যান্স ল্যান্ডে। নেত্রীকে দেখে লোকজন অভিভূত, দূরের বাড়ি থেকে ছুটে এসে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানালেন। বিএসএফ. সদস্যরা হাত নেড়ে সালাম জানালেন। বি. ডি. আর সদস্যরা দিলেন স্যালুট। শেখ হাসিনা সে-সময় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী।

সেদিন খুব উৎফুল্ল মেজাজে ছিলেন শেখ হাসিনা, মাঝে মাঝে হালকা কৌতুক করছিলেন, গাড়িতে বসেই একের পর এক ছবি তুলছিলেন ছোট্ট ক্যামেরায়। একটা ব্যাপার মনে পড়ে, বাংলাবান্ধার সীমান্তসফরের সময় কোত্থেকে যেন এসে জুটলেন এলাকার একজন জনপ্রতিনিধি। আগে আওয়ামী লীগে ছিলেন, এখন (সফর-সময়ে) সরকারি দলের সদস্য। সীমান্ত এলাকায় হেঁটে বেড়ানোর সময় জনপ্রতিনিধিটি খুব বকরবকর করছিলেন। অন্যরা বিরক্ত হলেও ব্যাপারটি কৌতুকের সাথে উপভোগ করছিলেন নেত্রী। জনপ্রতিনিধি নেত্রীর পাশেপাশে ঘোরেন আর আঙুল উঁচিয়ে এটা দেখান, ওটা দেখান। বলেন, ঐ যে ঐ গাছটা, আপা, ওটা ইন্ডিয়ান।

নেত্রী বলেন, ও তাই নাকি! আচ্ছা!

: ঐ যে মানুষটা, লাঙল চষে, ও হলো ইন্ডিয়ান ... ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেত্রী বলেন, তাই নাকি! আচ্ছা!

: ঐ যে বাড়িগুলো, ঐ যে ঘর, ওগুলো সব ইন্ডিয়ান ...।

: আচ্ছা আচ্ছা! তাই নাকি!

এভাবে জনপ্রতিনিধি নানানটা জিনিস দেখাচ্ছেন, আর শেখ হাসিনা অবাক হবার মতো করে 'ও আচ্ছা তাই নাকি' ইত্যাদি বলছেন। এ-সময় হঠাৎ সামনে এলো একটা কুকুর, এসেই ঐ জনপ্রতিনিধির পায়ের কাছে শুঁকতে শুরু করল। শেখ হাসিনা প্রায় লাফিয়ে দুপা সরে এলেন, তারপর আঙুল উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, চেয়ারম্যান সাহেব চেয়ারম্যান সাহেব, এটা কোথাকার কুকুর, ইন্ডিয়ান না বাংলাদেশের?

চেয়ারম্যান সাহেব আর কী বলেন! লজ্জায় সরে গেলেন নেত্রীর পাশ থেকে। আপাতত তাঁর বকবকানি থামল।

পাঠকগণ, মাফ করবেন, পথ থেকে পথে চলতে অনেক কথা এসে যায়। যেমন খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গ বলতে বলতে শেখ হাসিনার সফরে চলে গিয়েছি।

যাই হোক, নাস্তা সেরেই রওনা হলাম আমরা বোনারপাড়ার পথে। সঙ্গে হান্নান শাহ, ফরিদা হাসান, জলিল, রেজাউল হক সরকার রানা ও আরও দুজন। বোনারপাড়া একটি রেলওয়ে জংশন, সেখানে সাধারণত ট্রেনে যাই, গিয়েছি বহুবার, কিন্তু এই প্রথম সড়কপথে এলাম। রংপুর থেকে পলাশবাড়ি হয়ে গাইবান্ধা, সেখান থেকে ১২/১৩ মাইল কাঁচা রাস্তায় যেতে হবে। বিএনপির উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার সংগঠক রেজাউল হক সরকার রানা, গাড়িতে বারবার বলছিলেন, রাস্তা কাঁচা হলেও খুব ভালো, পিচের রাস্তাও হার মানবে। কিন্তু পরে বোঝা গেল, হয় তিনি জোক করছিলেন কিংবা নেহায়েত সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। গাইবান্ধা শহর ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই হার-হাড্ডির বাজনা শুরু হয়ে গেল। এর চেয়ে চষাজমির ওপর দিয়ে যাওয়াও বুঝি ভালো ছিল। উঁচু-নিচু, খাদ-গর্ত, ধুলো, ধাক্কা। খালেদা জিয়া বললেন, এমন রাস্তাও দেশে আছে? এরশাদ তা হলে কোথায় উন্নয়ন করল?

বোনারপাড়ার পর জনসভা ছিল গাইবান্ধার অপর এক উপজেলা সুন্দরগঞ্জে। সেখানে আমার যাওয়া হয়নি। পরে শুনলাম, সেখানকার রাস্তা এতই খারাপ যে গাড়ির চাকা কয়েকবার ডেবে গিয়েছিল। সবাইকে বারবার গাড়ি থেকে নামতে হয়, আর গাড়ি ঠেলতে হয় বেগম জিয়া আর ফরিদা হাসান বাদে সবাইকে। একবার খাদ থেকে গাড়ি টেনে তুলতে গ্রামবাসীদের ডেকে আনতে হয়। সুন্দরগঞ্জের রাস্তা সম্পর্কে খালেদা জিয়ার মন্তব্য শোনা হয়নি। তবে মন্তব্য করে থাকলে তা নিশ্চয়ই সুন্দর ছিল না।

আমি দল থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। বোনারপাড়া থেকে সুন্দরগঞ্জ যাওয়া হয়নি তা আগেই বলেছি। তার কারণ, হিসেব করে দেখলাম, সুন্দরগঞ্জ থেকে রংপুর শহরে ফিরতে সময় হবে রাত দশ কি এগারোটা, তখন নিউজ ধরানো কষ্টকর হবে। ঠিক করলাম, গাইবান্ধা শহর থেকে জনসভার খবরটি ডেসপ্যাচ দিয়ে আন্তঃনগর 'তিস্তা' ধরে রংপুর শহরে ফিরে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোনারপাড়ায় দুপুরের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। শুনলাম খুব বড় মাছ কাটা হয়েছে, আছে খাসি, মুরগি। কিন্তু রান্না হলেই খাওয়া হয় না, খালেদা জিয়া বললেন : এখানে নয় সুন্দরগঞ্জে গিয়ে খাবেন। অতএব উপোস। গাইবান্ধা নেমে হোটেলের ঝাল-মশলা খাবার ইচ্ছে হলো না, কেননা আগামী দুতিনদিন অন্তত বিছানায় পড়া যাবে না।

আমি ভাবছি বেলা থাকতেই জনসভার খবরটি পাঠানোর কথা। সন্ধ্যার পর অফিসের টেলিফোন বিজি হয়ে যাবে, লম্বা রিপোর্ট পাঠানো মুশকিল হবে। অন্যদিকে 'তিস্তা' গাইবান্ধা স্টেশনে এসে পৌঁছুবে পৌনে পাঁচটায়।

কিন্তু নিউজ পাঠানোর মতো টেলিফোন পাই কোথায়? গাইবান্ধার ইনকিলাব প্রতিনিধি ছেলেটি পূর্বপরিচিত, একটা নিরিবিলি টেলিফোনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম তার সাথে।

(খবরের কাগজ, ১ মার্চ '৯০)

'জনাব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ'

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখটি চলে যাবার পর ভাষা-শহীদদের স্মরণে তেমন আর অনুষ্ঠান হতে দেখা যায় না। সবকিছু তোলা থাকে আগামী আরেকটি একুশে ফেব্রুয়ারির জন্যে। কিন্তু গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজশাহী থেকে পার্বতীপুর এসে দেখলাম সেখানে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান হচ্ছে। হচ্ছে কবিতাপাঠ, গান, আলোচনা-সভা, নাটক। অডিটোরিয়ামে ঠাসা দর্শক-শ্রোতা, অধিকাংশই যুবক। আছেন কিছু মহিলাও। বিদ্যুৎ চলে গেল বারকয়েক, ভয় হলো কোনো কেলেঙ্কারি না ঘটে! কিছু হৈচৈ হলো, শিস শোনা গেল কতিপয় দুষ্টু বালকের, কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু ঘটল না। ভলান্টিয়াররা খুব সজাগ, বাতি নিভলেই লাঠি হাতে মেয়েদের বসবার পৃথক জায়গাটা ঘিরে রাখে।

পার্বতীপুর হলো দিনাজপুরের একটি উপজেলা। বড় রেলওয়ে জংশন। একসময় অবাঙালিপ্রধান এলাকা ছিল।

পার্বতীপুরের ইউএনও আবুল কালাম আজাদ সাহেব জানুয়ারি মাসেই আমাকে জানিয়েছিলেন যে, পার্বতীপুরে 'একুশে উদযাপন কমিটি' একমাসব্যাপী সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে। এর চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, এবারের শহীদ দিবস পালন করা হবে গ্রামপর্যায়ে। হয়েছেও তা-ই। উদ্যোক্তারা জানালেন, পার্বতীপুরের ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩টিতে একুশের অনুষ্ঠান হয়েছে। শহীদ মিনার তৈরি করে সেখানে ফুল দেওয়া হয়েছে, হয়েছে প্রভাতফেরি, কবিতাপাঠ, গান। ভালো লাগল এ কারণে যে, একুশে ফেব্রুয়ারির মতো একটি জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান এখন পর্যন্ত দেশের শহর এলাকাগুলোতেই সীমাবদ্ধ, গ্রামের মানুষ একুশের অনুষ্ঠান দেখবে কী, অধিকাংশই জানে না একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি কী কারণে তাৎপর্যপূর্ণ, কী কারণে এ দিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে চিহ্নিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, সেক্ষেত্রে শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানমালার গ্রাম-সম্প্রসারণ ভালো একটি উদ্যোগ। শুনলাম পার্বতীপুরে মাসব্যাপী একুশের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে খরচ হয়েছে আট হাজার টাকার কিছু বেশি। সরকার উপজেলা উন্নয়নের জন্যে বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল যা দেয় তার শতকরা পাঁচ ভাগ নির্দিষ্ট থাকে খেলাধুলা ও শিল্প-সংস্কৃতি খাতের জন্যে। এই টাকার একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করলেও একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলোই ডিসেম্বরসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলো ইউনিয়ন ও গ্রামপর্যায়ে পালন করা যেতে পারে। পার্বতীপুরে সম্ভব হলে অন্যখানে সম্ভব নয় কেন?

পার্বতীপুরে আসবার আগে একদিনের জন্যে ছিলাম রাজশাহীতে। তার আগে বগুড়ায়, একটানা ১০ দিন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি : বগুড়ার রুগ্ণ শিল্প-কারখানাগুলোর ওপর সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরি করব, আর যাব পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে। সেখানে যদি কোনো গবেষণাকর্ম পাওয়া যায়! শুনেছিলাম ড. আমজাদ হোসেন নাকি দেশে সেচের পানি ব্যবহারের ওপর একটি সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। সেটি পাওয়া গেলে হয়তো প্রথম পাতার রিপোর্ট হতে পারে 'সংবাদে'।

প্রতিষ্ঠানটি 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল একটি জাতীয়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। কুমিল্লাতে যেমন রয়েছে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, তেমনি বগুড়াতেও। কিন্তু কিছুদিন আগে জাতীয় সংসদে একটি বিলের মাধ্যমে 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'কে করা হয়েছে 'বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'। অর্থাৎ বগুড়া শব্দটি শেষের দিকে ছিল, তা সামনে আনা হয়েছে। এই নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা দারুণ হতাশ। তাদের আশঙ্কা, প্রতিষ্ঠানটি তার জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। আগে ছিল জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান, এখন পরিণত হয়েছে আঞ্চলিক একটি সংস্থায়। এর ফলে টাকাপয়সা বরাদ্দ কম হবে, কর্মকর্তাদের গুরুত্ব কমে যাবে, মিইয়ে পড়বে কর্মকাণ্ড। প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করব কী, কর্মকর্তাদের হায়-আফসোস শুনতে শুনতে বেলা গেল।

ঐদিন একটা ঝরঝরে বাসে চেপে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর প্রধান ফটকের ধারে নামলাম সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। সঙ্গে সংবাদের বগুড়া প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান বিলু। বয়সে বাচ্চা ছেলে, কিন্তু কাজ করে খুব ভালো। বেশ চটপটে, বিনয়ী।

একাডেমী চত্বরটি বগুড়া শহর থেকে ঠিক দশমাইল দক্ষিণে, শেরপুরের দিকে। ১২০ একরের ওপর মনোরম পরিবেশ। আধুনিক প্যাটার্নের বহু ভবন। গাছগাছালি। গবেষক কর্মকর্তা-কর্মচারীও অনেক। হালে অবশ্য গ্রাম-উন্নয়ন-সম্পর্কিত গবেষণা কাজকর্মের চেয়ে প্রশিক্ষণের কাজ হচ্ছে বেশি, তাও আবার সেসব প্রশিক্ষণ অধিকাংশই গ্রাম-উন্নয়ন-সম্পর্কিত নয়।

হাতে সময় ছিল, বাস থেকে নেমে হাসিবুর রহমান বিলুকে বললাম, চলেন চা খাই। ঢুকলাম একটা ছাপড়া মতন চায়ের দোকানে। বাইরে থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল না, ভেতরে ঢুকেই দেখি দোকানের চেয়ারে বেঞ্চে, এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের ওপর বসা বিভিন্ন বয়সের অগুনতি মানুষ। কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ। সবাই আশপাশের গ্রামের। বসবার জায়গা না পেয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখ ক্যাশবাক্সের কাছে রাখা একটি টেলিভিশনের পর্দার ওপর। শুধু দেখছে না, যেন গিলে খাচ্ছে সচল ছবি। আহাম্মক বনে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। একটা ভিসিপি সেটে ন্যাংটা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। প্রকাশ্য দিবালোকে তা 'উপভোগ' করছে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আশপাশের পল্লীর ছেলে-বুড়ো। কী কাণ্ড!

আমরা দুজন অচেনা মানুষ শহর থেকে এসেছি, কিন্তু ভিসিপি যন্ত্রের চালক কিংবা দর্শক কারোরই তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ঐ ভিড়ের মধ্যেও দোকানদার দুজন দর্শককে পিঠ চাপড়ে সরিয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দিলেন। চা যেন তৈরিই ছিল, এনে দিলেন সামনে। দেখি বিলু ইতোমধ্যেই লজ্জায় ঘামতে শুরু করেছে। বললাম, তাড়াতাড়ি চা খান। সময় নাই, কাজ আছে অনেক।

দোকানদারের কাছ থেকে জানলাম, এটা ঠিক মূল প্রদর্শনী নয়। প্রদর্শনী হবে রাতের বেলা, টিকিট বিক্রি করে। এখন এখানে শুধু 'টেস্ট' করে দেখা হচ্ছে ব্লু ফিলমের ক্যাসেসটি ভালো আছে কি না!

অপসংস্কৃতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে গ্রামে। কে ঠেকাবে? কাকে কী বলবেন? কার দোষ দেবেন? পুলিশ-প্রশাসন বলে কিছু আছে কি? আছে কি নিয়মনীতির বালাই?

বৈধ-অবৈধর রাখঢাক নেই। যার যা খুশি তা-ই করছে। বগুড়ায় নেমে দেখলাম শহর এলাকাতেই প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে হরেকরকম জুয়া আর যাত্রায় উলঙ্গ নৃত্য। বগুড়া স্টেশনের ধারে রেলওয়ে ময়দান, বিরাট এলাকা ঘেরা। সুদৃশ্য তোরণের ওপর সুন্দর করে লেখা 'কৃষি শিল্প প্রদর্শনী'। চারিদিকে রঙিন আলোর বাহার। ভেতরে কৃষি কিংবা শিল্পবিষয়ক স্টল নেই। রাত গভীর যত হয়, প্রদর্শনীটি তত জমে ওঠে। এমন কোনো ধরনের জুয়া নেই সেখানে হচ্ছে না। চলছে নীলছবি। যাত্রাগুলো নাচসর্বস্ব। বুক তো সম্পূর্ণ খোলা, এমনকি কোমরে থাকে শুধু প্যান্টি। দর্শকদের হৈহৈ, চিৎকার, শীৎকার, মঞ্চে টাকাপয়সা ছুড়ে দেওয়া, সব মিলিয়ে নরক গুলজার। হায় খোদা, প্রদর্শনীটি চলছে আবার পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের নাম করে! প্রদর্শনীর মুনাফার টাকায় নাকি তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে!

প্রদর্শনীতে জুয়া আর অশ্লীল নৃত্যের প্রতিবাদে বগুড়া শহরে মিছিল হয়েছে, মিটিং হয়েছে, ছাত্ররা জেলা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও করে স্মারকলিপি দিয়েছে, স্থানীয় একটি পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, জুম্মার নামাজের পর মুসল্লিরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে। কিছুতেই কাজ হয়নি।

সবার এক প্রশ্ন : প্রশাসন তার নাকের ডগায় এইসব অপকর্ম চলতে দিচ্ছেন কী করে? পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের টাকা অন্য কোনো পন্থায় সংগ্রহ করা যেত না কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলা পরিষদের ডাকবাংলোয় জায়গা পাওয়া দুষ্কর। ওটা এখন কর্মকর্তাদের স্থায়ী আবাস হয়ে উঠেছে। শুধু ৯ নম্বর কামরাটি, যাকে বলে স্পেশাল রুম, সেটি বরাদ্দ পেলাম জেলা বোর্ডের সচিব সাহেবকে বলেকয়ে। ডাকবাংলোটি বগুড়া শহরের সাত মাথায়। হোটেল রেস্টুরেন্ট ধারেকাছে।

কামরায় ঢুকেই এক যন্ত্রণা। পাশের ঘরে ফুল ভলিউমে বাজছে বিদেশি মিউজিক। ওদিকে ওপরতলায় এক কর্মকর্তা নতুন ফার্নিচার বানাচ্ছেন। মিস্ত্রিদের ঘটাং ঘটাং হাতুড়ির শব্দে গোটা বিল্ডিং কাঁপে। কী আর করি, কামরার একটা ছেঁড়া তোশক থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করলাম তুলো, দলা পাকিয়ে কানে গুঁজলাম। তবুও বিচিত্র শব্দ পাওয়া যায়। পাশে বিদেশি মিউজিক আর হাতুড়ির শব্দ মাথার ওপর। ভুক্তভোগী না হলে কেউ বুঝবেন না এ যন্ত্রণা কত অসহ্য!

টোকা দিলাম পাশের কামরার দরজায়। নিবেদন করলাম, জনাব, আপনার এ যন্ত্রটা কি আস্তে বাজানোর ব্যবস্থা আছে? ভদ্রলোক সাউন্ড কমিয়ে দিলেন মুখ ব্যাজার করে। মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করলেন দরজা। এবার গেলাম তিনতলায়। কর্তাটি কামরায় নেই, বারান্দায় কয়েকজন মিস্ত্রি একযোগে ব্যস্ত। ওরা বলল, আমাদের বলে লাভ কী? সাহেবকে বলেন। সাহেব কখন ফিরবেন? তার ঠিক নেই।

একটানা প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে লেখালেখি অসম্ভব। চিন্তাভাবনা করব একটুখানি, তাও পারা যাচ্ছে না। ব্যাগ হাতে বেরুলাম বাইরে, দেখি 'উত্তর বার্তা' অফিসে কিংবা অন্য কোথাও বসে লেখা যায় কি না!

দরজায় তালা দিচ্ছি, এ-সময় কানে এলো পাশের সেই কামরায় বিদেশি মিউজিকের বদলে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে। 'আজি এ বসন্তে কত ফুল ফোটে' গানটি হচ্ছে এখন। খুব আস্তে আস্তে। শোনা যায় কি যায় না এইরকম। এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় গান।

হাতের ব্যাগ রাখলাম বারান্দার মেঝেতে। পায়ে-পায়ে ভদ্রলোকের ঘরের দরজার কাছে এগুলাম, নিঃশব্দে কান পাতলাম কপাটের গায়ে। গানটি এখন বেশ শোনা যাচ্ছে।

এই সময়, হঠাৎ করে খুলে গেল দরজা। ভদ্রলোক তার দরজার সামনে এভাবে আমাকে দেখে অবাক। আমি অপ্রস্তুতের মতো বললাম, জনাব, কিছু মনে করবেন না, এই গানটি আমার খুব প্রিয়, শুনছিলাম তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুখানি।

ভদ্রলোক এবার দরজা বন্ধ করলেন না, স্মিত হেসে চলে গেলেন ভেতরে, সাউন্ড বাড়িয়ে দিলেন সেই আগের মতো।

আমি পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলাম ঘরের ভেতরে। বললাম, জনাব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

(খবরের কাগজ, ১৪ মার্চ '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গন্তব্য উল্লাপাড়া

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে বাসখানা। ছুটছে নয়, বলা যায় উড়ে যাচ্ছে যেন!

বাসটি এসেছে নীলফামারীর এক উপজেলা জলঢাকা থেকে, যাবে ঢাকায়। আমি রংপুর থেকে উঠেছি, গন্তব্য উল্লাপাড়া, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ে মারা গেছে অনেক মানুষ, তছনছ হয়েছে গ্রামকে গ্রাম। ঝড়ের পরে ত্রাণ বিতরণের কাজকর্ম কেমন হচ্ছে না-হচ্ছে তা-ই দেখতে যাচ্ছি। জানি না সেখানে কী ধরনের ছবি পাব, কী কী বিবরণ লিখতে পারব, আর সেগুলো ঢাকায় পাঠাবোই-বা কী করে! সবকিছুই অনিশ্চিত। এমনকি অনিশ্চিত রংপুরে ফিরে আসা, ঈদের বাজার-টাজার করা। দেখা যাক, কপালে কী আছে, আগে তো উল্লাপাড়া পৌঁছি! চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্ত্রী এবং সন্তানদের মুখ। ওরা বলছিল, এই তো এতদিন পর কেবলি ফিরলে, আবার বেরুচ্ছ? কবে ফিরবে আবার? কতদিন থাকতে হবে বাইরে? কবে হবে ঈদের বাজার?

এর আগে, এপ্রিলের দ্বিতীয় দিনে রংপুর ছেড়েছি। গাইবান্ধা জামালপুর ঢাকা বগুড়া ঘুরে রংপুরে ফিরে এলাম ঈদের পাঁচদিন আগে। ভেবেছিলাম ঈদের আগের দিনকটা বাড়িতেই থাকব, ঈদের পরে যাব দিনাজপুরের দিকে।

রংপুরে কেবলি নেমেছি, বাসায় ব্যাগপত্র রেখে 'চন্দ্রবিন্দু' (একটি পত্রিকার দোকান)-র আড্ডাখানায় এসেছি মাত্র, তখুনি খবর পেলাম সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া তাড়াশ শাহজাদপুর এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ২৪/২৫ জন লোক মারা গেছে শুক্রবার বিকেলে। বগুড়ার করতোয়া পত্রিকার খবরে আশঙ্কা করা হয়েছে মৃতের সংখ্যা ৭৪-এ উন্নীত হতে পারে। গুরুতর ক্ষতি। তক্ষুনি বাসায় গিয়ে বললাম, ব্যাগপত্র গোছাও, উল্লাপাড়া রওনা দিতে হবে। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের মুখ কালো হয়ে যায়। তাদের কাছে প্রথম প্রথম অবিশ্বাস্য ঠেকে আবার রংপুর ছেড়ে যাবার ব্যাপারটা।

বিকেল পাঁচটায় রওনা দিলাম। ঈদের আগে বাসের টিকিট পাওয়া মুশকিল, তবু কীভাবে যেন একখানা ম্যানেজ করলেন বাসের টিকিট কাউন্টারের লোকজন। উল্লাপাড়ায় নামলেও ভাড়া দিতে হবে নগরবাড়ি ঘাট পর্যন্ত। তা-ই সই। যাবার মতো জায়গা পাওয়া গেছে, এই যথেষ্ট। নাইট কোচগুলো সরাসরি ঢাকা যায়, রাস্তায় ঘনঘন থামাথামি আর লোকজন ওঠানোর ঝামেলা নেই। এখানে বলা দরকার, রংপুর দিনাজপুর বগুড়া এলাকা থেকে যেসব বাস নগরবাড়ি কিংবা ঢাকা যায়, সেগুলোকে যেতে হয় উল্লাপাড়া শাহাজাদপুর বেড়া কাশিনাথপুর হয়ে।

নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা পর জলঢাকা থেকে বাসখানা এলো রংপুর শহরে। মিনিট পনেরো পরে রওনা হলো আবার ঢাকার পথে। বাস না বলে এটিকে বলা যায় মুরগি ও কাপড়ের গাঁইট বহনকারী একটি ট্রাক। ট্রাকের সাথে এর পার্থক্য হলো যে, এর একটি ভাঙা ঝরঝরে ছাউনি আছে, ভাঙা নড়বড়ে বেঞ্চ আছে কয়েক সারি। আমার আসন বাসের শেষ দিকে, দেখি লোহার বেঞ্চের নিচে দুখানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়া নেই, মোটা দড়ি দিয়ে দোলনার মতো করে বেঁধে রাখা হয়েছে উপরের রডের সাথে। দড়িখানা ছিঁড়ে পড়বে কি না টেনেটুনে পরখ করে দেখলাম। না, নতুন দড়ি। ভালোই হলো, দোল খেতে খেতে যাওয়া যাবে!

বাসের ছাদে বৃহৎ গোলাকার মুরগির খাঁচা। একটিপ্ তরিতরকারির বস্তা। মানুষ। ভেতরে পা রাখবার জায়গা নেই। কাপড়ের গাঁইট। যাত্রীদের ব্যাগ-সুটকেস। ঈদের কেনাকাটা। তরমুজ। ইফতারি কিংবা পানির ভাণ্ড। আসনে বসবার সাথে সাথে কঁকিয়ে উঠল কিছু। দেখি, সিটের নিচেও কিছু হাঁস-মুরগি নেওয়া হয়েছে। বলা দরকার, এইসব হাঁস-মুরগি কিনে আনা হয়েছে নীলফামারী কিশোরগঞ্জ-জলঢাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে। ঢাকার বাজারে যে মুরগির দাম ৭০/৭৫ টাকা, তা ঐসব এলাকায় মেলে ২৫/৩০ টাকায়। অর্থাৎ রাত পোহালেই মোটা লাভ। তার ওপর ঈদের বাজার গরম। জলঢাকার গ্রামের মুরগি ঢাকা শহরে বিত্তবানদের খাবার টেবিলে রোস্ট কিংবা কোরমা হয়ে আসবে ঈদের দিনে। রাজধানীর সাহেব-বাবুরা রানের মাংসে কামড় দিতে দিতে পাচকের প্রশংসা করবেন, কিন্তু তাঁদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে হাঁস-মুরগির প্রতিপালকদের ন্যায্যমূল্য বঞ্চনার ক্ষুদ্র অধ্যায়টি। জলঢাকার গ্রামের গরিব-দুঃখী মানুষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস কত না আদর-যত্নে এইসব হাঁস-মুরগি পুষেছে, বড় করেছে, কিন্তু হাটে-বাজারে তোলার পর বাজার পায়নি। প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা থেকে এইসব পণ্য কিনে এনে মুনাফা লুটেছে পাইকারি ব্যবসায়ী মহাজন। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাথে তারা জড়িত নয়, শুধু কাঁচা টাকা খাটায়, ইধার কা মাল উধার করে, কাঁচা টাকা পকেটে তোলে।

এইসব এটা-ওটা ভাবছি, ভাবছি রাতের বেলা উল্লাপাড়ায় নেমে কার বাসায় রাত কাটাবো, কাল সকালে কাজ শুরু করব কীভাবে, কোত্থেকে! গ্রামে যাবার মতো একখানা মোটরসাইকেল পাওয়া যাবে কি? 'সংবাদ'-এর উল্লাপাড়া সংবাদদাতা গোলাম মোস্তফাকে কি পাওয়া যাবে উল্লাপাড়া সদরে? হিরু ভাই, দৈনিক খবরের সংবাদদাতা কিংবা তার ভাই আমিন, যে-ছেলেটি খবর পাঠায় বাংলার বাণীতে, তাদের যে কোনো একজনকে পেলেও রাতের আশ্রয় আর একটুখানি খাওয়া নিশ্চিত।

বাস চলছে ভীষণ গতিতে। বাইরে অন্ধকার, ভেতরে অসহ্য গরম, ধুলো, মুরগির বিষ্ঠার দুর্গন্ধ, যাত্রীদের এটা-ওটা আলাপ আর বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া, আমার আশপাশে দুয়েকজন ইতোমধ্যেই নাকডাকা শুরু করে দিয়েছে। শাঁই শাঁই করে পাশ কেটে যাচ্ছে বিপরীতমুখী বাস কিংবা ট্রাক। সরু রাস্তা, মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে পারে যে-কোনো সময়! রক্ষা করো ঈশ্বর!

হঠাৎ আমার পাশ থেকে একজন যাত্রীর তীব্র চিৎকার। আঁতকে উঠলাম, এটা-ওটা ভাবনার ঘোর কেটে গেল। লোকটি বাঁদিকে বসা। আসন পায়নি, অর্থাৎ এক্সট্রা যাত্রী। একটা কাপড়ের গাঁইটের ওপর পা গুটিয়ে কোনোরকমে বসেছিল, চিৎকার দিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিৎকার শুনে ড্রাইভার বাসের ভেতরে চড়া আলো জ্বালালেন, নেভালেন কয়েক মুহূর্ত পরেই। আগের মতোই গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি। আলো জ্বালিয়ে তিনি তাঁর মাথা ঘোরালেন দিলিপ কুমারের স্টাইলে, যাত্রীদের দেখে নিলেন একপলক। মুখেচোখে বিরক্তি : যেন ধ্যান ভেঙে দিয়েছে কেউ তাঁর।

যাত্রীটি, হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল যে, বোঝা গেল একজন মুরগি ব্যবসায়ী। ওরা ১০/১২ জন একত্রে এসেছিল উত্তরাঞ্চলে, ঈদের আগে মুরগি কিনে নিয়ে যেতে। এখন মাল কিনে ফিরে যাচ্ছে ঢাকায়।

তার আর্তচিৎকার থামে না। কিন্তু ব্যাপারটি কী? খানিক পরে বোঝা গেল, তার পেট খারাপ করেছে, এক্ষুনি গাড়ি না থামালে নাকি কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে তার। চিৎকারের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে আকুতি-মিনতি। আসন ছেড়ে সে নিজেই ত্বরিত উঠে যায় পেছন দিকের দরজার কাছে, বাস থামানোর জন্য বাসের গায়ে ধমাধম কিল মারতে থাকে। অন্ধকারেও শোনা যায় যাত্রীদের খিলখিল হাসি. নানান সরস মন্তব্য। গাড়ি তবু থামে না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে চলন্ত গাড়িতে দুটি দল হয়ে গেল। একটি দল, যাদের অধিকাংশই মুরগির পাইকার, তারা সমস্বরে বলছে গাড়ি থামাতে। তারা বলছে, 'শালা তোমরা যেখান-সেখান থেকে লোক তোলো, মাল তোলো, তাতে তোমাদের কিছু হয় না, আর একটা লোকের কাপড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তোমাদের তোয়াক্কা নেই!' আরেকটি দল, যারা সাধারণ যাত্রী ঈদ করতে যাচ্ছে ঢাকায়, তারা বলছে, না গাড়ি থামবে না। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করালে ডাকাতির ভয় আছে, ওদিকে আবার নগরবাড়ি ঘাটে ফেরি পাওয়া যাবে না। একেই গাড়িখানা একঘণ্টামতো লেট।

দ্বিতীয় দলটির সাথে যোগ দিয়েছে গাড়ির সুপারভাইজার কন্ডাক্টর আর হেলপার। 'না না, গাড়ি থামানো যাবে না' বলে তারাও চিৎকার করছে। দুদলের চিৎকার, বকাঝকা গালাগালি চরমে উঠল, অন্ধকারের মধ্যেই শুরু হলো হাতাহাতি। কে কার শত্রু বোঝা যাচ্ছে না, শুধু চিৎকার আর কোঁকানি। আমি ভাবছি, যাত্রী বনাম যাত্রী কিংবা ব্যবসায়ী বনাম বাস-শ্রমিক সংঘর্ষের জের হিসেবে কাল থেকে আবার উত্তরাঞ্চলের রুটগুলোতে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে না যায়! ঈদের আগে ঘরমুখো যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়বেন নিশ্চয়ই।

গাড়ি ধাঁই ধাঁই করে ছুটছে। চিৎকার আর মারামারি তুঙ্গে। ড্রাইভার সাহেব সুইচ টিপে আবার আলো জ্বালালেন। দেখি, ঐ যাত্রীটি, যাকে নিয়ে ঘটনা, সে আবার বসে পড়েছে নিজের আসনে, ঐ কাপড়ের গাঁইটের ওপর জুত হয়ে বসে ফুকুর ফুকুর বিড়ি টানছে। এবার উল্টো ধমক দিচ্ছে নিজের দলের লোকজনদের। বলছে, 'তোরা শালা চুপ কর! থাম শালারা থাম! গাড়ি থামানোর দরকার নাই, আমি বেগ থামাইয়া ফালাইছি, নগরবাড়ি ঘাটে গিয়া পায়খানা করুম নে। শালারা তোরা মারামারি চিল্লাচিল্লি থামা!'

মারামারি থামল সহসা। থামল চিৎকার। শুধু কিছু গুঞ্জন আর হাসি মুরগির বিষ্ঠার দুর্গন্ধের সাথে ভেসে বেড়াতে লাগল। এ-সময়, শুনি, ঐ যাত্রীটির বন্ধুরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা তারই মতো মুরগির পাইকার, সংখ্যায় ১০/১২ জন, একসাথে এসেছিল মুরগি কিনতে, তারা সবাই মিলে গজরাচ্ছে। তারা বলছে, 'তুই শালা আসার দিনেও এইরকম করছিলি। তোরে আর আমাদের সাথে কক্ষনো আনুম না।'

আরেকজন বলছে, 'তোর শালা পেট খরাপ, ওসুধ খাস না ক্যেন?'

আরেকজন : তুই শালা আমাদের অপমান করলি! চল, নগরবাড়ি ঘাটে চল, দেখামু মজা! তোর পাছায় লাথি মারমু!

আরেকজন : দে শালারে একটা লাথি দে। লাথি দিয়া গাড়ি থাইকা নামাইয়া দে ...।

যাত্রীটি, ঘটনার নায়ক, সে নির্বিকার। বিড়ির আগুনের টুকরো ঝুলছে তার ঠোঁটে।

(খবরের কাগজ, ১৭ মে '৯০)

চিনি ট্রেনে সফর

আন্তঃনগর ট্রেনের যেমন বিভিন্ন নাম দিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, তেমনি বিভিন্ন স্থানীয় নাম আছে মেইল কিংবা লোকাল ট্রেনের। যেমন সখিনা ট্রেন, হাঁড়ি ট্রেন, চিনি ট্রেন,। না, এ নামগুলো রেল কর্তৃপক্ষ দেয়নি, এগুলো মুখে-মুখে চালু করেছে যাত্রীরা; স্টেশনের আশপাশের লোকজন।

গোয়ালন্দ থেকে পার্বতীপুর যাতায়াত করে যে ট্রেনখানা, তার নাম যে একসময় 'গোয়ালন্দ লোকাল' ছিল তা ভুলেই গেছে লোকজন : ওটার নাম এখন 'সখিনা ট্রেন'। দুস্থ মহিলারা এই ট্রেনটিতে করে চাল, গম, চিনি, আটা, জ্বালানি কাঠ, ডাব, মাদুর, শাড়ি ইত্যাদি নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। বছর কয়েক আগে এর নাম ছিল গোলাপী ট্রেন, পরে হয়েছে সখিনা ট্রেন। শান্তাহার জংশন থেকে যে ট্রেনখানা লালমনিরহাট পর্যন্ত যায়, তাতে পরিবহন করা হয়ে থাকে অজস্র হাঁড়ি-পাতিল। এর নাম হাঁড়ি ট্রেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ লাইনে 'ঢাকা মেইল' নামে ট্রেনখানা, 'চিনি ট্রেন' নামেই এখন তা সবার কাছে পরিচিত। সীমান্ত পেরিয়ে যে বিপুল পরিমাণ চিনি আসে বাংলাদেশে, সেগুলো এই ট্রেনটিতে করেই বিভিন্ন জনপদে চালান যায়। চিনি ট্রেন নামকরণ এজন্যেই।

এইসব ট্রেন, সে মেইল হোক কিংবা লোকাল, টাইমটেবল বলে কিছু নেই। খেয়ালখুশি মতো ছাড়ে, পথের মাঝে যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়, যাত্রী ওঠায় কিংবা নামিয়ে দেয়। অধিকাংশ কামরায় দরজা-জানালা বন্ধ করার মতো ব্যবস্থা নেই, ছাদ ফুটোফাটা, বেঞ্চগুলো নড়বড়ে, কোনোটায় বেঞ্চের ফ্রেমখানা শুধু আছে, বসার জায়গায় কাঠের পাটাতন নেই। কামরায় আলো-পানি এইসব ব্যবস্থা তো নেইই, টয়লেটগুলো ব্যবহৃত হয় মালের বস্তা রাখার জায়গা হিসেবে, কোনোটিতে আবার দাঁড়িয়ে থাকে চাপ চাপ যাত্রী। এককেটা কামরা যেন এককেটা চলন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাস্টবিন, বিভিন্ন আবর্জনায় হাঁটু ডোবে প্রায়। মাসেও একবার ঝাঁট দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। কামরার ভেতর মানুষ তিনগুণ, তার চেয়েও বেশি ছাদে, পাদানিতে, দুবগির সংযোগস্থানে, ইঞ্জিনের বডিতে, সামনে। দেখলে মনে হয়, মানুষের চাক গড়িয়ে চলছে। বুঝে নিতে হয় একদলা মানুষের ভেতরে ট্রেন নামক যন্ত্রশকট আছে একখানা।

ক'দিন আগে ঈশ্বরদী থেকে চিনি ট্রেনে চাপলাম। যাব বড়াল ব্রিজ নামের একটি স্টেশনে, সেখানে আন্তঃনগর ট্রেন পদ্মা কিংবা যমুনা দাঁড়ায় না, অতএব চিনি ট্রেন ভরসা।

এটি একটি মেইল ট্রেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসে, ঈশ্বরদী জংশন হয়ে চলে যায় সিরাজগঞ্জ ঘাটতক। ট্রেনখানা ঈশ্বরদীতে আসবার কথা বেলা আড়াইটায়, সেটি এলো মাত্র তিনঘণ্টা লেট করে। দুতিন ঘণ্টায় বাংলাদেশ রেলওয়ের কিছু যায় আসে না, যখনই আসুক ট্রেন লোকজন অপেক্ষা করতে বাধ্য, সে ট্রেনে চাপতে বাধ্য। অন্য কোনো যোগাযোগ-ব্যবস্থা নেই। তবু শুধুমাত্র জানার কারণেই স্টেশনমাস্টারের কামরায় গেলাম। তিনি নেই, একজন কর্মচারী জানালেন, দুতিন ঘণ্টা লেট তো কিছুই না, বরং অন্যান্য দিন এ ট্রেনখানা আরও লেট করে। আজ নিতান্তই সৌভাগ্যবশত একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। এই কথা শোনার পর আর কথা বাড়ানো যায় না।

কামরায় ঠাসা মানুষ। আর আছে বিভিন্ন সাইজের বস্তা। সবগুলোতেই আছে ইন্ডিয়ান চিনি। সর্বনিম্ন ৫ সের থেকে ১ মণ পর্যন্ত। চিনির বস্তা দরজার কাছে, বেঞ্চের নিচে, উপরের তাকে, টয়লেটের ভেতর। অনেকে চিনির বস্তা কামরার পাটাতনে রেখে তার ওপর জাঁকিয়ে বসেছে। তিল ধারণের জায়গা থাকলেও পা রাখার জায়গা সত্যি নেই। মানুষ আর বস্তায় ঠাসাঠাসি, তার ওপর কেউ আবার তুলেছে মুরগি, হাঁস, কবুতরের খাঁচা, ছাগল, কাঁঠালের পাতা, পাটি, জ্বালানি কাঠ, মাছের ডালা, দুধ কিংবা ছানার বালতি। যাত্রীদের নিজ নিজ মালসামান তো আছেই। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর, এক প্রৌঢ়, অনেকটা অনুগ্রহের মতো করে নিজের চিনির বস্তার ওপর থেকে উঠে দাঁড়ালো, বসার আহ্বান জানালো। মানুষ এবং বস্তার স্তূপের ভেতর ডুবে গেলাম।

এ ট্রেনে টিকিট কেউ কাটে না। তবু টিকিট চেকার এলেন। পা মাড়িয়ে, বস্তা ডিঙিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে সংগ্রহ করলেন নগদ টাকা। এক টাকা, দুটাকা, পাঁচ টাকা, যে যা দিলেন পকেটে ঢোকালেন টপাটপ, যেন জালে-ধরা খুচরো মাছ খুঁটিয়ে খলুইতে ঢোকাচ্ছেন। আমার মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে দুআঙুলে বিচিত্র কায়দায় চুটকি মারলেন তিনি। অতিকষ্টে টিকিটখানা বের করে সামনে বাড়ালাম, তিনি দেখলেন না, ছুঁলেন না পর্যন্ত, বরং ভ্রূ কুঁচকালেন, জানতে চাইলেন কোথায় যাব। আশপাশের যাত্রীদের অনেকেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে, গলা বাড়িয়ে দলা পাকানো সত্ত্বেও আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল কেউ-কেউ।

চেকার সাহেব নেমে যাবার পর এলেন নিরাপত্তা বাহিনীর দুজন সদস্য। পেছনের জন পুরো পোশাকপরা, হাতে লাঠি, কামরায় ঢুকেই চিনির বস্তাগুলোতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুঁতো মারতে লাগলেন। এটা কার? ওটা কার? কথা কও না ক্যান? কার বস্তা এগুলান? কিন্তু সামনের লোকটি, পরনে চেক লুঙ্গি আর খাকি শার্ট, গালভরা পান, হাত বাড়াচ্ছেন ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে ওপরে। মুখে কথা নেই তাঁর, শুধু পান-ফোলা মুখে বিচিত্র হাসি ঝুলিয়ে 'কালেকশন' করে যাচ্ছেন। যেন হাটের তোলা আদায় করা হচ্ছে। কেউ দিল দুটাকা, কেউ পাঁচ টাকা; যার বড় বস্তা, চিনির পরিমাণ বেশি, তারা দিল সর্বোচ্চ দশ টাকা পর্যন্ত। টাকা বের করতে দেরি হলে লাঠির গুঁতো, মুখ-খিস্তি। আমার পাশে এক বুড়ি, রাজশাহী থেকে দশ সের চিনি নিয়ে এসেছে, যাবে উল্লাপাড়ায়, জানালো, রাজশাহী থেকে উল্লাপাড়া পর্যন্ত পাঁচ-ছয় দফায় এভাবে টাকা দিতে হয় তাকে। পাশের আরেকজন বলল, ট্রেনে ওঠার আগে টাকা দিতে হয়, ট্রেন চললে পরে দিতে হয় দুতিন দফা, টাকা দিতে হয় গন্তব্যে পৌঁছলে। এভাবে টাকা দিতে দিতে লাভ খুব একটা হাতে থাকে না, লাভের চিনি খায় এইসব সাদা কিংবা খাকি পিঁপড়েরা।

এই চিনি ব্যবসায়ের ওপর জীবিকা নির্বাহ করছে রাজশাহী-ঈশ্বরদী-উল্লাপাড়া-সিরাজগঞ্জ এলাকার কয়েক শ দুঃস্থ পরিবার। এরা কেউই সরাসরি চোরাচালানের সাথে জড়িত নয়। সীমান্তের ওপার থেকে চিনি পাচার করে আনার আলাদা লোক আছে, এরা শুধু রাজশাহী কিংবা চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের নির্দিষ্ট চোরাবাজার থেকে চিনি কিনে আনে, নিয়ে যায় নিজ নিজ এলাকায়। পথে চাঁদা দেওয়ার পর প্রতি দশ সের চিনিতে ছয় থেকে আট টাকা লাভ টেকে।

চিনি ট্রেনে রওনা দেবার আগে ঈশ্বরদী প্ল্যাটফরমে যখন অপেক্ষা করছি, দেখলাম, বিভিন্ন বয়সের প্রায় দু শ মহিলা অপেক্ষা করছে রাজশাহী যাবার জন্যে। এরা ফিরতি মেইল ধরে রাজশাহী যাবে, চিনি নিয়ে ফিরবে আগামীকাল, এই সময়ে। মেয়েদের বিরাট দল দেখতে দেখতে পাশ থেকে কে যেন বলল, দেখছেন দেশের অবস্থা? দেখছেন কত মেয়ে পথে নেমেছে? শহরে বসে চিৎকার করা হচ্ছে দেশের নাকি উন্নয়ন হচ্ছে। এই কি উন্নয়ন? আরেকজন, যিনি ঈশ্বরদীতেই থাকেন, যাবেন সিরাজগঞ্জ ঘাটে; বললেন, এইসব মহিলাদের মধ্যে এমনও আছে যারা একই পরিবারের সদস্য। মেয়ে, মা, নানী কিংবা দাদি একসাথে নেমেছে চিনির ব্যবসায়। মেয়েদের দলে রয়েছে ৮/৯ বছর বয়সের কিশোরীও।

ট্রেন থামল বড়াল ব্রিজ স্টেশনে। দরজা দিয়ে নামবার উপায় নেই। দরজার কাছে নারী-পুরুষ আর চিনির বস্তা এত গাদাগাদি যে ঠেলে সামনে যাওয়া অসম্ভব। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত জানালা গলিয়ে প্ল্যাটফরমে নামলাম। ব্যাগপত্র জানালা গলিয়ে বের করে দিলেন এক যুবক, যাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল কলেজের ছাত্র। পরনে ফিটফাট প্যান্ট শার্ট, হাতে একখানা রম্য পত্রিকা।

প্ল্যাটফরমে নেমে প্যান্ট শার্ট ঝাড়তে লাগলাম। ধুলো ময়লায় একাকার হয়েছে ব্যাগ। ট্রেনে বাসে শতশত মাইল ট্যুর করেছি, কিন্তু জানালা গলিয়ে ট্রেনের কামরা থেকে নামবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। নেমে হাঁপ ছাড়লাম, হঠাৎ শুনি যুবকটি চিৎকার করে আমাকে ডাকছে। তার হাতে অতিকষ্টে ধরা একটি বড় আকারের বস্তা। সেটা ধরে নামানোর ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছে সে। বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই, তাড়াতাড়ি ধরেন, ট্রেন ছেড়ে দেবে, আমাকে এখানে নামতে হবে, তাড়াতাড়ি ধরেন, বস্তাগুলান নামান। বস্তা ধরলাম। একটা নয়, একই আকারের তিনটি বস্তা। চিনি আছে এগুলোতে।

বস্তাগুলো বের করে দেওয়ার পর যুবকটি নামল জানালা গলিয়ে। আলাপে আলাপে জানলাম ছেলেটি পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর উপজেলার বাসিন্দা, রাজশাহীতে একটি কলেজে পড়ে। সপ্তাহে একবার বাড়ি আসে, আসার সময় রাজশাহী থেকে কিনে আনে দুতিন বস্তা করে চিনি। এগুলো গ্রামে বিক্রি করে যা লাভ হয়, তা-ই দিয়ে নিজের পড়াশুনার খরচ চালায়। ওর একটি বোন স্কুলে পড়ে, তারও কিছু খরচ দিতে হয়। ছেলেটির বাবা একজন বর্গাচাষী, ফসলের টাকায় বছরের ভাতটুকু টেনেটুনে হয় বটে, কিন্তু ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ দিতে পারে না। ছেলেটি রাজশাহী শহরে এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় থেকে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, আর পড়ার খরচ যোগায় এই চিনির ব্যবসা করে।

মানুষের জীবন-সংগ্রাম কত বিচিত্র!

(সংবাদ, ৮ এপ্রিল '৯০)

AMARBOI.COM

জামালপুর ॥ সেই পুরনো পাঁচালি

আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছিল জামালপুরে। তবু ঘনিয়েছে সংকট!

সরকারি গুদামে চাল আছে প্রায় সোয়া ৮ হাজার টন। আছে গম। তবুও এ জেলায় খাদ্যাভাব।

মাঠে মাঠে বোরো ধানের সবুজ সমারোহ। তবুও মজুররা বসে আছে হাত গুটিয়ে। কাজ নেই। নেই চাল-আটা কেনার ক্ষমতা।

কিন্তু কেন এই সংকট? এ সংকট কি নতুন কিছু? গত বছর এপ্রিলের প্রথম দিকে একই ধরনের সংকট-পরিস্থিতির উদ্ভব কি হয়নি? তা থেকে কতটা শিক্ষা নিয়েছেন সরকার? জেলা প্রশাসনই-বা কতটুকু তৎপর? পত্রিকায় চালের দাম বেড়ে যাবার খবর ছাপা হবার পর ঢাকা থেকে পাওয়া নির্দেশে জামালপুর শহরে খোলাবাজারে চাল বিক্রি শুরু করেছে প্রশাসন ও খাদ্য বিভাগ (সংবাদ, ৯-৪-৯০)। ঢাকার নির্দেশের আগ পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন কেন তাঁরা? প্রশাসন এখন নাকি গেছে মানুষের দোড়গোড়ায়? এই কি তার নমুনা?

জামালপুর শহরে এলাম ৪ এপ্রিল। গতবছর এসেছিলাম ঠিক একই সময়ে। শহর থেকে ৮/৯ মাইল দূরে তিতপল্লা এলাকায় কয়েকজন খাদ্যাভাবজনিত অপুষ্টিতে মারা গেছে—এই খবরটির সত্যতা যাচাই করতে এসে সেবার জেনেছিলাম চালের সের ২০ টাকায় উঠেছে এখানে। সে-খবর ছাপা হবার পর খোলাবাজারে চাল বিক্রি শুরু হয়, শুরু হয় বিশেষ টেস্ট রিলিফের কাজ। শুধু জামালপুর নয়, দেশের অভাবী জেলা-উপজেলার জন্যে সরকার বরাদ্দ করেন ৫০ লাখ মণ চাল-গম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হবার আগে পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানীয় কর্তারা ঘুমান কেন নাকে তেল দিয়ে? নিজের এলাকার খবর কি তাঁরা রাখেন না?

চালের মূল্যবৃদ্ধির খবর নিয়ে সে-সময় বিতর্ক হয়েছিল। কেউ-কেউ বলেছেন, চালের মূল্যবৃদ্ধির খবর দেওয়া উচিত হয়নি। এ ধরনের খবর ছাপা হলে নাকি 'প্যানিক' সৃষ্টি হয়, দেশের অন্যান্য এলাকায় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, দাম বেড়ে যায় হু হু করে। আবার, কেউ-কেউ বলেছিলেন, ঐ খবরটি আলোয় বেরিয়ে না এলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত, মানুষ মরত আরও অনেক। বড় কথা, খবরটি প্রকাশের পর সরকারের কিংবা জেলা প্রশাসকের টনক নড়েছিল। খোলাবাজারে বিক্রির জন্যে চাল দেওয়া ছাড়াও প্রচুর চাল-গম দেওয়া হয় বিশেষ টেস্ট রিলিফে। কাজ পেয়েছে বেকার মজুরেরা। রুজি-রোজগার হয়েছে। খেয়ে বেঁচেছে।

এইসব গত বছরের কথা। কিন্তু সেই পরিস্থিতির কথা কি ভুলে গেছেন সরকার? আমন খুব ভালো ফলেছিল বলে কি তাঁরা আত্মসন্তুষ্টিতে ছিলেন? সরকারি গুদামে 'খাদ্য মজুত সন্তোষজনক' ভেবেই কি তাঁরা নিশ্চিন্ত? তাঁদের তো জানা থাকবার কথা, ধান যতই ফলুক কিংবা যতই মজুত থাক গুদামে, তাতে মজুরশ্রেণীর কিছু যায় আসে না। তাদের জন্যে কাজের সুযোগ দরকার, ন্যায্য মজুরি দরকার। কাজ আর মজুরি পেলে তাতেই তো তারা খাবার কিনবে।

গাইবান্ধা থেকে ঢাকা আসার পথে বাহাদুরাবাদ ঘাটে সময় কাটল কিছুক্ষণ। আশপাশে খোঁজ করি, চাল-আটার দাম কত। শুনি চাল যেটা মোটা, বিক্রি হচ্ছে ১২ টাকা কেজি দরে। মজুরির হার কত? মজুর তো নিচ্ছে না কেউ, তবু যদি ভাগ্যগুণে কাজ পায় কেউ একদিন, মজুরি মাত্র ১০ টাকা। এ টাকায় ১ কেজি চাল কেনা যায় না। বরং ঐ ১০ টাকা দিয়ে কেনে ১ ধরা (৫ সের) মিষ্টি আলু আর কিছু লবণ-মরিচ। সে লবণেও আক্রা। কালচে রঙের মোটা দানার লবণ, ৮ টাকা সের।

ঢাকা আসা হয় না সরাসরি। নামি জামালপুরে। প্রথমেই জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার সাথে দেখা, তাঁর প্রথম সহাস্য প্রশ্ন : আবার জামালপুরে আপনি? তারপর বললেন, 'না, এবারে আর খাদ্যসংকট নেই। বাজারে যান, দেখুন প্রচুর চাল আছে। গুদামে মজুত খুব ভালো। এবারে বোরোধানও খুব ভালো ফলবে। রিপোর্ট করবার মতো এবার আর কিছু নেই।'

এইসব কথা নিয়ে তর্ক চলে না। এ ধরনের কর্মকর্তারা সবকিছুরই একপাশ দেখেন। তাঁরা মনে করেন প্রচুর ধান ফললেই বুঝি অভাব-সংকট থাকে না। গুদামে খাদ্য থাকা মানেই তাঁদের কাছে 'পরিস্থিতি ভালো'। শুধু একজন নয়, অনেকেই ধারণা পোষণ করেন এইরকম। যেমন জামালপুরের খাদ্য বিভাগে যাই, কর্মকর্তারা বলেন, কুছ চিন্তা নেই। প্রচুর খাদ্য আমাদের হাতে। ত্রাণ বিভাগ বলে, 'না, পরিস্থিতির অবনতি হয়নি'। কৃষি বিভাগ জানায় : 'আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে, বোরোধানও প্রচুর ফলবে, এবারে সংকটের চিন্তা করি না আমরা।'

জামালপুরে শুধু নয়, রাজধানীতেও একশ্রেণীর সাহেব একই রকম ভাবছেন। ঢাকায় এসেই কথা বলি খাদ্য দফতরে। ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে। না, জামালপুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতির কোনোরকম অবনতি হয়েছে এমন খবর তারা পাননি। একজন আমলা বললেন, 'এপ্রিল-মে মাস তো অফ্-সিজন, বোরোধান ওঠার আগে আগে একটু-আধটু কর্মসংকট তো থাকবেই। এটা আবার অস্বাভাবিক কী ঘটনা?' ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একজন উল্টো প্রশ্ন করলেন, 'আসলেই কি জামালপুরে সংকট চলছে? কই, ওখান থেকে কোনো খবর তো পাইনি আমরা!'

খবর 'তাঁরা' পান না, ঠিক নয়। পান, তবে দেরিতে। পরিস্থিতি যখন ল্যাজে-গোবরে হয়ে যায়, তখন আড়মোড়া ভাঙেন। এরকম গতবারেও হয়েছিল। সংকটের খবর প্রকাশিত হলে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী আর খাদ্যমন্ত্রী জামালপুরে গিয়ে বলেছিলেন, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক।' (এর পরপরই বরাদ্দ করা হলো ৫০ লাখ মণ চাল-গম। সরকারি প্রচারযন্ত্র বিশেষ করে টেলিভিশনে 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক') আর তার পাশাপাশি চাল-গম বরাদ্দ বিতরণের খতিয়ান দেখেশুনে দেশের মানুষ অবাক।

হাঁ, প্রচুর ধান আছে বড় কৃষকের গোলায়, মহাজনের আড়তে, বাজারে। কিন্তু ১৭ লাখ মানুষের জামালপুরে, বিশেষ করে চরাঞ্চলে ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ ভূমিহীন। এই বিরাট জনগোষ্ঠী দৈনিক কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। গোলা, আড়ত কিংবা বাজারে ধান-চালের পাহাড় থাকলে তাদের লাভ নেই। এটা শুধু জামালপুরের পরিস্থিতি নয়, ময়মনসিংহ, শেরপুর, কিশোরগঞ্জের অভাবী পকেটগুলোতে একই অবস্থা। একই অবস্থা উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নওগাঁ ও নাটোর জেলার ৪০টি উপজেলায়। বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল এবং পূর্বাঞ্চলের ভূমিহীন-প্রধান এলাকাগুলোতেও একই সংকট। জামালপুর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফরমে দেখা হলো আজিমুদ্দিনের সঙ্গে, সে একজন বেকার মজুর, কাজের সন্ধানে এসেছে সংকটের জামালপুরে। দুদিন উপবাসী লোকটি পায়নি কাজ, পায়নি খাবার। লাশের মতো লম্বা শুয়ে আছে কংক্রিটের মেঝের ওপর।

চলতি সংকট প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নয়, খাদ্য ও ত্রাণ বিভাগের নয়, ঘরে-গুদামে যাদের মেলা ধান আছে তাদের নয়, ১শ টাকা মণ দরে আমন ধান কিনে এখন যারা তা ৩শ টাকায় বিক্রি করছে, এ সংকট তাদের ছোঁয়নি। যারা দালাল, ফড়িয়া, ফটকা ব্যবসায়ী; যারা চড়া সুদে টাকা খাটাচ্ছে, যারা এখনই ঈদের বাজার করতে জামালপুর থেকে ঢাকা আসছে, যারা সোনার গহনা বানানোর জন্যে জামালপুর শহরের জুয়েলারিগুলোতে ভিড় করছে, এ সংকট তাদেরও নয়। এ সংকট ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, ঝিনাই নদীর চর এলাকার লাখো দরিদ্র মানুষের। ওদের জমি নেই, কাজ নেই, পয়সা নেই, খাবার নেই।

'সংকট নেই', 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক'. 'খাদ্য প্রচুর আছে'—এইসব মিষ্টি কথায় প্রকৃত পরিস্থিতি ঢেকে রেখে লাভ নেই। দরিদ্র ভুখা মানুষগুলোকে প্রাণে বাঁচাতে হলে তাই এখন বড় প্রয়োজন কর্মসুযোগ সৃষ্টি করা, প্রয়োজন খাদ্য সরবরাহ।

(সংবাদ, ১১ এপ্রিল '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোলামীর : জেগে ওঠার সময়

লোকটির নাম ভোলামীর। এই সমাজের কেউকেটা নয়, ক্ষুদ্র কৃষক একজন সে। বগুড়ায় ধুনট নামে এক উপজেলা আছে, তারই গোঁসাইবাড়ি ইউনিয়নের বালুভাঙ্গা গ্রামে বাড়ি।

ভোলামীরের বয়স প্রায় ৪০ বছর। মাঝারির চেয়ে একটু লম্বা চেহারা, পাকানো শরীর, পোড়াকালো রং। মাত্র সোয়া বিঘা আবাদি জমি তার নিজের মালিকানায়। নিজের এই সামান্য জমিটুকু ছাড়াও গ্রামে এর-ওর জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে। উদয়াস্ত শ্রম দিয়ে তিন ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে পাঁচ সদস্যের সংসারটি চলে কি চলে না—এইরকম। গ্রামের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে সে। তবে, জানা যায়, বাপ-দাদার আমলে নাকি ভোলামীরদের জমিজমা বেশ ভালোই ছিল, ছিল সচ্ছল-সমৃদ্ধ অবস্থা। পারিবারিক নানা কারণে জমিজমা হারিয়ে কিংবা সামান্য যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল তা ভাগাভাগি হতে হতে লোকটি এখন পরিণত হয়েছে ক্ষুদ্র কৃষকে। যে-জমি একদা ভোলামীরদের নিজস্ব ছিল, তা চলে গেছে নতুন গজিয়ে-ওঠা ভূস্বামীর হাতে এবং আজ 'কপালের ফেরে' সেসব জমিই বর্গা নিয়ে আবাদ করে বালুভাঙ্গা গ্রামের ভোলামীর।

সেই অখ্যাত বালুভাঙ্গা গ্রামের অখ্যাত ভোলামীর হঠাৎ হয়ে উঠল বারুদ যেন! হয়ে উঠল সে ভীষণ এক প্রতিবাদ, হলো চেতনাসম্পন্ন এক মানুষ। সেই মানুষটির কাহিনী আপনাদের বলছি।

শুধু বালুভাঙ্গা গ্রাম নয়, গোটা গোঁসাইবাড়ি ইউনিয়ন এলাকাটাই আজ ফুঁসে উঠেছে। এলাকার প্রতিটি গরিব মানুষ; ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষী, ভূমিহীন দিনমজুর, যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ এমনকি মেয়েরাও প্রতিবাদী ভোলামীরের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকে যেন শাণিত হাতিয়ার, তেঁতে ওঠা বারুদ। ভোলামীরের ওপর এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মস্তানদের যে নির্যাতন, তার বিচার না হলে ফুঁসে-ওঠা মানুষগুলো নাকি নিজেরাই প্রতিকারের পথ খুঁজে নেবে। এলাকায় মস্তানদের জোর-জুলুম বন্ধ না হলে নিজেরাই নাকি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে গ্রামবাসী। এইসব কথা জানিয়ে দিয়েছে তারা উপজেলা প্রশাসনে, জেলার পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে। অবশ্য তারা নিজেরা কী ধরনের ব্যবস্থা নেবে কীভাবে পথ খুঁজবে প্রতিকারের, তা এখনও জানা যায়নি।

ভোলামীর তিতুমীর নয়, নয় সে নুরলদীন। সে বর্তমানের এক মানুষ। একজন ক্ষুদ্র কৃষক। ঘটনাচক্রে হয়ে-ওঠা এক প্রতিবাদের নায়ক। সেই ঘটনার শুরু মাসকয়েক আগে। গোঁসাইবাড়ির বালুভাঙ্গা গ্রামে দুঃস্থ মাতাদের জন্যে দেওয়া গম বিতরণে নানা অনিয়ম আর দুর্নীতি হচ্ছিল। ৩৩ সেরের জায়গায় দেওয়া হচ্ছিল ১৫ সের করে গম। এই অন্যায় চোখের সামনে ঘটতে দেখে কী কারণে যে নিরীহ কৃষক ভোলামীর হঠাৎ প্রতিবাদ শাণিয়ে তোলে, বোঝা যায় না। গ্রামের দুঃস্থ মহিলা, যারা গমের কার্ডধারী কিংবা গম পাওয়ার যোগ্য, তাদের জড়ো করে সে। তারা এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে যায়, গম আত্মসাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। না, ভোলামীর কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থক নয়, নিজে নয় রাজনীতি সম্পর্কে সামান্যতম সচেতন, নেই তার পেছনে রাজনৈতিক কোনো নেতাকর্মীর পরামর্শ কিংবা অন্য কারোর অদৃশ্য হাত। বলা যায় আপনাআপনি প্রতিবাদমূলক এই কাজটি করে বসে সে।

গম আত্মসাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে এলাকার ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে তার দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে শত্রুতা। শত্রুতা ফেনায়িত হতে থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং তা ফেটে পড়ে সাম্প্রতিক উপজেলা নির্বাচনের সময়। ইউপি চেয়ারম্যান যাকে সমর্থন দেয়, তার বিপক্ষের প্রার্থীর হয়ে প্রচারকাজ শুরু করে ভোলামীর। খেপে যায় চেয়ারম্যান। তার লোকজন হুমকি দেয় : 'ঠিক আছে, ইলেকশন শেষ হয়ে যাক, তারপর তোমাকে দেখে নেব ভোলামীর।'

ঘটনা, যেন একটি চাকা, গড়াতে থাকে। নির্বাচন শেষ হবার পর রাতের বেলা চেয়ারম্যান ভোলামীরের বাড়িতে যায়, ভোলাকে বাইরে ডেকে আনার পর তার বুকে রিভলবার ঠেকায়। এ-সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে ভোলামীরের ভাই। চেয়ারম্যানের হাতে বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করে সে। রিভলবারটি ছিটকে পড়ে যায়।

এইসব ভোলামীরের পক্ষের ভাষ্য। থানায় যে এজাহার দেওয়া হয়েছে তারই বক্তব্য। এজাহারে বলা হয়েছে, রিভলবারটি মাটিতে পড়ে যাবার পর ত্বরিত স্থান ত্যাগ করে চেয়ারম্যান, থানায় যায় এবং এই মর্মে একটি এজাহার দায়ের করে যে, কাজশেষে বাড়ি ফেরার পথে ভোলামীর নাকি চেয়ারম্যানের পথরোধ করে এবং তার বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে ধরে। চেয়ারম্যানের দেওয়া এজাহার অনুসারে ধুনট পুলিশ গ্রেফতার করে ভোলামীরকে। আরও ৩ জনসহ মোট ৪ জনের নামে মামলা দায়ের হয়।

AMARBOI.COM

নিরীহ এক কৃষক বনাম প্রভাবশালী চেয়ারম্যানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কোন্দল হঠাৎ রূপ নেয় আন্দোলনে। ভোলামীর গ্রেফতার হবার সাথে সাথে, খবরটি যখন গোঁসাইবাড়িতে এসে পৌঁছায়, একজোট হয়ে পড়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষ। এরা গরিব কৃষক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী, ভূমিহীন দিনমজুর, ছাত্র-যুবক; মিছিল করে ছুটে যায় ধুনট উপজেলা প্রশাসনে, থানায়। তাদের দাবি : অবিলম্বে ভোলামীরের মুক্তি দিতে হবে এবং চেয়ারম্যানের দুর্নীতির বিচার করতে হবে। গ্রামবাসীরা বলে, ভোলামীর একজন নিরীহ ক্ষুদ্র কৃষক, দিনমান জমিতে ব্যস্ত, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে অতি সাধারণ জীবনযাপন করে, সে কোথায় পাবে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র? চেয়ারম্যানের বুকে রিভলবার ঠেকানোরই-বা কী প্রয়োজন তার? এইসব জানা সত্ত্বেও কেন গ্রেফতার করা হলো তাকে?

উপজেলা চত্বরে মিছিলশেষে গ্রামে ফিরে যায় মানুষজন। তারা ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। আসলে প্রভাবশালীদের দীর্ঘদিনের নির্যাতনের শিকার শুধু ঐ ভোলামীর নয়, ছিল আরও অনেকে, বিভিন্নভাবে। কিন্তু ভোলামীরের ঘটনাটি তাদের ক্ষোভের সলতেটি উসকে দেয়। ঘরে-ঘরে লাঠি নিয়ে তৈরি হতে থাকে তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে' সন্দেহে পুলিশ ও প্রশাসনের টনক নড়ে এবার। তাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। ১৫ এপ্রিল ছুটির দিন থাকা সত্ত্বেও বগুড়ার পুলিশ সুপার ও প্রশাসনের লোকজন ঘটনা তদন্তে যান গোঁসাইবাড়িতে। 'শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার স্বার্থে' সেখানে জনসভা করেন তারা। পুলিশ সুপার গ্রামবাসীদের কথা দেন, ঘটনার তদন্তশেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন তিনি। ভোলামীর যাতে আর নির্যাতনের শিকার না হন, সে ব্যাপারে দেখবেন।

বগুড়া থেকে এই লেখাটা যখন পাঠাচ্ছি তখনও ভোলামীর মুক্তি পায়নি। হয়তোবা মুক্তি পাবে সে দুচার দিনের মধ্যে। কিন্তু প্রসঙ্গ সেটা নয়। আমার কাহিনী হলো ভোলামীরের ওপর প্রভাবশালীদের নির্যাতন ও পরবর্তীকালে তাকে গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণের ব্যাপারটি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষ সেখানে হয়েছে একতাবদ্ধ।

ভোলামীর সেই তিতুমীরের মতো বাঁশের দুর্গ বানায়নি, ভোলামীর 'জাগো বাহে কোন্‌টে সবায়' বলে নুরলদীনের মতো ডাক দেয়নি। সে বানিয়েছে মানুষের কেল্লা, কারাবন্দি থেকেও সে জড়ো করতে পেরেছে গোঁসাইবাড়ির নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষগুলোকে। তারা এখন বিস্ফোরণোন্মুখ, তেঁতে উঠেছে বারুদের মতো, যেন জ্বলে উঠবে যে-কোনো সময়ে।

গ্রামের অসহায় মানুষ কি প্রভাব আর সন্ত্রাসের মুখে নীরব থাকবে? পড়ে পড়ে শুধু মার খাবে তারা? নাকি তাদের এখন জেগে ওঠার সময়? অন্তত ভোলামীরের ঘটনাটি দেখে মনে হচ্ছে, সেই সময় বুঝি সামনে।

এটা ঠিক যে, ভোলামীরকে নিয়ে গণজাগরণের যে ঘটনাটি, তার পেছনে শক্ত-পক্ত কোনো নেতৃত্ব নেই, রাজনৈতিক কিংবা সাংগঠনিকভাবে কেউ শক্তিশালী নয়। নিতান্তই আবেগ থেকে ভোলামীরের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা এলাকার মানুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু-একটা করতে হবে এই ধরনের হঠাৎ-জাগা কিছু চিন্তা-চেতনা কাজ করেছে। কিন্তু এখানে যদি রাজনৈতিক কোনো প্রক্রিয়া থাকত, থাকত যদি সাংগঠনিক কোনো সুষ্ঠু তৎপরতা, তা হলে ভোলামীরের কাহিনী হয়তো অন্যরকম হতে পারত।

(সংবাদ, ২২ এপ্রিল '৯০)

'ভিক্ষুক স্পেশালের' দুই চরিত্র

'চিনি ট্রেনে সফর' লিখতে গিয়ে দুটি ট্রেনের কথা বাদ পড়ে গিয়েছিল। এক হলো 'হাসিনা ট্রেন'—পার্বতীপুর থেকে সৈয়দপুর হয়ে চিলাহাটি সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত চলাচল করে। কেউ একে 'খড়ি ট্রেন' আবার সৈয়দপুর এলাকার কেউ-কেউ 'বিহারী ট্রেন' বলে ডাকে। এই ট্রেনটিতে করে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো থেকে নীলফামারী, সৈয়দপুর কিংবা পার্বতীপুর শহরে আসে বিপুল পরিমাণে জ্বালানি কাঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: বিভিন্ন গাছগাছালির ডালপাতা, বাঁশের মুড়ো, কঞ্চি। বলা বাহুল্য, দুঃস্থ একদল মানুষ যাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশি, তারাই জ্বালানি কাঠের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। এই ট্রেনটিতে করে সৈয়দপুরের কিছু অবাঙালি তাদের গৃহপালিত ছাগলের জন্যে কাঁঠালের পাতা বয়ে আনে। কেউ আনে চিলাহাটি সীমান্ত থেকে ভারতীয় ছাপা শাড়ি।

আরেকটি ট্রেন : তার নাম হলো 'দি ভিক্ষুক স্পেশাল'। এটি চলাচল করে শান্তাহার-বগুড়া-বোনারপাড়া লাইনে। প্রতি বৃহস্পতিবার ভোরবেলা ছাদঠাসা অসংখ্য ভিক্ষুক এই ট্রেনটিতে করে উত্তরাঞ্চলের শিল্পশহর বগুড়াতে নামে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও ভিক্ষুক আসে বটে, কিন্তু বৃহস্পতিবারে ভিড় হয় খুব বেশি। বগুড়া শহরে কেউ-কেউ পুরো ইংরেজিতে ট্রেনটির নাম দিয়েছে 'দি বেগারস্ স্পেশাল'। ভিক্ষুক ছাড়াও ট্রেনটিতে করে আসে দুধ, দই, জ্বালানি কাঠ, শাকসবজি, শূন্য বাঁশের ঝাঁকা, কিছু ধান-চাল, মাটির হাঁড়ি-পাতিল। তবে বৃহস্পতিবার ভোরে কিংবা সন্ধ্যায় এই স্পেশাল ট্রেনটিতে সাধারণ যাত্রীদের ঠাঁই মেলা দুষ্কর। শত শত ভিক্ষুক। অধিকাংশই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, আছে অসংখ্য কিশোরী। কেউ অন্ধ, কেউ পঙ্গু, অসুস্থ, হাড্ডিসার। কেউ কুষ্ঠরোগী, যক্ষ্মা-আক্রান্ত, কেউ বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, কেউ কুঁজো। কালো তোবড়ানো মুখ, গলার নিচের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, বুকের প্রতিটি হাড় গোনা যায়। ময়লা শতচ্ছিন্ন শাড়ি, লুঙ্গি, শার্ট, গেঞ্জি। কারও হাতে লাঠি, কারও কাঁধে ঝোলা, কারও হাতে থালা কিংবা বাটি। এদের মধ্যে কেউ-কেউ শূন্যহস্ত, দেখে বোঝা যায় এ পথে নতুন এসেছে। পেশাদার ভিক্ষুকদের মতো হাত বাড়িয়ে কাতরাতে পারে না। বগুড়া শহরে নামার পর একে অপরের শাড়ির আঁচল ধরে সারিবদ্ধ হেঁটে চলে, বাসাবাড়ি কিংবা দোকানপাটের সামনে চুপচাপ দাঁড়ায়। কেউ দেয় পাঁচ পাই দশ পাই খুব জোর সিকি, কেউবা দেয় ধমক। খুব হলে বলে, 'মাফ করো বাবা, সামনে যাও।' কিন্তু কে কাকে মাফ করে? সামনে যাবার জায়গাটাই-বা কোথায়?

ঈদের আগে-আগে ভীষণ ভিড় ছিল ঐ ভিক্ষুক স্পেশালে। ভোরবেলা বগুড়া স্টেশনে গেলাম ওদের ছবি তুলতে। পারলাম না। অত ভোরে ফ্লাশ ছাড়া ছবি আসবে না, আর ফ্লাশ জ্বালালে গোটা ট্রেনখানা কাভার করা যায় না, আসে শুধু গুটিকতক মানুষ। তাদেরও আবার ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা মুশকিল, ট্রেনখানা থামতে-না-থামতেই সে ভীষণ হুটোপুটি, ধাক্কাধাক্কি, দৌড়ছুট। কে আগে নামবে, কে আগে প্ল্যাটফরম থেকে রাস্তায় যাবে তারই প্রতিযোগিতা। অত ভোরে শহরের বাসাবাড়ির লোকজন ঘুম থেকে জাগে না, খোলে না দোকানপাট, তবু ওরা ছোটে। যেন ভিক্ষে সব ফুরিয়ে যাবে।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুকবোঝাই ট্রেনখানা দেখলাম। কোথায় থাকে এত কাঙাল মানুষ! ভিক্ষে করে কত পয়সা পায়? তা-ই দিয়ে সংসার চলে? গ্রামের নাকি উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু এই কি তার নমুনা? বগুড়া শহরটি দিনে-দিনে সম্প্রসারিত হচ্ছে, গড়ে উঠেছে বহু সুপার মার্কেট, ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরি; নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হচ্ছে, রাস্তার দুধারে আলো-ঝলমলো দোকানপাট, দেশিবিদেশি জিনিসপত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থরে-থরে সাজানো। বাঘের চোখ হয়তো সত্যি মেলে না এখানে, কিন্তু পয়সা উড়ছে দেদার, শহরে মানুষের ভিড়-চাপ বাড়ছে ক্রমশ, বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেকটা উন্নত, যুবকদের মধ্যে পোশাক-আশাকে নতুন স্টাইল এসেছে। নতুন অফিস বসেছে, নতুন কর্মকর্তা, নতুন গাড়ি, নতুন মুখ। পনেরো-বিশ বছর আগেকার বগুড়া শহরের সাথে আজকের বগুড়ার অনেক ফারাক, কিন্তু পাশাপাশি এ জেলার গ্রামগুলোর অবস্থা কী? কী কারণে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এত ভিক্ষুক? এই যে খানিক আগে ছাদবোঝাই ট্রেনখানা এসে থামল, সেটাই কি সুজলা-সুফলা গ্রামবাংলার চলমান ছবি? এই কি বাংলাদেশ? কারা এদের শোষণ করেছে, ঝলকানো শহরের পথে-পথে নামিয়ে দিয়েছে?

এলোমেলো ভাবনা হোঁচট খায়। দেখি, সামনে, এক কুঁজো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে একজন বৃদ্ধের দিকে, বিকৃত কণ্ঠে বলছে, 'বাবা, ভিক্ষা।' আকুতি শেষ হয় না, ভিক্ষের বদলে আসে ধমক। বৃদ্ধটি, কাঁধে ঝোলা, হাতে লাঠি, সেও এক ভিক্ষুক। খেঁকিয়ে ওঠে সে, হাতের লাঠি তুলে কুঁজোর বাঁকা পিঠে ঘা বসায়। শালা তুমি কোথাকার লোক হে, চোখে দ্যাখো না! আমি এক ফকির (ভিক্ষুক), তার কাছে আবার ভিক্ষা চাও? বলতে বলতে বৃদ্ধটি সরে যায়, কুঁজো লোকটি বোবার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। পাশে দাঁড়ানো আরও দুজন ভিক্ষুক, এই কাণ্ড দেখে হি হি করে হাসতে থাকে। বলে, ওরে ছমির, তুই শালা কুঁজা, না কানা? কার কাছে ভিক্ষা চাস?

AMARBOI.COM

সামনে আসে এক বুড়ি। কোলে একটি শিশু। শিশুটির মাথায় দগদগে ঘা। আমার সামনে হাত পাতে বৃদ্ধা, বাবা একটা ট্যাকা দ্যাও।

: নাম কী তোমার?
: হাসেনা।
: বাড়ি কোথায়?
: গাবতলী।
: এ কার ছেলে?
: কার আবার, আমার।
: ছেলের বাপ কই?

বৃদ্ধা এবার খনখনিয়ে ওঠে। 'এত কথাত্ কাম কী বাপু। ভিক্ষা দ্যাও, যাই।' এগিয়ে আসে রুগ্‌ণ দুই যুবক। একজনের মাথায় টুপি, হাতে মাটির সানকি। অপরজনের এক চোখ অন্ধ, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ময়লা ব্যান্ডেজ। ওরা ধমক দিয়ে বুড়িকে সরিয়ে দেয়, নিজেরা হাত পাতে। ওদের একজন বলে, এই বৃদ্ধাকে তারা ভালো করে চেনে। সে নাকি দারুণ মিথ্যাবাদী। কোলের ছেলেটি নিজের নয়, গ্রাম থেকে দুটাকার বিনিময়ে ভাড়া করে এনেছে। কোলে ঘেয়ো শিশু দেখলে মানুষ নাকি বেশি দয়া করে, বেশি ভিক্ষা দেয়। লেখা যায় না এমন ভাষায় বুড়িকে গাল দেয় ওরা। ধমক দিয়ে ওদের থামাই। এতক্ষণে বুড়ির ওপর যুবকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রোশের হেতুটি জানা যায়। এই যে দুজন যুবক, তাদের একজন, মাটির সানকি-হাতে ঐ টুপি-পরা ছেলেটি, ঐ হলো নাকি বুড়ির পেটে-ধরা পাঁচ সন্তানের একজন। মাত্র কিছুদিন আগে ওরা পৃথক হয়েছে কিছু চাল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যুবকটি অভিযোগের মতো করে জানালো, সে ভিক্ষে করে পাওয়া সেরখানেক চাল, 'বঁশের' (শুকনো লাউয়ের পাত্র) ভেতরে রেখেছিল। বুড়িটি সে চাল চুরি করে বেচে দিয়েছে, কিন্তু দোষ চাপিয়েছে বউয়ের ওপর। তাই নিয়ে ঝগড়া, মারামারি, শেষে আলাদা হয়ে গিয়েছে ওরা।

যুবকের বয়ান শেষ হতে-না-হতেই আবার সামনে ছুটে আসে বৃদ্ধা। কোলের ছেলেটি কিছু-একটা ছুড়ে দেওয়ার মতো করে নামিয়ে রাখে নোংরা প্ল্যাটফরমের কংক্রিটে, তারপর হঠাৎ চমকে দিয়ে লম্বালম্বি শুয়ে পড়ে পায়ের ওপর। চিৎকার করতে থাকে সে, কথা বলে যায় দ্রুত এবং অনর্গল, সেসব অধিকাংশই বোঝা যায় না, শুধু এটুকু বোঝা যায় যে, চাল চুরির মিথ্যা অভিযোগে তার পেটের ছেলে তাকে পর করেছে এবং এখন ঘরে-বাইরে নিত্যই মানসিক নির্যাতন করছে। এর বিচার আমাকে করে দিতে হবে : এখানে এবং এই মুহূর্তে। বিচার না করা পর্যন্ত বৃদ্ধা আমার পা ছাড়বে না। এই বলে, সে শোয়া অবস্থাতেই বুক চাপড়াতে লাগল।

কান্না এবং চিৎকারে ভোরের বাতাস ভারী হয়ে আসে, আমাদের চারদিকে বৃত্তাকার ভিড় করে লোকজন, যেন ভালো একটা মজমা জমেছে। বৃদ্ধাকে কোনোমতেই থামানো যায় না, পাও ছাড়ে না, শেষ পর্যন্ত আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করল শীর্ণকায় এক রেলপুলিশ। তার লাঠির গুঁতোয় একই দরজা ধরে ছুট দিল মা এবং ছেলে, নামল প্ল্যাটফরম থেকে রাস্তায়।

আমিও ওদের পিছু পিছু বেরিয়ে আসি, হাঁটতে থাকি। হঠাৎ রাস্তার ডানদিকে চোখ পড়তেই পা থেমে যায়, নিজের চোখকেও বিশ্বাস হতে চায় না। দেখি, রাস্তার ধারে ধুলোর ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে সেই বৃদ্ধা, আর টুপি-পরা যুবকটি তার মাটির সানকিতে পানি ভরে এনে মায়ের ঠোঁটে তুলে ধরেছে। চুকচুক করে পানি খাচ্ছে ক্রন্দন-ক্লান্ত বৃদ্ধাটি। কোলে জড়ানো ভাড়া-করা ঘেয়ো শিশুটি তখনও নিঃসাড়।

রাস্তার দুধার দিয়ে এগুচ্ছে ভিক্ষুকের দল। যাচ্ছে ওরা মূল শহরের দিকে। আমিও শরিক হই তাদের মিছিলে। পেছনে, ধুলোয় পড়ে থাকে ভোরের নাটকের একটি অঙ্ক, পড়ে থাকে এক পারিবারিক রহস্য।

সমাজ ভাঙছে, খণ্ডিত হচ্ছে পরিবার, ভিটেমাটি। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়ছে, মূল্যবোধের ক্ষয়-অবক্ষয় ঘটছে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ঘন হচ্ছে, জটিল হয়ে পড়ছে জীবনযাপন। তার মাঝেও, দি ভিক্ষুক স্পেশালের দুই যাত্রী সচল দুটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতোই ধুলোয় পড়ে থাকে।

(সংবাদ, ৭ মে '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরদী প্ল্যাটফরমে একরাত

চলার পথে প্রতিদিন কত-না বিচিত্র-বিচিত্রতর ঘটনা ঘটছে! কত চরিত্র, কত মুখ, কত কথা! সুখ দুঃখের নানান কাহিনী! কিন্তু সবটা লিখতে পারি কই? সময় বড় একটা ফ্যাক্টর, তা ছাড়া পত্রিকায় জায়গা পাবার ব্যাপারটাও রয়েছে। রয়েছে 'সংবাদ'-এর কাজের চাপ। উত্তরাঞ্চল বিরাট এক এলাকা : নতুন পুরাতন মিলিয়ে ১৬টি জেলা। তাও যদি যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভালো হতো!

খবরের কাগজে পনেরো দিন অন্তর এক পাতা করে লিখি। এতে করে অনেক ঘটনা-কাহিনী বাদ পড়ে যায়। অথচ ইচ্ছে করে লিখতে, পাঠকদের জানাতে। উপায় নেই। আর পাতার পর পাতা লিখলেই-বা কী, সেসব ছাপা হলেই-বা কী? পাঠকরা তা গ্রহণ করছেন কি না, সেটাও ভেবে দেখবার ব্যাপার। আসলে আমি তো গল্পকার কিংবা উপন্যাস লিখিয়ে নই, শহর বন্দর গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ানো এক সাংবাদিক। যা দেখি তা-ই লিখি। ঘটনায় রং মেশাতে পারি না। উপমা, বর্ণনাকৌশল, শব্দচয়ন ও তার ব্যবহার এইসব আসে না। ফলে বুঝি হালকা-জেলো হয়ে যায় লেখা। হতাশা আর নীচুতা কাজ করে।

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম ঈদের আগের ভ্রমণকাহিনী। রংপুর থেকে বাসে করে রওনা দিলাম উল্লাপাড়ার পথে। এর আগে-পরে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, লেখা হয়নি তা। এটা অসম্ভব ব্যাপার। যেমন, দেখুন, ২ এপ্রিল বেরুলাম রংপুর থেকে। যাব আন্তঃনগর তিস্তা ধরে, ঢাকায়। রংপুর-ঢাকা টিকিট কিনলাম, কিন্তু সরাসরি যাওয়া হলো না, নামতে হলো বোনারপাড়ায়। বোনারপাড়া থেকে গাইবান্ধা। সেখানে উপজেলা নির্বাচনের ব্যালটপেপার চুরি হয়েছে। ১৬ মার্চ বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় মুক্তিযোদ্ধা রাজাকে, কিন্তু অপর এক প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৩ দিন পর ব্যালটপেপার পুনঃগণনা করে দেখা গেল রাজার ভাগের ৫০৮৯টি ব্যালটপেপার গায়েব! সেক্ষেত্রে জিতে যাচ্ছেন জাপা প্রার্থী। এই নিয়ে গাইবান্ধা শহরে দারুণ টেনশান। শহরে আগুন দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে যে-কোনো সময়ে। ঢাকা সফর বাতিল করে গাইবান্ধায় থাকলাম। ইচ্ছে ব্যালটচুরির ব্যাপারটা নিয়ে সরেজমিনে প্রতিবেদন লিখব।

দু'দিন কাজ করবার পর আবার টিকিট করলাম ঢাকার। আন্তঃনগর তিস্তায়। এবারেও যাওয়া হলো না, নামতে হলো জামালপুরে। চালের দাম বেড়ে গেছে আবার, গ্রামে কর্মসংকট, মজুরির হার নেমে এসেছে অনেক নিচে। জামালপুরের জেলা বার্তা পরিবেশক উৎপলকান্তি ধরের সাথে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে রিপোর্ট লিখলাম। সংবাদ যাঁরা পড়েন, হয়তো দেখেছেন এইসব। বেশ গুরুত্বের সাথে রিপোর্টগুলো ছাপা হয়।

এরপর জামালপুর থেকে ঢাকা। অফিসের কিছু কাজ সেরে সড়কপথে এলাম বগুড়ায়। 'বগুড়ার সমস্যা সম্ভাবনা ও বিকাশ' এই বিষয়ের ওপর কাজ করলাম একটানা কয়েকদিন। ইচ্ছে একটা সচিত্র সিরিজ করব। বগুড়ার কাজ শেষ করে রংপুরে ফিরব ঠিক করেছি, কিন্তু হলো না, বিশেষ একটা ব্যাপারে আবার ঢাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে হলো। দুদিন পর ঢাকা থেকে একতা ধরে ফিরে এলাম রংপুরে, ঈদের পাঁচদিন আগে। কিন্তু না, রংপুরে এসে বিশ্রাম হলো না, ঘূর্ণিঝড়ের খবর পেয়ে খানিক পরেই রওনা দিতে হলো উল্লাপাড়ায় এবং ২ এপ্রিলের পর কেবল ঐ উল্লাপাড়া রওনা দেবার ঘটনা-অংশ আপনাদের জন্যে লিখতে পেরেছিলাম গতবারের কাগজে। তাও আবার কাহিনী শেষ করতে হয়েছে চলন্ত বাসেই। জায়গা ছিল না। কিন্তু ঘটনা তো আরও ছিল! প্রতি মুহূর্তে ঘটেছে চিত্র-বিচিত্র সব ঘটনা। লেখা হয়নি। সম্ভব নয়।

ঘূর্ণিঝড় কাভার করে ফিরে এলাম রংপুরে। ঈদ। ঈদের পরদিন আবার সিরাজগঞ্জের পথে। ভাবলাম, সড়কপথে বগুড়া হয়ে নয়, এবারে যাব ট্রেনে করে। রংপুর থেকে পার্বতীপুর, তারপর সকাল সাড়ে তিনটার রকেট মেইল ধরে ঈশ্বরদী, ঈশ্বরদী থেকে দুপুর তিনটার দিকে একটা ট্রেন যায় সিরাজগঞ্জে। দিনে-দিনে পৌঁছানো যাবে। তাড়া খুব নেই, তিনদিন পত্রিকা বন্ধ।

পার্বতীপুর যাবার পথে এক বিড়ম্বনা। রেলব্রিজ সংস্কার হচ্ছে বলে বেশকটি ডাইভারশন, ট্রেন চলল খুব ধীরগতিতে, তার ওপর খোলাহাটি স্টেশনে গিয়ে খামাখা আধঘণ্টামতো ফেলে রাখা হলো ট্রেনখানা। পাবর্তীপুর নেমেই শুনি এই পাঁচ মিনিট আগে রকেট মেইল প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? সীমান্ত এক্সপ্রেস আসে সেই রাত নয়টায়। থাকো অপেক্ষায়! আশ্চর্য, শতশত যাত্রী লালমনিরহাট কাউনিয়া রংপুর বদরগঞ্জ পার্বতীপুর এলাকা থেকে রকেট মেইল ধরে যাবে শান্তাহার ঈশ্বরদী ভেড়ামারা পোড়াদহ যশোর খুলনাসহ বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু লালমনিরহাটের ট্রেনখানার কানেকশন না দিয়েই রকেট মেইলটি আউট করে দিল পার্বতীপুরের সুইচ কেবিন! প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করতে থাকল অসংখ্য নারী পুরুষ শিশু। শুনলাম, এই ধরনের ঘটনা আজকের শুধু নয়, প্রতিদিনই ঘটছে। রকেট মেইলের কানেকশন না পেয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বহু যাত্রী। 'বিবেক বলে কিছু নেই ব্যাটাদের?' স্টেশনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে আস্ফালন করলেন কোনো কোনো যাত্রী। নিষ্ফল। কে কার কথা শোনে?

পার্বতীপুরে বাংলার বাণীর সাংবাদিক শ. আ. ম. হায়দারের বাসায় উঠলাম। রাত নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কী আর করা! হায়দার, আমজাদ, সংবাদ-এর মুকুল, আর আমি—চারজনে মিলে শহরে ঘোরা, আড্ডা, আর কাপের পর কাপ চা।

রাতে সীমান্ত ধরে ঈশ্বরদী পৌঁছুলাম দেড়টার দিকে। এখান থেকে সিরাজগঞ্জের গাড়ি যাবে ভোরবেলা। কেউ বলে পাঁচটায় ট্রেন ছাড়বে, কেউ বলে সাতটায়। যা মর্জি!

রাত দেড়টা থেকে ভোর অব্দি অপেক্ষা করি কোথায়? ঘণ্টাখানেক আগে এ এলাকায় ঝড় উঠেছিল, বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গোটা প্ল্যাটফরম অন্ধকার। দোকানপাটগুলো বন্ধ, রেল-কর্মকর্তাদের ঘরে তালা, 'উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের ভোজনালয়'-এ ভেতর থেকে কপাট দিয়েছে কেউ, শত চিৎকারেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলে না। ওয়েটিংরুমে গেলাম। সেখানে এক ছোলাভাজা বিক্রেতার কুপির আলোতে দেখলাম, ঘরে ঠাসা যাত্রী। পা ফেলার জায়গা নেই। মানুষের ঢিপ্।

আমার সঙ্গে ব্যাগপত্র। এগুলো নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা যায় না। দাঁড়িয়েই-বা থাকি কতক্ষণ? পা ধরে যায়, আর মশার জ্বালাতন। আমার চারিদিকে, প্ল্যাটফরমের ওপর শুয়ে-বসে-থাকা অসংখ্য মানুষ। কুকুর। ঝড় থেমেছে কিন্তু থেমে থেমে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সামনে আসে এক প্রৌঢ়া। প্রায় মুখের কাছে চোখ টেনে আনে তার, জিজ্ঞেস করে, পাটি লাগবে, পাটি? এই প্ল্যাটফরমে শুয়ে-বসে রাত কাটানোর মতো পাটি ভাড়া পাওয়া যায়। কত করে পাটি? প্রৌঢ়া জানায় ভোর পর্যন্ত চার টাকা ভাড়া লাগবে। ঠিক আছে, দাও দেখি।

এক কিশোর কুলি আর একটি কুকুর খেদিয়ে প্রৌঢ়া পাটি পেতে দেয় প্ল্যাটফরমের মেঝেতে। বসি। বেশ লাগে। প্রৌঢ়া হাত বাড়ায়। ট্যাকা দ্যেও। টাকা গুনে দিতে হয় আগাম। নইলে পরে গোলমাল হয়, পয়সা মার যায়। পাটি ছেড়ে চলে যায় ভাড়াটেরা।

টাকা গোনে দিই। ওদিকে চলে যায় প্রৌঢ়া, হয়তো আর-কোনো খদ্দেরের খোঁজে। আমার সামনে আসে ছায়ামূর্তি একটি। অন্ধকারেও কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারি, বৃদ্ধ। পরে পরিচয় হয়, জানতে পারি তিনি পাবর্তীপুর থেকে এসেছেন, একটি মাদ্রাসার শিক্ষক, সিরাজগঞ্জে যাবেন মেয়ের বাড়িতে। হাতে বোঁচকা আর টিফিন-কেরিয়ার। ঈদের সেমাই মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছেন মেয়ে জামাই আর নাতির জন্যে।

AMARBOI.COM

বৃদ্ধ শিক্ষক আসেন আমার সামনে। বসে পড়েন বিছানো পাটির এক কোণে। বলেন, আমার বাবা বেশি পয়সা নাই, এই দুই টাকা নেন, শেয়ারে আপনার সাথে বসি, দাঁড়ায় থাকতে থাকতে পা দুইখান টনটন করতেছে বাবা। এই যে নেন দুই টাকা। ধরেন, নেন।

অন্ধকারে বৃদ্ধের কাঁপা হাতের মুঠি স্পর্শ করে আমার হাত।

(খবরের কাগজ, ৩১ মে '৯০)

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতালে

ভেকে ভিখ মেলে, তেমনি বুঝি সাংবাদিকতা করতে গিয়ে লাগে হরেক কৌশল, ভণিতা। একটা প্রতিবেদনের তথ্য উপাত্ত হাতে আনতে নানা সাচা-মিছা কথা খরচ করতে হয়। অবশ্য সবক্ষেত্রে নয়।

বলছিলাম ভেক-ভণিতার কথা। চলার পথে বহু জায়গায় বহুবার এমনটি করতে হয়েছে। অনুসন্ধানের কারণে, বস্তুনিষ্ঠতার খাতিরে, প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে। বিশেষ করে সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে ছলাকলা লাগেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুমিল্লা গিয়েছিলাম সেবার কী-একটা কাজে। স্টেশনে নেমেই শুনি ইত্তেফাকের সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী প্রহৃত হয়েছেন, মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে আছেন বাসায়। কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতালে গিয়েছিলেন তিনি পেশাগত দায়িত্ব-পালনের জন্যে, সুযোগ পেয়ে হাসপাতালের একদল কর্তা-কর্মচারী তাঁকে নির্দয়ভাবে পিটিয়েছে, চাকু দিয়ে হাত-পা-পিঠ খুঁচিয়েছে। কারণ কী? কিছুদিন আগে হাসপাতালের অব্যবস্থার ওপর কিছু প্রতিবেদন পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন, তাতে একজন কর্তাব্যক্তির খুব অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তিনি অন্য কর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ঐ দাঙ্গা-বাহিনী তৈরি করেন।

সন্ধ্যায় গোলাম মোস্তফা চৌধুরী সাহেবকে দেখতে গেলাম। বৃদ্ধ সাংবাদিক শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। গোটা শরীরে ব্যান্ডেজ, প্রায়-অন্ধকার একটি ভাঙা-প্রায় ঘরে সাদা কাপড় জড়ানো স্তূপ। হাত বাড়িয়ে দিলাম, তিনি কাঁপা হাত ছুঁলেন, কিন্তু হ্যান্ডশেক করবার জায়গা পর্যন্ত নেই। হাতের তালুতেও ব্যান্ডেজ। সেখানেও চাকু মেরেছে জনগণের স্বাস্থ্যসেবকরা। চোখের জলে কাহিনী শোনালেন মোস্তফা চৌধুরী, বয়ান করলেন হাসপাতালের নানা অব্যবস্থা। ওষুধ-চুরি নিত্যদিনের ব্যাপার, রক্ত নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে আর দুধটা পণ্যের মতো। এইসব ধরা মুশকিল, মুশকিল প্রমাণ করা। ওষুধ-চুরি কিংবা ভেজাল রক্তের ব্যবসা দুই-ই ঘটে রাতে, গভীর রাতে। ছবি তোলা কিংবা অন্যান্য দলিল-প্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল।

সিদ্ধান্ত নিলাম কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতালের ওপর ধারাবাহিক সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করব। রংপুর, রাজশাহী এবং অন্যান্য হাসপাতালের ওপর যেমন করেছি, তেমনটি। এতে হয়তো বোঝা যাবে উত্তরাঞ্চলের বাইরে দেশের আরসব হাসপাতালের অবস্থা কী-রকম! তবে, অব্যবস্থার কথা শুধু মুখে বললে কিংবা লিখলে হবে না, প্রমাণ করতে হবে। এজন্যে ছবি আর অন্যান্য ডক্যুমেন্ট দরকার।

তখন 'সংবাদ'-এর কুমিল্লা প্রতিনিধি অধ্যক্ষ দেলোয়ার (এখন তিনি সংবাদে নেই), তাঁকে জানালাম সিদ্ধান্তের কথা, বললাম হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাব। রাতের বেলা নিজের চোখে ওষুধ-চুরির ব্যাপারটা দেখতে হবে, জানতে হবে রক্ত-চুরি আর ব্যবসার বৃত্তান্ত। 'জানা গিয়াছে কুমিল্লা হাসপাতাল হইতে ওষুধ চুরি হয়' এই ধরনের টেবিল-মেড রিপোর্ট লিখতে আমি রাজি নই।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যায় কীভাবে? চিন্তা নেই, এ ব্যাপারে রংপুর আর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভিজ্ঞতা রয়েছে। খুঁজে পেতে একজন ডাক্তারের (হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার) সঙ্গে কথা বললাম। তিনি সংবাদ-এর পোকা পাঠক, তিনিও চান এই কুমিল্লা হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থা আর দুর্নীতির চিত্রগুলো সব জনসমক্ষে আসুক। সবরকমের সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন তিনি, তবে কথা হলো তাঁর নাম-পরিচয় কোনোভাবেই প্রকাশ করা চলবে না। না, সোর্সকে কেউ কখনো বিগড়ে দেয়!

অসুখ কিছু-একটা হওয়া চাই। কিন্তু কী অসুখ? সিরিয়াস কিছু-একটা না হলে হাসপাতালের বেডে ঠাঁই করে নেওয়া মুশকিল। দেলোয়ারকে বললাম, অমুক দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমুক সময়ে আমার হবে প্রচণ্ড বুক ব্যথা। প্রথমে শহরে যেতে হবে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারের কাছে, খামাখা ঘুরে এসে বলতে হবে ডাক্তার পাওয়া গেল না। তখন অগত্যা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

কথামতো কাজ। পরদিন শুক্রবার, অফিস আদালত দোকানপাট বন্ধ। সকালে গ্রামে গিয়েছিলাম একটা কাজে। দুপরে সেখান থেকে ফিরে শিক্ষা বোর্ডের রেস্টহাউসে এলাম, খাওয়ার পালা শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল বুক ব্যথা। ঘরে বেশ কজন সাংবাদিক ও দর্শনার্থী হাজির, তাঁদের উৎকণ্ঠার সামনে দিয়ে দেলোয়ার ডাক্তারের খোঁজে ছুটে গেল। শুক্রবারের দুপুর, ডাক্তার কোথায় পাবে? ব্যর্থতার ভান করে ফিরে এলো। আমি কোঁকাতে কোঁকাতে বললাম, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলেন, আমি ব্যথায় মরে যাচ্ছি। সব সাংবাদিক আর দর্শনার্থীরা ধরাধরি করে রিকশায় তুললেন আমাকে তৎক্ষণাৎ।

ভণিতা বোধকরি যুতসই হয়েছিল। সেটা বুঝলাম হাসপাতালে নেওয়ার পর। ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে নেওয়ার পর যখন বুক চেপে ধরে চিৎকার করতে লাগলাম, ডাক্তার এসে নাড়ি টিপে গম্ভীরমুখে কিছু-একটা নির্দেশ দিলেন। পরমুহূর্তেই দেখি একটা সিরিঞ্জ দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওটা কী? দেলোয়ার কানের কাছে মুখ এনে বলল আপনাকে পেথিড্রিন দেওয়া হচ্ছে। 'না না' বলে চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু কে শোনে কার কথা! ডাক্তার মনে করলেন এটা বুঝি ব্যথারই চিৎকার। একজন হাত চেপে ধরল, আরেকজন পা। অগত্যা চোখ বন্ধ করলাম। ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি।

ঘণ্টা তিনেক পর ঘুম ভাঙল। স্যাভলনের তীব্র গন্ধ। চোখ মেলে দেখি আমি হাসপাতালের বেডে। শুধু আমার বিছানাতেই ফর্সা চাদর, ভালো বালিশ কম্বল। বিছানার ডানে-বাঁয়ে টানা তারে কম্বল ঝুলিয়ে পর্দামতো তৈরি করা হয়েছে। হাসপাতালে কেবিন নেই, এটা তার বিকল্প ব্যবস্থা। ঘুম ভাঙতেই দেখি অনেক মানুষজন। স্থানীয় কজন সাংবাদিক, ফ্যান, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা। ইতোমধ্যেই জানাজানি হয়ে গেছে হাসপাতালে আমার ভর্তি হবার কথা। দেলোয়ার জানালো, সিভিল সার্জন পেয়িং ওয়ার্ডে এসে নিজের হাতে স্যাভলনের শিশি ঢেলেছেন।

নানা অব্যবস্থা কুমিল্লা হাসপাতালে। কর্মকর্তাদের ধারণা আমি হয়তো এগুলো লিখব। গোড়া থেকেই তাই শুরু হলো তোয়াজ। বড়কর্তা আনেন সিগারেটের প্যাকেট, বালিশের তলায় গুঁজে দেন, অথচ দেয়ালে দেয়ালে বড় করে লেখা 'ধূমপান নিষেধ'। দুপুরে রাতে খাবার আসে ডবল ডবল। নাস্তা পরিমাণে প্রচুর, বাসনকোসন পরিষ্কার। ভালো খাবার পানি আসে। বিছানায় উঠে বসলেই 'কী লাগবে বলেন' বলে এগিয়ে আসে জোড়া নার্স। আশপাশের অন্য রোগীরা আমার বেডের পাশে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে। 'কোন্ ডিপারমেন্টের লোক আপনি? আরমি না পুলিশ? আমরা ঠিকমতো খাওয়ার পাই না। আপনের জন্যে যে ডবল ডবল আসে।' সময়ে সময়ে বিরক্ত হয়ে উঠি।

হাসপাতালের অব্যবস্থা-সম্পর্কিত রিপোর্টের ফলোআপ করতে এসে গোলাম মোস্তফা চৌধুরী হামলার শিকার হন। ব্যাপারটা ভুলতে পারি না। আমার মনেও ভয় এসে বাসা বাঁধে। নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তাই নিজে করলাম। পরিচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনকে ফোন করে দু'জন প্রহরী আনালাম, তারা সাদা পোশাকে বারান্দায় পাহারা থাকল। ভেতরেও ব্যবস্থা নেওয়া হলো। দেলোয়ার ঠিক করল স্থানীয় তিন ইয়া-চেহারার যুবককে। তারা সর্বক্ষণিক ডিউটি দিচ্ছে কামরার ভেতরই। রাতের বেলা তিনজনে তিনটি খালি বেডে শোয়। দেলোয়ার নিজে ভর্তি হলো আমার ডানদিকের বেডে : তার হলো কোমরের ব্যথা।

আমার ব্যাগপত্র থাকল শিক্ষা বোর্ডের রেস্টহাউসে, শুধু লুঙ্গি গামছা আনিয়ে নিলাম। আর দ্বিতীয় দিনে এলো ক্যামেরার ব্যাগ। ঐদিনই গভীর রাতে পাওয়া গেল রক্ত-ব্যবসায়ীদের। ছবি তোলা হলো। রসিদ সীজ করলাম। পরদিন পাওয়া গেল ওষুধ-চুরির ছবি। হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর।

আমরা ঠিক করেছিলাম ওষুধচোর হাতেনাতে ধরব। অপেক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত এলো সেই সময়-সুযোগ। গভীর রাত। আমাকে রাত দশটার দিকে ডবল সিডাক্সিন দিয়ে গেছে নার্স, ওষুধ খাবার ভান করে পানি খেলাম, ঘুমের বড়ি রাখলাম পকেটে। শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলাম, তারপর মিছিমিছি নাক-ঘড় ঘড় ডাক। তার আগে দেলোয়ারের ম্যানেজ করা ঐ যে তিনজন যুবক, তারা ঘুমকাতুরে, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম ওদের একজনের পা। লম্বা দড়ির এক প্রান্ত আমার হাতে। দড়ি টেনে আনা হয়েছে লোহার খাটের নিচ দিয়ে, ঘুরিয়ে। দড়িতে টান পড়লেই জেগে উঠবে তাহের নামের যুবকটি। সে গুঁতিয়ে জাগাবে পাশের অপর দুজনকে।

ডানে-বাঁয়ে ঝোলানো কম্বলের পর্দা। পর্দা সরিয়ে দিয়েছি যাতে নার্সের ঘর আর গোটা কক্ষটা দেখা যায়। ঘুমের ভান করে পড়ে আছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সরু করে চোখ খুলি। কিন্তু কোথায় চোর? আমাদের উদ্দেশ্য কি ওরা জেনে গেছে?

সময় বয়ে চলে। রাত একটা, দুটো, আড়াইটা, তিনটা। আমারও বুঝি ঘুম ধরে, এইরকম ভাব। দিয়াশলাইয়ের কাঠি গুঁজে রাখি চোখে। দাঁত চেপে ধরি ঠোঁটে।

মৃদু পদশব্দ। স্বল্প আলোয় বেঁটেখাটো ছায়ামূর্তি। হাতে লাঠি। এগিয়ে আসে, দেখি নাইটগার্ড।

নাইটগার্ড পাহারা দেবে বাইরে, সে আবার ভেতরে কী চায়? আর লোকটা চোরের মতো এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেই-বা কেন? লোকটি প্রতিটি বেডের কাছে যায়, গলা বাড়িয়ে দেখে নেয় রোগীটি ঘুমিয়েছে কি না। এলো সে আমার বেডের কাছে। চোখ বন্ধ করলাম। নাকের ডাক। বুঝতে পারছি সে আমাকে দেখছে। নিশ্চিন্ত অবস্থায় সরে গেল পাশে। সরু করে চোখ মেলতেই দেখি নাইটগার্ড দ্রুত ঢুকছে নার্সদের ঘরে। ব্যাপারটা কী? উঠে বসলাম নিঃশব্দে, খুব আস্তে।

একটু পরেই শব্দ। মেঝেতে শিশিজাতীয় কিছু-একটা পড়েছে হাত ফসকে। অমনি দড়িতে টান। মুহূর্তেই জেগে উঠল তাহের এবং অপর দুজন। কোমরে গুঁতো দিতেই দেলোয়ারও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। পাঁচজনে দৌড়ে গেলাম নার্সের কামরায়। গার্ড তখন ইনজেকশনের শিশি আর কয়েকমুঠো ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তড়িঘড়ি করে পলিথিনের ব্যাগে ঢুকাচ্ছে। আলমারির তাক থেকে বের করবার সময় ইনজেকশনের একটা শিশি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, তারই শব্দ হয়েছে।

ধরে ফেললাম হাতেনাতে। গার্ডের কান্না আর থামে না। পায়ে সটান হয়ে কী সে আকুতি! ছেড়ে দেন স্যার, আর জীবনে এ কাজ করব না। চাকুরি চলে গেলে ছেলেপুলে নিয়ে মারা যাব স্যার—ইত্যাদি। বললাম, ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু কাগজে লিখে দিতে হবে যে তুমি এইসব চুরি করেছ। বলতে হবে তোমার সঙ্গে আর কারা কারা আছে। হাঁ, লিখিতভাবে গার্ড স্বীকার করল সবকিছু। তার কথাবার্তা সব টেপরেকর্ডারে বন্দি, ইনজেকশন আর ওষুধসহ ছবি রয়েছে ক্যামেরায়। সাক্ষীসাবুদ রাখা হলো আশপাশের রোগীদের। নার্স কামরায় ছিল না, দোতলায় গিয়ে ঘুমাচ্ছিল। অবশ্য চোরকে সুযোগ দেওয়ার জন্যে। কেননা গার্ডের মুখে জানা গেল এই নার্সরাই রোগীদের জন্যে বরাদ্দকৃত ইনজেকশন-ওষুধ প্রয়োগ না করে তা এই কামরায় এনে জমিয়ে রাখেন আলমারির তাকে। গভীর রাতে নাইটগার্ড পাহারা দেবার ছলে এসে সেসব জড়ো করে নিয়ে যায়, পরদিন সকালে বিক্রি হয় শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে। টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় সকলের মধ্যে, সমান সমান। হাসপাতালে নানা পদ্ধতি-প্রক্রিয়ায় ইনজেকশন ও ওষুধ চুরি হয়, এটা তার একটা অংশমাত্র।

নাইটগার্ডকে ছেড়ে দিলাম। তাকে বলা হলো, আজকের রাতের ঘটনা আগামী ৩/৪ দিন কাউকে বলা যাবে না, বললে তাকে পুলিশে দেওয়া হবে। আসলে এটা ভয় দেখানো। কেননা আমাদের ভয় ছিল রোগী সেজে ওষুধচোর ধরার ঘটনা পরদিন জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের ওপর আবার হামলা না হয়! চোরের সংখ্যাই তো বেশি। তারা এমনই দলে ভারী যে, পিটিয়ে ছাতু করে দিতে পারে।

পরদিন আরও ছবি তোলা হলো অনেকগুলো। নানা সমস্যার ছবি। এগুলো বাইরে থেকে দেখা যায়। সমস্যা হলো না। সটাসট শার্টার করছি। আমাকে ঘিরে আছে ঐ তিন যুবক আর দেলোয়ার। দূর থেকে ফলো করছে দুই সাদা-পোশাকধারী। হাসপাতাল ভবন এলাকায় গুঞ্জন উঠল। কর্মকর্তারা খবর পেয়ে ছুটে আসছেন বাসা থেকে। আমি শার্টার শেষ করেই হাসপাতাল থেকে সোজা স্টেশনে। টিকিট কাটাই ছিল আগে থেকে, রেস্টহাউস থেকে আনা হয়েছিল এক্সপোজড ফিলমের প্যাকেট। এতে আছে রক্ত-ব্যবসা আর ওষুধ-চুরির ছবি। কেউ যাতে কেড়ে নিতে না পারে সেজন্যে এগুলো আগেই হাসপাতালের বাইরে পাচার করা হয়েছিল।

'কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল, এই তার হাল' শিরোনামে ধারাবাহিক সচিত্র প্রতিবেদন বেশ কিছুদিন ধরে ছাপা হয়েছিল সংবাদ-এ। রক্ত-ব্যবসা-সম্পর্কিত সচিত্র প্রতিবেদনটি এসেছিল প্রথম পাতায়। রোগীর অভিনয় না করলে এইসব ছবি আর তথ্য-উপাত্ত পাওয়া হয়তো সম্ভব হতো না।

(খবরের কাগজ, ১৪ জুন '৯০)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপারেশন : হাতিরদিয়া বাজার সমবায় সমিতি

গতবারের লেখায় ভণিতার কথা বলেছিলাম। আসলে এই ভণিতাটা কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক বিষয়ের রিপোর্ট থাকে, কৌশলের আশ্রয় না নিলে মালমশলা বের করা মুশকিল। (না, অন্য কিছু নয়, মালমশলা মানে খবরের জন্যে তথ্য-উপাত্ত)।

কুমিল্লা হাসপাতালে রোগী সেজে ভর্তি হবার ব্যাপারটিকে অনেকে সহজভাবে নিতে পারেননি। বলেছেন, এটা প্রতারণা হয়ে গেছে। কেউবা ব্যাপারটিকে নিছক কৌতুক হিসেবে উপভোগ করেছেন। আরেক ধরনের পাঠক আবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন সত্য বলবার জন্যে। আসলে ভণিতা আমরা কে না করি? ভেতরে ভেতরে চোর, বাইরে সাধু থাকবার ভণিতা। মুখে সততার বুলি, কাজের ক্ষেত্রে ঠক। কথা বলি মানবতার, সুযোগ বুঝে মানুষের রক্তমাংস চুষে খাই। অন্তরে দুঃখের প্রস্রবণ, মুখে ঝরে মেকি হাসি। এই জগত-সংসারের মঞ্চে কে না অভিনয় করছি?

অনেকগুলো ক্ষেত্র থাকে সেখানে সাচা-মিছা বলতে হয়। এমনটি করতে হয়েছে বহুবার। উপায় কী, চাই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা। সত্য বের করতে চাই মিথ্যার গহ্বর থেকে। উপর থেকে যেটা দেখলাম তা-ই যদি লিখে দিই, তা হয়তো হবে মিথ্যা, বিভ্রান্ত হবেন পাঠক।

'৮৯ সালে আমার ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার একটি গ্রাম থেকে মিনি জেলখানার ছবি তুলে আনা। মনোহরদীর হাতিরদিয়া গ্রামে গিয়ে অস্ত্রের মুখে ঐ ছবিটি আমাকে তুলে আনতে হয়। সঙ্গে ছিল সংবাদের একজন সংবাদদাতা বদরুদ্দিন হায়দার। সেখানে কীরকম ভণিতা করতে হয়েছিল, তা-ই আজ বলি।

মনোহরদী উপজেলায় অনেকগুলো সমবায় সমিতির মধ্যে একটি হলো হাতিরদিয়া বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঋণদান সমিতি। প্রচুর টাকা লেনদেন করে। গ্রামের ভেতরে বিরাট পাকা ভবন, নিরাপত্তাব্যবস্থা খুব কড়া। হুট করে যে-কারও পক্ষে ঢুকে পড়া অসম্ভব।

মাধবদী-বাবুরহাট-ঘোড়াশাল এলাকায় তাঁত এবং তাঁতের কাপড়ের ওপর একটা প্রতিবেদন তৈরির কাজে গিয়েছি আমরা, সেখানে খবর পেলাম মনোহরদী উপজেলার হাতিরদিয়া বাজার সমিতিতে তোঘলকি কায়কারবার চলছে। যেমন যেসব গরিব ঋণখাতক সুদ পরিশোধ করতে পারে না তাদের মস্তান দিয়ে ধরে এনে সমিতি ভবনের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হয়। কক্ষটি সমিতির জেলখানা হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ পাওয়া গেল, একজন খাতক ঋণ কিংবা সুদের টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে খাবার দেওয়া হয় না বরং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। সমিতির সুদের হার অত্যন্ত চড়া, শতকরা ৪০ থেকে ৪২ ভাগ। সমিতি আসল টাকা চায় না, সুদের টাকা বুঝে পেতেই তারা উৎসাহী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন গেলাম মনোহরদীতে। মনোহরদী থেকে হাতিরদিয়া বাজার। যা শুনেছিলাম তা-ই। বিরাট সমিতি ভবন। নকশা-করা, রংচঙে। প্রহরা অত্যন্ত কড়া। সদর দরজায় দুজন বন্দুকধারী। চারপাশে গিজগিজ করছে সশস্ত্র লোকজন। জেলখানার ছবি তুলব কী, এই ব্যূহ ভেদ করে সমিতিতে ঢোকাই মুশকিল। ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে পারে, মারপিটও করতে পারে।

জেলখানার ছবি চাই। জানতে চাই আসল ব্যাপারটি কী? অতএব সমিতি ভবনের ভেতরে ঢুকতে হবে। গ্রামে গিয়েই রটিয়ে দিলাম, সমিতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর রিপোর্ট করতে এসেছি আমরা। এত বড় প্রতিষ্ঠান, কুমিল্লার দিদার সমিতির চেয়ে বেশি টাকা আমানত, লাখ লাখ টাকা লেনদেন করে, কিন্তু তার প্রচার নেই। লোকে কেউ এ সমিতির নাম জানে না। অবাক হবার ভান করে সমিতির কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোনো জাতীয় পুরস্কার পায়নি এ সমিতি? টেলিভিশনের লোকজন আসেনি এখানে?

সহানুভূতির কথা শুনে সবাই খুশি। একেই সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গোলমেলে রিপোর্ট বেরুচ্ছিল সে-সময়, কর্মকর্তারা চাপের মুখে ছিলেন। স্থানীয় সর্বহারা পার্টি তাঁদের বিপক্ষে। তাঁরা ভাবলেন এই সময়ে 'সংবাদ'-এর মতো একটা জাতীয় দৈনিকে সমিতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে রিপোর্ট ছাপা হলে তো ভালোই হয়। কর্মকর্তারা খুব সহজভাবেই আমাদের দুজনকে ভেতরে নিলেন। আদর-আপ্যায়ন হলো, তাঁরা নির্দ্বিধায় খাতাপত্র ফাইল খুলে দেখালেন, ঘুরে ঘুরে দেখালেন সমিতি ভবনের ভেতরের ঘরগুলো।

আমার দরকার সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ যাকে বলা হয় জেলখানা। কিন্তু সেটা কই? মুখে জিজ্ঞেস করব সে সাহস হয় না। এত থাকতে ঐ বিশেষ কামরাটির খোঁজখবর করা কেন?

ঘুরছি। এ-ঘর থেকে ও-ঘর। বারান্দা থেকে বারান্দা। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলা। ঘুরে ঘুরে দেখি আর এটা-ওটা কথা। প্রশংসা আর প্রশংসা। খামাখা।

হঠাৎ রেগে গেলাম। এটা ভণিতার আরেক অংশ। নিজের সাথে নিজে কথা বলছি। বললাম, সব ব্যাটা হারামজাদা! মিথ্যুক!

কর্মকর্তা কাছে আসেন ছুটে। কাকে গালি দেন? হলো কী?

আমি বলি, সব তো দেখি ঠিকঠাক, অথচ বাইরে কত কী কথা! বলে হাতিরদিয়া সমিতিতে নাকি জেলখানা আছে! ব্যাটারা খামাখা শুধুশুধু অপবাদ দেয়। মনে হয় সহ্য করতে পারে না আপনাদের কাজকারবার!

জেলখানার কথা শুনে সচকিত হয়ে পড়েন কর্মকর্তা। পরিবর্তন লক্ষ করি তার চোখেমুখে। এদিকে-ওদিকে তাকান তিনি। ভয়-ভয় ভাব। চোখ এড়ায় না। আমি হঠাৎ করে বলে উঠি, চলেন তো দেখি কোন্ ঘরটাকে ওরা জেলখানা বলে। শুধুশুধু জেলখানা বললেই হলো! আসলে মনে হয় ওটা সমিতির গেস্টহাউস! ব্যাটারা লোনের টাকা শোধ করবে না, আর ওদিকে আবার জেলখানার নামে অপপ্রচার চালাবে! চলেন দেখি, নিজের চোখে ঘরটা দেখি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওষুধে কাজ হয়। ঠিক জায়গায় নক্ করেছি। কর্মকর্তা ভিজে যান। তিনি নিয়ে আসেন সমিতির কথিত গেস্টহাউসে। আসলে, আগে থাকতেই আমাদের জানা ছিল সমিতির জেলখানাটিকে কর্মকর্তারা জেলখানা বলেন না, বলেন গেস্টহাউস।

সমিতি ভবনের তিনতলায় উঠি। সেখানে দেখি বিশেষ ধরনের সরু একটি সিঁড়ি যেটা তিনতলার একটি কামরা থেকে সোজা নেমে গিয়েছে গ্রাউন্ডফ্লোরে। সিঁড়ি ভেঙে নামতেই চোখের সামনে একটা ঘর। কামরা নম্বর ১১। কলাপসিবল গেট, কাঠের কপাট। তালা। তালা খুলে দেওয়া হলো। সোজা ঢুকে পড়ি ঘরে। ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দিই। ঘরটি অপরিসর, অন্ধকার, নোংরা দুর্গন্ধ। দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দেখি মেঝেতে পাতা একখানা মাত্র শূন্য চৌকি। চৌকির উপর শুয়ে আছে এক যুবক। ঋণগ্রহীতা। টাকা দিতে পারেনি বলে ধরে এনে আটক রাখা হয়েছে। যুবকটি তন্দ্রায় ছিল, হঠাৎ জেগে ওঠে, বাইরের এক লোককে দেখে ঘাবড়ে যায়। একের পর এক প্রশ্ন। জবাব দিয়ে যায় সে একটার পর একটা। কর্মকর্তারা বাইরে দাঁড়ানো। ভেতরে আমি ঐ যুবকটির জবানবন্দী রেকর্ড করছি। দেরি করা যায় না, বেরিয়ে এলাম দ্রুত।

ঘরের বাইরে এলাম। বারান্দা। সামনে কলাপসিবল গেট। দারোয়ান তৎক্ষণাৎ গেট বন্ধ করল। মুহূর্তে ব্যাগ থেকে বের করি ফ্লাশআঁটা ক্যামেরা। ক্যামেরাটা এতক্ষণ ছিল মাঝারি সাইজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে। ওরা বুঝতে পারেনি।

ফ্লাশ জ্বলে সটাসট। কর্মকর্তারা অপ্রস্তুত। আমার সামনে চরম সময়। পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে, নইলে এখান থেকে নিরাপদে বের হওয়া মুশকিল। আমি এইসময় ভীষণরকম মুড নিই। চোখেমুখে রাগ-রাগ ভাব। গোঁফ পাকাতে থাকি আর অস্পষ্ট করে গালাগালি করি কারও উদ্দেশে। আসলে আমি কর্মকর্তাদের কথা বলার সুযোগ দিতে চাই না ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে। তাদের চিন্তাভাবনা অন্যখাতে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। এটা করতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে পানি খেতে চাই। পানির বদলে সেভেনআপ আনতে ছোটে একজন। ব্যাগে প্যাকেট থাকা সত্ত্বেও একটা সিগারেট খুঁজি। সিগারেট আনতে যায় কেউ। হঠাৎ করে পেট টিপে ধরে বসে পড়ি বারান্দায়। চোখেমুখে যন্ত্রণা। কী হলো, কী হলো? সবাই উদ্বিগ্ন, ছোটাছুটি। আমি বলি দারুণ পেট ব্যথা করছে। গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা। অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট পাওয়া যাবে কি ধারেকাছে? দোকান কতদূর? এক্ষুনি একটা ট্যাবলেট দরকার। চলুন তো দেখি একআধটা অ্যান্টাসিড পাওয়া যায় কি না। উফ, ব্যথায় মরে যাচ্ছি। বলতে বলতে ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকাই। তিনতলায় ওঠার জন্যে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি। এই সিঁড়িই হলো জেলখানা থেকে বাইরে বেরুনোর একমাত্র পথ।

কথা বলবার সুযোগ দিচ্ছি না কাউকে। ওষুধের খোঁজে বাইরে বেরুনো দরকার, দ্রুত হাঁটছি তাই। আমার আসল উদ্দেশ্য এই গুপ্ত জায়গাটা থেকে বেরুনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকর্তা পেছনে পেছনে আসেন ছুটতে ছুটতে। এই ছবি তুললেন যে? কী করবেন ছবি? এটা কি ছাপাবেন নাকি?

না, এখন নরম করে কথা বলা যাবে না। ধমক লাগাই উল্টো। কী বলেন আবোল-তাবোল কথা! ছবি তুললেই ছাপাতে হবে নাকি? আর ছাপালেই-বা ক্ষতি কী? এটাকে কি সত্যি সত্যি জেলখানা বলেন নাকি আপনারা? ওটা একটা গেস্টহাউস, কিন্তু বাইরে অপপ্রচার চালানো হয় জেলখানা বলে। এই গেস্টহাউসের ছবিটা ছাপা হলে লোকের ভুল ধারণা ভাঙবে না কি? আসলে ১১ নম্বর কামরাটা যে জেলখানা নয়, একটা গেস্টহাউস, লোকে সেটা বুঝুক! আর কিছু বলতে পারেন না কর্মকর্তা। কী বলবেন?

বাইরে আসি। সেভেনআপ খাই। ওষুধ, সিগারেট। দুপুরে খাবারের দাওয়াত দেন সমিতির লোকজন। প্রত্যাখ্যান করি বিনয়ের সাথে। বলি, আমাদের দাওয়াত আছে উপজেলার ইউএনও-র বাসায়। সেখানে খাওয়া তৈরি, না গেলে ভদ্রলোক মাইন্ড করবেন। আসলে মিছা কথা।

বিদায় নিয়ে সমিতি ভবন থেকে বাইরে বেরোই। প্রথমে রিকশা, তারপর মেইন রোডে এসে বাস ধরি। মনোহরদীর বাস নয়, ঢাকার। আমরা যাব ঘোড়াশালে। এই মুহূর্তে হাতিরদিয়া ত্যাগ করা দরকার।

সংবাদ-এর প্রথম পাতায় ৪-কলাম বক্স আইটেম হিসেবে হাতিরদিয়া সমিতির জেলখানার ওপর সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় দুদিন পর। প্রতিবেদনটি সাড়া জাগায় বিভিন্ন মহলে। সমবায় মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি গঠন করে হাতিরদিয়া পাঠান। সমবায় বিভাগ আমাকে জানান, প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরপরই জেলখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে আর কোনো ঋণগ্রহীতাকে এখানে আটক রাখা হবে না। হবে না কোনো নির্যাতন।

ঢাকায় ছুটে আসেন সমিতির কর্মকর্তা। দেখা হয়। এ কী করলেন আপনি? আমি বলি, এ ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না ভাই। এটাই তো আমার পেশা। সত্য উদ্ঘাটন করতে চাই আমি। তা-ই করেছি।

(খবরের কাগজ, ২৮ জুন '৯০)

করতকান্দি গ্রামে–১

গ্রামের নাম করতকান্দি, লোকে সহজ উচ্চারণ করে কত্‌কান্দি এবং উচ্চারণধ্বনিতে করতকান্দির চেয়ে কত্‌কান্দি বেশ মিষ্টি শোনায়। তবে নাম কিংবা ধ্বনি : তার চেয়েও ভালো লাগল এখানকার মানুষজন। গত ৫০ বছরে এই গ্রামে কোনো চুরি হয়নি, ঘটেনি সন্ত্রাসের কোনো ঘটনা। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি গলাগলি বাস করছে যুগ যুগ ধরে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে অটুট। ক্ষুধা-দারিদ্র্য, রোগ-শোক, কুশিক্ষা-কুসংস্কার এখানে আছে দেশের আর দশটা এলাকার মতো, রয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা, রয়েছে মজুরির অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্নহার, মহাজন ও সুদপ্রথা, সম্পদ সম্প্রসারণ; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বীজ পোঁতা নেই কোনো কৃষক-মজুরের উঠোনে। যে যার ধর্মকর্ম করছে, একজনের বিপদে-আপদে সাধ্যমতো এগিয়ে আসছে আরেকজন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এইরকম বড় কথা তারা যেমন জানে না, তেমনি আবার জানে না জাতি-ধর্মের নামে রক্তের হোলিখেলা। শুনলাম বাবরি মসজিদ কিংবা তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ডের কোনো খবরই এসে পৌঁছায়নি পাবনার প্রত্যন্ত এই গ্রামটিতে।

করতকান্দি গ্রামে 'নীলাঞ্জন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' নামে একটি সংগঠন রয়েছে। তারা দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করেছে নানান লোকজ অনুষ্ঠানের। তিনদিন ধরে হবে ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, হাডুডু খেলা, সং সাজা প্রতিযোগিতা, কানামাছি খেলা, থাকবে মঞ্চনাটক, মুক্তনাটক, হাটুরে কবিতাপাঠ, পুঁথিপাঠ, ভাসানযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা; এ ছাড়াও উচ্চাঙ্গ সংগীত, লালনগীতি, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত, পল্লীগীতি, ধুয়াগান, পদাবলী কীর্তন, রামপ্রসাদী, ফকিরান্তি গান এসবেরও আয়োজন রয়েছে। নীলাঞ্জন গোষ্ঠীর একটি লিফলেট হাতে পেয়েই সিদ্ধান্ত নিলাম করতকান্দি গ্রামে যাব। অনুষ্ঠান দেখা ছাড়াও গ্রামটির ওপর হয়তো একটা সিরিজ প্রতিবেদন করা যাবে। বাংলা একাডেমী কিংবা শিল্পকলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ব্যয় করলেও এতগুলো লোকজ অনুষ্ঠানের আয়োজন তারা আজ পর্যন্ত দেশের কোথাও করতে পারেনি। অথচ প্রত্যন্ত গ্রামে একটি ছোট্ট সংগঠন স্থানীয়ভাবে ধান-চাল মুষ্টিভিক্ষা করে এত ব্যাপক অনুষ্ঠান করছে কীভাবে? কারা আছে ঐ গোষ্ঠীর পেছনে? কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের নেপথ্য কাজ? এনজিও-তৎপরতা? ব্যাপারটা সরজমিনে দেখে আসা দরকার। আর বেশ কিছুদিন হলো গ্রামে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

নীলাঞ্জনের অনুষ্ঠান হবে নয়, দশ ও এগারো মার্চ। কিন্তু আমি যেহেতু গ্রামটির আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর প্রতিবেদন তৈরি করব, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন, সেজন্যে সাতই মার্চ সকালে সড়কপথে করতকান্দি এসে পৌঁছুলাম। পাবনা জেলার মধ্যে ভাঙ্গুড়া বলে একটা উপজেলা আছে, সেখানে বড়ালব্রিজ নামে আছে একটি রেলস্টেশন। ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ রেলপথের ওপর এই স্টেশনটিতে ঈশ্বরদী হয়ে আসা যায়, কিংবা উল্লাপাড়া থেকে। শুনেছিলাম বড়ালব্রিজ স্টেশন থেকে নয়-দশ মাইল দূরের করতকান্দি গ্রামে নৌপথে যাওয়াটাই সুবিধে। বড়াল নদী ধরে শ্যালোর নৌকায় যেতে হবে হান্ডিয়াল গ্রামে, সেখান থেকে হাঁটতে হবে মাইল তিনেক। কিন্তু বড়ালব্রিজ স্টেশনে নেমে দেখি নৌকা-টৌকা এখন কিছুই চলছে না, নদী শুকিয়ে প্রায় মরা। নদীর মূলধারা দুতিন ফুট, যেন একটা পগার। 'কোন্ আহাম্মকে বলল আপনাকে যে নদীপথে এখন যাওয়া যায়? বর্ষার আগে পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।' বলল বড়ালব্রিজ স্টেশনের ধারের দোকানদাররা। নয়-দশ মাইল পথ এই বয়সে হাঁটা সম্ভব? তার ওপর সঙ্গে আছে চার-চারটা ব্যাগ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙ্গুড়ার ইউএনও খলিলুর রহমানের সাথে দেখা হলো। পনেরো-ষোলো বছর আগে থেকে পরিচয়। তিনি বললেন, যাবেনই যখন, সড়কপথে চলে যান। গুমানি নদীর ঘাট পেরিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে খানমরিচ ইউনিয়ন হয়ে করতকান্দি পর্যন্ত। বড়ালব্রিজ থেকে দূরত্ব হবে প্রায় নয় মাইল। মাটিকাটা রাস্তা, খুব একেবারে খারাপ নয়। বৃষ্টি হলে মাটির গুণে রাস্তা খুব পিচ্ছিল হয়ে যায়, তখন পায়ে চলাও মুশকিল। কিন্তু এখন শুকনো মৌসুম। মোটরসাইকেল চলবে।

একটা মোটরসাইকেলের ব্যবস্থা হলো। একজন বাহকের কাঁধে ব্যাগপত্র চাপিয়ে রওনা দিলাম করতকান্দির উদ্দেশে। কিন্তু পথে নেমে দেখলাম খুবই খারাপ অবস্থা। এর চেয়ে বুঝি চষাজমির ওপর দিয়ে যাওয়া ভালো ছিল। মাটির রাস্তা, একেই উঁচুনিচু, ডানে-বাঁয়ে অসংখ্য বাঁক, খাল-খন্দক। রাস্তাটি স্থানে স্থানে ভেঙে গিয়েছে বিচিত্রভাবে। গত মৌসুমে একটা এনজিও-র অর্থসাহায্যে নতুন মাটি কাটা হয়েছিল, কিন্তু বানের তোড়ে দুদিকের মাটি ধসে গেছে। আসলে সড়কটি গেছে চলনবিল এলাকার মধ্য দিয়ে। বর্ষায় বিল ভরে ওঠে, পানির তোড়ে ভেঙে যায় রাস্তা। এই বিশাল বিলের মধ্য দিয়ে রাস্তা করতে হলে তার জন্যে দিতে হবে ইট আর লোহার নেট। তা করা হয় না বলেই প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ গম কিংবা টাকার অপচয় হয়।

পথের দুধারে, যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। আট-দশ ইঞ্চি লম্বা হয়েছে ধানগাছগুলো, সকালের রোদ কচি সবুজ পাতায় পড়ে অপূর্ব দেখাচ্ছে। কখনো মোটরসাইকেলের উপর, আবার কখনো হাঁটছি, কিন্তু মনে হচ্ছে সবুজ সমান একটি বিশাল কার্পেটের উপর দিয়ে চলেছি আমরা। চোখে পড়ে ধান গাছের আগার দিকে সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল। অনেক অনেক ক্ষেতের পোকামাকড় আটকা পড়ে এইসব চিকন জালে, কৃষকদের উপকার হয়।

খানমরিচ ইউনিয়নের কাছাকাছি আসতেই রাস্তার দুধারে বোরোর ক্ষেতের পাশাপাশি চোখে পড়ল কিছু গমের ক্ষেত। গম পাকার সময় বৃষ্টি হয়েছে, ফলে পচে কালো হয়ে গেছে গম গাছ। খণ্ড খণ্ড গমক্ষেত দেখে মনে হয় কালো-পোড়া-ছেঁড়া রুটি। কৃষক মজুররা নষ্ট গম গাছ টেনে টেনে তুলছে আক্রোশের মতো করে, এগুলো হবে এখন জ্বালানি। শেষ-ফাল্গুনের বৃষ্টি বোরোর জন্যে খুব উপকারে এসেছে বটে, কিন্তু সর্বনাশ করেছে গমের। পুরো অর্থ-শ্রম বরবাদ।

নামলাম করতকান্দি হাইস্কুল মাঠে। গ্রামের যুবকরা কাজ করছে। কেউ মাটি কেটে এনে উঁচু মঞ্চ তৈরি করছে, কেউ বাঁশ কাটছে। এদিকে-ওদিকে মাপজোক করছে কেউ-কেউ। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। ওরা অনেকেই আমার নাম জানত, রাজশাহী থেকে মলয় ভৌমিক আমার আসার ব্যাপারে মেসেজ পাঠিয়েছে সেটাও পেয়েছে, তবে অনুষ্ঠানের এত আগেই চলে আসব ধারণা করেনি। পরিচয় জানাতেই ওরা ছুটে এলো, এটা-ওটা কথাবার্তা, তারপর একটা খাল পেরিয়ে গেলাম আমরা নওগাঁ বাজারে। নওগাঁ বলতে জেলাশহর নওগাঁর সাথে এতদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় ছিল, কিন্তু এখানেও একটি নওগাঁ আছে জানা ছিল না। এই নওগাঁ সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার মধ্যে পড়েছে। এটি একটি ইউনিয়ন, বড় বাজার। বাজারে এসে শুনলাম বগুড়া শহর থেকে একটি বাস নাকি তাড়াশ হয়ে আসে এই নওগাঁ বাজার পর্যন্ত। ছেলেরা বলল, বড়ালব্রিজ হয়ে না এসে এই পথে এলে আপনার কষ্ট কম হতো। অবশ্য এই পথেও ঝুঁকি ছিল। সামান্য বৃষ্টি হলেই তাড়াশের পর থেকে নওগাঁ বাজার পর্যন্ত বাস-চলাচল বন্ধ থাকে। কাঁচা রাস্তা।

থাকবার জায়গা হলো করতকান্দির পশ্চিম অংশে। এটি হিন্দু বসতি। নির্মলকুমার সরকার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্টে পাস করে এসে এখন বেকার। তার ঘরে উঠলাম। বেশ নিরিবিলি আশ্রয়।

নির্মলের বৃদ্ধা মায়ের হাতের রান্না অপূর্ব। আলুভাজি, বাঁধাকপি ভাজি, হাঁসের ডিমের তরকারি আর ডাল। খেয়েই বিছানা। নির্মল নিজের হাতে খাটিয়ে দিল মলিন মশারি। অসম্ভব মশা এখানে, মশারি ছাড়া দিনের বেলাতেও শোয়া অসম্ভব। দেখি, সত্যি তা-ই। মশার গুঞ্জন শুরু হলো একটু পরেই। মশা ঢুকে পড়েছে বেশকটা।

দিনদুপুরে মশারির ভেতর বসে মশা মারতে লাগলাম। হাসছি। দিনের বেলা এভাবে মশারি খাটিয়ে শোবার অভিজ্ঞতা নেই। অজান্তেই হাসির শব্দ হলো একটুখানি। নির্মল জিজ্ঞেস করল, হাসেন কেন, মোনাজাত ভাই?

দুহাতে মরা মশার রক্ত দেখতে দেখতে বললাম, না, এমনি।

(খবরের কাগজ, ২৯ মার্চ '৯০)

AMARBOI.COM

করতকান্দি গ্রামে—২

নীলাঞ্জন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানমালা শুরু হলো নয়ই মার্চ শুক্রবার সকাল থেকে। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবার কথা ছিল হাসান আজিজুল হক সাহেবের। তিনি অসুস্থতার জন্যে আসতে পারেননি। আটই মার্চ সন্ধ্যায় যখন খবর পাওয়া গেল হাসান সাহেব আসতে পারবেন না, স্থানীয় ছেলেরা দারুণ হতাশ হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু তপন দাশ আর স্বদেশবন্ধু সরকার টললেন না, তাঁরা দুজনে ঘোষণা দিলেন 'আমরা নিজেরাই নিজেদের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করব।'

সকালবেলা নির্মল সরকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নওগাঁ বাজারে গেলাম নাস্তা সারতে। ধারণা ছিল সকাল দশ-এগারোটার আগে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়তো হবে না। শহরের অধিকাংশ অনুষ্ঠানই দেখি নির্দিষ্ট সময়ের বেশ দেরিতে শুরু হয়, এ তো আবার গ্রাম! তার ওপর প্রধান অতিথিই আসতে পারেননি! কিন্তু নাস্তা সেরে করতকান্দি স্কুলের মাঠে আসতেই ভুল ভাঙল, দেখি আয়োজকরা সময়মতোই উদ্বোধনপর্ব সেরে ফেলেছেন নিজেরাই। উদ্বোধনের পর লাঠিখেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, রক্ত টগবগ করা ধ্বনিতে ঢোল-কাঁসা বাজছে। বৃত্তের চারিদিকে অসংখ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শক : ছেলে যুবক বুড়ো। ঢোলের বাজনা শুনে গ্রামের এদিক-ওদিক থেকে পিঁপড়ের মতো ছুটে আসছে মানুষজন, আসছে মেয়েরাও। সুশৃঙ্খলভাবে লাঠিখেলার বৃত্তের চারিদিকে বসেছে সবাই। পরিবেশটা ভালো লাগল, ভালো লাগল অনেকদিন পরে লাঠিখেলা দেখতে। এইরকম লাঠিখেলা বছর চারেক আগে দেখেছিলাম গাইবান্ধার কামারজানির চরে। বন্যার খবর-সংগ্রহের জন্যে ঐ এলাকায় গিয়েছিলাম, দেখি বাঁধের উপর লাঠিখেলা হচ্ছে। লাঠিখেলা দেখিয়ে ধান, চাল কিংবা নগদ টাকাপয়সা সংগ্রহ করছিল গ্রামের কয়েকজন যুবক বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে। জানি না কেন, পাবনার প্রত্যন্ত গ্রাম করতকান্দিতে, স্কুলমাঠের বিরাট ভিড়ে দাঁড়িয়ে কামারজানির সেই ছোট্ট দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সত্যি বলতে কি, করতকান্দিতে আসার আগে পর্যন্ত আমার মনে একটা নিচু ধারণা কাজ করছিল যে, নীলাঞ্জন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর লিফলেটে যেসব লোকজ অনুষ্ঠানের কথা ছাপার অক্ষরে লেখা হয়েছে তা হয়তো ছেলেরা শেষ পর্যন্ত পরিবেশন করতে পারবে না। তিনদিনের অনুষ্ঠানে যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, ভাসানযাত্রা, লাঠিখেলা, ঘোড়দৌড়, হাডুডু খেলা, কানামাছি খেলা, পুঁথিপাঠ, রামমঙ্গল, ধুয়াগান, কীর্তন, চড়ক কবিতা, হাটুরে কবিতা, কবিতাভিনয়, ফকিরান্তি গান, বাউলগান, রবীন্দ্র-নজরুল-আধুনিক-লালনগীতি এইসব ছাড়াও মঞ্চনাটক মুক্তনাটক এইসব কি আদৌ আয়োজন করা সম্ভব শহর থেকে বহুদূরের একটি গ্রামে? নীলাঞ্জনের মতো গ্রামপর্যায়ের একটি সংগঠন কি এতই সুসংগঠিত ও পারদর্শী? কিন্তু না, আমার ধারণা পাল্টিয়ে দিল সংগঠনের ছেলেরা। কোনোরকম গোলমাল হলো না, বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল না, একে একে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হলো প্রতিটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান উপভোগ করল হাজারো দর্শক। বিশেষ করে একটা ব্যাপার ভালো লাগল যে, অশোভন কুরুচিপূর্ণ নাচ ছাড়াও তিনদিনে তিনটি যাত্রার পালা হতে পারে এবং গ্রামের নারীপুরুষ রাত জেগে তা দেখেও। না, পালা চলবার সময় একটা শিস পর্যন্ত দেয়নি কেউ। অথচ দর্শক হিসেবে আশপাশের পাঁচ-সাতটি গ্রামের যুবক ছিল অনেক।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে ছিল আলোচনা। সভা-সমিতিতে আলোচনা আর বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে আছে বলেই বোধকরি ব্যক্তিগতভাবে এই আলোচনাপর্বটি আমার ভালো লাগল না। তা ছাড়া প্রতিটি অনুষ্ঠান, যেটা যতটুকু দেখলাম, খুব ভালো লাগল। অপসংস্কৃতি শহরে গ্রামে যেভাবে ঢুকেছে সেখানে এই ধরনের লোকজ অনুষ্ঠানের সমাহার : শহরে বসে কেউ গল্প করলেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। করতকান্দি গ্রামে না এলে সত্যিই ভালো কিছু হারাতাম। এখানে এসে আমার বোধ হলো, শহরে বসে 'অপসংস্কৃতিতে দেশ ডুবে গেল' বলে হতাশা উচ্চারণ না করে যদি সাংগঠনিক তৎপরতা গ্রামে নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা এখনও হতে পারে, হতে পারে রুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান, সেখানে বেঁধে রাখা যায় হাজারো দর্শক। শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠান কিংবা রেডিও টেলিভিশনের মতো প্রচার-মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিদের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আবেদন, করতকান্দি ও আশপাশের গ্রামগুলোতে এখনও যে লোকজ অনুষ্ঠানগুলোর চর্চা রয়েছে তা আপনারা সংগ্রহ করে রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারেন, বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্যে তা পরিবেশন করতে পারেন। অনুষ্ঠানগুলো সবার দেখা দরকার শুধু সুস্থ চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়, বরং সেইসঙ্গে মানুষ দেখবে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। অপসংস্কৃতির যে জোয়ার চলছে শহরে গ্রামে, তার রোধ এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়তো সম্ভব নয়, সেটা এক বিরাট প্রক্রিয়ার ব্যাপার, কিন্তু এটা ঠিক যে নীলাঞ্জন গোষ্ঠী আয়োজিত এইসব লোকজ অনুষ্ঠান নিশ্চিতভাবে দর্শকদের চিত্তহরণ করবে, হতাশার মেঘ কিছুটা হয়তো সরবে।

নীলাঞ্জন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলা দরকার। করতকান্দি গ্রামে এই প্রতিষ্ঠানটি জন্ম নেয় ১৯৭৯ সালের মধ্য-জানুয়ারিতে। প্রতিবছর অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে তারা। তবে তিনদিনব্যাপী বিরাট ব্যাপক অনুষ্ঠানমালা এই প্রথম। বিগত বছরগুলোতে বহু নাটক, মুক্তনাটক আর নাটক বিষয়ে আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন করেছে তারা। করতকান্দি গ্রাম ছাড়াও নওগাঁ বাজার, চাটমোহর, মিসমিথুইর, সুলতানপুর এবং আশপাশের গ্রাম-জনপদে মুক্তনাটক করেছে। বিভিন্ন সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করছে তারা। অনুষ্ঠান করেছে রাজশাহী ও ঢাকায়। ১৯৮৫ সালে করতকান্দি গ্রামে তারা একটি স্কুল চালু করে, যার নাম ছিল কৃষ্ণচূড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল। স্কুলটি মাস তিনেক চালু থাকার পর বন্ধ হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

১০ জন সদস্য নিয়ে নীলাঞ্জন গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন অশোক সরকার, মিলন দাস, উৎপল সরকার, স্বদেশবন্ধু সরকার, তপন দাশ। সংগঠনের বর্তমান আহ্বায়ক অশোক সরকার, যুগ্ম আহ্বায়ক কাদের সিদ্দিকী ও রঞ্জন সরকার। এখন সদস্য-সদস্যা সংখ্যা ৬৫ জন, তাদের মধ্যে ৪৫ জন সংগঠনে তৎপর। সদস্যদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হলো মেয়ে। মেয়েদের নিয়ে নাটকের আলাদা একটি গ্রুপ রয়েছে এই সংগঠনে। ইতোমধ্যেই দুটি নাটক পরিবেশন করেছে তারা নিজেরাই।

এগারোই মার্চ। প্রচণ্ড রোদ। ঈশান কোণে কালো মেঘ। ভাঙ্গুড়া কলেজের শিক্ষক আবদুল জলিলের মোটরসাইকেলের পেছনে চেপে আবার বড়ালব্রিজের উদ্দেশে রওনা হলাম। ভয় হচ্ছিল বৃষ্টির, বৃষ্টি হলে দীর্ঘ ৯ মাইল রাস্তায় মোটরসাইকেল চলবে না, পিচ্ছিল পথে পায়ে হাঁটাও হবে মুশকিল। জলিলকে বললাম, তাড়াতাড়ি চালান, বৃষ্টি নামবার আগেই পৌঁছুতে হবে বড়ালব্রিজ এলাকায়। জলিল মেঘ দেখে বলল, না, চিন্তা করবেন না, বৃষ্টি আসবে না এই মেঘে।

রোদ আর মেঘ। ভীষণ ভাঙা রাস্তা। কখনো মোটরসাইকেলে, আবার কখনো হাঁটছি। পেছনে পড়ে থাকে বিভিন্ন বৃক্ষঘেরা করতকান্দি গ্রামখানা।

(খবরের কাগজ, ১২ এপ্রিল '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলা

করতকান্দি থেকে ভাঙ্গুড়া, তারপর ঈশ্বরদী, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ঘুরে জয়পুরহাটে এসে পৌঁছুলাম। কালাই নামে জয়পুরহাটে একটি উপজেলা আছে, যাব সেখানে। খুব একটা দূরে নয় কালাই, জয়পুরহাট শহর থেকে মাইল দশেক হবে।

কালাইতে উঠলাম এক আত্মীয়ের বাসায়, তিনি উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। একটানা বেশ কয়েকদিন ট্যুরের পর সেখানে খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রাম খুব ভালো হলো।

সন্ধ্যার পরপর, কী-একটা পত্রিকা নিয়ে কেবল বসেছি, মাথার ওপর ষাট পাওয়ারের বাল্ব লো-ভোল্টেজের কারণে কুপির মতো আলো দিচ্ছে, পত্রিকার কম্পিউটার কম্পোজের খুদে টাইপ অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, এ-সময় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেল। কালাই উপজেলা-চত্বরটি গ্রাস করল অন্ধকারের ভালুক। বাসায় তখন হেরিকেন জ্বালাবার আয়োজন, দেখলাম তৈরিই আছে চিমনি, আছে কেরোসিন ভরানো, শুধু একটি দিয়াশলাই খুঁজতে অন্ধকারে অন্ধের মতো এঘর-ওঘর করছেন গৃহকর্ত্রী আর কাজের দুটি মেয়ে। শুনলাম, ঠিক সন্ধ্যা লাগবার সাথে সাথে বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে এবং কয়েকদিন থেকে এটা একটা নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কখন বিদ্যুৎ আবার আসবে, ঠিক নেই। প্রথম প্রথম বিরক্ত হতেন উপজেলা-চত্বরের অধিবাসীরা, কিন্তু ক্রমশ ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার আগেই হেরিকেন কিংবা কুপি তৈরি হয়ে যায়।

বসবার ঘরে হেরিকেন জ্বালালো, উঠে এলাম বারান্দায়। দেখি আশপাশের বাসা-বাড়িগুলোতেও কেরোসিনের বাতি জ্বালানো হয়েছে, তার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জানালা-দরজা গলিয়ে। টিমটিমে আলো-বরাবর পাওয়া যায় মানুষের ছায়া ও কায়া।

এইসব দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি গ্রাম-বিদ্যুৎ সরবরাহে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কথা, হঠাৎ সামনের বাসা থেকে তীক্ষ্ন চিৎকার ভেসে আসে নারীকণ্ঠের। তারপর বাসনপত্র ভাঙার শব্দ, শিশুর কান্না, এ-বাসা ও-বাসা থেকে ছুটোছুটি, চাপা কথাবার্তা।

ব্যাপারটা কী? প্রথমে ভেবেছিলাম চোরটোর এসেছে বোধহয়, কিন্তু না। কিছুক্ষণ পরেই খবর এলো : ঐ বাসার ভদ্রমহিলাকে নাকি জিনে আছর করেছে। তিনি ঘরময় দাপাদাপি করছেন, জিনিসপত্র হাতের কাছে যা পাচ্ছেন আছাড় মেরে ভাঙছেন। সবচেয়ে বেশি আক্রোশ নাকি তাঁর পুরুষ মানুষের ওপর। পুরুষ দেখলেই ভীষণ খেপে যাচ্ছেন। খবর পেয়ে ছুটে গেলেন এ-বাসার আমার ভাবি, পাশের বাসার অন্যান্য কর্মকর্তার স্ত্রীগণ।

কাকে জিনে ধরল, কী কারণে ভদ্রমহিলা পাগলপ্রায় অবস্থা, আসলেই জিন না অন্য কোনো ব্যাপার আছে এর পেছনে তা এখানে আমি বলতে চাচ্ছি না, বলতে চাই শুধু কমলার কথা। কমলা, পুরো নাম কমেলা বেগম, বয়স এখন সাড়ে নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর। আমি যে-বাসায় উঠেছি, সেখানকার কাজের মেয়ে। ক্ষেতলাল উপজেলার জাইলাপাড়া গ্রামে বাড়ি। বাবার পেশা গ্রাম্য দালালি।

কমলা যে কোনো বাসার কাজের মেয়ে হতে পারে, এমনটি আমি কল্পনাও করিনি। কালাইতে এসে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাসিমুজ্জামান পান্নার বাসায় যখন ঢুকতে যাচ্ছিলাম, তখন প্রথমেই এই কিশোরীটির সাথে আমার দেখা হয়। দোতলা বাসার প্রবেশমুখে একটা টিউবওয়েল, তার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি যেন কার সাথে কথা বলছিল। ফর্সা পরিষ্কার গায়ের রং, হালকা-পাতলা চেহারা, ধোয়া এবং দামি একটা ফ্রক পরেছে। ভাবলাম আশপাশের কোনো বাসার কর্তা কর্মচারীর মেয়ে বুঝি!

ব্যাগপত্র নিয়ে আমি যখন দোতলায় উঠে এলাম, কিশোরীটিও সিঁড়ি লাফাতে লাফাতে এলো পিছুপিছু, ঢুকল একই বাসায়। আমাকে সহাস্য অভ্যর্থনা জানানোর পর ভাবি তাকে নির্দেশ দিলেন, 'কমলা, চায়ের পানি চাপাও তো।' রান্নাঘরে ছুটে চলে গেল মেয়েটি। আমি বললাম, 'মেয়েটিকে আমি মনে করেছিলাম আশপাশের বাসার কারও মেয়ে কিংবা আত্মীয়স্বজন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাদের কাজের মেয়ে।' ভাবি বললেন, 'হাঁ, নতুন পেয়েছি। এই কয়মাস হলো এসেছে।'

তখনও কিন্তু জানি না কমলা নামের সাড়ে নয় বছর বয়সের এই কিশোরীটি বিবাহিতা, ধর্ম এবং কাগুজে আইনগতভাবে একজন যুবকের স্ত্রী। পান্না কিংবা ভাবি, অথবা বাসার অন্য কেউ, কেউ বলেননি। ওর বিয়ে হবার খবরটা শুনলাম পরে, ঐ সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে যাবার পর, সামনের বাসার ভদ্রমহিলাকে জিনে ধরার পর।

AMARBOI.COM

কী করে ব্যাপারটা জানলাম, তা-ই শুনুন এবার।

জিনে ধরার খবর পেয়ে পান্নার বাসার ছোট বড় সবাই ঐ অন্ধকারের মধ্যেও ছুটে গেছে সামনের ফ্ল্যাটে। গেছে কাজের মেয়ে কমলাও। প্রায়-অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি একা বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছি আর ভাবছি নানান কথা। বিদ্যুতের কথা, জিনের ব্যাপারস্যাপার, আমার সফর, আগামীদিনের পরিকল্পনা, এইসব। হঠাৎ দৌড়ে বাসায় ফিরে এলো কমলা আর অপর একটি কাজের মেয়ে। কমলা হাঁপাচ্ছে, তার চোখেমুখে হেরিকেনের স্বল্প আলোয় যতটা দেখা যায়, ভয়ের চিহ্ন, আতঙ্ক। আঞ্চলিক ভাষায় সে জানালো তার গা নাকি কাঁটা দিচ্ছে, খুব ভয়-ভয় করছে। তার নাকি মনে হচ্ছে জিন তাকেও ধরবে। বলতে বলতে ড্রইংরুমের এক কোণে মেঝের উপর বসে পড়ল কমলা, রীতিমতো কাঁপতে থাকল। প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়েটি কিশোরীসুলভ দুষ্টুমি করছে। পরে বুঝলাম, না, সত্যি সত্যি জিনের ভয় পেয়েছে মেয়েটি। কাণ্ডকারখানা দেখে ওকে ধমক লাগালাম। বললাম, চুপ করে বসে থাক্। ওরকম করে কাঁপলে মারব এক থাপ্পড়। ধমক খেয়ে কমলা কাঁদোকাঁদো। এবার নিলাম অন্য কৌশল, মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার জন্যে বললাম, তোকে কেন জিনে ধরবে রে কমলা। ছোট মেয়েদের তো জিন ধরে না, ধরে বড়দের, যাদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবেছিলাম মিথ্যে সান্ত্বনায় কিছুটা শান্ত হবে হয়তো মেয়েটি। কিন্তু না, তার বদলে ও আরও ভয় পেল এবং আসল কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তখুনি। কমলা বলল, ভাই, আমারও তো বিয়া হচে ...

কথা শেষ হবার আগেই একবার ধমক খেল মেয়েটি। বললাম, ইয়ার্কি করিস! চুপ করে বসে থাক্! এ-সময়, দ্বিতীয় কাজের মেয়েটি জানালো, কমলা যা বলছে তা মিথ্যে নয়। আসলেই কমলা বিবাহিতা। বছর দেড়েক আগে বাবুল নামের ২০ বছর বয়স্ক এক যুবকের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়। বাবা-মা নাকি নিতান্তই খেয়ালের বশে বিয়ে দিয়েছে ওর। শুনে আমি অবাক, আরও অবাক হলাম জিন-ধরা বাসা থেকে ভাবি ফিরে আসবার পর তার মুখ থেকে কমলার বিয়ে-সম্পর্কিত বয়ানের কনফার্মেশন পেয়ে। পরবর্তীতে আরও জানা গেল, বিয়ে রেজিস্ট্রির সময় মেয়েটির বয়স দেখানো হয়েছে ১৮ বছর এবং এই অপকর্মটি করেছেন কাজী সাহেব। বিয়ের সময় মৌলভি সাহেব ছিলেন, এলাকার দুয়েকজন মোড়ল-মাতব্বর ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ বাধা দেননি বরং বিয়ে খেয়েছেন।

শহরের গণ্ডিতে যৌতুকবিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, বাল্যবিবাহ রোধের কথা বলা হচ্ছে, চলছে এইরকম আরও নানান আন্দোলনের কথা। কিন্তু গ্রামে এইসব চিৎকারধ্বনি আদৌ পৌঁছুচ্ছে না। কমলারা শিকার হচ্ছে বাল্যবিবাহের, শিকার হচ্ছে নানান সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতনের।

AMARBOI.COM

গত কয়েক বছরে বহুসংখ্যক বাল্যবিবাহের ঘটনা সচিত্র ফিচার অথবা সাধারণ প্রতিবেদন হিসেবে তুলে ধরেছি সংবাদ-এর পাতায়। এর মধ্যে, দেখা গেছে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে বাল্যবিবাহের সংখ্যা-হার বেশি। অথচ এই গ্রামটিতে শতবর্ষ আগে জন্ম নিয়েছিলেন নারী-জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া।

(খবরের কাগজ, ২৬ এপ্রিল '৯০)

গোলাম আজমের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে

একবার প্রফেসর গোলাম আজমের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে তাঁর পা ছুঁতে হয়েছিল। যাকে বলে একেবারে কদমবুচি। আজকের লেখায় সেই কাহিনী বলছি :

গোলাম আজম সাহেব তখন কেবলি এসেছেন বাংলাদেশে। এদেশের নাগরিকত্ব নেই, হঠাৎ করে কোথাও তাঁর যাবার কথা নয়, কথা নয় কোনো সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করবার। তাঁর গতিবিধির ওপর গোয়েন্দা বিভাগের কড়াকড়ি। তা সত্ত্বেও তিনি ঢাকা থেকে হঠাৎ চলে গেলেন দেশের উত্তর সীমান্তে, দিনাজপুর জেলায়। দিনাজপুরের দৈনিক উত্তরা লিড খবর করল কয়েক লাইনের, তাতে এটুকু শুধু বলা হলো যে, প্রফেসর গোলাম আজম গতকাল দিনাজপুর সফরে এসেছিলেন বলে জানা গেছে। দিনাজপুর সফরের পর তিনি অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন, তাঁর গতিবিধির সঠিক খবর পাওয়া যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রংপুরে সকাল ১০টার দিকে এই খবরটুকু পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদে প্রেসক্লাবের পাশে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনি পাশে দুজন লোক পান খেতে খেতে প্রফেসর সাহেবের সাথে দেখা করতে যাবার ব্যাপার নিয়ে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করছে। কান পেতে রাখলাম। তাদের কথা শুনে এটুকু অন্তত বোঝা গেল, আজ রংপুর শহরে কোনো-এক বাসায় তিনি অবস্থান করবেন এবং সেখানে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করবেন।

দিনাজপুর থেকে গোলাম আজম সাহেব তা হলে এখন রংপুরে? কোথায় উঠবেন তিনি? কোন্ বাসা? সমাবেশে বক্তৃতার কর্মসূচি কখন? তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলাম পাশের একটা পরিচিত ওষুধের দোকানে। দোকানের মালিক জামায়াতে ইসলামী করেন। গিয়ে দেখি, ঠিকই, তিনি দোকানে নেই। আমি তাঁর কর্মচারীর সাথে ভণিতা করলাম। ভাবখানা এইরকম যে, প্রফেসর সাহেবের আগমন এবং সমাবেশের ব্যাপারটা আগে থেকেই আমি জানি। কর্মচারীটিকে সরাসরি বললাম, উনি কি এত আগেই গোলাম আজম সাহেবের ওখানে চলে গেছেন? আমাকে তো সাথে নিয়ে যাবার কথা ছিল! কর্মচারীটি আমার হাওয়া-নির্ভর প্রশ্নে ভণিতা বুঝতে পারল না, জানালো, হাঁ, এইমাত্র তো উনি মিটিংয়ে চলে গেলেন। আপনার আসার কথা ছিল নাকি? কই আমাকে তো আপনার কথা কিছু বলেনি? আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, উনি চলে গিয়ে তো মুশকিল হলো! আমি এখন ওখানে যাই কী করে? বাসাটা তো চিনি না। আপনি আমাকে একটু নিয়ে যাবেন? কর্মচারীটি বলল, বাসাটা তো না-চেনার মতো জায়গা না। আমি বলে দিই, আপনি নিজেই সোজা চলে যান। এই বলে সে বাসার অবস্থানটি বুঝিয়ে দিল। এই বাসাতেই গোলাম আজম উঠবেন, জামায়াত-কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতা করবেন, দুপুরে খাবেন এবং বিকেলে ঢাকার পথে রওনা দেবেন।

মধ্য-শহর থেকে মাইলখানেকের কম বাসাটার দূরত্ব। রিকশা করে তক্ষুনি চলে এলাম শালবন পাড়ায়। যে-বাসাটার ঠিকানা আমাকে ওষুধের দোকানের কর্মচারীটি দিয়েছিল সেখানে পৌঁছে দেখি বাসার সামনে লোকজন তেমন নেই। প্রাচীরের গায়ে কয়েকটি সাইকেল হেলান দিয়ে রাখা, দরজার কাছে বসে একজন লোক লোটাভরা পানি নিয়ে হাতমুখ ধুচ্ছে। লোকজন কই? ঠিকানা ভুল করে এলাম? এই বাসা কি সেই বাসা? আমি এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি, লোকটি আমাকে প্রশ্ন করল, কাকে চান?

জবাব না দিয়ে দরজা গলিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। ওরে বাবা, এ কী কাণ্ড! প্রাচীরঘেরা বিরাট উঠোনে ঠাসা কয়েক শ মানুষ। টুপি আর টুপি। মাটিতে পোয়াল (খড়) বিছিয়ে বসে আছে তারা প্রায় চুপচাপ। আরও দূরে তাকিয়ে দেখি, বাড়ির পেছন দিকের একটা দরজা দিয়ে আরও বহু লোকজন গড়গড় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে আর নীরবে বসে পড়ছে। কয়েকজন ব্যাজধারী যুবক কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে।

আমাকে দরজায় উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এলো দুটি যুবক। আমার পরিচিত। কী চান? কাকে চান? সরাসরি বললাম, গোলাম আজম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই, তাঁকে কি একটু খবর দেওয়া যাবে? না-হয় আমিই যাই ভেতরে?

হাত প্রসারিত করে বাধা দিল ওরা। না না, ভেতরে যেতে পারবেন না। উনি এখন ব্যস্ত আছেন। অপর যুবকটি বলল, প্রফেসর সাহেব কেবলি এসে পৌঁছেছেন, এখনও নাস্তা করেননি, বিশ্রাম করছেন কেবল। আপনি পরে আসেন। আমি এটুকু অন্তত নিশ্চিত হলাম যে গোলাম আজম সাহেব ইতোমধ্যেই এখানে এসে গেছেন।

তাঁর সাথে দেখা করা চাই। কথা বলা দরকার। কড়া বাধানিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি কী করে ঢাকার বাইরে এলেন আর কী করেই-বা এহেন একটা সমাবেশে বক্তৃতা করতে যাচ্ছেন? তাঁর একটা ইন্টারভিউ করা কি আদৌ সম্ভব নয়? হলে তা স্কুপ হবে নিশ্চয়ই।

বাইরে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা ভাবছি। ইন্টারভিউ নিতে হলে আজই নিতে হবে এবং তা এক্ষুনি। সমাবেশে বক্তৃতার পরপরই রংপুর ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। ক্রমশ টেনশন ঘন হচ্ছে আমার।

জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার সাথে দেখা। বললাম তাঁকে মনের ইচ্ছে। তিনি বললেন, এখন কি প্রফেসর সাহেব ইন্টারভিউ দেবেন? মনে হয় না। 'সংবাদ'-এর লোক শুনলে রাজি হবার কথা নয়, তবু দেখি চেষ্টা করে একবার। এই বলে ভেতরে গেলেন, ফিরে এলেন খানিক পরেই। না, প্রফেসর সাহেব রাজি হননি। তিনি অসুস্থ, এখন কারও সাথে কথা বলতে পারবেন না।

বাসার কাছে একটা বটগাছ। গাছের নিচে বসে পড়লাম। দীর্ঘদিনে অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, ভীষণরকম কষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হইনি কখনো। কিন্তু এবার কি ব্যর্থ হব? ফিরে যাব? দেখি, আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

আবার এলাম বাড়ির সদর-দরজার কাছে। এবার আর নেতা নয়, ইসলামী ছাত্র শিবিরের একটা ছেলেকে হাত-ইশারায় ডাকলাম। ছেলেটি পরিচিত, দ্রুত কাছে এলো। আপনি এখানে? উনার আসার খবর জানেন তা হলে? আমি বললাম, তুমি কি সরাসরি যেতে পারবে প্রফেসর সাহেবের কাছে? গিয়ে বলবে আমি উনার এক বন্ধুর ছেলে, একটু শুধু সালাম করতে চাই। বাবার মুখে প্রফেসর সাহেবের নাম খুব শুনেছি কিন্তু সামনাসামনি দেখা কখনো হয়নি। তাঁকে শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখব আর একটা সালাম করব। এখানে বলা দরকার, প্রফেসর গোলাম আজম একসময় রংপুর কারমাইকেল কলেজে পড়াতেন, সেসময় আমার বাবা সাধারণ বিভাগে চাকরি করতেন ঐ কলেজে। না, বন্ধু নয়, তবে দুজনার মধ্যে সাধারণ পরিচয় ছিল। সেটাই কাজে লাগাতে চাইলাম এই মুহূর্তে।

ছেলেটি চলে গেল, কিন্তু ফিরে এলো না। কিছুক্ষণ পরেই দেখি গোলাম আজম সাহেব খুব দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছেন। চারপাশে ঘেরা জামায়াতের নেতাকর্মী। একটা চলমান বৃত্ত রচনা করেছে তারা এবং বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে প্রফেসর সাহেব ঋজু ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলছেন, কোথায়? কে আমার সাথে দেখা করতে চায়? কী দরকার? কই কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথিত বন্ধুর ছেলে, আমি, দ্রুত সামনে ছুটে গিয়ে প্রফেসর সাহেবের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। 'থাক থাক' বলে মাথায় হাত বুলালেন তিনি। তুমি কে? কার ছেলে? তোমার বাবার নাম কী? আমি অস্পষ্টকণ্ঠে বাবার নাম বললাম, স্বাভাবিকভাবেই তিনি চিনতে পারলেন না। কিন্তু আমার দরকার একটা সাক্ষাৎকার। 'সংবাদ'-এর পরিচয় দিয়েই আমি প্রশ্ন করা শুরু করে দিলাম। তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন, না না, আমি এখন কাউকে ইন্টারভিউ দেব না ... তার ওপর তুমি সংবাদের লোক ...

তা সত্ত্বেও আমি প্রশ্ন করে যাচ্ছি। 'না না' করা সত্ত্বেও তিনি কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, কোনোটা 'না না এ সম্পর্কে কিছু বলব না' বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে কথা হলো মিনিট তিনেক মাত্র। প্রশ্ন এবং উত্তর যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তখন দেখি প্রফেসর সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, বেষ্টিত অবস্থায় নেতাকর্মীরা বাড়ির ভেতর ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁকে। আমি সামনে এগুতে চাইলাম। মাথা গরম হয়ে গেছে উত্তেজনায়, পেছন থেকেও প্রশ্ন ছুড়ে মারছি। লক্ষ করলাম, একদল যুবক ধাক্কাতে ধাক্কাতে প্রধান ফটক গলিয়ে বাইরে বের করে দিল আমাকে। ঘাসের ওপর পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে।

তারপর সোজা টেলিফোনের সন্ধানে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোলাম আজমের ইন্টারভিউটি লেখা ও ঢাকায় পাঠানো শেষ হলো। পরদিন 'সংবাদ'-এর প্রথম পাতায় গুরুত্বের সাথে প্রতিবেদনটি ছাপলেন তৎকালীন বার্তা সম্পাদক সন্তোষদা, মানে শ্রীসন্তোষ গুপ্ত।

AMARBOI.COM

বাংলাদেশে আসবার পর পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আজম সাহেবের এটাই প্রথম সাক্ষাৎকার যা 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়েছিল। পরে প্রতিবেদনটির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা 'কোট' করে ছাপে। পুলিশের লোকজন পরদিন আমার বাসায় গিয়ে হাজির। কবে তিনি এলেন, কবে গেলেন, কী কী বললেন, এইসব তাদের বিস্তারিত জানাতে হবে। বললাম, আমি কি আপনাদের ইনফরমার নাকি? যান, অন্য কারও কাছে যান। পরে শুনলাম, পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা বিভাগ কেউ নাকি জানতেন না রংপুরে প্রফেসর সাহেবের আসা-যাওয়ার খবর। পত্রিকা পড়ে জানতে পারেন। স্থানীয় সাংবাদিক-বন্ধুরাও কেউ-কেউ খেপে যান। গোলাম আজমের খবরটা আমাদের জানাওনি কেন? একা একা এভাবে মেরে দিলে? আমি মনে-মনে বলি, একটা এক্সক্লুসিভ ঘটনা সবাইকে জানিয়ে দিলে আমার আর কী থাকে?

সাংবাদিকতা জীবনে ভালোমন্দ অনেক কিছু করতে হয়েছে। প্রতিবেদন তৈরির স্বার্থে অনেক সময় ছোট হতে হয়েছে, হতে হয়েছে নিচু। যেমন একটা ইন্টারভিউর কারণে প্রফেসর গোলাম আজমকে কদমবুচি করতে হয়েছে। কী আর করা, এ ছাড়া উপায় ছিল না।

(খবরের কাগজ, ১৯ জুলাই '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী

পথ চলতে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সাথে দেখা হয় তার ইয়ত্তা নেই! কত মুখ, কত কথা-কাহিনী! সময় হাতে থাকলে হয়তো আরও গভীরভাবে তাদের সম্পর্কে জানতে পারতাম, লিখতে পারতাম। না, হয় না। নোটবুকের পাতার আড়ালে হারিয়ে যায় পথে-দেখা মানুষের হরেক সুখদুঃখের কাহিনী।

আগেই শুনেছিলাম রাজশাহীতে 'সমতা পার্টি' নামে একটা নয়া রাজনৈতিক দল জন্ম নিয়েছে। অধ্যাপক মুহম্মদ সাইদুর রহমান তার সভাপতি। অনেকদিন আগে এক অনুষ্ঠানে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, তাঁর জীবন-সংগ্রামের টুকরো কাহিনী শুনেছিলাম এক বন্ধুর মুখে। অবসর নেওয়ার পর বৃদ্ধ সেই অধ্যাপক আবার নিজেই একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করলেন কী কারণে! কী তার উদ্দেশ্য? লোকে নানা কথা বলেন, বলেন বহু বছর ছাত্র পিটিয়ে এসে লোকটা নাকি এখন নিজেই একটা ইয়ে হয়ে গিয়েছেন।

গত মাসে বগুড়া থেকে রাজশাহী এসে শুনলাম অধ্যাপক সাইদুর রহমান শুধু সমতা পার্টি গঠন করেননি, ঘোষণা দিয়েছেন সামনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একজন প্রার্থী হবেন। ইতোমধ্যে প্রচারকাজও শুরু করে দিয়েছেন। প্রেসক্লাবে বসে তাঁর সম্পর্কে কথাবার্তা হচ্ছিল, তার কিছুক্ষণ বাদে দেখি হঠাৎ ভদ্রলোক সশরীরে হাজির। পরনে সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি, আরও সফেদ চুলদাড়ি, হাতে ঝোলানো কাপড়ের থলে, ৫৯ বছর বয়সের বৃদ্ধ চুপচাপ এসে বসলেন পাশের চেয়ারে। এক সাংবাদিক-বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি সেই সমতা পার্টির সভাপতি আর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী অধ্যাপক সাইদুর রহমান। হাত বাড়িয়ে হাত মেলালেন তিনি, জানলেন আমার পরিচয়, তারপর চমকে ওঠার মতো করে বললেন, আপনে সেই মোনাজাতউদ্দিন সাহেব? সংবাদের? আরে সাহেব আপনাকেই তো মনে-মনে খুঁজছি! বহুদিন থেকে আপনার লেখা পড়ি, আপনার সাথে দেখা করার স্বপ্ন বহুদিনের। আলহামদুলিল্লাহ, আজ আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল। কী সৌভাগ্য! এটা-ওটা প্রশংসা আরও, তারপর আসল কথাটি পাড়লেন, যার অর্থ হলো, নিজের প্রচার তিনি চান না, কিন্তু সমতা পার্টি সম্পর্কে দেশের মানুষকে জানানো নাকি খুবই দরকার। এ ব্যাপারে সংবাদ-এর মতো পত্রিকার 'বিরাট' ভূমিকা রয়েছে। বললেন, ইস, আপনার সাথে আরও আগে দেখা হওয়া দরকার ছিল। শুনেছি অনেকবার রাজশাহী এসেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার সাথে দেখা হয়নি ... এই বলে তিনি কাপড়ের থলে থেকে বের করলেন সমতা পার্টির ঘোষণাপত্র, লিফলেট, বিভিন্ন পত্রিকার শতভাঁজ মলিন কাটিংস। বাড়িয়ে দিলেন সামনে। দেখুন, এইসব একটু দেখুন।

কথা হলো দীর্ঘক্ষণ। কথায় কথায় তিনি জানালেন, নির্বাচন যদি ঠিকঠাক মতন হয় আর নিজের প্রচার-প্রচারণার সুবিধা তিনি পান তা হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারবে না, কমপক্ষে নাইনটি পারসেন্ট ভোট পেয়ে নাকি তিনি জয়ী হবেন। 'এরশাদ আমার কাছে ফ্যাক্টর নয়; হাসিনা, খালেদা যে-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াক পাত্তা পাবে না, দেশের লোক তাদের আউট করে দেবে, ভোট দেবে সবাই আমাকে।' বললেন তিনি সিরিয়াস কণ্ঠে। হঠাৎ তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আমার কথা শুনে মনে-মনে হাসছেন নাকি? কথা শুনতে শুনতে যদিওবা হাসি এসে গিয়েছিল, সামলে নিই, বলি, না না হাসব কেন? তিনি জোর দিয়ে বললেন, না, হাসার কিছু নেই, দেশের মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে তাদের মুক্তির জন্যেই সমতা পার্টি তৈরি হয়েছে, তখন তারা এই পার্টির পতাকাতলে সমবেত হবে এবং নিশ্চয়ই আমাকে ভোট দেবে।

: আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি জয়ী হবেন?

: একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত।

: এখন আপনার পার্টির সদস্যসংখ্যা কত?

: কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১০৫ জন সদস্য আছে, এ ছাড়াও সাধারণ সদস্য ২/৩ হাজার হবে। সদস্যসংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। তবে সদস্য বড় কথা নয়, আসলে বড় হলো সমর্থক। গোটা দেশে এর সংখ্যা বহু বহু ...

: পার্টির তহবিলের অবস্থা কেমন?

: এখনও 'নীল' তবে টাকাপয়সা কোনো সমস্যা হবে না, ভালো কাজে টাকা পয়সা কোনো ফ্যাক্টর হয় না ...

: আপনার দলীয় পতাকাটা কী-রকম?

: তিনরঙা পতাকা হবে, একজনকে ডিজাইন করতে দিয়েছি ... তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলে দেব ...

: আপনার এই ব্যাপারস্যাপারগুলো আপনার স্ত্রী কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যরা কীভাবে দেখছেন?

: তাদের খুবই উৎসাহ। বিশেষ করে আমার স্ত্রী নেপথ্য থেকে খুব ঠেলছেন, ছেলেমেয়েরা পার্টির জন্যে কাজ করছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কমলাকান্তপুর গ্রামে মুহম্মদ সাইদুর রহমানের বাড়ি, এখন থাকেন রাজশাহী শহরে। গ্রামে ৫০ বিঘার মতো আবাদি জমি রয়েছে, তা-ই দিয়ে বছরের খাওয়াটা চলে যায়। পেনশন পান প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তাঁর ছেলেমেয়ে ৭টি, এদের মধ্যে ১টি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বাদবাকি সবাই বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা স্কুল-কলেজে পড়ছে। বাড়িতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে এখন 'হবু ফার্স্টলেডি' এই সম্বোধনে ডাকেন। এতে নাকি খুশি হন ভদ্রমহিলা।

'৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন সাইদুর রহমান। চাকরি করেন শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে। এরই ফাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. বিএড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. [শিক্ষা] করেন। রংপুর ও পাবনা ক্যাডেট কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, কুমিল্লা কলেজ, পাঁচবিবির হাজী মুহসীন কলেজ, রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন, অবসর নেন '৮৮ সালে। এ-বছর ৩০ মে তিনি সমতা পার্টি গঠন ও রাজশাহীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটান। রাষ্ট্রপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছুদিন আগে। রাষ্ট্রপতি এরশাদ যখন নিজেকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করলেন, তার কদিন পর। সাইদুর রহমান বলেন, 'আমি জানি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না। অর্থ আর অস্ত্রের খেলা চলবে। কিন্তু যদি তা অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আমি স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হব। আপনারা দেখে নেবেন।'

সমতা পার্টি, অধ্যাপক সাইদুর রহমানের ভাষায় একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। 'সবার জন্য এক নীতি'—এই হলো পার্টির নীতি। একটি প্রচারপত্রে অধ্যাপক সাহেব আহ্বান জানিয়েছেন : 'যারা দেশ জাতি ও মানুষকে ভালোবাসেন এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে আগ্রহী, তারা সমতা পার্টিতে যোগ দিন।' তিনি বলেছেন, 'দেশের দরিদ্র নিপীড়িত বুভুক্ষু আপামর মানুষের হাহাকার নিবারণার্থে, নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবাত্মার আশ্রয়দানের নিশ্চয়তায় সমতা পার্টি আবির্ভূত হয়েছে।' ইত্যাদি।

পেনশনভোগীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও অধ্যাপক সাহেব 'আন্দোলন' করেন। পেনশনভোগী কল্যাণ পরিষদের তিনি আহ্বায়ক। রাজশাহী প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদের তিনি অন্যতম নেতা। তিনি আলাপকালে বারবার একটা কথাই বলছিলেন, আমাকে কেউ দমাতে পারবে না। শেষনিঃশ্বাস পড়বার আগ পর্যন্ত আমি মানুষের জন্য আন্দোলন করে যাব। নিঃশ্বাস শেষ হবে, আমার সংগ্রামও শেষ হবে।

লোকে ঠাট্টা-মশকরা করে অধ্যাপক সাহেবকে নিয়ে, আড়ালে-আবডালে। বলে, তাঁর মাথার 'ইয়ে' ঢিলা হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তাঁর সাথে কথা বলবার সময় আদৌ তা মনে হয় না। প্রতিটি কথা বলেন তিনি চিন্তাভাবনা করে, ব্যক্তিত্বের সাথে, সিরিয়াসলি। কথাবার্তায় এমন নরম আর মিষ্টভাষী যেন মনে হয় ৫৯ বছরের বৃদ্ধ নয়, একটি শিশুর সাথে কথা বলছি।

(খবরের কাগজ, ৯ আগস্ট '৯০)

শান্তাহার যাচ্ছি যখন—

বগুড়া থেকে একটা লোকাল ট্রেনে চাপলাম, যাব শান্তাহার হয়ে রাজশাহী। নির্দিষ্ট সময়ের দুঘণ্টা পর পুরাতন হাঁপানি রোগীর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে অতিকায় গিরগিটি প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালো।

কামরায় ঢোকা মুশকিল। মানুষ আর মানুষ। নানারকম মালবোঝাই বস্তা, জ্বালানি কাঠ, দুধের শূন্য বালতি, ডিমের ঝাঁকা, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি। দরজা দিয়ে কামরায় উঠবার উপায় নেই, অগত্যা জানালা গলিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম ব্যাগপত্র, উঠলাম একই পথে। ঠেলেঠুলে একটুখানি জায়গা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেখানে দেখি কাঠের বেঞ্চের পাটাতনে লেপটানো শিশুর বমি ও প্রস্রাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে কেউ কিনেছে পচা ইলিশ, বেঞ্চের নিচে থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তার ওপর এতগুলো মানুষের তপ্ত নিঃশ্বাস আর ঘামের কটু গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কী করি, কোথায় বসি, এতটা পথ যাব কী করে, এইসব ভাবছি, হঠাৎ হট্টগোল। যেন ডাকাত পড়েছে কিংবা আগুন লেগেছে কামরায়, এইরকম ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি হৈচৈ। কে আগে কামরা থেকে নামবে তারই প্রতিযোগিতা। প্রায় চোখের পলকে কামরাখানা ফাঁকা হয়ে গেল। এক কোণে আমি আর ওদিকে দরজার কাছে একটি দম্পতি। ব্যাপার কী? সবাই এভাবে নেমে গেল কেন?

খানিক বাদে জানা গেল কারণটা। গাড়ি চেকিং করা হচ্ছে, বিশেষ একটা স্কোয়াড তৎপর হয়েছে বিনা টিকিটের যাত্রীদের ধরবার জন্যে। কনুইয়ের ওপরে লাল পট্টি বাঁধা কয়েকজন যুবক যাত্রাগানের মঞ্চে পাত্রপাত্রীদের প্রবেশের স্টাইলে কামরায় ঢুকল, শূন্যপ্রায় কামরায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতার মতো করে বলতে লাগল, 'কোনো প্যাসেঞ্জার বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে পারবেন না, টিকিট না থাকলে তাকে হ্যান্ডওভার করা হবে। যান, যাদের টিকিট নাই তারা নেমে যান, টিকিট করি আসেন।' যাদের উদ্দেশে এইসব বলা, তারা ইতোমধ্যে হাওয়া। বিশেষ স্কোয়াডের একটি লোক সামনে এগিয়ে এসে আমার দিকে হাত বাড়ালো, ধমকের সুরে বলল, দেখি আপনার টিকিট! পকেটে হাত ঢোকাতে গেলাম, পেছন থেকে ওদের একজন বলল, 'আরে দেখা লাগবে না, আয় নামি আয়।' যেমন ভঙ্গিতে এসেছিল, তেমনি করে নেমে গেল ওরা।

'২১ জন বসিবেক' লেখা কামরায় এখন আমরা মাত্র ৩ জন। এইরকম আয়েশের আসন পাবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। ওদিকের ভদ্রলোক সিটের উপর পা তুলে বসলেন, আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যান এখন আরাম করে শুয়ে বসে যান।' তারপর নানান কটূক্তি করলেন বিনা টিকিটের যাত্রীদের উদ্দেশে। কামরার এক কোণে আয়েশ করে বসলাম আমিও। বমি আর প্রস্রাব এখন অনেকটা তফাতে, কিন্তু পচা ইলিশ, মুখে দড়ি বাঁধা, নোংরা মেঝেতে পড়ে আছে। কার মাছ পড়ে থাকল? যাত্রীটি নেমে যাবার সময় তড়িঘড়িতে ফেলে রেখে গেল মাছজোড়া? কামরার দম্পতি যাত্রী খ্যাঁকখ্যাঁকে কণ্ঠে বলল : 'দ্যান, জানালা দিয়া ফেলায় দ্যান।'

সময় পেরুচ্ছে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, ট্রেন ছাড়ে না। হলো কী? পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক চেকার, জিজ্ঞেস করলাম। পান চিবুচ্ছিল লোকটি, মুখভরা পিক নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে কিছু বলল, বোঝা গেল না।

আধঘণ্টা পর ছাড়ল ট্রেন। ফাঁকা কামরা, একটু একটু বাতাস পাচ্ছি, দুর্গন্ধ কম লাগছে। ভাবলাম ভালোই ব্যাপারটা, ট্রেনে এখন চেকিং হচ্ছে, রেল-কর্মচারীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছে বিনা টিকিটের যাত্রীদের রোধ করবার জন্যে। এতে রেলের আয় নিশ্চয়ই বাড়বে। আবার পরক্ষণেই মনে হলো, এই যে ট্রেনের যাত্রীরা, যারা চেকিংয়ের ভয়ে নেমে গেল, তারা নিজ নিজ গন্তব্যে যাবে কী করে? ওদের মধ্যে সত্যি সত্যি যাদের টিকিট কাটবার সাধ্য নেই, তাদের কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা হবে? বিশেষ করে ভাবনা হলো ইলিশের মালিকের জন্যে। আহারে, কত-না শখ করে কিনেছিল মাছজোড়া! ফেলে পালিয়েছে।

প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে হাজারখানেক গজ গেছে ট্রেন, হঠাৎ থেমে গেল। কী হলো আবার? দাঁড়ালো কেন গাড়ি? জানালা গলিয়ে বাইরে তাকাই, বোঝা যায় না। পাশের কামরার একজন, দাঁড়িয়েছিল দরজার হাতল ধরে, বলল, ইঞ্জিন নাকি বিগড়ে গেছে। হায় হায়, কী হবে উপায় তা হলে? সারতে কতক্ষণ লাগবে? শেষ পর্যন্ত ট্রেন থেকে নেমে যেতে হবে নাকি? রেললাইনের ধারেই পাকা রাস্তা। ছুটে যাচ্ছে ছাদবোঝাই ভাঙা ঝরঝরে বাস। বাস যাবে শান্তাহার, জয়পুরহাট, নাটোর কিংবা রাজশাহী। ট্রেন থেমে পড়েছে দেখে চলন্ত বাসের কন্ডাক্টর দাঁত বের করে হাসছে আর চিৎকার করে বলছে : 'আসেন আসেন, ট্রেন থাকি নামি আসেন।' ইত্যাদি। মশকরা।

ইঞ্জিনের শব্দ পর্যন্ত বন্ধ। যাত্রীরা হতাশ। হঠাৎ কোলাহল পেছনের দিকে। চোখ ফিরিয়ে দেখি, ধেয়ে আসছে কয়েক শ মানুষ। হাতে বোঁচকা-পুঁটলি, ঝাঁকা, ভার-বালতি, কাঁধে ছাগল, কারও হাতে মুরগির বোঝা। ওদের মধ্যে কেউ হাসছে, কেউ আবার উদ্বিগ্ন। কেউ দৌড়াচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, কেউ হাঁটছে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠে ছুটছে।

ওরা এল, উঠে পড়ল বিভিন্ন বগিতে। ভরে গেল আমাদের কামরাটিও। যারা নেমে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আছে এই দলে। আবার সেই চিৎকার, হুটোপুটি, আসন নিয়ে ঠেলাঠেলি। এক বৃদ্ধ যাত্রী, কামরায় ঢুকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেঞ্চের নিচে, ইলিশজোড়ার অবস্থান দেখে সন্তুষ্টির হাসিতে উঠে এল, আবার বেঞ্চে বসল। বুঝলাম ইনি ইলিশের মালিক। পরে আলাপে-আলাপে জানলাম গাবতলীতে যাচ্ছেন, সেখানে থাকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। বৃদ্ধ এক সরকারি অফিসের পিয়ন ছিলেন, এখন অবসর নেওয়ার পর বগুড়া শহরে পান-সিগারেটের দোকান দিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে গাবতলী যান।

বৃদ্ধ জানালেন, না, ভুল করে মাছ ফেলে যাননি তিনি। টিকিট ছিল না বলে কামরা থেকে নেমে একটা ওয়াগনের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন এতক্ষণ, চেকিং শেষ হবার পর বেরিয়ে এসেছেন আবার।

বৃদ্ধই জানালেন, টিকিট কেউই করেননি, 'চেকিং পার্টি' চলে যাবার পর যাত্রীরা ড্রাইভার সাহেবের সাথে 'ঠিক' করেছেন। যে যেখানেই যাক প্রতিজনকে এক টাকা করে দিতে হবে, প্ল্যাটফরম ছেড়ে এসে দাঁড়িয়ে যাবে ট্রেন। বিনা টিকিটের যাত্রীরা যেন আবার ট্রেনে উঠতে পারেন।

: তা হলে ইঞ্জিন বিকল হয়নি?

: আরে ধুর, বাজে কথা! আসলে ট্রেন দাঁড়িয়েছে যাত্রীদের নেবার জন্য। ইঞ্জিন বিগড়ে যাবার কথা বলে অফ করেছেন ইঞ্জিন। মিছেমিছি।

খানিক পরে আবার চলতে শুরু করল ট্রেনখানা। কখন শান্তাহার পৌঁছুব, কে জানে!

(খবরের কাগজ, ২৩ আগস্ট '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্তিকের দিনে ॥ ঝিনাইগাতীতে—

২৬ অক্টোবর। খুব ভোরবেলা, আমি আর উৎপল কান্তি ধর, জামালপুর থেকে রওনা দিলাম শেরপুরের উদ্দেশে। প্রথমে শেরপুর, সেখান থেকে ঝিনাইগাতী উপজেলা সদর, সদর থেকে যাব বিভিন্ন দুর্গত এলাকায়। খবর এসেছে ঝিনাইগাতীতে কার্তিকের আকাল শুরু হয়েছে, ইতোমধ্যে অনাহারে মারা গেছে ৫ জন, দারুণরকম অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়েছে সোয়া শ। আমিরুজ্জামান লেবু নামে এক সাংবাদিক, ঢাকার একটি পত্রিকার সংবাদদাতা, নিজের পত্রিকায় অনাহারে মৃত্যু-সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল, ছাপা হয়নি। শেষে রংপুরের ঠিকানায় চিঠি দেয় আমাকে। সে-চিঠি হাতে পেয়েই রওনা হয়েছি। গতকাল বিকেলে আন্তঃনগর 'তিস্তা' ট্রেন ধরে নেমেছি জামালপুরে, এখন শেরপুরের দিকে চলেছি।

আমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। কেননা পথ লম্বা, অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহের জন্যে যেতে হবে প্রত্যন্ত এলাকায়। আবার যথাসম্ভব দ্রুত ফিরে আসা চাই। তাই বাসের ভরসা ছেড়ে একটু তফাতে মেইন রোডের উপর দাঁড়ালাম। ধুলো আর ধোঁয়া উড়িয়ে শেরপুরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে লোডেড ট্রাক, একটিকে থামানো গেল, উঠে বসলাম। খাদ গর্তময় রাস্তায় দোল খেতে খেতে অতঃপর শেরপুর শহরে। আমাদের কাছে প্রশ্নই থেকে গেল, সরকার যখন উন্নয়নের নামে গলা ফাটাচ্ছেন, বলছেন বিভিন্ন কাজের সাথে সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থার 'বিরাট উন্নতি সাধিত' হয়েছে, তখন জামালপুর থেকে শেরপুরে যাবার একমাত্র রাস্তাটির দশা এইরকম কেন? কেন সম্পূর্ণ পাকা করা হচ্ছে না এটি? শুধু জামালপুর নয়, ঢাকা থেকেও এই একমাত্র পথ ধরেই শেরপুরে যাতায়াত করতে হয় বহু মানুষকে।

শেরপুর শহরে নেমেই নয়ানীবাজারে এলাম, সঞ্জীব চন্দ বিল্টুর বাসায়। বিল্টু হলো বাংলার বাণীর স্টাফ রিপোর্টার বাদল-এর ভাই, সে আমাদের আসবার খবর পেয়ে দুখানা মোটরসাইকেল 'রেডি' রেখেছিল, তাতে চাপলাম। শহর ছাড়তে-না-ছাড়তেই শুরু হলো 'অখাদ্য' রাস্তা এবং আমরা ঘণ্টায় ১৫-২০ মাইল স্পীডে এগিয়ে চললাম ঝিনাইগাতী উপজেলার দিকে। জামালপুর-শেরপুর : দুই জেলা-সংযোগকারী রাস্তার অবস্থা যা দেখেছি, তাতে শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কের দশা ভালো হবে আশা করিনি। তবু মাইল তিনেক যেতেই হাড়ের বাজনা শুরু হয়ে গেল। রাস্তা নয়, যেন অসংখ্য পুকুর এবং পাহাড় পেরিয়ে সামনে যাচ্ছি আমরা। দেশের লাখো মাইল পথ আমি অতিক্রম করেছি দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে, কিন্তু রাস্তার এইরকম দুরবস্থা দেখিনি। উত্তর জনপদের সবচেয়ে অভাবী এলাকা চিলমারী উলিপুর রাজিবপুর রৌমারীর সবচেয়ে খারাপ রাস্তাগুলো এরচেয়ে বুঝি খানিকটা ভালো।

ঝিনাইগাতী পৌঁছুলাম কিন্তু এখন দুর্গত গ্রামে যাওয়া কী করে? সবচেয়ে 'ভালো যোগাযোগ' হলো কাংসা-ধানশাইল ইউনিয়নের এবং সেখান থেকে বাগেরভিটা গ্রামে যাব। বলল আমাদের 'গাইড' আমিরুজ্জামান লেবু। ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগেরভিটাতেই মারা গেছে বেশিসংখ্যক মানুষ, অপুষ্টির শিকার সেখানেই বেশি। তবে লেবু তার কথার সাথে যোগ করল, আমরা ওখান মোটরসাইকেল নিয়ে যেতে পারব না, সাইকেলও নয়, পায়ে হেঁটে যেতে হবে। পথে আছে খাল-খন্দক, পাহাড়ি নদী-ছড়া। উৎপলদা শুনে মুখ ব্যাজার করলেন না বটে, কিন্তু থমথমে হয়ে উঠলেন। সঙ্গে আরও যারা আছেন তাদের মুখ শুকালো। একজন বললেন, কী দরকার স্পটে যাবার, এখানে যতটা বিবরণ পাওয়া গেল তাতে কি আপনার চলবে না? সঞ্জীব চন্দ বিল্টু, শরীরে-চলনে ধীরস্থির, কিন্তু মনে-মনে টগবগে, বোধকরি আমার ইচ্ছেটা ধরতে পেরেছে। বলল : না, আমরা বাগেরভিটা যাবই। সরেজমিনে না গেলে এইরকম একটা সিরিয়াস রিপোর্ট লেখা অসম্ভব। তা ছাড়া কিছু ছবিও তুলতে হবে।

সবাই তবু অপেক্ষা করছে আমি কী বলি শোনার জন্যে। আমি তেমন কিছু বললাম না, বিল্টুকে ইশারা করলাম এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। উপজেলা সদরে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়, বাগেরভিটা থেকে ফিরতে হবে দুপুরেই।

কিছুটা রাস্তা মোটরসাইকেলে, তারপর পায়ের উপর নির্ভর, আমরা এগিয়ে চলেছি। দূরে দেখা যায় গারো পাহাড়ের কায়া, আকাশের সাথে লেপ্টে আছে কালো ছেঁড়া কাগজের মতো। উপরে নীল আকাশ, মিহি রোদ, দুর্গম পথের দুধারে সবুজের সমারোহ, বেশকিছু আগাম আমনের ক্ষেতে শিষ উঁকি দিচ্ছে। অবাক এই বাংলা, কার্তিকের এইসব দিনে ক্ষেতে ক্ষেতে যখন থাকে আমনের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত, যখন ধানের দুধ-দানা মাটি ও পানি চুষে-শুষে পুষ্ট হতে থাকে, তখন কৃষক-মজুররা থাকে অনাহারে-অর্ধাহারে। অনাহার কথাটা সরাসরি লেখা যায় না। তাই বুঝি পত্রিকার পাতায় এইসব মৃত্যু 'অপুষ্টিতে মৃত্যু' কিংবা 'ডায়রিয়ায় মৃত্যু'-র বিবরণ পায়!

দুঃস্বপ্নে দেখা রাস্তার মতো দীর্ঘপথ, কোমর-ডোবা নদী, কাদা-পিচ্ছিল খালের পাড়, ঝাড়-জংলা, এইসব মাড়িয়ে আমরা একসময় বাগেরভিটা পৌঁছুলাম, কাজ সেরে ফিরেও এলাম। জিনসের প্যান্ট ভিজে বস্তা, শরীর ধুলোকাদাময়, অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, এখানে উপজেলা সদরে ফিরে কোথাও যদি গোসল করা যেত, ভালো হতো।

ফিরে এলাম ঝিনাইগাতী উপজেলা সদরে। বিধ্বস্তপ্রায় শরীর। ক্ষুধাও পেয়েছে প্রচণ্ড। সবচেয়ে খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে, কিছুক্ষণ পরই রাস্তা নামের পুকুর-পাহাড় মাড়িয়ে আবার আমাদের ফিরতে হবে শেরপুর শহরে।

আমিরুজ্জামান লেবুর অনুরোধে উঠলাম এক তরুণ ডাক্তারের বাসায়। দেখি দুপুরের খাওয়া টেবিলে সাজানো হয়েছে আমাদের জন্যে। এখন শুধু স্নান করে ফেললেই খেতে বসা যায়।

স্নান সারলাম একে একে। তারপর সোজা খাবার টেবিলে। বড় গামলায় সাজানো গরম ভাত, কিছুক্ষণ আগেই বুঝি উনুন থেকে নামানো হয়েছে, ধোঁয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠছে, মিষ্টি ভাপ বেরুচ্ছে। আরও দেখি, টেবিলের উপর সাজানো বেশ কয়েক পদের তরকারি। টাকি মাছের ভর্তা, আলু দিয়ে ছোট মাছের চচ্চড়ি, রুইজাতীয় বড় মাছ, মুরগি, ডাল ইত্যাদি। আমার আবার খুব তাড়াতাড়ি লালা এসে পড়ে জিহ্বায়, এসে পড়ল, প্রায়-হালুম দিয়ে পড়লাম খাদ্যের স্তূপের ওপর। আমাদের সামনে তখন বাগেরভিটা গ্রামের অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ মানুষগুলো নেই। বেকার মজুর তমিজউদ্দিন, যার স্ত্রী সিন্দু বেগম কদিন আগে মারা গেছে না-খেতে পেয়ে, সেই তমিজের হা-হুতাশ নেই। বৃদ্ধ দিনমজুর ভাদু, একমাস থেকে কর্মহীন, একটানা সাতদিন অখাদ্য-কুখাদ্য খাবার পর এক মেম্বারের পায়ে ধরে মাত্র আধসের চাল 'সাহায্য' পেয়েছিল এবং সেই চালের ভাতটুকু সাত-সদস্যের পরিবারের সবাই মিলে ভাগ করে খেয়েছে, সেই ভাদুর কাতরধ্বনি নেই। বৃদ্ধা কাঞ্চন বিবি, একটানা অনাহারে থাকবার পর গতকাল মাত্র ২টি কাঁচাকলা সেদ্ধ খেয়েছে, সেই কাঞ্চনের 'একটু ভাত দ্যেও বাবা' বলে কান্না নেই।

না, কিছু নেই, কোনো স্মৃতি নেই, কিছুক্ষণ আগের কোনো বেদনা নেই, আমি এক সাংবাদিক, নষ্ট সমাজের একজন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণমানুষের একজন, গোগ্রাসে গিলছি গরম ভাত। টেবিলে যেসব তরকারি সাজানো, যদিও দেখতে তা তমিজউদ্দিন, সিন্দুবিবি, ভাদু, কাঞ্চন বিবিদের রক্ত ও মাংসের মতো, তার সবকটিই আমার খুব প্রিয়।

(খবরের কাগজ, ৮ নভেম্বর '৯০)

AMARBOI.COM

পতাকা এবং খোকন–১

তিস্তামুখ ঘাট থেকে আন্তঃনগর 'তিস্তা' ট্রেনখানা নির্দিষ্ট সময়েই ছাড়ল দিনাজপুরের উদ্দেশে, তারপর অতিকায় এবং দুর্বল এক 'কেরুভার' মতো এগিয়ে চলল। এখানে, এই ঘাটের কাছে বালুমাটি, রেললাইন 'কাঁচা', ভরতখালী স্টেশন পেরুনোর পর কিছুটা গতি পাবে।

বিকেলে বাঁকা রোদ, মোটা দানার বালু, এলোমেলো বাতাস, যাত্রীদের এটা-ওটা কথাবার্তা, ছন্দের মতো ট্রেনের দুলুনি। খুব ভালো লাগছে অনেকদিন বাদে রংপুরে ফিরে যাচ্ছি। লাইনের ধারে খড়ের জীর্ণ ঘরবাড়ি, সতেজ লাউগাছ, কলাগাছের থোপ, মেলে দেওয়া শতচ্ছিন্ন কাঁথা, চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে দুই যুবতীর উকুন বাছার দৃশ্য, পাশাপাশি দুটি নতুন কবর, একটি ছাগলছানা লাফাতে লাফাতে ছুটছে, কর্মক্লান্ত কিছু মানুষ এলোমেলো বসে বিড়ি ফুঁকছে, ট্রেনের দিকে মুখ করে পেচ্ছাব করছে ধুলোমাখা উলঙ্গ এক বালক। শিশ্নটি উঁচু করে ধরেছে সে এবং আমাদের দেখানোর জন্যে কিংবা হতে পারে ট্রেনটিকে ভিজিয়ে দেবার মতো আক্রোশে অনাহারি অপুষ্টি-আক্রান্ত পেটখানি সামনের দিকে ঠেলে ধরেছে, একটু একটু করে শরীর ঝাঁকাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে পেচ্ছাব শেষ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে তার। আর এ-সময় বুফেকারের ভেতর আমি হেমন্তের বিকেল দেখছি, অল্প অল্প করে কামড় বসাচ্ছি গরম চিকেন ফ্রাইয়ের কুড়মুড়ে পিঠে।

এগুচ্ছে তিস্তা এক্সপ্রেস। দুইদিকে যতদূর চোখ যায় বালু, শূন্য মাঠ, মরা গাছ। একটু সবুজ খুঁজে পাওয়ার পর, দেখি, ছিন্নভিন্ন বেড়াঘেরা একটি নিঝুম স্কুলঘর, ফুলছড়ির বালিকা বিদ্যালয়। একটু আগে বোধকরি স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে, সামনের মাঠে উত্তোলিত জাতীয় পতাকাটি এখনও নামানো হয়নি, বাঁকা বংশদণ্ডের মাথায় হেমন্তের বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে বিবর্ণ সবুজ এবং লাল সূর্য, যেনবা উনিশ বছর বয়স্কা কোনো মায়ের আঁচল। মুরগির রানের হাড় চুষে ফেলে দিতে দিতে, মনে পড়ল, সামনে ডিসেম্বর, বিজয়ের দিন।

স্কুলের এই পতাকাটি দেখে কী জানি কেন হঠৎ করে মনে পড়ল খোকনের কথা।

খোকন বলতে 'কচি খোকা' অথবা 'খোকন সোনা' ধরনের কেউ নয়, তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সের টগবগে যুবক, নাম হলো মাহমুদ হাসান খোকন। আমার খুব প্রিয় একটি চরিত্র। আমি যদি গল্পকার কিংবা ঔপন্যাসিক হতাম, পাতার পর পাতা লিখতে পারতাম তাকে নিয়ে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সাধারণভাবেও কারও চরিত্র চিত্রণ করা। মনুষ্যচরিত্র নিয়ে কিছু লেখা তো দূরের কথা, তাকে বুঝে উঠতেই পারি না।

সে-কথা থাক, খোকনের কথা বলি। তার আদি বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, পরে কী কারণে উত্তরাঞ্চলের রংপুর শহরে চলে এসেছে, জানি না। খোকনের বাবা ইয়াহিয়া সাহেব ছিলেন এখানকার নামকরা আইনজীবী, এ বছরের গোড়ার দিকে মারা গেছেন। ঘটনাবহুল জীবন ছিল তাঁর, কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয়।

মাহমুদ হাসান খোকন এখন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়, কিন্তু চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ মানসিক সমর্থন রয়েছে। একসময় সে ছাত্র ইউনিয়ন করত, রংপুর শাখা সংগঠনের নেতা ছিল। কারমাইকেল কলেজ থেকে অনার্স নেবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টারস্‌ করে। '৮১ সালে সে কারমাইকেল কলেজের ভিপি ছিল।

পড়াশোনা শেষ করবার পর সে বিআইডিএস-এ রিসার্চ অর্গানাইজার হিসেবে কাজ করে প্রায় সাত মাস। চাকরি ভালো লাগে না, রংপুরে ফিরে এসে পৌরসভার অধীনে পরিচালিত নাইট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে, তার আগে করে পুস্তক ব্যবসা। ইকোনো বলপেনের এজেন্সি, বেবিফুডের এজেন্সি, ঠিকাদারি, তেলের ছোট মিল, এ ধরনের অনেক পেশা সে ধরেছে, ছেড়েছে। তারপর এখন করছে জাতীয় পতাকার ব্যবসা।

জাতীয় পতাকার ব্যবসা? সেটা আবার কী-রকম? অনেকের অবাক হবারই কথা। এই দেশে মানুষ মানুষ নিয়েও ব্যবসা করে, মানুষের লাশ নিয়ে ব্যবসা করে, খুলি হাড় রক্ত নিয়েও ব্যবসা করে। এমনকি ব্যবসা করে তাদের অসহায়ত্ব, দুর্বলতা, ক্ষুধা, কান্না নিয়ে। দেশকে নিয়েও ব্যবসা করবার ফন্দিফিকির করে বুঝি কেউ-কেউ। কিন্তু জাতীয় পতাকা নিয়ে ব্যবসা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁ, খোকন এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জাতীয় পতাকা বানায়। সরকার-নির্ধারিত যে মাপ রয়েছে, সেইমতো। বাসাবাড়ি ও দোকানপাটের জন্যে আড়াই ফুট বাই দেড় ফুট সাইজের ছোট পতাকা, দাম পঞ্চান্ন টাকা; পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট মাঝারি সাইজের পতাকা, দাম এক শ পঁয়ত্রিশ টাকা; দশ ফুট বাই ছয় ফুট বড় পতাকা সাড়ে তিন শ টাকা। একেকটা পতাকায়, বিক্রি হলে, শতকরা পঁচিশ ভাগ মুনাফা। বেচাবিক্রি আজকাল ভালোই হচ্ছে। খোকনের কাজে সহায়তা করে তার স্ত্রী, পতাকা বানিয়ে নেওয়ার পর বউটি তা ঘরে বসেই ইস্ত্রি করে, ভাঁজ করে দেয় পরিপাটি। খোকন কিংবা তার নিয়োজিত লোক ব্রিফকেসে ভরে সে পতাকা বহন করে নিয়ে যায় বিভিন্ন উপজেলা কিংবা দূর কোনো গ্রামে, স্কুলে স্কুলে। উপজেলার চেয়ারম্যান, প্রশাসক, স্কুলের হেডমাস্টার ও গভর্নিং বডির সদস্যদের প্রথমে সঠিক মাপের শুদ্ধ পতাকা সম্পর্কে মোটিভেট করে, তারপর পতাকা বিক্রি করে নগদ টাকায়। চতুর, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী খোকন পতাকা বিক্রিতে কোথাও ব্যর্থ হয়েছে এমনটি তার স্মরণ নেই।

খোকন, পতাকা-সম্পর্কিত এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে, ব্যবসা জমেছে ভালো, পাশাপাশি রয়েছে একটি ছোট তেলের মিল। পতাকা আর তেল, দারুণ বৈপরীত্যের বিষয় হলেও এই ব্যবসায় টিকে আছে এযুগের চতুর যুবকটি।

পাঠক, আপনারা যাঁরা এই লেখাটি পড়ছেন, তাঁদের কাছে কেমন লাগল খোকন এবং তার ব্যবসা? আপনারা কি কেউ জানতে চান ছেলেটি পতাকা সম্পর্কে কতটুকু অভিজ্ঞ? কী করে সে এই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবসায়ে এলো?

(খবরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর '৯০)

AMARBOI.COM

পতাকা এবং খোকন–২

জাতীয় পতাকা ব্যবসায়ী মাহমুদ হাসান খোকন সম্পর্কে কয়েকজন পাঠক বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। তবে যতটা সাড়া পাঠকদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম, তা পাইনি। চিঠি এসেছে খান চল্লিশেক, অধিকাংশই ঢাকা থেকে।

একজন জানতে চান, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোনো নাম আছে কি না। অপর একজন উৎসাহী খোকন বিবাহিত কি না জানতে। ঢাকা থেকে একজন কলেজ-শিক্ষক প্রশ্ন রেখেছেন, জাতীয় পতাকার মতো একটি সম্মানের জিনিস কারও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার উপাদান হতে পারে কি? ফেনী থেকে একজন ওষুধের ব্যবসায়ী জানতে চেয়েছেন : খোকন সাহেব কী করে কিংবা কোথা থেকে জাতীয় পতাকা বানানো ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তা বিক্রির প্ল্যান সংগ্রহ করলেন। এ ছাড়া অন্যান্য চিঠিগুলোতে রয়েছে খোকন-সম্পর্কিত লেখাটি সম্পর্কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তাঁদের কেউ-কেউ পরবর্তী লেখায় খোকন-সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। তবে ঢাকা থেকে লেখা এক চিঠিতে আমার এক সাংবাদিক-বন্ধু তাঁর মন্তব্য জানিয়েছেন যে, খোকন সম্পর্কিত লেখাটিতে নাকি খুব আবেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থান পেয়েছে। লেখাটি হয়ে গেছে ব্যক্তি-প্রচারমূলক, এতে করে 'খোকনের পতাকা ব্যবসা' লাভবান হবে। পাবনার শালগাড়িয়া থেকে নাম-ঠিকানাবিহীন একটি চিঠি পেয়েছি যাতে নিষ্ঠুরভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'খোকন তার ব্যবসার কত শেয়ার আপনাকে দিয়েছে?' রংপুরের শালবন পাড়ার জনৈক ছাত্র পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণমূলক এক চিঠিতে খোকন এবং তার জাতীয় পতাকার ব্যবসার ওপর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছায়াছবি (শর্ট ফিল্ম) নির্মাণ করা যায় কি না, তা বিবেচনা করবার জন্যে উৎসাহী শর্ট ফিল্ম নির্মাতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রতিটি লেখার ব্যাপারে পাঠকদের রিঅ্যাকশন থাকতে পারে, থাকে। সেজন্যে ধন্যবাদ অথবা পত্রাঘাত দু-ই স্বাভাবিকভাবে নিতে হয়। তবে পত্রাঘাতের নামে 'খোকন তার ব্যবসার কত শেয়ার আপনাকে দিয়েছে' কিংবা 'ঐ লেখাটির ফলে খোকনের পতাকা ব্যবসা লাভবান হবে' এই ধরনের মন্তব্য দুঃখ দেয়।

সমালোচনার নামে যুক্তিহীন বক্তব্য উত্থাপন ও অযথা মানসিক আঘাত দেওয়া থেকে বিরত থাকবার জন্যে আমি সকল শ্রেণীর পাঠকের সমীপে অনুরোধ জানাচ্ছি। যাঁরা খোকন-সম্পর্কিত লেখাটি সম্পর্কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তাঁদের জন্যে ধন্যবাদ রইল।

AMARBOI.COM

খোকন বিবাহিত কি না তা আগের লেখাটিতেই জানিয়েছি। বলেছিলাম, খোকনের স্ত্রী তার পতাকা ব্যবসায়ের নেপথ্যে কাজ করছে, পতাকা বানানোর পর বাসায় নিয়ে গেলে মেয়েটি সেগুলো নিজের হাতে ইস্ত্রি করে দেয়, গুছিয়ে দেয় বাক্সে।

হাঁ, খোকনের পতাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটি নাম রয়েছে। 'গৌরব'। গৌরবের প্যাড ও সিলে খোকন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পতাকা সরবরাহের বিল করে। নামটি নিশ্চয়ই পাঠকদের পছন্দ হবে।

অপর পাঠকের পত্রের জবাবে বলতে চাই, নিশ্চয়ই জাতীয় পতাকা সম্মানের, কিন্তু তাই বলে তা বানানো ও বিক্রি করা যাবে না, এমন বাধানিষেধ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেই। তবে হাঁ, তৈরিকৃত জাতীয় পতাকা হতে হবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া নির্দিষ্ট মাপ অনুসারে। সরকারের পতাকা-সম্পর্কিত যে আইন রয়েছে তাতে কোনো ব্যক্তি পতাকা তৈরি কিংবা বিক্রি করতে পারবেন না, এমনটি নেই। তবে হাঁ, আইনে বলা আছে কেউ ছেঁড়া, বিবর্ণ, সঠিক মাপহীন পতাকা উড্ডয়ন করতে পারবেন না, করলে তিনি শাস্তি পাবেন। অবশ্য বাংলাদেশে এই আইনটি কার্যকর হতে দেখা যায়নি, যায় না। বিকৃত মাপ, সবুজের বদলে নীল রঙের কাপড়, ত্যাড়াবাঁকা সূর্য, ছেঁড়া-ফাটা পতাকা এই দেশে অগুনতি ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরা পড়েছে বা শাস্তি হয়েছে এমন খবর শোনা যায়নি। পতাকা পোড়ানো হয়েছে স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতে, রাজশাহীতে, গত বছর। তারা ধরা পড়েনি বরং সবার চোখের সামনে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে বেঠিক মাপের পতাকা ব্যবহার যদিও তা বেআইনি, লজ্জাকর, তবু তা ঘটছে। সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে বলেন, 'আমাদের কাজ হলো সঠিক মাপের পতাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারের ব্যাপারে জনসাধারণকে জানানো, কিন্তু আইন কার্যকর করার ক্ষমতা আমাদের নেই।' আইন মন্ত্রণালয় বলে, 'বেঠিক মাপ কিংবা ছেঁড়া-ফাটা পতাকা কেউ ব্যবহার করছেন এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই তবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। জাতীয় পতাকার অপব্যবহার-সম্পর্কিত কোনো লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ প্রশাসনের ফাইলে নেই। আজ পর্যন্ত একটিও আসেনি।'

খোকন কী করে জাতীয় পতাকা বানানো ও ব্যবসায়ের প্ল্যান পেয়েছে, এ-সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে বলি : পরিকল্পনাটি তার মাথায় হঠাৎ করেই এসেছে। খোকন, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যখন এটা ছাড়ে ওটা ধরে অবস্থা, তেলের কলটি ভালো চলছে না, তখন একদিন পথ চলতে চলতে রংপুর জেলা প্রশাসন ভবনের পতাকাটির দিকে তার চোখ পড়ে। সেটি ছিল বিবর্ণ, ছেঁড়া। খোকন এ ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ একজন প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পতাকাটি তখুনি পাল্টিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ এক দর্জির দোকান থেকে কিনে আনা এই নতুন পতাকাটিও সঠিক মাপ ও রঙের ছিল না। এই দেখে সে আবার প্রশাসকের কাছে অভিযোগ জানায়। এ-সময় তার মাথায় হঠাৎ করে চিন্তা আসে 'অনেক ব্যবসাই তো করলাম আর ছাড়লাম, এখন পতাকা বানানো ও বিক্রির ব্যবসা করলে কেমন হয়?'

চিন্তার সাথে সাথে কাজ শুরু হয়। পতাকা ব্যবসায়ে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পায় সে। দেশের সকল অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, সেনাবাহিনী-বিডিআর-পুলিশ-কাস্টমস, জজকোর্ট-এর জন্যে বছরে প্রায় আড়াই লাখ পতাকা প্রয়োজন। এ ছাড়াও রয়েছে শহর এলাকার বাসাবাড়ি, দোকানপাট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—যেখানে বছরের কয়েকটি দিনে জাতীয় পতাকা তুলতে হয়। দেশে রয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার স্কুল, ১২শ কলেজ। শুধু এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পতাকা সাপ্লাই করতে পারলে তো ভালো মুনাফা থাকবে। এককেটা পতাকা বিক্রি হলে মুনাফা হবে শতকরা ২৫ ভাগ। তা ছাড়াও, খোকন ভাবে, ব্যবসাটি হবে ব্যতিক্রমধর্মী। আর্থিক লাভ ছাড়াও থাকবে আত্মমর্যাদা। থাকবে ভালো কিছু করার গৌরব।

সেই থেকে 'গৌরব'-এর সূচনা। প্রথম অবস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে ৫০ খানা পতাকা বানালো সে, বিক্রি হয়ে গেল দুতিন দিনের মধ্যে। এখন সেই 'গৌরব' অনেকটা এগিয়ে গেছে। সঞ্চিত হয়েছে সমাজ সম্পর্কে অনেক অনেক অভিজ্ঞতা। পতাকা বিক্রির বিলের টাকা তুলতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশাসনে কর্তাকর্মচারীদের যেমন সেলামি দিতে হয়েছে, তেমনি তাকে দূর গ্রামে গিয়ে নিষ্ঠুর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেউ বলেছে, এত ব্যবসা থাকতে আপনি ফ্ল্যাগের ব্যবসায় এলেন কেন? কেউ ভেবেছে ছেলেটার এই ব্যবসায়ের পেছনে কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি বুঝি আছে। শহর থেকে অনেক দূরে, অতি অভাবী চিলমারী উপজেলার এক গ্রামের স্কুল, যে-স্কুলটি ভাঙাচোরা, সরকারি অনুদান নেই, শিক্ষকরা মাসের পর মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না, সেই স্কুলের শিক্ষকরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছেন, 'প্যাটে আমাদের ভাত নাই, আর আপনে আসছেন ফ্ল্যাগ বেচবার?' খোকন জবাবে কিছু বলতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক রক্তক্ষয়ের পর স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, হয়েছে একেবারে নিজস্ব ভূখণ্ড, সূর্য-আঁকা একটি সুদৃশ্য পতাকা, কিন্তু আসেনি আর্থসামাজিক উন্নয়ন। কবে তা আসবে? কবে?—এইসব ভাবনা নিয়ে রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন এক যুবক মাহমুদ হাসান খোকন, তার ব্রিফকেসের ভেতর সদ্য ইস্ত্রি-করা একগুচ্ছ জাতীয় পতাকা শহর থেকে শহরে কিংবা গ্রাম থেকে গ্রামে বহন করে বেড়াচ্ছে এখন।

(অপ্রকাশিত। রচনাকাল : ডিসেম্বর '৯০)

আনন্দ-উল্লাসের মুহূর্তগুলো

৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। রাত ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে রাজধানীর রাস্তা বলতে গেলে ফাঁকা হয়ে গেল। এর আগে গোটা দিন ধরে মানুষ হরতাল পালন করেছে, মিছিল করেছে, সমাবেশে যোগ দিয়েছে। তারপর নিজের আবাসে ফিরে গেছে রাত ৯টার আগে।

কোনো কোনো রাস্তায় ধাবমান ট্রাকের চাকার ঘর্ষণ শব্দ। আছে দুয়েকটা হালকা যানবাহন। এদিকে-ওদিকে ছুটে যাচ্ছে বেবিট্যাক্সি, মোটরসাইকেল। রিকশার চাকাতে ছিল গতি। বাসাবাড়িতে মানুষজন রাতের আহার সারছে, কেউ ইংরেজি সংবাদ শোনার জন্যে টিভি সেটের সামনে বসেছে। ভোয়া কেন্দ্র শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেউ-কেউ। কিন্তু কেউ জানে না, কাল সকালে কী হবে! হরতাল চলবে কি আগের দিনের মতো? সন্ধে সাড়ে ৭টায় বিবিসির খবরে জানা গেছে, ৩ জন প্রাক্তন মন্ত্রীসহ ১৯ জন সংসদ-সদস্য পদত্যাগ করেছেন। সরকারি কর্মকর্তাদের একটি অংশ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা কাল থেকে অফিসে যাবেন না। ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। ঢাকায় হয়েছে বিশাল সমাবেশ, যেখান থেকে এরশাদ সরকারের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। ওদিকে, বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে শাহ মোয়াজ্জেম সূক্ষ্ম হুমকির সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিরোধী দল শান্তি চায় না, এজন্যেই তারা রাষ্ট্রপতির টেলিভিশন বক্তৃতা প্রত্যাখ্যান করেছে।'

রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদ। হঠাৎ প্রচারিত হলো এরশাদের পদত্যাগ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের খবর। মানুষ জানত এরশাদকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ছাড়তে হবে, কিন্তু তা যে আজই এবং ঠিক এ মুহূর্তে তা অনেকের চিন্তার বাইরে ছিল। টেলিভিশনের খবর ছেড়ে অনেকে ছুটে গেল ভোয়ার খবর শুনতে। সবাই খবরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়।

তারপর প্রথমে আনন্দের এলোমেলো ধ্বনি। কেউ উল্লাসে চিৎকার শুরু করল, কেউ আশপাশের মানুষের সাথে আলাপ। মুহূর্ত পরেই ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষ হঠাৎ করেই একযোগে সশব্দ আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ল। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল ৭৫ লাখ মানুষের ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহল্লা এবং বাসাবাড়ি থেকে রাস্তায় ঢল নামল হাজার মানুষের। রাত সাড়ে ১০টার পর ঢাকার রাত গণআন্দোলনের নগরী হয়ে উঠল। এ যেন নতুন মাত্রাযুক্ত নতুন এক রাত। নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে সমবেত হতে থাকল মানুষ, সমবেত হলো নির্দিষ্ট বক্তার বক্তৃতাহীন সমাবেশে।

'রাষ্ট্রপতি'র পদত্যাগের সিদ্ধান্ত-সম্পর্কিত খবরটি ছড়িয়ে পড়বার সাথে সাথে পরিস্থিতি মুহূর্তের ব্যবধানে নাটকীয়ভাবে পাল্টে গেল। ছাত্রছাত্রী, যুবক, আন্দোলনরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, সমর্থক, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতাকর্মী, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ আনন্দধ্বনি দিতে দিতে পথে নেমে এলো। কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, সবাই যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গত কয়েকদিন ধরে রাস্তায় ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর যেসব অস্ত্রধারী সদস্য, তারা রাস্তায় নেই, নেই তাদের কোনো যানবাহনের দেখা। লাঠিহাতে কয়েকজন পুলিশকে দেখা গেল গলির মুখে দাঁড়িয়ে কর্তব্য পালন করতে। শুরু হলো খণ্ড খণ্ড মিছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাস ও আবেগে বিজয়মিছিল হয়ে যায় এলোমেলো। ট্রাকমিছিল বের হয়, মোটরসাইকেল আরোহী যুবকেরা বিরাটাকার জাতীয় পতাকা বহন করে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায়। এই ধাবমান উড়ন্ত-উড্ডীন জাতীয় পতাকা দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে অনেকে। এ যেন এক নতুন বিজয়ের রাত।

যুবকেরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে কিংবা কেউ হাতের দুআঙুল তুলে বিজয় (ভিক্টরি)-সূচক ইঙ্গিত দেয়। বিভিন্ন খণ্ড মিছিলের মানুষেরা ধ্বনি তোলে : 'হৈ হৈ রৈ রৈ, এরশাদ গেল কই', 'বিমানবন্দর ঘেরাও করো, এরশাদকে আটক করো', 'এরশাদ যেন না পালায়, এরশাদের বিচার হবে', 'একটা করে মন্ত্রী ধরো, সকালবেলা নাস্তা করো' ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে আবার ধ্বনি দেয় জনগণের বিজয়ের পক্ষে, স্বৈরশাসনমুক্ত স্বদেশের পক্ষে। বেশ কয়েকটি মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব ও পল্টন মোড়ে সমবেত হয়। প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত জনতা রাত ১১টায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতাদের নিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রাত ১২টায় পুরানা পল্টনের মোড়ে গণসংগীতের আসর বসে।

দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের সফল পরিণতি, এই আনন্দ মিছিলগুলোর মধ্য দিয়ে নতুন অভিব্যক্তি লাভ করে। মিছিলের প্রতিটি স্লোগান উচ্চারণে ছিল যৌবন-শক্তির উদ্বেল উচ্ছ্বাস। পথে নেমে আসেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা। মিছিল ও সমাবেশের আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মিছিল সমাবেশ হয় মতিঝিল, কমলাপুর, শাহজাহানপুর, মালিবাগ, মগবাজার, শান্তিনগর, বিজয়নগর, কাকরাইল, নবাবপুর, সূত্রাপুর, নারিন্দা, গেণ্ডারিয়া, মোহাম্মদপুর, আগারগাঁও, কাজীপাড়া, ফার্মগেট, মিরপুর এলাকায়। তবে প্রেসক্লাবের সামনের সমাবেশটি ছিল সবচেয়ে বড়। রামপুরাসহ নগরীর কয়েকটি এলাকায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি মাইকযোগে প্রচারিত হয়, কোথাও বাজানো হয় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভাষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত ১২টার পর বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতা হতে থাকে। কয়েকটি খণ্ডমিছিল চলে যায় ধানমণ্ডিতে শেখ হাসিনার বাসভবনের দিকে। যায় বিএনপি অফিসে। উভয় স্থানে তারা আনন্দ-সংহতি প্রকাশ করে। মিছিলকারী কিংবা বিভিন্ন স্তরের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাদের ও পরিবার-সদস্যদের অভিনন্দন জানান। রাজপথের মিছিলগুলোতে ঢোল ব্যবহৃত হয়। কেউ-কেউ গলা ছেড়ে গান করে, কেউ শিস দেয়। কেউ স্বৈরশাসনের উদ্দেশে দেয় দুয়ো। গভীর রাতে রাস্তার পাশে চা-সিগারেট ও ভাজার দোকান বসে যায়। আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ চলে সারারাত ধরে। জনতার ঢলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা। গত ২৭ নভেম্বর দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারি হবার পর থেকে বিভিন্ন পেশার মানুষ যে আন্দোলন করেছেন, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ। টোকাই, আন্দোলনে ছিল যাদের ভূমিকা, তাদেরও অনেকে আসে প্রেসক্লাবের সামনে। কয়েকজন টোকাই প্রধান সড়কের ওপর আনন্দে গড়াগড়ি খেতে থাকে। রাত ১২টার পর ঢাকার আকাশে দেখা গেল একটি বিমান। শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে। সমবেত জনতা সেদিকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করতে থাকে 'ধর ধর', 'ওই পালিয়ে গেল'। এর কিছু পরে তুমুল করতালি। মিছিল নিয়ে আসছেন ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের দুই নেতা ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব ও ছাত্রদল নেতা ডাকসুর জিএস খায়রুল কবীর খোকন। তারা এখানকার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। রায় ঘোষিত হয় 'গণদুশমনদের' বিচারের। জনতার আদালতে ফাঁসির দণ্ডাদেশ হয় স্বৈরশাসকের।

রাত পৌনে একটার দিকে ব্যান্ডের তালে তালে একদল জনতা মিছিল নিয়ে আসে প্রেসক্লাবের সামনে। মিছিলের সামনে হুইলচেয়ারে বসা একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। একজন ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হলো। এইসময় হচ্ছিল সরকারবিরোধী স্লোগান। আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ৪ নভেম্বর রাতে বিজয়ের আনন্দে সরগরম হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। মিছিলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী, মহিলা, আশপাশের বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। অনেক রাত পর্যন্ত সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে এই এলাকার শিশু-কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত।

আনন্দে আত্মহারা অথচ দুর্জয় কঠিন জনতার একটি মিছিল সমবেত হয় মতিঝিলের আল্লাওয়ালা ভবনের সামনে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে মিছিলকারী জনতা ঐ ভবনের সবগুলো তলার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ভবনে জাতীয় যুব সংহতি, পার্টির শ্রমিক সংগঠন, আসম রবের 'কপ' ও সরকার-সমর্থক বেশ কয়েকটি সংগঠনের অফিস। জনতা, ভবনের অফিসগুলোর যাবতীয় আসবাবপত্র, কাগজপত্র, সাইনবোর্ড ও সরকারি নেতাদের ছবি তছনছ করে কিংবা আগুন ধরিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর রাতের আনন্দে, নগরীতে চারদিকে পটকা ফাটতে থাকে। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষ মুহুর্মুহু করতালি দিতে থাকে। অনেক স্থানে আতসবাজি পোড়ানো হয়। গণসংগীত ও বিজয়সূচক বক্তৃতা হতে থাকে। এক কথায়, দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের রাহুমুক্তির আনন্দে সাধারণ মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না। মানুষের বাঁধভাঙা ঢল আর আকাশফাটা স্লোগানধ্বনিতে মধ্যরাতের রাজপথ হয়ে উঠেছিল প্রকম্পিত।

গভীর রাতে প্রতিক্রিয়া জানান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ঘোষণাকে তিনি জনগণের বিজয় বলে অভিহিত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে দৈনিক সংবাদের একজন প্রতিনিধিকে টেলিফোনে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা জনগণের অর্জিত বিজয়কে নস্যাৎ করে দেবে। বিজয় অর্জনের পর এটাই ছিল সংবাদপত্রের কাছে দেওয়া শেখ হাসিনার প্রথম প্রতিক্রিয়া।

বিএনপি চেয়ারম্যান ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে অন্যতম নেত্রী ফরিদা হাসান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে কোনো অশুভ শক্তি টিকে থাকতে পারে না, এ সত্য আবার প্রমাণিত হলো। তিনি অর্জিত বিজয়কে সংহত করে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ড. কামাল হোসেন গভীর রাতে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ঐক্যবদ্ধ জনতার সামনে কোনো শক্তি টিকে থাকতে পারে না, তা প্রমাণিত হলো।

AMARBOI.COM

(খবরের কাগজ, ৬ ডিসেম্বর '৯০)

পতনের আগে ও পরে

এ লেখাটি রাজধানীর পাঠকদের জন্যে নয়। কেননা তাঁরা ছাত্র-জনতার আন্দোলন নিজের চোখে দেখেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুনেছেন। ৪ ডিসেম্বরের রাত ১০টার পর থেকে এ পর্যন্ত বিজয়ের আনন্দউৎসবে কেউ অংশ নিয়েছেন, কেউবা ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করেছেন। স্বৈরাচারের পতনের পরপর যেসব পত্রপত্রিকা বের হয়, সেই বিশেষ সংখ্যা, টেলিগ্রাম সংখ্যা, অভ্যুত্থান কিংবা বিজয় বুলেটিন, চিরকুট ধরনের কাগজ, এমনকি সাইক্লোস্টাইল করা ব্যঙ্গছবি, দালাল-তালিকা, এইসব হাতের কাছে পেয়েছেন।

কিন্তু ঢাকার বাইরে বিরাট যে পাঠকগোষ্ঠী, যারা তথ্যশূন্যতায় ছিলেন, বিবিসি, ভোয়া, আকাশবাণী থেকে কেবল আন্দোলন আর স্বৈরাচারের পতন-সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ কিংবা সংবাদভাষ্য শুনেছেন, তাঁদের জন্যে চোখে-দেখা কিছু টুকরো বিবরণ এখানে পরিবেশন করছি। এগুলোর কোনোটা বিজয়-সংবাদ-পরবর্তী বিশেষ বুলেটিনে (দৈনিক বা সাপ্তাহিক) ছাপা হয়েছে, কোনোটা রয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকেই, যাঁরা জানেন না, জানবার কথা নয়, তাঁরা ৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত ১০টায় টেলিভিশনের খবরে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত খবরটি শোনার পর প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। টেলিভিশন ছেড়ে তাঁরা ছুটে যান ভোয়া টিউনিং করতে, কেউ অসময়েও (তখনও সাড়ে ১০টা বাজেনি) বিবিসি শোনার জন্যে নব ঘোরাতে থাকেন। তারপর, যেভাবেই হোক, পদত্যাগের খবরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হন তাঁরা। রাজধানীর মহল্লা ও সড়কে আনন্দের হৈহল্লা শুরু হয়ে যায়। ঘর ছেড়ে বাইরে আসেন সর্বস্তরের মানুষ। পরদিন সকালে তো কথাই নেই, রাজধানীর গোটা এলাকাই হয়ে ওঠে জনসমাবেশের অতিশয় বিরাট ক্ষেত্র। ১২ হাজার মাইল রাজপথ আর অলিগলি হয় বিজয়-আনন্দ মিছিলের পথ। রাজধানীর বাইরের পাঠকগণ, আপনারা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, ৪ ডিসেম্বরের রাতে ঢাকা শহরে কী দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, কী ঘটেছে তার পরের দিনে! ঐ মুহূর্তের বিবরণ আমার কলমে দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকগুলো ঘটনা বর্ণনা করা দুষ্কর, সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে অবর্ণনীয়, এক্ষেত্রেও তা-ই বলা ছাড়া উপায় নেই।

স্বৈরাচার-বিদায়ের সংবাদ মেলে ৪ ডিসেম্বর রাত ১০টা ২১ মিনিটে। এটা টেলিভিশনে আপনারাও যাঁরা রাজধানীর বাইরে ছিলেন, জেনেছেন। কিন্তু বিদায়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে ঐদিন দুপুরে। দুপুরের পরে মহানগরীর অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, ১০/১২টি মিনিবাস চলে যাচ্ছে শহরের বাইরে, অজ্ঞাত স্থানে। বাসের ভেতর বড় বড় সুটকেস, যাত্রী হিসেবে ছিলেন অধিকাংশই চর্বিসর্বস্ব মহিলা, নাদুসনুদুস শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবতী। এরা কারা? কোথায় যাচ্ছে? বরযাত্রী? বাইরে থেকে এলো? না, ওরা ছিল কয়েকজন মন্ত্রীর পরিবার-সদস্য। পদলেহী আমলার স্ত্রী-কন্যা-পুত্র, ভাই-বোন, শ্যালক-শ্যালিকা, আত্মীয়। বিদায়ের খবর পেয়ে 'নিরাপদ স্থানে' পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাদের। অবশ্য, কিছু মন্ত্রী-আমলা পরিবার বাসা ছাড়ে রাত সাড়ে ১০টার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত, এমনকি শেষরাতেও। হাতের কাছে যা পেয়েছে, সুটকেসে যতটুকু আঁটাতে পেরেছে, তা-ই নিয়ে ছুট।

মস্তানদের, বিশেষ করে যারা সরকারের ভাড়াটে হিসেবে কাজ করেছিল, তারা ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে যায়, যে যেখানে পারে গাঢাকা দেয়, কেউ-কেউ আবার, যারা খুব মুখচেনা নয়, তারা পরদিন জনতার বিজয় মিছিলে ঢুকে পড়ে স্লোগান তোলে। যে কারণে ওরা আগেই চিহ্নিত হয়নি, সেজন্যে মনে হচ্ছে এটা খুব ক্ষতিকর হয়েছে, আগামীদিনের জন্যেও হবে।

পতনের আগে মহনগরীর রাস্তায় সেনাবাহিনী ও বিডিআর-এর বহর ছিল, কিন্তু তাদের হাতের অস্ত্র ২৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর সময়ের মতো উঁচিয়ে ধরা ছিল না। বোঝাই গাড়িগুলো সশব্দে ও দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল এদিকে থেকে ওদিকে। অধিকাংশ স্থানে পুলিশের হাতে ছিল শুধু লাঠি। মিছিলকারীদের উদ্দেশে অনেককে বলতে শুনেছি, 'ভাই, আমাদের কিছু করবেন না। দেখুন আমাদের হাতে রাইফেল নেই, শুধু লাঠি। এ দিয়ে আমরা আপনাদের কিছুই করব না।' কেউ বলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা শুধু ডিউটি করার জন্যে এখানে এসেছি, আমাদের চাকরিটা খাবেন না।' অনেক স্থানে পুলিশ এমনও বলেছে যে, 'আমরা আপনাদের ভাই, আমরা একই দেশের মানুষ।' ৪ ডিসেম্বর দুপুরে তো মতিঝিলের আল্লাওয়ালা ভবনের সামনে কিছু পুলিশকে জনতার উদ্দেশে হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি করতে দেখা গেছে। এ-সময় কয়েকটি ট্রাক সারিবদ্ধ বেষ্টনী দিয়ে জনতার রোষ থেকে ঐ ভবনটি বাঁচানো হয়। কিন্তু রাতে তা আর সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার গভীর রাতে উৎফুল্ল হাজারো জনতা ভবনটির বিভিন্ন কক্ষ থেকে আসবাবপত্র, কাগজ, এইসব বের করে সামনের রাস্তায় ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরদিন ৫ ডিসেম্বর ভবনটির ইট-পলেস্তরা পর্যন্ত খুলে নেয় মানুষ। অবশ্য লুটপাট বলতে যা বোঝায়, তেমনটি এই ভবনের ক্ষেত্রে হয়নি। আসবাবপত্র বের করবার পর দৈনিক বাংলার মোড়ে একজন যুবকের সঙ্গে দেখা হয় যে কি না ভবনটির কক্ষ থেকে নেওয়া একটি চেয়ার কাঁধে বহন করছিল। হাঁটছিল নয়, লাফাচ্ছিল সে। চেয়ারের শুধু ফ্রেমটি ছিল, বসবার পাটাতন ফাঁকা। কোনো প্রশ্ন করিনি, সে নিজেই হাসতে হাসতে বলল যা, তার অর্থ হচ্ছে, চেয়ারের ফ্রেমটি সে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে ব্যবহার করবার জন্যে নয়, স্মৃতি হিসেবে রাখবার জন্যে। ঐদিন অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, জিনিসপত্র লোকজন বাড়ি বয়ে নিয়ে যায়নি, ঘটনাস্থলেই ভেঙে ফেলেছে কিংবা পুড়িয়ে দিয়েছে। তবে বেশকিছু অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে ৬ ডিসেম্বরে, কিংবা তার পরের দিনগুলোতে। পিটিয়ে হত্যা, ছিনতাই, অগ্নিসংযোগ, গুলিবর্ষণ এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে। দৈনিক পত্রিকা সরবরাহ শুরু হওয়ায় নিশ্চয়ই সেসব আপনারা পড়েছেন!

AMARBOI.COM

৪-৫ ডিসেম্বর রাতে ও দিনে সবচেয়ে যে ব্যাপারটি অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে, তা হলো জাতীয় পতাকার সম্মিলন। ছোট, মাঝারি, বড় এবং বিশাল বিশাল আকারের পতাকা উড়ছে মহানগরীর রাস্তায়। পুরাতন নয়, নতুন পতাকা : পটভূমি গাঢ় সবুজ, সূর্যটা টকটকে লাল। ট্রাকে-বাসে-জীপে-কারে পতাকা উড়ছে। রিকশায় বা ভ্যানগাড়িতে যাচ্ছে কয়েকজন যুবক, তাদের একজনের হাতে বংশদণ্ডের মাথায় বিরাট পতাকা। সাইকেলচালক, মোটরআরোহী, এদেরও কারও কারও হাতে পতপত করে উড়ছে পতাকা। এটাকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে, মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা স্বাধীনতার চেতনাকেই ঘরের বাইরে থেকে পথে এনে সবার চোখের সামনে ওড়াচ্ছে ওরা। দীর্ঘ স্বৈরশাসন আমলে বিভিন্নভাবে যে-চেতনাটি বন্দী থেকেছে হৃদয়ে, তাই একটি বিশেষ মুহূর্তে হয়েছে প্রকাশিত এবং এই পতাকা উড়ানোর কাজটি যারা করেছে, তারা কেউ ৩০ বছর বয়সের উপরে নয়, তারা তরুণ, এই প্রজন্মের। তারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, বিজয় দেখেনি, শুধু শুনেছে। হৃদয়ে লালিত করেছে নতুন করে জন্মানো এক চেতনা। জাতির জন্যে, আগামীদিনের জন্যে এটি খুব প্রয়োজন। উড্ডীন পতাকা যেন এই সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিল যে, স্বৈরশাসন গেছে কিন্তু আছে রক্তের বিনিময়ে অর্জন করা বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই চেতনাবোধকে খুঁজে পাওয়া গেছে বিজয়-পরবর্তী জনপ্রতিক্রিয়ায়। বন্ধু আবদুল মান্নান, এখন সরকারি চাকুরে, '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, এখন চোখের রোগে ভুগছেন, তবুও যতটা দেখতে পেয়েছেন ৪ ডিসেম্বরের পরে, সেই থেকে বললেন, '৭১-এ দেশের জন্যে লড়েছি, নিজে বিজয়-আনন্দ করেছি, আর এবারে গণতন্ত্রের মুক্তির জন্যে লড়ল ছাত্র-জনতা যারা অধিকাংশই এই প্রজন্মের। এটা দেখে খুব ভালো লাগল।' মোঃ মতিয়ার রহমান, ইস্কাটন গার্ডেনে থাকেন, বললেন, এই মুক্তির সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে খাটো করে দেখা যায় না, অন্তত একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি তা দেখি না। খবরের কাগজ-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত জিল্লুর রহমান, যিনি এই প্রজন্মের প্রতিনিধি, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন, '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ বোঝার সৌভাগ্য হয়নি। ডিসেম্বরের বিজয় যে কী তা ছিল অজ্ঞাত। ৯০-র ডিসেম্বরে তা দেখলাম। অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বললেন, এই আন্দোলনে কাজ করেছে মুক্তির চেতনাবোধ যা খুব মূল্যবান এই জাতির জন্যে। তিনি বললেন, 'আমরা পুনর্জন্ম লাভ করলাম।'

খুব ছোট কিছু দৃশ্য চোখে পড়ল পতনের পরদিন বিজয়ের মিছিল ও সমাবেশে। এমনকি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার রাতেও। যেমন ঐদিন রাতে হাইকোর্টের সামনে দেখা গেল, দুজন তরুণ, কিশোর বয়সে টোকাই ছিল (এখনও বেকার), তারা রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। খালি গা তো বটেই, পরনের লুঙ্গিও খুলে রেখেছে পাশে। চারদিকে লোকজন মজমার ভিড়ের মতো করে দেখছে ঘটনা। একজন ছাত্র এসে ওদের উঠিয়ে দিল, লুঙ্গি পরিয়ে দিল আবার। কিন্তু মনের আনন্দপ্রকাশের যে টুকরো দৃশ্যটি, তা উলঙ্গ কিংবা অশ্লীল মনে হয়নি, যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছেন সোডিয়াম বাতির নিচে তাদের দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শুধু তা-ই নয়, পরদিন সন্ধ্যার পর, 'জনতার জয় সম্প্রচার কেন্দ্রে' মঞ্চের পেছনে দেখি, এক যুবতী বেশ কদিন বাদে দেখা তার যুবক বন্ধুর গণ্ডে সশব্দে চুম্বন দিল। তার আগে বিজয়ের আনন্দে একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরল এবং মুখে বিজয়সূচক শুভেচ্ছা জানালো। ঢাকার রাস্তায় পুরানা পল্টনের মোড়ে অন্য সময় হলে প্রকাশ্যে চুম্বন ঘটনাটি হতো অশ্লীল এবং জনতার হাতে অন্য ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতিভেদে তা অন্যরকম অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫ ডিসেম্বর সারাদিন ঢাকা মহানগরীর অন্যরকম রূপ। রং খেলা হয়, হয় রজনীগন্ধা বিতরণ, মিষ্টি খাওয়া। ঐদিন সকালে প্রকাশিত হয় শুধু 'সংবাদ', বিশেষ সংখ্যা হিসেবে। সংবাদের প্রধান শিরোনাম ছিল 'এরশাদের বিদায়'। ৮ কলাম জুড়ে বিরাট অক্ষরে লেখা। অনেকের হাতে 'এরশাদের বিদায়' শিরোনামটি ব্যানার হিসেবে শোভা পায়। পত্রিকাটি কেউ মাথায় বাঁধে, কেউ বুকে আঁটে। পথের ধাবমান মানুষ 'সংবাদ' হাতে তুলে ধরে একে অন্যকে দেখাতে থাকে। এমন দৃশ্য আগে কখনো চোখে পড়েনি, অন্তত একটি পত্রিকার ক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য, সংবাদ গরম পিঠের মতো ঐদিন বিক্রি হয়, অন্যান্য জাতীয় পত্রিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিগ্রাম সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা বের করে দুপুরের পরে। বাংলার বাণী তো শিরোনামে আনে লাল রং, আসলে এটি রং বদলের কিংবা রং বদলানোর একটি প্রক্রিয়া কি? শাহবাগের মোড়ে প্রশ্ন করলেন এক পাঠক। আনন্দ-নগরীতে এ প্রশ্নের জবাব আর কে দেবে?

অনেকে খুব উপভোগ করেছেন স্বৈরাচারের প্রতিকৃতি। চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছেলেরা ৩০ ফুট উঁচু ঐ ব্যঙ্গ প্রতিকৃতি (মাসকট) তৈরি করে এবং ৫ ডিসেম্বর দুপুরে নগরীর বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। 'মাসকট'-এর সাথে ছিল মাইক, একজন ব্যঙ্গ সুরে স্বৈরাচারের দেহ বর্ণনা করছিল। স্বৈরাচারের কান লম্বা, ভুঁড়ি বেঢপ ফোলা, রক্তচক্ষু, লম্বা লাল জিভ। হাতে ধরা ছুরি। এ সবই স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছে এবং সবাই আনন্দ করেছে। কিন্তু শিল্পীরা স্বৈরাচারের প্রতিকৃতির নিতম্বে ঢুকিয়ে দিয়েছে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ডাঁটার অংশ ভেতরে, মূল ফুল নিচের দিকে ঝুলে পড়ে আছে, খাড়া-সোজা লেজের মতন। আগে শুনেছি 'হাতে হেরিকেন পেছনে বাঁশ'। এখন দেখা গেল হাতে ছুরি, পাছায় রজনীগন্ধা। এটা কি বিকৃতি ছিল চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিল্পীদের? না, এটিকে মানুষ কৌতুক হিসেবে নিয়েছেন, পথের দুধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছেন, উপভোগ করেছেন। আরেকটি দল, মিছিল করে একজোড়া স্বৈরশাসককে সামনে রেখে। তারা জীবন্ত, মুখোশ-পরা, দেহে রং মাখানো। গলায় তাদের দড়ি বাঁধা, পেছন থেকে একজন টেনে রেখেছে। মিছিলটি চলছে, কাঁসার মতো করে বাজানো হচ্ছে অ্যালুমেনিয়ামের থালা। এই মিছিলটিকে স্বাগত জানায় পথের মানুষেরা।

AMARBOI.COM

৫ ডিসেম্বর দিনমান আনন্দ-মুখরিত রাজধানীতে বহু মিছিল, বহু স্লোগানধ্বনি, অনেক ছবি ছিল। ছিল বঙ্গবন্ধুর ছবি, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছবি, ছিলেন হাসিনা, খালেদা। কিন্তু ডা. মিলন মিছিলে জীবিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন কর্নেল তাহের, আসাদ, মতিউর, তাজুল, নূর হোসেন এবং অন্যান্য। কয়েকজন যুবক উদোম পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে বিভিন্ন সমাবেশে ঘুরে বেড়ায়। এক শহীদ নূর হোসেন, অনেক হয়ে নীরব সংলাপে ঘোষণা করে : মুক্তিকামী জনতার জয় হয়েছে, গণতন্ত্র ফিরে এসেছে দুয়ারে।

অনেক আনন্দের মাঝে কান্নাও ছিল। কাঁদতে দেখেছি সংবাদের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মরহুম মোজাম্মেল হোসেন মন্টুর স্ত্রী অধ্যাপিকা রুনু ভাবীকে। তাঁর দুঃখ, মন্টু, যিনি ছিলেন প্রগতিশীল আন্দোলনের নীরব কর্মী, তিনি জনতার জয় দেখে যেতে পারলেন না, তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান গত বছর ডিসেম্বরে। কান্না দেখেছি পিজি হাসপাতালের ডা. শাহানা রহমানের। তিনি ছিলেন শহীদ ডা. মিলনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি বলছিলেন, 'সেই তো গণঅভ্যুত্থান হলো, জয় হলো মানুষের, কিন্তু মিলন তা দেখে যেতে পারল না!'

(খবরের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর থেকে অনেক দূরে

রাজধানীর মানুষ স্বৈরাচার হটানোর আন্দোলন করেছে, সফল হয়েছে এবং বিজয়-আনন্দ করেছে ৪ ডিসেম্বরের রাত থেকে এ পর্যন্ত। আন্দোলন আর আনন্দ একইভাবে হয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলা-শহরে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো উপজেলা সদরে। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট, যশোর, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া; ওদিকে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফেনী, চাঁদপুর, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের ৬৪টি ছোটবড় জেলাশহরেই হয়েছে মিছিল, সভা-সমাবেশ, অবরোধ-প্রতিরোধ। তারপর, ৪ ডিসেম্বরের পর থেকে আনন্দ মিছিল বেরিয়েছে বিজয়ী মানুষের। ঢাকার মতো অত রং খেলা হয়নি, রজনীগন্ধা-বিনিময় ছিল না, ছিল না রঙিন বেলুন উড়ানো, কিন্তু উল্লাসধ্বনি ছিল, ছিল নৃত্যগীত, নেতানেত্রীর ছবি ও বহুবর্ণ ব্যানার বহন, ঢোল কাঁসার বাদ্য বাজনা, মিঠাই বিতরণ ইত্যাদি। হয়েছে বিজয়-সমাবেশ। ট্রাক, বাস, জীপ, মোটরসাইকেল ও রিকশার মিছিল বের হয় প্রায় সর্বত্রই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এইসব খবর ইতোমধ্যেই আমরা পড়েছি।

কিন্তু গ্রামের খবর কী? গ্রাম, শহর থেকে অনেক দূরে, যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেনি, কর্মহীন মানুষ, ক্ষুধা দারিদ্র্য অনাহার অর্ধাহার যাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কৃষক খাদ্য উৎপাদন করে কিন্তু নিজে থাকে উপোস, যেখানে রয়েছে বিরাট তথ্য-শূন্যতা, সেখানকার সংবাদ কী? বাংলাদেশের আদমশুমারির তালিকায় তাদের নাম আছে, নাম আছে ভোটার লিস্টে, তারা খাজনা ট্যাক্স দেয়, দেশের মোটা পরিমাণ উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে এদের অধিকাংশ জড়িত, কিন্তু তারা কীভাবে করল স্বৈরাচার উৎখাতের আন্দোলন? কখন তারা এরশাদের পদত্যাগ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কথা জানল আর কতটা কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করল? চলুন না, চলে যাই দেশের প্রত্যন্ত কোনো উপজেলা এলাকায়, যাই সেখানকার কয়েকটি গ্রামে। আন্দোলন আর অর্জিত বিজয় সম্পর্কে সেখানকার বিবরণ শুনে আসি। তবে হ্যাঁ, গ্রাম সম্পর্কে নিতান্তই যাঁরা উন্নাসিক, যাঁরা মনে করেন '৯০-এর গণআন্দোলন ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যাঁদের ধারণা, গ্রামের মানুষের তৎপরতা বা বিজয়-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় কিছু যায় আসে না, তাঁরা থাকুন। তাঁদের এ লেখা পড়বারও প্রয়োজন নেই।

ঢাকা থেকে প্রায় নব্বুই মাইল দূরে একটি উপজেলা ফরিদপুর। পাবনা শহর থেকে দূরত্ব হবে প্রায় ছাব্বিশ মাইল। এটি একটি বিলপ্রধান অঞ্চল। শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ ভূমিহীন, তারা মিশ্র পেশায় জড়িত। বেকারের সংখ্যা অনেক। যাতায়াত-ব্যবস্থা সময় ও কষ্টসাপেক্ষ। এক লাখের কিছু বেশি নরনারী শিশু বাস করে এই ফরিদপুরের গ্রামগুলোতে।

এখানে, এই উপজেলা সদরে আওয়ামী লীগের কোনো অফিস নেই, তবে সংগঠনটি কর্মতৎপরতার দিক দিয়ে শক্তিশালী। সদর-কেন্দ্র এলাকার অধিকাংশ মানুষ এই দলটির সমর্থক, গত উপজেলা নির্বাচনে প্রমাণ মিলেছে। আওয়ামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন গোলাম হোসেন গোলাপ এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছেন। অবশ্য, রাজনৈতিক চরিত্র তাঁর কী-রকম তা বোঝা গেল গণআন্দোলনের শুরুর মাস ছয়েক আগে। তাঁকে ভূতে পেল : অবসরপ্রাপ্ত মেজর মনজুর কাদেরের সঙ্গে হাত মেলালেন, উপজেলা সদরে জাতীয় পার্টির এক সমাবেশে জাতীয় পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। এখন পটপরিবর্তনের পর তিনি অবশ্য সুর পরিবর্তন করেছেন। বলে বেড়াচ্ছেন, 'আমি তো জাতীয় পার্টিতে যোগ দেবার জন্যে আবেদন করেছিলাম মাত্র, কিন্তু যোগ দিইনি। আমি আওয়ামী লীগারই আছি।' অবশ্য আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা এখন পর্যন্ত বলছেন, তাকে (গোলাপ) আর পার্টিতে নেওয়া হবে না। কেননা সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাপ যা-ই করুক, আওয়ামী লীগের সংগঠন ও জনসমর্থন খুব ভালো। গ্রামের শিকড় পর্যায়েও তাদের বেশকিছু কর্মী রয়েছে। বিএনপির একটি অফিস আছে, আছে সংগঠন এবং তৎপরতা। বাকশালের কয়েকজন তরুণ নেতাকর্মীর দেখা মেলে। জামায়াতের কাজ রয়েছে এলাকার কয়েকটি মসজিদভিত্তিক, সেখানে নিয়মিত বৈঠক হয়। উপজেলা সদরের বাজারে একটি দোতলা পাকাঘর ভাড়া করে সিপিবি অফিস খুলেছে। ঢাকায় সিপিবির কেন্দ্রীয় অফিস যেমন তিনজোটের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণমূলক 'কন্ট্রোল রুম' হয়ে উঠেছে, তেমনি এখানেও সিপিবির অফিসটি প্রগতিশীল বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সমাবেশ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে দেখলাম। অবশ্য আন্দোলনকালে নেতাকর্মী সমাবেশ তেমন ছিল না। বিভিন্ন চায়ের দোকানে কিংবা দোকানঘরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসতেন তাঁরা।

১০ অক্টোবর থেকে জাতীয় পর্যায়ে দেওয়া বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি এখানে, এই উপজেলা সদর-কেন্দ্রে পালিত হতে থাকে। হয় হরতাল, সভাসমাবেশ, মিছিল। সবটাই সফল হয়েছে বলা যাবে না, কিন্তু এই অসাফল্যের পেছনে সরকারি দলের জনপ্রিয়তা ছিল, তাও বলা যাবে না। আসলে ফরিদপুর জায়গাটি প্রত্যন্ত, যোগাযোগ-ব্যবস্থা খারাপ, রয়েছে বিরাট তথ্যশূন্যতা, কেন্দ্র পর্যায় থেকে গৃহীত ও প্রচারিত কর্মসূচিগুলো এখানে এসে পৌঁছুত কম। শেষদিকে বিশেষ করে ২৭ নভেম্বরের পর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাজধানী এমনকি পাবনা জেলা-সদরের সঙ্গে সড়ক-যোগাযোগ বন্ধ ছিল। হরতাল কিংবা কারফিউর কারণে যানবাহন চলেনি, লোকজন যাওয়া-আসা করেছে খুব কম। ঢাকার পত্রপত্রিকা আসেনি (কেননা সাংবাদিক ধর্মঘটের কারণে পত্রিকাই বেরোয়নি)। ফরিদপুরের আন্দোলন পরিচালনাকারীদের পুরোপুরিভাবে নির্ভর করতে হয়েছে বিবিসি ও ভোয়ার খবরের ওপর। স্থানীয় বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা বললেন, 'ঐ দুই সেন্টার না থাকলে তো আমরা কোনো কর্মসূচিই পালন করতে পারতাম না, এমনকি দেশের অন্যান্য এলাকার খবরাখবরও মিলত না।' ত্রিশোর্ধ্বরা বললেন, 'একাত্তরে যেমন স্বাধীন বাংলা বেতার শুনেছি, এবারের আন্দোলনে তেমনি কাজ দিয়েছে বিবিসি আর ভোয়া। অবশ্য স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতাম গোপনে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৯০-এর ডিসেম্বরে শুনেছি প্রকাশ্যে।' বনওয়ারীনগর বাজারে বিভিন্ন দোকান ঘরের সামনে সন্ধে সাড়ে সাতটায় বিবিসি শোনার জন্যে মজমার মতো ভিড় জমে যেত। ভোয়া শুনত গ্রামে গিয়ে : নিজের বাড়িতে কিংবা দেওয়ানী মাতবরের দহলিজে। মাতবরশ্রেণীর লোক, যাদের দলীয় রাজনৈতিক কোনো চরিত্র থাকে না, এবারের আন্দোলনের সময়ও ছিল না, তারাও ঐ দুই বিদেশি বেতার শুনেছে আর আন্দোলনকে সমর্থন করেছে।

ফরিদপুর উপজেলা এলাকায় ভোটারসংখ্যা প্রায় ৭৬ হাজার, এদের মধ্যে খুব জোর ৬/৭ হাজার জন এবারের বিভিন্ন আন্দোলন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। অধিকাংশ অতি দরিদ্র, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বেকার। যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে কিন্তু আয় উপার্জন করেছে সামান্য, যারা ক্ষেতমজুর, মাঝি, তাঁতশ্রমিক, হলধর, মিস্ত্রি, কুলি-পাইট, মিষ্টান্ন কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার, যারা বাস করে একেবারে গ্রামে, উপজেলা সদর-কেন্দ্রে খুব একটা আসে না, তাদের কারও কারও সমর্থন থাকলেও আন্দোলনের মূল কার্যক্রম (মিছিল সভাসমাবেশে অংশগ্রহণ ও হরতাল পালন) থেকে ছিল তারা দূরে। তারা নিরক্ষর, সে কারণে সামাজিক তথা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন। স্বৈরাচার তাদের রুগ্ণ দুর্বল করে তুলেছে, কিন্তু তারা তাকে দেখেনি।

এখানকার গ্রামের কিছু মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত-সম্পর্কিত খবর শোনে সাড়ে ১০টার বিবিসিতে। সাধ্যবান পরিবার ও উপজেলার কর্মকর্তা, যাদের বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ ও টিভি আছে, তারা (খুব জোর এক শ পরিবার), বিটিভির ইংরেজি খবরের শেষদিকে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত শোনেন, কিন্তু অধিকাংশই তা বিশ্বাস করেননি। বিবিসির শ্রোতারা পদত্যাগের খবর শোনার পর উৎফুল্ল হন বটে, কিন্তু ঢাকা বা অন্যান্য শহরের মতো আনন্দে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেননি। কেননা ফরিদপুর উপজেলার জনপদগুলোতে সাড়ে ১০টা মানে নিশুতি রাত। না হয়নি তেমন হৈহল্লা। তবে কিছু উৎসাহী নেতাকর্মী নিজ গ্রামের অপরাপর নেতাকর্মীদের বাড়িতে যায় ও বিবিসির খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।

আনন্দের ঢেউ বয় পরদিন ৫ ডিসেম্বর সকালে। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে মানুষ। আসে তারা রাস্তায়, নদী-বিল-খাল-খন্দক পেরিয়ে আসে গ্রাম থেকে উপজেলা সদর-কেন্দ্রের বাজারে। সিপিবির অফিস, যা ছিল রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের প্রধান সমাবেশ কেন্দ্র, হয়ে ওঠে সরগরম। চা মিষ্টির দোকানে ভিড় বাড়ে, মিষ্টির অর্ডার নিতে হিমশিম খায় দোকানদার এবং শোকেসে সাজানো খাবার অল্প সময়েই উবে যায়। আনন্দে উদ্বেল হয় তরুণ-যুবক শ্রেণী। আনন্দমিছিল বের করে রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা সকাল ১০টায়, অংশ নেয় খুব জোর শতিনেক মানুষ। আনন্দ মিছিল দর্শন করে দোকানদার, তাদের কর্মচারীরা, ঘাটের মাঝি, মাঝির সহকারী, জেলে, মাছ ব্যবসায়ী, দূরগ্রাম থেকে উপজেলা সদরে কাজের ধান্ধায় আসা শ্রমিক-মজুর। এদের কেউ-কেউ হাততালি দেয়, আনন্দধ্বনি করে; আবার কেউবা, যাদের সংখ্যা মোটা, তারা অবাক চোখে এই মিছিল দেখে, এর-ওর কাছ থেকে শুনে নেয় প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে দেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর পতনের খবরটি নিশ্চিত হয়ে, নিজেদের ক্ষুধা-দারিদ্র্য শোষণ-বঞ্চনার জন্যে অদৃশ্য স্বৈরাচারকে দায়ী করে, ভূতের মতো অলৌকিক এক দীর্ঘ মানুষকে চোখের সামনে ন্যাংটা নাচাতে নাচাতে ঘরে ফিরে যায় তারা একসময়।

(খবরের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর '৯০)

শুধু হাসি বিনিময়

ডিসেম্বর '৯০-এর প্রথম সপ্তাহে স্বৈরাচার উৎখাত এবং বিজয়-আনন্দ। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ শপথ নিলেন। তারপর বঙ্গভবনের দরবার হলে তিনি মিলিত হলেন বিভিন্ন গণআন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীর সাথে।

ঢাকা ছেড়েছি তখন। পত্রিকায় দেখলাম সে সমাবেশের ছবি আর খবর। শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আর বেগম খালেদা জিয়াকে এক সোফায় পাশাপাশি দেখে খুব ভালো লাগল, ভালো লাগল তাঁদের হাসি-বিনিময়ের ছবিটি। এ-সময় স্মৃতির পটে ভেসে উঠল বছর পাঁচেক আগের কিছু টুকরো ঘটনা।

AMARBOI.COM

'৮৭-এর ১০ আগস্ট। শেখ হাসিনা ওয়াজেদ উত্তরাঞ্চল সফরে বেরিয়েছেন। তাঁর জনসভাগুলোর বক্তৃতা-বিবরণ কাভার করবার জন্যে সঙ্গে আছি। ঢাকা থেকে এসেছেন বাংলার বাণীর মঞ্জুরুল ইসলাম আর এনা-র শামিম সাহেব (এখন ইউএনবিতে আছেন)।

নানান জায়গা ঘুরে আমরা এলাম বগুড়ায়। জনসভা হলো। শেখ হাসিনা শহরের এখানে-ওখানে কয়েকটা বন্যা আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করলেন। ঐ রাতে থাকলেন বগুড়া সার্কিট হাউসে। পরদিন সকালে বগুড়া থেকে যাবেন রংপুরে, তার আগে গাইবান্ধায় একটি জনসভায় বক্তৃতা করবেন, পথসভা করবেন পলাশবাড়িতে।

সকালবেলা রওনা হলাম আমরা বগুড়া থেকে সড়কপথে গাইবান্ধার উদ্দেশে। ইতোমধ্যে, শুনেছি, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উত্তরাঞ্চল সফর শুরু করে দিয়েছেন। আমরা যেদিন বগুড়া থেকে গাইবান্ধা রওনা হলাম সেদিনই সফর শেষ করে বেগম জিয়ার ঢাকায় ফেরার কথা। তিনি ঢাকা থেকে সৈয়দপুর এসেছিলেন বিমানে, কিন্তু ঢাকায় ফিরবেন সড়কপথে। পথে যেতে কয়েকটা পথসভায় বক্তৃতা করবেন।

গাইবান্ধার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে আমাদের সকালের নাস্তা করার কথা সার্কিট হাউসে। আওয়ামী লীগের বগুড়ার নেতৃবৃন্দ সেরকম ব্যবস্থা করেছেন। বলা বাহুল্য, নাস্তার মেনু খুব ভালো। কিন্তু সকালে উঠেই আমাদের খুব খিদে পেয়েছিল কেননা গতরাতে খাওয়া ভালো হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরে বিছানা ছেড়েই মঞ্জুরুল ইসলামকে বললাম, নেত্রীর উঠতে দেরি হবে, আটটার আগে নাস্তা আর গাইবান্ধা রওনা দিতে দিতে হয়ে যাবে নয়টা। অতক্ষণ দেরি আমার সম্ভব নয়, চলেন আমরা শহরে কোথাও থেকে নাস্তা করে আসি। মঞ্জু রাজি হলেন, আমরা দুজন একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে নাস্তা সেরে এলাম। সার্কিট হাউসে ফিরে এসে দেখি, শেখ হাসিনা এবং সফরসঙ্গীরা কেবলি ঘুম থেকে উঠছেন, কেউ-কেউ বাথরুমে, কেউ আবার কাপড়চোপড় পরে নাস্তার টেবিলে হাজির। দেখি বিরাট টেবিলের ওপর সাজানো আয়োজন অনেক পদের। পরোটা, রুটি, পাউরুটি, ডিম পোচ, মুরগির মাংস, কলা, ছানা, সবজি-মিষ্টান্ন। সকালবেলা নাস্তার সাথে সাধারণত দই দেওয়ার কথা নয়, তবু দেখি টেবিলে দই-এর বড় হাঁড়ি। জাতীয় নেতানেত্রীর সফরে বাইরে গেলে স্থানীয় নেতাকর্মীরা একটু বেশি বেশি খাতির-যত্ন করবেন সেটা অস্বাভাবিক নয়।

শেখ হাসিনা নাস্তা সারলেন তার কক্ষে। অন্যরা টেবিলে এলেন। খাবার পরে এটা-ওটা সাংগঠনিক আলাপ। তারপর গাইবান্ধার উদ্দেশে গাড়ির বহর ছাড়ল।

গাড়ি ছুটে চলেছে। আমি এটা-ওটা নানা কথা ভাবছি। আচ্ছা, যদি এমন হয় যে, সামনে কোনো এক জায়গায় হাসিনা আর খালেদা সামনাসামনি হয়ে গেলেন, কেমন হবে তা হলে? দুজনে কি ...। এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কেননা শেখ হাসিনা যাচ্ছেন গাইবান্ধা হয়ে রংপুর, আর অপরদিকে তিনদিনের উত্তরাঞ্চল সফরশেষে আজই তো বেগম খালেদা জিয়ার ঢাকায় ফেরার কথা এবং এই একই পথে! ভাবতে ভাবতে কী ভাবনা হয়, ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করে গলায় ঝোলাই, শার্টার স্পীড-অ্যাপারেচার এইসব ঠিকঠাক করি আন্দাজমতো। খবর অথবা ছবির ব্যাপারে আমি খুব স্বার্থপর। ঘটনাক্রমে যদি ওঁরা দুজন মুখোমুখি হয়ে যান, তা হলে যেভাবেই হোক ক্যামেরার শার্টার টিপতে হবেই। অবশ্য মনের কথা মনেই রাখি। আরেকবার ভাবি, না, আমি যা ভাবছি তেমনটি তো নাও হতে পারে। বেগম জিয়া হয়তো সৈয়দপুর থেকে বিমানযোগেই ফিরে গেলেন, কিংবা হতে পারে যে তিনি আজ সকালে রওনা না হয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবেন বিকেলে বা সন্ধ্যায়।

গাড়ি ছুটতে থাকে জোরে। বগুড়ায় দেরি হয়ে গেছে রওনা হতে হতে। শেখ হাসিনা তাড়া দিচ্ছেন তাই। পলাশবাড়িতে পথসভা, গাইবান্ধায় জনসভা এবং দুপুরের আহার, বিকেলে রংপুরে প্রোগ্রাম। দেরি করা চলবে না কোনোক্রমেই।

আমরা এসে গেছি পলাশবাড়ির প্রায় কাছাকাছি। খুবজোর ২/৩ মাইল পথ বাকি। ড্রাইভার সাহেব মুখ বিকৃত করে গাড়ি চালাচ্ছেন। কিন্তু খুব স্পীডে যাবার উপায় নেই। রাস্তা একেই সরু, তার ওপর খাদগর্ত। সামনে থেকে ধেয়ে-আসা বাস-ট্রাক ইত্যাদি সাইড দিতে হচ্ছে। ৩০ মাইলের বেশি স্পীড তোলা ঝুঁকির ব্যাপার, তবু ড্রাইভার সাহেব চলাচ্ছেন ঘণ্টায় ৪০ মাইল গতিতে। বুঝতে পারি, যে কারণেই হোক তাড়াতাড়ি যাওয়া তাঁর গরজ। ড্রাইভার সাহেব বারবার বলছেন, পলাশবাড়ি আর কতদূর?

আমি বলি : খুব বেশি নয়, এই তো সামনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বলেন, ওখানে কি ডাকবাংলো-টাংলো আছে?

আমি বলি, আছে। কিন্তু কেন?

ড্রাইভার জবাব দেন না, মুখের চামড়ায় ভাঁজ ফেলেন, বাঁকা করেন পিঠ, উত্তেজনার সাথে এগুতে থাকেন।

সামনে পলাশবাড়ি। রাস্তা এখানে বেশ সরু।

হঠাৎ। হ্যাঁ, হঠাৎ সামনে দেখি একটি পাজেরো। পাকা অথচ উঁচু-নিচু রাস্তায় দোল খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। একটু কাছাকাছি হতেই, পরিষ্কার দেখি, সামনের সিটে বসে আছেন বেগম খালেদা জিয়া। হাস্যোজ্জ্বল মুখ। উত্তেজনায় শরীর টান হয়ে যায়। হ্যাঁ, একেবারে সামনাসামনি দুটি গাড়ি, সামনাসামনি দুই নেত্রী। হায়, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী সকল মানুষ যখন চাচ্ছেন দুই নেত্রী এক হোক, একজোট হয়ে স্বৈরাচার হটানোর আন্দোলন করুক। তখন উত্তরাঞ্চলে এই বগুড়া-গাইবান্ধা সড়কের উপর পলাশবাড়ির কাছে আজ এই মুহূর্তে তারা একেবারে সামনাসামনি! পার্থক্য শুধু দুজনের গাড়ির রং আলাদা।

বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি একেবারে সামনে এসে গতি কমিয়ে ফেলে, তারপর আস্তে করে সাইডে চলে যায়। এ গাড়ি থেকে আমার মনে হয় তাঁর গাড়িটি বুঝি থেমে যাবে, খুলে যাবে দরজা, দুজন নেত্রী পথের ওপর নামবেন, আলাপ করবেন, কিংবা করবেন কুশল-শুভেচ্ছা বিনিময়। মুহূর্তে চোখের সামনে কল্পনায় দেখি দুই নেত্রী হাসি-উজ্জ্বল মুখে কথা বলছেন আর সেই দুর্লভ মুহূর্তের ছবিটি ক্যামেরায় ধরে নিয়ে আমি পেছন দিকে রওনা হয়েছি। রাশ করছি ঢাকার দিকে। 'সংবাদ'-এ লিড ছবি হবে এটি নিশ্চয়।

না, কিছুই হলো না। শেখ হাসিনার গাড়ি দাঁড়ালো না, দাঁড়াতে দাঁড়াতেও দাঁড়ালো না বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি। শুধু দুই নেত্রীর চোখাচোখি হলো, দুজনে বিনিময় করলেন শুধু হাসি। একটি লিড ছবির ধাক্কায় অন্ধ এক সাংবাদিক আমি হাতের আঙুল কামড়াতে থাকি।

বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি চলে যায় বগুড়ার দিকে। আমাদের গাড়িটি পলাশবাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। তারপর একসময় গাইবান্ধায় পৌঁছি। সেখানে এক রেস্টহাউসে নেমেই ছুটে যাই টেলিফোনের কাছে। এটা ভিআইপি রুম, এখানে শেখ হাসিনা উঠবেন। আমি তাঁর আগেই ঘরে ঢুকে পড়ি এবং ডায়াল করি ফোন। এক ঘুরানিতেই ঢাকায় সংবাদ অফিসের টেলিফোন বেজে ওঠে। তারপর আমি বগুড়া-পলাশবাড়ি সড়কের ওপর জাতীয় দুই নেত্রীর সামনাসামনি হওয়া এবং হাসি-বিনিময়ের খবরটি পাঠাতে থাকি। খবর পাঠানো হয়েছে আধাআধি, এ-সময় শেখ হাসিনা ঘরে ঢোকেন। রেস্টহাউসের সামনে নেমে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদের দেওয়া ফুল মালা ইত্যাদি নিতে নিতে যে সময়টুকু লেগেছে, সে-সময়ের মধ্যেই খবরটি অর্ধেক পাঠানো হয়ে গেছে আমার। ঘরে ঢুকেই হাসতে থাকেন শেখ হাসিনা। 'আপনি দেখি এই খবরও পাঠাচ্ছেন?'

আমি জানি যে, এই খবরটি ছোট্ট হলেও 'সংবাদ'-এ প্রথম পাতায় বক্স করে ছাপা হবে। হয়েছেও তা-ই পরদিন। খবরের শিরোনাম ছিল 'শুধু হাসি বিনিময়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বেগম খালেদা জিয়া ঢাকায় ফিরে যাবার পরদিন উত্তরাঞ্চল সফর অভিজ্ঞতার ওপর সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন শেখ হাসিনার সাথে সামনাসামনি ও হাসি-বিনিময়ের ব্যাপারটি নিয়ে। খালেদা জিয়া জবাবে বলেন, 'কতজনকে দেখেই তো আমরা হাসি। এ এমন আর কী?'

আমি জানি না বেগম জিয়া কেন এই জবাবটি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল। তবে এটা ঠিক যে, এই হাসি-বিনিময় ঘটনার মাস ২/৩ পর দুই জাতীয় নেত্রী তাঁদের একত্র আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন, শুধু তা-ই নয়, দুজনে সাক্ষাৎ করেন, সেই সাড়াজাগানো খবর ও ছবি দেশবাসীর জানা।

পরে তো জোটবদ্ধ হলেন দুই নেত্রী, আবার জোট ভাঙলেন, আবার তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হলেন স্বৈরাচার উৎখাতের আন্দোলনে, '৯০-এর অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরে। বঙ্গভবনের সমাবেশে ফের তাঁরা একই সোফায় পাশাপাশি বসলেন। কিন্তু ঐ সময়, ঐ বগুড়া-গাইবান্ধা সড়কের ওপর দুজনে যখন মুখোমুখি, তখন কেন তাঁদের গাড়ি দাঁড়ালো না? কেন নামলেন না তাঁরা? কেন কথা বললেন না? আজও এই প্রশ্ন জাগে।

AMARBOI.COM

আমার মনে হয়, আসল ব্যাপারটি ছিল অন্যখানে। প্রাকৃতিক ব্যাপার এবং এজন্যে শেখ হাসিনার গাড়ির ড্রাইভার সাহেব ...

আগেই বলেছি, ড্রাইভার সাহেব বারবার জানতে চাইছিলেন, 'পলাশবাড়ি কতদূর এবং সেখানে কোনো ডাকবাংলো আছে কি না।' অর্থাৎ ঐদিন ঐমুহূর্তে তার ভীষণ প্রয়োজন হয়েছিল বাথরুম করা। এর প্রমাণ পেয়েছি আগেই। বগুড়া থেকে আমরা যখন রওনা দিই, তার কিছু পরে অর্থাৎ শহর ছাড়িয়ে মাইল চার-পাঁচ আসবার পর গাড়ির কয়েকজন কর্মী (সবাই নন) পথে নেমে যান। তাঁরা একেকজন নামেন আর শেখ হাসিনাকে বলেন, 'আপা আপনারা যান, আমি পরে আসছি।' সেই সময়ই বুঝতে পারছিলাম, বগুড়া সার্কিট হাউসের নাস্তার কোনো আইটেমে সম্ভবত মৃদু ফুড পয়জনিং হয়েছে। তাঁরা এমন কিছু খেয়েছেন যে সামলাতে পারছিলেন না। আমরা, আমি আর মঞ্জু, যেহেতু বাইরে নাস্তা করেছি, সেহেতু রক্ষা পেয়েছি। আর শেখ হাসিনার জন্যে তাঁর ভিআইপি কক্ষে আলাদা এবং স্পেশাল ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা ছিল। তাই তিনিও সুস্থ ছিলেন।

গাড়ি হয়তো দাঁড়াতো দুজনেরই। কিন্তু সম্ভবত হয়নি এই কারণে যে, ড্রাইভার সাহেব খুব তাড়াতাড়ি পলাশবাড়ি পৌঁছুতে চাচ্ছিলেন। মানুষ তো পরিস্থিতির শিকার!

(অপ্রকাশিত। রচনাকাল ডিসেম্বর '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছি যার পতন

ফরিদপুর। না, জেলা ফরিদপুর নয়, এটি পাবনার একটি উপজেলা। ঢাকা থেকে প্রায় ৯০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, পাবনা শহর থেকে দূরত্ব প্রায় ২৬ মাইল।

আমি এখন বড়াল নদী ধরে আপনাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সে জায়গাটার নাম বনওয়ারীনগর। স্থানীয় লোকজন সহজ উচ্চারণে বলে 'বোনাইনগর'। তাড়াশের জমিদার বনওয়ারীলাল রায়বাহাদুরের জমিদারির অংশ ছিল এখানে, ছিল সুরম্য নিবাস। তারই নামানুসারে বর্তমান ফরিদপুর উপজেলার সদর-কেন্দ্রটি বনওয়ারীনগর। রাজবাড়ির ভেতরেই উপজেলা প্রশাসনের অফিস-আদালত। বিশাল এলাকাজুড়ে খণ্ড খণ্ড ভবন, তার চারিদিকে যে পরিখা রয়েছে তা নয়নাভিরাম। উপজেলা হবার পর এলাকায় মার্কারি বাতি যেমন এসেছিল তেমনি সরকারি অর্থে রানীর স্নানঘাটটি সংস্কার ও রংচঙে করা হয়েছিল। পরে, 'সংবাদ'-এ সে-সময় 'উপজেলা ও চকচকে উন্নয়ন' শিরোনামে একটি সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর ঢাকার নির্দেশে বাহুল্য মার্কারিগুলো তৎকালীন ইউএনও রাগ করে খুলে রাখেন। তবে রাণীর স্নানঘাটটি আজও রয়েছে। রয়েছে আরও নানা অপচয় অপব্যয়ের চিহ্ন-স্বাক্ষর।

বিভিন্ন পথে এই উপজেলা সদরে যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে সড়কপথে এসে নামুন বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে। বড় ব্রিজের নিচে প্রবাহিত বড়াল নদী, মাইল বারো নৌকায় যাবার পর ফরিদপুর বাজার। পাবনা শহর থেকে আতাইকুলা হয়ে ডেমরা পর্যন্ত বাস আসে, তারপর সেখান থেকে রিকশায় বা ইচ্ছে হলে নৌকায় ফরিদপুর আসা যায়। সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী রেলপথের মাঝামাঝি 'বড়ালব্রিজ' নামে একটা স্টেশন আছে, সেখানে নেমেও ৭ মাইল নদীপথ পেরিয়ে আসতে পারেন। এখানে বড়াল নদীর পাড়-ঘেঁষে রাস্তা হয়েছে, খুব ভাঙাচোরা, লক্করমার্কা বাসও চলে, বারংবার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পেতে একসময় পৌঁছুবেন প্রায় ১ লাখ মানুষের এই জনপদে। কিন্তু যে পথে আসুন, যে বাহনই নিন, সময়ক্ষেপণ আর ভোগান্তি থেকে কোনোক্রমেই রক্ষা নেই। বড়াল নদীটি পাবনার বিরাট অঞ্চলের জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা ড্রেজিং করা হয়নি, ফলে মাঘ-ফাল্গুন, চৈত্র-বৈশাখ এই চার মাস প্রায় শুকিয়ে ওঠে। বন্ধ থাকে বাঘাবাড়ি ঘাট কিংবা বড়ালব্রিজের নিচের নৌকাগুলো। মাঝি-হাইলা বেকার থাকে অধিকাংশই, কেউ-কেউ কাজ নেয় কুলি-কামলার। মাঝিদের এই দুর্দিনে মিল মমতাজদের মিনিবাস চুটিয়ে ব্যবসা করে। ভাড়া আদায় করে ইচ্ছেমতো।

মিল মমতাজ নামটি কৌতূহলের উদ্রেক করে। এ কি কণ্ঠশিল্পী পিলু মমতাজ বা ঐ ধরনের কোনো নাম নাকি? আমাদের নৌকার মাঝি জানায়, না, মিল মমতাজ তার আসল নাম নয়, নাম হলো মমতাজউদ্দিন। কিন্তু গ্রামে আরও অনেক মমতাজ থেকে পার্থক্য টানবার জন্যে এলাকাবাসী বাস মালিক মমতাজের নামের আগে মিল কথাটা জুড়ে দিয়েছে। ফরিদপুর বাজারের কাছে একটি মিল (ধানকল) রয়েছে তাঁর। এখানে, আরেকজন মমতাজের পরিচয় 'চা মমতাজ' হিসেবে। বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহুল্য তার আছে চায়ের স্টল। তা বাপু, মিল মমতাজ কেন, বাস যখন আছে, বাস মমতাজ নাম দিলেই হতো!

ঢাকা থেকে যারা ফরিদপুরে আসেন, বাঘাবাড়ি ঘাটে নামলেই তাঁদের জন্যে সুবিধে। অবশ্য বড়াল নদীতে নৌকা-চলাচলের মতো পানি থাকলে। শুকনো মৌসুমে আতাইকুলা হয়ে যাতায়াত করতে হয়।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখে বাঘাবাড়ি ঘাটে নামলাম। ঢাকায় ১২/১৩ দিন ধরে গণআন্দোলন, স্বৈরাচারের পতন আর মহানগরীতে জনতার বিজয়-উল্লাস দেখেছি, তার পর এই প্রথম শহর থেকে দূরের কোনো গ্রামে চলেছি।

নৌকা মিলল অল্পক্ষণেই। ভাড়াও সস্তা। আসলে এ পথে যাত্রীসংখ্যা কম, কিন্তু নৌকা বেশি। কোনো ফেরিঘাটের সারিবদ্ধ হোটেলগুলোর সামনে গেলে যেমন হয়, আহারের প্রয়োজন থাক বা না-থাক হোটেলের বয়-বেয়ারারা বাক্স-পেটরাসহ লোকটিকে যেমন ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে চায়, তেমনি করে প্রতিযোগিতা শুরু হলো এখানেও। শুধু মালমাত্তা নয়, পারলে তো আমাকেই পাঁজাকোলা করে নৌকার পাটাতনে ফেলে দেয়! মাঝি বলছে, 'ভাড়া যা দেন দেবেন, নৌকায় ওঠেন।'

মাথার উপর তখন প্রচণ্ড শোরগোল। আমাদের নৌকা যেখানে বাঁধা, অর্থাৎ মূল ঘাট, তার ওপরে বড়াল নদীর যে পাড়, সেখানে একদল কিশোর একটি কুকুরকে নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে। লেজে বাঁধা দড়ি, তার অপরপ্রান্তে বাঁধা বাঁধের কংক্রিট বোল্ডারের একটি ভগ্নাংশ। কুকুরটি পালাতেও পারছে না, শুধু মার খাচ্ছে আর কাঁই কাঁই করে চিৎকার করছে। বালক-বালিকারা চেঁচাচ্ছে আরও জোরে। নদীতীরবর্তী গ্রামের বাসাবাড়ি থেকে আরসব কুকুরেরা বেরিয়ে এসে 'ঘর কা কুত্তা, গর্জন বেশি' এই কথাটা প্রমাণ করার জন্যে হোক কিংবা পিটুনি থামানোর আর্জি পাগলপারা কিশোরদের উদ্দেশে নিবেদনের প্রচেষ্টায় হোক, খুব ঘেউঘেউ করছে।

কী কারণে কুকুরটাকে মারে?

প্রশ্ন যেন লুফে নেয় নৌকার 'হাইলা' (যে হাল ধরে থাকে) হানিফ। সে জানায়, কুকুরটি নাকি পাগলা এবং কদিন ধরে গ্রামবাসীদের খুব জ্বালাচ্ছিল। আর আজ সেটি ধরতে পেরে ছেলেমেয়েরা তাদের খায়েশ মেটাচ্ছে। হানিফ তার ছত্রাকভরা দাঁত বিকশিত করে যা জানালো তাতে বিস্মিত শুধু নয়, কুকুরটাকে একনজর দেখার উদ্দেশ্যে নদীর পাড়ে উঠার তাগিদ অনুভব করলাম। ছেলেমেয়েরা একখণ্ড পিচবোর্ডের গায়ে একজনের নাম লিখে পাগলা কুকুরটির গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। চার অক্ষরে যার নাম লিখেছে, তার পতন নিজেই দেখে এসেছি ৪ ডিসেম্বর রাতে।

এটা নিছক অবুঝ শিশু-কিশোরদের আনন্দ-উল্লাস। অথবা যে পাগলা কুকুরের জ্বালাতনে তারা ঘর থেকে বেরুতে পারত না, তাকে বাগে পেয়ে চরম শাস্তিপ্রদান, নয়তোবা হতে পারে প্রতিশোধের স্পৃহা। কিন্তু কুকুরটির গলায় পিচবোর্ডটি বাঁধল কে? তার আগে স্বৈরশাসকের নাম লিখল কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় ৪ ডিসেম্বরের বিজয়-উল্লসিত রাত দেখেছি। পরদিন হাজারো মিছিল আর সমাবেশে ছিল যেমন জাতীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন; ছিল বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের, মতিউর থেকে নূর হোসেন আর ডা. মিলনের ছবি; তেমনি ছিল স্বৈরাচারের বহু ব্যঙ্গচিত্র, ব্যঙ্গ প্রতিকৃতি, মাসকট। জুতোপেটা করা হয়েছে এরশাদের ছবিতে। কিন্তু সেই মহানগরী থেকে অনেক দূরে, এ বড়াল-তীরবর্তী গ্রামের মাটিতে, এতদিন যারা শুধু শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে প্রতিবাদহীন, তারা খোদ স্বৈরশাসককে হাতের মুঠোয় না পেয়ে এ কী কাণ্ড করছে? কত ক্ষিপ্ত হবার পর এইসব করে মানুষ?

ভট ভট শব্দে শ্যালোর নৌকা ছাড়ে। সন্ধ্যার আগে উপজেলা সদরে পৌঁছানো চাই। আঁধার নামলে নৌকা চালানো দুষ্কর : পেতে রাখা জালের খুঁটির সাথে ধাক্কা খায়।

নৌকা এগুচ্ছে। পেছন ফিরে দেখি, কী অবাক, পাগলা কুকুরটাকে ওরা এখনও ছাড়েনি। সামনে ও পেছনের পায়ে আলাদা আলাদা দড়ি বেঁধে দুদিক থেকে দুজন যুবক চ্যাংদোলা করে নদীর একেবারে তীরে নিয়ে এলো কুকুরটিকে, তারপর দোলাতে দোলাতে ছুড়ে ফেলল পানিতে। দূর থেকে দেখে মনে হলো, স্লো-মোশন ছবির ভঙ্গিতে কুকুরটি বড়ালের বুকে পতিত হলো, কিছু পানি ছলকে উঠল, তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। তীরে ছেলেমেয়েরা লাফাচ্ছে।

আমাদের নৌকা তখন তরতরিয়ে এগুচ্ছে বিকেলের চড়া-প্রখর সূর্যের দিকে ...।

AMARBOI.COM

(খবরের কাগজ, ১০ জানুয়ারি '৯১)

বড়াল ধরে চলেছি—

বাঘাবাড়ি থেকে বড়াল ধরে চলেছি। 'শ্যালোর নৌকা'র একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে সামনাসামনি কাটিয়ে যাচ্ছে অন্য নৌকা, পানিতে ঢেউ উঠছে, আমরা দুলছি। কথা হচ্ছে মাঝি ও হাইলাদের সাথে।

চোখের সামনে বিকেলের সূর্য, ডানে-বাঁয়ে অতিকায় সিসার বুলেটের মতো পড়ে আছে দুধের কনটেইনার। নদীতীরবর্তী এলাকার গোয়াল যারা, তারা দুধভর্তি এইসব পাত্র রেখে গেছে পাড়ের ঢালে, বাঘাবাড়ি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র থেকে নৌকা এসে নিয়ে যাবে এইসব তাদের ফ্যাক্টরিতে। হাইলারা বলল, যারা বাড়িতে বাড়িতে গাভী পোষে কিংবা বাথানের মালিক, তারা পাত্রগুলো রেখে গেছে দুপুরের আগে, কিন্তু ফ্যাক্টরি থেকে নৌকা আসবে সন্ধ্যার পর। বুঝি না এই দেরির কারণ। দেরি হলে দুধ কি নষ্ট হয়ে যায় না? বনওয়ারীনগর থেকে ফেরার পথে আসতে হবে বাঘাবাড়ি ফ্যাক্টরিতে। ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করা দরকার। এলাকায় প্রচুর গাভী, দুধও মেলে প্রচুর, তবু প্রতিবছর বাঘাবাড়ি দুধ ফ্যাক্টরি লোকসান গোনে লাখ লাখ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকা এগুচ্ছে। আলাপ এটা-ওটা। তারই মাঝে লক্ষ করি গরুবোঝাই নৌকা আসছে সামনে থেকে। খুব বড় বড় আকারের গরু, অধিকাংশই হালের বলদ, কী তেজি দেখতে, তেল যেন চুয়ে পড়ছে চামড়া থেকে। বোঝা যায় এগুলো এ এলাকার গরু নয়।

তবু হাইলাদের জিজ্ঞেস করি। কোত্থেকে এসব গরু আসছে জানি না বুঝতে পেরে ওরা বিস্মিত হয়। ছার, এ তো ইন্ডিয়ান গরু। এই নদী ধরে রোজই আসছে। শয়ে শয়ে। মূলত এই নদীপথে গরুগুলো আসে রাজশাহীর বিভিন্ন সীমান্ত পেরিয়ে, চোরাচালান হয়ে। না, চোরাচালান বলা বোধহয় ঠিক হবে না। কেননা এখন কোনোরকম 'লুকাছাপা' কিংবা গোপন পথ ধরে নয়, রাতের অন্ধকারে নয়, অন্যান্য মালামালের পাশাপাশি প্রকাশ্যে আসে গরু। বাঘাবাড়ি ঘাট থেকে সড়কপথে চলে যায় ঢাকায়। সেখান থেকে বিভিন্ন এলাকায়।

পাবনার এই নদীপথে যে চোরাচালানির মালামাল আসে, আগে জানা ছিল না। গরু-বোঝাই নৌকার কয়েকটা ছবি তুলি। ঢাকা ফিরে এ নিয়ে হয়তো লেখা যাবে। এইসময় মনে পড়ে আমাদের সম্পাদক আহমদুল কবির সাহেবের কথা। কিছুদিন আগে এনএপি'র (তখনও গণতন্ত্রী পার্টি হয়নি) কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে তিনি সফর করে গেছেন উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা। তিনি বেশ কয়েকটি সুধী সমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন। বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রতিটি স্থানেই তিনি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন, বলেছেন চোরাচালান সম্পর্কে। তাঁর কথা ছিল 'দেশের অর্থনীতি আজ চোরাচালান-নির্ভর হয়ে পড়েছে।' সমাবেশগুলোতে তিনি সংবাদে প্রকাশিত 'চিনি ট্রেনে সফর' উপসম্পাদকীয়টির প্রসঙ্গ টেনেছেন আমার নাম উচ্চারণ করে। অর্থাৎ বুঝতে পেরেছি এই লেখাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে। পরে, এর কিছুদিন পরে, যশোর সীমান্ত-এলাকার চোরাচালান পরিস্থিতি-সম্পর্কিত সচিত্র প্রতিবেদন যখন লিখি আমি আর রুকনউদ্দৌলাহ, তিনি তা 'কোট' করে বক্তৃতা করেছেন মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গল এলাকার সুধী সমাবেশে। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু বক্তৃতার টেপ শোনালেন মৌলভীবাজারের সাংবাদিক-বন্ধু আবদুস সালাম। তাতেও বোঝা গেল কবির সাহেব খুশি হয়েছেন ঐ সচিত্র প্রতিবেদনে। বড়াল নদী ধরে যেতে যেতে ভাবতে থাকি সেই বক্তৃতার কথা, আর ভাবি এখানকার গরু চোরাচালান-সম্পর্কিত আরেকটি প্রতিবেদন লিখলেও হয়তো তিনি খুশি হবেন। আসলে, একজন সাংবাদিকের কাজে পত্রিকার সম্পাদক সাহেব যদি খুশি থাকেন, তা হলে তা জানতে পারলে কার না ভালো লাগে?

ছবি তুলি। গরু বহনকারী নৌকার মাঝি-পাইট হাসে। কী যেন বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। তবে আতঙ্ক লক্ষ করি, যারা নৌকায় বসে আছে পাচারকারী কিংবা পাচারকারীর সহকারী হিসেবে। ওরা কী বুঝতে পারে বুঝি না, তবে ক্যামেরা চোখে তুললে হাত দিয়ে মুখ ঢাকে ওরা। কেউ-কেউ মুখ লুকায় গরুর পেট-পাঁজরের ওপাশে। নৌকা দূরে চলে যাবার পর উঁকি দেয় তারা। গরুবোঝাই একটা নৌকায় দেখি খাকি পোশাক। প্রথমে মনে হয়েছিল বিডিআর বুঝি, কিন্তু না, পুলিশ। রীতিমতো 'প্রটেকশন' দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চোরাচালানের গরুবোঝাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকা। পুলিশটি ক্যামেরা দেখে একটি বলদের মাথার ওপাশে ঘাপটি মেরে থাকে কিছুক্ষণ। শ্যালোর ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলে যায় দূরে। দেখি, দূরে গিয়ে আবার মাথা বের করেছে পুলিশটি। দাঁত বের করে হাসছে তা এতদূর থেকেও বোঝা যায়। আমার ক্যামেরায় টেলিলেন্স নেই, অত দূরের ছবি আসবে না, আর প্রয়োজনও নেই। তবু পুলিশটির দাঁত বের করা দেখে আমিও দুষ্টুমি করি, ক্যামেরাটা তুলে ধরি চোখের সামনে। ভঙ্গি করি ছবি তোলার। পুলিশটি আবার হুট করে মাথা আড়াল করে। যেন শিশু এক, লুকোচুরি খেলছে। এ দৃশ্যটি দেখে আমার নৌকার হাইলারা মজা পায়। একজন প্রশ্ন করে, 'এই ফটোক্ কী করবেন ছার?' আমি তাকে আমার পরিচয় দিই, আমার পেশার কথা বলি। সে পত্রিকা চেনে, বনওয়ারীনগর বাজারের বিভিন্ন দোকানে বেড়ায় সাঁটানো দেখেছে, দেখেছে ডাল লবণ চিনি মশলার *ঠোঙা* হিসেবে। কিন্তু 'সাংবাদিক' কী তা জানে না, বোঝে না। আমি তাকে সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে ঘটনা ঘটে সেসব পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই, ছাপা হয়। তবু বোঝে না সে। নতুন পেশার কথা শুনে অবাক চোখে একটু একটু মাথা দোলায় শুধু।

সামনে ডেমরা বাজার। দুটি ডেমরা এখানে, একটা নাক ডেমরা, অপরটি বড় ডেমরা। বড় ডেমরায় আছে বাজার। চোখে পড়ে নদীর তীরেই একটা লাইব্রেরি, চায়ের দোকান, ধানকল, গুদামঘর। গুদাম থেকে কিছু খালি ড্রাম বের করছে একদল কুলি। গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে ফেলছে। ড্রাম তোলা হচ্ছে নৌকায়। কে জানে কোথায় যাবে!

একটু চা খেতে পারলে ভালো হতো। মাঝিকে নৌকা ভিড়াতে বলি। ক্রমশ নিকটবর্তী হয় ডেমরা বাজারের ঘাট। এ-সময় দেখি, একজন নেমে আসছে তীর থেকে নিচের দিকে, ঢাল বেয়ে। মামুনুর রশীদের ইবলিশ নাটকের সেই মেম্বরের মতো বেশভূষা। গোড়ালির ওপর তোলা নতুন চেকলুঙ্গি, পায়ে জুতা, সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় মাফলার ঝোলানো, এই বিকেলেও হাতে বড় সাইজের একটা টর্চলাইট।

কোথায় যাবে এই নৌকা? আমাদের মাঝিকে জিজ্ঞেস করে। 'ছার যাবেন বোনাইনগর।' মাঝি জবাব দেয়। লোকটি প্রায় লাফিয়ে নৌকায় ওঠে, ছৈ-এর ভেতর অনুসন্ধানী দৃষ্টি তার। মাথা নিচু করে দেখে পাটাতনের নিচে। লোকটি কিছু খুঁজছে বুঝতে পারি, কিন্তু কী খুঁজছে! মাঝি আমার কাছাকাছি সরে এসে নিম্নকণ্ঠে বলে, উনি খুঁজছেন নৌকায় চোরাচালানের কোনো মালামাল আছে কি না। লোকটি পুলিশের দালাল। প্রতিটি নৌকা এভাবে সার্চ করে। কিছু পেলেই নিকটবর্তী ফাঁড়িতে খবর দেয়। পুলিশ আসে এবং পয়সা আদায় করে। কিন্তু যারা এই পথের নিয়মিত যাত্রী এবং প্রকৃতপক্ষেই চোরাচালানকারী, যারা এই দালালটিকে চেনে, তাদের জন্যে আর ফাঁড়িতে খবর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কী ধরনের মাল, মালের পরিমাণ কত, তারই ভিত্তিতে রফা হয়ে যায়।

একটা লোক, বলা নেই কওয়া নেই আরেকজনের নৌকায় উঠে মাল খুঁজছে। বিরক্ত বোধ করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: কী খোঁজেন ভাই?

লোকটি জবাব দেয় না বরং পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি যাবেন কই? অত্যন্ত কর্কশ তার কণ্ঠ।

আমার মেজাজ খিঁচিয়ে ওঠে। বলি, আমি যাব ভাই ইন্ডিয়া।

লোকটি জবাব শুনে মুখ তুলে তাকায়। আবার বলি, এখন নৌকায় খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই। ফাঁকা নৌকা। কেবল ইন্ডিয়া যাচ্ছি মাল আনতে। মাল নিয়ে যাবার পথে আপনার ইয়েটা দিয়ে যাব। আপনি ঘাটে থাইকেন।

কী বোঝে, বুঝি না। তবে লোকটি নৌকা থেকে নিচে নামে এবং নিজের সাথে কিছু বলতে বলতে ঢাল বেয়ে উপরে ওঠে। এখানে দেখি, একটি চায়ের দোকানের আড়ালে বসে-থাকা এক পুলিশ, বেরিয়ে আসে। কী যেন কথা হয় দালালটির সঙ্গে। তারপর বিরস বদনে দুজনেই একটি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে।

ইতোমধ্যে চা এসে গেছে। চুমুক দিই। আর ভাবতে থাকি, দালাল-টাউট ব্যক্তিরা গ্রামের একেবারে শিকড় পর্যায় পর্যন্ত কীভাবে ছড়িয়ে গেছে!

(অপ্রকাশিত। ১০ ডিসেম্বর '৯০।)

AMARBOI.COM

বিরাট তথ্যশূন্যতায়—

অনেক বছর বাদে বনওয়ারীনগর গিয়ে দেখি, উপজেলার কল্যাণে অবকাঠামোগত বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু হয়নি সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার কোনো উন্নয়ন।

রয়েছে বিরাট তথ্যশূন্যতা। ঢাকা থেকে বনওয়ারীনগরের দূরত্ব মাত্র নব্বই মাইল, বাঘাবাড়ি ঘাটে নেমে যন্ত্রচালিত নৌকায় এখানে আসতে লাগে আড়াই তিন ঘণ্টা। প্রায় ১২ মাইল পথ। ঢাকার দৈনিক পত্রিকা পৌঁছায় দুপুর ২টার মধ্যে। আছে এলাকায় শখানেক টেলিভিশন সেট, আছে অসংখ্য রেডিও ট্রানজিস্টর। তবু এলাকার অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে যারা উদয়াস্ত কায়িক শ্রম দেয়, আয়-উপার্জন করে অল্প, সংসারের জোয়াল টানতে হিমশিম, তারা দেশ-দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে না-ঘটছে জানে না, খবর রাখে না, এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহীও নয়।

যেমন, '৯০-এর ডিসেম্বরে, ১০ তারিখ বিকেলে, ঢাকা থেকে বাঘাবাড়ি ঘাট নেমে যে-নৌকাটি পেলাম, তার এক হাইলার নাম হানিফ। আলাপ প্রসঙ্গে হানিফ জানালো, সে শুনেছে, ঢাকায় নাকি গত কয়েকদিনে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। আন্দোলন, গণআন্দোলন, এইসব বিষয় বোঝে না হানিফ, এ ব্যাপারে কেউ তাকে বলেনি। তবে শুনেছে, গণআন্দোলন নয়, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল মারামারি হয়েছে আর 'ইস্‌সাদ' দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া শুধু নয়, এইরকম নানান গুলগুজব তো ঢাকাতেও ছিল। তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ নব্বই মাইল দূরের জনপদে এসে পৌঁছুবে, তাতে আর অবাক কী? তবে বিস্মিত হলাম এ-সময় যে, যখন হানিফ বলল, তার কথিত 'ইস্‌সাদ' নানান কুকর্ম করে পালিয়ে যাওয়ার পর দেশের ক্ষমতা নিয়েছে নাকি তারই এক 'ভাগিনা'। আমি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করার চেষ্টা করি, জানাই যে এরশাদের কোনো আত্মীয়স্বজন নয়, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ, তখন সে 'ও আচ্ছা' বলে তা বিশ্বাস করে, কিন্তু অন্য কোনোরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় না। বরং সে প্রায়-নিভে-যাওয়া বিড়ির শেষাংশ বড়ালে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং বৈঠা ধরে থির বসে থাকে।

আমি তো আলাপ বাড়াতে চাই। হাতে সময় আছে বেশ, দ্বিতীয়ত গণতন্ত্রের বিজয়-পরবর্তী জনপ্রতিক্রিয়া জানতে চাই। রাজনীতি বলুন আর আন্দোলন বলুন, প্রতিক্রিয়া তো ব্যক্ত করেন খ্যাতিমানগণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা শহুরে। কিন্তু যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাস গ্রামে, যাঁরা আদমশুমারি ও ভোটার তালিকাভুক্ত, তাঁরা কি সামাজিকভাবে রাখেন কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার অধিকার? তা কি তাঁদের দেওয়া হয়?

এটা-ওটা আলাপ। হানিফ নিস্পৃহ। কিন্তু সে ঘনঘন তাকাতে থাকে হাতের সিগারেটটির দিকে।

তারপর, একসময়, যখন আগুন ফিল্টারের কাছাকাছি, হানিফ আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্ররকম হাসে। কথা বলে না সে, কিন্তু চোখেমুখে এমন একটা ইশারা করে, এমনভাবে সিগারেটের মুড়োটি দেখায়, তাতে বোঝা যায় সে কী চায়। হাত বাড়িয়ে দিই। খুব খুশি। খুবসে টানতে থাকে।

হানিফ, তিন মাস পর ভোট হবে। শুনেছ সে-খবর?

আমি আলাপে ফিরে যেতে চাই। লক্ষ করি ভোটের কথায় তার উৎসাহ আছে। পরে বুঝি, না, নিজে ভোট দেবে বলে নয়, ভোটের সময় কিছু-একটা কাজ জুটবে বলে তার কাছে এটা বিরাট এক সুখবর। এই বড়াল নদী শুকিয়ে যাবে মাসখানেক বাদে, তখন বাঘাবাড়ি-বনওয়ারীনগর রুটে নৌকা চলবে না। হানিফ শুধু নয়, আরও বহু মাঝি ও হাইলাকে বেকার থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে, হানিফের ভাষায়, 'এলেকশান' হলে তো খুব ভালো কথা। ... বেকারত্ব যেখানে ছিল নিশ্চিত, শুকনোর সময় খাবে কী সে চিন্তা, সে-মুহূর্তে নির্বাচন-সম্পর্কিত খবরটি শুনে সে দাঁত বের করে হাসে, অস্পষ্টকণ্ঠে কিছু বলে, কিন্তু শ্যালো-নৌকার ভট্ ভট্ শব্দে তা বোঝা যায় না। এ-সময়, লক্ষ করি, কর্মপ্রাপ্তির উত্তেজনা কিংবা হতে পারে সিগারেটের অতি ক্ষুদ্র অংশটুকু তার পূর্বের নেশার জন্য যথেষ্ট হয়নি বলেই হানিফ এবার নিজের লুঙ্গির কোঁচড় থেকে একটা বিড়ি বের করে এবং আমার কাছ থেকে দিয়াশলাই চেয়ে নিয়ে ধরায়। বলে, 'ছার, আপনাদের এই সিগারেটগুলান ভালো না, ঘাসের মতোন মনে হয়।'

আলাপ করি আরেকজন হাইলার সাথে। সেও দেখি দেশ-দুনিয়ার খবর তেমন রাখে না। অবাক লাগে, মধ্যপ্রাচ্য সংকট-সম্পর্কিত কোনো কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কারভাবে জানে না, শোনেনি। একদিন মালিকের হয়ে নৌকার ইঞ্জিনের জন্যে তেল কিনতে গেলে ঘাটের তেল-বিক্রেতা আগের চেয়ে অনেক বেশি দাম হাঁকে। কারণ জানতে চায় হাইলা। তাকে বলা হয়, 'কোথায় নাকি খুব যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আর এইজন্য তেলের দাম বেড়ে যাচ্ছে।' কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে, কার কার যুদ্ধ হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এইসব কোনো প্রশ্নই সে করেনি। নিজের জীবনযুদ্ধ নিয়ে খুব সে ব্যস্ত। সারাদিনে নৌকার যাত্রী জুটবে কি না, জুটলে পয়সা পাবে কি না, পয়সা পেলে নৌকার মালিক তার দৈনিক মজুরিটি ঠিকঠাকমতো পরিশোধ করবে কি না, সেই টাকাতে আটা আর গুড় কেনা যাবে কি না, এইসব ভাবনাচিন্তাতেই দিন চলে যায়। রাতে বাড়িতে ফিরে স্ত্রী আর একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার-যুদ্ধ। এক সের আটার রুটি ছয়জনে ভাগ করে খাওয়া। গুড় হয় এক চিমটি করে, নতুবা স্রেফ লবণ।

মধ্যপ্রাচ্য সংকট দূরে থাক, নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের চার তারিখ পর্যন্ত কী ঘটেছে ঢাকায়, কিংবা দেশের অন্যান্য স্থানে, এ হাইলাটি জানে না। জানে না ৪ ডিসেম্বর-পরবর্তী বিজয়ের কোনো সংবাদ। হানিফের মতো সেও শুধু শুনেছে ঢাকায় খুব গোলমাল হয়েছে। ঢাকা-বগুড়া সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় কয়েকদিন বাঘাবাড়ি-বনওয়ারীনগর নৌপথে যাত্রী হয়নি। বেকার থাকে এরা সবাই। কারণ খুঁজতে গিয়ে পেয়েছিল 'গোলমালের' খবর।

আরেকজন হাইলা, সে স্বৈরশাসনের পতনের খবর এইভাবে শুনেছে যে, 'পেরচিডেন'-কে গদি থেকে কারা যেন লাথি দিয়া 'ফালায়া দিছে'। আর এখন দেশ চালাচ্ছে হাসিনা-খালেদা।

তার ভুল ভেঙে দিই। 'অ, তাই নাকি ছার' বলে বিস্মিত হয়, কথা বিশ্বাসও করে। এ-সময় জিজ্ঞেস করি, হাসিনা কে, চেনো? খালেদা জিয়াকে?

না, হাসিনা-খালেদা দুজনের কাউকে সে চোখে দেখেনি। তবে বোনাইনগর বাজারে এক দোকানের বেড়ায় সাঁটানো খবরের কাগজের পাতায় দেখেছে দু জনেরই ছবি। হাসিনা হইল এই এইরকম শুকনা পাতলা, আর খালেদা হইল চোখেত্ চশমা দেওয়া। বলে সে।

বিবরণে গোলমাল কিছুটা থাকলেও হাইলাটি জানে যে, হাসিনা হলেন 'মজিবরের (শেখ মুজিবর রহমান) বেটি' আর খালেদা জিয়া হলেন 'জিয়া'র রহমানের (জিয়াউর রহমান) বিবি'। জিয়ার রহমানের ধানের শীর্ষ মার্কা খতম করে ইস্সাদ গদিতে আসে। আর তখন থেকে জিয়ার বিবি 'পলিটিচ্' করে বেড়ায়।

তথ্য শূন্যতায় হাবুডুবু এই খেটে-খাওয়া মানুষগুলোর কাছ থেকে 'পলিটিচ' উচ্চারণ শুনে বেশ ভালো লাগে। আমার কাছাকাছি, নৌকার হাল-ধরা এইসব যুবকদের মাথা ঝাঁকানি, হাসি, উপমা-বর্ণনা, এইসব দেখেশুনে মনে হয়, এরা একেকজন যেন স্বপ্নের মানুষ, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ।

(অপ্রকাশিত। রচনাকাল : ডিসেম্বর '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই এক কিশোর—

ফরিদপুর উপজেলায় পৌঁছুবার পর, আমার নিবাসের আশপাশ থেকে শুঁটকি মাছের কড়া গন্ধ পেলাম। শুনলাম, হাশিমাবাদ গ্রামের একধারে রাস্তার ওপর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুঁটকি তৈরি হয়। সাড়ে সাত বছর আগে সর্বশেষ যখন এ-গ্রামে এসেছিলাম তখন এমনটি ছিল না। জায়গাটি ছিল বিলের মতো, এদিকে-ওদিক বহু 'খরা'। বিশাল বিশাল টানা-জাল দিনের বেলা প্রার্থনার উঁচিয়ে-ধরা হাতের মতো, আর রাতে সেগুলোতে মাছ ধরা হতো। বিলের বিখ্যাত পাবদা দেখতে যেন রুপালি ছুরি, আরও নানান মাছ : রুই, কাতলা, বোয়াল, টেংরা, সরপুঁটি, এখান থেকে ফড়িয়া-মহাজনের হাত ঘুরে চলে যেত বড়ালব্রিজ ভাঙ্গুড়ায়। সেখান থেকে ঈশ্বরদী হয়ে রাজশাহীতে, কিংবা উল্লাপাড়া হয়ে ঢাকায়। সড়কপথে মাছ যেত বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর শহরে। যারা জেলে, এখানে বলে হলধর, তারা মাছ নিয়ে সরাসরি যেতে পারত না শহরের বাজারে বেচতে, এমনকি বড়ালব্রিজ বাজারেও নয়। একেই পরিবহণ ব্যয় বেশি, তার ওপর দেশি নৌকায় করে যেতে-আসতে দিন কাবার। ফলে মাছ তারা বেচত নিজের এলাকাতেই, বলা বাহুল্য খুব কম দামে। মাছ ধরার মতো পরিশ্রমী মানুষগুলো নয়, মোটা মুনাফা পকেটে তুলত পানি ও জালের সাথে সম্পর্কহীন কিছু ফড়িয়া আর মহাজন। দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে, মাছ শুধু নয়, অন্যান্য কৃষিপণ্য, এমনকি দুধ, ডিম, মুরগি এইসব ক্ষেত্রেও ঘটত একই ব্যাপার। ফসল যদি উৎপাদিত হয় বেশি, যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা খারাপ থাকে, তা হলে তো ক্ষুদ্র কৃষকেরা দারুণ মার খায়।

www.amarboi.com

এই পাবনা জেলারই একটি উপজেলা সাঁথিয়ায় যে পটল উপন্ন হয়, তা নিয়ে মূল্য-বঞ্চনার ঘটনা ঘটে প্রতি মৌসুমেই। পটলের ভর-মৌসুমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের বাজারে পটল যখন ছয়-সাত টাকা সের, তখন সাঁথিয়ার গ্রামগুলোতে পানির দামে তা বিক্রি করতে হয় কৃষকদের। খুব জোর এক টাকা সের। নাটোর এলাকায় উৎপাদিত তরমুজের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। উৎপন্ন এলাকায় যখন তরমুজের সের পঁচিশ পয়সা থেকে পঞ্চাশ পয়সা, শহর এলাকায় চালান যাবার পর তা-ই বিক্রি হয় দুই টাকা থেকে আড়াই টাকায়। মাঝখানে বিরাট অঙ্কের যে অংশটি, তা চলে যায় ব্যবসায়ীদের হাতে। উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সাথে তারা জড়িত নয়, শুধু টাকা খাটায়, দালাল-ফড়িয়া নিয়োগ করে, আর শহরের গদিতে বসে মোটা মুনাফা গোনে। বাংলাদেশের এইরকম 'কৃষি উৎপাদন ও বাজারব্যবস্থা' নিয়ে কত কত লিখেছি, কাজ হয়েছে কি কিছু?

কারা কিংবা কোন্ সমাজব্যবস্থা সর্বত্র সুন্দর একটি বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে? কবে থেকে প্রকৃত উৎপাদনকারীরা পাবে ফসলের ন্যায্যমূল্য?

পরদিন সকালে হাশিমাবাদ গ্রাম থেকে বের হই। আগে নাম ছিল খাগোড়বাড়িয়া, পরে কবি মরহুম আবুল হাশিম-এর নামানুসারে হাশিমাবাদ। কবি আবুল হাশিম হলেন বিবিসিখ্যাত (এখন রয়টার-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি) আতিকুল আলমের পিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবাস থেকে নামতেই সরু খাল। এখন প্রায় ভরাট হয়ে গিয়েছে। খালের উপর দিয়েই হয়েছে বড়-প্রশস্ত রাস্তা। কয়েক পা হেঁটে আসতেই দেখি, উপজেলা সদর-কেন্দ্র সংযোগকারী অপর একটি উঁচু সড়কের ধারে সারি সারি ঝোলানো কাঁচা কিংবা প্রায়-শুকনো মাছ। গ্রামের বিয়েবাড়ি কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে সরু সুতলিতে রঙিন কাগজের ত্রিকোণ পতাকা যেমন টানা-টানা টাঙানো হয়, দূর থেকে শুঁটকির সারি তেমনি দেখতে লাগে। ঝোলানো মাছে ভনভন করছে মাছি, আর, একটি উলঙ্গ কিশোর পাটখড়ি হাতে সেই মাছি তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। উলঙ্গ বালক পাটখড়িটি হাতে একবার এদিকে আসে, একবার ওদিকে যায়, সর্বাঙ্গে লাফায়। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে কিংবা হতে পারে মাছি তাড়ানোর মতো বিরক্তির কাজটি থেকে ইস্তফা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে হঠাৎ হাতের পাটখড়িটি বর্শা ছোড়ার মতো করে দূরে ফেলে দেয় এবং নিজে ধুলোর ওপর বসে পড়ে। রাস্তার ঢালুতে বসে হালকা প্রাকৃতিক কার্য সম্পন্ন করছিল এক যুবক, সে উঠে এসে কিশোরটির পেছনে কষে লাথি মারে, কঁকিয়ে ওঠে ছেলেটি এবং উবু হয়ে পড়ে। যুবকটি স্থানীয় ভাষায় কিছু গালাগালি দেয়, তার অংশবিশেষের মর্মার্থ হলো, মাছি তাড়ানো ছেড়ে এভাবে বসে থাকলে ভাত তো আজ জুটবেই না, বরং আরেকটি লাথি মেরে তাকে ঢুকিয়ে দেবে তার মায়ের গর্ভে।

পুনরায় লাথির ভয়ে, কিংবা মায়ের জঠরে ফিরে যাবার আতঙ্কে কিশোরটি উঠে দাঁড়ায় এবং কুড়োতে যায় ফেলে-দেওয়া পাটখড়ি। আমি ওর সামনে যাই। আলাপ করবার ইচ্ছা। জিজ্ঞেস করি নাম, বাড়ি কোন্ গ্রামে ইত্যাদি। ছেলেটি কোনো কথা বলে না, শহরের লোক দেখে এক হাতে চেপে ধরে তার শিশ্নটি, অপর হাতে পাটখড়ি নিয়ে আগের মতোই এদিকে-ওদিকে যায়, লাফাতে লাফাতে মাছি তাড়ায়। আমি আরও এগোই। ওর সাথে কথা না বললেই যেন নয়! ওর সাথে কথা বলব, একটা ছবি তুলব। সংবাদ-এ 'হিউম্যান ফিচার' লিখলে একটা ছবির দাম তো পাওয়া যাবে কড়কড়ে পঞ্চাশটি টাকা! সাংবাদিকতা যদি আমার ব্যবসা হয়, তা হলে এই মাছি তাড়ানো-ছেলেটি আমার ভালো পণ্য-পুঁজি।

না, ছেলেটি কথা বলে না। শুধু দেখি ওর ধুলোমাখা গণ্ডে অশ্রুর ধারা। আমাকে সে ধারা ও বেগ থেকে বাঁচাতেই বুঝিবা এগিয়ে আসে যুবকটি। সে জানায়, 'ওই গেদা কথা কইতে পারে না ছার, ও বোবা!'

(অপ্রকাশিত। রচনাকাল : ডিসেম্বর '৯০)

চতুর আলী : চতুরালী

আমার স্মৃতির পাতা ওল্টালে খুঁজে পাই অনেক মজার মজার চরিত্র। 'সংবাদ'-এর কাজে শহরে-গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এদের কারও সাথে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা হয়েছে, হয়েছে পরিচয়, আলাপ। আবার কেউবা সামনে এসেছেন একাধিকবার। আমি নানা ভেক-ভণিতায় তাদের সাথে মিশেছি, তাদের অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি। এদের কারও কারও সম্পর্কে আলাদাভাবে লেখার ইচ্ছে আছে আগামীতে। তাদের জটিল-কুটিল চরিত্র-চিত্রণ আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না, তবে এটা ঠিক যে, তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় অন্তত হবে।

পথ থেকে পথে ঘুরি। এ-শহর থেকে ও-শহর। শহর থেকে গ্রাম। গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম। এই চলার পথে পরিচয় হয় চতুর আলী সাহেবের সাথে। ইনি আমার জীবনে বহু ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটারের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন।

উপজেলা পদ্ধতি চালু হবার পর বিভিন্ন এলাকা সফর করছি। আমি অনুসন্ধান করে দেখছিলাম প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের নামে আসলে কী হচ্ছে, অর্থ অপচয় হচ্ছে কেমন, কে কোথায় দুর্নীতি করছে,—এইসব।

ঘুরতে ঘুরতে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলা সদরে আসি। শহর থেকে খুব জোর ২০/২২ মাইল দূরের এই জনপদে উন্নয়নের নামে হচ্ছিল তখন ভবন নির্মাণ কিংবা সংস্কার, কর্মকর্তাদের বাসাবাড়ি তৈরি। গ্রামের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের কোনো কাজ নেই, তার বদলে হচ্ছে সাহেবদের খেলাধুলার জন্যে টেনিস কোর্ট, হয়েছে উপজেলা ভবন চত্বরের সীমানা-দেয়াল। মার্কারি বাতি জ্বলছে আধ বর্গমাইল আয়তন এলাকায় অর্থাৎ শুধুমাত্র উপজেলা সদর-কেন্দ্রে। ইউএনও-র বাসা সংস্কার, বাগান ও শৌখিন পুকুর তৈরি এইসব হচ্ছে। টাকাটা যদিও জনগণের!

AMARBOI.COM

সাঁথিয়ায় নেমে এদিকে-ওদিকে যাই। আলাপ করি এলাকার কয়েকজনের সাথে। আসেন স্থানীয় সাংবাদিক ভাইয়েরা। তাঁদের কাছ থেকে প্রাথমিক কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করি। তারপর একসময় ঢুকি ইউএনও সাহেবের কক্ষে। দরজায় দামি-ভারী পর্দা। পর্দা তুলতেই দেখি খুব মূল্যবান একটি চেয়ারে গ্যাঁটসে বসে আছেন ইউএনও। সে-সময়টা বিদ্যুৎ ছিল না। এক পিয়ন, সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে। পরিচয় হবার পর ইউএনও-র প্রথম যে অভিযোগটি, তা হলো, এই উপজেলায় কাজ করা তাঁর পক্ষে ভীষণ সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা বিদ্যুৎ থাকে না। 'আমরা ভাই শহরের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, বিদ্যুৎ না থাকলে দুঃসহ যন্ত্রণায় পড়ে যাই, কী করে জনগণের সেবা করব বলুন' বলেন তিনি।

এইসময়, দেখি, বেঁটে-খাটো এক ব্যক্তি বসে আছেন ইউএনও-র পাশের চেয়ারে। বোকামির জন্যে হোক কিংবা হতে পারে কর্তার গরমের কষ্টে তাঁর নিজের প্রাণ যায় এইরকম অনুভূতি থেকে হোক, ঐ লোকটি পিয়নের হাত থেকে তালপাতার পাখাটি নিয়ে ইউএনও-কে বাতাস করতে থাকেন। ডানে-বাঁয়ে লম্বা হাত চলে তাঁর।

ইনি কে?

পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে, আমার সাথে। তাঁর নাম মন্তাজ আলী চতুর। মন্তাজ নামে কেউ একটা তেমন চেনেন না, চতুর আলী তাঁর পরিচয়। লোকজন টানা উচ্চারণ করেন 'চতুরালী'। তিনি একজন ইউপি চেয়ারম্যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহ্, নামটি খুব সুন্দর তো! চতুর আলী! মনে-মনে বলি। কিন্তু মুখের ভাষায় যে কৌতূহলের ছাপ, হাসি, তা দেখে ইউএনও সাহেব আন্দাজ করেন চতুর আলীর সাথে পরিচিত হয়ে আমি বুঝি খুব খুশি হয়েছি। তিনি (ইউএনও) হঠাৎ করে শুরু করেন চতুর আলীর তারিফ। তিনি জানান যে, খুব অল্প লেখাপড়া হলেও চতুর আলী একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি একটি উড়োজাহাজ বানাচ্ছেন।

এই লোকটি বৈজ্ঞানিক? উড়োজাহাজ বানাচ্ছেন? অবাক হয়ে যাই। হাঁ হয়ে থাকি কিছুক্ষণ। ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো! বলি ইউএনও সাহেবকে। তাঁকে জানাই, আমার সবকিছু বিস্তারিত জানা দরকার। চতুর আলী এবং তাঁর উড়োজাহাজ নিয়ে 'সংবাদ'-এ লিখব।

কথাটা এমনভাবে বলি যে, আমি যেন চতুর আলী এবং তাঁর উড়োজাহাজের ভালো একটা পাবলিসিটি করতে চাই। এতে ইউএনও এবং চতুর আলী দুজনেই খুশি হন। নিজস্ব কীর্তিকলাপের বিবরণ দিতে থাকেন তাঁরা নিজেরাই।

বিস্ময়ের সাথে শুনতে থাকি যে, মন্তাজ আলী ওরফে চতুর আলী অনেকদিন থেকে প্ল্যান করছেন, তিনি একটি বিশেষ ধরনের উড়োজাহাজ বানাবেন। একজন চালক ও আরেকজন আরোহী উঠতে পারবে তাতে। উড়োজাহাজটির নির্মাণকৌশল এমন হবে যে, এর নিচের দিকে মোটগাড়ির চাকা থাকবে এবং ব্যবস্থা থাকবে এর ডানা দুটি গুটিয়ে নেওয়ার। প্রয়োজন হলে, ডানা গুটিয়ে নিয়ে উড়োজাহাজটি চালানো যাবে সড়কপথে। আবার, চালক বা আরোহী যদি মনে করেন যে আকাশে কিংবা সড়কপথে নয়, যানটি তিনি চালাবেন নদীতে, তাও পারবেন। উড়োজাহাজের সঙ্গে থাকবে পাল ও বৈঠা। অর্থাৎ এক কথায়, বহুমুখী যান হিসেবে ব্যবহৃত হবে এই উড়োজাহাজটি!

AMARBOI.COM

চতুর আলীর সাথে রাস্তায় যদি পরিচয় হতো, আর তিনি এইসব কথা বলতেন, তা হলে নাহয় উন্মাদ বলে মনে করা যেত। কিন্তু তিনি এরশাদ সরকারের এক খাস কর্তার সামনে বসে এইসব বলছেন। আর শুধু তিনিই বলছেন না, সেইসাথে বলছেন ইউএনও সাহেবও।

উড়োজাহাজের বিস্তারিত প্ল্যানটি বলবার পর, যখন তাঁরা দুজনে লক্ষ করলেন যে আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না, তখন তিনি কাগজ-কলম এনে উড়োজাহাজটির একটি নকশা এঁকে দেখালেন। দেখালেন কোথায় থাকবে চাকা, কোথায় ডানা, কোথায় বৈঠা-পাল ইত্যাদি। ইউএনও বললেন, 'বিশ্বাস করেন রিপোর্টার সাহেব, এই মিস্টার চতুর আলী বাংলাদেশের বিরাট এক প্রতিভা। পৃথিবীর অন্য দেশে হলে একে নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত।'

'উড়োজাহাজ' সম্পর্কে আরও শুনতে চাই। প্রশ্ন করি নানানটা। যন্ত্রপাতি কোত্থেকে আসবে? কবে নাগাদ চালু হবে বহুমুখী বিশেষ যানটি? বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বানানো শুরু হবে কি না! খরচ হবে কত টাকা?—এইসব।

চতুর আলী জানান, ৬/৭ মাসের মধ্যে উড়োজাহাজ তৈরি শেষ হয়ে যাবে। তিনি ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করবেন পুরাতন ভোক্সওয়াগনের একটি ইঞ্জিন। সেটি ইতোমধ্যে নাকি কিনে ফেলেছেন। চতুর আলী চান, তাঁর ভাষায় 'মহামান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট এরশাদ' এই উড়োজাহাজটির উড্ডয়ন উদ্বোধন করবেন। ফিতা কাটার পর প্রেসিডেন্ট সাহেবকে আহ্বান জানানো হবে উড়োজাহাজে উঠবার। আমি জিজ্ঞেস করি, শুধু প্রেসিডেন্ট কেন, আপনি ওতে উঠবেন না? চতুর আলী বলেন, 'আমি পরে উঠব। সে-সময় অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার স্বপ্ন 'আমার মহামান্য প্রেসিডেন্ট' উড়োজাহাজে আগে চড়ুক। সঙ্গে থাকবেন ইনো সায়েব।'

আসি টাকাপয়সা খরচ এবং তার সোর্স-এর প্রসঙ্গে। আমার উৎসাহে ইউএনও সাহেব উৎসাহী হন। তিনি যা বলেন, তাতে আরও বিস্মিত হই। জানান তিনি, এই উড়োজাহাজ বানানোর জন্যে টাকা দেবে উপজেলা প্রশাসন।

: উপজেলা প্রশাসন দেবে টাকা? বাহ্!

: হ্যাঁ, আমরাই দেব।

: বলেন কী? ইন্টারেস্টিং!

: জেনে খুশি হবেন ইতোমধ্যেই তাঁকে আমরা উপজেলা তহবিল থেকে টাকা দিয়েছি আগাম হিসেবে। ৪০ হাজার টাকা দিয়েছি। হেঃ হেঃ ...

পাঠক, খুব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে কি? মনে হচ্ছে বানানো কোনো কথাকাহিনী? না, সত্যি সাঁথিয়ায় এখনও আছেন চতুর আলী সাহেব। ইউএনও সাহেব প্রশাসনের অন্যত্র আরও বড় পদে অধিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য আজ পর্যন্ত ঐ বিশেষ ধরনের উড়োজাহাজটির নির্মাণকাজ শেষ হয়নি।

সাঁথিয়া থেকে ফিরে চতুর আলী ও তাঁর উড়োজাহাজ সম্পর্কে 'সংবাদ'-এ লিখি। চতুর আলীর ছবি, উড়োজাহাজের নকশা এইসবও ছাপা হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন না। সাংবাদিক-বন্ধুরা বলেন 'বেসলেস নিউজ।' এটা কি হতে পারে? ক্লাস এইট পাশ একটা লোক উড়োজাহাজ বানাবে আর উপজেলা প্রশাসন তার পেছনে টাকা জোগান দেবে? না না, চতুর আলী নাহয় চতুর কিন্তু একজন প্রশাসক কী করে হন অত বোকা?

'সংবাদ'-এ একাধিকবার লেখা হয় চতুর আলী ও তাঁর কল্পিত উড়োজাহাজ সম্পর্কে। ছাপা হয় সম্পাদকীয় মন্তব্য, উপসম্পাদকীয়। প্রশ্ন তোলা হয় : টাউটদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে কেন, আর সরকারি অর্থই-বা এভাবে অপচয় হচ্ছে কেন? চিঠিপত্র ছাপা হয় অনেক পাঠকের। সন্তোষদা চতুর আলীকে নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ লেখেন।

অনেক লেখালেখি, কিন্তু কাজ হয় না। উড়োজাহাজের পাত্তা নেই, আর চতুর আলীকে অগ্রিম হিসেবে দেওয়া টাকাও আদায় হচ্ছে না। আবার প্রতিবেদন লেখা হয়। পাবনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক একদিন সাঁথিয়ার গ্রাম সফরে গিয়ে চতুর আলীর ঘটনা তদন্ত করেন, উড়োজাহাজ-সম্পর্কিত ফাইলটি উপজেলা প্রশাসন থেকে নিয়ে দেখেন, আগাম টাকা দেওয়ার প্রমাণটি পান। তিনি 'সংবাদ'-এ খবরটি পড়ে বিশ্বাস করেননি, কিন্তু সাঁথিয়ায় সরেজমিনে গিয়ে যখন দেখেন যে পত্রিকার বিবরণ সত্যি, তখন ক্রোধান্বিত হয়ে লাফাতে থাকেন। চতুর আলীকে গ্রেফতার করে পাবনা শহরে নিয়ে আসেন তিনি সেদিনই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর কী হলো?

না, কিছু হয়নি। মামলা চলেনি, বরং দুদিন বাদে ছাড়া পেয়েছেন সুচতুর চতুর আলী। কীভাবে পেয়েছেন, কী শর্তে পেয়েছেন, তা বলব না। আপনারা কেউ যদি কখনো পাবনায় যান, কিংবা সাঁথিয়া উপজেলায়, তবে অনুগ্রহ করে এ সম্পর্কে জেনে নেবেন। তবে এটুকু জানাই যে, চতুর আলী ভালোই আছেন। উচ্চপদে ভালোই আছেন উপজেলার সেই প্রশাসক সাহেব!

(অপ্রকাশিত। রচনাকাল : ডিসেম্বর '৯০)

একজন রহমান মিয়া

সাঁথিয়ার চতুর আলীর মতো লোকের সাথে যেমন পরিচয় আছে আমার, পাশাপাশি তেমনি আবার রংপুরের রহমান মিয়াকে আমি চিনি। শহরের কাচারি বাজার, যেখান দিয়ে যাতায়াত করি বাসা থেকে মধ্যশহরে, সেখানে, প্রধান সড়কের ধারে রহমান মিয়ার সিমেন্টের টিউবওয়েলের সেলস্‌রুম। কারখানাটি তাঁর শহর-পার্শ্ববর্তী গ্রামে, চিকলিভাটায়।

পঞ্চান্ন বছর বয়সের জীবনসংগ্রামী এই বৃদ্ধ আমার কাছে খুব প্রিয় একটি চরিত্র। শহরের পথে যেতে যেতে তাঁর দোকানের দিকে যখন তাকাই, কিংবা দেখা হয় রহমান মিয়ার সাথে, আমার তখন অনেকবারের মতো আবার মনে হয়, মানুষ যদি হয় কঠোর পরিশ্রমী, থাকে যদি কর্মস্পৃহা, তা হলে সৃষ্টি করতে পারে সে মানুষের কল্যাণে অনেক কিছু। চতুর আলীর মতো কেউ-কেউ আছে, যাঁরা টাউট, 'বিশেষ উড়োজাহাজ' বানানোর নাম করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেন, প্রশাসনে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে ফায়দা লোটেন, এমনকি হাটে-বাজারে গরু-ছাগল বিক্রির মতো হরদম বেচে খান স্বার্থপর রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, আমলা ইত্যাদিদের। কিন্তু রহমান মিয়া তেমনটি নন। তাই সান্ত্বনা খুঁজে পাই এঁকে দেখে।

কিছু জটিলতা আছে তাঁর মধ্যে, আছে চরিত্রের বৈপরীত্য, তবু লোকটির কাজ আমার ভালো লাগে। ভালো কাজ দিয়ে যদি হয় ভালো মানুষের পরিচয়, তা হলে নির্দ্বিধায় বুকে বুক মেলাতে পারি গ্রাম থেকে উঠে আসা এই একজন রহমান মিয়ার সাথে। আমি আমার প্রিয় গল্পকার মঞ্জু সরকারকে অনুরোধ করেছি রংপুরে এলে এঁর সাথে পরিচিত হতে, কর্মময় জীবনের এক লড়াকু রহমান মিয়া সম্পর্কে জানতে। আমি বিশ্বাস করি অবিনাশী আয়োজন, নগ্ন আগন্তুক, জেগে উঠার সময়, প্রতিমা উপাখ্যান খ্যাত মঞ্জু সরকার পারবেন তাঁকে নিয়ে খুব ভালো একটি উপন্যাস লিখতে।

আসলে রহমান মিয়া আমার কাছে বহুপৃষ্ঠার এক উপন্যাস। তিনি ছিলেন পথের মানুষ; কুয়োর সিমেন্টের রিং, ফুলের টব, সিমেন্টের পাইপ ইত্যাদি বানাতেন। ছোট একটি কারখানা। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ভাবতে লাগলেন নতুন কিছু-একটা করা যায় কি না যা মানুষের উপকারে আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের মেধা খাটিয়ে এই স্বল্পশিক্ষিত মানুষটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন, সাধারণ যে লোহার টিউবওয়েল মানুষ ব্যবহার করে থাকেন, তার বদলে সিমেন্ট দিয়ে নতুন ধরনের টিউবওয়েল বানানো যায় কি না। দীর্ঘদিনের শ্রমের পর সফল হলেন তিনি। লোহার টিউবওয়েলের দাম যেখানে ১২/১৩শ টাকা, সেখানে তিনি সিমেন্টের তৈরি টিউবওয়েল বাজারে ছাড়লেন ৭শ টাকার কিছু কমে। এই নতুন টিউবওয়েলের সাইজটি বেঢপ, কিন্তু হাতল চাপানো খুব সহজ, পানি বেরিয়ে আসে গলগল করে, অনেক। টিউবওয়েল তৈরিতে সিমেন্ট ছাড়াও ব্যবহার করলেন ছোট খোয়া, বালু, লোহার ছোট রড, এক টুকরো কাচ। পাইপ ও ফিল্টার থাকল প্লাস্টিকের। নতুন জিনিস গ্রহণ করতে শহরের মানুষ ইতস্তত করলেন, কিন্তু টিউবওয়েলটি গ্রামে বিক্রি হতে লাগল ভালোই।

টিউবওয়েল তৈরিতে সাফল্যের পর বানালেন তিনি সিমেন্টের হালকা পাম্প : সেচযন্ত্র। দাম সস্তা, কৃষকরা এটিকেও গ্রহণ করলেন। রহমান মিয়া বলেন, 'আমার শিক্ষাদীক্ষা কম, বুদ্ধিটুদ্ধি আপনাদের মতো নাই, তবু চেষ্টা করেছি। আমার ওপর আল্লাহ্‌র রহমত ছিল।' অবশ্য এইসব কথা বিনয় মনে হয়।

তার শো-রুম বলুন আর সেলস্-রুম বলুন, সেটা রংপুর শহরের কাচারি বাজারে। কারখানাটি গ্রামের বাড়িতে। আপনারা কেউ কখনো যদি এদিকে আসেন, দেখবেন কোর্ট মসজিদের পাশেই একটি স্টল। সিমেন্টের ওপর বড় অক্ষরে লেখা আছে 'রংপুরের গৌরব কি?' এই কথাটা। লেখার নিচে একটি সিমেন্টের টিউবওয়েলের নকশা আঁকা। টিউবওয়েলের পাশে বসে রহমান মিয়ার মতো দেখতে একজন বৃদ্ধ ওজু করছেন। জায়গা এবং দোকান চিনতে কষ্ট হবে না এবং লোকটির সাথে কথা বলে আপনারা আনন্দ পাবেন, এটা নিশ্চিত বলতে পারি।

আগেই বলেছি, তিনি এক মজার মানুষ, চরিত্রে আছে নানান বৈপরীত্য। কিন্তু এগুলোর পেছনেও তাঁর যুক্তি আছে। তাঁর স্ত্রী, দুজন। এ সম্পর্কে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন, 'জৈবিক প্রয়োজনের চেয়ে দুই বিয়ে করার বড় প্রয়োজন ছিল অন্য কারণে। আমার প্রথম স্ত্রী একা সংসার চালাবেন, না কারখানা চালাবেন? আমি তো থাকি দোকানে, বেচাবিক্রি দেখতে হয়। সেজন্যে আরেক বিয়া করে ফেললাম। বড় বউ দেখেন সংসারের সবকিছু, দ্বিতীয়জন পরিচালনা করেন কারখানাটি।' 'ডিভিশন অব লেবার' করে দিয়েছেন তিনি।

'দুই স্ত্রীর মধ্যে গোলমাল একেবারেই হয় না।' বলেন তিনি। দুজনের জন্যে আলাদা আলাদা ঘর। টাকাও দেন আলাদা করে। রহমান মিয়ার নিয়ম হলো, প্রতিদিন সকালে উঠে তিনি এক শ এক শ করে দুই স্ত্রীর হাতে দু শ টাকা দেন। এ টাকায় দুজনের রান্নাঘরে আলাদা আলাদা রান্না হয়। রহমান বলেন, 'এক স্ত্রী রাঁধেন মাংস, অপরজন হয়তো রাঁধেন মাছ। আমি খেতে বসি দুজনের ঘরের মাঝখানে। দুই ঘর থেকে দুটি বাটি আসে তরকারির। আমি একই সাথে মাংসও খাই, মাছও খাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমান মিয়া দাবি করেন সন্তানসংখ্যা বেশি হলেও পরিবারটি তাঁর সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। 'এই সন্তানেরা, ছেলে এবং মেয়ে, সবাই কাজ করে আমার কারখানায়। শ্রম দেয়, দৈনিক মজুরি পায় নিয়মিত। তারা শ্রমে ঠকে না, মজুরি কম দেওয়া হয় না, বা টাকা বাকি রাখা হয় না। সবাই খুশি। আমার লাভ হলো যে, আমি আমার একান্ত আপনজনদের খাটাই, তাদের মমতা পাই। আমি না থাকলে এই কারখানা তো হবে তাদেরই। সেজন্যে তারা কাজে সামান্য ফাঁকি দেয় না, কারখানার আরও উন্নতির জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে।' এখানে তাঁর দর্শন হলো : শ্রমিকরা যদি বুঝতে শেখে যে কারখানার মালিক ভবিষ্যতে হবে সে-ই, তা হলে নিশ্চয়ই ভালোভাবে কাজ করবে সে, দেবে কঠোর শ্রম। জানি না, স্বল্পশিক্ষিত রহমান মিয়া এই মূল্যবান 'ফিলোসফি' কোত্থেকে পেলেন।

আমার চলার পথে প্রেরণার প্রয়োজন, সে প্রেরণা রহমান মিয়া। আমার জন্যে আনন্দ প্রয়োজন, রহমান তাঁর কথাবার্তায় তা-ই দেন। কিন্তু দুই স্ত্রীতে আমি সমর্থন করি না।

আমার সমর্থন থাকুক না-থাকুক, রহমান মিয়ার কিছু আসে যায় না। তিনি বলেন, 'আমি কাজের মানুষ, কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা যে যা মনে করেন, করুন।'

(অপ্রকাশিত। রচনাকাল : ডিসেম্বর '৯০)

AMARBOI.COM

নিজস্ব রিপোর্ট

রোদ-বৃষ্টির ভেতর পথ চলেছি। বন্ধুর এ পথ। পদেপদে নানান বৈপরীত্য। কত মানুষ, বিচিত্র বিচিত্রতর চরিত্র। দেখি আর দেখি। মনে হয় সবাই কত চেনা, তবু চিনতে পারি না। অন্যকে চিনব কী করে? এই আমি মোনাজাতউদ্দিন, সংবাদ-এর রিপোর্টার, নিজেকেই-বা চিনতে পারি কই?

পথ থেকে পথে ঘুরে বেড়াই। আজ শহরে, কাল গ্রামে। আজ রংপুরে কাল রাজশাহীতে কিংবা পাবনায় কিংবা বগুড়ায়। দিনাজপুর থেকে তেঁতুলিয়া, তার পরের দিন আছি ময়মনসিংহ কিংবা জামালপুরে। চলে গেলাম ঢাকায়। 'সংবাদ'-এর টেবিলে বসে হয়তো লিখছি দুর্ভিক্ষের সংবাদ। কিংবা কারও দুর্নীতির পাঁচালি।

পথ চলি নানান বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে। এমনও দিন গেছে, একই দিনে রাজশাহী থেকে চড়া কোনো দুপুরে ঢাকায় খবর পাঠিয়েছি : পদ্মাতীরের শহরে প্রচণ্ড গরম, তাপমাত্রা বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস, লু হাওয়া বইছে। টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে বাস ধরে চলে আসি বগুড়া শহরে। দেখি, বগুড়ায় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। অল্প সময়ে পানি জমে যায় রাস্তায়। 'বগুড়ায় ভারী বৃষ্টিপাত' এই মর্মে খবর ডেসপ্যাচ করি। সন্ধ্যায় বগুড়া থেকে রংপুরে রওনা হই। রাতে, রংপুর শহরে যখন ঢুকছি, দেখি চাঁদনি রাত, হালকা চাদরের মতো কুয়াশার পর্দা। অসময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুয়াশাপাত হচ্ছে। শহরে নেমেই পাঠাতে হয় খবরটি। যিনি খবরটি রিসিভ করেন, সহজে বিশ্বাস করেন না বৈপরীত্যের খবর। একই উত্তরাঞ্চল, একই দিনে বিভিন্ন আবহাওয়ার রিপোর্ট পান কোত্থেকে? সহকর্মীকে পরিস্থিতি বোঝাই।

খবরগুলো পরদিন ছাপা হয়। কোনোটা আবার বাদও পড়ে। কপি এক্সপ্রেসেজ হয়ে যায়।

পাঠকরাও অনেক সময় হন বিভ্রান্ত। তাঁরাও অনেক খবর বিশ্বাস করেন না। রাজশাহীর যে পাঠকটি প্রচণ্ড গরমে গায়ে ফোস্কা পড়ার খবরটি পড়েন, তিনি একই দিনে বগুড়ার ভারী বৃষ্টিপাত কিংবা রংপুরে কুয়াশাপাতের খবরটি দেখে বিস্মিত হন। কিন্তু কাগজে যদি কোনোক্রমে শুধু বগুড়ার বৃষ্টিপাত আর রংপুরের কুয়াশার খবরটি ছাপা হয়, রাজশাহীর প্রচণ্ড গরমের সংবাদটি হয় এক্সপ্রেসেজ, তা হলে তিনি, ঐ রাজশাহীর পাঠক, আহত হন। 'মোনাজাতউদ্দিনকে তো কাল রাজশাহীতে দেখলাম, তিনি এখানকার উষ্ণ আবহাওয়ার খবর পাঠালেন না, অথচ পাঠালেন বগুড়ার বৃষ্টিপাত আর রংপুরের কুয়াশার খবর?' শুধু খবরের নয়, একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার নিজেরও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যায় ঐ চেনা পাঠকটির কাছে। পত্রিকায় খবরের 'রাশ' কিংবা কী কারণে কোনো-একটি সংবাদ এক্সপ্রেসেজ হয়ে যায়, তিনি (পাঠক) বোঝেন না। বুঝবার কথাও নয়। আমরা পাঠকদের জন্যে খবর দিই। খবরের নেপথ্য খবর থেকে রাখি দূরে।

অনেক খবর নিয়ে হয় তাই ভুল-বোঝাবুঝি। অবিশ্বাস। এই তো গত অক্টোবর-নভেম্বরে ('৯০) খবর পাঠালাম কুড়িগ্রামের উলিপুর-চিলমারীতে দৈনিক মজুরির হার নেমে এসেছে মাত্র তিন টাকায়। ভেতরের পাতায় হলেও গুরুত্বের সাথে ছাপা হলো। কিন্তু অনেক পাঠক এ খবর বিশ্বাস করেন না। চট্টগ্রামে বাড়ি, থাকেন ঢাকায়, এমন একজন পাঠক সংবাদ অফিসে এসে বললেন, এটা একটা ভুয়া খবর। তিন টাকা দিনমজুরি, এটা হতে পারে না। আপনি বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন, ঢাকার টেবিলে বসে তৈরি করেছেন খবরটি। তাঁকে বোঝাই, কিন্তু তাঁর একই কথা, 'আমাদের চিটাগাং-এ দিনমজুরির হার এখন সর্বনিম্ন ৫০ টাকা, এটা আবার কুড়িগ্রামের গ্রামে তিন টাকা হয় কী করে?' এই কথার পর থামেন না তিনি। বলতে থাকেন, 'ও সাহেব, আপনাকে দেখছি কাল থেকে আছেন ঢাকায়। কবে গেলেন কুড়িগ্রামের উলিপুরে? চাপা মারার জায়গা পান না, না?'

আমি কোনোমতেই তাঁকে পরিস্থিতি বোঝাতে পারি না। কুড়িগ্রাম থেকে রংপুর, রংপুর থেকে জামালপুর, জামালপুর থেকে শেরপুর-ঝিনাইগাতী হয়ে ঢাকায় চলে এসেছি গত ৪৮ ঘণ্টায়, এটা বোঝানো তাঁকে মুশকিল। বোঝানো মুশকিল যে, শুধু উলিপুরের নিম্নমজুরি হারের খবরটি নয়, এরই মধ্যে শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে গিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে কয়েক ব্যক্তির মারা যাবার খবরও লিখেছি এই সময়ের মধ্যে।

এই বয়ান শুনে আরও সন্দেহ করেন পাঠক। আসলে দোষটা আমারই। মাঝেমধ্যে বেশি বেশি করে ফেলি। এমন কিছু করে ফেলি যে সত্য ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। অবশ্য আহাম্মকদের কাছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ থেকে পথে চলি। সঙ্গে বিরাট ব্যাগ। প্রয়োজনীয় সবকিছু। আছে ক্যামেরার ব্যাগ, লেখার প্যাড খাম ছবি পত্রপত্রিকা এসবের জন্যে আলাদা একটি ব্যাগ। আছে তেল, সাবান, ব্রাশ, পেস্ট, শেভের যন্ত্রপাতি, ক্রিম, এমনকি সুই সুতো পর্যন্ত। ব্যাগে রাখতে হয় আলপিন, জেমস ক্লিপ, কাঁচি, ব্লেড, গাম কিংবা টেপ, মোমবাতি, বলপেনের একটা রিফিল। কখন কোথায় কী লাগবে বলা মুশকিল। থাকে জুতার কাঁটা আর ছোট্ট হাতুড়ি পর্যন্ত। মনে করুন, দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতি কভার করার জন্যে গিয়েছি জামালপুরের তিতপল্লা গ্রামে অথবা আরও দূরে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলায় ঘটনাস্থল উপজেলা সদর থেকে আরও ১০ মাইল ভেতরে। হাঁটতে গিয়ে এ-সময় হঠাৎ করে স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেল। কী করব? পাব কোথায় সেখানে মুচি? শেরপুর পর্যন্ত ফিরে আসব কি হাতে ছেঁড়া স্যান্ডেল ঝুলিয়ে? সেজন্যে সঙ্গে রাখতে হয় কাঁটা হাতুড়ি।

ব্যাগে থাকে সবকিছু। ক্যামেরায় ফিল্ম ভরা। নিউজপ্রিন্টের প্যাড আছে, পকেটে কলম। শহর থেকে গ্রাম আর গ্রাম থেকে শহরে ঘুরে ফিরি খবরের সন্ধানে। দুর্নীতির খবর, খাদ্যাভাবের খবর, মানুষের দুর্গতির খবর। এইসব তুলে ধরব 'সংবাদ'-এ। সরকার জানবে, ব্যবস্থা নেবে। পাঠক জানবেন, জনমত সৃষ্টি হবে। আর, ভালো কাজ করতে পারলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ থাকবেন সন্তুষ্ট। আমি শ্রমিক, লিখে খাই। কর্তৃপক্ষ কিছু টাকার বিনিময়ে আমার শ্রম কেনেন। আমি এটা বুঝি। তবুও 'সিনসিয়ার' হবার চেষ্টা করি। ভালো কাজে নাকি ভালো ফল মেলে! কিন্তু না, মিথ্যে এই কথা। মিথ্যে। যিনি ঐ কথা বলেছেন তিনি মিথ্যুক। নইলে, পেশায় যিনি এসেছেন সেদিন, যাঁর খবর ছাপা হয় আমার এক-চতুর্থাংশ, তিনি কী করে পাঁচ-ছয় বছরের সাংবাদিকতায় ...

আমি এইসব ভাবি। অনুতাপ হয়। তারপর, একসময় ভুলে যাই সেসব কথা। যা পাচ্ছি, যতটা পাচ্ছি, তা-ই আমার প্রাপ্য। অন্তত মাথা উঁচু করে হাঁটতে তো পারি আর দশজনের সামনে! স্নেহ পাই আহমদুল কবির সাহেবের কাছ থেকে, ভালোবাসেন বজলু ভাই, সন্তোষদার স্নেহধন্য আমি, নির্বাহী পরিচালক আলতামাশ কবির সাহেব বিশ্বাস করেন। সহকর্মী যাঁরা, সবাই সমান ভালো না বাসুক অন্তত ঘৃণা করেন না কেউ বোধকরি। এই তো ভালো। এই তো যথেষ্ট পাওয়া।

মাথা উঁচু করে পথ হাঁটি। কিন্তু মাথা নত হয় বিবেকের কাছে। সাংবাদিকতার নামে এ আমি কী করছি! এটা কি রীতিমতো একটা ব্যবসা হয়ে যাচ্ছে না?

মানুষের দুর্ভোগ-দুর্গতি নিয়ে ব্যবসা। অনাহারী মানুষ আমার ব্যবসার পুঁজি। দুঃস্থ-দুঃখী মানুষ আমার সুনাম এবং অর্থ। তারাই স্বর্ণপদক, ফিলিপস্ পুরস্কার, আই ডি ই পুরস্কার ইত্যাদি। এই তো কিছুদিন আগের কথা। গেছি শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে। সেখানে খাদ্যাভাবে মারা গেছে ৮ জন। আক্রান্ত দেড় শ। ছবি তুললাম যে-লোকটি সাতদিন অনাহারে থাকবার পর আধসের চাল পেয়েছে আর তা-ই ৭ সদস্যের পরিবারটি ভাগাভাগি করে খেয়েছে, তার। ছবি তুললাম এক বৃদ্ধার যে নাকি খ্যাদ্যাভাবে ভাত বা রুটির পরিবর্তে অনাহারী পেটে গতকাল খেয়েছে দুটি কাঁচাকলা সেদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ ছবি তুলে আনলাম। ঝিনাইগাতী থেকে শেরপুর, শেরপুর থেকে জামালপুর হয়ে ঢাকা। সংবাদে এসেই জমা দিলাম সচিত্র প্রতিবেদন। প্রতিবেদন পড়ে কনগ্রাচুলেট করলেন বেশ কজন পাঠক। বেশ ভালো হয়েছে লেখা। ছবি, সে তো আরও খুব ভালো। 'থ্যাংক ইউ মোনাজাতউদ্দিন'।

ছবি ছাপা হয়। প্রশংসা যেমন পাই, তেমনি আবার ছবির বিল জমা দিই। বিল পাশ হয়ে যায় অল্প সময়েই। একেকটা ছবির জন্যে পঞ্চাশ টাকা। একসাথে মোটা টাকা তুলি আমাদের হিসাব বিভাগ থেকে। দুপুরে খেতে যাই। শুভ্রায়, অথবা সংবাদ অফিসের নিচে মহুয়া রেস্তোরাঁয়।

খাই মুরগির রান, কিংবা খাসির কলিজা। কোনোদিন থাকে মাছ। থাকে গরুর ভুনা মাংস। গরম ভাত থেকে ধোঁয়ার সাথে সাথে উবে যায় সব স্মৃতি। অতীত উধাও, দুদিন আগে শেরপুরের কোনো অভাবী গ্রামে ছিলাম, ভুলে যাই। ভুলে যাই দীর্ঘদিন বেকার বৃদ্ধ মজুর ভাদুর কথা, বিস্মৃত হয় কাঁচাকলা সিদ্ধ-খাওয়া সেই বৃদ্ধা। যে-গ্রামে ক্ষুধা আজও আছে, যেখানে অনাহারজনিত অপুষ্টিতে মারা গেছে নরনারী শিশু, তারা কোথায়? কই? খাবারের টেবিলের ধারে ওদের ছবির টাকা আছে, ওদের নিয়ে লেখা ছবি-প্রতিবেদনের প্রশংসাবাক্য স্মরণ আছে, কিন্তু ধারেকাছে নেই আমার পণ্য। আমি যখন দুপুরে ভরপেট খাচ্ছি, তারা তো এই শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামে আছে উপবাসী। তারা থাকুক কি মরুক, আধসের চালের ভাত ৭ জনে ভাগ করে খাক কিংবা কেউ খাক কাঁচাকলা সেদ্ধ, আমার যেন কিছু আসে যায় না! মানুষের কলিজাখাদক জনৈক খলিলুল্লাহ, অনেকদিন আগে ধরা পড়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কাছে থেকে। সে খেত মৃত মানুষের কলিজা। খেত প্রকাশ্যে। আর আমি, অসম সমাজের আমি, সম্পদের সুষম বণ্টনহীন সমাজের আমি, জ্যান্ত মানুষের দুর্গতি-দুর্ভাগ্য পণ্য করে খাই এবং এই কাজটি করি কৌশলে, সবার চোখের আড়ালে, ফর্সা কাপড়ে দেহ ঢেকে। আমার মেকআপ খুব কড়া। ধরা যায় না।

AMARBOI.COM

আর আমাকে ধরবেই-বা কে? কারা? কারা করবে চিহ্নিত? আমার আশপাশের মানুষজন? না, তাঁরা পারেন না। কেননা, কে বুকে হাত দিয়ে বলবেন মানুষের দুর্গতি-দুর্ভোগকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পণ্য করেন না তাঁরা? যে-মজুরটি উদয়াস্ত শ্রম-ঘাম ঢালে, কে তাকে ন্যায্য মজুরি দেন? যে-কৃষকটি রক্ত ঢেলে খাদ্য ফলায়, কে তাকে সম্মান করেন? কে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য দেন? সামাজিকভাবে মর্যাদা পায় কি ওইসব মূল্যবঞ্চিত মানুষ? নাকি, আমার মতোই অনেকে ব্যবহার করেন তাদের!

এইসব ভাবি আর পথ চলি। আমার সঙ্গে আছে তিন-তিনটি ব্যাগ। প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র আছে সেগুলোতে। নেই শুধু একটি জিনিস। একটি আয়না।

আপনাদের আছে? দেবেন একটুখানি? না, এক্ষুনি নয়। নিজেদের মুখটি দেখে নিন আগে। তারপর।

দেখা কি যাচ্ছে নিজেকে?

(অপ্রকাশিত। ২২ ডিসেম্বর '৯০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ নেপথ্য

উৎসর্গ

মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরীর
স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯২ প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাড়িতে মৌচাক

তাঁর নাম সিদ্দিক হোসেন ওরফে ভ্যাবলা। নামটা শুনে কেউ যদি মনে করেন যে তিনি ভ্যাবলাকান্ত কিংবা বোকা ধরনের কোনো লোক, তাহলে ভুল করবেন। বেঁটে-খাটো, গোলগাল, চলনে-বলনে চটপটে মানুষটি অত্যন্ত চালাক, রসিক, হিউমারাস।

যখনকার ঘটনা বলছি তখন রংপুর শহরের কাচারিবাজারে তাঁর ছিল ছোট্ট একটি পান-সিগারেটের দোকান। নিজেই দোকানদারি করতেন। এত দ্রুতহাতে পান বানাতেন তিনি, ছিল তা দেখবার মতো। পরতেন চেকলুঙি, বিরাট পকেটওয়ালা শার্ট। দুআঙুলে সিগারেট গুঁজে এমন কায়দা করে টান দিতেন, উর্ধ্বমুখে ফুরফুর করে ধোঁয়া ছাড়তেন, মনের আনন্দে কিংবা হতে পরে অভ্যাসবশত উরু নাচাতেন ঘন ঘন, তাও ছিল দর্শনীয়।

ভ্যাবলা ভাইয়ের সেই দোকানটির পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই। তবে বয়সের ভারে প্রাণচঞ্চল মানুষটি এখন কিছুটা নুয়ে গেছেন। বয়স এখন তার চুয়ান্ন বছর, ৯ ছেলেমেয়ে। চলনে-বলনে আগেকার মতো প্রাণচাঞ্চল্য নেই।

আমার এ কাহিনী তাঁর অবস্থা পরিবর্তনের নয়, তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনী নিয়ে হবে আলাদা রচনা। খবরের একজন 'সোর্স' হিসেবে এই ভ্যাবলা ভাই কিভাবে আমার পেশাগত জীবনে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেই গল্পটাই আজ শুধু বলছি। হ্যাঁ, আপনাদের অচেনা-অজানা এক ভ্যাবলা ভাই, যিনি সাংবাদিকতা বোঝেন না, খবরের কাগজ সম্পর্কে তেমন উৎসাহী নন, সাধারণ এক পান-দোকানদার, তিনিই আমাকে সর্বপ্রথম শিখিয়েছিলেন সরজমিন প্রতিবেদনের ব্যাপারটি। মিথ্যা, মনগড়া কিংবা টেবিলমেইড সাংবাদিকতা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়। এমন হতে পারে যে, কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তিনি ঘটনাটি ঘটাননি, কিন্তু হালকা করে বলা যায়, তিনি ঐ ঘটনায় আমাকে 'হাড়ে হাড়ে শিক্ষা' দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন 'আজাদে' কাজ করি। রংপুর থেকে 'নিজস্ব সংবাদদাতা'। অল্প বয়স, কেবলি নিয়োগপত্র পেয়েছি, কাজ করবার খুব উৎসাহ। রোজ রোজ মেলা মেলা খবর আর ছবি পাঠাই, নিয়মিত ছাপা হয়। লাইনেজ চার পয়সা, একেকটা প্রকাশিত ছবি পাঁচ টাকা। আজাদের মফস্বল বার্তা সম্পাদক ছিলেন তখন দুদু ভাই (মরহুম সৈয়দ ওবায়েদউল্লাহ চৌধুরী)। সরাসরি তাঁর কাছেই আমার খবরের প্যাকেটগুলো যেত। প্যাকেট খুলে যদি দেখতেন যে, কোনো খবর প্রথম পাতায় যাবার মতো, নিজে গিয়ে দিয়ে আসতেন বার্তা সম্পাদক সাহেবের হাতে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় নানা বিবর্তন এলেও এই নিয়মটি এখনও দেশের অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় বহাল রয়েছে।

আমার কর্মক্ষেত্র তখন উত্তরাঞ্চল নয়, শুধু রংপুর। নেই-কাজে ঘুরে বেড়ানো কিংবা আড্ডা-আসর করবার প্রচুর সময় ছিল। রংপুর শহরের যে জায়গাটায় কোর্টকাচারি, সেই জায়গাটার নাম কাচারিবাজার, প্রায়শই আড্ডা হতো এর চত্বরে। সেখানেই ভ্যাবলা ভাইয়ের সাথে একদিন পরিচয়, তারপর একসময় অন্তরঙ্গতা। রোজ সকাল-বিকেল শহর থেকে বাসায় যাতায়াতের সময়ও তাঁর সাথে দেখা হতো। সালাম বিনিময়, এটা-ওটা কথা, একদলা মিষ্টি-মশলা দেওয়া পান। কখনো জিগ্যেস করতেন, 'আইজ কি কি রেপোট্ পাঠাইলেন রেপোটার সাইব, কন?'

বলতাম। কোনোটাই তাঁর মনঃপূত হতো না। তাঁর ধারণা, এইসব 'আলতু ফালতু' রেপোট্ ছাপিয়ে এই দুনিয়ায় কারও কোনো লাভ নেই। কে এসব পড়ে, কোথায় কোন্ উন্নতিটা হয়! কে কোথায় কী বক্তৃতা করল, বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে না কমছে, মশা-মাছির উৎপাত, চোরাচালানি, কে ঘুষ খায়, কার বউ নিয়ে কে পালালো, পত্রিকায় এইসবই শুধু লেখা হয়ে থাকে। জনগুরুত্বপূর্ণ কিংবা পাঠকে পছন্দ করে এমন খবর কী কারণে ভ্যাবলা ভাইয়ের অপছন্দ, তা বোঝা ছিল দুষ্কর। আমি বলতাম, আপনিই বলুন ভ্যাবলা ভাই, এইসব ঘটনা ছাড়া আর কী খবর লিখি? আপনার কাছে আছে কি কোনো খবর? থাকলে বলুন, এক্ষুনি পাঠিয়ে দেই। তিনি বলতেন না কিছু। অন্য প্রসঙ্গে যেতেন। বলতেন, 'ন্যেন, একটা মিঠা পান খান রেপোটার সাইব।' রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রিপোর্টার কথাটা উচ্চারণ করতেন রেপোটার। আর সাহেবকে বলতেন সাইব।

সেই ভ্যাবলা ভাই, একদিন সোর্স হিসেবে 'এক্সক্লুসিভ' একটা খবরের সন্ধান দিলেন। শহর থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে নিসবেতগঞ্জ, সতরঞ্জির জন্যে দেশ-বিদেশ বিখ্যাত, সেখানে এক মজার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে এক কৃষকের দাড়িতে মৌমাছি চাক বেঁধেছে।

বলেন কী! দাড়িতে মৌচাক? আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ হই। কোথায় পেলেন এ খবর? কে বলল আপনাকে? কবেকার ঘটনা? কোন্ গ্রাম? ঐ কৃষকের নামটা কী?

ভ্যাবলা ভাই আমার উত্তেজনার টগবগানির সাথে সাথে তাঁর স্বভাবগত উরু নাচাতে লাগলেন আর মুখে ঝুলিয়ে রাখলেন রহস্যের হাসি। আমার তর সয়না, কিন্তু তিনি আমাকে পাশে বসান, মিঠা পান বানিয়ে তুলে দেন হাতে। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের উরুতে থাপ্পড় মেরে বলেন, 'কী যে রেপোটারি করেন আপনেরা! আসল খবর রাখেন না, খালি খালি এটা-ওটা লেখেন! আসল খবর পাইতে হইলে আইসেন আমার কাচে।'

আমার মাথায় তখন 'এক্সক্লুসিভ'-এর টগবগ। ভ্যাবলা ভাইকে থামিয়ে দিয়ে বলি, দাড়িতে মৌচাক বাঁধল কোথায়, সেই খবরটা বলেন!

তারপরেও অনেকক্ষণ এটা-ওটা প্যাঁচাল, অবশেষে তিনি আমার কানের কাছে আনলেন মুখ, যা বললেন তার সংক্ষিপ্ত সার হলো : নিসবেতগঞ্জ গ্রামে তাহের মিয়া নামের এক কৃষক তার ধানক্ষেত নিড়ানি দিচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখতে পেল একঝাঁক মৌমাছি তার মাথার ওপর দিয়ে গুঞ্জন করতে করতে উড়ে যাচ্ছে। তাহের নিড়ানি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ সে দেখতে পেল মৌমাছিগুলো তার মাথার ঠিক ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে। হাঁ করে দেখছে তাহের, পালাবে কিনা ভাবছে, কিন্তু হঠাৎ, মৌমাছির ঝাঁক একেবারে নিচে নেমে এলো এবং মুহূর্তের মধ্যে তার দাড়িতে চাক বেঁধে ফেলল। ভ্যাবলা ভাই জানালেন, তিনি নিজে আজ সকালে ঐ গ্রামে গিয়ে ঘটনাটি দেখে এসেছেন। লোকটার দাড়িতে এখনও মৌচাক বাঁধা আছে, চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ দেখতে আসছে তাহের মিয়ার এই ঘটনা।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। মাথার ভেতর উত্তেজনা, যেন একঝাঁক মৌমাছি আমার মাথার ওপরই গুঞ্জন করছে। চোখের সামনে দেখতে পাই 'আজাদে'র প্রথম পাতায় এই খবরটির কিরকম ডিসপ্লে হয়েছে। আমি প্রায় ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করি, ভ্যাবলা ভাই, এই খবরটা কি আমাদের আর কোনো সাংবাদিক জানে? ভ্যাবলা ভাই আমাকে যেন উড়িয়ে দেন, বলেন, 'দূর! আপনের কি মাতা খারাপ? কোনো রেপোটার গ্রামোত্ যায়? না না, এটা আমি কারও কাছে বলি নাই।'

সবাইকে টেক্কা দিয়ে 'এক্সক্লুসিভ' করার চিন্তা আমার। ভ্যাবলা ভাইয়ের হাত চেপে ধরি। 'এই ঘটনাটি যেন অন্তত আজকের দিনের জন্য আর কেউ না জানে। প্রেসক্লাবের দিকে যাবেন না, অন্য কোনো সাংবাদিক এলে টুঁ শব্দটি করবেন না।' ভ্যাবলা ভাই এক্সক্লুসিভ নিউজ বোঝেন না, তবে এটা বুঝলেন যে, আমি সত্যি সত্যি চাই না এই খবরটি আর কেউ জানুক। একটা মিঠা পান খাওয়ানোর পর তিনি আমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করলেন।

আমার উচিত এক্ষুনি নিসবেতগঞ্জ চলে যাওয়া, ঘটনার বিবরণ জানা, ছবি তুলে আনা। কিন্তু হাতে সময় কোথায়? কালকের কাগজে খবরটি ধরাতে হলে এক্ষুনি তা পাঠানো দরকার। টরে টক্কা (মর্স সিস্টেম) টেলিগ্রাম, তাতে আবার রাত আটটার পর টেলিগ্রাম অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। ভাবলাম, ঘটনাস্থলে কাল যাওয়া যাবে, আনা যাবে বিস্তারিত বিবরণ আর ছবি, আজ অন্তত প্রাথমিক খবরটি পাঠানো যাক। আমি নিশ্চিত যে, 'দাড়িতে মৌচাক' এই খবরটি আজ পাঠাতে পারলে কালকের কাগজের প্রথম পাতার 'বক্স আইটেম'। নিসবেতগঞ্জ যাবার বদলে চলে আসি টেলিগ্রাম অফিসে। ভ্যাবলা ভাই নিজে যখন ঘটনাটি দেখে এসেছেন, তখন আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট্ট টেলিগ্রাম। কিছুক্ষণের মধ্যে মেসেজটি ঢাকায় পাঠানো শেষ হয়। টেলিগ্রাম মাস্টার সাহেবকে এক কাপ চা খাওয়াই, আর অনুরোধ করি, কোনো সাংবাদিক টেলিগ্রাম অফিসে এলে সে যেন আমার মেসেজের কপিটি না দেখে। তখন এরকম ব্যাপার-স্যাপার চলত যে, অনেকে দিনমান কোনো খবরেরই সন্ধান করত না, সন্ধ্যার পর টেলিগ্রাম অফিসে এসে অন্যের কপি 'টুকলিফাইং' করে পাঠাত।

হতে পারে এটা একধরনের টেক্কা মারার মানসিকতা, কেউ কেউ আরও কঠোরভাবে বলতে পারেন মনোবিকৃতি, সেসব নির্দ্বিধায় স্বীকার করে বলি, টেলিগ্রাম মেসেজটি পাঠানোর পর এক্সক্লুসিভের আনন্দে থাকি। আর কেউ জানার আগেই আমার খবরটি ছাপা হয়ে যাবে! মজিদ ভাই (মরহুম সাংবাদিক আবদুল মজিদ), খোকা ভাই (ইত্তেফাকের নোয়াজ্জেস হোসেন খোকা) এঁদের মাথা ঘুরে যাবে! আজ নিশ্চয়ই এটি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মফস্বলীয় ধারণা, কিন্তু দুযুগ আগে এটাই ছিল বাস্তব। ওদের সামনাসামনি পড়বার ভয়ে সন্ধ্যার পর প্রেসক্লাবেও যাই না।

ধারণা সত্যি হয়। পরদিন বিকেলে কাগজ এসে পৌঁছয় রংপুর শহরে। 'আজাদে'র বাণ্ডিল খুলে দেখি প্রথম পাতায় মোটা বক্স করে রিপোর্টটি ছাপা হয়েছে, হেডিং দিয়েছে 'দাড়িতে মৌচাক'। আজাদ রংপুরে তখন চলত ভালো, কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট্ট শহরটিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। গরম পিঠের মতো বিক্রি হয়ে যায় পত্রিকা। 'দারুণ একখানা খবর দিয়েছ' বলে অনেকে পিঠ চাপড়ায়, কেউ মুখে ধন্যবাদ দেয়, দুয়েকজন বলে, 'এ খবর পেলে কী করে? অন্য কাগজে তো দেখি না!'

'দাড়িতে মৌচাক' ছাপা হলো। বাহবা পেলাম। পরদিনই 'আজাদ' থেকে বার্তা সম্পাদক সাহেবের টেলিগ্রাম। 'খবরটি ভালো হয়েছে এবং সেজন্যে ধন্যবাদ। এধরনের খবর আরও পাঠাবেন, আজাদ কর্তৃপক্ষ তাই আশা করে।'

কিন্তু বিপত্তি বাধাল ইত্তেফাক। খবরটি ছাপা হবার পরদিন আমি যখন 'ধন্যবাদ বার্তা' পেলাম, একই সময়ে ইত্তেফাকের রংপুর সংবাদদাতা নোয়াজ্জেস হোসেন ওরফে খোকা পেলেন আরেকখানা টেলিগ্রাম। ইত্তেফাক থেকে বলা হয়েছে আজই তাকে নিসবেতগঞ্জ গ্রামে যেতে হবে এবং দাড়িতে মৌচাক সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। পাঠাতে হবে ছবি। নোয়াজ্জেস হোসেন খোকা ক্যামেরাম্যান ভাড়া করে ছুটলেন নিসবেতগঞ্জে, কৃষক আবু তাহেরের খোঁজে।

দিনমান ঘোরাঘুরির পর প্রায়-বিধ্বস্ত অবস্থায় শহরে ফিরে এলেন ইত্তেফাক সংবাদদাতা। শুধু একটি গ্রাম নয়, গোটা নিসবেতগঞ্জ এবং আশপাশের এলাকা চষে বেড়িয়েছেন তিনি, কিন্তু আবু তাহের নামে কোনো কৃষকের দেখা পাননি, দাড়িতে মৌচাক বাঁধার খবর তো দূরের কথা। এই শুনে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল, মনে হতে লাগল যেন বা আমার মাথাতেই একঝাঁক মৌমাছি চাক বেঁধে ফেলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোয়াজ্জেস হোসেন খোকা, ইত্তেফাকের সাংবাদিক, তিনি টেলিগ্রাম করে জানালেন তাঁর বিবরণ : দাড়িতে মৌচাকের পুরো ব্যাপারটিই মিথ্যা। নিসবেতগঞ্জ কিংবা আশপাশের গ্রামে আবু তাহের নামে কেউ নেই। কারও দাড়িতে মৌচাক বাঁধবার মতো ঘটনা গ্রামের কেউ জানেন না, শোনেননি। পরদিন ইত্তেফাক প্রায় একফুট লম্বা এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করল যার শিরোনাম : 'এই হলুদ সাংবাদিকতা আর কতদিন চলিবে?'

শুধু ইত্তেফাক নয়, সম্পাদকীয় ছাপা হলো আবদুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত সান্ধ্য-দৈনিক 'আওয়াজে'। আমি তখন আল্লা আল্লা করছি। আজাদ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিকে কিভাবে নেবেন?

ইত্তেফাকে সম্পাদকীয় প্রকাশের দিনই এলো আজাদ থেকে টেলিগ্রাম। 'দাড়িতে মৌচাক সম্পর্কিত খবরের বিস্তারিত ডক্যুমেন্ট আর ছবি নিয়ে অবিলম্বে ঢাকায় চলে এসো।' আমি ছুটে গেলাম ভ্যাবলা ভাইয়ের কাছে। সালাম দেবার সময় নেই, কেমন আছেন কেমন নেই জানার ফুরসত নেই, আমি তাঁকে সরাসরি বললাম, চলেন নিসবেতগঞ্জ যেতে হবে। আবু তাহেরকে দরকার। এই যে দেখেন ইত্তেফাকে কী লিখেছে! কাগজখানা মেলে ধরি তাঁর সামনে।

কিন্তু তিনি কাগজ দেখার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নন, বরং পানপাতার ওপর ঘষতে থাকেন চুনের কাঠি, মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলেন, 'চুপচাপ বসেন, একখান মিঠা পান খান।'

তাঁর হাসি গায়ে জ্বালা ধরায়, চুনের লেপন যেন আমার দেহের চামড়ার উপরই দিচ্ছেন তিনি। আমি প্রচণ্ড টেনশনে, গলার কাঁটায় শিরশির বিচিত্র অনুভূতি, নতুন সাংবাদিকতা কচুর পাতার পানির মতো টলমল, আর আমার 'সোর্স' ফুকুর ফুকুর হাসছেন আর আমাকে মিঠা পান খেতে বলছেন!

: ভ্যাবলা ভাই!

উত্তেজনার কণ্ঠে ডাকি। কিন্তু নিজের কানেই তা যেন কোনো বোকার উচ্চারণ ধ্বনির মতো শোনায়। ভ্যাবলা ভাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান, খুব ভঙ্গি করে সিগারেট ধরান একখানা, তারপর লম্বা ধোঁয়ার সাথে উচ্চারণ করেন, 'রেপোটার সাইব, আপনে একটা আহাম্মক!' তারপর থেমে থেমে বলতে থাকেন, 'আইজ আপনাকে আর এক্খান রেপোর্ট দেবো। পাঠেয়া দেন।' তিনি যা বললেন, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো : মাহিগঞ্জে (রংপুর শহর পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা) একটি ছাগলের পেট থেকে মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ভূমিষ্ঠ হবার পরই সে নাকি উঠে দাঁড়ায়, হাসতে থাকে, যাকে সামনে দেখে হাত তুলে সালাম দেয়। তারপর একসময় হঠাৎ করে চিৎপটাং মারা যায়।' ভ্যাবলা ভাই আবার বলেন সিরিয়াস কণ্ঠে, 'দ্যেন, পাঠে দ্যেন এই রেপোট্!'

আমি হা করে থাকি। হাস্যকৌতুকে যে লোকটিকে সর্বক্ষণ দেখি, তার গম্ভীর কণ্ঠ, স্থির চেহারা, আমাকে হকচকিয়ে দেয়, ভীত করে তোলে। দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষটিকে মনে হয় অচেনা, ভীষণ অহংকারী, নিষ্ঠুর। আমি একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিই, এমন অনুভূতি হচ্ছে যে আমি এখন কেঁদে ফেলব, সেই মুহূর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানের পাটাতন থেকে নেমে আসেন ভ্যাবলা ভাই, আমাকে প্রায় জোর করে বসান সামনের একটা টুলে। তারপর, এক পান-দোকানদার, এখন যেন শিক্ষকরূপে অবতীর্ণ, বলতে থাকেন, 'রেপোটার সাইব, আমি খবরটা কইলাম আর আপনে পাঠে দিলেন? সত্য কইলাম না মিথ্যা কইলাম, যাচাই করি দেখা লাগবে না? নিসবেতগঞ্জ যাওয়া লাগবে না? এ্যই আপনে রেপোটার! আমার মুখ থাকি শুনলেন আর পাঠে দিলেন? ... ভালো হইচে, আপনের একটা শিক্ষা হওয়া দরকার আচিলো ...'

শিক্ষা তো হলো, কিন্তু যাওয়া দরকার ঢাকায়। ট্রেনে চাপলাম ঐদিনই রাতে। পরদিন সকালে ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে সোজা আজাদ অফিসে। দেখি, হ্যাঁ, দুদুভাই এসে গেছেন। একমনে মফস্বলের পাতার খবর কাটা-ছেঁড়া করছেন তিনি। চশমার উপর গলিয়ে প্রথম দর্শনে তাঁর প্রথম কথা : যান, এম. ডি. সাহেবের ঘরে যান। আপনার নিয়োগপত্র বাতিল হয়ে গেছে।

আমি ধপ করে বসে পড়ি। চেয়ারে নয়, দুদুভাইয়ের পায়ের কাছে। হাত রাখি বৃদ্ধের পায়ে। আমার ভুল হয়ে গেছে দুদুভাই। আমাকে আপনি বাঁচান। প্রায় লাফিয়ে উঠেন দুদুভাই। টেনে দাঁড় করান। 'না না এখনও কোনো ডিসিশন হয়নি। এম. ডি. বলেছিলেন আপনাকে বাতিল করে দিতে, আমি ম্যানেজ করে নিয়েছি। বলেছি নতুন ছেলে, ভুল করে ফেলেছে। প্রথমবারের জন্যে মাফ করে দেওয়া যায়।' এই বলে হঠাৎ ধমকের সুরে বলে উঠেন তিনি, 'ধরুন, কান ধরুন।'

তারপর অর্ডার হাঁকলেন চায়ের।

AMARBOI.COM

পরদিন ফিরে এলাম রংপুরে। কিন্তু মনে বড় অভিমান। যখনই কাচারিবাজারে যাই ভ্যাবলা ভাইয়ের দোকানটি চোখে পড়ে, কিংবা লোকটাকে দেখি, ঐ কথা মনে পড়ে, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ক্ষোভ হয়, হাস্যকৌতুকে প্রাণবন্ত একটি মানুষ কী করে এতবড় একটা ধাপ্পা দিতে পারে, সাংবাদিককে নিয়ে নির্মম উপহাস করতে পারে! কিন্তু যতই দিন যায়, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হাজারো চিত্র-বিচিত্র চরিত্র সামনে আসে, ক্রমশ যখন হই জীবন-বাস্তবতার মুখোমুখি, তখন ভ্যাবলা ভাইয়ের সেই নিষ্ঠুরতা ম্লান হয়ে আসে। কৌতুক করুন কিংবা নির্মমতা, অথবা আমাকে তিনি ঠকিয়ে উপহাসের পাত্র করে তুলুন, যা-ই করুন, তিনি অন্তত এটুকু শিক্ষা দিয়েছেন যে, লোকের মুখে শুনে রিপোর্ট হয় না, ঘটনাস্থলে না গেলে তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

এবং এই ধরনের ব্যাপার-স্যাপার বাংলাদেশের সংবাদপত্রে আজো ঘটছে এন্তার। 'দাড়িতে মৌচাক' সম্পর্কিত রিপোর্টের ঘটনাটি আজ থেকে ২৫/২৬ বছর আগেকার, কিন্তু আধুনিক সাংবাদিকতার যুগেও, যখন পত্রিকা মুদ্রণশিল্পে বিপ্লব ঘটেছে, শহর ও গ্রামে সাংবাদিক সংখ্যা বেড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কম্পিউটার, টেলেক্স, টেলিফোন এমনকি ফ্যাক্স-সুবিধা সম্প্রসারিত, কর্মরত সাংবাদিকরা যাতায়াত ভাতা পাচ্ছেন, তখনও কিন্তু পাঠকরা বানোয়াট খবর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেহাই পান নি। গ্রামীণ সাংবাদিকতা তো বটেই, জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতাতেও চলছে এই ভুলের কর্মটি। এর সবগুলোই যে ইয়েলো জার্নালিজমের ব্যাপার, পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যেই কেবল সাধিত হয়ে থাকে, তা নয়। এমনটি হয়ে থাকে ঘটনাস্থলে যাবার আলসেমির জন্যে, কর্তব্য ফাঁকি দেওয়ার কারণে অথবা আমার ঐ 'দাড়িতে মৌচাক' খবর পরিবেশন করে অপরকে টেক্কা দেওয়ার মানসিকতা থেকে। পাঠক তো ঘটনাস্থলে যান না, তাঁরা অনেকে চটকদার খবর পড়ে পুলকিত হন, বাহ্বা দেন, কিন্তু কখনো-কখনো ধরা পড়ে গেলে হয় বিপত্তি। বিপত্তি মানে কারও চাকরি যায় না, অনেকক্ষেত্রে কৈফিয়তের সম্মুখীনও হতে হয় না, শুধু পত্রিকার ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হয়। হেয় হন গোটা সাংবাদিক সমাজ, সাংবাদিকতার মতো মহৎ পেশাটি খেলো হয়ে ওঠে।

এইতো '৯১ সালের ঘটনা। উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলছে। শতশত মানুষ মরছে খাদ্যাভাবজনিত অপুষ্টিতে। স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে ডায়রিয়া, সরকার বলছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক, জাতীয় সংসদে দুর্ভিক্ষ না আকাল এই নিয়ে বিতর্ক, অপরদিকে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ হচ্ছে। ঢাকার নবীন-প্রবীণ অনেক সাংবাদিক এসে পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট লিখছেন, একের পর এক যাচ্ছে ছবি। উত্তরাঞ্চলে কী ঘটছে জানতে চান গোটা দেশের সচেতন মানুষ। রয়টার, এপি, এএফপি, বিবিসির প্রতিনিধিরাও ছুটে এসেছেন। বিরোধী দল বলছে মানুষ বাঁচাও, রিলিফ দাও; আর ঘটনাস্থল থেকে অনেকদূরে বসে একদল বলছে, 'পত্রপত্রিকায় যা লেখা হচ্ছে তা অতিরঞ্জিত।' কেউ কেউ আবার অনাহারী মানুষের লাশের ওপর দাঁড়িয়েও নানা 'শঙ্কা' করছেন। কেউ বলেন, 'ওরা সরকারকে ফেলে দিতে চায়', কেউ বলেন, 'শিশু গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে।' এরকম নানা কথা। একজন সিনিয়র মন্ত্রী তো এলাকা সফরের নামে রংপুর শহরে বসেই রায় দিয়ে বসলেন, 'তিন-চার বছর আগের পুরাতন কঙ্কালসার শিশুর ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।' কেউ বললেন, 'এ ছবি গুলিস্তানের ফুটপাত থেকে তোলা।' অনেকে এসব কথা বিশ্বাসও করলেন। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতির পর নভেম্বরে ঢাকায় যখন গেলাম, বহু বুদ্ধিজীবী পাঠকের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হলো। অপুষ্টি-আক্রান্ত শিশুটির ছবি নাকি পুরাতন? তিন-চার বছর আগেকার?

কেন এই অবিশ্বাস? এর নানা কারণ, তার অন্যতম একটি হলো, ক্রেডিবিলিটি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পাঠকের মনে সন্দেহ। শুধু সাধারণ পাঠক কেন, ঢাকার অনেক নামজাদা সাংবাদিকও জিগ্যেস করেছেন : 'সত্যি কি উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল? মানুষ কি সত্যি মারা গেছে? তোমাদের ছবিগুলো কি সাজানো? নাকি আগেকার ছবি মেরে দিয়েছ? মন্ত্রী যে বলেন ...' ইত্যাদি।

জবাবে আমি সত্য বলতে চাই। পারি না। একজন প্রশ্নকর্তা ড্রয়ার থেকে বের করেন অতি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পত্রিকা। বেশ বড় সাইজের ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে পথের ধারে মানুষে-কুকুরে একসাথে খাবার খাচ্ছে। ভয়াবহ এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য। গা শিউরে ওঠে। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর এ ছবিটি বগুড়া শহর থেকে তুলেছেন বাংলাদেশের নামী এক আলোকচিত্রী।

ছবিটি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী? প্রশ্নকর্তা সিনিয়র সাংবাদিক ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চান। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাই। খুব রহস্যের মতো করে তিনি হাসেন, ড্রয়ার থেকে বের করেন আরেকখানা পত্রিকা। এটি বগুড়া থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত আঞ্চলিক দৈনিক 'করতোয়া।'

করতোয়া'র রিপোর্টটি পড়ে হা হয়ে গেলাম। প্রতিবেদক তার বর্ণনাধর্মী রিপোর্টটিতে বলেছেন যে, বগুড়া শহরের একটি হোটেলে দীর্ঘদিনের নিয়ম রয়েছে, যেসব খাবার বেঁচে যায় সেসব রাত এগারটা-বারোটার দিকে শহরের ভাসমান নরনারী-শিশুদের বিলিয়ে দেওয়া হয়। হোটেলের সামনে লাইন ধরে বসে সে খাবার খায় তারা, কেউ বয়ে নিয়ে যায় অন্যত্র।

ঘটনার দিন রাতের বেলা একই ব্যাপার ঘটেছিল। হোটেলের অবিক্রিত ভাত-তরকারি দেওয়া হচ্ছিল মিসকিনদের। আর এসময় রংপুর থেকে বগুড়া হয়ে ঢাকাগামী দুজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে। একটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিক তাঁরা। একজন রিপোর্টার, অপরজন ফটোগ্রাফার।

'মারাত্মক' একখানা ছবি চাই। ভূত যেন চাপল মাথায়। ফটোগ্রাফার করলেন কী, মিসকিনরা যেখানে ভাত খাচ্ছিল, সেখানে পথের উপর ছিটিয়ে দিলেন কিছু ভাত। ছুটে এলো কয়েকটি কুকুর। ভাত খেতে লাগল মানুষগুলোর পাতের পাশে। ওমনি শার্টার। শার্টারের পর শার্টার। ফ্লাশ ঝলকাচ্ছে।

সে সময় ছবিঘরের নাইট শো শেষ। পথে অনেক মানুষ। সচকিত তারা অনেকেই দেখলেন ছবি তোলার এই দৃশ্যটি। কেউ উপভোগ করলেন, কেউবা হলেন ক্ষিপ্ত। পরিচয় পাবার পর প্রকাশ্য মন্তব্য করলেন তারা, এই কি সাংবাদিকতা? ছি ছি!

ঘটনার সময় অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন করতোয়া'র এক রিপোর্টার। তিনিও ক্ষিপ্ত। ফিরে গেলেন অফিসে। নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে লিখলেন একটি প্রতিবেদন। পরদিন তা প্রথম পাতার টপে গুরুত্বের সাথে ছাপা হলো। পরদিন একই পত্রিকায় কড়া ভাষার সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রশ্নকর্তা, অগ্রজ সাংবাদিক, যেন এই ঘটনার সব দোষ আমারই, সেভাবেই কথার ছুরি হেনে হেনে বললেন, 'তোমরা যদি এইসব কাণ্ড করো, পাঠক তোমাদের বিশ্বাস করবে কী করে?'

আমি আর কী বলব? চুপ করে থাকি। সিদ্ধান্ত নিই, বগুড়া গিয়ে ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে হবে। করতোয়া'র সাংবাদিকই আবার ঘটনাটি উল্টোপাল্টা লিখলেন নাতো! কদিন পর ট্যুরে গেলাম বগুড়ায়। ঐ হোটেলের ম্যানেজার, আশপাশের দোকানদার, ভাজাওয়ালা এবং প্রতিদিন রাতে যারা পথের ধারে বসে খাবার খায়, তাদের সাথে আলাদা-আলাদা করে কথা বললাম। জানা গেল, করতোয়া'য় প্রকাশিত বিবরণ সঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার, যিনি স্থানীয় সাংবাদিক সংগঠনের একজন নেতা, তাঁর সাথেও আলাপ হলো। আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম, কাকে তো কাকের মাংস খায় না বলে অনেকে বলেন। তা আপনি এই রিপোর্টটি লিখলেন কেন? এতে তো সাংবাদিকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে!

তরুণ রিপোর্টার, আমার কথা শুনে যেন জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'রাখেন ওসব ভাবমূর্তি-টাবমূর্তি! যেখানে অসাধুতা আর ছলনা, সেখানে আবার ভাবমূর্তি কী?' তারপর বললেন গলা একটু নামিয়ে, 'আমি তো ঐ পত্রিকার নাম দিয়ে দিয়েছিলাম, ঐ রিপোর্টারদের নামও দিয়েছিলাম। সেগুলো কেটে দিয়েছে।'

খবর বা ছবির বিকৃতি শুধু এদেশে নয়, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশেই ঘটে থাকে। কিন্তু এদেশে, নিরক্ষরতার সংখ্যা যেখানে বেশি, পত্রপত্রিকার পাঠক কম, সচেতন পাঠকের সংখ্যা আরও কম, সেখানে ক্ষতির পাল্লা হয়ে যায় ভারি। সামাজিক অবক্ষয় সবখানে, সে অবক্ষয়ের ঢেউ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও যখন লাগে, সত্য-মিথ্যা একাকার হয়ে যায়। তখন সত্য চিত্রকেও 'মন্ত্রী মহোদয়' বলেন যে, এটা তিন-চার বছর আগের পুরাতন এবং অনেক পাঠক তা বিশ্বাসও করেন।

AMARBOI.COM

মিথ্যা, বানোয়াট, বিকৃত খবর হরদম প্রকাশিত হচ্ছে পত্রপত্রিকায়। হালে এ প্রবণতা বেড়েছে। কোনো কোনো পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই চোখে পড়ে ত্রুটি স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা। বলা হয়, অমুক রিপোর্টটি সঠিকভাবে যাচাই না করেই ছাপা হয়েছে ইত্যাদি। কোনো পত্রিকা আবার প্রতিবেদন প্রকাশের পরই তার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং পরবর্তীকালে তাদের ভুল স্বীকারের ভাষা এরকম, '... লেখাটি সম্পূর্ণভাবে অসাবধানতাবশত ছাপা হয়েছে এবং প্রকাশের পর তথ্যানুসন্ধানে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, লেখাটিতে যে বক্তব্য এসেছে প্রকৃত সত্যের আলোকে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

দুর্ভিক্ষ বনাম আকাল

১

'৯১-এর ২৯ এপ্রিল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল তাতে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে দেশবাসী। আর্তমানবতার ডাকে সাড়া দেয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তারা, আসে প্রচুর বিদেশি সাহায্য।

এই ঘটনার কিছুদিন আগে বি.এন.পি সরকার গঠন করেছে। কোনো কোনো দুর্মুখ মন্তব্য করলেন, 'এই সরকার কুফা।' কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'খালেদা জিয়া পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন তো?' কিন্তু পারলেন। দ্রুত পৌঁছুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যসামগ্রী, মাসখানেকের মধ্যে পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সমুদ্রের বেলাভূমিতে পড়ে থাকল শুধু শোক।

বড় ধরনের সংকট আবার শুরু হলো উত্তরবঙ্গে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মারা গেল হাজারো মানুষ। কিন্তু সামান্য শোক হলো না, বরং অনাহারী মানুষের শূন্য জঠরের পাশে জমে উঠল দারুণ এক রাজনৈতিক বিতর্ক। দুর্ভিক্ষ না আকাল, অপুষ্টি না ডায়রিয়া, এই নিয়ে তোলপাড়। আবার কেঁপে উঠল বাংলাদেশ। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুযোগের দাবিতে জাতীয় সংসদে 'ওয়াকআউট' করলেন বিরোধী দলের (সবাই নয়) সদস্যরা, চার বাম দলের কজন নেতা দুর্গত এলাকা সফর করে ভয়াবহ পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। হারারে থেকে ফিরেই বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'দেশে দুর্ভিক্ষ নেই।' মির্জা গোলাম হাফিজসহ চারজন মন্ত্রী রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলা সদর কেন্দ্র সফর করে এইমর্মে বললেন, 'দেশে দুর্ভিক্ষ নেই, যা আছে তা হলো আকাল এবং প্রতিবছরই আশ্বিন-কার্তিকে উত্তরাঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় এই সংকট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে।' কয়েকজন মন্ত্রী একটানা এলাকা সফর করতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক, পর্যাপ্ত রিলিফ দেওয়া হচ্ছে।' উড়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী। রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা সফর শেষে তিনি বললেন, 'ধান ওঠার আগে পর্যন্ত ত্রাণসাহায্য প্রদান অব্যাহত থাকবে। চলবে টেস্ট রিলিফের কাজ, দুস্থ মায়েদের জন্যে ভিজিডি কার্ডে গম দেওয়া হবে।'

এলেন শেখ হাসিনা। তিনদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন। ত্রাণসামগ্রীর অপ্রতুলতা, বিতরণে অনিয়ম আর গাফিলতির তীব্র সমালোচনা করলেন তিনি। সরকার কথিত আকালকে তিনি বললেন দুর্ভিক্ষ। রংপুর সার্কিট হাউসে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আমাকে বললেন, 'এবারের দুর্ভিক্ষে অনাহার ও ডায়রিয়ায় মারা গেছে প্রায় ৯ হাজার মানুষ।' এই সফর সময়ে বিভিন্ন জনসভা ও পথসভার বক্তৃতায় তিনি দাবি করলেন উত্তরাঞ্চলের জন্যে আরও খাদ্যসামগ্রীর। চাইলেন শিশুখাদ্য, দুধ, শাড়ি, লুঙ্গি, শীতের পোশাক ইত্যাদি। তিনি পরিষ্কার বললেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।' বললেন, 'যথাসময়ে খাদ্য পাঠালে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।'

সরকারের ভাষায় পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক, তখন কেবল বৃহত্তর রংপুরের পাঁচটি জেলার জন্যে দেওয়া হলো সাড়ে ২৭ কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রী। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার জন্যে আরও বহুকোটি টাকা। 'দুর্ভিক্ষ নেই', 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক' এইসব বক্তব্যের পাশাপাশি কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য বরাদ্দের ফলে খুব হালকা কথা হলেও বলা যায় সরকার 'ধরা খেয়ে' গেলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকার এত কোটি টাকা ব্যয় করলেন কেন? এটা কি অপচয়ের পর্যায়ে পড়ল নাকি সত্যি সেখানে খাদ্যসাহায্য প্রয়োজন ছিল?

আসলে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল খুব খারাপ। দুর্ভিক্ষ, আকাল, মঙ্গা, বন্যা-পরবর্তী দুর্গতি, যা-ই বলুন মানুষ মরেছে। মরেছে দীর্ঘদিনের অনাহার-অর্ধাহারজনিত অপুষ্টিতে। না খেয়ে তো আর কেউ মরে না! খায়। শূন্য জঠরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুপাক কিছু খায়, প্রধান খাদ্য হিসেবে কলাগাছ, কচুরমুড়ো, মাছ, আলু, শাকপাতা সেদ্ধ খায়, মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের নাম জপার সময় পানি খায় অন্তত একটুখানি। সেক্ষেত্রে, সরকারের দাবিই সঠিক। না খেয়ে কেউ মরে না।

কিন্তু তারা অপুষ্টির শিকার হয় কেন? কেন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়? স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ তো '৯১-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের খাদ্যাভাবজনিত সমস্ত মৃত্যুকেই ডায়রিয়া বলে চালালেন। শুধু রংপুরের সিভিল সার্জন মাহবুবুর রহমান একটুখানি সাহস করে (সংবাদে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার) বললেন, 'আসলে ডায়রিয়ার মূল কারণ অপুষ্টি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া। অনাহারী পেটে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ।'—কিন্তু একথা বলে পরদিন ধাতানি খেলেন উপর থেকে। এরপর থেকে, যে সাংবাদিকই কথা বলতে যান, 'মৃত্যুর কারণ স্রেফ ডায়রিয়া' ছাড়া তিনি আর কিছু বলেন না। তারও পর আবার এই সময় ঢাকা থেকে এলেন স্বাস্থ্যবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ। তিনি যে কি মন্তর দিলেন আল্লা মালুম, স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন টোটালি মুখ বন্ধ করলেন। ডায়রিয়ায় মৃত্যু-সম্পর্কিত তথ্য দিতেও তারা নারাজ। বিনীত নিবেদন : 'আমাদের চাকরিটা খাবেন না ভাই।'

একজন মার্কিন সিনেট-পত্নীর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মী দল এলেন ঢাকায়। তাদের মধ্য থেকে ডা. জনসনের নেতৃত্বে একটি দল রংপুরে এসে গঙ্গাচড়া উপজেলার নোহালী আর আলমবিদিতর ইউনিয়নে গেলেন। ঐ দুই জায়গাতেই বেশি লোক মারা যাচ্ছিল। 'ডায়রিয়ায়' আক্রান্ত অনেক।

AMARBOI.COM

অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডা. জনসন নোহালীতে নেমেই বিহ্বল। তিনি দুয়েকজন 'রোগী' পরীক্ষার পর দারুণ বিস্মিত। বারবার বলতে লাগলেন, 'আমাকে বলা হয়েছিল এখানে ডায়রিয়া হয়েছে, কিন্তু এ যে দেখছি অন্যরকম ব্যাপার! এরা তো সব ম্যালনিউট্রেশনের রোগী! স্যালাইন বা ওষুধ এদের জন্যে দরকার নেই, এদের জন্যে খাবার দিতে হবে, পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে!'

ডা. জনসনের এই 'প্রেসক্রিপশন' কিন্তু তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা হলো না। হলো অনেক পরে। রংপুরে 'জাউভাত কেন্দ্র' খোলা হলো ৮৩টি, দেওয়া হলো চাল, গম। কিন্তু ততদিনে আরও কিছু প্রাণহানি ঘটে গেছে। আসলে, এবারের ব্যাপার শুধু নয়, অতীতেও দেখা গেছে, সংকট মোকাবিলায় সময়মতো ব্যবস্থা কখনোই নেওয়া হয় না। মানুষ মারা যাবার পর খাদ্য আসে, প্রচণ্ড শীতে মারা যাবার পর যখন একসময় তীব্রতা কমতে থাকে, তখন এসে পৌঁছায় শীতবস্ত্র। ভাঙনে ঘরবাড়ি হারিয়ে যখন একটি পরিবার শহরে চলে যায় পথের ধুলোর আশ্রয়ে, তখন তার গ্রামে পৌঁছায় গৃহনির্মাণ সাহায্যের টাকা। না, শুধু দুর্যোগ-দুর্গতির কালে নয়, সাধারণ সময়গুলোতেও একই ব্যাপার ঘটে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের দীর্ঘসূত্রতা এবং বিভিন্ন দফতরের আমলা-কর্তাদের গাফিলতির কারণে। এরা দৃশ্যত কর্মতৎপর, কথাবার্তায় পাকা, দুনিয়ার হেন জ্ঞান নেই যে মস্তিষ্কে ধারণ করেন না, কিন্তু সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে করবার মতো বুদ্ধিমান নন। এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণে আবাদ মৌসুম পেরিয়ে যাবার পর কৃষকের হাতে যায় বীজ আর ঋণের টাকা। বর্ষা নামার পর সেচযন্ত্র বরাদ্দ বসানো কিংবা শুরু করেন। এদেশে এমন উপমাও আছে যে, স্বাস্থ্যবিভাগের একজন কর্মচারী মারা যাবার একবছর পর তিনি (তাঁর পরিবার) প্রমোশনের চিঠি হাতে পেয়েছেন। এরকম আরও আছে হাজারো 'কর্মকাণ্ড'।

আসলে কোন্ জিনিসটার অভাব? এই যে দুর্ভিক্ষ গেল, সেসময় কি দেশে চাল, গম, টাকার কমতি ছিল? না। উত্তরাঞ্চলে যখন মানুষ মরছে, সরকারের গুদাম তখন চাল-গমে ঠাসা। তবু পরিস্থিতির অবনতি ঘটল কেন? সরকারের সদিচ্ছার অভাব ছিল কি? না, তা হতে পারে না। কোনো গণতান্ত্রিক সরকার চাইতে পারেন না, খাদ্যের অভাবে কিংবা অসুখে মহামারীতে তার দেশের মানুষ পথে পড়ে মরুক। আসলে, '৯১-এর দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে ওঠার কারণটির পেছনে ছিল সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করার ব্যাপারে গাফলতি। কথিত ডায়রিয়া অর্থাৎ খাদ্যাভাবজনিত অপুষ্টিতে মানুষের মৃত্যু শুরু হবার ১ মাস আগে যদি সাড়ে ২৭ কোটি টাকার (পরে যা পাঠানো হলো) খাদ্যসাহায্য বৃহত্তর রংপুরের জেলাগুলোতে পাঠানো হতো, তাহলে এতগুলো প্রাণহানি ঘটত না। অন্তত আমার তাই মত। ব্যাপারটি ইচ্ছে করলে সরকার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। '৯২ সালেও (বাংলা ১৩৯৯) আশ্বিন-কার্তিক মাসে মঙ্গা আসবে উত্তরাঞ্চলে, কর্মসংকট সৃষ্টি হবে, মজুরি না থাকায় মজুরশ্রেণী ও দুস্থ পরিবারগুলোর হাতে খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা থাকবে না। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই যদি সরকার খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেন আর তার সুষ্ঠু বিতরণ কাজ শুরু হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি পত্রপত্রিকায় দুর্ভিক্ষ, আকাল, মঙ্গা এসব কিছুই লিখতে হবে না, উত্তপ্ত বিতর্কের প্রয়োজন হবে না সংসদে, মন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীকে ছোটাছুটি করতে হবে না এবং আমন ধান কাটা-মাড়াই শুরু হবার আগ পর্যন্ত ঐ ত্রাণতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।

এবারেও '৯১-তে এরকম হতে পারত। অক্টোবরে যেভাবে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ হলো, তা যদি হতো ১ মাস আগে দুর্ভিক্ষ, আকাল, মঙ্গা, মৃত্যু, কিছুই হতো না।

২

উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা পুরোপুরি অবগত নন, তাদের জন্যে বলতে হয়, '৯১-এর খাদ্য ও কর্মসংকট পরিস্থিতি নতুন নয়। গত দুদশকের খতিয়ানে দেখা যায়, প্রতি বছরই আশ্বিন-কার্তিক মাসে মঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ক্ষেতে ক্ষেতে যখন আমনের সবুজ সমাহার, কিংবা শীষ উঁকি দেয়, তখন মজুরশ্রেণীর হাতে কাজ থাকে না। আর কাজ না থাকা মানেই হলো আয়-উপার্জন না থাকা, চাল-আটার মতো প্রধান খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা না থাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা ঠিক নয় যে, আশ্বিন-কার্তিক মাস এলেই বৃহত্তর রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলের সর্বত্র সবাই খাদ্য ও কর্মসংকটের শিকার হয়ে পড়ে। একথা বললাম, তার কারণ আছে একটুখানি।

দুর্ভিক্ষের সময় আমার এক লেখকবন্ধু রংপুরে বেড়াতে এলেন ছুটিতে, সস্ত্রীক, তার এক আত্মীয়ের বাসায়। বেড়াতেই এসেছেন, তবু আমাকে বললেন, এসেই যখন গেছি দেখি দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর এক্সক্লুসিভ কিছু লেখা যায় কিনা!

আমি তখন এ-জেলা ও-জেলা আজ এ-উপজেলা কাল ও-উপজেলা ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রচণ্ড ব্যস্ততা যাচ্ছে। আমার পক্ষে তাকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি নিজেই ঘুরে ঘুরে আপনাদের দুর্ভিক্ষ দেখি!

আমি গাইবান্ধা গেলাম। তিনি দুর্ভিক্ষ দেখতে বেরুলেন। ফিরে আসার পর, লক্ষ করি লেখকবন্ধু রীতিমতো ক্ষুব্ধ। তার অভিযোগ, কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় কী! পত্রপত্রিকায় সব বানিয়ে বানিয়ে লেখা হচ্ছে। কোনো মানুষের মৃত্যু তার চোখে পড়েনি।

জিগ্যেস করলাম, কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, কেন, এই রংপুর শহরের কোনো জায়গাই তো বাদ রাখলাম না! চল্লিশ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে গোটা শহর ঘুরলাম, মাহিগঞ্জ গেলাম, তাজহাট গেলাম, ক্যান্টনমেন্টের দিকে গেলাম, চিড়িয়াখানার সামনে দিয়ে হনুমানতলা হয়ে খটখটিয়ার দিকে গেলাম!

আমার সাথে যত কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় আছে, তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি, যিনি আবার একজন পাতি আমলা, টেলিভিশনের পর্দাতেও মাঝে-মধ্যে মুখ দেখা যায়, তার 'দুর্ভিক্ষ দর্শনে'র ভ্রমণ-বর্ণনা শুনে হা হয়ে গেলাম। তিনি রংপুর শহরের ফলের বাজারের সামনে দিয়ে গেছেন এবং দেখেছেন আপেল, কমলা, আঙুরের আমদানি প্রচুর এবং তা দেদার বিক্রি হচ্ছে। মাছের বাজারে খুব বড় বড় রুই, কাতলা, পাঙ্গাস উঠেছে এবং তা কেনার জন্যে খুব ভিড়। চালের বাজারে বস্তা বস্তা চাল, দামও ১১/১২ টাকা। শহরে বহু মানুষের ভিড়, সিনেমা হলের চত্বরে ঢোকাই যায় না, চায়ের দোকানে জমজমাট আড্ডা-আসর, রাজনৈতিক দলের অফিসগুলো নেতা-কর্মীদের পদচারণায় সরগরম। শহরে অফিস-আদালত-ব্যাংক চলছে, দোকানগুলো আলো ঝলমলো, প্রচুর বেচাকেনা ...।

আমি তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু মেজাজ তার খুব খারাপ, থামতে চায় না। বলতে থাকে, আপনার ভাবীকে নিয়ে গেলাম সোনার দোকানে, সেখানে দেখি মহিলাদের এমন ভিড় যে দোকানে দাঁড়ানোর জায়গা নেই! দশ-বারোজন মহিলা বিভিন্ন গয়নার অর্ডার দিতে এসেছেন!

তাকে থামানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। বলি, আর কোথায় কোথায় গেলেন?

তিনি জানালেন, পর্যটনের মোটেলে গিয়েছিলেন। রেস্টুরেন্টে বসার জায়গা নেই। শতাধিক নরনারী বিকেল চারটায় চাইনিজ খাচ্ছেন। খটখটিয়া যাবার পথে স্ত্রীর অনুরোধে চিড়িয়াখানার সামনে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দর্শনার্থীর এতই ভিড় যে, পারেন নি। এই বলে তিনি জোরসে টান দিলেন সিগারেটে, তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুআঙুলে চুটকি বাজিয়ে ছাই ঝাড়লেন এবং ঘোষণার মতো করে বললেন, 'দুর্ভিক্ষ-টুর্ভিক্ষ কিছু নাই, আসলে আপনারা বিএনপি গরমেন্টকে ফালাইয়া দিতে চান।' সরকারের পতন ঘটানো যেন তার সিগারেটের ছাই ঝাড়ার মতো ব্যাপার, আবার সেই ভঙ্গিটি করলেন তিনি।

হাতির কান ছুঁয়ে অন্ধের হাতি-বর্ণনা সেতো গল্পের ব্যাপার। কিন্তু বন্ধুটির শহর দর্শন ও দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান এরকম হবে, সে গল্প অন্যের মুখে শুনলে বিশ্বাস হতো না। হামেশাই শোনা যায় যে, অনেক কবি-সাহিত্যিক আদৌ গ্রামে না গিয়ে শুধু আন্দাজ কিংবা খুব জোর অন্যের মুখের বর্ণনা শুনে গ্রামীণ পটভূমির ওপর সাহিত্য রচনা করে থাকেন। এই বন্ধুটির কথাবার্তা শুনে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। আমি তাকে কী করে বোঝাই যে, রংপুর শহরের ফলের দোকানে ভিড়, বড় মাছ বিক্রি কিংবা পর্যটন মোটেলে বড় খানাপিনা মানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়।

কবিবন্ধু নয়, পরিস্থিতি আরও অনেককেই বোঝানো যায় নি। ঢাকা থেকে ফোন করলেন এক তরুণ সাংবাদিকবন্ধু। বেশকিছু চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট লিখে ইতোমধ্যে নাম কুড়িয়েছেন। তিনি জানতে চাইলেন, মোনাজাত ভাই বলেন তো আপনাদের ওখানকার আসল অবস্থাটা কী?

: আসল অবস্থা তো রোজই পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে!

: কিন্তু এখানে সবাই তো বলছে ঘটনা ঠিক নয়। সেক্রেটারিয়েটে যার কাছে যাই, বলে ওখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক!

আমি বলি, বন্ধু, আপনি কি আশা করেন যে, সেক্রেটারিয়েটের ফুড মিনিস্ট্রি আর রিলিফ মিনিস্ট্রিতে গেলে আপনাকে কেউ বলবে উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছে? আপনি নিজেই চলে আসুন না। নিজের চোখে দেখে যান!

তারপরেও নানান প্রশ্ন। অবস্থা কি চুয়াত্তর সালের মতো হয়ে গেছে?

আমি বলি, না।

: তাহলে আবার দুর্ভিক্ষ কিসের?

: আপনার কথার কী জবাব দেই? আমার সময় নেই, ছবি প্রিন্ট করার জন্যে স্টুডিও যেতে হবে।

: রাখেন ছবি প্রিন্ট। বলেন, অনাহারে কত লোক মারা গেছে?

: এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

: ক্যেন?

ভাগ্য ভালো টেলিফোনের লাইন এসময় হঠাৎ করে কেটে যায়। এনডাবলুডির কল্যাণে আবার যদি কঠিন এবং জটিল প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়, সে ভয়ে বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি।

তবু রেহাই নেই। শহরে পৌঁছুতেই দেখি খ্যাতনামা এক আলোকচিত্রী আমার জন্যে চন্দ্রবিন্দুতে (রংপুর অবস্থানকালে আমার আড্ডার জায়গা) অপেক্ষা করছেন। তিনি একটি ... এজেন্সিতে ছবি সরবরাহ করেন। আমার খুব অন্তরঙ্গ। অনেকদিন বাদে দেখা এবং রংপুরের মতো এই জায়গায়। স্বাভাবিকভাবেই আনন্দ হয়। 'আপনি এসেছেন' বলে জড়িয়ে ধরি তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্রী-বন্ধু খুব গম্ভীর। আমি মনে করি দীর্ঘ জার্নিতে বোধকরি ক্লান্ত অথবা খাওয়া হয়নি অথবা হতে পারে আমার দেখা পাবার আগেই কোনো দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলেন।

কখন এলেন? কোথায় উঠেছেন? চায়ের কথা বলি? কিন্তু তিনি প্রশ্নের জবাব দেন না। মুখ ফিরিয়ে থাকেন এমন ভঙ্গিতে যেনবা বাবার কাছে কোনো কিছু চেয়ে না পাওয়া কোনো বালকের অভিমান! আমি হেসে বলি, ব্যাপারখানা কী বলুন তো? মুড অফ ক্যেন্?

হঠাৎ তিনি উচ্চকণ্ঠ হন। কোথায় আপনার দুর্ভিক্ষ? খামাকা এতদূর কষ্ট করে এলাম! আপনারা কী লেখেন, আর কী দেখলাম! ধুস্!

উষ্ণ চা-পানের পর তার মেজাজের উষ্ণতা খানিকটা কমে। জানতে পারি, তিনি আজ দুপুরে এসে পৌঁছেছেন বিমানে করে, পর্যটনের মোটেলে কামরা নিয়েছেন, তারপর সেখানেই লাঞ্চ সেরে শহরে বেরিয়েছেন লাশের সন্ধানে। আলোকচিত্রী-বন্ধু ঢাকা থেকে শুনে এসেছেন, রংপুর শহরের রাস্তায় লাশ। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ পথের ধারে পড়ছে আর মরছে। তিনি আজ এসেছেন, ইচ্ছে ছিল লাশের ছবি তুলে কালকের বিমানেই ঢাকা ফিরে যাবেন। তারপর এজেন্সিতে পাঠিয়ে দেবেন ছবি। একটা 'হিট' ব্যাপার হয়ে যাবে। এখন গোটা শহর ঘুরেছেন, কোথায় লাশ, কোথায় কী!

আমি জানতে চাই 'রংপুর শহরের রাস্তায় রাস্তায় লাশ' এ আপনি কোত্থেকে শুনলেন? এই ধরনের ফেবরিকেটেড রিপোর্ট আপনাকে কে দিল? তিনি বললেন, 'ঢাকায় তো তাই শুনছি! রংপুরের অবস্থা '৭৪ সালের চেয়েও খারাপ! অনাহারে বহু লোক মারা গেছে।'

আমি তাকে গোটা পরিস্থিতি বোঝাই। কিন্তু তিনি সেসবে উৎসাহী নন। তিনি লাশের সন্ধানে এসেছেন। শুধু জানতে চান, লাশ কোথায় পাই, বলেন তো! আমার যে লাশের দরকার! একটা অন্তত লাশ ...

আমি বলি, লাশ পেতে পারেন হয়তো, কিন্তু রংপুর শহরের রাস্তায় নয়, গ্রামে যেতে হবে। তবে অনাহারে কিংবা না খেয়ে মারা গেছে এমন লাশ পাবেন না, পাবেন অপুষ্টিতে শুকিয়ে যাওয়া কারও লাশ। কয়েকদিন উপোস-কাপাসের পর অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ডায়রিয়া হয়েছে তারপর মারা গেছে, এরকম কারও লাশও পেতে পারেন।

আমার কথা তার কাছে জটিল মনে হয়। মুখের ভঙ্গি দেখে বুঝি, তিনি 'খুশি' হন নি। ফিরে যান মোটেলে। যাবার আগে বলেন, 'দূর! কাল চলে যাব ঢাকায়। খামাকা এই এতদূর আসা!'

৩

দুর্ভিক্ষ, আকাল বা মঙ্গার ব্যাপারটি যেমন 'পলিটিকালাইজড' হয়ে গেছে, তেমনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরিস্থিতির খবর পৌঁছেছে বিকৃতভাবে। এর নানা কারণ। তার মধ্যে একটি হলো, তথ্য পায়নি মানুষ সঠিকভাবে। নানা মাধ্যমে প্রাপ্ত যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পায় নি, নেপথ্য ঘটনা জানতে পরেনি। টিভিতে খবর শোনেন একরকম, পত্রিকাভেদে অনেকক্ষেত্রে তথ্যের মিল নেই, ধারাবাহিকতা নেই। বিবিসি প্রথমদিন ভাষ্য দিল এমন যে, প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝে ওঠাই কঠিন। বিবিসির বাংলা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তি উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর রংপুরে হলো এক অনুষ্ঠান। এতে এলেন সিরাজুর রহমান, দীপঙ্কর ঘোষ, আতাউস সামাদ আর প্রাচ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান ব্যারী ল্যাংরিজ। অনুষ্ঠানের পরদিন ব্যারী আর আতাউস সামাদ ভাই গেলেন রংপুরের গঙ্গাচড়ার কয়েকটি প্রত্যন্ত এলাকায়, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সরজমিনে দেখবার জন্যে। তাঁদের সঙ্গে রংপুরের (তৎকালীন) ডিসি গিয়াসউদ্দিন আহমদ এবং দৈনিক খবরের মুকুল মোস্তাফিজ।

এলাকা ঘুরে একটা রিপোর্ট পাঠালেন ব্যারী। কিন্তু লন্ডনে প্রাচ্য বিভাগের ভাষ্য শাখায় সম্পাদনায় সময় কয়েকটি শব্দ বাদ পড়ল। ব্যারী তাঁর রিপোর্টের এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'ঐসব ইউনিয়নে' এই কথাগুলো। কিন্তু যিনি ব্যারীর পাঠানো ভাষ্যটি সম্পাদনা করেন, তিনি (বিদেশি) বাংলাদেশের ইউনিয়ন আছে এটা জানতেন না। ফলে, ব্যারী কী লিখেছেন তা বুঝতে না পেরে সম্পাদনার সময় তা বাদ দেন। ফলে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর বিবিসি প্রতিনিধির ভাষ্যটি কিছুটা বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয় এবং শ্রোতাদের কাছে পৌঁছায়।

আসলে, ব্যারী বলতে চেয়েছিলেন, তিনি (ব্যারী) গঙ্গাচড়া উপজেলার যে ইউনিয়নগুলো সফর করেছেন, সেখানে কোনো লোক অনাহারে মারা যায় নি, সরকারের এ দাবি সঠিক মনে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু 'ইউনিয়ন' শব্দ বাদ পড়ায় রিপোর্টটি শুনে মনে হলো অন্যরকম (অবশ্য পরের দিন ভাষ্যটির ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়েছিল)।

দুর্ভিক্ষ আদৌ স্বীকার করতে চাচ্ছে না এরকম পত্রিকা পরদিন দর্শনীয়ভাবে বিবিসির প্রথমদিনের মূল ভাষ্য প্রকাশ করল। কেউ আবার সে ভাষ্যটি করল সম্পাদনা, বলা বাহুল্য নিজেদের মতো করে। সরকারকে কোণঠাসা করতে চায় এমন একটি দৈনিক বিবিসি ভাষ্যের শেষাংশটি, যেখানে বলা হয়েছে 'অনাহারে কেউ মারা যায় নি সরকারের এ দাবি সঠিক মনে হয়' তা ছাপল না। ছাপল শুধু সংকটের বিবরণ অংশটি। ঐ পত্রিকাটি ব্যারী ল্যাংরিজের নামটি পর্যন্ত ব্যবহার করেনি।

ব্যারীর ভাষ্যের দুদিন বাদে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর আতাউস সামাদ ভাইয়ের প্রতিবেদন প্রচারিত হলো। তিনি তীব্র সংকটের কথা বললেন। এইমর্মে বললেন, ভিক্ষার অভাব যদি দুর্ভিক্ষ হয়, তাহলে রংপুরে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি বিদ্যমান। সামাদ ভাই একটি প্রতিবেদনে গঙ্গাচড়া এলাকার কয়েকজন অভাবী মানুষের সংলাপ (আঞ্চলিক ভাষায়) প্রচার করলেন, যাতে তারা তাদের দুরবস্থার কথা জানিয়েছেন। জানিয়েছেন অনাহারে-অর্ধাহারে থাকবার কথা।

বিবিসি'র এই প্রতিবেদনটি অবশ্য কোনো পত্রিকা আর ছাপল না। কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতা ব্যারীর ভাষ্য নয়, আতাউস সামাদ ভাইয়ের প্রতিবেদনটি বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। পরবর্তীকালে পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে আতাউস সামাদ ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠকের চিঠি ছাপা হলো।

বেকায়দায় পড়লেন রংপুরের ডিসি। কেন তিনি বিবিসি প্রতিনিধিদের দুর্গত এলাকায় নিয়ে গেলেন? তারওপর ঘটল আরেকটি ঘটনা। স্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়ে কথা বললেন ডিসি। কথায় কথায় নাকি তিনি বলে ফেলেছিলেন, 'খাদ্য সংকট নেই। কিন্তু অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে।' ডিসিকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হলো এই 'বক্তব্য' কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশের পরদিন।— ঐদিনই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এলেন রংপুরে দুর্গত এলাকা সফরে।

অবশ্য, ডিসি গিয়াসউদ্দিন সাহেবের 'ট্রান্সফার অর্ডার' মাসতিনেক আগেই এসেছিল, রংপুরে জয়েন করবার কথা রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়ার। কিন্তু সে সময় তদ্‌বিরের জোরে ঐ ট্রান্সফার অর্ডার স্থগিত হলো। কারণ বলা হলো দুটি। নতুন গণতান্ত্রিক সরকার চালুর পর গিয়াসউদ্দিন সাহেব 'খুব ভালো কাজ' করছেন, আর সামনে বাই-ইলেকশন, এসময়টা তিনি থাকলে 'ভালো হবে' এবং যে গিয়াসউদ্দিন সাহেব স্বাভাবিক ট্রান্সফার অর্ডারের ফলে ভালোয় ভালোয় রংপুর ছেড়ে চলে যেতে পারতেন, তিনি গেলেন বটে, কিন্তু দারুণ এক বেকায়দা অবস্থায়। ১ ঘণ্টার নোটিসে এডিএম সাহেবের কাছে 'চার্জ হ্যান্ডওভার' করতে হলো।

গিয়াসউদ্দিন সাহেবের প্রসঙ্গ এখানে একারণেই উত্থাপন করলাম যে, ডিসির স্বাভাবিক কোনো বদলির খবর স্থানীয় কোনো পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হলেও জাতীয় পত্রপত্রিকায় ভেতরের পাতাতেও তা আসে না। কিন্তু, 'রংপুরের ডিসি স্ট্যাণ্ড রিলিজ' এই খবর ২২ অক্টোবরের একটি দৈনিক লিড এবং অপর কয়েকটি পত্রিকায় দর্শনীয়ভাবে ছাপা হয়েছিল। তবে ঐ স্ট্যান্ড রিলিজের পরিষ্কার কারণ কেউ উল্লেখ করেন নি। পরবর্তীকালে ঢাকা এবং অন্যান্য জেলা শহরে অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রংপুরের ডিসিকে ওভাবে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছিল কেন? আমি যতটা পেরেছি জবাব দিয়েছি।

এই ডিসি সাহেব আমাকেও কম যন্ত্রণা দেননি। রংপুরে আসবার আগে, তিনি যখন সিরাজগঞ্জের ডিসি, তখন আমার সাংবাদিকতা নিয়ে নানা কটুকথা বলেছেন। আমি ঐ সময় কয়েকবার সিরাজগঞ্জ যাই বন্যাপরবর্তী পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট করবার জন্যে। সচিত্র প্রতিবেদন লিখি ত্রাণকার্যক্রমে গাফিলতি, ত্রাণস্বল্পতা, ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি তথা প্রশাসনিক ব্যর্থতার ওপর। গিয়াস সাহেব খুবই ক্ষেপে যান। নাজেহাল করার চেষ্টা করেন। প্রতিবেদনগুলো প্রকাশের সময় তিনি সিরাজগঞ্জে আমার এক বন্ধুর কাছে হুংকার দেন, 'কোথায় আপনার মোনাজাতউদ্দিন? আমি তাকে দেখে নেব।' ইত্যাদি। তাই নয় শুধু, প্রতিবেদন প্রকাশের পর তৎকালীন একজন 'বাঘা মন্ত্রী' সিরাজগঞ্জ সফরে এলে ডিসি সাহেব প্রকাশ্য মিটিংয়ে বলেন, 'স্যার, মোনাজাতউদ্দিন যা লিখেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু সংবাদ-নেপথ্য লিখতে বসে সত্যের খাতিরে একটা কথা বলা দরকার, একাধিক পত্রিকায় যদিও (২২ অক্টোবর '৯১) ছাপা হয় যে, 'ডিসি গিয়াসউদ্দিন আহমদ বলেছেন, খাদ্য সংকট নেই তবে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে' তা ঠিক নয়। সাংবাদিকদের সাথে চা-চক্রের আলাপকালে আদৌ ঐ কথা তিনি উচ্চারণ করেন নি। তাঁর ঐ বক্তব্যের প্রকাশিত অংশটি ছিল বানানো। এর প্রমাণ রয়েছে।

পরবর্তীকালে, যে কটি পত্রিকায় ডিসির 'খাদ্য সংকট নেই তবে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে' বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, সেইসব পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে কথা বলি। তাদের একজন বলে 'আমি ডিসির ঐ কথা অমুকের কাছ থেকে শুনেছি।' অমুককে জিগ্যেস করলে বলে, 'তমুকের কাছে শুনেছি।'

৪

'৯১-তে উত্তরাঞ্চলের খাদ্যসংকট পরিস্থিতি নানাভাবে জটিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আবারো লিখছি, এমনটি হতো না যদি সাড়ে ৫৭ কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রীর অর্ধেকও দেওয়া হতো সংকট পরিস্থিতি শুরুর সাথে সাথে। কাজ না-পাওয়া মানুষ কিংবা দুঃস্থ মাতা পরিবার খেতে পারত, কচু-ঘেচু খেয়ে ডায়রিয়া হতো না বা অপুষ্টিতে শুকাত না।

উত্তরাঞ্চলের খাদ্য ও কর্মসংকট পরিস্থিতি নতুন নয়। গত দুদশকের খতিয়ানে দেখা যায়, প্রতিবছরই আশ্বিন-কার্তিক মাসে মঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সবখানে সবাই নয়, এ সংকটের শিকার হয় ১৬টি জেলার ১২৩টি উপজেলার প্রায় ১৬ লাখ মজুর পরিবার, উপার্জন ও খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় এদের ঘরে ঘরে খাদ্যসংকট ও হাহাকার-আহাজারি চরমে ওঠে। এসময় বিপাকে পড়ে এলাকার প্রায় ৪০ হাজার ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী। বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তিহীন দুঃস্থ মাতা পরিবারগুলোও দুর্গতির শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। এরকম অবস্থায় দুস্থ মাতা পরিবার এ অঞ্চলে প্রায় ১ লাখ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ লাখ পরিবার আশ্বিন-কার্তিকের এই মঙ্গার শিকার হয়ে পড়ে। প্রধান খাদ্যের অভাবে এসব পরিবার-সদস্যরা উপোস-কাপাস শুরু করে, অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় অনেক মানুষ, বিশেষ করে শিশু-কিশোর, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ও বিভিন্ন রোগাক্রান্ত নরনারী অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে চলে যায় মৃত্যুর দিকে। এ অবস্থা চলতে থাকে আমন ধান কাটা-মাড়াই শুরু হবার আগ পর্যন্ত।

'৯১-তেও মঙ্গা আসে। আশ্বিনের শুরুতে বেকার হয়ে পড়ে লাখো মজুর, তারা মানবেতর জীবনযাপন শুরু করে। দুস্থ মাতা পরিবারগুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষীদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

ফি বছরের মতো উদ্ভূত 'মঙ্গা' প্রকট রূপ নেয় মধ্য সেপ্টেম্বরের পর। এর কারণ, মঙ্গার ওপর অসময়ের বন্যা, ৪ দফা টানা ভারি বর্ষণ। এছাড়াও ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তার মতো প্রধান নদনদী ভাঙন-ছোবল হানতে থাকে ২৫টি স্থানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজারো পরিবার এই ভাঙনের ফলে নতুন করে গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই দুঃসময়ে দুস্থ মাতাদের জন্যে স্বাভাবিক যে গম প্রদান কার্যক্রম, তা বন্ধ থাকে। বন্যার পর সরকার অতি-সামান্য চাল-গম খয়রাতি সাহায্য হিসেবে বরাদ্দ করেন, শিকড় পর্যায়ে তা বিতরণ নিয়ে হয় ব্যাপক দুর্নীতি। খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায়, মজুরি মেলে না, টেস্ট রিলিফ কার্যক্রম নেই। গ্রামে 'ভিক্ষে মেলে না' এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যাঁরা দৈনিক সংবাদের পাঠক, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, আশ্বিনের শুরু থেকেই বৃহত্তর রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলের খাদ্যসংকট পরিস্থিতির ওপর প্রথম পাতায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ উপজেলা 'অভাবী পকেট' হিসেবে চিহ্নিত, তাও উল্লেখ করা হয়; বলা হয় অবিলম্বে বিশেষ টেস্ট রিলিফ কার্যক্রম চালুর প্রয়োজনীয়তার কথা।

এই সময় বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট ত্রাণ বিভাগ একাধিকবার লিখিতভাবে পরিস্থিতি ঢাকায় জানায়। 'সংকট পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠতে পারে' এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাঠায় উত্তরাঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। কিন্তু উপরমহল, পুরু গদি আঁটা আরামকেদারার কর্তাব্যক্তিরা, এসব পাত্তা দেননি, এমনকি প্রধানমন্ত্রীকে সময়মতো পরিস্থিতি জানাননি তারা। পরে, পরিস্থিতি যখন ল্যাজে-গোবরে হয়ে যাবার মতো অবস্থা, তখন তাদের টনক নড়ল। টনকে টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ হতে থাকল। ঐসময়, একদিকে টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে দুর্গত এলাকায় শূন্য ডানোর কৌটাভরা চাল-গম ঢেলে দেওয়া হচ্ছে হাড়সর্বস্ব মহিলার ছিন্ন শাড়ির কোঁচড়ে; টেস্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে, ৮০ বছরের কোমরভাঙা বৃদ্ধ এবং ৮ বছর বয়সের কিশোর কোদাল হাতে মাটি কাটছে, গম নিচ্ছে; বিভিন্ন উপজেলার 'ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে' শতশত আক্রান্ত, তাদের চিকিৎসা চলছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা পর্যন্ত তৎপর। আর এর পাশাপাশি সংবাদ-বিবরণ দেওয়া হচ্ছে 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক।'

টেলিভিশন তো একদিন উত্তরাঞ্চল পরিস্থিতির ওপর 'বিশেষ প্রতিবেদন' প্রচার করল নির্ধারিত অনুষ্ঠান বাতিল করে। গালভরা নাম। প্রযোজনা করলেন বিখ্যাত এক সংবাদ প্রযোজক। দেখা গেল ঐ প্রযোজক নিজেই বৃহত্তর রংপুরের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। তার স্বকণ্ঠ এবং সুকণ্ঠ ভাষ্যের পাশাপাশি দেখানো হচ্ছিল 'সব কুছ ঠিক হ্যায়' এই ধরনের বেশকিছু ছবি। কিছু পত্রপত্রিকার কাটিংসও ক্লোজআপে পর্দায় দেখানো হলো যার শিরোনামে বলা হয়েছে 'উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি বিরাজমান নাই।'

ঐ স্ক্রিপ্টখানা কে লিখেছিলেন, জানি না। তবে যেই হোন, তাকে ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ ঐ সংবাদ প্রযোজক সাহেবকে। এরশাদ আমলে তিনি এ ধরনের বহু অনুষ্ঠান নিয়ে ইডিয়ট-বক্সে এসেছিলেন। অনেক বিরোধীদলীয় রাজনীতিক এমনকি মন্ত্রী, আমলারা তাঁদের বক্তৃতায় মাঝে-মধ্যে বলে থাকেন যে, স্বৈরাচার হটেছে কিন্তু স্বৈরাচারী প্রথা কিংবা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের অ্যাকটিভিটি এখনও আছে চালু। কথাটা তারা মিথ্যা বলেন না, তার একটি জলজ্যান্ত এবং রঙিন প্রমাণ জনাব সংবাদ-প্রযোজক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে, প্রযোজক সাহেবেরও বক্তব্য আছে। না, আমার সাথে সরাসরি তাঁর কথা হয় নি। অনুষ্ঠানটি ধারণ করার সময় তিনি যখন রংপুরে, সার্কিট হাউসে অবস্থান করছেন, তখন তাঁর অতিপরিচিত ব্যক্তি শওকত আলী সরকার বীরবিক্রমের কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন যে, তিনি নাকি বাধ্য হয়েই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনার কাজে হাত দেন।

জানি না, সেই 'বাধ্য' হবার পেছনে প্রকৃতপক্ষে কী কারণ ছিল। তবে, মনে হয়, এরশাদ আমলে তার 'কাজ' আর বর্তমান, তাকে 'ব্যালান্স' করতে চাইছেন তিনি।

বেশ কটি জাতীয় দৈনিক উত্তরাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি পুরোপুরি এড়িয়ে গেল। গণতন্ত্র কায়েমের পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পথে যখন বাধা নেই, এটা ছাপা যাবে না, ওটা ছাপা যাবে না বলে প্রেস এ্যাডভাইস আসে না, কথায় কথায় বিজ্ঞাপন বন্ধের হুমকি নেই, তখন কয়েকটি বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সেলফ সেন্সরশীপ' চালু করে দিল। একটি পত্রিকা তো দুর্ভিক্ষ, আকাল, মঙ্গা কিংবা খাদ্য-কর্মসংকট কিছুই বলল না; এমনকি সরকার কথিত ডায়রিয়ায় লোক মারা যাচ্ছে, এ খবরটুকু পর্যন্ত পরিবেশন করল না। একটি প্রভাবশালী দৈনিক তার স্থানীয় সংবাদদাতার পাঠানো খবর ব্লাকআউট করল, পরে একসময় মাত্র ৩খানা সরজমিন রিপোর্ট ছাপল ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে।

ফলে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা বিভক্ত হয়ে পড়ল উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোর হাজারো পাঠকের কাছে। বিভক্তিটা এরকম যে : কয়েকটি পত্রিকা সংকটের কথা লিখছে, কয়েকটি পত্রিকা আদৌ কিছু লিখছে না, কেউ আবার 'দুর্ভিক্ষাবস্থা নেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক' বক্তব্যদানকারীর এই সংলাপ উদ্ধৃত করে খবর পরিবেশন করছে। এরই ফাঁকে কেউ আবার পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্যে কিছু কিছু অতিরঞ্জন ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন শুরু করল। এদের কেউ বলল পরিস্থিতি '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেউ বলল রংপুর শহরের পথে পথে বুভুক্ষু মানুষের মিছিল। একটি পত্রিকা টেনে আনল '৭৪-এর সেই বাসন্তিকে। মোটিভটি পলিটিক্যাল। '৭৪ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে বহু মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, কাপড়ের অভাবে মানুষের লাশ দাফন হয়নি, মানুষ মানুষের বমি খেয়েছে—এইসব বক্তব্য একসময় বেগম খালেদা জিয়া দিয়েছিলেন। এবারে, '৯১-তে এসে কোনো একটি পত্রিকা এরকম প্রমাণ করতে উৎসাহী হলেন যে, খালেদা জিয়ার আমলেও সেই '৭৪-এর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেছে।

সংবাদ বিকৃত হতে থাকল নানাভাবে। একটি পত্রিকা, আওয়ামী লীগের একজন এমপি যার মালিক-সম্পাদক, '৭৪-এর বাসন্তিকে নিয়ে বিরাট প্রতিবেদন ফেঁদে বসল। ডিসপ্লে করা হলো টপে। প্রতিবেদনের শিরোনামে বাসন্তির সংলাপ : 'ভোক নাগছে, মোক এ্যকনা ভাত দ্যেও।' রিপোর্টটির এই শিরোনাম পড়েই হা হয়ে গেলাম। বাসন্তিতো বোবা, সে আবার কথা বলল কিভাবে? তৎক্ষণাৎ প্রতিবেদকের সাথে কথা বললাম। তিনি জানালেন, 'আমি এটা করি নাই, অফিস থেকে করে দিয়েছে। আমি এখন আর কী করি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, যারা জানেন না, তাদের কথা বাদ, কিন্তু যারা জানেন বাসন্তি বোবা, তাদের কাছে আপনার পত্রিকার ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হয়ে গেল না?

প্রতিবেদক আর কী জবাব দেবেন?

কোনো পত্রিকা লিখল, ভাতের ফেনের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিড়, একটি পত্রিকা ৫শ মানুষের ভুখা মিছিলের বিবরণে বলল ৫ হাজার মানুষের কথা।

... এবং এসবের ফলে, আমরা যারা সত্য লিখতে চাই, প্রকৃত তথ্য দিতে চাই, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করতে চাই, তাদের জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো যে, সত্য কোনো ঘটনার বিবরণ এমনকি ছবিও অনেকে বিশ্বাস করতে চাইল না। সত্য-মিথ্যা একাকার হয়ে গেল, এক কথায় গোটা সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা টলমল হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ সমর্থন করে এমন একটি পত্রিকা লিখল : '৭৪ সালে বাসন্তি-দুর্গাতির যে ছবি ইত্তেফাকে ছাপানো হয়েছিল, তা ছিল সাজানো। কিছু টাকা দিয়ে তোলা। একইভাবে বিএনপির একটি পত্রিকায় '৯১-এর একটি ছবি সম্পর্কে একজন মন্ত্রীর ভাষ্য উদ্ধৃত করে সংবাদ ছাপা হলো, 'এ ছবি তিনবছর আগেকার পুরাতন।' আরেকজন মন্ত্রী বললেন, 'এ ছবি গুলিস্তান এলাকা থেকে তোলা।'

অবশ্য সব পাঠকই তো আর এক নন! সচেতনও আছেন অনেক। যেমন—'ছবিটি গুলিস্তান থেকে তোলা', মন্ত্রীর এই বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশের পরপরই একজন পাঠক 'সংবাদে'র চিঠিপত্র কলামে এই মর্মে লিখলেন, 'তিলোত্তমা ঢাকার গুলিস্তানে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে উত্তরাঞ্চলের গ্রামের অবস্থা যে কী!'

AMARBOI.COM

তা, ঐ যে বিতর্ক সৃষ্টিকারী ছবি, যেটাকে বলা হলো ৩ বছরের পুরাতন। পরে বিবিসির ব্যারী ল্যাংরিজ তাঁর ভাষ্যে যে ছবিটির কথা উল্লেখ করলেন, সে সম্পর্কে দুটি কথা বলি। সংবাদে প্রকাশের ৩ দিন আগে ছবিটি তোলা হয়েছিল রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার হেলথ কমপ্লেক্সের বারান্দা থেকে। আমাকে ঐ ছবিটি তুলে দেন 'নিউজ ব্যুরো'র দুই তরুণ সাংবাদিক জুলফিকার আলি মানিক ও তাহের মাসুদ লিটন। নিউজ ব্যুরো হলো বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী পরিচালিত একটি সংস্থা। এরা বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকায় এক্সক্লুসিভ নিউজ বা ফিচার সরবরাহ করে।

মানিক ও লিটন, নিউজ ব্যুরোর ঐ দুই তরুণ সাংবাদিক, গঙ্গাচড়া সফরে যাবার আগে আমার কাছে কিছু 'গাইড লাইন' চাইলেন। সে সময় তাদের আমি বলি যে, ওখানকার বিশেষ কোনো ছবি পেলে আমার জন্যে আনবেন।

ছবিটি হাতে পাবার পর আমি গঙ্গাচড়া গেলাম এবং সংগ্রহ করে আনলাম প্রয়োজনীয় তথ্য। ছবির নওয়াব আলীর সাথে কথা বললাম। ঐ দিনই ফিরে এসে ছবিটি প্রিন্ট করে তা ঢাকায় পাঠাই এবং পরদিনই প্রধান ছবি হিসেবে ৩ কলাম জুড়ে ছাপা হয়। ছবিটি অত গুরুত্ব পাবে আমার ধারণা ছিল না। ছবিটি একটি ফিচারের সাথে জুড়ে আমাদের 'মফস্বল বিভাগীয়' বার্তা সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুলের নামে পাঠাই, কিন্তু তিনি তা চীফ সাব-এডিটর (এখন ভারপ্রাপ্ত বার্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদক) আতাউর রহমানের হাতে দেন এবং ছবিটি আতাউর রহমান ব্লোআপ করে প্রথম পাতায় নিয়ে আসেন। আমাদের 'সংবাদে'র একটা ব্যাপার খুব ভালো লাগে যে, কোনো কোনো বিষয়ে একের সাথে অন্যের মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু মেইন ডেস্কের সাথে মফস্বল ডেস্কের খুব সুন্দর একটা সমন্বয় রয়েছে। বিশেষ করে '৯১-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে যে খবর ও ছবিগুলো সংবাদ অফিসে আসছিল, তা মেইন ডেস্ক ও মফস্বল ডেস্কের যৌথ আলোচনা-পর্যালোচনার পর ছাপা হচ্ছিল। যেমন, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুলের কাছে পাঠানো অপুষ্টি-আক্রান্ত শিশুর ছবিটি তিনি আতাউর রহমানকে দেখালেন। বললেন, দেখুন তো আতা ভাই এই ছবিটা আমার কাছে এসেছে, এটা কি ... কথা শেষ হতে না হতেই আতাউর রহমান পছন্দ করে ফেললেন ছবিটি, বললেন, হ্যাঁ, দিন, এটাই ফার্স্ট পেজে দিয়ে দিই ...।

ছবির সাথে যে ফিচারটি ছিল, তা-ই সংক্ষেপ করে ক্যাপশন লেখা হয়। কিন্তু ভুলবশত ছবির যুবক পিতা ও তার অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুটির গ্রাম, ইউনিয়ন এমনকি উপজেলার নামও বাদ পড়ে যায়। সে কারণে ছবিটি ছাপার পর বোঝা যাচ্ছিল না তা কোন্ এলাকা থেকে তোলা। ঐদিনের 'সংবাদে' কুড়িগ্রাম এলাকার খাদ্যসংকট পরিস্থিতির ওপর একটি ৪ কলাম প্রতিবেদন ছাপা হয়, ফলে সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন যে, নওয়াব আলী ও তার সন্তান মোফাজ্জলের ছবিটি বোধকরি কুড়িগ্রাম জেলার কোনো এলাকা থেকে তোলা।

সে কারণে কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসন ও ঐ এলাকায় ত্রাণকাজের দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা আমার সাথে বারংবার যোগাযোগ করে জানতে চাচ্ছিলেন ছবিটি কুড়িগ্রামের কোথা থেকে তোলা হয়েছে। কারণ, প্রকৃতই পরিস্থিতি ওরকম কিনা তা তাঁরা যাচাই করে দেখতে চান। প্রয়োজন হলে ওদের জন্যে ত্রাণ দেবেন। আমি তাঁদের জানাই ছবিটি কুড়িগ্রামের নয়, রংপুরের এবং তা গঙ্গাচড়া উপজেলা থেকে তোলা।

এদিকে, মন্ত্রীমহোদয় ঐ ছবিটিকে পুরাতন বললেও সেনাবাহিনীর রংপুরস্থ একজন কর্মকর্তা আমার সাথে যোগাযোগ করে নওয়াব আলী ও তার সন্তান সম্পর্কে তথ্য নেন। তাঁরা জেনে নেন ছবির নওয়াব আলীর বাড়ি কোথায়, কোন্ গ্রামে এখন তাদের পাওয়া যাবে।

'সংবাদে' ছবিটি ছাপা হবার দিনই উপজেলা প্রশাসনের কর্তা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের একজন নওয়াব আলী ও তার কঙ্কালসার সন্তানটিকে সরিয়ে দেন হেলথ কমপ্লেক্সের বারান্দা থেকে। নওয়াব আলী তার ছেলেকে নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে যায়। খাদ্য বা ওষুধ তারা পায়নি। কিন্তু সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা নওয়াব আলীর ঠিকানা, গ্রামের অবস্থান ইত্যাদি জেনে নেওয়ার পর দ্রুত সেখানে খাদ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিলেন। শিশুটির প্রাণ রক্ষা পেল।

রংপুর শহরে সাধারণত পত্রিকা এসে পৌঁছায় বিকেলে বা সন্ধ্যায়। কিন্তু কঙ্কালসার শিশুটির ছবি যে প্রথম পাতায় বিরাট আকারে ছাপা হয়েছে তা জানলাম সকাল ১০টায়, ময়মনসিংহ থেকে পাওয়া টেলিফোনে। ভদ্রলোকের নাম শহিদ মোতাহার হোসেন, একজন পশু-চিকিৎসক। তিনি 'সংবাদে' ঐ ছবি দেখে ঢাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সংবাদ' অফিসে ফোন করেন এবং আমার রংপুরের টেলিফোন নম্বরটি সংগ্রহ করেন। কথা বলার সময় আবেগে তাঁর কণ্ঠ কাঁপছিল। তিনি জানালেন, ঐ কঙ্কালসার শিশুটির জন্য তিনি ৫শ টাকা দিতে চান এবং পরবর্তীকালে যতদিন ছেলেটি সম্পূর্ণ পুষ্ট-সুস্থ না হয় ততদিন প্রতিমাসে ২শ টাকা করে দেবেন।

ঐদিনই সন্ধ্যায় ৫শ টাকা আমার হাতে এসে গেল। ডাক্তার সাহেবের এক আত্মীয় রংপুরে থাকেন, সিবা-গেইগীর স্থানীয় প্রধান, মোঃ নুরুজ্জামান, তিনি দিয়ে গেলেন টাকা। পরদিন আমার সাহায্যকারী আ শা ফা সেলিমকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম গঙ্গাচড়ায়।

৫শ টাকা পেল নওয়াব আলী, পেল খাদ্যসামগ্রী। ছেলেটি ক্রমশ সুস্থ-চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। আসলে, খাদ্য-খাবার যদি পেটে থাকে, তাহলে কোথায় থাকে অপুষ্টি, কোথায় হয় কথিত 'ডায়রিয়া।'

উত্তরাঞ্চলের ফি-বছরের যে সংকট, দুর্ভিক্ষ আকাল কিংবা মঙ্গা, তা তো প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের অভাবেরই ব্যাপার।

তবে এই খাদ্যাভাব মানে সরকারের গুদামে থাকা চাল-গমের অভাব নয়, জোতদারের গোলার সংকট নয়, এ হলো দিনমজুর আর অতি দুঃস্থ পরিবারের ঘরে খাদ্য-শূন্যতা। কিন্তু এই কথাটা অনেক রথি-মহারথিও বোঝেন না। যেমন, আমি যখন দিনাজপুর থেকে একটি প্রতিবেদন পাঠালাম যে : বৃহত্তর দিনাজপুরের সরকারি খাদ্য গুদামে ঠাঁই নেই, অবস্থা এমন যে আমন ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলে ধান রাখবার জায়গা পাওয়া যাবে না এবং তা যখন 'সংবাদে' ছাপা হলো, খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে এলো টেলিফোন। বলা হলো, মোনাজাতউদ্দিন এ কী সব লিখছে? সে এই বলে উত্তরাঞ্চলে খাদ্যসংকট, আবার এই বলে যে গুদাম ঠাসা, নতুন করে ধান চাল গম রাখবার জায়গা নেই! এ কেমন কথা!

এক সাংবাদিক-বন্ধুও সেই একই কথা বললেন। বললেন, আপনি একই হাতে দুই রকম লিখছেন যে! একবার লিখলেন দারুণ খাদ্যসংকট, মানুষ আছে দুর্গতির মধ্যে, উপোস-কাপাস করছে; আবার আরেকটা রিপোর্টে লিখলেন দিনাজপুরে এতই খাদ্যশস্য যে গুদামে জায়গা ধরছে না! ব্যাপারটা কি?

আমি তাঁকে বলি, বন্ধু, দুটি রিপোর্ট ভালো করে পড়ুন এবং অনুগ্রহ করে বুঝে বুঝে পড়ুন। সরকারের গুদাম ভর্তি খাদ্যশস্য থাকলেই তো আর দীর্ঘদীন কর্মহীন উপার্জনহীন, উপবাসী, অসুস্থ দিনমজুর কিংবা দুস্থ মাতা পরিবার-সদস্যদের পেট ভরে না! এবং খাদ্য সংকটটা তো তাদেরই ঘরে! সরকারি গুদামে যদি লক্ষ-কোটি টন চাল গম থাকে এবং তা যদি বরাদ্দ বা বিতরণ করা না হয়, তাহলে অনাহারী মানুষ কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবে?

দু-তিনটি বাদে সবগুলো দৈনিক '৯১-এর এই দুর্ভিক্ষের ওপর বহু প্রতিবেদন ও ছবি প্রকাশিত হয়েছে। কভার স্টোরি করেছে বিচিত্রা, খবরের কাগজ, দিকচিহ্নসহ বেশ কটি সাপ্তাহিক। একতাও লিখেছে অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্তেফাকের শফিকুল কবির, এদেশের বহু জনপদ ঘুরে সাড়া জাগানো বহু রিপোর্ট লিখেছেন, যিনি '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর লিখে সে সময় বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দেন, এবারেও এসেছিলেন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। সরজমিন এবং তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট লিখেছেন। কিন্তু বৃহত্তর রংপুর এলাকার পাঠকের মন জয় করতে পারেন নি ধারাবাহিকতা ছিল না বলে। ২/৩টি প্রতিবেদন প্রকাশের পর হঠাৎ যখন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল, এ অঞ্চলের পাঠক হতাশ হলেন; তেমনি আবার ঐ পত্রিকার পলিসি নিয়েও নানা কথা বলতে লাগলেন। অন্য কোনো বিষয়ের ওপর রিপোর্ট লিখতে লিখতে হঠাৎ যদি তা বন্ধ হতো তাহলে পাঠক হয়তো সাংবাদিকটিকেই দুষতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয় নি। সবাই নিন্দা করেছেন পলিসির।

আবার, যারা বাড়াবাড়ি করেছেন, বিকৃত করেছেন রিপোর্ট, তথ্য ভুল দিয়েছেন তাদের লেখাও পাঠক গ্রহণ করেন নি। ফলে নির্দিষ্ট ঐ পত্রিকা যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকও হয়েছেন নিন্দিত।

দৈনিক জনতার রংপুর সংবাদদাতা আবদুস সালাম, ঢাকা থেকে আগত মহিতুল ইসলাম রঞ্জু, নজরুল ইসলাম, রূপালীর স্টাফ রিপোর্টার কাজী জাহেদুল ইসলাম, একই পত্রিকার রংপুর জেলা সংবাদদাতা মানিক সরকার মানিক, বাংলার বাণীর স্টাফ রিপোর্টার দাউদ ভুঁইয়া ও রংপুরের নিজস্ব সংবাদদাতা সাইফুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, আজকের কাগজের ঢাকা থেকে আসা প্রতিবেদক কাদির কল্লোল এবং স্থানীয় দুই প্রতিবেদক আরিফুল হক রঞ্জু ও মাহবুবুর রহমান হাবু, সংগ্রামের নুরুজ্জামান, ইউএনবি'র সদরুল আলম দুলু, দৈনিক খবরের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি মুকুল মোস্তাফিজ, সংবাদের রংপুর প্রতিনিধি আলী আশরাফ—এঁরা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর কলামকে কলাম লিখেছেন। কুড়িগ্রামের ছেলে আমান-উদ দৌলা, আজকের কাগজের প্রতিবেদক, ঢাকা থেকেই কয়েকটি সাড়া জাগানো রিপোর্ট লেখেন। তার সূত্র-স্থান ছিল সেক্রেটারিয়েট আর এনজিও ব্যুরো। রংপুরের খুব উজ্জ্বল প্রতিভা মাহবুবুল ইসলাম, দৈনিক বাংলার নিজস্ব সংবাদদাতা, নিজস্ব পত্রিকায় লিখতে পারেনি, তবে স্থানীয় দৈনিক দাবানলে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার পরিস্থিতির ওপর তার যে সরজমিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তা ছিল মর্মস্পর্শী। নিজ নিজ পত্রিকার পলিসি অনুযায়ী রিপোর্ট লেখেন দৈনিক দিনকালের মুহম্মদ আকবর হোসেন, বাংলাদেশ টাইমসের আবদুস শাহেদ মন্টু, দৈনিক বাংলা'র স্টাফ রিপোর্টার খায়রুল আনোয়ার, বিশিষ্ট সাংবাদিক মইনুদ্দিন নাসের, ইনকিলাবের আবদুল হাই সিদ্দিকী, একই পত্রিকার দিনাজপুরের আঞ্চলিক প্রতিনিধি মাহফুজুল হক (আনার) এবং রংপুর সংবাদদাতা রাজু আহমদও যৌথ বা এককভাবে পরিস্থিতির ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন লেখেন। বাসস প্রতিনিধি মোহাইমিন হোসেন রাজশাহী থেকে রংপুরে এসে 'সরকারি ত্রাণ তৎপরতার' ওপর বেশকিছু রিপোর্ট করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্তেফাক-এর প্রখ্যাত আলোকচিত্রী মোহাম্মদ আলম, জনতার বুলবুল, বাংলার বাণী'র শহীদুল্লাহ, ইনকিলাবের মিজানুর রহমান, রূপালীর মাসুদুজ্জামান, দৈনিক বাংলার ওয়াজে আনসারীর অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়।

পাভেল রহমান দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা থেকে বেশকিছু ছবি তোলেন যার কিছু বাংলাদেশের পত্রিকায় এবং বিদেশী ফটো এজেন্সি এপিতে যায়। এসেছিলেন অনেক সাড়া জাগানো ছবির শিল্পী মুফতি মুনীর, রয়টারের রফিকুর রহমান ও রয়টার প্রতিনিধি আনিস আহমেদ, এএফপির নাদিম কাদের। এএফপি 'সংবাদে' প্রকাশিত একটি বৃদ্ধার ছবি 'লিফট' করে পাঠিয়েছিল যা বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ছবিটি ছিল গঙ্গাচড়া এলাকা থেকে আমার সাহায্যকারী আ শা ফা সেলিমের তোলা। সংবাদে আমার নিজের তোলা ছবিগুলো নামেই ছাপা হয়। 'নিউজ ব্যুরো' পরিবেশিত সরজমিন একটি প্রতিবেদনের সাথে জুলফিকার আলি মানিক ও তাহের মাসুদ লিটনের তোলা কয়েকটি ছবি ছাপা হয় খবরের কাগজে। বিচিত্রার আশরাফ কায়সার যে প্রতিবেদন লেখেন তাও এ অঞ্চলের অনেক পাঠকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

৫

তবে মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন ও ছবি ছাপা হয়েছে দৈনিক খবরের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি মুকুল মোস্তাফিজের। সংখ্যাও ছিল বেশি। মাত্র ২ হাজার টাকা মাসিক সম্মানীপ্রাপ্ত এই সাংবাদিকটি একই সাথে কলম ও ক্যামেরা চালিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর নিজ পত্রিকায় উপসম্পাদকীয়ও ছাপা হয়েছে তার।

রংপুরের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে গল্পকার মঞ্জু সরকার বেশ কবছর আগে 'কার্তিকের আকাল' লিখেছেন, যা অনেক পাঠকের মতে দুর্ভিক্ষের ওপর এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এটি তার 'অবিনাশী আয়োজন' বইটিতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু মুকুল মোস্তাফিজ তার ফিচারধর্মী প্রতিবেদনগুলোতে যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা মঞ্জু সরকারের গল্পের মতোই আমাকে কাঁদিয়েছে, ঘুমাতে দেয়নি, মুখে ভাতের গ্রাস তোলার সময় হাত থামিয়ে দিয়েছে। সাধারণভাবে কারও কাছে এটা মনে হতে পারে যে ব্যক্তিগত আবেগের ব্যাপার এবং যদি তা হয়ও, বলব, সেই আবেগ খুঁচিয়ে দিয়েছে আমারই এক জুনিয়র সহকর্মী। বারবার মনে হয়েছে, কঠিন মাটি থেকে খাদ্যকণা তুলে আনে যে কিষাণ-মজুর, তারাই আজ উপবাসী, ধুঁকে ধুঁকে মরছে, আর আমরা শহুরে কিছু মানুষ, নানাভাবে সুবিধাভোগী, সমস্যা সমস্যা বলে চেঁচাচ্ছি, কিংবা কেউ বলছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং কী চমৎকার আছি!

ফিচারধর্মী প্রতিবেদনগুলোতে মুকুল মোস্তাফিজ বেশকিছু উপমা ব্যবহার করেছেন যা আধুনিক সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অনেকে বলে থাকেন যে সাংবাদিকতা তা শুধু সাংবাদিকতাই, সেখানে আবার সাহিত্য হবে কেন? পাঠক তো শুধু আসল খবরটি জানতে চায়, তথ্য-উপাত্ত চায়। কিন্তু বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক যেমন মনে করেন যে, সাংবাদিকতায় বিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে এবং তা সাহিত্য-বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনটি আমারও মত। অনেক পাঠক নিরেট কিছু তথ্য-উপাত্তেই শুধু সন্তুষ্ট নন।

মুকুল মোস্তাফিজ তার প্রতিবেদনগুলোতে উপমা, আঞ্চলিক সংলাপ ও বর্ণনা ব্যবহার করেছেন বেশকিছু। যেমন :

'সারিন্দার মতো পেট নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন দোলাপাড়া গ্রামের বৃদ্ধ আবদাল মিয়া'

'প্যাটোত্ নাই ভাত গোয়াত্ নাই কাপড়, ক্যামন করি নামাজ পড়ি'

'তিন দিন থাকি উপাস, প্যাটোত্ মাও নক্কি যায় নাই' ইত্যাদি।

এখানে তার একটি প্রতিবেদন, যা দৈনিক খবরের প্রথম পাতায় (১৯ অক্টোবর '৯১) ছাপা হয়, তা হুবহু তুলে ধরছি। শিরোনাম ছিল 'আকাল শখের শাড়ি ধরে টান দিয়েছে।'

মুকুল মোস্তাফিজ লিখেছে :

'রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার তাম্বুলপুর ইউনিয়নের তহশীল অফিসের পাশ দিয়ে ফিরছিলাম উপজেলা অফিসের দিকে। সময় তখন বিকেল ৪টা। অনাহারী-অসহায় কর্মহীন মানুষের বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে দেখার ফলে আমি তখন নিজেই কিছুটা আনমনা। হঠাৎ আমার মোটরসাইকেলের সামনে এসে দাঁড়ালো অচেনা এক মহিলা। দাঁড়ালো একেবারে পথ রুদ্ধ করে। মহিলাটি বলতে লাগল : 'বাবা তোমার আল্লার দোয়াই লাগে এ্যাকনা দেকি যাও হামরা ক্যামন আচি।'

'বাধ্য হলাম থামতে। তাম্বুলপুর তহশীল অফিসের পাশেই একটি বাড়িতে ঢুকলাম। দুটো প্রায়-ভগ্ন ঘর বাড়িটাতে। বাড়ির এক চিলতে আঙিনায় ছেঁড়া কাঁথার ওপর শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ। ২/৩ জন ধরে বসালো তাকে। আলাপ করে জানলাম বৃদ্ধের নাম আমীরউদ্দিন (৬০)। তার স্ত্রী আমেনা খাতুনই আমার পথ রুদ্ধ করে ডেকে এনেছে তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য। বৃদ্ধ আমীরউদ্দিন জানালেন, গত সপ্তাহে সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত টিনজাত পচা খাবার খেয়ে তিনি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৫দিন যাবৎ ভুগে এখন কিছুটা সুস্থ আছেন। আমীরউদ্দিনের ২ ছেলে ২ মেয়ে। সবাই কর্মহীন। কেউ ২টি রুটির বিনিময়েও সারাদিন কাজ করার জন্য ডাকে না। ১ সপ্তাহ আগে ২ কৌটা টিনজাত খাবার এবং ৩ কেজি গম পেয়েছে। গত ২ দিন যাবৎ বাড়ির সবাই অভুক্ত আছে। ছবি নিলাম আমীরউদ্দিনের।'

'তার বাড়ির আঙিনা থেকে চলে আসছি। হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের জীর্ণ খড়ের ঘরের দরজা ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা। তার শাড়িটি বলতে গেলে প্রায় নতুনই। আমি হোঁচট খেলাম। মনে মনে ভাবলাম, এই আকালের দিনে বিয়ে! এটা কী করে সম্ভব! আবার ফিরে গেলাম বৃদ্ধ আমীরউদ্দিনের কাছে। বললাম : চাচা, আপনার ঘরে কি নতুন বৌমা এসেছে?'

'আমার প্রশ্ন যেন বৃদ্ধ আমীরউদ্দিনের সকল ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ডায়রিয়া-আক্রান্ত বৃদ্ধ আমীরউদ্দিন। আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, দরজায় দাঁড়ান মহিলা ঠিকই তার ছেলে বউ। কিন্তু আমীরউদ্দিন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে আজিজুল হক (৩০)-কে বিয়ে করিয়েছেন আজ থেকে ৮ বছর আগে। দরজায় দাঁড়ান মহিলার নাম মরিয়ম বেগম (২০), তাদের ২টি ছেলেও রয়েছে।'

বৃদ্ধ আমীরউদ্দিন জানালেন : 'হামার ব্যাটার বউয়ের পেন্দনের মতোন আর কোনো শাড়ি নাই। এইজন্যে বিয়ার শাড়িখানা পিন্দি আছে।'

'মরিয়ম বেগমের সাথে কথা হলো, সেও ঠিক একই কথা জানালো এবং বলল : 'বিয়ার শাড়ি হইল তুলি থোয়ার জিনিস, পেন্দনের মতোন শাড়ি থাকলে কি আর হামরা হাউসে উয়াক পিন্দি আছি!' (বিয়ের শাড়ি হলো গচ্ছিত রাখার জিনিস। স্মৃতি হিসেবে বউরা সেটা রেখে দেয়। পরনের মতো শাড়ি থাকলে কেউ শখ করে তা পরে না।)

মুকুল তার প্রতিবেদনের শেষ প্যারায় লিখেছে :

'চলতি মৌসুমের আকাল মানুষের সকল স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। অসুস্থ শ্বশুর, কর্মহীন স্বামী, চারদিকে আকাল, সবই একাকার করে দিয়েছে। বিয়ের শাড়ি পরনে, অথচ বাড়ির সবাই তিনদিন যাবৎ অভুক্ত। কী চরম বাস্তবতা!'

নাম মোস্তাফিজুর রহমান, ডাক নাম মুকুল। দৈনিক খবরে লেখে মুকুল মোস্তাফিজ। ৪২ বছর বয়সের তরুণ-দৃশ্য মুকুল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কালে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মুজিব বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট লিডার ছিল। পরবর্তীকালে জাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত হয় এবং তারও পরে জাসদ খণ্ডিত হলে রাজনীতির অঙ্গন থেকে নীরবে সরে আসে।

'৬৫ সালে সে ছিল সাপ্তাহিক জনতার উত্তরাঞ্চল সংবাদদাতা। পরে সাপ্তাহিক বাংলার বাণীতে কাজ করে। গণকণ্ঠ বেরুলে কিছুদিন সাংবাদিকতা করে ঢাকায়। একটুখানি 'হাত পেকে' গেলে জেলা থেকে রাজধানীতে গিয়ে স্টাফ রিপোর্টার বা সাব-এডিটর যখন অনেকেই হন, মুকুল মোস্তাফিজ করে তার উল্টোটি। ঢাকার টেবিল ছেড়ে চলে আসে রংপুর। গণকণ্ঠের হয়ে গ্রামীণ সাংবাদিকতা করতে থাকে। '৭৫ থেকে '৭৮ পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে সে ছিল রংপুর, পাবনা, নীলফামারী জেলে বন্দী। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার সাংবাদিকতা এবং গণকণ্ঠ প্রকাশ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি। তারপর কিছুদিন ডেইলি নিউজ-এর সংবাদদাতা এবং পরবর্তীকালে '৮৩ থেকে উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি হিসেবে দৈনিক খবরে।

মুকুল একজন মুদ্রণ ব্যবসায়ী। প্রেসের নাম : বর্ণসজ্জা। তার প্রেসের ভেতর ট্রেডল মেশিনের ভীষণরকম ঘটাং ঘটাং শব্দ, কর্মচারীদের কথাবার্তা আর নানা মানুষের আনাগোনার মধ্যে যেখানে কান পাতাই যায় না, অথচ সে দ্রুত কলম চালিয়ে যায়, পাতার পর পাতা লেখে, টেলিফোনে রিপোর্ট পাঠায় প্রচণ্ড চিৎকারে, দীর্ঘসময়। কখনো ছোটে স্টুডিওতে, প্রসেস করে আনে ছবি, প্যাকেট বানায়, কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দেয়। সারাক্ষণ খবরের খবর আর ছবি নিয়ে মেতে আছে মুকুল। এরই ফাঁকে বাজারও করছে, বহুবছর পর পাওয়া একমাত্র সন্তানটিকে আদর করছে, স্ত্রীর ফাই-ফরমায়েশ শুনছে। তার ওপর আবার বিভিন্ন জনপদ সফর, ঝড়ের বেগে যাওয়া-আসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জিগ্যেস করি : মুকুল, তুমি এতসব কী করে পারো?

হাসে মুকুল। বলে, মোনাজাতভাই, আমার কাজের স্বীকৃতি কখনো হয়তো পাব না। সেজন্যে কাজও করি না। তবে, একটা কথা, আমার এই সাংবাদিকতার পেছনে অর্থ বা খ্যাতির লোভ নেই। আছে মানুষ। আমার দুঃখিনী বাংলায় মানুষকে আমি ভালোবাসি। তাই তো তাদের নিয়ে লিখি।

তার এই কথা নাটুকে সংলাপ মনে হতে পারে। পাঠকের কাছে হয়তো বা মনে হতে পারে সংবাদ-নেপথ্য লিখতে বসে অযথা মুকুল মোস্তাফিজের লেখা এবং তার ব্যক্তিগত জীবন-প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এলাম কেন?

কিন্তু না, অন্য কিছু নয়, মুকুলের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হলো একজন গ্রামীণ সাংবাদিকের কর্মতৎপরতা পাঠকের সামনে তুলে ধরা, তার মানসিকতা জানানো। আপনাদের জন্যে বলছি : মুকুল সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেয়নি, এটা নিতান্তই তার নেশা। প্রেস থেকে সে ভালো আয় করে। দৈনিক খবর থেকে এখন সে মাসিক দুহাজার টাকা সম্মানী পায় এবং এর প্রতিটি পয়সা বিলি করে দেয় গ্রামে গিয়ে, গরিব-দুঃখীদের মধ্যে। সে যখন গ্রাম সফরে যায়, ব্যাগে থাকে রুটি, বিস্কিট, শিশুদের খাবার। যেখানে যখন যেভাবে পারে, টুকটুক করে বিলি করে দেয়।

মুকুল মোস্তাফিজের মতো 'মানুষকে আমি ভালোবাসি' এমনটি তো অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু ভালোবাসার প্রকৃত কাজটি করে কজন?

AMARBOI.COM

৬

নিউজ ব্যুরোর জুলফিকার আলি মানিক ও তাহের মাসুদ লিটন সম্পর্কে দুটি কথা বলে 'দুর্ভিক্ষ বনাম আকাল' লেখাটি শেষ করব।

রংপুরের দুর্গত এলাকা সফর শেষ করে ঢাকা আসবার পরদিন তারা দেখলেন যে, তাদেরই একজনের শাটার করা ছবি 'সংবাদে'র প্রথম পাতায় তিন কলাম জুড়ে ছাপা হয়েছে এবং রাজধানীর বিভিন্ন মহলে সাড়াও জাগিয়েছে তা যথেষ্ট। মীর্জা হাফিজসহ ৪ মন্ত্রী রংপুর সফরে গেলেন, ছবিটিকে '৩ বছর আগেকার' বলে উড়িয়ে দিলেন তাঁরা, এসবও জানলেন মানিক আর লিটন। কিন্তু, কী আশ্চর্য, কাউকেই জানালেন না তারা যে ঐ ছবিটি ওরাই তুলেছেন। জানালেন না মতিউর রহমান চৌধুরীকে, নিউজ ব্যুরো সহকর্মীর কাছে, খবরের কাগজে, এমনকি নিজের বাসাতেও। 'সংবাদে' ঐ ছবিটি দেখে বাসার লোকজন যখন উত্তরাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, প্রশংসা করছিলেন 'আমার' ছবিটির, তখন ঐ দুই তরুণ উপরে উপরে ছিলেন ভাবলেশহীন। পরে, ঢাকায় এসে, তাদের জিগ্যেস করেছি : আপনারা কেন বলেন নি যে ঐ ছবি আপনাদেরই তোলা? জবাবে ওরা হেসেছিলেন, মাথা চুলকে বলেছিলেন : 'মোনাজাত ভাই, আমরা ভেবেছিলাম যে, ওটা আমাদের ছবি এটা জানাজানি হয়ে গেলে আপনি যদি আবার মাইন্ড করেন? কিংবা, ভেবেছি, সংবাদে যদি আপনার কোনো অসুবিধা হয়!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানতে চেয়েছি : আচ্ছা বলুন তো সংবাদের মতো একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় আপনাদের ঐ লিড ছবিটি দেখে সেই মুহূর্তে কী অনুভূতি হয়েছিল? ঢাকায়, খেলাঘর কেন্দ্রীয় দপ্তরের একটি কক্ষে দাঁড়িয়ে মাসুদ জবাব দিয়েছিল : 'মোনাজাত ভাই, আমরা খুব আবেগ আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই দেশে একদল মানুষ সম্পদ-প্রাচুর্যে গা ভাসায়, আর আরেকটি দল খাবারের অভাবে শুকিয়ে মরে! এ অবস্থা কতদিন চলবে?'

আমি বললাম, সে কথা নয়, আমি জানতে চাই, আপনাদের ছবি একটা জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়ে গেল, অথচ আপনাদের ক্রেডিট দিতে পারিনি, কেউ জানল না ওটা দুই তরুণ সাংবাদিকের তুলে আনা, সে অর্থে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

শিশুর মতো হেসেছে ওরা। বলেছে, 'আপনি যেমনটি ভাবছেন তেমন কিছু আমরা চিন্তাও করি নাই মোনাজাত ভাই।'

আমি কণ্ঠ চড়িয়ে বলেছি : মানিক, লিটন, এটা ঠিক যে আমার অনুরোধে ঐ ছবিটি আপনারা আমাকে তুলে এনে দিয়েছেন, কিন্তু আরেকদিকে চিন্তা করলে এটাও ভাবা যায় এই প্রজন্মের দুই সাংবাদিকের ছবি নিয়ে আমি পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসা আর পাঠকের কাছ থেকে বাহ্‌বা কুড়িয়েছি। এটাকে অনেকেই হয়তো সহজভাবে নেবে না। কিন্তু আপনারা তা হালকাভাবে দেখছেন কেন?

ওরা আবারো হেসেছে। বলেছে, 'বিশ্বাস করুন মোনাজাত ভাই, এত কিছু তো আমরা বুঝি নাই, চিন্তাও করি নাই।'

আমার ভয় হয়েছে। শঙ্কা হয়েছে। অতি সরল দুই তরুণ, সংবাদপত্রের ব্যবসা ও সাংবাদিকতার কঠিন প্রতিযোগিতার দিনে কিভাবে টিকে থাকবে?

AMARBOI.COM

মনু মিয়া মৃত্যুর আগে দুধ ও কলা খেয়েছিল

খাদ্যাভাবজনিত কারণে শুধু '৭৪ আর '৯১-তে মানুষ মরেছে, তা নয়। আশ্বিন-কার্তিকের মঙ্গা বা আকাল যেমন ফি-বছরের ব্যাপার, তেমনি এরশাদের ৯ বছরের শাসনামলেও বহু নরনারী-শিশু একই কারণে মারা গেছে। 'সংবাদে'র পুরনো দিনের পাতা ওল্টালে এইসব মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ মিলবে। তবে বিধিনিষেধের কারণে কৌশল নিতে হয়েছে নানানটা। যেমন অনাহারজনিত মৃত্যুর একটি সরজমিন প্রতিবেদন, 'সংবাদে'র প্রথম পাতায় তিন কলামে ছাপা হয়, তার শিরোনাম ছিল : 'মনু মিয়া মৃত্যুর আগে দুধ ও কলা খেয়েছিল।'

অবশ্য, এধরনের কৌশল আরও নানাভাবে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায়। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের প্রথমদিকের কথা, 'প্রেস অ্যাডভাইস' এলো হরতালের কথা লেখা যাবে না। পরদিন, আন্দোলন সমর্থনকারী বেশ কটি পত্রিকায় 'হরতাল', 'অবরোধ' এইসব এড়িয়ে গিয়ে লেখা হলো '১০ নভেম্বরের কর্মসূচি।' সরকার আর কী করে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌশলটি অনেক আগেই চালু হয়, তবে এর রূপ বদলেছে। পাকিস্তান আমলে কড়া সেন্সরশীপের সময় বিভিন্ন পত্রিকায় মোটা বক্স করে জায়গা (কলাম) ফাঁকা রাখা হতো। পাঠক বুঝতেন, এখানে একটি খবর ছিল এবং তা সেন্সরশীপের কারণে ছাপা যায় নি। এই কৌশলটি সর্বপ্রথম করেছিল বাংলাদেশ অবজারভার। যখনকার কথা, তখন অবশ্য ছিল পাকিস্তান অবজারভার।

রিপোর্ট পরিবেশনে চমৎকার একটি কৌশল নিয়েছিল ইত্তেফাক। অনাহার কিংবা অনাহারে মৃত্যু হয়েছে একথা লেখা যাবে না। এরশাদ আমলের নির্দেশ। কিন্তু ইত্তেফাকের ঐ রিপোর্টার, নাম জানি না কে, অনাহারে মৃত্যু-সম্পর্কিত একটি রিপোর্টে অনাহার শব্দটি আদৌ ব্যবহারই করলেন না, অথচ পাঠক বুঝে নিলেন প্রকৃত ঘটনা। খবরটি এইভাবে পরিবেশিত হয় যে, একজন মানুষ অমুক স্থানে মৃত অবস্থায় পড়েছিল, হাসপাতালে লাশটি আনবার পর ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন তার পাকস্থলীতে সামান্য খাবারও ছিল না।

ইত্তেফাকের এই কৌশলটি পরবর্তীকালে আমি ব্যবহার করি বিভিন্ন সময়ে। '৯১-এর দুর্ভিক্ষের সময় বহু প্রতিবেদনে দুর্ভিক্ষ শব্দটির পরিবর্তে 'ভিক্ষা মেলে না পরিস্থিতি', 'খাদ্যাভাবজনিত কারণে মৃত্যু' এ ধরনের কথা ব্যবহার করেছি। শুধু কুড়িগ্রাম থেকে পরিবেশিত একটি প্রতিবেদনে সরাসরি অনাহারে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করি।

AMARBOI.COM

যাক, 'মনু মিয়া মৃত্যুর আগে দুধ ও কলা খেয়েছিল' এই সরজমিন প্রতিবেদনটির নেপথ্য কথা এখন বলছি।

এরশাদ শাসনামল। দুর্ভিক্ষ হয়েছে, মানুষ মারা যাচ্ছে অনাহারে, কিন্তু তা লেখা যাবে না। দিনাজপুরের এক জনসভায় রাষ্ট্রপ্রধান দম্ভের সাথে বললেন, অনাহারে কেউ মারা যায় নি, কাউকে অনাহারে মরতে দেওয়া হবে না।

আমি তখন রংপুরে, একটা সিরিজ প্রতিবেদনের জন্যে কাজ করছি, সংবাদ থেকে বজলু ভাই টেলিফোনে নির্দেশ দিলেন : আপনি আজই পাবনা চলে যান। ওখানে চরদুলাই নামে একটা গ্রামে ৫ জন অনাহারে মারা গেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। আপনি ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে দেখুন এবং সত্য হলে রিপোর্ট করুন।

পাবনা আমার কর্ম-এলাকা। কিন্তু আমি অনাহারে মৃত্যুর মতো কোনো খবর পাই নি, অথচ সংবাদ অফিসে তা পৌঁছে গেছে! পরে শুনলাম, আমাদের এক সহকর্মীর (এখন সংবাদে নেই) আত্মীয় চাকরি করেন পাবনার সুজানগর উপজেলায়। তিনি ঐ খবরটি জানিয়েছেন। তখন বজলু ভাই বার্তা সম্পাদনা করতেন।

সিরিজের কাজ অসমাপ্ত রেখে আমি চলে গেলাম পাবনায়। শহরে নেমেই রনেশদা (রাজনীতিক ও সাংবাদিক রণেশ মৈত্র)-র সাথে দেখা। চরদুলাইতে 'অনাহারে কয়েকজন মারা গেছে' এরকম খবর তিনিও পেয়েছেন কয়েকদিন আগে, কিন্তু কনফারমেশন পান নি। জেলা প্রশাসন স্বীকার করেন নি।

রনেশদাকে জিগ্যেস করলাম, কোনো সাংবাদিক চরদুলাইতে যান নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বললেন, 'না, এখনও কেউ যায় নি। আমি যাব যাব ভাবছি। কিন্তু সময় হচ্ছে না ... নানা ঝামেলায় আছি।' আসলেই রনেশদা তখন খুব ব্যস্ত।

চরদুলাইতে যাওয়া দরকার। কিন্তু ভাবলাম, যাবার আগে প্রশাসনের কোনো কর্তার সাথে কথা বলা যাক। তারা অনাহারে মৃত্যু-সম্পর্কিত কোনোরকম খবর পেয়েছেন কি-না। দৈনিক বার্তার তৎকালীন পাবনা প্রতিনিধি শিবজিত শাগ, এখন অধ্যাপনা করেন, তাঁকে বললাম, চলেন দাদা, একবার ডিসি সাহেবের সাথে কথা বলে আসি। তিনি রাজি হলেন। সকাল ১১টায় আমরা ডিসি অফিসে পৌঁছুলাম। তিনি নেই। কোথায় আছেন? একজন জানালেন, 'সাহেবকে' বাসায় পাওয়া যাবে।

গেলাম তাঁর বাসায়। রিকশা থেকে নেমেই দেখি তিনি লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় বাগানে পায়চারি করছেন আর থেমে থেমে ফুল গাছের মরা-বাঁচা অবস্থা দেখছেন। সেজদার মতো করে মাথা নামিয়ে সালাম জানালাম তাঁকে। ভেতরে ভেতরে মেজাজ আমার খুব খারাপ। জেলার প্রধানকর্তা অফিসে না গিয়ে সকাল সাড়ে এগারোটায় রোদে ফুলবাগানে পায়চারি করছেন!

: কী চাই আপনাদের?

: হুজুর, আমি সংবাদের একজন সাংবাদিক, নাম মোনাজাতউদ্দিন। আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই।

আমার অতি বিনয়ে, কিংবা হতে পারে অন্য কোনও কারণে তাঁর মুখে বিরক্তি। আমরা ঘেরার এপারে, আর তিনি হাত ত্রিশেক দূরে বাগানের ভেতর থেকেই জানতে চাইলেন, 'বলেন কী কথা বলতে চান!' আমি আরও বিনয়ী, বলি বাগানে দাঁড়িয়ে তো কথাটা বলা যায় না হুজুর, আপনি কি অনুগ্রহ করে অফিসে বসবেন?

কী তাঁর খেয়াল হলো, শ্লথ পায়ে যিনি এতক্ষণ হাঁটছিলেন, তিনি হঠাৎ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন বাগান থেকে। বললেন, ঠিক আছে চলেন, অফিসে গিয়ে বসি।

ডিসি সাহেবদের কুঠির সাথে একটা অফিস থাকে, অনেকে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে না গিয়ে অতিজরুরি ও অতি গোপনীয় কাজের জন্যে সকালে কিংবা বিকেলে এখানে বসেন। ব্যক্তিগত গোপন সহকারী, পিয়ন, চাপরাশি এই অফিসের জন্যে আলাদা।

ঝকঝকে তকতকে অফিসে বসি। ঠিক তক্ষুনি কামরায় এসে ঢোকেন জেলার আরও দুজন কর্মকর্তা। এঁদের একজন, পরে শুনলাম 'খোমেনী' নামে পরিচিত। তিনি কেদারায় হেলান দিয়ে বসেই জানতে চান, স্যার, এনারা কে স্যার! ডিসি সাহেব বলার আগেই আমি নিজে হাত বাড়িয়ে পরিচয় দিই। খোমেনী সাহেব কি জানি কেন গম্ভীর, বিরক্ত। ডিসি সাহেবের বাসায় এসে দারুণ কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করে ফেলেছি। 'এরা কি চায়' এই ধরনের প্রশ্ন চোখেমুখে নিয়ে খোমেনী সাহেব ডিসি সাহেবের মুখের দিকে তাকান। ডিসি বলেন, 'বলেন রিপোর্টার, আপনাদের কী কথা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চরদুলাইয়ের প্রসঙ্গ তুলি। আপনারা কি ওখান থেকে অনাহারে মৃত্যু কিংবা ঐ ধরনের কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়েছেন?

কেদারার হেলান ছেড়ে এবার সামনে ঝুঁকে আসেন ডিসি সাহেব। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠ তিনি। 'নো নো নো। আমাদের এই জেলায় অনাহারে-ফনাহারে কেউ মারা যায় নি। এই ধরনের কোনো খবর আমাদের হাতে নেই।' ডিসির কথা শেষ হবার সাথে সাথেই পায়ের ওপর পা তোলেন খোমেনী সাহেব, আরও হেলান দিয়ে বসেন এবং চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের শিল্পী আবুল বজল তুলিপের মতো খলনায়ক স্টাইলে বলতে থাকেন : 'মিস্টার সাংবাদিক, আপনি ভুল খবর পেয়েছেন এবং ভুল জায়গায় এসেছেন! আমাদের এখানে কোনো স্টারভেশন কেস নেই।' আরেকজন কর্মকর্তা, যিনি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন, মুখ খুললেন : 'আপনারা যে এইসব আবোল-তাবোল কথা কোত্থেকে শোনেন!' তারপর কণ্ঠ চড়িয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন, 'কে এই খবর দিল আপনাকে? আমরা জানি না আর আপনি জেনে ফেললেন? নো নো, দেওয়ার ইজ নো অনাহার-ফনাহার ...

আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলি, জনাব, আমি আপনাদের সাথে নয়, মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের সাথে কথা বলতে এসেছি। যা বলবার তিনিই বলবেন। ঐ কর্মকর্তা থামেন, কেদারার হাতল ঠকাস ঠকাস করে চাপড় মারতে থাকেন। ডিসি সাহেব এবারে কি ভেবে কলিংবেল টেপেন। পিয়ন ছুটে আসতেই বলেন, 'চা নিয়ে এসো।'

AMARBOI.COM

চা খেতে খেতে আরও কিছু কথা। আমি জানাই, স্পটে যাব। মৃত্যুর খবর যেটা এসেছে, যাচাই করে দেখা দরকার। ডিসি সাহেব কী ভাবলেন, হঠাৎ বললেন, 'এক কাজ করি, আপনি যখন যাচ্ছেনই, আমার একজন অফিসার আপনার সাথে যাক। সেও ব্যাপারটা দেখে আসুক।' এই বলে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। এডিসি জেনারেল সাহেবের সাথে কথা বললেন এবং নির্দেশ দিলেন : 'আপনি ব্যাপারটা ইনকোয়ারি করে এসে আজই আমাকে রিপোর্ট করবেন।' তারপর টেলিফোন রেখে আমাকে বললেন, 'এক কাজ করুন, আমার এডিসি সাহেব চরদুলাই যাচ্ছেন, আপনি তার সাথেই চলে যান। একসাথেই দেখে আসুন।' তার কণ্ঠ হঠাৎ খুব নরম। বলেন, 'বসুন, আরেকবার চায়ের কথা বলি।' আবারো কলিং বেল টেপেন তিনি।

চরদুলাই রওনা হই সাড়ে ১২টার দিকে। এডিসি সাহেব খুব বিরক্ত, কেননা বারবার বলছিলেন, ডিসি সাহেব আমার লাঞ্চটা নষ্ট করালেন। আমাকে বললেন, 'কোথায় যে কী খবর পেয়েছেন! খামাকা!' গোটা রাস্তা আমার সাথে আর কোনো কথাই বললেন না তিনি।

পাবনা-নগরবাড়ি পাকা সড়কের ধারে দুলাই ইউনিয়ন, একটা বাজারে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। এখান থেকে চরদুলাই যেতে হবে নদীপথে। নদী তো নয়, এখন শুকিয়ে মরা খাল, সেই খাল ধরে ডিঙিতে দুতিন মাইল যেতে হবে। পানি এত কম যে বড় নৌকা চলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজারের সময় নয়, তবু সেখানে নামতেই চারপাশ থেকে কিছু লোক এসে ঘিরে ধরে। তাদের সাথে কথা বলতে থাকেন এডিসি সাহেব। আমি ভিড় কাটিয়ে বাইরে আসি। দেখে মনে হতে থাকে পথসভায় ভাষণ দিচ্ছেন কেউ। এডিসি সাহেব উচ্চঃস্বরে প্রশ্ন করছেন, এখানে কি কেউ অনাহারে মারা গেছে? এরকম কোনো খবর আপনারা শুনেছেন? কেউ মাথা নাড়ায়, কেউ মুখে বলে 'না স্যার, এরকম কথা শুনি নাই।' দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক, আমিও লম্বা, ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বললেন, 'কী রিপোর্টার! শুনলেন তো! কোথায় আপনার অনাহারে মৃত্যু! চলেন চলেন, এবার ব্যাক্ করি।'

এই সময় লক্ষ করি, হালকা-পাতলা এক যুবক, চেকলুঙ্গি আর চেকসার্ট পরা, আমাকে চোখ ইশারায় ডাকছে, পাশের একটা ঘরের বেড়ার একটু আড়াল হয়ে। হাত ইশারায় আমি এডিসি সাহেবকে জানান দিই : আপনি একটু দাঁড়ান আমি আসছি। আমি প্যান্টের বেল্ট খুলতে খুলতে ঐ ঘরের দিকে যেতে থাকি যেন প্রস্রাব করতে যাচ্ছি। এডিসি বলেন, 'ঠিক আছে, সেরে আসুন।'

সেই যুবকটির সামনাসামনি হই ঘরের আড়ালে এসে।

: ছার, আপনি কি রিপোর্টার?

: হ্যাঁ।

: উনি কে ছার?

: উনি একজন এডিসি। পাবনা জেলার একজন বড় অফিসার। তা আপনি কে? কিছু বলতে চান?

যুবকটি কেন যেন ভীত। আড়ালে থাকা সত্ত্বেও এদিকে-ওদিকে তাকায়। বলে, ছার আমার বাড়ি চরদুলাই ...

আমি বলি, স্যার স্যার বলার দরকার নেই। আমাকে ভাই বলুন। আমার নাম মোনাজাত, ঢাকা থেকে একটা পত্রিকা বের হয়, নাম সংবাদ, ঐ পত্রিকায় কাজ করি। তা আপনি কি জানেন যে চরদুলাইতে না খেয়ে লোক মারা গেছে?

'হ্যাঁ ভাই ...' হাত চেপে ধরে যুবকটি। 'আমি সরকারি দলের লোক। দুলাই ইউনিয়নের ইয়ে পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক। কেউ যদি জানে যে আমি আপনাকে এই খবর বলেছি, আমার খারাপ হয়ে যাবে। আপনারা এখানে কোনো খবর পাবেন না। কেউ কেউ জানে কিন্তু ভয়ে স্বীকার করবে না। ঐ এডিসি সাহেবকে মনে করেছে আর্মির লোক ... এবং সেই ভয়ে ...

তারপর যুবকটি যা জানালো তার সার হলো : চরদুলাই গ্রামে ৫ জন অনাহারে মারা গেছে। এদের একজনের নাম মনু মিয়া, বয়স পঞ্চাশ বছর। যুবকটি কোন্ পথে চরদুলাই গ্রামে যেতে হবে, কোথায় মনু মিয়ার বাড়ি, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এখন কে কোথায় কী অবস্থায় আছে, জানিয়ে দিল। আমি তাকে বললাম, আপনি ভয় পাবেন না, আমাদের সাথে থাকুন! আপনার ব্যাপার আমি সামলাব। কোনো অসুবিধা হলে সেটা আমার দায়িত্ব। আপনি এক কাজ করুন, এখান থেকে নদীর ঘাটে চলে যান ... ওখানে অপেক্ষা করুন, আমরা আসছি যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবকটি প্রথমে ইতস্তত করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হয় প্রস্তাবে। আমি প্যান্টের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসি। এসে দেখি এডিসি সাহেব ইতোমধ্যেই গাড়িতে উঠে বসেছেন। দরজা খোলা, আমাকে হাত নেড়ে ডাকছেন। কব্জি-ঘড়ি দেখে বললেন, চলেন চলেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গাড়ির কাছে যাই। লাফিয়ে নামেন তিনি। আমাকে ভেতরের দিকে বসতে হবে, তিনি দরজার দিকে বসবেন। আমি বলি, এডিসি সাহেব, আমি দুঃখিত, আপনি চলে গেলে যান, আমি চরদুলাই গ্রামে যাব। আমরা নেমেছি দুলাইতে, চরদুলাই আরও দূর। এই বলে পেছন ফিরি আমি। হাঁটা দিই।

কয়েক পা এগিয়ে থেমে পড়ি। এডিসি সাহেব এগিয়ে আসছেন। কী করছেন আপনি? ওখানে গিয়ে আর লাভ কী? এখানেই তো শুনলেন ...

আমি বললাম, এতদূর যখন এসেই পড়েছি, আর মাত্র দুতিন মাইল, আমার সিদ্ধান্ত আমি যাবই। আপনার লাঞ্চের সময় চলে যাচ্ছে ... আপনি ফিরে যান ...

কী মুশকিলে ফেললেন বলেন তো! আপনে যাবেন, আর আমি ... না না চলেন আমিও তাহলে যাই। ... কিন্তু যাওয়া যাবে কী করে ... একটা খাল আছে, ডিঙিও আছে, কিন্তু পানি নাকি নেই ...?

: 'চলেন সেটা দেখা যাবে' এই বলে আবার হাঁটা দিই। মুখ বেজার করে তিনিও হাঁটতে থাকেন পাশাপাশি।

ডিঙি একখানা ভাড়া করা হলো। মাঝি বলল : 'অসুবিধা হবি না নে ছার।' তারপর সে জানালো, খালের সবখানে নয় কোথাও কোথাও পানি কম, ডিঙি আটকে যাবে, কিন্তু ঠেলাঠেলি করে পার করিয়ে নেওয়া যাবে।

ডিঙিতে উঠলাম আমরা তিনজন। এডিসি সাহেব পাটাতনে বসেই জিগ্যেস করলেন, 'এ আবার কে?' এই বলে প্রশ্ন করলেন যুবকটিকেই : কোথায় যাবে তুমি? আমি বললাম, এই ছেলেটার বাড়ি নাকি চরদুলাই গ্রামে ... এখানে কী কাজে এসেছিল ... তা আমাকে বলল যে আপনারা যখন আমাদেরই গ্রামে যাচ্ছেন তো আমাকেও নিয়ে চলেন ...

এই শুনে এডিসি সাহেব আর কিছু বললেন না, এমনকি গোটা পথে যুবকটিকে কোনো প্রশ্নও করলেন না।

মাঝির ভাষায়, 'ডোঙায় ভার বেশি' হয়ে গেছে। সেই ভার কমাতে খুব পানি কম এমন জায়গায় বেশ কবার নামতে হলো। কাদা ঠেলে ডিঙি সামনে এগিয়ে নিল মাঝি। এভাবেই একসময় খালের ঘাটে নামলাম আমরা এবং কিছুটা পায়ে হেঁটে চরদুলাই পৌঁছুলাম। যুবকটি যাচ্ছে সামনে সামনে। কথা বলবার দরকার নেই, মনু মিয়ার বাড়ি সে চেনে।

পল্লীটিতে খুব গরিব এবং মজুর-পরিবার বাস করে সেটা বোঝা গেল ঘরের অবস্থা আর নরনারীশিশুর অপুষ্টি-আক্রান্ত চেহারা দেখে। সরুপথের ধারে হাঁটুতে হাত বেঁধে বসে আছে বেকার যুবক, বৃদ্ধ। পথে দুএকটি বাড়ি অবস্থাপন্নের, গায়ে গতরে মাংস, চকচকে দেহ, ভুঁড়ি মোটা এমন কয়েকজন আমাদের উদ্দেশে সালাম উচ্চারণ করলেন এবং জানতে চাইলেন কোথায় যাব, কার বাড়িতে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: আমরা যাব মনু মিয়ার বাড়ি ...

: কোন্ মনু মিয়া ...?

: লোকটা কদিন হলো মারা গেছে ...

: ও!

কেউ কেউ আঞ্চলিক ভাষায় জানালো, হ্যাঁ, মারা যাবার খবর তারাও শুনেছেন। কিন্তু তার বাড়িতে কেন? দরকারটা কী? আমরা কোনো জবাব দিই না। লক্ষ করি এডিসি সাহেবও কোনো কথা বলছেন না, গম্ভীর মুখে হাঁটছেন। কী যেন ভাবছেন তিনি।

একটি ছিন্নভিন্ন খড়ের ঘরের সামনে দাঁড়াই। এটাই মনু মিয়ার বাড়ি। শহর থেকে আসা বাইরের লোক দেখে কেঁদে উঠে মনু মিয়ার সদ্যবিধবা স্ত্রী। আমার ক্যামেরায় শার্টার করতে থাকি তার মুখের ছবি নেওয়ার জন্যে। এ কী এক পেশা! একটি মানুষ অসহায়ভাবে মারা গেছে এই স্বাধীন দেশে। আমরা তার ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে পারিনি। আর, এখন, তার অসহায় স্ত্রীর কান্নার ছবি তুলছি! তার মুখের ক্লোজআপ আমার দরকার! কান্নার ভঙ্গি চাই, তার চোখের জল চাই!

আরও ছবি তোলা যাবে। ব্যাগের ভেতর রাখা টেপ রেকর্ডারের বোতাম টিপি এবং শুরু করি আলাপ। পাড়ার নর-নারী-শিশু, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যেন ভেঙে পড়েছে, আমাদের ঘিরে ধরেছে তারা। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকি, আপনারা কেউ কথা বলবেন না। মনু মিয়ার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাই, তার কথাগুলো আমাদের শোনা দরকার।

আমার হাতে নোটবুক আর কলম। প্রয়োজন নেই, তবু লিখছি মনু মিয়ার স্ত্রীর জবানবন্দী। লেখার দরকার নেই এই কারণে যে, কথাবার্তা তো রেকর্ডই হয়ে যাচ্ছে! আসলে লেখার ভান করার মানে আমি এই মুহূর্তে এডিসি সাহেবকে বুঝতে দিতে চাই না, আমার কাছে টেপরেকর্ডার আছে।

পাবনার আঞ্চলিক ভাষায় তার স্বামীর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর পরিবারটির অবস্থা কী, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানালো মনু মিয়ার বিধবা স্ত্রী, আর পাড়ার লোকজন। তাদের সাথে কথা বললেন জেলা প্রশাসনের কর্তাটিও। আরও কিছু ছবি তোলা হলো। ভেতরে ভীষণ উত্তেজনা বোধ করছি, উদ্বিগ্নতা। মনু মিয়ার স্ত্রী আমাদের দেখেই যখন হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিল, আমার চোখেও আবেগে এসে গিয়েছিল জল, এখন শুকিয়ে গেছে।

উপস্থিত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমি প্রশ্ন করি বিধবা মহিলাটিকে : আপনার স্বামী কি অনাহারে মারা গেছে? সে কি না খেয়ে মরেছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। জবাব দেয় পাড়া-পড়শীরা। কিন্তু মনু মিয়ার স্ত্রী বিবরণ দেয় আরও বিস্তারিত। দীর্ঘদিন কর্মহীন মানুষটি প্রায় উপোস-কাপাস করত। শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল তার। এই অবস্থায় দুতিনদিন করল সে পুরো উপোস। কাহিল হয়ে পড়ল। এই সময়, এক সচ্ছল প্রতিবেশী দয়াপরবশ হয়ে পাঠিয়ে দিলেন একটুখানি দুধ আর একজোড়া কলা। তা খাবার পর মনু মিয়ার শুরু হলো পাতলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়খানা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লোকটা মারা গেল। এই বলে আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে।

ঐ গ্রামেই আরও ৪ জনের নাম-পরিচয় মিলল যারা খাদ্যাভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগবার পর অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে। এদের বিবরণ সংগ্রহ করে ফিরে এলাম আমরা।

আবার সেই মেঠোপথ, খাল। কাদায় নামা-উঠা আর ডিঙি ঠেলাঠেলি। একসময় গাড়িতে এসে বসলাম। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। শহরে ফিরে চলেছি আমরা।

গাড়ি ছাড়তেই, এডিসি সাহেবের কথা শুরু হলো। চরদুলাই আসার পথে যে ভদ্রলোক একটি কথাও বলেন নি, ছিলেন গম্ভীর মুখ, বিরক্ত, তিনিই এখন সম্পূর্ণ উল্টো স্বভাবের মানুষ। 'সংবাদে' তার অতিপরিচিত একজন কাজ করেন সেকথা বললেন, কোন্ কোন্ পত্রিকা পড়েন, কার লেখা ভালো লাগে, জানালেন তিনি নিজেই। আলাপে জানালেন আমার নাম নাকি অনেক আগে থেকেই জানেন, অনেক রিপোর্টও পড়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব অনেকটাই আমার কানে যাচ্ছে না। আমি ভাবছি, ঢাকা রওনা দেব কখন আর পৌঁছুব কখন!

: কি রিপোর্ট লিখবেন মোনাজাত সাহেব? প্রশ্ন করেন এডিসি। আমি পাল্টা জিগ্যেস করি, ডিসি সাহেব তো আপনাকে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করতে বলেছেন, তা আপনি কী জানাচ্ছেন তাকে? স্টারভেশন না ডায়রিয়া?

: কী রিপোর্ট দেওয়া যায় বলুন তো?

: সেটা আপনার ব্যাপার। তবে আমার ধারণা হচ্ছে, আপনি ঐ ডায়রিয়ার কথাই বলবেন। কেননা আপনি নিজেই শুনে এলেন, মনু মিয়া না খেয়ে মারা যায় নি। মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগে সে দুধ এবং কলার মতো উন্নত খাবার খেয়েছিল!

আমার এই কথায়, নাকি অন্য কোনও কারণে, হঠাৎ আমার হাতের ওপর হাত রাখেন এডিসি সাহেব। মুখ ফেরাতেই দেখি তার দুচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। পাথর স্বভাবের মানুষটি, যিনি তার প্রাত্যহিক লাঞ্চ-আওয়ার পেরিয়ে যাবে বলে আক্ষেপ করেছিলেন, 'খামাকা' একটা ইনকোয়ারি চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে ডিসির ওপর ছিলেন রুষ্ট, যিনি চরদুলাই আসার পথে একটি ভদ্রতামূলক কথাও বলেন নি, দুলাই বাজার থেকে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তিনি এখন ধা-ধা ছুটে যাওয়া জীপের ভেতর একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দের বিপরীতে কাঁদছেন! আমি বুঝতে পারি, বলি, এডিসি সাহেব, এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীন দেশে মানুষ অনাহারে থাকে, মরে, কিন্তু আরও দুর্ভাগ্য, আপনাদের বলতে হয় 'ডায়রিয়ায় মৃত্যু।'

আমি ভেবেছিলাম শহরে ফিরে এডিসি সাহেব 'ডায়রিয়ায় মৃত্যুর' রিপোর্ট দেবেন ডিসি সাহেবকে। সেটাই ছিল 'স্বাভাবিক'। কিন্তু না, তিনি ইংরেজিতে টাইপ করা রিপোর্টে মনু মিয়ার 'স্টারভেশন ডেথ' কথাটা উল্লেখ করলেন। আমি করলাম কী, সরকারি নথি বের করে আনা অন্যায় হলেও, পরে যাতে ঝামেলায় না পড়ি সেজন্যে ঐ রিপোর্টের ফটোকপি বের করে আনলাম খুব কৌশলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটোকপি আনবার পর বাসের টিকিট কাটলাম। পরদিন ভোরবেলা ঢাকা রওনা দেব, পৌঁছে যাব আশা করি দুপুর দেড়-দুটোর মধ্যে। তারপর ছবি প্রসেস, প্রতিবেদন তৈরি। অর্থাৎ ছাপা হতে হতে পরশু। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি 'কিল' না হয়। কিল মানে কিল-ঘুষি নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে Kill এবং তবু আক্ষরিক অর্থে হত্যা করা নয়, সংবাদপত্রের ভাষায় এই নির্মম শব্দটি বলতে বোঝায় রিপোর্ট বা ছবি না ছাপানো। বাতিল করে দেওয়া।

সন্ধ্যার পর পাবনা প্রেসক্লাবে আসি। অনেকের মুখে প্রশ্ন : কখন ফিরলেন চরদুলাই থেকে? কী পেলেন ওখানে? সত্যি কি অনাহারে মারা গেছে মানুষ? আমি ভীত এবং শঙ্কিত। চরদুলাই অনুসন্ধানে যাবার ব্যাপারটি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এঁরা জানলেন কী করে? জানেন শুধু শিবজিত দা, তিনি তো কাউকে বলে দেওয়ার কথা নয়! পরে বুঝলাম, না তিনি বলেন নি, আমি যে স্পটে যাব তা তারা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছেন।

কিন্তু আমার মাথা ঘুরে গেল তখনই, যখন শুনলাম ৫টি পত্রিকার সাংবাদিক চরদুলাইতে ৫ জনের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আজই দুপুরে টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টেলিগ্রাম মেসেজটি ছোট, কিন্তু আমাদের সংবাদেও তা গেছে। তা আমার ভয় ইত্তেফাককে নিয়ে। কালকের কাগজে ৫ জনের অনাহারে মৃত্যুর খবর যদি ৫ লাইনও ছাপা হয়ে যায়, তাহলে 'সংবাদে'র এক্সক্লুসিভ বলে আর কিছু থাকবে না। একবার ভাবলাম, আমার প্রতিবেদনটি এক্ষুনি টেলিফোনে পাঠিয়ে দিই, কিন্তু সে ভাবনা পরমুহূর্তেই বাতিল করতে হলো। কেননা এটি একটি সরজমিন প্রতিবেদন, স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ। এত বড় প্রতিবেদন টেলিফোনে দেওয়া খুব কষ্টকর। আর, তা-ও নাহয় দেওয়া গেল, কিন্তু ছবি যাবে কী করে?

মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। অভিমান হচ্ছে এ কারণে যে, পাবনার বন্ধুরা এতদিন খবরটা পাঠালেন না, আর আজই তাঁদের ...। কিন্তু ঘটনা যখন ঘটে গেছে, কী আর করা যাবে! আবদুল হামিদ সড়ক ধরে একা একা হাঁটতে থাকি। আমার প্রিয় লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে এসে দাঁড়াই। নানারকম মিষ্টি দেখি, মানুষজনের খাওয়া দেখি, ক্যাশকাউন্টারে বসা মানুষটির টাকা গোনা দেখি। একটা লোক কাউন্টারে আসেন, মালিকের একজনের সাথে কথা বলতে থাকেন। লোকটির আক্ষেপ শুনি, সেটা এরকম : তিনি ঢাকায় একটা ফোন করার জন্যে গিয়েছিলেন, দীর্ঘক্ষণ বসে অপেক্ষা করেও লাইন পান নি। ঢাকার লাইন নাকি সেই দুপুর থেকে খারাপ্। তিনি টেলিফোন বিভাগের ওপর খুব ক্ষিপ্ত এবং নানা কটু মন্তব্য করতে থাকেন।

হঠাৎ আমি যেন লাফিয়ে উঠি ভেতরে ভেতরে। হাঁটা দিই বাণী সিনেমা হলের দিকে, দ্রুত। সিনেমা হলো পেরিয়ে যে রাস্তাটা ডানে গেছে, তার ধারেই টেলিগ্রাম অফিস। এর লাগোয়া পাবলিক কল অফিস অর্থাৎ সংক্ষেপে যাকে বলে পিসিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, ঠিক তাই। টেলিফোন লাইন খারাপ। টেলিগ্রাম, যা ঢাকা পাঠানো হয় টেলিপ্রিন্টারে, তাও অচল হয়ে আছে দুপুর থেকে। যান্ত্রিক গোলযোগ। প্রেস টেলিগ্রাম 'বুক' হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনোটাই এখনও পাঠানো সম্ভব হয় নি।

: লাইন কি ভালো হবে ভাই? কতক্ষণে ভালো হবে?

জবাব মেলে যা, তাতে বোঝা যায়, আজ রাতের মধ্যে লাইন সচল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় পাতা বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে পড়ি। সিগারেটের মতো বিষপান করতে করতে আমি মনে মনে হাসতে থাকি। আমার ভেতর বিচিত্র এক অনুভূতি! কী নিষ্ঠুর, কী নির্মম, কী স্বার্থপর আমার এই পেশা-চিন্তা! এই পাবনা শহরে, টেলিগ্রাম অফিসের বারান্দায় বসে আমি এক সাংবাদিক আমার 'এক্সক্লুসিভ' রক্ষায় কত তৃপ্ত! এই মুহূর্তে কত জরুরি সংবাদ শতশত টেলিগ্রাম ফরমে আটকা পড়ে আছে, কত মানুষ টেলিফোনে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। কারও আছে ব্যবসাপাতির খবর, কারও মৃত্যুসংবাদ, কেউ নতুন জন্ম নিয়েছে তার শুভবার্তা। আর আমি, মোনাজাতউদ্দিন, পাবনা-ঢাকা টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে এই মুহূর্তে কী আনন্দিত!

সিগারেটের নির্গত ধোঁয়ার সাথে বলি, হাঁ মোনাজাতউদ্দিন! এই তোমার সাংবাদিকতা!

AMARBOI.COM

রাতে ঘুম হয় না। খুব ভোরে বোঁচকা-বুচকি নিয়ে ত্যাগ করি নূরপুরের জেলা বোর্ড ডাকবাংলো। পাবনা বাসস্ট্যান্ড। ঢাকা। তারপর দুপুর তিনটায় ২৬৩ বংশালে, 'সংবাদ' অফিসে।

নিউজরুম। ঢুকতেই নিউজ ডেস্কের সবাই হৈ হৈ করে ওঠেন। আসুন আসুন, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি! স্বপন দা (শ্রী স্বপন দত্ত) চায়ের অর্ডার হাঁকেন। ডেস্কের কাছাকাছি যেতেই লক্ষ করি, আমাদের সহকর্মী ছাড়াও অপরিচিত এক লোক বসে আছেন একটি চেয়ারে। তিনি উঠে দাঁড়ান, একটুখানি এগিয়ে এসে বাড়িয়ে দেন হাত। নামটি বলেন, আমি ইউএনও সুজানগর।

আমি থমকে দাঁড়াই। সংবাদ অফিসে সুজানগরের ইউএনও! ব্যাপারটি কী? তিনি ...। ভাবনায় ছেদ পড়ে। বেনসনের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে নানা প্রশ্ন তাঁর : এত দেরি হলো যে? পথে কোনো অসুবিধা হয় নি তো? দুপুরে খাওয়া হয়েছে? ডেস্কের অনেকেই মুচকি মুচকি হাসছেন। একজন বললেন, আপনি যান, বজলু ভাইয়ের ঘরে যান, তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কিন্তু আমি নিউজ ডেস্কের ধারেই বসে পড়ি। বজলু ভাইয়ের সাথে দেখা করার আগে জানা প্রয়োজন, আমি যে উপজেলা থেকে অনাহারের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এলাম, সেই উপজেলার প্রধানকর্তা সংবাদ অফিসে কেন? জানা গেল, সুজানগরের ইউএনও সাহেব আসলে ঢাকাতেই ছিলেন অফিসের কাজে, পাবনা থেকে প্রশাসনের একজন কর্তার টেলিফোন পেয়েছেন আজ সকালে। ইউ.এন.ও'কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে : মোনাজাতউদ্দিন তোমার উপজেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকার অনাহারে মারা যাবার খবর-ছবি নিয়ে ঢাকা চলে গেছে। তুমি সংবাদ অফিসে যাও এবং মোনাজাতকে ম্যানেজ করো। ঐ রিপোর্ট ছাপা হলে তোমার ঝামেলা হয়ে যাবে। ইউএনও তাই ছুটে এসেছেন, সকাল থেকেই বসে আছেন সংবাদ অফিসে। আরও শুনলাম, এই ইউএনও সাহেব সংবাদের একজনের বন্ধু, দুএকজনের পরিচিত এবং ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন বলে মতিয়া আপার সাথেও তাঁর ভালো জানাশোনা। আমার বুক কেঁপে ওঠে। এ আবার কোন্ ঝামেলা বাঁধল। এত কষ্টের পর রিপোর্ট-ছবি ছাপা হবে, না-কি কিল হবে!

বজলু ভাইয়ের কামরায় ঢুকি। তিনি কী লিখছিলেন, আমাকে দেখেই হেলান দিয়ে বসলেন। তার গম্ভীর প্রশ্ন : স্পটে গিয়েছিলেন?

: জি।

: কী পেয়েছেন?

: কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি লিখে দিচ্ছি। ছবিও করিয়ে নিচ্ছি।

: ঠিক আছে, লিখতে বসে যান।

এই বলে আবার কলম হাতে তুলে নেন বজলু ভাই। আমি বেরিয়ে আসার সময়। পেছন থেকে বজলু ভাইয়ের কণ্ঠস্বর : সুজানগরের ইউএনও এসে বসে আছে। দেখা হয়েছে?

: জি। ... একটু থেমে বলি : তা, বজলু ভাই, আপনি কি, মানে ...।

: না। যা দেখে এসেছেন, ডিটেইলস্ লিখুন। আমি ওটা দেখে তারপর যাব। ছবি কী কী আছে, করে ফেলুন।

আমি বেরিয়ে আসি। বার্তা বিভাগে নয়, সহকারী সম্পাদক সাহেবরা যেখানে বসে কাজ করেন, সেই কামরাটা ফাঁকা, বসে পড়ি সেখানেই। বের করি নোটবুক, টেপ রেকর্ডার, প্যাড। আমি ভাবছি, স্টোরিটা আগে লিখে দিই, বজলু ভাই দেখুন, তারপর ছবি প্রসেস করা যাবে। ততক্ষণে আসুক আমার কোনো আলোকচিত্রী বন্ধু।

লিখতে বসি।

কিভাবে শুরু করা যায়?

না, অনাহারে মারা গেছে কিংবা না খেয়ে মারা গেছে এমন শব্দ বা বাক্য আমি ইনট্রোতে ব্যবহার করব না। এমনভাবে লিখতে হবে যাতে পাঠক ব্যাপারটি বুঝে নেন কিন্তু সরকার প্রতিবাদ করতে না পারে। আমি এইভাবে শুরু করি : মনু মিয়া কি না খেয়ে মারা গেছে? না, না খেয়ে মরে নি। মৃত্যুর আগে সে খেয়েছিল প্রতিবেশীর দেওয়া দুধ ও কলা ,... এবং তারপর ...

এই সময় কামরায় ঢোকেন ঐ ইউএনও সাহেব। এতক্ষণ তিনি নিউজ ডেস্কে বসে ছটফট করছিলেন, আর পারেন নি, এখানেই, এই এ্যাসিসটেন্ট এডিটরদের কামরাতেই চলে এসেছেন। তিনি বেনসনের প্যাকেটটি রাখলেন আমার সামনে, মুখ খোলা, একটি শলা আধাআধি বের করা, দেখাচ্ছে যেন প্যাকেটে একটি রেফ। তিনি ডাকেন :

মোনাজাত ভাই ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: বলুন ...

: এই রিপোর্টটি ছাপবেন না মোনাজাত ভাই। আমাকে মেরে ফেলবেন না।

: আমি এ ব্যাপারে কিছু বলব না। কিছু বলবার থাকলে বজলু ভাইকে বলুন।

আবার লেখা শুরু করি। তিনি হাত রাখেন হাতে। আমি কলমের মুখ বন্ধ করে প্যাড উল্টে রাখি। আমি দুঃখিত ইউএনও সাহেব। আমার কাজ আমি করব। আমার মেজাজ বুঝে তিনি চেয়ার ছাড়েন, বজলু ভাইয়ের কামরায় ঢুকে পড়েন দ্রুত। আমার লেখার আর মুড নেই। কান পেতে থাকি। বজলু ভাই বলছেন, 'আপনি কিছু বলতে আসবেন না। বরং চলে যান।'

এ ঘর থেকেও বুঝতে পারি ইউএনও সাহেব কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। মিনিট কয়েক পরে বেরিয়ে আসেন তিনি এবং আবার আমার সামনে।

: মোনাজাত ভাই। তার গলা কাঁপছে। এখন কী করি আমি?

: ঢাকায় আপনার কাজ শেষ?

: না, এখনও শেষ হয় নি ...

: তবু যদি পারেন, ফিরে যান।

: আজই কি চলে যাব?

: সেটা আপনিই ঠিক করুন। আজও যেতে পারেন। কাল সকালেও। তবে তাড়াতাড়ি যান। ওখানকার অবস্থা খারাপ।

AMARBOI.COM

: মোনাজাত ভাই ...

: বলুন ...

: রিপোর্টটা কি না ছাপলে হয় না মোনাজাত ভাই?

: রিপোর্ট তো আমি ছাপব না। ওটা বজলু ভাইয়ের ব্যাপার। আমার কাজ লিখে দেওয়া। আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলে আর ইয়ে করবেন না। বুঝতেই পারছেন আমি টেনশনে আছি। অনেক লিখতে হবে এবং চিন্তাভাবনা করে লিখতে হবে।

আসলেই সময় কম। স্টোরিটা 'এডিট' করে বাসায় যাবেন বজলু ভাই। আর আমাকেও অনেকখানি লিখতে হবে। ইউএনও সামনে বসেই থাকেন। আমি আবার লিখতে থাকি।

পরদিন চরদুলাইয়ের ওপর সরজমিন প্রতিবেদনটি ছাপা হলো খুব ভালো 'ডিসপ্লে' দিয়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে লাগল টেলিফোন। পাবনা থেকে খবর পেলাম : 'সংবাদ' এখনও পাবনা শহরে পৌঁছায়নি, তবে ঢাকা থেকে টেলিফোন-নির্দেশ পেয়ে চাল-গমসহ একজন ত্রাণকর্তা চরদুলাই গ্রামে চলে গেছেন।

অনেক টেলিফোন। অনেক অভিনন্দন। কনগ্রাচুলেশন মোনাজাতউদ্দিন। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। কেউ বললেন, রিপোর্টটা খুব ভালো হয়েছে, কেউ বললেন ছবিটা হয়েছে চমৎকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি চমৎকার! এ যেন শোকসভায় হাততালি! মনু মিয়ার স্ত্রীর কান্নার ছবি আর বিবরণ হয়েছে 'বিউটিফুল'! তুমি নিশ্চয়ই উন্নতি করবে মোনাজাতউদ্দিন!

উৎফুল্ল আমি। এই সমাজ, যেখানে মানুষ না খেয়ে মরে, আর আমি তারই 'রিপোর্ট' লিখে বাহ্বা পাই! মনু মিয়ার বিধবা স্ত্রীর সেই কান্না থেকে অনেক দূরে, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার আলো ঝলোমলো পথে আমি এই মুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি ...।

সাজানো ছবি

১

তুমি তো অন্যের সাজানো ছবি আর বানোয়াট খবরের কথা বলো, তুমি নিজে করো না সেটা? করোনি কখনো? আড্ডা-আসরে প্রশ্ন করেন অনেক বন্ধু। প্রশ্ন করেন ঘনিষ্ঠ পাঠক। এমনকি কোনো কোনো সাংবাদিকও।

সব কথা তো আর বলা যায় না। তবু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি। 'দাড়িতে মৌচাক' রিপোর্টটির ঘটনা বলি। বাত্রিগাছ ছিটমহলের ছবির কথা বলি। নিজের অপরাধ স্বীকারের লজ্জা আমার নেই, আমি আত্মসমালোচনায় বিশ্বাসী।

এই লেখাটিতে 'বাত্রিগাছ ছিটমহলে ভারতীয়দের অগ্নিসংযোগ' সম্পর্কিত একটি ছবির কাহিনী বলব। তার আগে বলি, ছিটমহল বলতে আমরা দহগ্রাম আঙ্গরপোতাকেই জানি। কিন্তু, ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ১২৬টি ও বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের ৯৪টি ছিটমহল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা আর তার করিডোর তিনবিঘা নিয়েই জটিলতা।

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা। এখানে ৩টি ছিটমহল। দুর্গাপুর, বাত্রিগাছ আর কিসমত বাত্রিগাছ। বাত্রিগাছ ছিটমহলের আয়তন প্রায় ৫৭৭ একর, কিসমত বাত্রিগাছের ২১০ একর। কেউ কেউ 'বত্রিগাছ' বললেও জায়গার নামটি বাত্রিগাছ। তা নামের বানান-বিতর্ক এখানে নয়, বলছি কাহিনীটি।

১৯৬৫। 'আজাদে'র নিজস্ব সংবাদদাতা আমি। লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ থেকে খবর এল : একদল ভারতীয় দুর্বৃত্ত বাত্রিগাছ ছিটমহলে হামলা চালিয়েছে। মারপিট, লুটপাট, শ্লীলতাহানি তো করেছেই, ফিরে যাবার সময় বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সবগুলো পরিবার আশ্রয়হীন, তারা অনেকেই চলে আসছে (তৎকালীন) পূর্ব পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুট দিলেন মজিদ ভাই আর আইনুজ্জামান। আবদুল মজিদ (মরহুম) তখন দৈনিক পাকিস্তানের রংপুর প্রতিনিধি আর আইনুজ্জামান (এখন ঢাকায় থাকেন) একটি বার্তা সংস্থার সংবাদদাতা। ওঁরা সঙ্গে নিলেন ছোট্ট পুরাতন ভাঙা-প্রায় একটি ক্যামেরা। স্পটে যদি যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে ছবি তুলবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিটমহলে ঢোকা অসম্ভব। অন্তত শহর থেকে কেউ গিয়ে। কিন্তু মজিদ ভাই, কাজের ব্যাপারে যিনি অত্যন্ত সিরিয়াস, ছবি তুলবেনই। স্বাভাবিক পথে যখন ওখানে ঢোকা বা ছবি তোলা সম্ভব নয়, তখন পরলেন তাঁরা লেংটি। খালি গা। গায়ে মাখলেন কয়লা-ছাই। কাঁধে কোদাল আর হাতের ছেঁড়া চটের ব্যাগে কাগজ-কলম এবং সেই ক্যামেরাটা। মজুরের ছদ্মবেশে ঢুকলেন তারা বাত্রিগাছে, তাও সদর রাস্তা ধরে নয়, চোরাপথে।

একের পর এক ছবি। পুরো রীলটাই শেষ করলেন আইনুজ্জামান। মজিদ ভাই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আর ক্ষতিগ্রস্ত দুএকজনের সাক্ষাৎকার টুকে নিলেন। এই অভিযানটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, ছিটমহলের আশপাশে দুর্বৃত্ত কেউ যদি টের পেত, খতম করে দিতে পারত। কিন্তু মজিদ ভাই আর আইনুজ্জামান, সে সময় টগবগে যুবক, মাথায় সাংবাদিকতার নেশা, প্রায় অসাধ্য সাধন করলেন। পরদিন ফিরে এলেন রংপুর শহরে। মজিদ ভাই খুব খুশি। ছবি আর খবরটি যে দৈনিক পাকিস্তানের 'লিড আইটেম' হবে, তা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন।

আমি ঘটনাস্থলে যাইনি। ওদের মুখে শুনে নাহয় রিপোর্ট পাঠানো যায়, কিন্তু ছবি? মজিদ ভাইয়ের হাতে যে এক্সপোজড ফিল্মের রীল, তাতে আছে বাত্রিগাছ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়ার 'মারাত্মক মারাত্মক' সব ছবি। আমি মজিদ ভাইয়ের কাছে হাজির। পায়ে পড়ার মতো করে অনুনয় করলাম, 'আমাকে কি একখান ছবি দেওয়া যাবে না মজিদ ভাই?'

বিরাট হৃদয়ের মজিদ ভাই, পরে যাঁকে দেখেছি নিজের দৈনিক বাজার খরচের সামান্য টাকাটিও অভুক্ত মানুষকে বিলিয়ে দিতেন, যিনি তাঁর কোটটি খুলে দিয়েছিলেন পথের পাশে শীতযন্ত্রণায় কাতর বৃদ্ধের গায়ে, তিনি ছবি দিতে রাজি হয়ে গেলেন। তবে এটুকু বললেন, 'খবর আর ছবি নিয়ে আজই আমি ঢাকা রওনা হব, তুমিও চলো।'

আমি আবার ক্যানো যাই? তিনি বললেন, 'আরে বোকা, চলো। নইলে আমি কাল ঢাকা পৌঁছাব, পরশু ছবি ছাপা হয়ে যাবে। আর বাই পোস্ট ছবি যেতে যেতে তিন-চারদিন লেগে যাবে। তখন আর ঐ ছবির গুরুত্ব থাকবে না।' তারপর হেসে বললেন, 'এটা ভাবিও না যে আমি তোমাকে ছবিও দেব, সেই ছবি ঢাকায় গিয়া আজাদ অফিসে দিয়াও আসব। তা হবে না। চলো তুমি ঢাকায়। বেড়ায়া আসবা। খরচাপাতি আমার।

আমি বলি, ঠিক আছে, বলছেন যখন, তাহলে যাই—

ছবি প্রসেস করা দরকার। মজিদ ভাই আর আমি এলাম ভিউফাইন্ডারে। এটি একটি স্টুডিও, যার মালিক ছিলেন মোনায়েম ভাই (মরহুম), তখনকার রমরমা ব্যবসার ব্যস্ততার ফাঁকেও সাংবাদিকদের ছবি ডেভলপ ও প্রিন্ট করে দেওয়ার ব্যাপারে খুব সহযোগিতা করতেন। 'প্রেস কমিশনের' ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। তার মানে, কোনো সাংবাদিক তার স্টুডিও থেকে ছবি করিয়ে নিলে চার্জ নিতেন অর্ধেক। সেই ভিউফাইন্ডারের এখন আধুনিকীকরণ হয়েছে, কালার প্রসেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেশিন বসেছে, কিন্তু পিতার করে যাওয়া প্রেস কমিশনের ব্যবস্থাটা এখনও ধরে রেখেছে তার ছেলেরা।

যে কথা বলছিলাম। ভিউফাইন্ডারের 'ডার্করুম বয়' তখন ছিল না, খুব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ছবি আছে শুনে মোনায়েম ভাই নিজেই ফিল্ম নিয়ে ডার্করুমে ঢুকলেন। আমরা বাইরে বসে চা খাচ্ছি আর শুনছি মজিদ ভাইদের বাত্রিগাছ অভিযানের গল্প। কয়েক মিনিট বাদে সশব্দে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন মোনায়েম ভাই। তার প্রথম কথা, 'শ্যাষ।' তারপর কালো লম্বা সেলুলয়েডের ফিতা আমাদের সামনে মেলে ধরলেন তিনি। মজিদ ভাই ধপ করে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। আমি হাঁ।

ব্যাপার কী?

মোনায়েম ভাই বোঝালেন, ক্যামেরায় ফুটো ছিল, কিংবা ফাঁক। 'লাইট পাস' করেছে। 'কী ক্যামেরা নিয়া গেছিলেন আপনেরা! দূর!' ভর্ৎসনার সুরে বললেন তিনি। আমাদের কারও মুখে কথা সরে না। 'কল্পনাও করিনি এইরকম একটা বিশ্রী হয়্যা যাবে।' অনেকক্ষণ পরে মজিদ ভাই কথা বললেন মাথায় হাত ঘষতে ঘষতে।

ছবি নিয়ে ঢাকা যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যানসেল। আমরা প্রচণ্ড হতাশ। আমি মজিদ ভাইকে সান্ত্বনা দিতে যাই। 'যা হবার হয়েছে মজিদ ভাই, এখন আর কী করা যাবে। ছবি বাদ দেন, চলেন শুধু নিউজটা টেলিগ্রাম করে পাঠাই। মজিদ ভাই, কিছুক্ষণ আগে যিনি আমাকে ছবি দিতে চেয়েছিলেন এবং নিজের খরচায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ঢাকায়, তিনি হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠেন, 'চুপ করো তো! প্যাচর প্যাচর করিও না।' সে ধমকটি এতই অপ্রত্যাশিত যে, কেঁদে ফেলি। মোনায়েম ভাই এই সময় বলে উঠেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখেন মজিদ, চা খান।

চা আসে। এসময়, ঝানু ক্যামেরাম্যান মোনায়েম ভাই তাঁর ড্রয়ার থেকে একগাদা খাম বের করেন। তাঁর ঠোঁটে ঝোলানো হাসি। কিন্তু কোনো কথা না বলে আবার ঢুকে যান ডার্করুমে। আমরা পাশাপাশি, চুপচাপ। মাঝখানে কিছু সময় বয়ে যাচ্ছে।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন মোনায়েম ভাই অন্ধকার থেকে আলোয়। তাঁর হাতে টেন-টুয়েলভ সাইজের ভেজা ছবি। 'দেখেন তো মজিদ, এইখান্ চলবে কিনা!' তিনি ছবিখানা মেলে ধরেন আমাদের সামনে। মজিদ ভাই লাফিয়ে উঠেছেন। কয়েক মুহূর্ত আগের মানুষটি, যিনি ছিলেন মৃত কোনো ব্যক্তির পাশে বসা কেউ, এবারে আনন্দে হা-হা করে হাসতে থাকেন। 'এ ছবি কোথায় পাওয়া গেল?'

বর্ণনা দিলেন মোনায়েম ভাই। কিছুদিন আগে রংপুর শহরের রাধাবল্লভে (মরহুম মশিউর রহমান যাদু মিয়ার বাড়ির পাশে) একটা বাড়িতে আগুন লাগে। ধান, পাট, আলু সরিষা, কাপড়-চোপড়, ট্রাঙ্ক, সুটকেস সব পুড়ে ছাই হয়। সেই ছবিটি তুলে রেখেছিল জামান নামে এক ছেলে। তা ঐ জামান ফিল্ম ডেভলপ করিয়েছে, কিন্তু ছবি প্রিন্ট করায়নি, ফিল্মটাও নিয়ে যায় নি। অগ্নিকাণ্ডের সেই ছবিটাই এখন এনলার্জ প্রিন্ট করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিটার একদিকে একটা প্রাচীর। কেটে বাদ দেওয়া হলো। উপর দিকে কয়েকটা সুপারি গাছ, তারও মাথা উড়িয়ে দেওয়া হলো। ডানদিকে, দেখা যাচ্ছিল একটি বালক উঁকি দিচ্ছে, তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করলেন মোনায়েম ভাই নিজ হাতে। এই ছবি সম্পাদনার পর যা থাকল, তাতে দেখা যাচ্ছে : একটি উঠোনে পড়ে আছে পোড়া ধান, কিছু পাট, আলু, কাঁথা, কাপড়, একটা কোঁকড়ানো ট্রাঙ্ক, গ্রামীণ ঘর-গেরস্থালির এটা-ওটা। মোনায়েম ভাই বললেন, 'চালায়া দ্যান। কোন্ ব্যাটায় বলবে এটা আপনাদের ছিটমহলের আগুন না রাধাবল্লভের আগুন।' তারপর হা-হা করে হেসে উঠলেন, 'আরে এ তো আমিও এখন বুঝতে পারতাছি না এটা কোন্খানকার ছবি!'

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পরদিন সকালের ট্রেনে চেপে ঢাকা রওনা হলাম আমরা দুজন। ইতোমধ্যে লেখা হয়ে গেছে প্রতিবেদন। পরদিন 'দৈনিক পাকিস্তানে' লিড আইটেম। দৈনিক আজাদেও। ছবির ক্যাপশনে ছাপা হলো : 'বাত্রিগাছ ছিটমহলে ভারতীয় দুর্বৃত্তদের বর্বরোচিত হামলার স্বাক্ষর।'

২

ছবি নাকি সত্য বলে! সত্যি কি তাই? আধুনিক সাংবাদিকতার এই যুগে দেশে-বিদেশে এখন যা ঘটছে তাতে ছবির সত্য বলে কিছু থাকছে না। এ নিয়ে অনেক ঘটনা-গল্প সাংবাদিকরা জানেন, তবে সাধারণ পাঠক অনেকেই অজ্ঞাত।

এমন ঘটনা আছে অনেক অনেক। তবে একটির কথা বলছি। একটি বিদেশি পত্রিকায় ছাপা হলো একটি ছবি, যাতে দেখা যাচ্ছে, একটি পাতাশূন্য গাছের ডালে একটি বিড়াল উঠে বসে আছে। ছবিটি সত্যি ভালো ছিল, পাঠকদের মধ্যে সাড়া জাগায়, ফটোগ্রাফার বাহ্বা পান এবং পরবর্তীকালে পুরস্কারও। কিন্তু কিছুদিন পর অপর এক পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেল ঐ মূল ছবিটির নেপথ্য-ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে : একজন ফটোগ্রাফার নিজ হাতে একটি বিড়ালকে গাছে ঠেলে তুলে দিচ্ছেন। পাশের দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে : ঐ ফটোগ্রাফারটি ক্যামেরা তাক করে আাছেন পাতাশূন্য গাছে বসা বিড়ালটির দিকে। বলাবাহুল্য, এই নেপথ্য-ছবি ছাপা হবার পর হুলস্থুল বেঁধে যায়। প্রথম ফটোগ্রাফার প্রশংসা ও পুরস্কার ফিরিয়ে দেন, পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁদের অবশ্য এই সৎসাহসটুকু আছে অপরাধ স্বীকার করার। এমনকি, বিশ্ববিখ্যাত 'পুলিৎজার' পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনাও ঘটেছে এইতো কবছর আগে। যে সাংবাদিক পুলিৎজার পেয়েছিলেন তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর রচিত প্রতিবেদন, যার ওপর ভিত্তি করে পুরস্কারটি পেয়েছিলেন, তা ছিল বানোয়াট।

এদেশে, অনেক সাড়া জাগানো ছবি নিয়ে বিতর্ক আছে। '৭৪-এর বাসন্তি-দুর্গাতির জাল-পরা ছবিটি নিয়ে এখনও কথা উঠে, সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বলা হয়, ঐ ছবিটি নাকি বাসন্তি-দুর্গাতিকে কিছু টাকা দিয়ে, জাল পরিয়ে, তারপর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলা হয়েছিল। আফতাব আহমদের তোলা এই ছবিটি নিয়ে 'পথ থেকে পথে' বইটির 'আনসার আলী' পর্বে কিছু কথা বলেছি। আমি আওয়ামী লীগ করি না, এই দলের বিরুদ্ধ নই, অন্য কোনো দলের হয়ে ঐ ছবিটির পক্ষে বা বিপক্ষে সন্দেহ-তর্ক করবার মতোও আমার চিন্তাভাবনা নেই। তবে ঐ ছবিটি সাজানো ছিল কিনা তা আমি বহুবার বহুভাবে তদন্ত করেছি। কথা বলেছি ফটোগ্রাফারের নৌকায় যারা ছিলেন, কিংবা ছিলেন ছবি তোলার সময় উপস্থিত, তাঁরা একবাক্যে যা বলেছেন তাতে এটুকু নিশ্চিত হয়েছি, আফতাব আহমদের ঐ ছবিটি বানানো বা সাজানো ছিল না। অথচ, '৯১-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে একটি পত্রিকায় বাসন্তির এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জবানবন্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদন লেখা হলো : '৭৪-এর ঐ সময় নাকি টাকা দিয়ে জাল পরিয়ে ওদের ছবিটি তোলা হয়েছিল! কই, আমি তো বহুবার বহুভাবে কথা বলেছি ঐ আত্মীয়টির সাথে, বলেছি আপনি সত্য বলুন, কিভাবে ফটোগ্রাফার ঐ ছবি তোলেন? কিন্তু তিনি 'ছবিটি সাজিয়ে তোলা' এমন কথা বলেন নি কখনো।

এটা ঠিক যে রাজনীতিতে মার খাওয়া কিংবা সেই মার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেক সময় সংবাদ ও ছবি তথা গোটা সংবাদপত্রকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে নানাভাবে। সেজন্যে, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চরিত্র বা বিষয়রূপী বাসন্তি, যে কিনা সত্যি বোবা, সামাজিকভাবেও বোবা, চুয়াত্তর থেকে একানব্বই পর্যন্ত একই সামাজিক অবস্থানে পড়ে থাকে। কিন্তু সেই মেয়েটি সংবাদ শিরোনাম হয়, ছবির বিষয় হয়, জমে ওঠে রাজনীতিকদের বক্তৃতার উত্তপ্ত মঞ্চ।

মোহাম্মদ আলম, আমার প্রিয় একজন। 'ভালো-মন্দ মিশিয়ে মানুষ' এ কথাটা যারা মানেন, তাদের কাছেও প্রিয় তিনি। এই মোহাম্মদ আলমের একটি ছবি, এক বানর তার বাচ্চাকে কোলে জড়িয়ে বংশাল এলাকার এক ভবনের ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা ছবি তুলেছিলেন, সেটি আমার খুব মন কাড়ে। ছবিটি সংবাদে ছাপা হয়েছিল। (পরে অবশ্য এরকম একটি ছবি মুফতি মুনীরও তুলেছিলেন।)

তা মোহাম্মদ আলমের জীবনকাহিনী নয়, তার একটি বহু বিতর্কিত ছবির নেপথ্য কথা বলছি। ছবিটি রাজশাহী থেকে তোলা। দৈনিক সংবাদে ছাপা হয়। পরে প্রেস ইনস্টিটিউটের পত্রিকা 'নিরীক্ষা'য় শেষ প্রচ্ছদেও ছবিটি প্রকাশিত হয়।

যাই হোক, মোহাম্মদ আলমের এই ছবি, যা নিয়ে তাঁর কিছু সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠজনের মধ্যেও সন্দেহ রয়েছে, তার নেপথ্য কাহিনী বলি। কেননা, ছবিটি তোলার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ছবির নিচে রাজশাহী ডেটলাইনে আমার একটি প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিল, কিন্তু তা সাড়া জাগাতে পারে নি। শুধু একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়েও শক্তিমান, তাই নয়, ঐ ছবি যদি হিট করে তাহলে তার পাশাপাশি প্রকাশিত মর্মস্পর্শী প্রতিবেদনও ম্যাটম্যাটে হয়ে যায়। ইত্তেফাকে জাল-পরা সেই বাসন্তি-দুর্গাতির ছবির সাথে শফিকুল কবিরের মতো অত্যন্ত শক্তিশালী কলম-হস্তের প্রতিবেদনও তো ছিল, কিন্তু তা নিয়ে অতটা হৈচৈ কই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ আলমের ছবিটি ছিল এরকম : চারদিকে বন্যার পানি, লাশ কবর দেওয়া বা হিন্দু হলে পোড়ানোর মতো জায়গা নেই। তাই এক পিতা তাঁর মৃত সন্তানকে হাঁড়িতে বেঁধে পদ্মাবক্ষে নিক্ষেপ করছেন। হাঁড়িতে বাঁধা সন্তানটিকে যখন নিক্ষেপ করা হয়, অর্থাৎ হাত থেকে হাঁড়িটি ছোঁড়া হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে শার্টার করা হয়েছিল। পাঠকরা দেখেছেন মৃতদেহটি পদ্মার জলে গিয়ে পড়ছে। নিক্ষেপকারীর হাতে 'থ্রো' করার ভঙ্গিটি স্পষ্ট বোঝা যায়। ছবিটি 'সংবাদে' লিড হিসেবে ছাপা হয়েছিল।

মোহাম্মদ আলম তখন 'সংবাদে'। বন্যা পরিস্থিতি কভার করবার জন্যে আমি আগেই রংপুর থেকে রাজশাহীতে গিয়েছি। ঢাকা থেকে এলেন আলম। দুজনে এক সাথে কাজ করব।

দুদিন এদিকে-ওদিকে গেলাম। ছবি মিললো বটে, কিন্তু তা বন্যার সাধারণ সব ছবি। আলমের হাবভাবে লক্ষ করি, তিনি সন্তুষ্ট নন। তৃতীয় দিন সকালে আমরা গেলাম কাজলার কাছে, পদ্মার ধারে বাঁধের ওপর। ওখানে বাঁধে নতুন একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। ঐ ছবিটি তুলবেন তিনি, আর আমি প্রতিবেদনের মালমশলা সংগ্রহ করব।

পানি মাড়িয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলাম। নৌকায় চেপে বাঁধের ফাটল অংশের ছবি তোলা হলো। ঐ জায়গায় কিছু কাঁচা বাড়িঘর ডুবে গেছে এবং মানুষজন প্রায় পানিবন্দী অবস্থায় এরকম কয়েকটি দৃশ্য ধারণ করলেন আলম তাঁর ক্যামেরায়। ফিরে আসব আসব করছি, এসময় হঠাৎ আলম জিগ্যেস করলেন 'দেখেন তো মোনাজাত, ঐখানে কি হইতাছে?'

ঘুরে দেখি দূরে একটি জটলামতো। কয়েকজন মানুষ ... একজনের হাতে যেন কী! আলম, এসময় তাঁর মাথায় কী খেয়াল হলো আমাকে শুধু 'চলেন' বলেই দৌড়াতে শুরু করলেন। সামনে পানি, কিছু জংলা, এক জায়গায় কিছু ইটের স্তূপ—এইসব লাফিয়ে-মাড়িয়ে লম্বা লম্বা পায়ে দৌড়াচ্ছেন তিনি। পেছনে পেছনে আমি। সামনে একটা মাটির দেওয়াল, বুক সমান, তার পাশ দিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেই খেয়ালও তাঁর নেই। ডানে-বাঁয়ে না গিয়ে তিনি সেই মাটির দেওয়াল টপকে সামনে দৌড়ুতে থাকলেন। হোঁচট খেলেন বারকয়েক, কিন্তু সামলে নিলেন প্রতিবার। তাঁর এই দৌড় আর হোঁচট খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, একত্রে এই দুই-ই তার এগিয়ে যাওয়ার দৌড়।

জটলার কাছাকাছি পৌঁছুলেন আলম। দৌড়ের শেষ স্টেপটি যেখানে শেষ হলো, সেখানে দাঁড়িয়ে বিচিত্র দেহভঙ্গিতে শুরু হলো শার্টার। না, 'মোটর ড্রাইভ' সিস্টেমের ক্যামেরা তখন তাঁর কাছে ছিল না, সাধারণ ক্যামেরাতেই শার্টার করলেন তিনি বেশ কয়েকটা। ইতোমধ্যে হাঁড়িতে বাঁধা মৃতদেহটি পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ের গভীরে অদৃশ্য। আলম হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন এবং দারুণ হাঁপাচ্ছেন। সে এমনই এক বিচিত্র অবস্থা যে, সন্তানহারা পিতা আর আত্মীয়স্বজনরা শোক ভুলে আলমকে ঘিরে ধরলেন। আমি হাত ধরে টেনে তুললাম তাঁকে।

: খুব খারাপ লাগছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: না।
: পানি খাবেন?
: না।
: কী মনে হয়, ছবিটা কি ...
: মনে হয় হয়েছে ...।

আমি কয়েকজনের সাথে কথা বললাম এবং নোট করলাম তা। আলমও এটা-ওটা জিগ্যেস করলেন কিছু। তারপর আমাকে বললেন, চলেন, এখন কোনো একটা টেলিফোনের কাছে যেতে হবে। অফিসে কথা বলতে হবে।

রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার অফিসে এসে মোহাম্মদ আলম কথা বললেন সংবাদে, বার্তা সম্পাদক সাহেবের সাথে। ছবির বিষয় বিবরণ শুনে আলমকে বলা হলো ঢাকায় ব্যাক করতে। কিছুক্ষণ পর রাজশাহী-ঢাকা বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেল। পরদিন সংবাদে মোহাম্মদ আলমের নামে লিড ছবি। হাঁড়িতে বেঁধে একটি মৃত সন্তানকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ছবিটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, পাঠক-প্রতিক্রিয়া হলো। চিঠিপত্র ছাপা হলো, সেক্রেটারিয়েটও কাঁপল কিছুটা। কেউ কেউ বললেন, হিন্দুদের শিশুসন্তান মারা গেলে তা পোড়ানো হয় না, এইভাবে হাঁড়ির সাথে বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয়। একে বলে নাকি 'গঙ্গাজলি', কেউ বললেন, 'অন্তর্জলি'। কিন্তু অনেকেরই ধারণা মোহাম্মদ আলমের এ ছবি সাজানো। কেউ কেউ অতীতে তোলা তাঁর কিছু ছবির রেফারেন্সও দিলেন। 'অন্তর্জলি' সম্পর্কিত পাঠকের চিঠি ছাপা হবার পর গোটা পরিস্থিতির ওপর খুব কড়া একখানা উপসম্পাদকীয় লিখলেন সন্তোষ দা (সংবাদের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক)।

মোহাম্মদ আলমের এই ছবিটি নিয়ে বেশ কিছুদিন বিতর্ক জিইয়ে থাকল। যারা জানতেন যে, ঐসময় আলমের সাথে আমি ছিলাম, তাদের একজন বলেছেন, 'তোমরা শালা ছবিটা সাজিয়েছ।' অপর একজনের মন্তব্য : 'এইভাবে কি সংবাদের সার্কুলেশন বাড়াতে চাও তোমরা?' অনেকে আবার, যারা অনুসন্ধিৎসু, জানতে চেয়েছিলেন : 'আসলে ঐ ছবির ব্যাপারটা কী ছিল? সত্যি কি সাজানো ছিল না?'

আমি বলেছি, ছবিটি সাজানো নয়। আর আপনারা কীভাবে ভাবেন যে ওটা সাজানো? কীভাবে সাজানো যেতে পারে? কোনো পিতা কি দেবে তার জীবিত সন্তানকে হাঁড়িতে বেঁধে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে? কিংবা 'আপনারা কি বলতে চান যে হাঁড়িতে বাঁধা দৃশ্যমান যে শিশুটি, সেটা একটা ডামি? মাটি বা কাপড়ের তৈরি পুতুল?

তবু যেন সন্দেহ দূর হয় না।

আসলে, সত্য-মিথ্যা এখন এমন একাকার হয়ে গেছে যে, বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় সম্পূর্ণ হৃত। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে চাইছি না। আমাদের সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থাটাও এখন তাই। পিতা তার সন্তানকে, সন্তান তার মাতাকে, বন্ধু বন্ধুকে, কর্তা তার কর্মচারীকে এবং একইভাবে কর্মচারীকে কর্তা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজ দলের মানুষ তার নেতাকে, একজন সাধারণ মানুষ তার দেশপ্রধানকে বিশ্বাস করছেন না। সমাজ-গবেষকরাই বলতে পারবেন, কী এর প্রকৃত কারণ।

৩

তা, এই যে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রসঙ্গ উঠল, সেই সাথে মনে পড়ল দিনাজপুরের এক গল্প। তবে, তা বলবার আগে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হাজারো সমস্যার মধ্যে একটি উল্লেখ করি।

পাঠক তো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ চান। চান সঠিক তথ্য-উপাত্ত। কিন্তু কী করে মিলবে তা? একজন সাংবাদিক চাইলেই কি ঘটনাস্থলে যেতে পারেন? না, অনেকক্ষেত্রে সেটা সম্ভব, কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়।

যেমন ধরুন, একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে। সূত্র জানালেন, মারা গেছে দশ জন, আহত অনেক। দিনের বেলা নাহয় ঘটনাস্থলে যাওয়া যায়, ছবি তুলে আনা যায়। কিন্তু দুর্ঘটনাটি যদি ঘটে রাতে, কিংবা তারও আগে সন্ধ্যায়, তখন আর সময় কই? ঘটনাস্থলে যেতে-আসতে খবরটি পাঠানো যাবে না, মার খাবে। ঢাকা কিংবা আশপাশের এলাকা নয়, দূর অঞ্চলের কথা বলছি।

সেক্ষেত্রে 'সোর্স' হলো প্রথম খবরদাতা, তারপর থানা-পুলিশ আর হাসপাতাল। দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় নিয়োজিত হাজার হাজার সাংবাদিক সাধারণত এই 'সোর্স'-এর ওপর নির্ভরশীল। কেউ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নেন, কেউ যান থানায়। গাড়ির চালক ধরা পড়েছে কিনা, গাড়িটি আটক করে আনা হয়েছে কিনা ইত্যাদি।

অতি নির্মম হলেও সত্যি, এক শ্রেণীর সাংবাদিকের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তখন মারামারির প্রতিযোগিতা। না, তারা নিজেরা মারামারি করেন না, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন যে, কে কতটি হতাহত দেখাতে পারবেন। দুর্ঘটনায় যত বেশিসংখ্যক মারা যায়, কিংবা যত বেশি হয় আহত, 'হেডিং' তত বড় হয়, ডিসপ্লে হয় দর্শনীয়। এটা একটা বিকৃত মানসিকতা বটে, কিন্তু এমনও অনেক সময় দেখেছি, কমসংখ্যক হতাহত হলে অনেক পত্রিকা তার সংবাদদাতার পাঠানো খবরটি টেলিফোনে নিতেই চায় না নিউজ ডেস্ক থেকে। 'কী বললেন? দুজন মাত্র মারা গেছে? আহত তিন? আরে দুৎ, এটা কাল লিখে পাঠাবেন।' খবর-প্রেরক হন হতাশ। এদের কেউ কেউ শুধু 'খবরটি যাতে গ্রহণ করা হয়' কিংবা 'ভালো ডিসপ্লে পায়', সেজন্যে হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে বলেন। সূত্রও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেন অনেক সময়। আর, বিকৃতি তো আছেই। আছে সংবাদপত্র ও সাংবাদিককে ব্যবহার করবার হীন প্রবণতা। দুর্ঘটনায় আহত হলো মনে করুন ৫ জন, আপনার সোর্স এসে বলল ৫ জন মারা যাবার কথা। আপনি দুর্গম এলাকায় যেতে পারছেন না, অন্য সোর্স-এর সাথে 'ক্রস চেক' করতে পারছেন না। প্রথম সোর্সের মুখে শুনেই '৫ জন নিহত' এই মর্মে খবরটি পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাপাও হলো। কিন্তু পরে, বিস্তারিত বিবরণ আসার পর জানা গেল ঐ দুর্ঘটনায় আদৌ কেউ মারা যায় নি, এমনকি দুর্ঘটনাটিও ঘটেনি। আপনি তো অবাক। আরও পরে শুনলেন, আসলে আপনার ঐ প্রথম সোর্স প্রতারণা করেছে। তিনি একজন বাসমালিক। আরেকজন মালিককে কোনো কারণে জব্দ করার জন্যে তার গাড়ির নম্বরসহ কল্পিত দুর্ঘটনা এবং হতাহতের খবর দিয়ে গেছেন। আপনি ছুটে গেলেন প্রথম সোর্সের কাছে। তিনি নেই, ঢাকা চলে গেছেন। একমাস পর তিনি যখন ফিরলেন তখন শুনলেন ঢাকা থেকে ফিরেই গেছেন শ্বশুরবাড়ি। দেখা পেলেন তারও দুতিন মাস পর। আপনি খুব রাগতস্বরে জানতে চাইলেন যে, কেন তিনি মিথ্যা খবরটি দিয়েছিলেন। তিনি যেন ঘটনাটি ভুলেই গেছেন, এমন ভঙ্গিতে বললেন 'ও! খবরটা ঠিক ছিল না? তাই নাকি?' তারপর গালাগালি শুরু করলেন তার নিজের বাসের এক কন্ডাক্টরের উদ্দেশে। ব্যাটা বদমাইশ! আমাকে শালা নিজে খবরটা দিয়ে গেল! ঠিক আছে, দেখা হোক হারামজাদার সাথে! লাথি মারব শালার ...

তা, সম্পূর্ণ ভুয়া খবর পরিবেশনের দায়ে যা হবার তা তো ইতোমধ্যে হয়ে গেছে আপনার। এখন ঐ অদৃশ্য কন্ডাক্টরটি তার মালিকের লাথি খাবে কি খাবে না, তাতে আপনার কী!

এমন বহু ঘটনা আমার নিজের বেলাতেই ঘটেছে। নানাভাবে প্রতারিত করেছে সোর্স। 'দাড়িতে মৌচাক'-এ সেটা পড়েন নি?

AMARBOI.COM

দিনাজপুরের কাহিনীটি এরকম :

রংপুর থেকে সড়কপথে দিনাজপুরে যাচ্ছি। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দশমাইল নামে যে জায়গাটা, তার কাছাকাছি আসতেই দেখি ঘণ্টাতিনেক আগে এখানে বাস-জীপ মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে।

গাড়ির চালকদ্বয় পলাতক। ঘটনাস্থলে শতশত মানুষ। ৪ জন মারা গেছে এবং তাদের সদরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে পুলিশ। আহতদের অনেক আগেই পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে।

আমাদের বাসটি দুর্ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়ালো। আমি আমার পরিচয় দিলাম ড্রাইভার সাহেবকে এবং বাড়তি দুমিনিট সময় নিয়ে লাশের ছবি তুললাম, দুর্ঘটনার বিবরণ টুকে নিলাম। উপস্থিত লোকজন এবং পুলিশ কনফার্ম করল এই দুর্ঘটনায় ৪ জনই মারা গেছে। আহত ৮ জন, যাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তাদের অবস্থা তেমন গুরুতর নয়। তবু ভাবলাম, দিনাজপুর সদর হাসপাতালে গেলেই সেটা বোঝা যাবে।

দিনাজপুর শহরে নেমেই দৈনিক বাংলার প্রতিনিধি আবদুল বারীর সাথে দেখা। বারী পুলিশের সোর্স থেকে ইতোমধ্যে দুর্ঘটনার খবর, ৪ জন মারা যাবার তথ্য এবং হাসপাতালে ফোন করে আহতদের সংখ্যা পেয়ে গেছেন। তবু বারী ভাবছিলেন ঘটনাস্থলে যাবেন কিনা! আমি বললাম, তার আর দরকার নেই ক্যাপ্টেন। আমি নিজেই ঘটনাস্থল থেকে এলাম। তা চলুন, একবার হাসপাতালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই আহতদের সর্বশেষ অবস্থাটা দেখে আসি, দুএকজনের সাথে কথাও বলা যাবে। বারীকে আমরা অনেকে 'ক্যাপ্টেন' বলে ডেকে থাকি।

হাসপাতাল। আহতদের সাথে কথা। অবস্থা দেখে মনে হলো না এদের কেউ মারা যেতে পারে। আমরা দুজনে টেলিগ্রাম অফিসে এলাম, পিসিও থেকে টেলিফোনে খবরটি পাঠিয়ে দিলাম নিজ নিজ পত্রিকায়। এটা তো আর এক্সক্লুসিভ কোনো খবর নয়। প্রকাশ্য ঘটনা, সবাই পেয়ে যাবে। আমার পাঠানো খবরে ৪ জন আর বারীর খবরে ৫ জনের মৃত্যুসংবাদ যাবে, এমন তো ভাবা যায় না।

টেলিফোনে খবরটি পাঠিয়ে এলাম আমরা একটা রেস্টুরেন্টে। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে, সেইসাথে কিছু খাওয়া যাক। অর্ডার দিয়েছি। এসময় রেডিওতে খবর হচ্ছে। হঠাৎ দুজনেই একসাথে আঁতকে উঠলাম। একটি সংবাদ সংস্থার খবর : আজ বিকেলে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে এক বাস দুর্ঘটনায় ৮ ব্যক্তি মারা গেছে এবং আহত ... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি হা, বারীর মুখেও সেরকম ভঙ্গি। পরমহূর্তে 'ক্যাপ্টেন', যেন তার নৌকা ডুবেছে, মাথায় হাত চাপড়াতে লাগলেন। সংবাদ সংস্থার নাম ধরে বারী এমন একটি উক্তি করলেন, যা শুনতে পেলে প্রতিষ্ঠানটির সমস্ত সাংবাদিক বারীকে পেটাতেন, কিন্তু সামান্যতম লজ্জা থাকলে সেই মুহূর্তেই ইস্তফা দিয়ে বসতেন। একটু সুস্থির হবার পর হতাশা ভর করল, মাথা নাড়তে নাড়তে বারী বলতে লাগলেন, 'আমাদের কাগজে গেল ৪ জনের মরার খবর, আর ... ৮ জনের, এখন তো দৈনিক বাংলা আমার খবরটা ছোঁবেই না!' হ্যাঁ, সরকারি সংবাদ সংস্থাই যেখানে ৮ জনের মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে, তখন তো সংবাদদাতার পাঠানো ৪ জনের মৃত্যুর খবর না ছাপানোরই কথা! আর, ছাপা হলেও, যারা রেডিও'র শ্রোতা এবং একই সাথে পত্রিকার পাঠক, তারাই বা ব্যাপারটিকে কিভাবে গ্রহণ করবেন? সাধারণ মানুষের অনেকেরই এরকম একটা ধারণা রয়েছে যে, সরকারি সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত বিভিন্ন খবরে মৃত্যুর সংখ্যা চেপে রাখবার কিংবা কম করে প্রচারের প্রবণতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তারাই যদি ৮ জনের মৃত্যুর খবর রেডিও-টিভি কিংবা পত্রিকায় সরবরাহ করে এবং তা যদি প্রচার বা প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে পাঠক সংবাদদাতার পাঠানো ৪ জনের মৃত্যুর খবরটি গ্রহণ করবেন কেন? তারা ভাববেন, পত্রিকার সাংবাদিকটি ঠিকমতো খবর নেন নি। কিংবা আরও নানা ব্যাপার হতে পারে।

বারী বললেন, 'চলেন পিসিও-তে যাই। দৈনিক বাংলায় ফোন করতে হবে। আমাদের খবরটাই যে সত্য, সেটা বোঝাতে না পারলে কাল ঐ সংবাদ সংস্থার খবরটাই বেরিয়ে যাবে।' না, শুধু বারী নয়, আমি ভাবছি একই সমস্যা 'সংবাদে'ও হতে পারে। আমার পাঠানো ৪ জনের মৃত্যুসংবাদ আর এজেন্সি থেকে পাওয়া ৮ জনের খবর পেলে যে কোনো বার্তা সম্পাদক কনফিউজড হয়ে যাবে।

তখন এনডাবলুডি সিস্টেম ছিল না। বারী তার পত্রিকায় কল বুক করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তিনি রাত ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও লাইন পেলেন না। ঢাকা এক্সচেঞ্জ থেকে বারংবার বলা হচ্ছে, টেলিফোনে রিং হয়, কেউ ধরে না। অপারেটরকে বোঝানো হলো এটা একটা পত্রিকা অফিস এবং সবসময় লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে, এই মুহূর্তে টেলিফোনের পাশে বহুলোক কাজ করছেন। অপারেটর আবারো চেষ্টা করলেন, তারপর জানালেন, না ভাই, আপনার টেলিফোন ধরছেই না। বোধহয় ফোন খারাপ আছে।

: 'ফোন খারাপ থাকতেই পারে না। আমরা কিছুক্ষণ আগেও ঐ ফোনে কথা বলেছি!' বারীর কণ্ঠ রাগে কাঁপছে।

বিরক্ত টেলিফোন অপারেটর ঢাকা প্রান্ত থেকে বলে উঠলেন, অতো রাগ করেন ক্যান! একটু আগে কথা বলেছেন তো কী হয়েছে? এখন তো খারাপ হয়ে যেতে পারে!

না, বারী কথা বলতে পারলেন না। আমার ভাগ্য ভালো যে সংবাদের টেলিফোন ভালো ছিল। শিফট ইনচার্জ বললেন : ব্যাপার কী বলুন তো! আপনি পাঠিয়েছেন ৪ জন মারা গেছে আর এজেন্সি রিপোর্টে বলেছে ৮ জনের কথা! ...

আমি তাঁকে পরিষ্কারভাবে বোঝালাম যে, এজেন্সির খবর সত্য নয়, তারা যে ৮ জনের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছে সেটা 'কিল' করুন। আমি ঘটনাস্থল ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছি। ৪ জনের একজনও বেশি মারা যায় নি। শিফট ইনচার্জ বিস্মিত। তিনি বললেন, তা কী করে হয়! ৮ জনের মৃত্যুর খবরতো কিছুক্ষণ আগেও রেডিও'তে প্রচার করল ... । আমি জোরকণ্ঠে বললাম, তারা যতজনের মৃত্যুর কথা প্রচার করুক, আপনারা সংবাদে ৪ জনের মৃত্যুসংবাদই ছাপুন। আমি আপনাকে সাংবাদিকতার দোহাই দিয়ে বলছি, ৮ জন নয়, ঐ অ্যাকসিডেন্টে প্রকৃতপক্ষে ৪ জনই মারা গেছে। শিফট ইনচার্জ বিশ্বাস করলেন কি করলেন না বোঝা গেল না। ভীষণরকম একটা রহস্যে পড়েছেন এরকম কিছু সংলাপ উচ্চারণ করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

AMARBOI.COM

অনেক রাতে বেরুলাম আমরা পিসিও থেকে। আমি আর বারী দুজনেই প্রায়-বিধ্বস্ত। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। সেই ক্ষুধা ছাপিয়ে, দিনাজপুরের লোকশূন্য সড়কে হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবছি : এ কোন্ সাংবাদিকতা? নিজের চোখে দেখা সত্য ঘটনাটি ছাপা হবে না, আর লোকে জানবে মিথ্যা! একবার রাগে যেন গা জ্বলে যায়, আরেকবার হতাশা এমনভাবে চেপে বসে যে খুব অসহায় বোধ করি।

অত রাতে সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক বন্ধুটির বাসায় গেলাম। শুধু আমি একা। তাঁকে পাওয়া গেল। এত রাতে আমাকে তিনি কল্পনাও করেন নি, খাওয়া-দাওয়া সেরে কেবলি শুয়েছিলেন। বললেন, কী ব্যাপার বলেন তো মোনাজাত?

আমি বললাম, আমরা খবর দিলাম ৪ জন মারা গেছে, আর আপনি দিলেন ৮ জন! এই ৮ জনের তথ্য কোথায় পেলেন? পুলিশ বলেছে? হাসপাতাল থেকে দিয়েছে? মৃতদের নামগুলো আছে আপনার কাছে?

প্রশ্ন শুনে সাংবাদিক বন্ধুটি হা-হা করে হেসে উঠলেন। তার জবাব শুনে আকাশ থেকে মাটিতে পড়া নয়, মনে হতে লাগল মাটি থেকে আকাশের দিকে ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে কেউ আমাকে। তিনি জানালেন, 'আরে ভাই, আসলে তো মারা গেছে ৪ জনই।'

: 'তাহলে? আপনি' ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: 'এর মধ্যে সন্দেহের কিছু নেই। আমি ৪ জনের জায়গায় ৮ জনের মৃত্যুর কথা ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছি। ৪ জনের নাম দিয়েছি, তা আপনারাও পেয়েছেন। আর বাকি ৪ জন চালিয়ে দিয়েছি 'অজ্ঞাত পরিচয়' বলে। কে প্রতিবাদ করবে? করুক দেখি কে প্রতিবাদ করে!' তারপর আবার সেই হাসি।

আসলেই, প্রতিবাদ করবার কেউ ছিল না। যে সময়টার কথা বলছি, সেসময় অনাহারে কিংবা কলেরা ডায়রিয়ায় মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হলে প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, এরা প্রতিবাদ পাঠাতেন, তদন্ত-টদন্ত হতো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'প্রকাশিত খবর প্রসঙ্গে' ব্যাখ্যাও দেওয়া হতো। কিন্তু কোন্ সড়ক দুর্ঘটনায় কতজন মরল না মরল তা নিয়ে প্রশাসন বা পুলিশের মাথাব্যথা ছিল না। তথ্যের হেরফের কেন, সম্পূর্ণ ভুয়া খবর ছাপা হলেও কেউ রা করতেন না।

যাই হোক, আমি সংবাদ সংস্থার বন্ধুটির কাছে জানতে চাইলাম, কী কারণে জেনেশুনেও তিনি ৪ জনের জায়গায় ৮ জনের মৃত্যুর খবরটি পাঠলেন? রহস্যটা কী? কি তার নেপথ্য কথা? কিন্তু তিনি কিছুতেই তা খোলাসা করলেন না। বললেন, আজ নয়, আরেকদিন বলব।

রহস্যেই পড়ে থাকলাম। পরদিন বিকেলে দিনাজপুর শহরে পত্রিকা এসে পৌঁছুল। দেখি, দৈনিক বাংলা আবদুল বারীর পাঠানো খবরটি নেয়নি, সংবাদ সংস্থার পরিবেশিত ৮ জনের মৃত্যুসংবাদটি ডবল কলাম হেডিং-এ ছেপেছে। আর সব পত্রিকাতেও একই ব্যাপার। শুধু 'দৈনিক সংবাদ' আমার পাঠানো ৪ জনের মৃত্যুর খবরটি ছেপেছে। খুশি হলাম। যাক, আমাকেই বিশ্বাস করে 'সংবাদ।'

কিন্তু খুশি হয়ে লাভ কি? কী লাভ সত্য খবর পরিবেশন করে? কেননা অধিকাংশ 'সংবাদ' পাঠক আমার খবরটি বিশ্বাস করলেন না। আমার পরিচিত কয়েকজন, যারা গতকাল রেডিও'র খবর শুনেছেন, যারা চোখ বুলিয়েছেন পত্রিকায়, তারা প্রকাশ্য মন্তব্য করলেন, 'আপনি তো দেখি খবরই রাখেন না মোনাজাতউদ্দিন! রেডিও'তে বলল ৮ জন মারা গেছে, সব পত্রিকাতেও একই কথা লিখল, আর আপনি ছাপলেন ৪ জন!' কেউ বললেন, 'ভালো করে খবর নিলেন না ক্যান?' কেউ বললেন, 'ঘটনাস্থলে যেতে পারেন নি বুঝি? কারও মুখে ঐ ৪ জনের মরার কথা শুনেই পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

দশচক্রে নাকি ভগবান ভূত। এই উপমা যদি পুরাতন হয়ে থাকে, তাহলে বলি, মিথ্যার জয় হলো। সত্য সংবাদ পরিবেশন করেও আমি পাঠকের তাচ্ছিল্য কুড়ালাম। ছোট থেকে শুনে আসছি সত্যের নাকি জয় হয়। কিন্তু কে বলেছে সে কথা? ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনি দিনাজপুরের এইসব পাঠকদের সামনে। তারপর, একবার ভাবি, এদেরই বা দোষটি কোথায়? বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর ব্যাপারটি তো উড়ে এসে কেউ ঘটায়নি, আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

কিভাবে তৈরি করেছি? প্রমাণ আছে তোমার কাছে? জানো এরকম কোনো ঘটনা? এরকম প্রশ্ন কেউ করতে পারেন।

তা বেশি দূরে যেতে হবে না। '৯১-এর ১ ডিসেম্বর বগুড়া থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকে খবর ছাপা হলো : 'কত ধানে কত চাল' শিরোনামে। খবরটিতে এই মর্মে বলা হয়েছে : গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার এক গ্রামে এক কৃষকের আমন ধানের জমিতে 'অলৌকিক' ঘটনা ঘটেছে। কৃষক তার ৩ কাঠা জমিতে আমন ধান আবাদ করে। ধান কাটার সময় দেখা যায় প্রতিটি ধানের কণার ভেতর ১টি নয়, ২টি করে চাল!

খবরে আরও বলা হয়, 'এলাকার শতশত উৎসাহী লোক এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে উক্ত জমির ধানের শীষ তুলে পরীক্ষা করে 'আশ্চর্য' হয়ে যায়।'

খবরটি নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে যে-কোনো জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় বক্স আইটেম হতে পারত। চালান যেতে পারত বাইরেও। কিন্তু উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক একটি দৈনিকে এই খবরটি ভেতরের পাতায় এলো কেন? বোঝাই যায়, বার্তা সম্পাদক সাহেব তেমন বিশ্বাস করেন নি। তবু, পাঠক আকৃষ্ট করবার জন্যে কিংবা হতে পারে পেজ মেকআপ করতে গিয়ে গ্যাপ পূরণের জন্যে হাতের কাছে পেয়েছেন, তড়িঘড়ি করে খবরটি ছেপে দিয়েছেন।

অনেক সচেতন পাঠক, তারা প্রশ্ন করেছেন : ১. খবরটি যখন ছাপাই হলো তখন প্রথম পাতায় দেওয়া হলো না কেন? ২. সাঘাটা এলাকায় কি আর কোনো পত্রিকার সাংবাদিক নেই? তারা কী কারণে খবরটি পেলেন না? এলাকার শতশত মানুষ যখন ব্যাপারটি জেনেছে, তখন এ খবরটি শুধু বিশেষ একটি পত্রিকার 'স্কুপ' নিউজ হতে পারে না তো! ৩. খবরটি বিস্তারিত নয় কেন? প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কি যাননি তা উল্লেখ নেই কেন? ৪. প্রতিবেদনের সঙ্গে ছবি ছাপা হয়নি কেন? ইত্যাদি।

এ খবরটি আমি পেলে এবং যাচাইয়ের পর সঠিক প্রমাণিত হলে তা 'সংবাদে' ছাপা হতে পারত। দেশে যখন লাখ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি, খাদ্যাভাবে শুকিয়ে মানুষ মরে প্রতিবছর, সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ দিচ্ছেন, বাড়তি শস্য ফলানো অতি প্রয়োজনীয়, তখন সাঘাটা উপজেলার ঝাড়াবর্শা গ্রামের কৃষক দিজেন্দ্রনাথ তার ৩ কাঠা আমন ধানের জমিতে কী এমন 'অলৌকিক' বীজ ব্যবহার করেছিলেন যে একটি ধান থেকে দুটি করে চাল পাওয়া যাচ্ছে?

না, ঐ অলৌকিক বীজ নয়, সন্ধান করি শিকড়ের। কেননা, মনে হতে থাকে খবরটি আদৌ সত্য নয়। সাংবাদিক বন্ধুটির সাথে কথা বলি। প্রথমে তিনি হলপ করে জানান যে, নিজে ঐ গ্রামে গিয়েছিলেন, ধানের শীষ থেকে কয়েকটি ধান নিয়ে নিজে ভেঙে দেখেছেন যে, প্রতিটির ভেতরে আছে দুটি করে চাল। কিন্তু, আমি যখন আমার স্বভাবগত কৌশলে প্রশ্ন শুরু করি, করলাম, তিনি মিনিটখানেকের মধ্যে নতমুখ হলেন, বললেন, না এখনও ঐ গ্রামে যাননি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকমুখে শুনে লিখে দিয়েছেন, 'কত ধানে কত চাল' খবরটি। তিনি আরও স্বীকার করলেন, এত বড় একটা খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে তার গ্রামে যাওয়া উচিত ছিল। 'আজই আমি ঝাড়াবর্শী গ্রামে যাব ভাই'—জানালেন তিনি।

'টেবিল মেড' খবর এ ধরনের আরও হচ্ছে ম্যালা। 'হক হুজার' মিছা কথা, দিব্যি চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই তো নভেম্বরে ('৯১) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এলেন তিন বিঘায়, বাংলাদেশের একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত হলো তিন বিঘায় তাঁর সাথে বাংলাদেশের সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারের বিবরণ, মায় সংলাপ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো : জ্যোতিবসু তিন বিঘা ঘুরে চলে যাবার দুইঘণ্টা পর প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন। আমার হাতে তার প্রমাণ রয়েছে। তবু সে রিপোর্ট জাতীয় দৈনিকের লিড আইটেম হয়েছে। অধিকাংশ পাঠক তা গ্রহণও করেছেন। কিন্তু, সেইসব পাঠক, যারা পরে যেভাবেই হোক জেনেছেন সাক্ষাৎকারটি ছিল বানানো, তাদের কাছে সংবাদপত্র কিংবা সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকল কোথায়?

AMARBOI.COM

অনেকে মনে করে থাকেন যে, টেবিল মেড রিপোর্ট শুধু লিখে থাকেন গ্রামীণ সাংবাদিকরাই। শুধু তাই নয়, প্রভাবশালী মহলের লেজুড়বৃত্তি করা, প্রভাব খাটিয়ে স্বার্থসিদ্ধি, নানাভাবে অর্থ উপার্জন, এরকমের অভিযোগও উদ্‌গীরণ করা হয়ে থাকে রাজধানীর কোনো কোনো মহলের আড্ডা-আসরে। কিন্তু, আমি বলব, সাংবাদিকতার যেমন সদর-মফস্বল বলে কিছু নেই, তেমনি ফারাক নেই মনগড়া প্রতিবেদন রচয়িতা এক গ্রামীণ সাংবাদিকের সাথে রাজধানীর সাংবাদিকের। অসাধুদের কোনো এলাকা থাকে না, সদর মফস্বল বলে আলাদা পরিচিতি থাকে না। ঢাকার এক বদমাইশের সাথে কোনো জেলার এক বদমাইশের পার্থক্য কতটুকু? কেউ কি বলেন যে, ইনি মফস্বলের বদমাইশ আর ইনি রাজধানীর বদমাইশ?

রাজধানীতে, জাতীয় পর্যায়েও মনগড়া রিপোর্ট হচ্ছে। এইতো গতবছর একটি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হলো ড. কামাল হোসেনের একটি বক্তৃতা। এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি বলেছেন। পরদিন জানা গেল, ড. কামাল হোসেন ঐদিন দেশেই ছিলেন না, তিনি কয়েকদিন আগে থেকেই বিদেশ সফরে। অথচ পাঠকদের তাঁর ভাষণ-অংশ পড়তে হলো। একইভাবে হজম করতে হলো আরেকটি দৈনিকে প্রকাশিত 'জেলখানায় এরশাদের আত্মহত্যার চেষ্টা' এই সম্পর্কিত একটি 'চাঞ্চল্যকর' প্রতিবেদন।

মনগড়া কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজস্ব ধারণার ওপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তো হরদমই হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতা উল্টালে রীতিমতো মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়। দুএকজন ছাড়া আর কারও সৎসাহস নেই যে তিনি তার কৃতকর্ম স্বীকার করেন। যারা স্বীকার করেন নিজের ভুল, তাদের মধ্যে একজন আমার অনুজপ্রতিম আমান-উদ-দৌলা, তরুণ অথচ প্রতিভাধর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংবাদিক। সেদিন আলাপ প্রসঙ্গে তিনি অকপটে স্বীকার করলেন যে, নিজ ধারণার ওপর তিনি এমন একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন কয়েকমাস আগে, যা তাকে পরে মর্মপীড়ায় ভুগিয়েছে। গত সংসদ নির্বাচনের আগে আগে ঢাকায় বসে তিনি এই মর্মে একটি প্রতিবেদন লেখেন যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং গঠন করবে সরকার। এটি ছিল তার ধারণাপ্রসূত একটি প্রতিবেদন। তা, আমানের সেই ধারণা ফলে গেলে কথাই ছিল না, ঝড়ে বক মরত আর কেরামতি বাড়ত ফকিরের। কিন্তু, নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি অনেক সামনে। সেক্ষেত্রে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হৃত হলো।

আমি আমানকে জিগ্যেস করলাম, আপনি কি নিতান্তই ধারণা করে প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন, নাকি তার একটা ভিত্তিও ছিল? আমান, এই প্রজন্মের চৌকস সাংবাদিক, জীবনযুদ্ধের এক লড়াকু, বিস্তারিত বলেছেন তার সেই ধারণার ভিত্তির কথা। কিন্তু এখানে বিতর্কিত প্রসঙ্গে না গিয়ে আমানকে এই বলে ধন্যবাদ জানাব যে, যেহেতু তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন 'ধারণা করে এমনটি লেখা তার ঠিক হয় নি' এবং তার এই সৎসাহস অন্যদের ক্ষেত্রে দুর্লভ, সেহেতু তা ক্ষমার চোখে দেখা যেতে পারে।

AMARBOI.COM

এই যে ধারণাপ্রসূত লেখা, কিংবা পুরোপুরি মনগড়া রিপোর্টিং, এটি কিন্তু আজকের নয়, আগেও ছিল। শুধু এটুকু বলা যায় যে, আগে কম হতো, এখন প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে এবং সামগ্রিক যে সামাজিক অবক্ষয়, তা থেকে সংবাদকর্মী সকলে আলাদা হয়ে থাকবেন, তেমনটি আশাই বা করা যায় কী করে? রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক ক্ষতের ফেটে পড়া, উপর থেকে নিচের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সব মিলিয়ে তৈরি যে বিষ-বোমা ফেটে পড়েছে, তার মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে চাইলেই কি রক্ষা পাবেন বিশেষ একটি পেশাজীবী শ্রেণীর মানুষ? তাছাড়া, একসময় নাহয় সাংবাদিকতা মিশন ছিল, এখন তো তা শিল্প-সম্পৃক্ত, প্রতিযোগিতার ব্যাপার, লাভ-ক্ষতির বিষয়। একজনকে টেক্কা দিয়ে সহজে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, পণ্যের কাটতি বাড়াতে হবে বাজারে, এইরকম মানসিকতা থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ইয়েলো জার্নালিজম' আসছে, বক্তৃতায় বস্তুনিষ্ঠতার কথা বললেও এক শ্রেণীর পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে মিথ্যা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক রচনা। অতিরঞ্জন তো আছেই, এই আধুনিক সভ্যতার যুগেও ছাপা হচ্ছে অলৌকিক সব ঘটনাবলি। অনেক পাঠক এসব বিশ্বাসও করছে। আবার একবার বিশ্বাস করে যিনি ঠকেছেন তিনি পরবর্তীকালে প্রকাশিত খাঁটি সত্যটিও বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

বছর দুয়েক আগে 'সংবাদে'র প্রথম পাতায় দর্শনীয়ভাবে ছাপা হয়েছিল আমার পরিবেশিত একটি সংবাদ। রংপুরের একজন কৃষক নিজ মেধা খাটিয়ে উদ্ভাবন করেছেন যে, মাজরা পোকা-আক্রান্ত ধানের জমিতে গোমূত্র ছিটালে তৎক্ষণাৎ পোকা ধ্বংস হয়ে যায়। রংপুরের কৃষি বিভাগ সূত্রে খবর পেয়ে তক্ষুনি ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষকের বাড়িতে গেলাম, তার গবেষণা নিজে যাচাই করে দেখলাম, সংবাদের জন্যে রিপোর্ট লিখলাম। কিন্তু সেটি ছাপা হবার পর কৃষি কর্মকর্তারাই তা বিশ্বাস করলেন না, বরং 'যত্তো সব বাজে খবর' বলে উড়িয়ে দিলেন। খামারবাড়ির এক কর্তা, টেলিফোন করে বললেন, 'আপনি কি গাঁজা খান নাকি মোনাজাতউদ্দিন? কোটি কোটি টাকার ওষুধ ঢেলে আমরা যখন মাজরা পোকা মারতে পারছি না, তখন গোমূত্র ছিটালেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে? কে দেয় আপনাদের এই ধরনের খবর?' আমি মেজাজ শীতল রেখেই বললাম, 'আপনি ঐ কৃষকের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তাছাড়া আপনার জেলা-কর্মকর্তারা ইতোমধ্যেই ঐ বিষয়ে যে রিপোর্টটি পাঠিয়েছেন, তাও খতিয়ে দেখতে পারেন!' কিন্তু, আমার কোনো কথাই আমল দিলেন না তিনি। শুধু বলেন একই কথা, 'এইসব আজেবাজে রিপোর্ট করে বিভ্রান্ত করবেন না। লোকে মূর্খ বলবে।'

একই কৃষিকর্তা টেলিফোন করলেন এই সেদিনও। 'সংবাদে'র ৫-এর পাতায় ছাপা হলো যে, কৃষকরা আবিষ্কার করেছে তামাকের ডাঁটার গুঁড়ো পানিতে মিশিয়ে ছিটালে বাদামী গাছফড়িঙের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। না, ৫-এর পাতায় ছাপা হয়েছে বলে দুঃখ নেই, যদিও খবরটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, সময়োপযোগী। 'কৃষকের নিজস্ব প্রযুক্তি' বিষয়ক এ খবরটি পড়ে আরও অনেকে উপকৃত হতে পারেন এটা ছিল আমার চিন্তা। সে কারণে আর সব কাজ ফেলে দ্রুত গ্রামে যাই, কৃষকের সাথে কথা বলি, পোকা দমন পদ্ধতিটি নিজে যাচাই করি এবং তা লিখে পাঠাই। ঐ সময়, আমন ধানে যখন কেবলি পাক ধরেছে, সেই সাথে ধরেছে বাদাম গাছফড়িঙের মতো সর্বনাশা পোকা। কৃষকরা ওষুধ পাচ্ছে না, কেউ কেউ ভুল ব্যবস্থাপত্রমতো এটা-ওটা ছিটাচ্ছে-ছড়াচ্ছে, কিন্তু তারও দাম চড়া। এই পরিস্থিতিতে তামাকের ডাঁটার গুঁড়ো ব্যবহার পদ্ধতি জানানো দরকার।

কিন্তু না, সঠিক এ খবরটিও ঐ কৃষিকর্তা বিশ্বাস করলেন না। আমি আর কী করি! কর্তাটির উদ্দেশে রাগ বর্ষণ করলাম। তারপর একটু ভাবনাচিন্তার অবকাশ পেয়ে আফসোস করে উঠলাম, দোষ আর কার! নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা তো নিজেই হারিয়ে বসে আছি!

৫

সব দোষ যে শুধু একতরফা, তা নয়। যারা সাংবাদিকদের তথ্য দিয়ে থাকেন তাদেরও কেউ কেউ মূর্খ, কেউবা আবার নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন সংবাদপত্র ও এক শ্রেণীর সাংবাদিককে। আবার এমনও হামেশাই হচ্ছে যে, সূত্র তথ্য দিচ্ছেন, দিচ্ছেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কিন্তু সেই খবরটি ছাপা হবার পর যখন দেখলেন উপরওয়ালার ঠেলায় বেকায়দা, তখন নিজেই আবার সেই খবরটির প্রতিবাদ পাঠাচ্ছেন নিজ স্বাক্ষরে। মাঝখানে, শুধু বিশ্বাসের কারণে ফাঁকে পড়ছেন সাংবাদিক। আমলা-কর্তা শুধু নয়, কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতাও এমনটি করে থাকেন। আবেগে ঠিকই বলে বসেন একথা-ওকথা, কিন্তু বক্তৃতার সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবরণ পত্রিকায় যখন ছাপা হয়ে যায়, প্রতিক্রিয়া শুরু হয় নিজ দলের ভেতরে ও বাইরে, তিনি বলে বসেন, 'ও কথা আমি বলি নাই।' আরে বাপু, সব কথা কি আর রেকর্ড করে রাখা সব রিপোর্টারের পক্ষে সম্ভব?

সূত্র বিভ্রান্ত করেন। কখনো জেনেশুনে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, আবার কখনো অজ্ঞতার কারণে। একবার 'সংবাদে' আমার একটা লিড আইটেম ছাপা হলো লালমনিরহাটে ধানক্ষেতে 'ব্লাস্ট' রোগ দেখা দিয়েছে। এটি ধানগাছের জন্যে এমন একটি সর্বনাশা রোগ যা শুরু হলে রাতারাতি ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ধানক্ষেত সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়।

লালমনিরহাট সফরে গিয়ে 'ব্লাস্ট'-এর খবরটি পেলাম কৃষিবিভাগের এক ব্লক সুপারভাইজারের কাছ থেকে। এদের সংক্ষেপে বলা হয় বিএস। বিএস আমাকে আক্রান্ত ধানক্ষেত দেখালেন, বোঝালেন এই রোগের ভয়াবহতা। কিভাবে বোঝা যাবে এটা 'ব্লাস্ট' রোগ তারও বর্ণনা তার কাছ থেকে পাওয়া গেল। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক কাছেই ছিলেন, কিন্তু তিনি আর কী বলবেন! কষ্টের ধানক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার মাথায় হাত। আর, অত রোগ ও পোকার নাম মনে রাখবার মতো শিক্ষিত-সচেতন তিনি নন।

একবার ভাবলাম, বিএস সাহেবের কথাতেই 'ব্লাস্ট' আক্রমণের খবরটি পাঠিয়ে দিই। একেবারে এক্সপার্ট না হলেও কিছুতো অন্তত পড়াশোনা করে এসেছেন! তবু কেন জানি খটকা লাগল। ভাবলাম একবার উপরকর্তার সাথে বাজিয়ে নেওয়া যাক না!

AMARBOI.COM

উপর কর্তা হলেন এডি সাহেব, মানে অ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর। (যখনকার কথা বলছি, তখন ছোট জেলা শহরে এডি পোস্ট ছিল)। তিনি থাকেন লালমনিরহাট শহরে। এলাম, কিন্তু তিনি গেছেন ছুটিতে।

পরদিন এলেন। কিন্তু মিটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথমে জেলা পর্যায়ের মিটিং, তারপর নিজস্ব বিভাগের কর্তাকর্মীদের নিয়ে মিটিং, তারপর কোন্ মন্ত্রী আসবেন সেই ব্যাপারে মিটিং।

মিটিং-এর সিরিজ শেষ হবার পর সাহেবের সাক্ষাৎ মিলল। তিনি অনুগ্রহ করে 'কনফার্ম' করলেন, হ্যাঁ, ব্লাস্ট আক্রমণের খবরটি তিনিও পেয়েছেন এবং যাচাই করে দেখেছেন যে তা সঠিক। ইতোমধ্যেই ঢাকাতেও এ ব্যাপারে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমিও রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম তৎক্ষণাৎ। অবশ্য, কৃষিপ্রধান এই দেশে যদিও শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তবু কৃষি-বিষয়ক খবরাখবর অধিকাংশ পত্রিকায় সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায়, সেক্ষেত্রে আমি ভাবতেও পারিনি এ খবরটি 'সংবাদে' প্রধান শিরোনাম হয়ে আসবে! তবু এলো। হয় সেদিন খবরের ঘাটতি ছিল কিংবা বার্তা সম্পাদক সাহেব ছিলেন মহানুভব। তা খবরটি গুরুত্বের সাথে ছাপা হবার সাথে সাথে ঢাকার খামারবাড়ির টনক নড়ল। 'ব্লাস্ট' দমনে ত্বরিত ব্যবস্থা নিলেন তারা। লালমনিরহাটে পাঠালেন কৃষি বিশেষজ্ঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুতিনদিন বাদে জানা গেল, না, ঐ রোগটি আদৌ ব্লাস্ট নয়। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এটি ধানগাছের 'পাতা ঝলসানো রোগ' মাত্র। 'সংবাদে' প্রকাশিত আমার খবরটির প্রতিবাদ করলেন না তারা, কিন্তু আমি মর্ম-লজ্জা-পীড়ায় ভুগতে লাগলাম। ব্লাস্ট-এর মতো ভাইরাস রোগের খবরটি কেন যে পাঠালাম!

তা আমার কী দোষ? খোদ কৃষি কর্মকর্তাই যদি ব্যাপারটি কনফার্ম করে থাকেন, তাহলে আমার আর করার কী ছিল? একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এমনিতেই কম, তার ওপর কৃষি বিষয়ে কতটুকুই বা জ্ঞান থাকতে পারে আমার? আর, থাকলেও তা তো ঐ এডি সাহেবের চেয়ে বেশি হবার কথা নয়!

আমার 'সোর্স' এভাবে ভুগিয়েছে বহুত। আমি যে পর্যায়ে সাংবাদিকতার কাজ করেছি, সেখানে কারা কারা কর্মকর্তা তা আপনারা জানেন। সেক্ষেত্রে তারা অনেকেই বহুবার বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন চামড়া বাঁচাতে। জেলাশাসক আমাকে বলেছেন অনাহারজনিত কারণে মানুষের মৃত্যুর কথা, কিন্তু পরে সেক্রেটারিয়েট থেকে ধাতানি খেয়ে ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। সিভিল সার্জন আমার কাছে স্বীকার করেছেন কলেরা ডায়রিয়া বা অপুষ্টিতে মৃত্যুর কথা, পরে কোনো মন্ত্রীর ঠেলা খেয়ে বলেছেন, 'এমন কথা আমি কক্ষণো বলি নাই স্যার।' এবং প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন পত্রিকায় : প্রকাশিত খবরটি মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যমূলক ইত্যাদি।

আমি ঠকতে ঠকতে শিখেছি। কর্তাদের মুখের কথায় বিশ্বাস করিনি, হাতে নিয়েছি কাগজপত্র, দলিল, অনেকক্ষেত্রে বক্তব্য রেকর্ড করেছি চুপিচুপি যাতে কেউ টের না পায়।

পাঠান এখন প্রতিবাদ!

তার কাছে ক্ষমা

আমার প্রথম গ্রামভিত্তিক সিরিজ-প্রতিবেদন : 'দৃশ্যপট চিলমারী।' ৭০ দশকের শেষদিকে প্রকাশিত হয়েছিল 'সংবাদে'। আপনারা জানেন চিলমারী কুড়িগ্রাম জেলার একটি উপজেলা। নদীভাঙা অতি অভাবী জনপদ 'ও কি গাড়িয়াল ভাই, হাঁকাও গাড়ি তুই চিলমারীর বন্দরে'—আব্বাসউদ্দিন আহমেদের কণ্ঠের এই গানে চিলমারী নামটি বয়সীদের কাছে পরিচিত। চিলমারীর বাসন্তি-দুর্গাতির সেই জাল-পরা ছবি তুলে ইত্তেফাকের আলোকচিত্রী আফতাব আহমেদ '৭৪-পরবর্তী রাজনীতিতে যেমন মৌসুমী বক্তব্য-ঝড় তোলেন, তেমনি ভূমিহীন মজুরপ্রধান উত্তরবঙ্গের এই এলাকাটির নামও তোলেন অনেকের মুখে মুখে। চিলমারী চেনা আছে মঞ্জু সরকারের গল্প ও উপন্যাস পাঠকদেরও। তবে মানচিত্র, প্রাথমিক ভূগোলের বই, দোকানপাটের সাইনবোর্ড ও প্রতিবছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে পত্রপত্রিকায় ডেটলাইন হওয়া ছাড়া বাস্তবে চিলমারী বলে কোনো জায়গা এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নেই। ব্রহ্মপুত্রে চিলমারী বিলীন হয়েছে বহুবছর আগে। এখন কুড়িগ্রাম থেকে ট্রেনে চেপে গেলে পাবেন রমনাবাজার স্টেশন, সড়কপথে বাস ধরে গেলে মিলবে থানাহাট। বাজার কিংবা হাট যেখানে নামুন, সেইটিই চিলমারী।

চিলমারীতে নেমেই ডাকবাংলোয় জায়গা নিলাম। পূর্ব পরিকল্পনামাফিক শুরু করে দিলাম কাজ। প্রথমে যে বিষয়টির ওপর জরিপ করতে চাই, তা হলো : রাজধানী ও জেলাশহর থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক জনপদের মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে কী ভাবনাচিন্তা করছেন, কোন্ স্তরের কতজন মানুষ রাজনীতির সাথে জড়িত, কোন্ রাজনৈতিক দলের সদস্য কত, সমর্থক কত, তাদের অফিস আছে কিনা, পূর্ণাঙ্গ কমিটি আছে কিনা, তারা কতটুকু এ্যাকটিভ, কারও যদি রাজনীতির ওপর হতাশা থেকে থাকে, তাহলে তার কারণ কি, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ব্যাপারে কে কতটুকু উৎসাহী, দূর গ্রাম এলাকায় নির্বাচন হলে কত ভাগ ভোটার ভোট দেন, রিগিং কারা কিভাবে করে ইত্যাদি ইত্যাদি। দরদী পাঠকগণ, আপনারা যারা এই লেখাটি পড়ছেন, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, গ্রামীণ রাজনীতির একেবারে শিকড়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ কাজ শুরু করেছিলাম। এটি ছিল গ্রামীণ সাংবাদিকতায় একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় তথা দৃষ্টিভঙ্গি। ... কিন্তু, মজার ব্যাপার হলো, পরে একই বিষয়ের ওপর অন্যান্য এলাকা থেকে আমার লেখা একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও চিলমারীর রাজনীতি সম্পর্কিত এই প্রতিবেদনটি ছাপা হয় নি।

এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে খুবই পরিশ্রম হয়, ব্যয় হয় সময় ও অর্থ। স্থানীয়ভাবে, যারা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির মানুষ, তারা বাধা সৃষ্টি করেন। তাদের অনেকে চিলমারী সদরে রটিয়ে বেড়ান যে, 'এইসব তথ্য বিদেশে পাচার করা হইবে।' কেউ বলেন, 'ইহা সি.আই,এ-র কাজ।' কেউ বলেন, 'এই সাংবাদিক কমুনিস্।' অনেকে, এমনকি প্রগতিশীল দলের স্থানীয় নেতা বা কর্মী সরাসরি প্রশ্ন করেন : 'এখানে কয়টি রাজনৈতিক দল, কয়টির অফিস আছে, কার কমিটি কাজ করে কি করে না, এইসব খবর নিয়ে আপনি কি করিবেন?' কেউ বলল, 'ইহা কি রিপোর্টের কোনো বিষয় হইল? এইরকম রিপোর্টতো কোথাও কখনো পড়ি নাই!' একজন যুবক চেয়ারম্যান পরামর্শ দিলেন, 'এইসব তথ্য সংগ্রহ বাদ দিয়া বরং অমুক চেয়ারম্যান কত গম চুরি করিয়াছেন, তাহার খবর লিখুন। আমার কাছে তাহার সমস্ত তথ্য রহিয়াছে।' বলা বাহুল্য এইসব কথা হচ্ছিল কুড়িগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়। কিন্তু অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে বলে মৃদু বৈচিত্র্য আনার জন্যে এখানে তা সাধু ভাষায় পরিবেশন করলাম।

যাই হোক, চিলমারী সদরে রাজনীতি বিষয়ক প্রতিবেদনটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে কয়েকজন ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেও কয়েকজন যুবক আবার খুবই সহযোগিতা করল। এরা কমিউনিস্ট পার্টি ও ক্ষেতমজুর সমিতির স্থানীয় নেতা-কর্মী-সমর্থক। আমি যেহেতু সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব ও দুস্থদের নিয়ে লিখি, মজুরদের অতিনিম্ন মজুরি হারের কথা লিখি, যেহেতু আমার লেখার অনেক বিষয়ের একটি হলো ক্ষেতমজুর, কার্তিকে তাদের উপোস-কাপাস আর মৃত্যু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেহেতু আমি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলি ফিচারধর্মী প্রতিবেদনগুলোতে, সেহেতু তাদের ধারণা আমি 'কমিউনিস্ট পার্টির লোক'। শুধু তাই নয়, ঐ সংগঠনের কয়েকজন যুবক নিজে এসে বলল, 'মোনাজাত ভাই আপনাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।' এখানে বলে রাখি, চিলমারী একটি প্রত্যন্ত এলাকা হলেও সেখানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ক্ষেতমজুর সমিতির শক্তিশালী সংগঠন ছিল, এখনও রয়েছে।

যাই হোক, যুবকদের সহযোগিতায় আমি বেশকিছু মজার মজার তথ্য পেলাম। যেমন : চিলমারীর স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর জরিপ টেব্যুলেশন করার পর দেখা গেল : চিলমারীর প্রত্যন্ত কয়েকটি গ্রামে শতকরা ৯৬ ভাগ মানুষ (যারা ভোটার) ১ থেকে ৩টি রাজনৈতিক দলের নাম বলতে পারেন। বাকি ৪ জনের মধ্যে ২ জন ৪ থেকে ৫টি দলের নাম, ১ জন ৬টি দলের নাম ও ১ জন ৮টি দলের নাম বলতে পারেন। মহিলাদের সচেতনতার চিত্র অতি হতাশাব্যঞ্জক। চিলমারী সদর থেকে ১৫-২০ মাইল দূরের ৫টি গ্রামে ১শ মহিলার (প্রাপ্তবয়স্কা) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ১শ মহিলার মধ্যে ৩২ জন আমাদের প্রশ্নের জবাব দেন নি। বাকি ৬৮ জনের মধ্যে ৬৭ জনই ১টি রাজনৈতিক দলেরও নাম বলতে পারেন নি। ১ জন বলতে পেরেছেন ২টি দলের নাম, তাও তিনি ঐ দুটি দলের প্রধানের নাম বলতে পারেন নি। মহিলাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায় : ১শ জনের মধ্যে ২০ থেকে ২৫ জন ভোট দিতে যান স্থানীয় বা জাতীয়ভিত্তিক নির্বাচন হলে। অধিকাংশ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না, এ ব্যাপারে সচেতনও নন। যে ২০-২৫ জন মহিলা ভোট দেন, তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, এরা কেউ-ই নিজের ইচ্ছেমতো ভোট দেন না বা দিতে পারেন না। পিতা বা স্বামী যা বলেন, তাই শুনতে হয়। কাকে ভোট দিতে হবে তা বলে দেন গৃহস্বামী। গৃহস্বামীকে আবার সিদ্ধান্ত দেন গ্রামের দেওয়ানি মাতবর। ফলে একজন বধূ ঘরে যেমন দাসীবৃত্তি করে, পদসেবা করে স্বামী পরিচয়ের ধর্ম-সিদ্ধ মানুষটির, তেমনি ভোটদানের ক্ষেত্রেও তাকে স্বামীর নির্দেশ পালন করতে হয়। এই নিয়ম চিলমারী কেন, বাংলাদেশের বহু গ্রামেই এখনও চালু আছে। 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব' এই স্লোগানটি শহরের সীমানায় উচ্চারিত বটে, গেছে কোনো কোনো উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যন্তও; কিন্তু উত্তরাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুরসহ আরও বহু এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে স্বামীর হুকুমমতো ভোট না দেওয়ায় স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, আজও ঘটছে। ঐসব অসচেতনতার অন্ধকার জনপদে দেওয়ানি মাতবর যা বলেন, তা-ই শোনা হয়। আর ঐসব দেওয়ানি মাতবর, যাদের কারও কারও রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে কিন্তু চরিত্র নেই, তারা ইলেকশনের আগে নিজ নিজ গ্রামের ভোট বেচে দেয় প্রার্থীর কাছে। হাতিয়ে নেয় হাজার হাজার টাকা। চিলমারী থেকে বহুদূরে, মনতলা গ্রামের মোসলেমা মোকসেদা হালিমা—এরা 'স্বামীধনের' হুকুমমতো অমুক মার্কায় সিল মেরে আসে, কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের এই ভোট, প্রার্থীর কাছে দিন-কতক আগেই বিক্রি করে দিয়েছে গ্রামের মাতবর সাহেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক, চিলমারীর গ্রাম পর্যবেক্ষণে দেখা গেল, এখানকার মেয়ে-পুরুষ অনেকেই বলতে পারেন না সর্বশেষ জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে কোন্ দলের কাকে তারা ভোট দিয়েছেন। বলতে পারেন না, ভোট দিয়ে কাকে তারা কী হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং কোথায় থাকেন তিনি, কী কী করেন। কাকে ভোট দিয়েছেন বা কোন্ মার্কায় সীল মেরেছেন, এই প্রশ্নের জবাবে একজনও বলেন নি যে এটা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ব্যাপার এবং গোপন ব্যাপার। সংসদ-সদস্য নির্বাচনের জন্যে ভোট দিলেও তারা অনেকেই তা জানেন না এবং সে কারণে কেউ কেউ কাকে ভোট দিয়েছেন এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'মেম্বার সাইবকে ভোট দিচি।' কেউ বলেছেন, 'চ্যারমেন সাইবকে ভোট দিচি।' একজন বলেছেন, 'ভোট দিচি দারোগা সাইবকে।'

সংসদ নির্বাচনে দারোগা সাহেবকে ভোট দিয়েছেন, মানে? প্রশ্নের জবাব মেলে। জানা যায়, ভোটের আগে আগে এক সিপাই এসেছিলেন মনতলা গ্রামে। তিনি একজন প্রার্থীর হয়ে ক্যানভাস করে গেছেন এবং ভোটারটি তারই কথামতো বিশেষ একটি মার্কায় সিল মেরে এসেছেন। ভোটারটির ধারণা, ঐ সিপাইটি, যেহেতু তার খাকি পোশাক ছিল, অতএব তিনিই দারোগা সাইব এবং ক্ষমতার মালিক তিনিই। তার হুকুম না শুনলে বিপদ হয়ে যাবে পরে। অতএব তার কথামতো ভোট দান।

শিকড় পর্যায়ে যে অন্ধকার, তার রূপটি এরকমই। আমি কেন, যে কোনো সাংবাদিকের জন্যেই এটি একটি পছন্দের বিষয় যা পাঠকরা লুফে নেবেন। আমি তাই উৎসাহের সাথে প্রতিবেদন লিখলাম শিকড় পর্যায়ের রাজনীতি সম্পর্কে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এত পরিশ্রমের পরেও ঐ প্রতিবেদনটি ছাপা হলো না।

কেন ছাপা হলো না? পত্রিকার পলিসির বাইরে ছিল? সম্পাদক সাহেবের নিষেধ ছিল? না, এসব কিছু নয়। ব্যাপারটি ছিল ব্যক্তি-খেয়ালখুশির। বার্তা সম্পাদনা যিনি করতেন তার সেলফ-সেন্সরশীপের যাঁতাকলে পড়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এই রিপোর্ট ছাপলে নাকি সমাজের জন্যে ক্ষতি হয়ে যাবে? রাজনীতির ওপর মানুষ আস্থা হারাবে। গণতন্ত্রের সংগ্রাম বিঘ্নিত হয়ে পড়বে। ইত্যাদি।

গ্রামীণ রাজনীতি বিষয়ে ঐ প্রতিবেদনটি ছাপা হয় নি। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলোর ওপর লেখা ধারাবাহিকভাবে এসেছে। সরজমিন প্রতিবেদনগুলো কথিত মফস্বলের পাতায় ছাপা হলেও সেসময় যথেষ্ট সাড়া জাগায়, পাঠকের বহু চিঠি আসে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ঐ সিরিজ-প্রতিবেদনের ফটোকপি বিলি করা হয় এবং আলোচনা চলে। মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (প্রেস ইনস্টিটিউটের সিনিয়র প্রশিক্ষক) ঐ প্রতিবেদনটির ওপর 'নিরীক্ষা'তেও আলোচনা করেন। অবশ্য দুএকজন সাংবাদিক পেছনে বলেন, মোনাজাতউদ্দিন এসব কী বোগাস রিপোর্ট লিখেছে! কেউ বলেন, সরজমিন প্রতিবেদন আবার কী জিনিস? কিন্তু অধিকাংশ পাঠক এগুলো গ্রহণ করেছেন তা পরে বুঝতে পারি। কমপক্ষে ৫০ জন পাঠক, যাদের মধ্যে আছেন বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সমাজকর্মী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারি কর্মচারী, তারা চিঠি লিখে জানান, ঐ সিরিজ প্রতিবেদনগুলো তারা কেটে রেখে দিয়েছেন। আমার প্রাতঃনমস্য সন্তোষদা বলেন, 'রিপোর্টগুলো ভালোই হয়েছে মোনাজাত।' এবং এর ফলে, একটা ব্যাপার ঘটল যে, যেসব সাংবাদিক বলেছিলেন এসব বোগাস রিপোর্ট, বলেছিলেন আলতু-ফালতু বিষয় এবং আমি নিরুৎসাহিত হয়ে গিয়েছিলাম, পাঠক-প্রতিক্রিয়া জানবার পর আবার চাঙা হয়ে উঠলাম। এই সমাজে এমন মানুষ বহু আছে যারা নতুন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহ তো দেবেই না বরং পেছনে নানা কটূক্তি করবে। শুধু সাংবাদিকতায় নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি রয়েছে। আমার এক বন্ধু মোতালেব রাজশাহী রেডিও'র জন্যে একটি নাটক লিখল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর। স্ক্রিপ্ট জমা দিল প্রযোজকের কাছে। প্রযোজক করলেন কি, স্ক্রিপ্টের প্রথম পাতাটি পড়েই আমার সামনে তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন এবং বাস্কেটে নয়, জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। আমার খুব রাগ হলো, দুঃখ পেলাম। বন্ধুটিকে বললাম, আপনি এটার একটা কপি ঢাকা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন তো! তাই করলেন মোতালেব। কিছুদিন বাদে দেখা গেল, ঐ নাটকটি রেডিও'র জাতীয় পর্যায়ের পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে!

তা অন্যের কথা কেন, আমার ঐ 'কানসোনার মুখ' প্রতিবেদনটির কথাই ধরা যাক। সিরিজটি ছিল দীর্ঘ, ১৯টি পর্ব, কিন্তু এর ৭/৮টি ছাপা হবার পর দেখা গেল, একটি মহলে বেশ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। পোশাক ও মেকআপে খুব ভদ্রদৃশ্য একজন আমাকে সরাসরি আক্রমণ করলেন : মোনাজাত, এইসব প্যাঁচাল আর কতদিন চালাবেন? শুনে আমি মানসিকভাবে খুব দমে গেলাম। মোজাম্মেল হোসেন মন্টু (মরহুম), যিনি ঐ সিরিজটি সম্পাদনা করছিলেন এবং যার তত্ত্বাবধানে (কার্তিক চাটার্জী, তৎকালীন ৫-এর পাতার সম্পাদক) কানসোনার মুখ ছাপা হচ্ছিল, তারাও খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। অপর একজন বললেন, 'কানসোনার মুখ' নিয়ে রিঅ্যাকশন ভালো নয়, ওটা বন্ধ করে দিন।'

পাঠকরা জানেন, এই 'কানসোনার মুখ' সিরিজটি পরে ফিলিপ্স পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়।

পাঠক, মাফ করবেন। মনের খেদে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। এবার 'ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ' সম্পর্কিত প্রতিবেদনটির নেপথ্য-কাহিনী বলি।

সরকার ভূমিহীনদের জন্যে মেলা জমি দিয়েছেন। প্রচার-মাধ্যমে এ সম্পর্কিত খবর হামেশাই প্রকাশিত হচ্ছে। তা আমি ভাবলাম, চিলমারীতে যখন এসেছি তখন তদন্ত করে দেখাই যাক না, সরকারি প্রচার-প্রচারণা আর বাস্তব অবস্থার মধ্যে মিল কতটুকু!

চিলমারী সদরে আছে রাজস্ব অফিস। সেখানে হাজির হলাম এক সকালে। কর্মকর্তাটি নেই। কেউ বলেন ট্যুরে গেছেন, কেউ বলেন ছুটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, ৩/৪ দিন অপেক্ষা করেও তাকে পাওয়া গেল না। করি কি? রাজস্ব অফিস থেকে খাস জমি দেওয়া হয়েছে এমন ভূমিহীনদের তালিকা যদি না পাই, তাহলে গ্রামে গিয়ে তদন্ত করব কিভাবে যে কে জমি পেয়েছে আর কে পায়নি! একটা কাজ করা যায় যে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে খোঁজ নেওয়া : কে ভূমিহীন, কে জমি পেয়েছে, কে পায়নি। কিন্তু সেটার জন্যে সময় লাগবে খুব বেশি। আর পায়ে হাঁটাও কষ্টকর। মনতলা গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে গিয়েছে ইতোমধ্যেই।

রাজস্ব অফিসে ছিলেন কেরানি। সালাম-পরিচয় দিয়ে তাকে বললাম, এই চিলমারীতে যেসব ভূমিহীন জমি পেয়েছে, তার একটা লিস্ট দিন না ভাই! কিন্তু গললেন না। পান খাওয়া মুখের জিহ্বায় চুনের লেপন দিতে দিতে বললেন, 'হ, আপনাকে লিস্টি দেই, আর আমার চাকরিটা যাক!' এই বলে একসময় চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন জানালার কাছে, পানের পিক ফেলে জানালা গলিয়ে আরেকটা পানের অর্ডার হাঁকলেন এবং আবার চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, 'আমাদের সাহেব না আসা পর্যন্ত আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না।'

আমি জিগ্যেস করলাম, তা ভাই, আপনার সাহেব আসবেন কবে? ৩/৪ দিন ধরে তো শুধু আসি আর যাই। তিনি আসেন কই? গেলেন কোথায়?

জবাবে কেরানি কথা বলেন না। বলেন না মানে বলতে পারেন না। কেননা তার মুখে পিক। তিনি শুধু দুই হাতের সমস্ত আঙুল প্রসারিত করে বিচিত্র ভঙ্গিতে তা নাড়াতে থাকেন। তার মানে, তিনিও জানেন না, সাহেব কবে আসবেন।

ভালো ল্যাঠা! আমার দরকার প্রাথমিক কিছু, তা পাচ্ছি না। রাষ্ট্র কিংবা সরকারের গোপন কোনো ব্যাপার নয়, তবু তা সাংবাদিককে জানালে চাকরি চলে যাবে বলে কেরানির ভয়। ওদিকে কর্তার পাত্তা নেই। আমি এই চিলমারীর মতো দূর-অঞ্চলে থাকিই বা আর কতদিন? আর সব কাজ তো শেষ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে, পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করল অন্য পথ ধরতে। আমি অপরাধ করছি বুঝেও চা সিগারেট ও কয়েক খিলি পানের অর্ডার দিলাম। কেরানিটি 'এসবের কী দরকার', 'আপনি আমাদের গেস্ট, আপনি চা খাওয়াবেন কেন?' এইসব বলে পিয়নটিকে তাড়া লাগালেন তাড়াতাড়ি সবকিছু নিয়ে আসার জন্যে। বুঝলাম লোকটা কি রকম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে, যখন দেখলাম অফিসের আর কেউ আমাদের লক্ষ করছেন না, তখন পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের করে তার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলাম। তিনি সহসা সচকিত, চঞ্চল-চোখে দেখে নিলেন এদিকে-ওদিকে, তারপর ফটাস করে ড্রয়ার বন্ধ করে মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, ভাইরে, আপনার সাহেব কবে আসবেন সেজন্য তো আর অপেক্ষা করতে পারি না। জমিপ্রাপ্ত ভূমিহীনদের তালিকাটা দিয়ে দিন।

দশ টাকার কারণে, নাকি আমার কথায় আকুতি ছিল বলে তার মন নরম হলো, বোঝা গেল না। তবে, চা শেষ হবার সাথে সাথে তিনি ফাইল-খাতা খুললেন, লিখে দিলেন ভূমিহীনদের তালিকার একটি অংশ। বললেন, 'আমি এটা সাপ্লাই করলাম সেটা আবার কাউকে বলবেন না যেন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'আপনার কি মাথা খারাপ! না না, এটা কেউ জানবে না।'
তারপর রাজস্ব অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

কেরানি-প্রদত্ত তালিকায় অনেক নাম। কিন্তু সবার বাড়ি বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। আমি ৫/৬ জনের নামের পাশে টিক চিহ্ন দিলাম। শুধু এদের কাছে গিয়ে তদন্ত করে দেখব এরা প্রকৃত ভূমিহীন কি-না, কিংবা সরকারের দেওয়া জমি পেয়েছে কি-না!

রাণীগঞ্জ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শওকত আলী বীরবিক্রম। তাকে বললাম, চলেন একটা ব্যাপার খোঁজ নিয়ে আসি। বিষয়টি শুনে তিনি কী জানি কেন উৎসাহী হয়ে উঠলেন, রাজি হলেন আমার সাথে গ্রামে যেতে। শওকত আলী বীরবিক্রমকে সঙ্গে নেওয়ার পেছনে চিন্তা ছিল অন্যরকম। এটা একেই তার নিজের এলাকা, পথঘাট চেনেন, মোটরসাইকেলে দ্রুত যাওয়া-আসা যাবে, তাছাড়াও একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি থাকবেন আমার তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।

গ্রামের পথে দুলতে দুলতে, ঝাঁকি খেতে খেতে, ধুলোয় চেহারা সাদা করে আমরা হাজির হলাম রাণীগঞ্জের একটি হাটের ধারে। সেখানে লাইন করে বসে কয়েকজন নাপিত দ্রুত হাতে কাজ করে যাচ্ছে। আমি ঐ ক্ষৌরকর্মকারদের সাথে কথা বলতে চাই এ কারণে যে, এরা বিভিন্ন গ্রামের লোকজনকে সহজে চিনবে। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি যারা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে নাপিত, ভিক্ষুক, ডাকপিয়ন, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মী, কৃষিকর্মী। 'সোর্স' হিসেবে এরা আমার ব্যক্তিগত পছন্দের।

মাঠের ওপর কাঠের ছোট ছোট টুল বিছিয়ে বসেছে ওরা। মাথা শুধু নয়, সমস্ত দেহ অধিকার করে চালাচ্ছে ক্ষুর, কাঁচি, ইত্যাদি। প্রয়োজনের গরজ এমনই যে, বিভিন্ন বয়স, পেশা ও স্তরের মানুষ একই ভঙ্গিতে মাথা সমর্পণ করে বসে আছে এমন একটি পেশার মানুষের কাছে যারা সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন। স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'নাউয়া'। এই 'নাউয়া' শব্দটি ক্ষেত্রবিশেষে একটি তাচ্ছিল্যসূচক গালিও বটে। যে ব্যক্তি জমি কর্ষণ করে, ফসল ফলায়, তাকে 'চাষা' সম্বোধন যেমন করা হয় অনেকক্ষেত্রে, তেমনি, চুল-দাড়ি এমনকি বগলের লোম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে যে মানুষটি নরকে সুন্দর করে, তাকে শহর ও সাহিত্যে 'নরসুন্দর' বলা হলেও গ্রামের বাস্তবতায় সে নাউয়া, খেউরি। উত্তরের অনেক গ্রামে এখনও এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে, সকালবেলা উঠে নাপিতের মুখ দর্শন করলে 'সাঁইত' নষ্ট হয়, অর্থাৎ দিনটি নাকি খারাপ যায়! একই মানুষ, হাত ও কাঁচিতে জোতদারটিকে সাফ-সুতরো করে দেওয়ার সময় তার মাথাটি নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলতে পারে, নাপিতের নির্দেশে মাথা নোয়াতে হয়, থুতনি উঁচু করতে হয়। কিন্তু সেই শ্রমজীবী মানুষটি তার কাজের ন্যায্যমূল্য তো পায়ই না, বরং একটুখানি পানি খেতে চাইলে তাকে গ্লাস দেওয়া হয় না, আনা হয় লোটা-বদনা। ঐ পাত্রটিতে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারে না সে। পানি কেউ ঢেলে দেয় প্রার্থনার মতো তুলে ধরা দুটি বদ্ধ হাতের অঞ্জলিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সালাম ও নমস্কার উচ্চারণ করি। শান্তি কামনার চেয়েও অন্য গরজ আমার; ওদের সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া। হঠাৎ করে এটা-ওটা কিছু প্রশ্ন করলে ওরা ঘাবড়ে যেতে পারে, চেপে রাখতে পারে জানা তথ্য।

হাট তখনও জমেনি। চিৎকার শোরগোল তেমন নেই। আমার কণ্ঠস্বরে ওরা সবাই আমার দিকে চোখ তুলল। আমি স্থানীয় ভাষায় জিগ্যেস করলাম, ক্যেমন আছেন বাহে তোমরা? তারপর বসে পড়লাম একজনের সামনের খালি টুলে। শওকত আলী বীরবিক্রম, মোটরসাইকেল হেলান দিয়ে রেখে আমার কাছে আসতে চান, কিন্তু পারেন না। 'গম কবে আসবে', 'গমের কাজ কবে শুরু হবে' এইসব প্রশ্ন নিয়ে তাকে ঘিরে ধরে কয়েকজন।

আমি যে নাপিতটির সামনে বসেছি তার কাছে জানতে চাই, অমুক নামের লোকটি তার বাড়িটা কোথায় কতদূর। সে এবার ভয়ের চোখে আমার দিকে তাকায়, তারপর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। তার সাথে সাথে আমিও উঠে পড়ি টুল ছেড়ে। তার কথা শুনে হেসে ফেলি। যে ভূমিহীনটিকে আমরা এখানে খুঁজতে এসেছি, যে সরকারি খাস জমি পেয়েছে, সে-ই এই লোক। বাহ্!

ছার! আপনেরা ... লোকটা হাতজোড় করে কাঁপছে। আমি তার কাঁধে হাত রাখি বন্ধুর মতোন। নিজেও সিগারেট ধরাই, তাকেও দেই একটি। অগ্নিসংযোগের সময়ও লক্ষ করি তার হাত রীতিমতো ঘটাঘট করে কাঁপছে।

লোকটা ঘাবড়ে গেলে তো চলবে না। এটা-ওটা আলাপ জমাই তার সাথে। বাড়ি কতদূরে, ছেলেমেয়ে কজন, জমি কতটুকু আছে কি নেই, ক্ষৌরকর্ম করে দিনে কত আয়-উপার্জন হয়, এসব জেনে নেই।

AMARBOI.COM

তার সাথে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছি। কথা বলার সময় আমার দেহটি নিয়ে যাচ্ছি তার খুব কাছে। একটা প্রশ্ন বারবার করছি। কারণ, ইতোমধ্যে আমি আমার কাঁধে ঝোলানো মুখ খোলা ব্যাগের ভেতর টেপ রেকর্ডারটি চালু করে দিয়েছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল, এই নরসুন্দরটি ভূমিহীন নয়, অল্প হলেও নিজস্ব মালিকানায় জমি আছে তার, ক্ষৌরকর্ম করে যে আয়-উপার্জন করে তা-ও একেবারে খারাপ নয়।

আমি কিন্তু খাসজমি প্রাপ্তি সম্পর্কে কিছুই বলি না। বরং বলি, 'হাঁটো বাহে, তোমার বাড়ি যামো। শুনচি, তোমার বাড়িত্ বড় বড় চড়াই আচে, জবো করি ভাত খামো।' হাঁটো। অর্থাৎ 'ভাই চলুন, আপনার বাড়িতে যাব। শুনেছি আপনার বাড়িতে বড় বড় মুরগি আছে, তা জবাই করে ভাত খাব। চলুন।'

এখানে বলে রাখি, উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রামে গেলে আমি স্থানীয় ভাষায় কথা বলে থাকি। এতে খুব তাড়াতাড়ি অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। এজন্যে, শুধু রংপুর নয়, বগুড়া পাবনা রাজশাহী দিনাজপুর সব এলাকার ভাষা, ভাষার উচ্চারণধ্বনি, টান, এসব শিখতে হয়েছে। অনেক গ্রামে শহুরে মানুষ মানে 'বিদেশি মানুষ' এবং তাদের সাথে 'আসুন বসুন বলুন' এসব কথাবার্তা বললে ঘনিষ্ঠ তো হন না বরং অনেকক্ষেত্রে ভড়কে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক, ঐ নরসুন্দরকে নিয়ে হাট ছেড়ে হাঁটা দিই। হাট থেকে মাইলখানেক দূরে তার বাড়ি। আমি আর নরসুন্দর পাশাপাশি হাঁটছি, পেছনে শওকত বীরবিক্রম, তারও পেছনে মৌমাছির মতো লেগেছে একদল শিশু-কিশোর, উৎসাহী যুবক, এমনকি আছে প্রৌঢ়-বৃদ্ধও। ছেলেরা কেউ আমার ক্যামেরা ছুঁয়ে দেখছে চলন্ত অবস্থায়, কেউ আমার দেহের দৈর্ঘ্য নিয়ে কথা বলছে। বলছে 'ইসসারে মানুষট্যা কি ঢাঙ্গা বাহে!' অর্থাৎ ইস, মানুষটি কী লম্বা রে বাপু! যুবকদের কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন চালাচালি করছে, এই লোক আবার কে? নাপিতটাকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? এদের প্রশ্ন সামলালেন শওকত। আমি তাকে কিছু শিখিয়ে দিইনি, কিন্তু কান পেতে শুনছি, তিনি আঞ্চলিক ভাষায় বলছেন, ঐ লোক এক রিপোর্টার, দেখতে এসেছে সরকার এই গ্রামে ভূমিহীনদের যে জমি দিয়েছে তা তারা ঠিকমতো পেয়েছে কিনা। এই শুনে যুবকেরা এগিয়ে আসে, আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। রিপোর্টার, সাংবাদিক, এইসব তারা শুনেছে বটে চায়ের দোকানের আড্ডা-আসরে। কিন্তু চোখে দেখেনি। আমি খুব গম্ভীর মুখে হাঁটছি। মাঝে-মাঝে গোঁফে তা দিচ্ছি। কোনো ব্যাপারে আমি খুব রেগে আছি, এমনটি বোঝাতে চাই। তবু এক যুবক খুব ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল : আপনে কি বিবিসি?

মেকি গম্ভীর কণ্ঠে বললাম : না।

: তাইলে কি রিত্তেফাক?

: না।

পরে বুঝলাম, তথ্যমাধ্যম বলতে এই গ্রামের হাতেগোনা কজন পাঠক ও শ্রোতার কাছে পরিচিত বিবিসির সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান, আর স্থানীয় স্কুলে ডাকযোগে আসা এক কপি ইত্তেফাক। তা ইত্তেফাককে স্থানীয় ভাষার উচ্চারণে রিত্তেফাক বলা হয়ে থাকে। যেমন রংপুরকে বলে অংপুর, রামকে বলে আম, রিলিফকে বলে ইলিপ, রিকশাকে বলে ইশকা ইত্যাদি।

হাঁটছি। বুঝতে পারি নরসুন্দর ভেতরে ভেতরে খুব ছটফট করছে। আমার পরিচয় সে এখনও জানে না, বুঝতে পারেনি কী কারণে তার বাড়িতে আমরা যাচ্ছি। বারবার সে বলে, ছার ... আপনেরা ... ছার ...।

ইতোমধ্যে আমরা তার বাড়িতে এসে গেছি। এবারে মুখ খুললাম। সরকার আপনাকে যে জমিটা দিয়েছে সেইটা দেখব ভাই। চলেন, ঐ জমিটার কাছে নিয়ে চলেন ...।

আমি চিলমারী রাজস্ব অফিস থেকেই জেনে এসেছি যে এই লোকটি ১ বিঘা জমি পেয়েছে। কিন্তু তবু আমি প্রশ্ন করি, আপনাকে তো সরকার ১০ বিঘা জমি দিয়েছে, না? এটা একটা কৌশলের প্রশ্ন। আসলে আমি ঐ লোকটির মুখ থেকেই বের করতে চাই যে আসলে সে কতটুকু জমি পেয়েছে। সে কারণে ১০ বিঘা জমির কথা শুনে সে 'না না' করে ওঠে। বলে, 'ছার, ১০ বিঘা নয় ছার, আমাকে দিয়েছে ১ বিঘা ছার ...।

আমি বলি, 'ও, তাই নাকি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তার জমির পাশে এসে দাঁড়ালাম। ছবি তুললাম কয়েকটা। ছবিটি এরকম যে, নরসুন্দরটি দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে দেখা যাচ্ছে তার জমিখণ্ড। ক্যামেরার অ্যাপারেচার আর শার্টার স্পীড ঠিক করে দিয়ে শওকতের হাতে দিলাম। সে একটা শার্টার করল। এ ছবিটি ডকুমেন্ট। আমি গ্রামে এসে এই ভূমিহীনের সাথে তার জমির পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি, তার প্রমাণ। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

কথাবার্তা সব রেকর্ড হচ্ছে। তবু কিছু নোট করি। গ্রামটির বর্ণনা, জমিতে ফসল কী আছে, এইসব। দেখি, ঐ জমিটিতে ধানের চারা গজিয়েছে বেশ। গাঢ় সবুজ রঙের চারা ৫/৬ ইঞ্চি লম্বা হয়েছে। বোনা জাতের আউশ ধান। ফলন বেশ ভালো হবে। আমার বেশ ভালোই লাগছে। সরকারি যে কার্যক্রম, এই যে ভূমিহীনদের মধ্যে জমিদান, এটা বেশ সাকসেসফুল হবে। তবে হ্যাঁ, নরসুন্দরটির নিজস্ব জমি আছে, নিজের হাতে আয়-উপার্জন করে। একে জমি না দিয়ে যদি প্রকৃত অর্থে ভূমিহীনকে জমি দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো আরও ভালো হতো। আবার, একসময়, এ-ও মনে হয়, সম্পূর্ণ যে লোকটি ভূমিহীন, অর্থাৎ নিঃস্ব, হাতে টাকা-পয়সা নেই, দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে পারে না, সে এই সরকার প্রদত্ত জমি চাষাবাদ করবে কী করে? লাঙ্গল দেবে কিভাবে? বীজ, সার এসব কিনবে কী করে? তাহলে তো যেতে হবে গ্রামের অর্থলগ্নিকারী মহাজনটির কাছে।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। হঠাৎ আমার কেন যেন মনে লাগল : এই যে নরসুন্দর, সে শুধু চুল-দাড়ি কাটে না, আবাদ-সুবাদেও তো পাকা হাত! নইলে এত সুন্দর-দৃশ্য ধানক্ষেতটি কিভাবে গড়ে তুলল সে? সে তাহলে নিশ্চয়ই ভালো বীজ ছিটিয়েছে, নিশ্চয়ই মাত্রামাফিক সার দিয়েছে! আমি এবার প্রশ্ন করে বসলাম : কী ধান ফ্যালাইচেন বাহে? অর্থাৎ জমিতে কী ধানের বীজ বুনেছেন?

নরসুন্দর কথা বলে না। আমি মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাই। তার চোখমুখ যেন কীরকম। আবার প্রশ্ন করি : এই জমিতে বীজ ছিটিয়েছেন কতটুকু?

জবাব নেই।

সার দেননি?

জবাব নেই।

কী কী সার দিয়েছেন?

জবাব নেই।

আমি তার কাছে সরে আসি। নাম ধরে ডেকে বলি, ভাই, জমিতে বীজ কতটুকু ছিটিয়েছেন?

: ছার ...

: ধান তো খুব ভালো হয়েছে। তা সার কী কী দিয়েছেন?

: ছার ...

: আপনি অমন ভয় করছেন কেন? শুধু ছার ছার বলছেন কেন? জমিতে সার কতটুকু দিয়েছেন?

: ছার ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আরও কাছে যাই। আবার প্রশ্ন করি : ভাই, আপনি কি এই জমি আবাদ করেন নি?

: করচি ছার।

: এই জমিটাই তো সরকার আপনাকে দিয়েছে?

: হয় ছার।

: ধান কে লাগিয়েছে?

: আমি ছার।

: তাহলে বলছেন না কেন বীজ কতটুকু দিয়েছেন?

: ছার ...

: সার কী কী দিয়েছেন? গোবর দিয়েছেন? ইউরিয়া? টিএসপি?

: ছার ...

বারবার তার এই ছার-ছার শুনে উপস্থিত লোকজনও বিরক্ত। একজন, ঐ নরসুন্দরের প্রতিবেশী, সে বলে উঠে রাগের কণ্ঠে : খালি খালি ছার-ছার করিস ক্যান? উনি যা জানতে চান, তাক বলি দে না!

নরসুন্দরটি হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। বলে, আমার জমি আমি ধান লাগাইচি। কী বিচন দিচি, কী সার দিচি, সেগুলা কী দরকার? আমি কবার পাবার নই।

দীর্ঘপথ আসা, নানারকম কথা, ক্ষুধা, নরসুন্দরের এই ভাষ্য, সব মিলিয়ে আমার ভেতর এমন কিছু একটা কাজ করে, নিজেকে সামলাতে পারি না। সত্য জানার জন্যে এতদূর এসেছি, সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতার কারণে আমি শিকড়ে যেতে চাই, আর এই লোকটি, যে কি-না জমির মালিক হয়েও ভূমিহীন, আয়-উপার্জন থাকা সত্ত্বেও যে লোকটি সরকারি সুবিধা পেয়েছে, সে আবার উল্টো চোখরাঙানি দেখাচ্ছে! বলছে যে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না!

বুঝতে পারি মাথায় রক্তের চাপ বাড়ছে। রাগে আমার গা কাঁপছে। নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করি। নরসুন্দরের কাছে এসে কাঁধে হাত রাখি তার। বলি, ভাই, আমি অনেক কষ্ট করে আপনার বাড়ি পর্যন্ত এসেছি। আমি জানতে এসেছি সরকার বাহাদুর যে জমি আপনাকে দিয়েছেন তা আপনি পেয়েছেন কি-না, সে জমিতে আপনি আবাদ-সুবাদ করছেন কি-না, জমি পাওয়ার পর আপনার কোনো উপকার হয়েছে কি-না। আর আপনি আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন?

নরসুন্দর তার হাত ঝটকা দেয়। কাঁধ থেকে খসে যায় আমার হাত। কিছুটা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় সে। বলে, 'আমি আপনার কোনো কথার জবাব দেব না। এই জমি আমার, আমি আবাদ করছি। আর কোনো কথা নাই।'

আমি গুম মেরে থাকি। উপস্থিত সবাই চুপচাপ। কারও নিঃশ্বাসের শব্দও যেন পাওয়া যাচ্ছে না। কাঁধ ট্যারা ও চোখের মণি ট্যারা করে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে নরসুন্দর। তার জেদের কাছে পরাজিত হয়ে আমি ফিরে যাব? ফিরে গিয়ে কী প্রতিবেদন লিখব? একজন ভূমিহীন সরকারি জমি পেয়েছে এবং তাতে উন্নত পদ্ধতিতে ধান আবাদ করেছে? এই লিখব? বস্তুনিষ্ঠতা শুধু সাংবাদিকদের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপদেশদানকারীদের বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকবে? সত্য কি পড়ে থাকবে চিলমারীর গ্রামের ধুলোয়?

আমি নরসুন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। এগোই। একেবারে কাছে। তার শরীরের সাথে আমার শরীর যেন এঁটে গেছে। আবার আমি তার নাম ধরে ডাকি। ভাই, আপনি সত্য বলুন। এই ধান আপনি লাগিয়েছেন?

: জ্বে ...

: এই ধান আপনি লাগিয়েছেন?

: বললাম তো, জ্বে।

: তাহলে বলুন, বীজ কতটুকু ছিটিয়েছেন?

: বলব না ...

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আমি চিৎকার করে উঠি। আপনাকে বলতে হবে ... অবশ্যই আপনাকে সত্য বলতে হবে। বলুন এই ধান আপনি লাগিয়েছেন, নাকি অন্য কেউ? তারপর, হঠাৎ, নিজেও বুঝতে পারি না এ কী হলো, আমি আমার ডান হাতটি পেছনে টেনে নিলাম এবং পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক থাপ্পড়ে লোকটি 'ওরে বাবারে' বলে আর্তনাদ করে উঠল, ধপ করে বসে পড়ল জমির আইলের ওপর। সমস্ত গ্রাম তখন নিস্তব্ধ, উপস্থিত শিশু-কিশোর যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ পাথরের মতো হয়ে গেছে। শুধু ঐ নরসুন্দর তার চোয়াল চেপে ধরে গোঙাচ্ছে : 'মোক মারি ফেলাইচে রে বাবা ... মোক মারি ফেলাইচে। মোর দাঁত ভাঙি দিচে ...'

এইসময় উপস্থিত জনতার পাথর ভেঙে সামনে আসে এক যুবক। নরসুন্দরের সামনে গিয়েই সে লাথি মারে তার নিতম্বে। শালা হারামজাদা, সত্যি কথাটা বলিস না ক্যান? তারপর লেখা যায় না এমন কিছু গালিবর্ষণ সমাপ্ত করে যুবকটি ঘোষণা দেয়, সত্য কথাটা এক্ষুনি বলি দে। না হইলে উনি তো খালি একটা থাপড় মারছে আর দাঁত ভাঙি দিচে, আমরা লাথি মারতে মারতে তোকে আইজ শেষ করি ফ্যালাবো। শালা নাউয়ার বাচ্চা নাউয়া। এই জমিন যে তুই পাইস নাই, তাক কইস না ক্যান? তারপর একটু থেমে বলে, 'বল, সত্য কথা কি কি আচে, সাইবকে খুলি বল।'

নরসুন্দর এবার শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। সে কান্না অসহায়ত্বের। আমি একটা সিগারেট ধরাই। ও কাঁদুক। একটু হালকা হোক। পাথর যখন গলেছে তখন সত্য নিশ্চয়ই এবার জানা যাবে।

সত্য জানা গেল।

গ্রামসমাজে যা ঘটছে, তা-ই।

এই নরসুন্দর ভূমিহীনের জন্যে জমিদানের মতো বৃহৎ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কিছুই জানে না। একদিন গ্রামের মাতব্বর, গ্রামের লোকে যাকে 'গ্রাম সরকার প্রধান' বলে মানেন, তিনি নরসুন্দরের হাতে ২শ টাকা তুলে দেন এবং কয়েকটি সাদা কাগজে টিপসই নেন। পরবর্তীকালে ভূমিহীনের জন্যে জমি সরকারি খাতাপত্রে বরাদ্দ হয় ঐ নরসুন্দরের নামে, কিন্তু তা ভোগদখল করতে থাকেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতব্বর সাহেব। উন্নত পদ্ধতিতে আউশ ধানের চাষাবাদ তিনিই করেছেন। ফসলও ভোগ করবেন তিনি। শুধু নরসুন্দরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদি কখনো কেউ জানতে চায় সে সরকারি জমি পেয়েছে কি-না, তাহলে যেন বলা হয়, হ্যাঁ, সে জমি পেয়েছে।

ঘটনা বর্ণনা করে নরসুন্দর কাঁদতে থাকে আবার। প্রচণ্ড চড় এবং দাঁতের ব্যথা ভুলে গেছে সে। তার ভয়, এই ব্যাপারটি প্রকাশ করবার পর মাতব্বর তার 'বেসুবিধা' করবে। আমি বললাম, 'আপনার চিন্তা নাই, আপনার যাতে অসুবিধা না হয় আমি সেটা দেখব।'

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। নরসুন্দরের বাড়ি থেকে আমরা গেলাম ঐ মাতব্বরের কাছে। আমার সেই মেকি উদ্ধত ভঙ্গি। বড় বড় চোখ। গম্ভীর মুখ। গোঁফে তা দিচ্ছি। এতে লাভ এটুকু হলো যে, ভয়ের চোটে প্রথমেই মাতব্বর সাহেব তার অপরাধ স্বীকার করে ফেললেন। তার যুক্তিটি অপূর্ব বটে! বললেন, 'ছার, জমি আমি নিয়েছি। বলবেন যে নাউয়াকে ঠকিয়েছি। ঠিক কথা। কিন্তু কি করবেন ছার, আমি ঐ জমি না নিলে আমার মতোন আর কেউ তো নিতোই! নাকি বলেন?'

তার 'অকাট্য' যুক্তি শুনে আমি হা হয়ে যাই। আমার নীরবতাকে সমর্থন মনে করে তিনি আরও কণ্ঠ উঁচু করেন। বলেন, 'শালা ঐ নাউয়ার গোয়াত নাই চাম। তা ঐ হারামজাদা জমি নিয়া করবেটা কি? পারবে আবাদ-সুবাদ কইরবার?' তিনি আরও জানালেন, ঐ জমিটুকু নিতে সিও রেভনু অফিসে টাকা-পয়সা কিছু বেশি খরচ হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার আক্ষেপ নেই। কেননা জমিটুকু খুব উর্বরা। তেল চকচকে ভুঁড়িতে হাত ঘষতে ঘষতে মাতব্বর বললেন, 'ছার, জমিখানা দেখলেন তো? কী সুন্দর ধান হইচে!'

মাতব্বরের যুক্তি, অপরাধের উক্তি ও ধানের স্বপ্নে মাতোয়ারা হবার ভঙ্গিটি দেখে যতটা না অবাক লাগে, তার চেয়ে বেশি দুঃখ পাই যখন দেখি 'সংবাদে' 'প্রকৃত ভূমিহীনরা জমি পায় নি পেয়েছে প্রভাবশালীরা' এ সরজমিন প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরেও সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেননি। খবর ছাপা হবার পর ঢাকা থেকে ডিসি সাহেবকে টেলিফোনে ব্যাপারটি 'দেখতে' বলা হয়। সুযোগ্য ডিসি সাহেব এই ঘটনার তদন্ত করার নির্দেশ দেন ঐ রাজস্ব অফিসারকে, যিনি কিছু অর্থের বিনিময়ে নরসুন্দরের প্রাপ্ত জমি মাতব্বরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তদন্ত করতে গিয়ে রাজস্ব অফিসার ঐ মাতব্বরের বাড়িতে ওঠেন, দুপুরে পোলাও ও মুরগি আহার করেন। তার পকেটে কিছু টাকা ও হাতে কয়েকটি বড় মোরগ 'বাসায় খাওয়ার জন্যে' তুলে দেওয়া হয়। 'তদন্ত' সমাপ্ত করে রাজস্ব সাহেব 'রিপোর্ট' দেন যে, 'পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

নরসুন্দর ঐ জমি পায়নি। অ্যাকশন নেয়নি সরকার। চোরকেই পাঠানো হয়েছে চুরির ঘটনা তদন্তে। সেই চোর বাগিয়ে এনেছে আরও কিছু ঘুষ, আরও কয়েকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোরগ। আমি ধিকিধিকি জ্বলতে থাকি। সরকার ও প্রশাসনের এই অবস্থার জন্যে নয়, আমার কর্মের জন্যে। ভীষণ অপরাধবোধ হতে থাকে যে, যে সত্য আদৌ প্রতিষ্ঠা পেল না, সেই সত্য উদ্‌ঘাটনের নামে কেন আমি একজনকে মারলাম? এক থাপ্পড়ে তার দাঁত ভেঙে গেল! ঈশ্বর, তুমি আমাকে শাস্তি দাও।

হ্যাঁ, নানাভাবে শাস্তি আমি পেয়েছি। কিন্তু তবু শান্তি পাইনি। লক্ষ করি বারবার ঐ ঘটনাটি মনে ভাসে। মন দিয়ে কাজ করতে পারি না, খাওয়া হয় না, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। একদিন প্রত্যুষে, ট্রেনে চেপে নেমে পড়ি রমনাবাজার স্টেশনে। চিলমারী। সেই গ্রাম।

সেদিনও ছিল হাটবার। তার সাথে দেখা হয়ে যায়। এক কিশোরের মাথা কামানো অসমাপ্ত রেখে শ্লো-মোশন ছবির ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় সে। দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। অপলক চোখে তাকায়। তারপর, হঠাৎ, সে আবার নিমগ্ন হয়ে পড়ে। ব্যস্ত হাতে ক্ষুর চালাতে থাকে সে কিশোরটির মাথায়। ক্রমশ নেড়ে হতে যাচ্ছে এক বালক। বুঝিবা ঐ নরসুন্দর, আমাকেই ফালা ফালা করে কাটতে থাকে।

আমি তার নাম ধরে ডাকি।

একবার। দুইবার। আবার।

কিন্তু মুখ তোলে না সে। বালকটিকে সম্পূর্ণ নেড়ে না করা পর্যন্ত চিলমারীর এই নরসুন্দর যেন এই পৃথিবীর কারও দিকে তাকাবে না, কারও সাথে কথা বলবে না। আমি আরও এগিয়ে যাই। আরও কাছে। তবু সে মুখ তোলে না। আমি তার পাশে বসে পড়ি। হাত রাখি তার কব্জিতে। এবার ক্ষুর থামে। যেন ভীষণ লজ্জিত সে নিজে, এরকম ভঙ্গি করে নরসুন্দর আলতো চোখ তোলে। ঘোলা চোখ ছাপিয়ে উঠা অশ্রু, গড়িয়ে পড়ছে গণ্ড বেয়ে। এই সময়, হু হু করে ওঠে আমার বুক। তার নিঃশব্দ কান্না তৎক্ষণাৎ আমাকে সংক্রামিত করে। আমি, নষ্ট সমাজের সত্য-উদ্‌ঘাটনকারী সাংবাদিক, মোনাজাতউদ্দিন, তার ধুলোমাখা শীর্ণ পায়ের ওপর হাত রাখি। আপনি আমাকে মাফ করুন ভাই।

তারপর নরসুন্দর ডুকরে কেঁদে উঠলে গোটা হাট যেন আমাদের দুজনের কাঁধের ওপর ভেঙে পড়ে। সত্য এবং মিথ্যা, কিংবা মিথ্যা এবং সত্য, অথবা হতে পারে দুই সত্য অথবা দুই মিথ্যা যখন শেষ বিকেলের রোদে আলিঙ্গনাবদ্ধ, তখন হাটময় রটে যায়, 'সেই রেপোর্টার আইজ ফির আচ্চে রে! তাঁয় ক্যানবা নাউয়াক জড়েয়া ধরি কান্‌তোচে ...!'

সেন্সর আর সেলফ-সেন্সর

সেন্সরশীপ তুলে নেওয়ার জন্যে কম সংগ্রাম করেছেন এদেশের সাংবাদিকগণ! বিভিন্ন সময়ে তাঁরা বজ্রকণ্ঠ হয়েছেন, শাণিত ছুরির মতো কলম ধরেছেন। সাংবাদিক ইউনিয়ন, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এরশাদ শাসনামলের শেষদিকে যে ভূমিকা রাখেন, তা এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হয়ে থাকবে। তাঁদের সফল আন্দোলনের কল্যাণে এখন আর অন্তত 'প্রেস অ্যাডভাইস' আসে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর ছাপাতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারটি অনেক আগের। স্বার্থবাদীরা চান না তাদের অপকর্ম রাষ্ট্র হয়ে যাক। সেজন্যে প্রণীত হয় কালাকানুন। যাঁতাকলে পিষ্ট হয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিক। এই কালাকানুনের বাইরেও আরও কিছু থাকে। বেশি তেড়িবেড়ি করলে বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে ডিক্লারেশন। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে গণতন্ত্র যখন এলো, তখনও কিন্তু ঐ কালাকানুন বাতিল হলো না। যদিও বর্তমান সরকার এটি অনুগ্রহ করে ব্যবহার করছেন না, কিন্তু খড়গটি তো আছে ঝোলানো!

পাকিস্তান আমলে, '৬৫ সালে প্রেস এ্যাডভাইস শুরু হয়। কিন্তু সাংবাদিকগণ নানা কৌশলে ঐ কৃষ্ণ নিয়মটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। আমার জানা মতে, তারও অনেক আগে, চল্লিশের দশকে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' সর্বপ্রথম কৌশল-প্রতিবাদের আশ্রয় নেয়। একটি সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না—এই সরকারি আদেশ পেয়ে পত্রিকাটি 'যে খবর ছাপা গেল না' এই শিরোনাম দিয়ে জায়গা ফাঁকা রাখে। প্রতিবাদের অক্ষর-শব্দহীন ভাষা সেসময় পাঠক মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

৬০-এর দশকে এই প্রতিবাদ নানাভাবে হতে থাকে। তবে তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভারে কে.জি. মুস্তাফা ভাই ও এ.বি.এম. মুসা ভাই যৌথভাবে যা ঘটিয়েছিলেন তা গল্পের মতো এখনও সাংবাদিক মহলে চালু। ব্যাপারটি হয়েছিল কী, সরকার থেকে একটি অর্ডার এলো, একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা স্টাফ আইটেম হিসেবে ছাপা যাবে না, ছাপা হবে শুধু প্রেসনোট। তা ঐ সাংবাদিকদ্বয় করলেন কী, চিঠির উপরের দফতরের নাম, মেমো নম্বর থেকে শুরু করে নিচে টাইপিস্টের নাম পর্যন্ত পুরোটাই হুবহু ছাপিয়ে দিলেন। বোদ্ধা পাঠক যা বুঝবার বুঝেই নিলেন, হাড়ে হাড়ে বুঝলেন সরকার। তারা সঙ্গে সঙ্গে আরেক হুকুম হাঁকলেন, এখন থেকে অর্ডারটি পুরো ছাপা যাবে না, ছাপতে হবে শুধু Text টি।

মার্শাল ল'র সময়ে এইধরনের অর্ডার ছিল যে, যে-কোনো কর্তা (Any officer) টেলিফোনে খবর প্রকাশ বা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে পত্রিকাকে অ্যাডভাইস দিতে পারবেন। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশেও এমন ঘটনা ঘটেছে যে, রাতের বেলা পত্রিকার 'ডামি' নিয়ে সচিবালয়ে ছুটতে হতো পত্রিকার লোকজনকে। আর সেসব বার্তা দেখে দিতেন সহকারী সচিব পদমর্যাদার কেউ কেউ।

পাকিস্তান আমলে মার্শাল ল' উঠে যাবার পর আরও ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে লাগল। এসময় 'নিউজ ব্যান অর্ডার' শুরু হলো সাংবাদিক ও তাঁদের সত্য লেখনী ঠেকানোর জন্যে। কিন্তু অর্ডার যারা হাঁকেন, সাংবাদিকরা তাদের চেয়েও চালাক।

'৬৪ সালের ঘটনা। কার্জন হলের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোনেম-খানি কনভোকেশন। ছাত্র-জনতা ভাঙচুর করলেন প্যান্ডেল। নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন (মরহুম) শেখ ফজলুল হক মণি। ভাঙচুরের বেশকিছু ছবি তুললেন অবজারভারের আলোকচিত্রী মোজম্মেল হক ভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনার ওপর খবর লেখা হলো। ছবি প্রসেস হলো। কিন্তু রাতের বেলা পত্রিকার ওপর মহল থেকে শিফট ইনচার্জকে (বার্তা সম্পাদক সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন) বলা হলো : ভাঙচুর ঘটনার খবরটি যেন হোম-সেক্রেটারিকে দেখিয়ে আনা হয়। শিফট ইনচার্জ বললেন, 'হোম সেক্রেটারি আমার এডিটর নয়, রিপোর্টটি দেখালে আপনাকে দেখাতে পারি।' ওপর মহল থেকে বলা হলো : 'ঠিক আছে তাই করুন।'

রিপোর্টটি পত্রিকার ওপর মহলে জমা দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর শিফট ইনচার্জ জানতে পারলেন, না এ রিপোর্ট ছাপা যাবে না। ছাপা হবে শুধু সরকারি প্রেসনোট।

'ঠিক আছে, তাই হবে।' বললেন শিফট ইনচার্জ সাহেব।

এবং পরদিন, সবারই চক্ষু চড়কগাছ! স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদনটি ছাপা হয় নি, বদলে দর্শনীয়ভাবে ছাপা হয়েছে সরকারি ভার্সন অর্থাৎ ঐ প্রেসনোট। কিন্তু তারই পাশে মোজাম্মেল হকের তোলা বড় সাইজের কয়েকটি ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কনভোকেশন ভণ্ডুলের বিভিন্ন দৃশ্য। পাঠকরা গোটা ব্যাপারটি বুঝে নিলেন। কিন্তু ওপর মহল হলেন ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ সরকারি মহল। কিন্তু করার আর কী আছে! ওপর মহল তো রিপোর্ট ছাপতে মানা করেছেন, কিন্তু ছবি ছাপা যাবে না এমন নির্দেশ তো ছিল না!

এরকম আরও বহু ঘটনা রয়েছে। অবজারভার তার একটি খবরে হামিদুল হক চৌধুরীকে 'হরিবল হক চৌধুরী' লিখে যেমন সংবাদপত্রে ভুলের রেকর্ড সৃষ্টি করে রেখেছে, তেমনি আবার নানা ঝুঁকি নিয়ে শরিক হয়েছে গণআন্দোলনে। এ. বি. এম. মুসা ভাই সেই আন্দোলনের অনেক সৈনিকের একজন। ... তিনি ছিলেন দূরদর্শী, অনেক ব্যাপার আগে থাকতেই আঁচ করতেন। 'সন্ধ্যার পর বিশেষ ঘটনার ওপর প্রতিবেদন ও ছবি প্রকাশে সরকারি নিষেধাজ্ঞা আসবে' এটা অনুমান করতে পেরে দুপুরের মধ্যেই পত্রিকার টেলিগ্রাম সংখ্যা বের করে দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনাও রয়েছে। 'ব্যান অর্ডার' আসবার আগে প্রকৃত ঘটনা অন্তত জেনে নিক কিছু পাঠক!

পরবর্তী সময়ে, সাংবাদিকগণ নানাভাবে স্বৈরাচারী সরকারের কালো আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হন। বিশেষ ঘটনার খবর ছাপতে না দেওয়ায় পত্রিকার প্রথম পাতায় মোটা বর্ডার দিয়ে বক্স সাজিয়ে কলাম ফাঁকা রাখা হয়। সেই স্টাইলটি দৈনিক জনতা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। ঐ পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধের প্রতিবাদে তাদের ছিল এই ব্যবস্থা। তবে, জায়গা (স্পেস) ফাঁকা রেখে ভীষণরকম বক্তব্য প্রকাশের মতো সাড়া জাগানো একটি ঘটনা ঘটিয়েছে নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত 'আজকের কাগজ।' '৯১-এর ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'তুই রাজাকার' শিরোনামে ঐ দৈনিকটি যে কার্টুন ছাপে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ঐ কার্টুনে কারও মুখের আদল আঁকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না, শুধু ছিল সিঙ্গেল কলম × দেড় ইঞ্চি একটি ফাঁকা বক্স। নিচে লেখা, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস আছে, আমরা আপনারা মিলে চারপাশের সকল প্রতিষ্ঠিত, মুখচোরা রাজাকারদের সনাক্ত করে একদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবোই।'

এর নিচে একটি ছড়া :

'ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না
বলা যাবে না কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার
এমন স্বাধীনতা'

বিখ্যাত এই ছড়াটি সাংবাদিক আবু সালেহ'র লেখা (কিন্তু 'আজকের কাগজে' তার উল্লেখ ছিল না)। তবু, আমার মনে হয়, কার্টুন-সাংবাদিকতায় এটি একটি বিরাট এবং সাহসী ঘটনা। বক্সে কারও মুখের আদল না থাকলেও পাঠকগণ বুঝে নিয়েছেন এখানে কার কথা বলা হয়েছে।

'আজকের কাগজ' '৯১-এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকে 'তুই রাজাকার' শিরোনামে ঐ সিরিজ কার্টুনটি ছাপানো শুরু করে এবং ১৬ ডিসেম্বর তা শেষ হয়। কার্টুন এঁকেছিলেন প্রখ্যাত রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য। স্পেস ফাঁকা রেখে বক্তব্য প্রকাশের যে ভঙ্গিটি বহুবছর আগে সংবাদপত্রে শুরু হয়, শিশির ভট্টাচার্য তাঁর একটি কার্টুনের মাধ্যমে তা আরও পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্টভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

সরকারের চাপিয়ে দেওয়া যে সেন্সরশীপ, তা নাহয় কৌশলে এড়ানো যায়, প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু সেলফ-সেন্সরশীপের ব্যাপারটি নিয়ে কী করবেন? ... সরকারের কোনো নির্দেশ নেই, প্রেস অ্যাডভাইস নেই, তবু খবর কিংবা ছবি 'ব্লাকআউট' হয়ে যায়। এক শ্রেণীর মালিক-সম্পাদক আছেন যাঁরা বিশেষ মহলকে খুশি করবার জন্যে এমনটি অতীতে করেছেন, এখনও করে চলেছেন। তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব দুঃখ হয়, যখন দেখি কোনো পত্রিকার মালিক বা সম্পাদক সাহেবের অজ্ঞাতে একজন বার্তা সম্পাদক সাহেব এই অপকর্মটি করেছেন। কোনো ক্ষেত্রে এটা হয়ে দাঁড়ায় তৈলমর্দনের ব্যাপার, কখনো থাকে তাঁর খেয়ালখুশি, কখনো আবার নিরেট আহাম্মুকি করে বসেন। সরকারপক্ষে কোনো বাধা নেই, মালিক জানেন না, জানেন না সম্পাদক সাহেব, কিন্তু নির্মমভাবে হত্যা (Kill) করা হয় খবর বা ছবি। আমার হাতে বেশ কয়েকটি প্রমাণ রয়েছে যে, কেবল ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল হিসেবে একজন বার্তা সম্পাদক এক প্রতিবেদকের একাধিক প্রতিবেদন 'কিল' করেছেন কিংবা খুব 'পুওর ডিসপ্লে' দিয়েছেন। 'এসব কিস্‌সু হয়নি' বলে স্টোরি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এমন ঘটনাও আছে যে, ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণে একজন প্রতিবেদকের লেখা বহু প্রতিবেদন একটানা ৬ মাস ধরে ঐ পত্রিকার প্রথম পাতায় ঠাঁই দেওয়া হয়নি, ছাপানো হয়েছে ছোট্ট শিরোনামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরের পাতায়। আমি সেই প্রতিবেদনের 'কাটিংস' ফাইলে রেখে দিয়েছি। কেউ ইচ্ছে করলে পাঠকদের পছন্দসই দেশের সেরা ৫ জন সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেখা যেতে পারে : ঐ প্রতিবেদনগুলো প্রকৃতপক্ষে ভেতরে ছাপার মতো ছিল, নাকি প্রথম পাতায় তা ভালো 'ডিসপ্লে' হতে পারত!

সেলফ-সেন্সরশীপের বহু ঘটনা রয়েছে। এখানে একটিমাত্র তুলে ধরতে চাই।

'৯১ সালে উত্তরাঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ হলো, তার ওপর রিপোর্ট লেখার জন্যে বাংলাদেশে বিবিসির সংবাদদাতা আতাউস সামাদ গেলেন রংপুরের একটি দুর্গত এলাকায়। সঙ্গে ছিলেন একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিনিধি। ঐ প্রতিনিধির ইচ্ছে হলো সাধারণ রিপোর্টের পাশাপাশি আতাউস সামাদের সফর এবং দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার ওপর একটি স্টোরি লিখবেন।

আতাউস সামাদ সাহেব যখন অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর সাথে কথা বলছেন, টেপ রেকর্ডার চলছে, তখন এক প্রশ্নের জবাবে অনাহারী একজন এই মর্মে বলে উঠল, 'কি আর কমো বাহে, ম্যালা দিন থাকি মাও লক্ষী হামার প্যাটোত্ যায় না।' অর্থাৎ সে বলছে, কী আর বলব বাপু আপনাকে, অনেকদিন থেকে মা-লক্ষী আমাদের পেটে যাচ্ছে না। এই 'মা-লক্ষী' মানে হলো ভাত। রংপুরের গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভাতকে মা-লক্ষী বলে থাকে।

তা এই মা লক্ষী কথাটা শুনে আতাউস সামাদ সাহেব প্রথমে সঠিক ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, যার সাথে কথা বলছেন তার মেয়ের নাম বুঝি লক্ষী এবং সে হয়তো না খেয়ে আছে। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন : এই যে আপনি লক্ষীর কথা বলছেন, সে আপনার কে? কতদিন থেকে সে না খেয়ে আছে? সে কি কোনো রকম রিলিফ পায় নি?

আতাউস সামাদ সাহেবের সাথে যে সাংবাদিক, বাড়ি রংপুরে, আঞ্চলিক ভাষা বোঝেন, তিনি ধরে ফেললেন যে, বিবিসি প্রতিনিধি ঐ লোকটির কথার মানে বোঝেন নি। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন : 'সামাদ ভাই, আসলে লক্ষী মানে কারও নাম সে বলছে না। মা লক্ষী মানে সে ভাতকে বোঝাচ্ছে এবং বলছে অনেকদিন থেকে সে ভাত খায়নি।'

সামাদ ভাই এতক্ষণে বুঝলেন। বিস্ময়ে বললেন, 'ও, তাই নাকি! ভাতকে এখানে মা-লক্ষী বলা হয়?' তারপর, হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন আতাউস সামাদ, অনেকক্ষণ তার মুখে কথা নেই, স্বভাবসুলভ হাত ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'কী আশ্চর্য! এই উত্তর জনপদের মানুষ, ভাতকে যারা দেবতা জ্ঞান করে, লক্ষী বলে মানে, তারাই আজ উপবাসী! তাদের ঘরেই হা-অন্ন!'

পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আতাউস সামাদ সাহেবের এই বক্তব্যটি খুব হৃদয়স্পর্শী। প্রতিবেদক ভাবলেন, এই বক্তব্যের ওপরই হতে পারে একটি প্রতিবেদন। লিখে ফেললেন তিনি। পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন আতাউস সামাদ সাহেবের প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে লেখা প্রতিবেদনটি ছাপা হলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন দেখা গেল, আসল যে বক্তব্য (আতাউস সামাদের সংলাপ) তা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে!

কেন এমনটি করা হলো? বক্তব্যটি কি অপ্রাসঙ্গিক ছিল? ক্ষতিকর ছিল? ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন কিছু ছিল? সরকারপক্ষের প্রেস অ্যাডভাইস ছিল? মালিকের পলিসির বাইরে ছিল? সম্পাদক সাহেবের মানা ছিল?

না, এসব কিছুই ছিল না। তবু তা করা হয়েছে।

কেউ হয়তো বলবেন যে, এটা ঐ পত্রিকার নিজস্ব ব্যাপার। যেহেতু বার্তা সম্পাদনার দায়িত্বে একজন আছেন, সেহেতু কী ছাপা হবে আর কোন্‌টি বাদ দেওয়া হবে, সেটা তাঁর ব্যাপার। ঠিকই। এটা আমিও মানি। মাননীয় বার্তা সম্পাদক সাহেব যা ভালো মনে করেন, তা-ই করতে পারেন। তবু আমি এই ঘটনাটি এখানে উপস্থাপন করলাম শুধু এজন্যেই যে, পাঠক বিচার-বিবেচনা করে দেখুন, আতাউস সামাদ সাহেবের ঐ বক্তব্যটি বাদ দেওয়া সত্যি ঠিক হয়েছে কিনা!

লেখা কোন্‌টা যাবে আর কোন্‌টা নীতিগতভাবে বাদ দেওয়া দরকার, সে সম্পর্কেও নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার প্রায়শই চোখে পড়ে। যেমন ধরুন ঐ 'এনড্রিন' পান করে আত্মহত্যা করার খবরটির কথা। প্রায়শই বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়, 'এনড্রিন' পানে অমুকের আত্মহত্যা। তা বাপু, 'এনড্রিন' নামের যে কীটনাশক ওষুধটি, তার উৎপাদন তো বন্ধ হয়ে গেছে বহু বছর আগে! এখন সে কীটনাশক ওষুধ আত্মহননকারীরা পান কোত্থেকে? আসলে, তারা পান করেন বিভিন্ন নামের কীটনাশক ওষুধ, কিন্তু রিপোর্টে বেরোয় 'এনড্রিন' পানের। কেন এই ভুলটি হয়? ভুল হয় ঐ বার্তা পরিবেশক এবং পরবর্তীকালে ঐ বার্তা যিনি সম্পাদনা করেন, তাঁর অজ্ঞতার কারণে। সাংবাদিক যেমন জানেন না যে, 'এনড্রিন' এখন আর তৈরি হয় না, তেমনি জানেন না বার্তা সম্পাদনা বিভাগের অনেকে। আপনারা অবাক হবেন যে, এদেশের অনেক সংবাদপত্রে

'পাটক্ষেতে মাজরা পোকার আক্রমণ'

'বিএডিসি'র গুদামে কীটনাশক ওষুধের মজুত নেই'

'তাপমাত্রা এতই কমছে যে পানি ক্রমশ ঘন হয়ে যাচ্ছে'

এই শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। পাটগাছে মাজরা ধরে না, বিএডিসির গুদামে কীটনাশক ওষুধের মজুত থাকে না—এসব ব্যাপার কারও জানা না থাকতে পারে, কিন্তু তিনি খবর লিখতে বা খবরটি সম্পাদনা করতে পারেন কি? আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে একজন সাংবাদিক এবং তাঁর বার্তা সম্পাদক সাহেব জানেন না, পানি বরফ হবার আগে তার প্রক্রিয়াটি কি! পানি কি বরফ হবার আগে ঘন হয়?

অনেক খবর আছে, আসলেই যা এড়িয়ে যাওয়া নীতিগতভাবে প্রয়োজন, অনেকক্ষেত্রে তা হয় না। যেমন— একটি পত্রিকায় এইমর্মে একটি প্রতিবেদন ছাপা হলো : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গ্রামে একটি হিন্দু-পরিবার 'গুম' হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা কি আরেক নিদারাবাদের মতো ঘটনা! তাহলে তো চাঞ্চল্যকর বটে! এবং প্রথম পাতায় ছেপে দেওয়া হলো। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া হলো।

তা, আরেকটি জাতীয় দৈনিক, ঐ পত্রিকার প্রতিবেদনটি দেখে তাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতাকে দিলেন ধাতানি। অমুক কাগজে গুমের খবর ছাপা হয়েছে, আপনি সেটা পাঠাননি কেন? সাংবাদিকটি বললেন, 'ঐ পরিবারটি আদৌ গুম হয়নি। তারা ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। প্রকাশিত খবর সত্য নয়।' এই শুনে পত্রিকা থেকে বলা হলো : যদি তা-ই হয় তাহলে আপনি প্রকৃত ঘটনাটি পাঠান। আপনার হাতে যেসব ডকুমেন্ট আছে, ছবি-টবি আছে কি-না, সবই পাঠাবেন। খুব জরুরি।

নিজস্ব সংবাদদাতা বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে আমাকে দুতিনদিন সময় দিন।'

আসলেই নিজস্ব সংবাদদাতাটি জানতেন যে পরিবারটি গুম হয়নি, কেউ খুন হয়নি, তারা কাউকে না জানিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গেছে এবং সেখানকার একটি গ্রামে বসবাস করছে।

পরিবারটি গুম হয়নি, এটা প্রমাণ করা যাবে কী করে? সাংবাদিকটি ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে গেলেন। ঐ 'গুম' হয়ে যাওয়া পরিবার-সদস্যদের সাথে কথা বললেন, তাদের ছবি তুললেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে এসে বিস্তারিত প্রতিবেদন ও ছবি পাঠিয়ে দিলেন ঢাকায়। ছাপা হয়ে গেল এবং ঐদিনই ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিস থেকে পত্রিকার উচ্চপর্যায়ের একজনের কাছে এলো টেলিফোন। আপনার সাংবাদিক কী করে ইন্ডিয়ায় গেলেন? পাসপোর্ট করে গেছেন? ভিসা কে দিয়েছে? এইসব প্রশ্ন। কিন্তু কী জবাব দেবেন পত্রিকার কর্তাব্যক্তিটি? আর 'মফস্বল' বিভাগীয় বার্তা সম্পাদক, যিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন এবং পরে সত্য উদ্‌ঘাটনমূলক প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করে ছেপেছেন, তিনিই বা জবাব কী দেবেন? ... আসলে, খবরটি ছাপার সময় তা সংগ্রহের পদ্ধতিগত দিকটি দেখা হয়নি। একজন সাংবাদিক তো আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন সম্পর্কিত আইন-কানুনের উর্ধ্বে নন। তিনি চাইলেই হুট করে বিনা পাসপোর্টে অন্য দেশে চলে যেতে পারেন না।

অবশ্য, এই ঘটনাটিতে ঐ 'মফস্বল' বিভাগীয় সম্পাদকের যথেষ্ট 'জ্ঞানলাভ' হয়েছে। সেদিন আমার সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি খোলাখুলি স্বীকার করলেন যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতার সংগ্রহ করা প্রতিবেদন ও ছবি ছাপানো নীতিগতভাবে তাঁর উচিত হয় নি এবং এই 'শিক্ষা' পরবর্তীকালে তাঁর কাজেও লেগেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার পর বরগুনা থেকে তিনি এমন একটি প্রতিবেদন হাতে পান যা সংগ্রহ করার জন্যে বরগুনা সংবাদদাতা একইভাবে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা তিনি ছাপেননি।

ছাপেননি। তবে ঘটনাটি ছিল হৃদয়স্পর্শী। স্ত্রীকে দারুণভাবে নির্যাতন করবার পর বাংলাদেশ এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। গিয়েছিলেন সীমান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরিয়ে, ভারতে। এদিকে তার নামে থানায় এজাহার হয়েছে, নারী নির্যাতনের অভিযোগে আদালতে গেছে মামলা।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অভিযুক্ত ব্যক্তিটির পাত্তা নেই। তার 'উধাও' হয়ে যাবার খবর ডালপালা বিস্তারিত হলো, নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। এরই মধ্যে একদিন দেখা গেল, সেই বধূটি, যার ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল তার স্বামী, সেও লাপাত্তা! খোঁজ খোঁজ খোঁজ। পাওয়া গেল না কোথাও। এলাকার লোকজন ভাবল 'মহিলাটিকে গুম করা হয়েছে।' কেউ বললেন 'তাকে খুনই করে ফেলা হয়েছে।'

কিন্তু না। এসব কিছুই হয়নি। দিনকতক বাদে সংবাদ এসে পৌঁছুল : ঐ বধূটি কাউকে না জানিয়ে চলে গেছে ইন্ডিয়ায় এবং তার ঐ স্বামীর সাথে মিলিত হয়ে সেখানকার এক গ্রামে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে!

তা ঐ সাংবাদিক 'দম্পতিটি বহাল তবিয়তে আছেন' এই খবরটি সংগ্রহের জন্যে বিনা পাসপোর্টে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। শুধু তাদের কাহিনী-তথ্যই আনেননি, তুলে এনেছেন পাশাপাশি বসে থাকা হাস্যোজ্জ্বল ঐ দম্পতির ছবিও।

কিন্তু ছাপা হলো না। সীমান্ত অতিক্রম করবার মতো বৈধতার প্রশ্নে মফস্বল বার্তা সম্পাদক ঐ সচিত্র প্রতিবেদনটি 'কিল' করলেন।

AMARBOI.COM

আমার নিজের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল একবার। বৈধ-অবৈধতার ব্যাপারটি তখন মাথাতেই আসেনি, চলে গিয়েছিলাম ভারতীয় এলাকায়।

ঘটনাটি এরকম : একবার গিয়েছি দেশের সর্বউত্তর সীমান্তে। পঞ্চগড় থেকে তেঁতুলিয়ার দিকে যাচ্ছি। দেখি, যাবার পথে হাতের বাঁয়ে খাটো-পাকা সীমান্ত খুঁটি পোঁতা। সহযাত্রী বললেন, 'ঐ খুঁটির ওপাশ থেকে ইন্ডিয়ান এলাকা!'

: তাই নাকি!

মোটরসাইকেল থামিয়ে নেমে পড়লাম আমরা দুজন। বললাম, চলেন, জায়গাটা ভালো করে দেখি। না, জায়গাটা দেখার উদ্দেশ্য শুধু ছিল না, ছিল প্রস্রাবের বেগ। জায়গাটা বেশ ফাঁকা, ধারে-কাছে ঘরবাড়ি গাছপালা নেই। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দুজনে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে লাগলাম।

প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে সহযাত্রী বললেন, দেখেছেন, ঐ যে কী দেখা যায়?

: কী?

দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। আশ্চর্য! ব্যাপারটি এতক্ষণ নজরে আসেনি! খুব জোর মাইল আধেক দূরে দেখা যাচ্ছে বিশাল এক চা-বাগান। ঢালুমতো জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চা-গাছ। 'শেড ট্রি'গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি পেয়ে গেলাম খবরের গন্ধ। আরে! বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আধমাইল দূরে যদি এত চমৎকার ও বিরাট চা-বাগান গড়ে উঠতে পারে, তাহলে এখানে, এই বাংলাদেশের মাটিতে চা উৎপন্ন হবে না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই হবে! মাটি একই রকম! ভারতীয় এলাকার মতো বাংলাদেশের এ এলাকাটাও ঢালু! ভাবলাম 'পঞ্চগড়ে চা উৎপন্নের সম্ভাবনা' এধরনের একটি প্রতিবেদন নিশ্চয়ই লেখা যাবে।

তথ্য-উপাত্ত পরে সংগ্রহ করা যাবে, ঢাকায় গিয়ে কথা বলা যাবে চা-শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে। আগে তো 'ডকুমেন্ট' হিসেবে ঐ চা-বাগানের একটা ছবি তুলি! ভাবা মাত্রই কাজ শুরু। সীমান্ত খুঁটি পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা দুজন।

ফাঁকা জায়গা। চষা জমি। আশপাশে বিডিআর চেকপোস্ট নেই, চোখে পড়ে না বিএসএফ ফাঁড়ি। বাগানের কাছাকাছি গেলাম, ক্যামেরা বের করে পটাস্ পটাস্ ছবি তুললাম কয়েকটি। আমি ভাবছি, এই ছবিটি ছাপিয়ে দিয়ে বেশ একটা প্রশ্নবোধাত্মক প্রতিবেদন লেখা যাবে : 'পঞ্চগড় সীমান্ত এলাকায় চা আবাদের সম্ভাবনা আছে কি?' রিপোর্টটি দেওয়া যেতে পারে আমাদের অর্থনীতির পাতাতেও।

ভারতভূমিতে গিয়ে ছবি তুলে ফিরে এলাম এবং আরও পরে ঢাকায় ফিরে লিখলাম প্রতিবেদনটি।

কিন্তু, ছবি প্রসেস করতে গিয়ে দেখি, সব বরবাদ। ফিল্মটি, ঠাকুরগাঁও থেকে কেনা সাধারণ রিফিল, ব্যবহারের মেয়াদ-তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ফলে সব ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে!

ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নইলে 'সংবাদে' তা হয়তো ছাপা হতো এবং সেটা হতো রাষ্ট্রীয়ভাবে বেআইনি এবং অবৈধভাবে তোলা একটি ছবি।

AMARBOI.COM

ভুল তো হয়। নানাভাবে। তবে মূলত অজ্ঞতা থেকে। আছে এক শ্রেণীর স্বার্থপর সোর্সকে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করে ফেলার ব্যাপার। আছে তথ্যশূন্যতার বিষয়টি। কর্তৃপক্ষ, যাঁর বা যাঁদের কাছে খবরের সত্যতা যাচাই করা যায়, তিনি অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করেন। কিংবা কখনো আবার মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন। এতে তথ্য-বিকৃতি ঘটে থাকে, গুজবের ডালপালা বিস্তারিত হয়। বিশেষ করে এক শ্রেণীর থানা-পুলিশকর্তা কিংবা হাসপাতালের ডাক্তার সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতা ধসিয়ে দেন। এর পেছনে কাজ করে অর্থ-স্বার্থ, কখনো অজ্ঞতা-বোকামি। যেমনটি ঘটেছিল গতবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের সময়। পত্রিকার প্রথম পাতায় মোটা বক্স টেনে ছাপা হলো : অমুক দল পরাজিত হয়ে গেছে বলে দক্ষিণ অঞ্চলের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু দুদিন বাদে জানা গেল, ঐ খবরটি ছিল ডাহা মিথ্যা। আত্মহত্যার ঘটনা নয়, মহিলাটিকে হত্যা করা হয়েছে।

তা, সাংবাদিকটি আত্মহত্যার খবর পেয়েছিলেন কোথায়? থানা থেকে দেওয়া হয়েছিল। ... কিন্তু, সাংবাদিকটি যদি একটুখানি অপেক্ষা করতেন, নিজে ঘটনা-এলাকায় গিয়ে তা যাচাই করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই 'ফেভরিকেটেড' খবরটি ছাপা হতো না, পাঠকও বিভ্রান্ত হতেন না।

আসলে, 'স্কুপ' কিছু একটা মেরে দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টির প্রবণতা অনেকেরই রয়েছে। যেমনটি হয়েছিল আমার ঐ 'দাড়িতে মৌচাক' প্রতিবেদনটির বেলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ খবর হলে পাঠক-প্রতিক্রিয়া তেমন হয় না। যেমন, অমুক জেলার অমুক গ্রামে ছাগলের বাচ্চা হয়েছে ৮ পা-বিশিষ্ট। এ খবর ছাপা হলে লোকে পড়েন, মজা পান, কিন্তু পরে যদি দেখা যায় যে খবরটি ছিল নিতান্তই বানোয়াট, তাহলে তা শুধু সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন সামনে তুলে আনে। কিন্তু এমন খবরও মাঝে-মধ্যে ছাপা হয় যা দেশব্যাপী বিরাট এক আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তারপর, কদিন বাদে একদিন, প্রকৃত ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে পড়লে, পাঠক হাঁফ ছাড়েন বটে, কিন্তু সেই সাথে বিরক্ত হয়ে উঠেন গোটা পাঠকসমাজ। বলেন, 'দুর! সাংবাদিকরা কীসব আবোল-তাবোল লেখেন!'

এ প্রসঙ্গে '৯০-এর মাঝামাঝি সময়ে 'ঢোলকলমী পোকার আতঙ্ক' বিষয়ক প্রতিবেদনগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়। পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে ঢোলকলমী পোকা নিয়ে দেশব্যাপী কী রকম প্যানিক সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রতিদিন ছাপা হতে থাকে মৃত্যু, আক্রান্ত এবং পোকার আক্রমণ বিস্তারের খবর। এক পর্যায়ে ঢোলকলমীর 'আক্রমণ' ইট সিমেন্ট লোহা কাঠ ঘেরা রাজধানীতেও এসে পড়ে।

সর্বপ্রথম পিরোজপুর থেকে 'ঢোলকলমী পোকার আতঙ্ক' সম্পর্কিত খবর ছাপা হয় ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে, ৫-এর পাতায়। সময়টি ছিল '৯০-এর জুন মাসের শেষদিক।

AMARBOI.COM

১১ জুলাই ঢোলকলমী পোকার আক্রমণে ৪ জনের মৃত্যু ও ২৪ জন অসুস্থ হবার খবর দেয় একটি জাতীয় দৈনিক।

১২ জুলাই একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক তার প্রথম পাতায় দর্শনীয় স্থানে 'ঢোলকলমী পোকার আক্রমণে আহত ২২ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন' এই খবরটি প্রকাশ করে।

একই তারিখে আরেকটি জনপ্রিয় দৈনিকে 'আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ঢোলকলমী এখন রাজধানীতে' এই সংবাদ পরিবেশন করে। এতে রাজধানীতে ৮ জনের মৃত্যু ও ৫শ জন আহত হবার খবর দেয়।

সরকার ভর্তুকি দেয় এমন একটি দৈনিক একই দিনে 'ঢোলকলমীর আক্রমণে ৩০ জনের প্রাণহানি, শত শত লোক হাসপাতালে' এই খবর পরিবেশন করে ফার্স্ট লিড আইটেম হিসেবে।

অন্যান্য পত্রিকা (সবগুলো নয়) ঢোলকলমী পোকার আক্রমণ ও মৃত্যুসংবাদ নিয়ে একই রকম 'কর্ম' শুরু করে দেয়। ঢোলকলমী পোকা, পোকার ডিম ইত্যাদির ছবি ছাপা হয় কয়েকটি পত্রিকায়। আঞ্চলিক ও জেলা শহরের স্থানীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিদিন গরম গরম খবর আর হিট ছবি ছাপতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, রচনা প্রকাশিত হয় কয়েকটি সাপ্তাহিকীতে। সে সময়ে আমি ঢাকায় ছিলাম। চায়ের দোকান থেকে সচিবালয়, সেলুন থেকে অভিজাত এলাকার বাসাবাড়ির ড্রইংরুম, সবখানে ঐ ঢোলকলমী নিয়ে আলোচনা। গ্রামে গ্রামে ঢোলকলমীর গাছ নিধন করার খবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে থাকে, শহরে গুজবের ডালপালা এমনভাবে বিস্তারিত হতে থাকে যে গাঁজাখোরও বুঝি হয় পরাস্ত!

শেষ পর্যন্ত ঢোলকলমী পোকার হাত থেকে গোটা দেশের মানুষকে রক্ষা করেন কয়েকজন কীটতত্ত্ববিদ। ১২ জুলাই যে বহুল প্রচারিত দৈনিকটি পোকার আক্রমণ-আক্রান্ত ও 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২২ জন চিকিৎসাধীন' সম্পর্কিত খবর পরিবেশন করেছিল, সেই দৈনিকটিই পরদিন অর্থাৎ ১৩ জুলাই বড় শিরোনাম দিয়ে খবর ছাপে : 'ঢোলকলমী পোকার বিষ : আতঙ্কের কিছু নাই।'

প্রকৃতপক্ষেই আতঙ্কের কিছু ছিল না। কেননা, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদগণ বলেন, 'পোকাটি নির্দোষ।' ঐ পত্রিকার প্রতিবেদনে কীটতত্ত্ববিদগণের ভাষ্য উদ্ধৃত করে লেখা হয়, 'ঢোলকলমী পোকার ছোঁয়ায় লক্ষ বা হাজারে একজন মরিলেও মরিতে পারে, কিন্তু এখন যাহা প্রচারিত হইতেছে তাহ স্রেফ আতঙ্কজনিত মৃত্যু, না হয় নির্ভেজাল গুজব।'

'ঢোলকলমী পোকার বিষে আতঙ্কিত হবার মতো কিছু নেই' এই বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি প্রামাণ্যধর্মী অনুষ্ঠান প্রচার করে। এরপর, অধিকাংশ পত্রপত্রিকা 'টোন ডাউন' করে ফেলে। ঢোলকলমীর আতঙ্ক ১৫/১৬ জুলাইয়ের মধ্যে ম্লান হয়ে আসে। পত্রিকার বোদ্ধা পাঠক এ সময় এইমর্মে বলতে থাকেন, 'তা ঐ কীটতত্ত্ববিদের ভাষ্য প্রথমদিকেই নিতে পারতেন সাংবাদিকেরা। তাহলে তো এতটা গোল পাকাত না!'

AMARBOI.COM

'ঢোলকলমী পোকার আতঙ্ক' বিষয়ে লেখাটি এ বইয়ের জন্যে কম্পোজে দেওয়ার আগে এক সহকর্মীকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলাম। বললাম, 'বানানগুলো একটু কারেকশান করে দিন।'

তিনি যথেষ্ট সাহায্য করলেন, কিন্তু লেখাটির বিষয়ের ওপর আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এক. নিজের সংবাদ-নেপথ্য লিখতে বসে ঢোলকলমী পোকার আতঙ্ক টেনে আনলাম কেন? দুই. তিনি বললেন, আপনি তো নিজেও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী খবর-টবর লিখে থাকেন, তা নিজের কথা না বলে শুধু অন্যের দোষটি ধরেন কেন?

সহকর্মীটিকে প্রথম প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। তাকে শুধু জানিয়ে দিলাম যে, এ ব্যাপারে আমি শুরুতেই 'আমার কথা' বলেছি। তবে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তিনি পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলেন, 'জামালপুরের গ্রামে চালের সের ২০ টাকা' এই খবরটি লিখে কি আপনি আতঙ্ক সৃষ্টি করেন নি?

সহকর্মীটি তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা ভেবেছেন এবং আমাকে প্রশ্ন করেছেন তা আরও অনেকেরই বক্তব্য ছিল। '৮৯-এর এপ্রিলে 'সংবাদে' জামালপুরে চালের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি যখন (দ্রষ্টব্য : পথ থেকে পথে : তিতপল্লার অ্যাসাইনমেন্ট) প্রকাশিত হয়, তখন বহু পাঠক যেমন তা অভিনন্দিত করেছেন, তেমনি আবার আরেক শ্রেণীর পাঠকের গালমন্দ কম শুনতে হয়নি। তা সাধারণ পাঠকের কথা কেন, একাধিক সাংবাদিক-বন্ধুর মুখেও ঝাল ছিল। একজন বেশে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেকআপে ভদ্র, কথাবার্তায় উচ্চকণ্ঠ ও প্রগতিবাদী, অত্যন্ত ঝাঁঝমেশানো কণ্ঠে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, চালের দর ২০ টাকা এই খবরটা দিলেন ক্যান মোনাজাত? আপনি কি আহাম্মক নাকি? বোঝেন না যে জামালপুরের এই খবর পড়ে ঢাকার চাল ব্যবসায়ীরা চালের দর বাড়িয়ে দেবে? তারপর উষ্মার সাথে বললেন, এটা একটা মারাত্মক প্যানিক সৃষ্টিকারী খবর। আমি নিউজ এডিটর হলে কিন্তু ঐ খবর ছাপতাম না!'

শুধু তাই কেন, জামালপুরের ২০ টাকা চালের দরের খবরটি যখন ছাপা হলো, তখন এক বড়কর্তা ফোন করলেন রিলিফ মিনিস্ট্রি থেকে। তিনি কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আপনারা যা ইচ্ছা তাই লিখবেন? বোঝেন না যে এতে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে? তার চেয়ে তো ২০ টাকা চালের সেরের খবরটা টেলিফোনে আমাদের জানাতে পারতেন! আমি রিলিফ-টিলিফ দিয়ে সিচ্যুয়েশন কন্ট্রোল করে ফেলতাম!'

আমি অবশ্য সেসময় কোনো জবাব দেইনি। শুধু বলেছি, জনাব, আপনি অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে আমাদের সম্পাদক কিংবা বার্তা সম্পাদক সাহেবের সাথে কথা বলুন। আমি সংবাদের এক রিপোর্টার মাত্র, কিন্তু মুখপাত্র নই। এই শুনে তিনি খটাস্ করে টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন। আমার খুব রাগ হয়েছিল, মনে মনে বলেছিলাম সাংবাদিকতা ছেড়ে এখন রিলিফ মিনিস্ট্রির চাকরি করি! জামালপুরের ডি.সি. ঘুমাচ্ছেন, ফুড অফিসার নাকে তেল দিয়ে আছেন, রিলিফ অফিসার চোখে-কানে ঠুলি-তুলো এঁটে আছেন, আর আমি খবর লেখা বাদ দিয়ে ত্রাণমন্ত্রী আর সচিবের ইনফর্মারের কাজ করি! বদমাশ কোথাকার!

তা টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর নাহয় গায়ের জ্বালা মেটানো যায় মনে মনে, কিংবা প্রকাশ্যে নানা কথা বলে। কিন্তু ঐ যে আমার জাত-কর্মীটি, তাঁকে কী জবাব দিই? তিনি তো আমার কাছাকাছি! একেবারে সামনাসামনি!

না। তাঁকেও তক্ষুনি কিছু বলিনি। শুধু দু'তিনদিন ধরে খানিক বাদে বাদে ফোন করেছি ঢাকার চালের আড়তে। জামালপুরের দর-প্রতিক্রিয়ার ঢেউ ঢাকায় লাগল নাকি? পত্রিকায় খবর পড়ে দর বাড়িয়ে দিয়েছেন কি চাল ব্যবসায়ী মহাজন-আড়তদার? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমার মুখ রক্ষা করেছেন। ঢাকায় শুধু নয়, জামালপুরের খবরের রিঅ্যাকশনে দেশের অন্য কোথাও দর বাড়েনি। সপ্তাহখানেক পর, পরিস্থিতি যখন মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এলো, আমার সাংবাদিক-বন্ধুটিকে বললাম, কই, আপনি তো বলেছিলেন, প্যানিক সৃষ্টি হয়ে যাবে! ঢাকায় চালের দর বেড়ে যাবে! কিন্তু গেল না তো? আপনার ঢাকার চালের মহাজন-আড়তদাররা কেউ 'সংবাদ' পড়েন না?

তিনি কিছু বলেননি, তা নয়। বলেছেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। আমার প্রশ্নের জবাবে রাগী বিড়ালের মতো কিছুক্ষণ গোঁ গোঁ করেছিলেন তিনি, মুখে বিড়বিড় করা পাগলের মতো বলেছিলেন কিছু। এটুকু শুধু কানে গিয়েছিল, 'স্টুপিড!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পর্বটি শেষ করবার আগে এটুকু বলতে চাই যে, ঐ আতঙ্ক, বিশেষ করে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এসে যে রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, সেটি ব্যক্তি, সমাজ, বিষয়, পরিবেশ পরিস্থিতি-নির্ভর। কেননা 'জামালপুরের গ্রামে চালের সের ২০ টাকা' এই খবরটি 'সংবাদে' প্রকাশের ফলে দেশের আর সব এলাকায় দাম বাড়েনি। ৩ জন মন্ত্রী জামালপুর ছুটে গিয়ে 'খাদ্যাভাব নেই', 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে' এসব কথাবার্তা বললেও ৩ দিনের মাথায় সরকার শুধু জামালপুরে নয়, গোটা দেশের বিভিন্ন অতিঅভাবী জেলা-উপজেলা এলাকার জন্যে ৫০ লাখ মণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছিলেন। জামালপুরের তিতপল্লায় প্রচুর সাহায্য গিয়েছিল, খোলাবাজারে চাল বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছিল জামালপুরে, ময়মনসিংহে।

আসলে সমাজ ও দেশের জন্যে ক্ষতিকর খবর সেটাই যা শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করে, সাংবাদিকের টেবিলে মানুষ মরে ঢোলকলমী পোকার আক্রমণে। কিন্তু বিশেষ কোনো খবরে বৃহৎ জনগোষ্ঠী যদি উপকৃত হয়, তাহলে সাধারণভাবে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে আতঙ্ক মনে হলেও তা নিশ্চয়ই প্রকাশযোগ্য সংবাদ। কিন্তু আধুনিক সাংবাদিকতার যুগেও চলনে-বলনে আধুনিক যাঁরা, কিন্তু মনের গভীরে পুরাতন-ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁরা ঐ সাংবাদিক-বন্ধুর মতোই বলবেন, 'এটা একটা মারাত্মক প্যানিক সৃষ্টিকারী খবর! আমি নিউজ এডিটর হলে ঐ খবর ছাপতাম না!'

আসলে আমাদের এক শ্রেণীর সাংবাদিকের দশা হয়েছে ঠিক আমার মতো। তাঁরা পড়েন কম, চিন্তা করেন কম, কিন্তু বোঝেন বেশি, বকেন আরও বেশি!

'মানুষজন চট ও কাঁথা পরে আছে'

বাইরে প্রচণ্ড রোদ। কামরার ভেতর গান হচ্ছে 'আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সাথে কইবো কথা নাইবা তুমি এলে।' এই রকম বৈপরীত্যের ভেতর প্রায় গরুগাড়ির গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ রেলওয়ের আন্তঃনগর তিস্তা এক্সপ্রেস।

'৮৭ সালের ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার। রংপুরের বদরগঞ্জ থেকে তোলা কিছু ছবি নিয়ে চলেছি ঢাকার দিকে। অনিবার্য কারণবশত ট্রেনখানা তিন ঘণ্টা লেট, তার ওপর গত কদিনের টানা বৃষ্টিতে রেললাইনের দুধারে মাটি ধসে গেছে, খুব ধীরগতিতে চালাতে হচ্ছে ট্রেনখানা। একটু আগে কন্ডাক্টর গার্ড আর ড্রাইভার দুজনের সাথে কথা বলে এসেছি, তাঁরা জানালেন রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কমলাপুরে পৌঁছানো যাবে হয়তো, অবশ্য যদি যমুনা পেরুতে কোনো সমস্যা না হয়। মনের ভেতর উত্তেজনা কাজ করছে। আল্লা আল্লা করে বারোটার মধ্যে সংবাদে পৌঁছুতে পারলেও চাঞ্চল্যকর একটি চিত্র-সংবাদ কালকের কাগজের পাঠকরা পড়তে পারবেন। আর অভিজ্ঞতা থেকেই কল্পনা করতে পারি, এই ছবি আর প্রতিবেদন প্রথম পাতায় কি রকম গুরুত্বের সাথে ছাপা হবে, এই ছবি কিভাবে সরকারি মহলে কাঁপুনি ধরাবে, এই ছবি আর প্রতিবেদন পত্রিকার কাটতি বাড়িয়ে দেবে কয়েক হাজার। গতকাল রাতে, বদরগঞ্জ থেকে রংপুর শহরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে ফোন করেছিলাম সংবাদে, ছবির বিবরণ শুনেই মন্টুদা বলেছিলেন আমি যেন ছবি আর লেখা নিয়ে কালই ঢাকা চলে আসি। মন্টুদা মানে মরহুম মোজাম্মেল হোসেন মন্টু, মধ্য '৮৭-তে যদিও তিনি ছিলেন চীফ সাব-এডিটর, কিন্তু এন.এম. হারুন সাহেব পদত্যাগ করবার পর তিনিই অলিখিতভাবে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই সময়টিতে সম্পাদক আহমদুল কবির সাহেব নিজেও প্রতিদিন রাতে নিউজ ডেস্কে আসতেন, গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর চোখ বুলিয়ে নিতেন। রাত ১২টায় পল্টনের সংবাদ অফিসে পৌঁছে দেখি, কবির সাহেব বার্তা কক্ষে বসে আছেন। দিনের বেলাতেই মন্টুদা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, বিশেষ একটি ছবি আর রিপোর্ট নিয়ে আমি ঢাকা আসছি, সেজন্যে তাঁর এত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা। অফিসে ঢুকতেই কবির সাহেব বললেন, 'দেখি বাবা কী স্পেশাল ছবি এনেছ, দাও।' ছবি বের করে তাঁর সামনে দেই, স্টোরি দেই মন্টুদার হাতে। পাঁচ মিনিটের মাথায় স্টোরি কম্পোজের জন্যে চলে যায়, ছবি যায় ক্যামেরা সেকশনে, বাড়তি কপি ছাপানোর অর্ডার যায় ২৬৩ বংশালের প্রেসে। গভীর রাতে আমি যখন প্রীতম হোটেলের আরামের শয্যায় শরীর এলিয়ে দিয়েছি, তখন সংবাদের প্রথম পাতায় মেইন স্টোরি হিসেবে আমার ঐ ছবি-প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে হাজার হাজার। তিন কলামে বক্স আইটেম করা হয়েছে বদরগঞ্জের দুই দিনমজুর আবদুল্লাহ আর আবদুল আজিজের দুর্দশার কাহিনী। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ধসে পড়া মাটির ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন, তাদের পরনে ছেঁড়া চট। রিপোর্টে বলা হয়েছে : সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে খাদ্য সংকটের পাশাপশি বস্ত্রসংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। পুরুষ মানুষ লুঙ্গির বদলে চট, আর মেয়েরা ছেঁড়া কাঁথা পরছে। কেউ শুধু সায়া পরে আছে। তারপর গ্রামটির দুর্দশার বিস্তারিত বিবরণ। রংপুরের একটি উপজেলা বদরগঞ্জ, তারই শঙ্করপুর-বেলপাড়া গ্রাম থেকে ছবিটি তোলা। তৎকালীন সরকার যখন প্রচার-মাধ্যমে গলা ফাটাচ্ছিলেন যে, কোথাও কোনো সমস্যা-সংকট নেই, সব কুছ ঠিক হ্যায়, তখন 'সংবাদ'ই প্রথম প্রকাশ করল দুর্গত এলাকার প্রকৃত চিত্র কি রকম ছিল।

চট পরা দুই মজুরের ছবির জন্যে কিন্তু শঙ্করপুর-বেলপাড়া গ্রামে যাইনি। এটি হঠাৎ মিলে যায়। আসলে ঐ গ্রামে আমরা গিয়েছিলাম ধসে পড়া মাটির ঘরের ছবি তুলতে। বদরগঞ্জের প্রাক্তন সংসদ সদস্য আনিসুল হক চৌধুরী জানিয়েছিলেন, ঐ শঙ্করপুর-বেলপাড়া গ্রামে এমন একটিও ঘর নেই যা খাড়া আছে। যমুনেশ্বরীর বানের তোড়ে থুবড়ে পড়েছে প্রতিটি মাটির ঘর। সমস্ত পরিবার হয়েছে আশ্রয়হীন। ভালো একখানা দৃশ্যের ছবি হবে, ছুটে যাই। বলাই বাহুল্য মানুষের দুর্গতি যত বাড়ে, তত ভালো ছবি হয় আমার মতো সাংবাদিকদের। কোনো ঘটনায় দুএকজন মানুষ মারা গেলে মন চুপসে যায়, ধুৎ বলে উঠি। যারা সাধু সাংবাদিক, তাদের কাছে এ এক রকমের মনোবিকৃতি হয়তো।

উপজেলা সদর থেকে শঙ্করপুর-বেলপাড়া গ্রামটি মাইল দুয়েক দূরে। আরোহণ করি আনিসুল হক চৌধুরীর মোটরসাইকেলের পেছনে। আমাদের সফরসঙ্গী হলেন কয়েকজন ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগ কর্মী, জাতীয় পার্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মী, পাট চাষী সমিতির একজন। না, আমাকে কোনো সাহায্য করবার জন্যে নয়, তারা পিছু নিলেন আমি কিভাবে কাজ করি তাই দেখবার জন্যে। বিভিন্ন এলাকায় গেলে এমনটি হয়, সঙ্গে চলেন এলাকার উৎসাহী অনেকে। অবশ্য, বদরগঞ্জের ঘটনায় ঐ সফরসঙ্গীদের ঘটনাস্থলে উপস্থিতি আমার জন্যে শুভ হয়েছিল। চট-পরা দুই মজুরের ছবি তুলবার পর ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই তারা যে লিখিত জবানবন্দী দিয়েছিল, তা পরে আমাকে সেভ করে। নয়তো ফেঁসে গিয়েছিলাম। ছবি ও প্রতিবেদনটি সংবাদে ছাপা হবার পর যখন সরকারিমহল থেকে চাপ এলো, যখন বলা হলো ছবিটি সাজানো এবং রিপোর্টটি বানোয়াট, তখন সফরসঙ্গীদের লিখিত জবানবন্দী আমার যথেষ্ট উপকারে আসে। জবানবন্দীটি নিয়েছিলাম উপস্থিত বুদ্ধিতে, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এই ভেবে। জবানবন্দীতে ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা জনপ্রতিনিধি এমনকি সরকারি দলের লোকজন সবাই মিলে বলেছিলেন, চট-পরা দুই মজুরের ছবিটি তাদের উপস্থিতিতে তোলা হলো। তারা স্বচক্ষে দেখেছেন, আবদুল্লাহ আর আবদুল আজিজ বস্ত্রাভাবে চট-পরা অবস্থায় ছিল। ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশের পর রাজধানীর উত্তরপাড়া থেকে যখন চাপ আসে, তারা যখন ছবিটির সত্যতা সম্পর্কে ডকুমেন্ট চায়, তখন ঐ জবানবন্দীর ফটোকপি তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বলেছিলাম, চট-পরা ছবিটির জন্যে শঙ্করপুর-বেলপাড়ায় যাইনি। ঠিক তাই। গ্রামে পৌঁছে যখন ধসে-পড়া ঘরবাড়ি আর নিরাশ্রয় পরিবারের ছবি তুলছিলাম, কথা বলছিলাম এর-ওর সাথে, হঠাৎ একটি ভাঙা মাটির দেওয়ালের পাশ থেকে বেরিয়ে আসে আবদুল্লাহ আর আবদুল আজিজ। তাদের দুজনের পরনে ছেঁড়া চট। কোনো কথা নয়, প্রবল উত্তেজনায় ক্যামেরার শার্টার টিপতে থাকি একের পর এক। ক্যামেরা চোখে থাকতেই বুঝতে পারি, সংবাদের কোন্ জায়গায় কিভাবে ছাপা হবে এই ছবি, পাঠক মহলে আলোড়ন তুলবে কতটা। ছবি-প্রতিবেদন প্রকাশের দিনই ঢাকার মেসেজ পেয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা বদরগঞ্জে ছোটেন। শঙ্করপুর-বেলপাড়া গ্রামে যায় চাল গম আর লুঙ্গি-শাড়ির গাঁট। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের পর থানা থেকে পুলিশ এসে পাকড়াও করে নিয়ে যায় আবদুল্লাহ আর আবদুল আজিজকে। তাদের প্রচণ্ড মারধোর করা হয়, হাতের কব্জি ও আঙুল থেঁতলে দেওয়া হয়। থানার দারোগা বারংবার ওদের মুখ থেকে কথা বের করতে চাইলেন যে, ছবিটি সাজানো। আসলে তারা চট পরে ছিল না, সাংবাদিকই তাদের চট পরিয়ে দিয়ে ছবি তোলেন।

কিন্তু গ্রামের অতি দরিদ্র মজুর আবদুল্লাহ আর আবদুল আজিজ, নিরক্ষর, অনাহার-অর্ধাহার যাদের নিত্যসঙ্গী, পরনের বস্ত্রখণ্ডটিও যাদের জোটে না, তারা বেদম মার খাওয়ার পরেও সত্যে অটুট ছিল। তারা দারোগাকে একই কথা বারবার বলেছে, 'মারতে মারতে মারি ফ্যালান ছার, তবু মিচা কতা কবার নই।' অর্থাৎ স্যার, আমাদের মারতে মারতে মেরে ফেলুন তবু আমরা মিথ্যে বলতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজগঞ্জের বিধবা এবং দুই 'মহামান্য'

আশি বছর বয়সের বুড়োর বন্ধ্যাকরণ অপারেশন সম্পর্কিত লেখাটি যারা পড়েছেন, তাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, কী কারণে জোরজবরদস্তিমূলক বন্ধ্যাকরণ করে থাকে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ? মাঝে-মধ্যেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় একই ব্যক্তির একাধিকবার অপারেশনের কথা, হয় অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপারেশন, বিধবাদের অপারেশন। কেবলি বিয়ে হয়েছে কিংবা একটিও সন্তান হয়নি এমন যুবক-যুবতীর অপারেশনের কথা শোনা যায়। একটি দম্পতির মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী যে-কোনো একজনের অপারেশন করলেই যথেষ্ট, কিন্তু করিৎকর্মা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই অপারেশন করিয়ে দেয় এমন ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে।

কেন?

প্রধান কারণ দুটি। এক হলো, হেড অফিস থেকে যে লক্ষ্যমাত্রা (টার্গেট) ধার্য করে দেওয়া হয়, যে প্রকারেই হোক তা পূরণ করা। অর্থাৎ 'খুব ভালো কাজ' দেখানোর মানসিকতা। দুই হলো, অপারেশন বাবদ প্রাপ্ত টাকা-পয়সা লোপাট করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অপারেশন করানোর পর গ্রামের গরিব নরনারীকে নির্দিষ্ট টাকার অর্ধেক দেওয়া হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নগদ টাকা না দিয়ে লুঙ্গি বা শাড়িখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করা হয়।

www.amarboi.com

এদেশে গত দুই দশকে হাজারো ভুয়া বন্ধ্যাকরণ অপারেশন সরকারি কাগজপত্রে দেখানো হয়েছে। সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ছাড়াও এ অপকর্ম করেছে কয়েকটি এনজিও। দুঃখজনক যে, এধরনের বহু কেস ডিটেক্ট হবার পরেও জড়িত দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোনো শাস্তি হয়নি। বরং অনেক সময় দেখা গেছে, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা কিংবা এনজিও প্রধান সাংবাদিকদের উপদেশ দিয়েছেন : ভুয়া অপারেশন, একাধিকবার অপারেশন কিংবা বিধবা ও অকর্মণ্য বুড়োদের অপারেশন সম্পর্কিত খবর যেন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা না হয়। এতে নাকি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বিদেশের কাছে। এতে নাকি বিদেশি দাতারা পরিবার পরিকল্পনার কাজের জন্যে টাকা দিতে চায় না।

টাকা চুরি করতে পারেন, কিন্তু তার খবরটি ছাপা যাবে না। এ একধরনের মস্তানি মানসিকতা। পরিবার পরিকল্পনার নামে বিদেশি টাকা ভিক্ষে করে এনে যদি তা লোপাট করেই খাবে একটা শ্রেণী, তাহলে সে টাকা আসুক বা বন্ধ হোক, তাতে সাংবাদিকের কী আসে যায়?

সিরাজগঞ্জে গিয়ে ইত্তেফাকের সাংবাদিক বন্ধু আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে খবর পেলাম, শহর-পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে বেশকিছু বিধবার বন্ধ্যাকরণ অপারেশন করা হয়েছে। অপারেশনের ভয়ে বেশ কয়েকজন বিধবা গ্রাম ছাড়া।

যে মহিলার স্বামী নেই কিংবা সন্তান ধারণের ক্ষমতা যারা বয়সের কারণে হারিয়েছে, তাদের আবার বন্ধ্যাকরণ অপারেশনের দরকার কী? আমিনুল বলল, আসলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে চায়। সেক্ষেত্রে, যাকে পাচ্ছে যেভাবে পাচ্ছে বাছবিচার না করে ছুরি চালাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশ্লিষ্ট বিভাগের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে কোনো বিধবা মহিলার বন্ধ্যাকরণ অপারেশন করা যাবে না। তবু হচ্ছে। ঘটনা সরেজমিনে যাচাই করবার জন্যে গ্রামে গেলাম। দেখি ঘটনা ঠিক। একটি পাড়া ঘুরে আমরা তিনজন বিধবাকে পেলাম যাদেরকে ফুসলিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে অপারেশন করানো হয়েছে।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, ছবি তোলা, সাক্ষ্যপ্রমাণ নেওয়া, সারাদিন এইসব কাজ করে সিরাজগঞ্জ শহরে ফিরলাম। পরদিন ছবিসহ স্টোরি পাঠানো হলো ঢাকায়। সংবাদের প্রথম পাতায় খুব ভালো ডিসপ্লে হলো। সেদিনই হেলিকপ্টারে উড়ে সিরাজগঞ্জে এলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সঙ্গে বিএভিএস-এর সভাপতি ডা. আজিজুর রহমান। এই আজিজুর রহমান পরবর্তীকালে এরশাদ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

এরশাদ শাসনামলের প্রথমদিকের ঘটনা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী একজন 'অব'। খুব চোটপাট করলেন তিনি সিরাজগঞ্জে নেমেই। তার সফরসঙ্গী আজিজুর রহমান আরও বেশি যান। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'কোথায় মোনাজাতউদ্দিন? এইসব খবর লিখে সে কি বিদেশি গ্রান্ট বন্ধ করতে চায়? এই রিপোর্ট দেখলে বিদেশিরা কি আর টাকা দেবে?'

বিধবাদের অপারেশন সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি যখন ছাপা হয়, তখন আমি কিন্তু সিরাজগঞ্জে নেই, চলে গেছি পাবনায়। পাবনায় বসেই খবর পেলাম, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর ডা. আজিজুর রহমান স্থানীয় সাংবাদিকদের ডাকবাংলোয় ডেকে নিয়ে এসে খুব গরম মেজাজ দেখিয়েছেন। তাদের বলেছেন, সাংবাদিকরা যেন এধরনের খবর পরিবেশন না করে। করলে বিপদ হবে।

AMARBOI.COM

কেন বিধবাদের অপারেশন করা হয়েছে, কারা এই দুষ্কর্মের সাথে জড়িত, তা অবশ্য ঐ দুজনের কেউ খোঁজখবর করে দেখেননি, অপরাধীদের শাস্তি তো দূরের কথা। পাবনায় বসে ভাবলাম, বিধবাদের অপারেশন বন্ধ করবার জন্যে নয়, মহামান্যদ্বয় এসেছিলেন 'আর যাতে' এধরনের খবর ছাপা না হয়, তারই ব্যবস্থা করতে।

এদেশের বিভিন্ন দপ্তর-কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় কোনো অপকর্মের খবর বেরুলে পরে তা রোধ-ব্যবস্থা নিতে চান না। বরং তারা খোঁজ করেন কী করে খবরটি লিক হলো, তারা ফরমান জারি করেন এইসব অনিষ্টের খবরাখবর যেন আর ছাপা না হয়।

০১.০১.৯২

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস)-এর কার্যক্রম আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেল। না, দুর্নীতি অনিয়ম-অনাচার বিষয়ক কোনো খবর প্রকাশের কারণে নয়, বন্ধ হলো সংস্থাটির বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে : যা উত্থাপন করেছে সরাসরি দাতাসংস্থা। দাতাসংস্থা বলে দিয়েছে : বিএভিএস-এর নির্বাহী কমিটির ওপর-পর্যায়ের নেতৃত্বে যদি রদবদল করা না হয়, তাহলে তারা আর অর্থসাহায্য দেবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ্য, বিএভিএস-এর সভানেত্রী ছিলেন এরশাদ আমলের মন্ত্রী ডা. আজিজুর রহমানের স্ত্রী ডা. সুলতানা বেগম।

বিএভিএস-এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবার ফলে ঐ সংস্থার ২৬ জন ডাক্তারসহ প্রায় ৪শ' কর্তা-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক বন্ধ হয়ে যায়।

এই বইটি বেরুনোর আগে পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ খবর : বিএভিএস-এর কার্যক্রম এখনও চালু হয়নি। চাকরি ফিরে পাননি ৪শ ডাক্তার কর্তা-কর্মচারী।

পত্রিকায় দুর্নীতি-অনিয়ম-অনাচারের খবর ছাপা হলে সেবা-সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবে, দাতা-সংস্থা আর অর্থসাহায্য দেবে না, এইসব যাঁরা বলতেন; খবর না ছাপানোর জন্যে সাংবাদিকদের পরামর্শ দিতেন, কখনো বা হুঁশিয়ার করে দিতেন; ভাগ্যের কী পরিহাস তাদের সেই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে। নেতৃত্বের প্রতি দাতা-সংস্থার বিশ্বাস না থাকার কারণে।

সৌদি মাংস যখন নিজের খাবার টেবিলে

AMARBOI.COM

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এসেছে সৌদি মাংস। এগুলো পাবে দুঃস্থ নরনারী। 'সংবাদ' থেকে আমাকে জানান হলো, তুমি দু একটা জায়গা ঘুরে দেখো, মাংস বিতরণ ঠিকমতো হচ্ছে কি-না, আসল হকদাররা এগুলো পাচ্ছে কি-না। ধারণা করা হচ্ছে যে, জেলা বা উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সৌদি উপহারের মোটা একটা অংশ নিজেদের বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। মাংস নেবে এলাকার কিছু টাউট আর প্রভাবশালী। সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

দেশের সবখানেই সৌদি মাংস যাবে। উত্তরাঞ্চলের জন্যে যে 'কোটা' সেটা নামবে বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে। ট্রাক তৈরি থাকবে সেখানে, যাতে নষ্ট হবার আগেই সমস্ত জেলা-উপজেলায় মাংস পৌঁছে দেওয়া যায়। এই শুনে বগুড়া থেকে ছুটেছিলাম বাঘাবাড়ির উদ্দেশে।

বাঘাবাড়ি ঘাটে নেমে দেখি লাইন লাইন ট্রাক। মাংস বহনকারী কার্গোটি তখনও এসে পৌঁছায়নি। কখন পৌঁছুবে তাও নিশ্চিত নয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ বললেন, মাংসের জাহাজ আসবে এই খবর তারা পেয়েছেন, কিন্তু জানেন না পৌঁছুনোর সঠিক সময়। প্রথম রাত বাঘাবাড়িতে কাটল একটা চায়ের স্টলের বেঞ্চিতে শুয়ে, দ্বিতীয় রাতে বাঘাবাড়ি মিল্ক ফ্যাক্টরির রেস্ট হাউসে ঠাঁই পাওয়া যায় কি-না সেই চেষ্টা করতে লাগলাম। না, সেখানে আছেন কয়েকজন বিদেশি মেহমান।

রাত কাটানোর সমস্যাটা প্রকট। প্রথম রাতটা নাহয় চায়ের দোকানে থাকা গেল, কিন্তু পরের রাতে সেরকমটি কষ্ট আর সম্ভব নয়। চলে এলাম সিরাজগঞ্জ শহরে। ভাবলাম, মাংস এসে পৌঁছাক, তারপর তা সিরাজগঞ্জে আসুক। সিরাজগঞ্জে কিভাবে মাংস বিতরণ করা হচ্ছে তারই ওপর একটা সরজমিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবেদন করা যাবে। বাঘাবাড়িতে দিনের বেলা বড়ালনদীর ধারে বসে হাওয়া খেতে মন্দ লাগে না, কিন্তু চায়ের স্টলের খটমট বেঞ্চে বসে দ্বিতীয় রাতের মতো মশার হুল হজম করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

সিরাজগঞ্জের শহরে এসে আশ্রয় নিলাম এক বন্ধুর বাসায়। সেদিনই সন্ধ্যার পর খবর পাওয়া গেল বাঘাবাড়িতে সৌদি মাংসের জাহাজ এসে গেছে এবং খুব দ্রুত মাংস তুলে দেওয়া হয়েছে ট্রাকে ট্রাকে। বিভিন্ন স্থানে রওনা হয়ে গেছে ট্রাক। সিরাজগঞ্জের জন্যে মাংসের যে ভাগ, সেটা আজ রাতেই পৌঁছুবে। জেলা সদর থেকে 'মাল' চলে যাবে বিভিন্ন উপজেলায়। উপজেলা থেকে ইউনিয়নে।

ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে জেলা প্রশাসনে যাই। এখানেই মাংসের ট্রাক আসবে। তারপর উপজেলা-ওয়ারী ডিস্ট্রিবিউশন।

মাংসের ট্রাক এলো রাত ৯টার দিকে। ভাগাভাগি হলো দ্রুত। যেসব মাংস দূরের উপজেলায় যাবে, সেগুলো ট্রাকে বা নৌকায় পাঠানো হলো আগেই। জেলা প্রশাসন আর তার ত্রাণ বিভাগ খুবই করিৎকর্মা। তাদের তৎপরতা দেখে খুব ভালো লাগল। ডেপুটি কমিশনার সাহেব নিজেই মাংস বিতরণের তদারকি করছিলেন। তিনি আমাকে গর্বভরে বললেন : দেখে নেবেন, একটুকরো মাংস এদিক-ওদিক হতে দেব না। 'সৌদি মাংস সুষ্ঠুভাবে বিতরণ হচ্ছে,' এছাড়া আর কী খবর লেখা যাবে? রাত ১২টার দিকে ফিরে এলাম আস্তানায়। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি ভাবছি, মাংস বিতরণের অব্যবস্থা আর কারচুপি দেখবার জন্যে কাল চলে যাব পাবনা কিংবা রাজশাহীতে। তন্দ্রার মধ্যে ছিলাম। রাত একটা কি দেড়টা হবে, দরজায় নক হলো। কে? কে ডাকে এত রাতে? জবাব এল, 'আমি স্যার। দরজা খোলেন।'

দরজা খুলি না। বিছানার পাশে একটা জানালা, তার কপাট খুলি। অন্ধকারে ভেতরে আসে একটা হাত, হাতে ধরা পুঁটলি।

কী এটা?

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা হাসে। বলে, এটা স্যার সৌদি গোস্ত। ডিসি স্যার পাঠায় দিছেন। আপনারা খাবেন। লোকটা চলে যায়। সৌদি মাংসের পুঁটলি হাতে স্থবির বসে থাকি। পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি সিরাজগঞ্জে এসে যার বাসায় উঠেছি তিনি একজন প্রভাবশালী। বাসায় 'সবাই মিলে খাবার জন্যে' সৌদি মাংসের উপহার পাঠিয়েছেন জেলা প্রশাসন। আমার সামনে যেন আলো জ্বলে ওঠে। কয়েকঘণ্টা আগে আমার সামনে সুষ্ঠুভাবে মাংস বিতরণের যে তৎপরতা প্রশাসন দেখিয়েছে, তা ছিল মেকি।

গভীর রাতে মাংস নিয়ে বিরাট ঘাপলা হচ্ছে।

খবরের গন্ধ পাই।

রাত পোহাবার সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়ি। রাতে মাংসের প্যাকেটটি হাতে পাবার পর থেকে কেন জানি মনে হচ্ছে, বিরাট একটা কারচুপির ঘটনা অপেক্ষা করছে। সংবাদ হবার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের বিভিন্ন মহল্লায় যাই। না, কেউ মাংস পায়নি। পৌরসভা অফিসের সামনে এসে দেখি হাজার হাজার নরনারী, শিশু। এরা অতি দুস্থ। সৌদি মাংস দেওয়া হবে বলে গতকাল এদের একটা করে 'টোকেন' বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু আজ সকালে এসে শোনে মাংস আর নেই। ফুরিয়ে গেছে নাকি কাল রাতেই!

না, কেউ মাংস পায়নি। যারা অতি দুঃস্থ, প্রকৃত যাদের ঘরে এ মাংস যাবার কথা, তারা সবাই বঞ্চিত হয়েছে। তাহলে এতগুলো মাংস গেল কোথায়? পেল কে?

পৌরসভা ভবনের সামনে ছবি তুললাম। মাংসের জন্যে অপেক্ষা করছে হাজারো মানুষ। ছবি তুললাম বোরকা-পরা দুজন মহিলার, যারা মাংসের টোকেন হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবি প্রসেস হলো আধঘণ্টার মধ্যে। প্রতিবেদনটিও দ্রুত লিখে ফেললাম। আমার লেখার বিষয় হলো : প্রকৃত দুঃস্থরা সৌদি মাংস থেকে বঞ্চিত হয়েছে, মাংস পেয়েছে প্রশাসন আর তাদের খাতিরের লোকজন। আমি নিশ্চিত এই ছবি আর প্রতিবেদনটি প্রথম পৃষ্ঠায় আসবে। আজ যদি খবর ও ছবির প্যাকেটটি পাঠাতে পারি, আর রাত ১০/১২ টার মধ্যে ঢাকায় পৌঁছে যায়, তাহলে নির্ঘাত ছাপা হবে কালকের কাগজেই।

প্যাকেট হাতে চলে যাই সিরাজগঞ্জ লঞ্চঘাটে। ঢাকাগামী একজন যাত্রীর হাতে ধরিয়ে দেই সেটা। ভদ্রলোক ওয়াদা করেন, রাত ১০টার মধ্যে সংবাদ অফিসে পৌঁছাবেন তিনি প্যাকেটটি।

AMARBOI.COM

কাজের খুব চাপ গেল। শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। দুপুর আড়াইটায়, ক্লান্ত ক্ষুধার্ত শরীর টেনে টেনে আস্তানায় ফিরি। গৃহকর্তা বললেন, খাবার রেডি, তাড়াতাড়ি গোসল সেরে আসুন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই গোসল শেষ। বসে পড়ি খাবার টেবিলে। ধোঁয়া ওঠা চিকন চালের ভাত আর নানা পদের তরকারি। সব্‌জি, শাক, ছোট মাছের চচ্চড়ি, বড় মাছ, ডাল, আর আছে ভুনা মাংস। মাংসের ডিশের দিকে চোখ পড়তেই ভাবী হি হি করে হাসেন। বলেন, আপনার জন্যে ভুনা করে রান্না করেছি। চেখে দেখুন তো কেমন হয়েছে! গৃহকর্তা বলেন, খান খান, এ মাংস খেলে আর যাই হোক, সওয়াব তো পাবেন!

আমার মাথা ঘুরছে।

কিছুক্ষণ আগেই আমি দুস্থ মানুষের মাংস-বঞ্চনার ছবি ও প্রতিবেদন পাঠিয়ে এসেছি।

আমার খাবার টেবিলে সেই মাংসের ভুনা!

হা ঈশ্বর, এখন আমি কী করি?

খাব কি এই মাংস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিনা বিউটি লাভলী স্বপ্না রুবি

সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কত রকম ভড়ং-ভণিতা যে করতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। 'পথ থেকে পথে' বইটির বিভিন্ন পর্বে এ নিয়ে খোলামেলা স্বীকারোক্তি করেছি। আসলেই, সত্য লিখবার তাগিদে, বস্তুনিষ্ঠতার কারণে এসব সাজানো ঘটনা ঘটাতে হয়েছে, মিথ্যা বলতে হয়েছে। খাঁটি উপকারী ওষুধ তো বিষ থেকে হয়, পুড়ে পুড়ে সোনা হয় খাঁটি। আর, খবরের বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, জীবনযাপনের বহু খাত-ধারা রয়েছে সেখানে সত্য-মিথ্যা খুব আপেক্ষিক বিষয়। স্থান-কাল-পাত্রের ব্যাপার ভালো-মন্দ। একজন চোর, আইনের চোখে নিশ্চয়ই অপরাধী, চুরি প্রমাণিত হলে সাজা হবে। কিন্তু ঐ চোর, চুরি করে আনা চালের ভাত যখন তুলে দেয় তার ক্ষুধার্ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখে, তখন কে আছে তার মতো ভালো মানুষ? পতিতাবৃত্তি সামাজিকভাবে ঘৃণিত পেশা বটে, কিন্তু দেহ বিক্রির ঐ টাকায় যখন সে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত ক্ষুধাতুর একটি মানুষের মুখে আহার তুলে দেয়, জীবন বাঁচায়, তখন ঐ পতিতা তো আমার কাছে হয়ে উঠে মহান, গরিবের রক্ত চুষে ধনী হওয়া কোনো ধার্মিকের চেয়েও অনেক উত্তম।

সেসব কথা যাক। রাজশাহীর সেই এ্যাসাইনমেন্টটার কথা বলি যেখানে পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল এক পুলিশ অফিসারকে ধাপ্পা দিতে। তাদের ব্যবহার করতে।

আমাদের বার্তা সম্পাদক সাহেব একদিন অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন। রাজশাহী থেকে খবর মিলেছে ঐ শহরে বেশকিছু ভ্রাম্যমাণ পতিতা রয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই 'শিশুপতিতা'। দেহগতভাবে সাবালিকা হয়নি এমন মেয়ে, যাদের বয়স ৮/১০ বছর, তারাও পথে নেমে এসেছে। ব্যাপারটি সরজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে ছবি। সিরিজও করা যেতে পারে যদি ভালো এবং প্রচুর 'মালমশলা' পাওয়া যায়। আমি অবিলম্বে রাজশাহী চলে এলাম।

এ আবার কী এমন কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট? পথে পথে পতিতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সাথে পটাপট কথা বলো, সটাসট ছবি তোলো, তারপর ঘষাঘষ লিখে যাও পাতার পর পাতা। শহরের বাইরেও যেতে হবে না, রিকশায় একটা চক্কর দিলেই হয়ে যাবে কাজ। পতিতাদের ছবি ও কাহিনী হরদমই তো ছাপা হচ্ছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়!

কিন্তু না, আমার বেলায় নানা আপত্তি বাধল। ছবি তুলবো কী, ক্যামেরা তাক করতেই ওরা মুখ ঢেকে ফেলে কিংবা ছুটে পালায়। কথা বলতে গেলেই বলে উঠে, 'ওসব প্যাচাল পাড়েন ক্যান? ট্যাকা কত দিবেন, তাই কন। কোথায় নিয়া যাবেন, বলেন!' ... আর, আমিও বুঝতে পারলাম, ওদের দেওয়া সাধারণ যেসব তথ্য— যেমন নাম কি, বাড়ি কোথায়, এসবও কেউ সত্য বলছে না। কারও নাম লাভলী, কেউ স্বপ্না, কেউ বিউটি, কেউ রুবি। না, এগুলো তো তাদের আসল নাম নয়। অথচ আমি সত্য জানতে এসেছি। বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন আমি রচনা করতে চাই।

একজন বলল, দালাল ধরো। ঐ দালাল তোমাকে মেয়ে সাপ্লাই দেবে। তাদের কিছু টাকা দিয়ে দাও। সময়ের দাম যদি পায় ওরা, তাহলে গল্প করবে অনেকক্ষণ। তা নইলে কাজ ফেলে কেন তোমার সাথে খোলামেলা কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসবে? যে বন্ধুটি এই পরামর্শ দিলেন, তার নাকি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে ঢাকার এক লেখকবন্ধুর সাথে একবার দিনাজপুর পতিতালয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে মেয়ের হাতে টাকা দিয়েছে, দালালকে মদ খাইয়েছে, তারপর শুনেছে কয়েকজন পতিতার 'জীবন কাহিনী।'

আমার হাতে অত টাকা-পয়সা কোথায়? তবুও দালালের সন্ধানে গেলাম ভুবন মোহন পার্কে। পার্কটির পাশেই প্রেসক্লাব। আমি দালাল খুঁজছি, এমন সময় শুনি প্রেসক্লাবের ছাদের অংশে দাঁড়িয়ে অর্থবহ গলাখাঁকারি দিচ্ছেন দুজন সাংবাদিক-বন্ধু। এদের মধ্যে একজন উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার মোনাজাত! আপনিও এই লাইনে?' আরেকজনের প্রশ্ন : 'ভাবী সাহেবের কাছ থেকে কতদিন হলো বিদায় হয়েছেন?'

আমি তো লজ্জায় মরে যাই।

৫০ টাকা দর-দামে পাওয়া গেল এক দালাল আর এক মেয়ে। বয়স খুব জোর ১০ বছর, নাম হাসিনা। তিন জনে চলে গেলাম কাছাকাছি একটি কলেজের পেছনদিকে। আমাকে মেয়েটির সাথে বসিয়ে দিয়েই দালালটি সটকে পড়ল। অন্ধকারে আমরা দুজন বসলাম। আগে সাক্ষাৎকারটা সেরে নিই, পরে ছবি তোলা যাবে।

কয়েকটা কথা বলেছি মাত্র। অন্ধকারে আন্দাজে নোট নিচ্ছি নিউজপ্রিন্টের প্যাডের পাতায়। হঠাৎ পেছনে ডাণ্ডার বাড়ি। কঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, দেখি এক পুলিশ। আমি তো লাঠির আঘাত ভুলে গিয়ে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। থানা কিংবা ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে গেলে মান-সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু না, পুলিশটি শব্দ করে হেসে উঠল, বলল, 'দে শালা আমারে দশটা টাকা দে!' আমি টাকা বের করে দিলাম তড়িঘড়ি; এবারে নিজের হাঁটুতে সশব্দে লাঠির বাড়ি মারতে মারতে স্থান ত্যাগ করল। মনে হলো, খুব সহজে ১০ টাকা হাতে পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছে।

আমি বসে পড়লাম আবার। কিন্তু মেয়েটি কই? পালালো নাকি এই ফাঁকে!

: হাসিনা ... হাসিনা।

: এদিকে আসেন ... এইদিকে ...

কণ্ঠ অনুসরণ করে দেখি হাসিনা বারান্দার এক কোণে। কাছে যাই। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে আরও কাছে। কিন্তু হোঁচট খেলাম। হাসিনা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে বারান্দার মেঝেতে।

আমি বললাম : শুয়েছো কেন, উঠে বসো!

: না, উঠব না।

: তোমার সাথে কথা বলব হাসিনা।

: ওসব কথা-টতা বাদ দ্যান। কাম লাগাইলে লাগান। আমার সময় কম। আসেন ... এই বলে মেয়েটি গুনগুন করে শুরু করে দিল মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের উদ্দেশে নিবেদিত একটি গান।

আমার পিঠে কে যেন চাবুক মারছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোরী হাসিনা শোয়া অবস্থায় পায়ের ওপর পা তুলে নাচাচ্ছে এবং তার ঐ পা নাচানোর ভঙ্গিটিকে যদি লাথি মারার ভঙ্গি মনে করি, তাহলে সেগুলো সে ছুঁড়ছে যেন আমারই মুখ লক্ষ করে। হায় ঈশ্বর, এই গান কোত্থেকে ঠোঁটে তুলে নিল পথের ধুলোয় পড়ে থাকা কিশোরী হাসিনা? পদ্মাতীরের এই রাজশাহী শহরে, যাকে বলা হয় উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় শহর, অসংখ্য বিদ্যাপীঠের শহর, তারই মাঝখানে ইংরেজ শাসনামলে নির্মিত এক স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনসমৃদ্ধ ভবনের বারান্দায় কার মুখে কি শুনছি! আমার সেই মুহূর্তে মনে হতে থাকে, শহর-সভ্যতা বুঝি পদ্মাতীরের চাকচাক মাটির নিচে চাপা পড়ছে। চাপা পড়ছে সমাজ-সরকার, গদি-লোভী রাজনৈতিক নেতা, ভণ্ড বুদ্ধিজীবী এবং আমার মতো এক সাংবাদিক। কী আশ্চর্য—স্বাধীন দেশ, যেখানে উন্নয়নের গালভরা বুলি উচ্চারিত হয় প্রতিনিয়ত, সভ্যতার মিথ্যা গর্ব বিবৃত হয়, সেখানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির গান ঠোঁটে নিয়ে কিশোরী এক হাসিনা কয়েকটি টাকার জন্যে দেহ বিছিয়ে শুয়ে পড়ে সটান। গুনগুন থামিয়ে আবার সে বলে ওঠে, 'কই, কি হইল? আসেন না ক্যান? আমার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

পুরাতন ভবনটি মাথার ওপর যেন ভেঙে পড়বে, এইরকম আতঙ্ক বোধ করি এবং বারান্দা থেকে সরে আসি দ্রুত। পেছন থেকে হাসিনা তবু ডাকছে : কই যান ছার?' আসেন ... আসেন ...

AMARBOI.COM

দৈনিক বার্তার ফটোগ্রাফার ফরহাদ ভাই আমাকে উদ্ধার করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যা, তার সার হলো : এভাবে কাজ হবে না। আপনি বরং থানার ওসি সাহেবের সাথে আলাপ করুন। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, সহজ কথায় কাজ হবে না। বুঝিয়ে-বাগিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। রীতিমতো তেলাতে না পারলে নরম হবেন না ওসি।

কি করি? কিভাবে পুলিশ কর্তাটিকে ভেজাই-ভজাই? ঘুমের বদলে পরিকল্পনা আঁটতে লাগলাম। পরদিন সকালে সোজা চলে গেলাম থানায়।

ওসি সাহেবকে পরিচয় দিই। কিন্তু কী কারণে বুঝি না, তিনি গম্ভীর, কথাবার্তা বলছেন কম। 'ভীষণ ব্যস্ত আছেন' এরকম একটা ভঙ্গি দেখাচ্ছেন। এই সময়ে আমি আমার কৌশল ব্যবহার শুরু করলাম। বললাম, ওসি সাহেব, আমি আপনার একটা ছবি তুলতে এসেছি ...

: ছবি? আমার ছবি আবার কী হবে?

: আমরা সংবাদ পত্রিকায় ছাপাবো। শুনেছি আপনি এই রাজশাহীতে আসবার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির খুব উন্নতি হয়ে গেছে। চুরি-ডাকাতি খুনখারাবি কিছু নেই ...

ওসি সাহেব এবার নড়েচড়ে বসেন। আমার ওষুধ বুঝি ধরতে শুরু করেছে। গড়গড় করে পূর্বসাজানো বুলি আউরাতে থাকি। বলি, ওসি সাহেব, আসলে কাজ করেন আপনি, উপরওয়ালারা বাহবা পায়, আপনারা বুড়ো আঙুল চুষেন। তা এবার আমি আপনারই একখান ছবি ফার্স্ট পেজে ছাপিয়ে দিতে চাই। দেশের সব মানুষ আপনার সম্পর্কে জানুক। আপনার কর্তৃপক্ষও খুশি হোক। আপনি ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শেষ হয় না। ওসি কলিং বেল টেপেন। কী খাবেন সাংবাদিক সাহেব? চা নাকি কফি? নাকি কোল্ড ড্রিঙ্ক? সিগারেটের ব্র্যান্ড কী আপনার? অর্ডারলি ঘরে ঢোকার আগেই অর্ডার হাঁকেন ড্রিঙ্ক আর ট্রিপল ফাইভের। এবার আমি আমার আসল উদ্দেশ্য বলে ফেলি। ওসি সাহেব, 'আপনার ছবিতো ছাপাবো ভাই, কিন্তু আমার কিছু পতিতা চাই। ওদের ছবি তুলব আর ইন্টারভ্যু করব। আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে। ওসি বললেন, 'ও! এই কথা! তা এটা আর কী এমন ব্যাপার! কটা চান বলুন, এক্ষুনি ধরে এনে দিচ্ছি!' তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল, এটা তার দুআঙুলের চুটকির মতো কাজ। আমি বললাম, 'না, এখন নয়, কাজ হবে সন্ধ্যার পর। আপনি ঐ সময়ই ওদের ম্যানেজ করে দিন।'

ওসি বললেন, 'ঠিক হ্যায় আমার এখানে চলে আসবেন রাত ঠিক আটটায়।'

ও মা! রাত ৮টা কী, ৬টার আগেই পুলিশের লোক প্রেসক্লাবে এসে হাজির। সংবাদের 'সম্বাদিক' সাহেব কোথায়, বড়বাবু তাকে সালাম দিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ থানায় যাই, দেখি, হায় খোদা, এ কী কাণ্ড! রাজশাহী শহরের তাবৎ পতিতা ধরে আনা হয়েছে ট্রাকে তুলে। আছে কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, পতিতার দালাল। এমনকি পতিতা নয় এমন বৃদ্ধা, ছিন্নমূল নারী, ভিক্ষুক—এরাও ছাড়া পায়নি। একজন বৃদ্ধা ভিখারী, পরে শুনলাম সোনাদীঘির ধারে উনুন জ্বালিয়ে ভাত রাঁধছিল, তাকে পর্যন্ত তুলে আনা হয়েছে ভাতের হাঁড়িসমেত। বুড়ির সে কী চিৎকার আর কান্না! আমার পায়ে ধরে বলতে লাগল, বিশ্বাস করেন হুজুর, আমি 'কুকাজ' করি না। আমি এক ভিখারী ... আমার বাড়ি রংপুরে বাবা! আঞ্চলিকতা বলে আমার কিছু নেই, কিন্তু তবু ঐ বৃদ্ধার কান্নায় খুব খারাপ বোধ হতে থাকে। ওসি সাহেবকে বলি : একে আবার ধরে এনেছে কেন বলেন তো! সত্তর বছরের এই বুড়ি, এ আবার দেহ বেচে কিভাবে? ওসি আমার সাথে একমত হন এবং চিৎকার করে উঠেন 'কোন্ ... একে ধরে এনেছে রে? ... করি তার।' তার গর্জনে এমন কিছু ছিল যাতে ঐ বৃদ্ধা, অনেকবারের মতো আরেকবার কেঁদে ওঠে।

আসলেই যারা পতিতা, তারা চুপচাপ বসে আছে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে কেউ, কেউ আবার ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছে। অনেকের ভাঙা চোয়াল, অপুষ্টি আক্রান্ত দেহ, কেউ খসাখস করে পা চুলকাচ্ছে। কয়েকজন, দেখি, সবে বুঝি রুজ পাউডার লিপস্টিক লাগাচ্ছিল, মেকআপ সমাপ্ত হয়নি, তাদের ঐ অবস্থায় ধরে আনা হয়েছে। বিচিত্র দেখাচ্ছে তাদের চোখমুখ। এদের দেখে আলো ঝলমলো রাজশাহী শহরটাই যেন ব্যঙ্গ করে ওঠে। নাকি এরাই উল্টো ব্যঙ্গ করে শহর সভ্যতাকে? বুঝে উঠতে পারি না।

: সম্বাদিক সাহেব, চলবে তো?

: ঠিক আছে, চলবে।

: আপনি তাহলে আপনার কাজ করুন, আমি যাই।

: ঠিক আছে।

ওসি সাহেব সত্যি প্রস্থান করতে থাকেন। নিয়োজিত করে যান দুজন সিপাই। তাদেরই একজন আমার খুব কাছে এসে নিম্নকণ্ঠে বললেন যা, তার অর্থ হলো, পুলিশ এদের 'অ্যারেস্ট' করে এনেছে। তা এদের একটা গ্রুপ ছবি আমি যেন তুলি। পেছনে দাঁড়ানো থাকবে গ্রেফতার অভিযান পরিচালনাকারী পুলিশ দল, মাঝখানে থাকবেন ওসি সাহেব। আমি রাজি হয়ে যাই। পতিতাদের বাছাই করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে এনে আলাদা বসানো হয়। দুপাশে দুজন দালাল। পেছনে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে কয়েকজন সিপাই। মাঝখানে খাটো লাঠি বগলে ওসি সাহেব। ক্যাপ তো আছেই, চোখে গোঁজেন গগলস। ফ্লাশ জ্বলে ওঠে। খুশিমুখে ওসি সাহেব বলেন, 'থ্যাঙ্কু।' আরও ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এই ছবিটাই যেন 'পেপারে' ছাপা হয়। পুলিশের 'অ্যাকটিভিটি' বোঝা যাবে।

ওসি সাহেব কামরায় চলে যাবার পর শুরু হয় আমার কাজ। কিশোরী কয়েকজন, দেখেই বোঝা যায় যাদের বয়স ৯/১০ বছরের বেশি নয়, তাদের আলাদা করি। প্রত্যেকের মুখের ক্লোজআপ ছবি নিই। একটা ছবি তোলেন ফরহাদ ভাই নিজে। কোট-প্যান্ট পরা আমি, হাতে নোট বই কলম, একজন কিশোরী পতিতার সাথে কথা বলছি। এটি একটি প্রামাণ্য ছবি। পরে কাজে লাগতে পারে। আওয়াল ভাই (বার্তা সম্পাদক আবদুল আওয়াল খান) এই ধরনের বেশকিছু ছবি ছেপেছিলেন ঢাকা শহরের ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের সময়। ছবিতে দেখা যায়, একজন প্রতিবেদক নিজে এলাকায় গিয়ে এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলছেন। প্রতিবেদনটি যে সরজমিন তদন্তের ভিত্তিতে করা হয়েছে, অর্থাৎ টেবিল মেড নয়, তা পাঠক বুঝতে পারেন।

যাই হোক, ছবি তোলার পর শুরু হলো আলাপ। কিন্তু কেউই সত্য কথা বলছে না। আমি আকুতির মতো করে বলি, বোন, তুমি সত্যি কথা বলো। বলো তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়? কিভাবে এই শহরে এলে? কে এনেছে তোমাকে?

কিন্তু না, সত্য মেলে না। কিছুতেই মুখ খুলবে না তারা। যা বলছে, তা বানানো সাজানো। অথচ আমি সত্য কথা বের করতে চাই।

: কী নাম তোমার?

: বিউটি।

: না, বিউটি তোমার আসল নাম নয়। এ নাম দালালেরা দিয়েছে, কিংবা যে তোমাকে পোষে সে দিয়েছে!

: না স্যার, আমার নাম বিউটি। আর কোনো নাম নাই।

: তুমি বিউটি নও ...

: বিশ্বাস করেন, আমি বিউটি ...

এই সময় হঠাৎ লাফিয়ে সামনে আসে এক সিপাই। লাঠির ঘা বসিয়ে দেয় পিঠে। মেয়েটি কঁকিয়ে ওঠে। কাঁদতে থাকে। প্রথমে চিৎকার করে, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

আবার প্রশ্ন করি : বলো বোন, তোমার নাম কী?

: আমার নাম মোসাম্মৎ জাহানারা খাতুন।

: বাড়ি কোথায়?

: কাশিনাথপুর ...

এইভাবে, মারের চোটে, কিংবা বোন বলে ডাকার মতো আদরে, হতে পারে নিতান্তই আবেগে, সাজানো বিউটি বলতে থাকে তার কাহিনী। আমার নোটবুকের পৃষ্ঠা শুধু নয়, দুঃখের কালিতে ভরে উঠছে বুক। কোন্ সমাজের আমরা বাসিন্দা, যেখানে এক নাবালিকা, এখনও যার ঋতুস্রাব হয়নি, সে নেমে আসতে বাধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে এই পথে! কেউ এসেছে পেটের জ্বালায়, কেউ অপহৃতা হয়েছে, কাউকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, ফুসলিয়ে আনা হয়েছে কাউকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যই তাদের ভাষায় এই 'কুপথে' আসার মূল কারণ।

না, ওসি সাহেবের ছবি ছাপা হয়নি। ছাপা হয় রাজশাহীর ক্রমবর্ধমান পতিতাবৃত্তি ও অপ্রাপ্তবয়স্কা পতিতাদের ওপর সচিত্র সিরিজ প্রতিবেদন। অনেকে বাহ্বা দেয়, খুব ভালো হয়েছে তোমার রিপোর্ট। কেউ আবার বলে, ছি ছি, পতিতাদের সাথে তোমার ছবি ছাপতে গেলে? নিজের ছবি ছাপানোর এতই শখ তোমার? একজন বললেন, 'তোমরা শালা পর্ণো শুরু করলে নাকি? পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়াতে চাও?' কিন্তু একজনও বলেননি কী করে এই সামাজিক সমস্যাটির সমাধান করা যায়!

সেই ওসি সাহেবের মুখোমুখি আর হইনি। তবে পরবর্তীকালে রাজশাহী সফরকালে একজন সিপাইর সাথে দেখা হয়ে যায়। আমি একটা জনসভা কাভার করতে গিয়েছিলাম, তিনি সেখানে 'ডিউটি' করছিলেন। আমাকে চিনতে পেরে সামনে এলেন তিনি, সালাম দিলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'স্যার অনেক ছবিতো ছাপালেন দেখলাম, তা আমাদের ছবিটা ছাপা হলো কই?'

আমি বললাম, ভাই, আর বলবেন না। আমার কপাল খারাপ, ঐ ছবিটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

ঘুষ ও ঘুষি

১

অনেকে প্রশ্ন করেন, এই যে আপনি বিভিন্ন প্রশাসন থেকে দুর্নীতি-অনিয়ম-অনাচার ইত্যাদির খবরগুলো বের করে আনেন, তাতে প্রাণের ঝুঁকি হয় না? আপনাকে আটকায় না কেউ? মারপিট করে না? হামলা চালায় না? অনেকে জানতে চান, কিভাবে বিভিন্ন দফতরে ঢোকেন আপনি? সোর্সের সাথে অত তাড়াতাড়ি খাতির জমান কী করে? ফাইলের কাগজ কি উড়ে আসে আপনার পকেটে?

আসলেই আমার ক্ষেত্রে শুধু নয়, গোটা সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদপত্র সম্পর্কে নানারকম কৌতূহল আছে এক শ্রেণীর পাঠকের।

ঝুঁকির প্রসঙ্গ উঠলে আমি সিরাজগঞ্জের সেই ঠিকাদারদের কথা বলি, যারা আমাকে হাত-পা বেঁধে যমুনায় ফেলে দিতে চেয়েছিল। প্রাণনাশের চেষ্টা যে হয়েছিল আমনুরা জংশন স্টেশনে, সেই গল্প শোনাই। কোন্ কৌশলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ি, সে সম্পর্কে জানাই হাতিরদিয়া বাজার সমবায় সমিতি ভবনের মিনি জেলখানায় ঢোকার কথা। কাগজপত্র হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল-কাহিনী শোনাই বগুড়ার শিল্প ব্যাংকের। ৩০ বছরে এরকম হাজারো কথা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনী লেখা আছে মনের ডায়রির পাতায় পাতায়, ওপরে যে কটি প্রসঙ্গে বললাম তা তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আসলে, জীবনের সমস্ত ঘটনাতো আর মুখের গল্পেসল্পে বলা যায় না!

বগুড়ার শিল্প ব্যাংকের ঘটনাটা বলি। একবার আমাদের সম্পাদক সাহেব নিজে অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন : তুমি বগুড়া চলে যাও, ওখানে গিয়ে দেখো শিল্প ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কি-না! এ পর্যন্ত মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, কত আদায় হয়েছে, অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কত, ঋণ পেতে শিল্পকারখানার মালিক কিংবা নতুন উদ্যোক্তাদের কতটা কিরকম ভোগান্তি পোহাতে হয়, ইত্যাদি। বগুড়া হলো উত্তরাঞ্চলের শিল্প শহর। অনেক উৎসাহী ব্যক্তি আছেন যাঁরা নতুন শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে চান। আহমদুল কবির সাহেব ঢাকায় থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা ও সম্ভাবনার খবর ছিল তাঁর নখদর্পণে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার মনে হয়েছে, আহমদুল কবির সাহেব বগুড়ার শিল্পকারখানা ও শিল্পঋণ সম্পর্কে ভালো খবরই রাখেন। এখন আমাকে সেখানে পাঠিয়ে পুরো ব্যাপারটি তিনি খতিয়ে দেখতে চান, চান এ নিয়ে 'সংবাদে' সরজমিন তদন্তভিত্তিক একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হোক।

তা কী তাঁর উদ্দেশ্য সেটা আমার কাছে গৌণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সম্পাদক সাহেব অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন এবং আমাকে তা সফল করতে হবে, সেই মুহূর্তে এটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। আমি ঢাকা থেকে বগুড়া রওনা দিই পরদিনই।

AMARBOI.COM

বগুড়া নেমেই ঠিক করলাম : শিল্পঋণ পেয়েছেন কিংবা ঋণের জন্যে আবেদন করেছেন এরকম কমপক্ষে ৫০ জনের সাথে কথা বলব। তাঁদের বক্তব্যের ওপরই তৈরি হবে আমার মূল প্রতিবেদনটি। এছাড়াও কয়েকটি চালু কিংবা রুগ্ণ শিল্পকারখানায় গিয়ে সরজমিনে দেখব তাদের অবস্থা এখন কিরকম।

কিন্তু যা-ই করি না কেন, প্রথমে যেতে হবে শিল্প ব্যাংকের বগুড়া শাখায়। সেখানেই পাওয়া যাবে কারা কারা ঋণ পেয়েছে, মোট কত টাকা পেয়েছে, আবেদনপত্র ফাইলে জমা আছে কত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেলা বোর্ডের ডাকবাংলোয় উঠেছি। এর সামনেই শিল্প ব্যাংকের শাখা অফিস। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই দেখি ঝকঝকে-তকতকে সাজানো-সুন্দর অফিস। স্মার্ট-দৃশ্য কর্তা-কর্মচারীরা খুব ব্যস্ত।

একেকজনের সামনে ফাইলের স্তূপ, ঠাসা কাগজপত্র, টাইপিস্টের ব্যস্ত আঙুল, একের পর এক টেলিফোন বাজছে। কোনো কোনো কর্তার সামনে 'পার্টি' বসে আছেন, দেখেই বোঝা যায় এরা কারা। কর্তা এবং পার্টির মাঝামাঝি জায়গায় ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ, ট্রিপল ফাইভ কিংবা বেনসনের প্যাকেট। উর্দি-পরা পিয়ন শশব্যস্ত, দরজার মুখে ব্যাংকের গুঁফো গার্ড সাহেব এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন যেন শুধু এই অফিসকক্ষ নয়, গোটা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এই মুহূর্তে তার কাঁধে ও হাতে। আমাকে সদর দরজাতেই আটকে দিলেন তিনি হাত ইশারায়। কী চান? কার সাথে দেখা করতে চান? আমি হেসে বললাম, আমার দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুলাভাই? কে তিনি?

আমি বললাম, আপনাদের ঐ ম্যানেজার সাহেব এবং তৎক্ষণাৎ, যেভাবে তার হাতখানা আমার নাকের সামনে উঠেছিল, তেমনিভাবে সটাৎ নেমে গেল, বদলে গেল সটান দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি। কোমর বাঁকা করে তিনি সামনে ঝুঁকলেন এবং দুহাত মেলে ধরে বললেন, 'যান স্যার, যান ...'

বিশাল কক্ষে ঢুকে ইতি-উতি তাকাই। আলাদা পার্টিশন-দেওয়া একটি কক্ষ, নেমপ্লেট নেই, তবু বুঝতে পারি এটাই ম্যানেজার সাহেবের ঘর এবং সেদিকেই এগুতে থাকি। কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকবার আগেই পথ আটকান পিয়ন সাহেব। কাকে চান আপনে?

: ম্যানেজার সাহেব নেই?

: আছেন, কিন্তু সাহেব এখন ব্যস্ত।

: মিটিং হচ্ছে?

: না।

: ভেতরে কোনো গেস্ট আছে?

: না।

: তাহলে?

পিয়ন জানান, সাহেব মানা করেছেন এখন যেন কেউ তাকে 'ডিসটাব্' না করে। কেননা তিনি পিয়নের ভাষায়, 'কি য্যান্ একখান্ বই' পড়ছেন। তারপর তিনি, ঐ পিয়ন, প্রশ্ন করতে থাকেন নানানটা। পরিচয় কী আমার, লোনের জন্যে এসেছি কিনা, কী ধরনের ইন্ডাস্ট্রির জন্যে কত টাকা চাচ্ছি, এইসব। এটা-ওটা কথা বলে প্রশ্ন এড়াই তার, বলি, আপনার সাহেবকে বলুন একজন লোক আপনার সাথে জরুরি দেখা করতে চায়। আমি এই মুহূর্তে আমার পেশাগত পরিচয়টি দিতে চাই না, আবার জোর করে দরজা ঠেলে ভেতরেও যেতে চাই না। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম একজন সাধারণ লোক কিংবা ঋণ-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি ব্যাংকে এসে বড়কর্তার দেখা করতে চাইলে কি রকম ট্রিটমেন্ট পান।

কিন্তু পিয়ন কোনোমতেই ভেতরে যাবেন না, আমাকেও ঢুকতে দেবেন না। তার ঐ এক কথা : সাহেবকে 'ডিসটার্ব' করা যাবে না। কিন্তু আমি আর দোরগোড়ায় অপেক্ষা করি কতক্ষণ? এরই মধ্যে দশটা বেজে গেছে, ব্যাংকের কাজ সেরে যেতে হবে শিল্প ও বণিক সমিতির অফিসে, তারপর বিসিক শিল্প এলাকায়, কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিতে। আর শুধু কারখানায় গেলে তো চলবে না, তার মালিকদের খুঁজে বের করতে হবে। যেতে হবে তাঁদের বাড়ি বাড়ি যাঁরা নতুন শিল্পঋণের জন্যে আবেদন করেছেন, কিন্তু ঝুলে আছেন।

সামনে এগোই এবং পিয়নটির বাধা এবং দরজা দুই-ই ঠেলে ম্যানেজার সাহেবের কামরায় ঢুকে পড়ি। না, পিয়ন মিথ্যে বলেননি, তার 'সাহেব' সত্যি সত্যি একখানা বই সামনে মেলে ধরে আছেন। একটি মোটা বিদেশি রহস্য-উপন্যাস।

: স্লামালেকুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাল্টা জবাব দিলেন না তিনি শান্তি কামনার, শুধু খুব গম্ভীর কণ্ঠে 'হুঁহ্' শব্দটি উচ্চারণ করলেন বই থেকে মুখ না তুলেই। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, পাশের একটি চেয়ারে দুপা তুলে রেখেছিলেন তাও নামানোর মতো সাধারণ ভদ্রতা তাঁর নেই। কিন্তু মেজাজ খারাপের ব্যাপারটি প্রকাশ করা যাবে না। আমি ভণিতা করে তাই হাসলাম, বললাম, জনাব, আমি কি বসতে পারি?

: 'কী চাই আপনার?' এবার চোখ তুললেন তিনি। বড় বড়, বড় সুন্দর এবং অবাক চাহনি মেলে ধরা তাঁর চোখ। অনুমতি দেওয়ার আগেই আমি তার সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়লাম এবং পরিচয় দিলাম নিজের : জনাব, আমার নাম মোনাজাতউদ্দিন, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার একজন রিপোর্টার, আপনার একটুখানি অনুগ্রহ নিতে এসেছি ...।

কথা শেষ হতে না হতেই, ভদ্রলোক এবার ধীরে ধীরে পা নামান চেয়ার থেকে, বইখানা বন্ধ করেন, ঢুকিয়ে রাখেন ড্রয়ারে, ভ্রূ নাচিয়ে বলে উঠেন : বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি? পা নামালেও তিনি পুরু গদি-আঁটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে আছেন এমন ভঙ্গিতে, মনে হয় কোনো 'লর্ড'!

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবারে আগমনের উদ্দেশ্যটি নিবেদন করি, সেই সাথে এও বলি যে, রহস্য-উপন্যাস পড়বার মতো শ্বাসরুদ্ধকর সময়ে তাঁকে বিরক্ত করবার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। কিন্তু আমার সময় কম, বগুড়ার কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি ঢাকা ফিরে যেতে হবে এবং রিপোর্টটি দিতে হবে জমা।

তাঁর চোখ যেমন সুন্দর, তেমনি চমৎকার কণ্ঠস্বর। কিন্তু, আসল কাজের বেলায় হতাশ করলেন। বললেন, 'স্যরি, আপনাকে আমি কোনোরকম সাহায্য করতে পারব না। আপনি আমাদের পিআরও'র সাথে দেখা করুন। তিনিই সব বলবেন।'—এই বলে তিনি উদাসের ভঙ্গিতে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর টেবিলের একধারের পাহাড় থেকে সামনে টেনে নিলেন একটি ফাইল এবং তা ব্যস্ততার সাথে পড়তে থাকলেন বিড়বিড় করে।

পেশাগত জীবনে কত চিত্রবিচিত্র চরিত্র নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তাদের কাছে এই ভদ্রলোক হয়তো এমন কিছুই না। তবু খুব কষ্ট পাই। এদেশের এরকম বহু কর্তা আছেন, যাঁরা তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট চান, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার বুলি কপচান, কিন্তু নিজের বেলায় হলে মুখে কুলুপ ও ফাইলে ফিতা বেঁধে বসে থাকেন। সাধারণ তথ্যের জন্যে এঁদের অনেকেই পাবলিক রিলেশান্স অফিসারকে দেখিয়ে দেন, আবার কেউবা বলেন কথিত সরকারি নির্দেশের কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে, কষ্ট এবং দুঃখের ভাবনা ছাপিয়ে টেনশন আমাকে গ্রাস করে। এই বগুড়ায় কারা কতজন কত টাকা ঋণ পেয়েছে এই প্রাথমিক তথ্যটুকু না পেলে আমি আমার পরবর্তী তদন্ত চালাব কি করে? আর এই ভদ্রলোক আমাকে দেখাচ্ছেন পিআরও।

আমি বলি, জনাব, এটা তো একটা প্রাথমিক তথ্য, অতি সাধারণ তথ্য। আপনার ব্যাংকের কোনো সিক্রেট ইনফরমেশন আমি জানতে চাচ্ছি না, আমি কারও দুর্নীতির ওপর আপনার বক্তব্য চাচ্ছি না, আমি চাই শুধু সাধারণ একটি তালিকা ... যেখানে ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা থামিয়ে দেন তিনি। বলেন, 'আমি আপনাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারব না। এমনকি আপনার সাথে এ নিয়ে কোনো কথাও বলতে পারব না। হেড অফিসের মানা আছে।'

: মানা আছে মানে?

: মানা আছে মানে মানা আছে!

: এরকম মানা কি মৌখিক, নাকি চিঠি দিয়ে মানা?

: আপনাকে তাও বলব না।

তাঁর কথা খুব নিষ্ঠুরের মতো শোনায়। রাগে আমার গা রি রি করতে থাকে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি। যে কাজটি করি, তাতে ধৈর্য হারালে চলে না। এই ব্যাংকের শাখা থেকে অতি সাধারণ তথ্যটুকুও যদি বের করতে না পারি তাহলে প্রতিবেদন লেখা হবে না। সম্পাদক সাহেবকে জবাব দেব কী? 'সোর্স'-এর কাছ থেকে কথা বের করতে না পারলে আমার কর্মযোগ্যতা নড়বড়ে হয়ে যাবে। সম্পাদক খবর চান, বার্তা সম্পাদক খবর চান, পাঠক খবর চান, কিন্তু সেই খবরের তথ্য-উপাত্ত জোগাড় হবে কি হবে না, হলে তা কিভাবে, এইসব দায়িত্ব তো বহন করতে হবে সাংবাদিককেই!

রাগের মাথার ওপর বরফ ঢালি। বলি, আপনার চিন্তার কোনো কিছু নাই। সোর্স আমি কখনই লিক করব না। বিশ্বাস করেন... আমি ...

ভদ্রলোক কথা বলছেন না। ফাইলটি বিড়বিড় করে পড়ে যাচ্ছেন তিনি সেই আগের ভঙ্গিতে। আমি বলি, হুজুর, এটা তো আপনার ব্যাংকের জন্যে ক্ষতিকর কোনো তথ্য নয়! বরং, এটা একটা পজেটিভ অ্যাপ্রোচ ... মানে আপনার ভালো কাজেরই পাবলিসিটি হয়ে যাবে। শিল্প ব্যাংক এখানে কতটি প্রকল্পে ঋণ দিয়েছে, কত টাকা দিয়েছে এসব পাঠক জানতে পারবেন। আপনার কর্মতৎপরতায় ঢাকার বড়কর্তারা খুশিই হবেন! ...

ম্যানেজার সাহেব কথা বলেন না। এবার ফাইলের চিঠি পড়া বন্ধ করে কিছু লেখা সংশোধন করতে লাগলেন তিনি খুব যত্নের সাথে।

: আপনি কি আমার সাথে কথাও বলবেন না?

: আমার যা বলবার, তা তো বলেই দিয়েছি রিপোর্টার সাহেব। কোনো সাংবাদিকের সাথে কথা বলা আমার হেড অফিসের বারণ।

এই বলে তিনি কলিংবেল টেপেন। পিয়ন ঘরে ঢুকতেই নির্দেশ দেন কাউকে ডেকে আনতে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘরে ঢোকেন একজন। ম্যানেজার হঠাৎ গর্জে উঠেন : 'কী লিখেছেন এসব? একটা সাধারণ চিঠিও ঠিকমতো ড্রাফট করতে পারেন না?' এই বলে, এতক্ষণ যে ফাইলটি পড়ছিলেন, কারেকশন করছিলেন, সেটি ছুঁড়ে মারেন কর্মচারীটির গায়ে।

কর্মচারীটি প্রথমে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে ছিলেন, এখন গায়ের ওপর ফাইল ছুঁড়ে দেওয়ায় ভীষণ রাগান্বিত। চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। আমি, খুব গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। তিনি, ঐ কর্মচারী, প্রতিবাদ করলেন না। শুধু অতি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ : 'শালা!'

আমি মনে মনে বলে উঠলাম, 'এই পেয়েছি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য মিলল না। বেরিয়ে এলাম ম্যানেজারের কামরা থেকে। তারপর খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে ঐ কর্মচারীটির দিকে গেলাম। সাহেবের অপমান কাঁধে নিয়ে তিনি বসে আছেন ঘাড় নিচু করে। আমি তাঁর টেবিলের কাছে গেলাম, দাঁড়িয়ে থাকলাম কয়েক মুহূর্ত। আমি তাঁর সাথে কোনো কথা বলতে চাই না। শুধু চাই, তিনি আমার চেহারাটা মনে রাখুন। কর্মচারীটি আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। আমি টিপ্ করে চোখ মারলাম! তারপর একটুখানি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললাম, 'পরে দেখা হবে।'

এবং তাঁকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলাম ব্যাংক থেকে।

হ্যাঁ, দেখা হলো। লাঞ্চ আওয়ারে। আমি দুপুর একটা থেকে ব্যাংকের সামনে অপেক্ষা করছি। আমার শরীর আড়াল হয়ে আছে পথের ধারের কয়েকটি রিকশার এধারে। চোখ আছে ব্যাংকের সিঁড়ির সর্বশেষ ধাপে।

তিনি নামলেন। খেতে যাবেন আশপাশের কোনো হোটেলে। আমি তাঁর পিছু নিলাম। বিআরটিসি ক্যান্টিনে ঢুকে হাত ধুলেন তিনি বেসিনে, তারপর বসলেন। অর্ডার হাঁকলেন, এমনি সময়ে হঠাৎ করে আমি ঠিক তাঁর সামনের আসনটিতে বসে পড়লাম।

: আপনি? তিনি বিস্মিত।

আমি বললাম, আপনার সাথে কথা আছে। কিন্তু তা পরে বলব। আসুন, আগে আমরা খেয়ে নিই। আমারও খুব ক্ষুধা পেয়েছে।

খাবার এলো। খেলাম দুজনে। টুকটাক কথা হচ্ছে। এরই মধ্যে পরিচয় দিয়ে ফেললাম তাঁর কাছে। তার আগে মুখে যা এলো তা-ই বলে গালাগালি করলাম অদৃশ্য ম্যানেজারের উদ্দেশে।

খাবারের বিল দিলাম আমি। হোটেল থেকে বেরুবার পূর্বমুহূর্তে বাড়িয়ে দিলাম একটি পঞ্চাশ টাকার নোট। না, কোনো সংকোচ নয়, খুব স্বাভাবিকভাবে তিনি তা পকেটে পুরলেন। আমি বললাম : বগুড়ায় শিল্প ব্যাংকের কারা কত ঋণ পেয়েছে সেই লিস্ট আমি চাই। ঋণ কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেই রিপোর্টও আমার দরকার এবং আজ-ই এগুলো দিতে হবে। আপনি আরও পঞ্চাশ টাকা পাবেন। এই বলে আমি জানিয়ে দিলাম কোথায় কখন আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব।

তিনি বললেন, এটা আর কঠিন কী ব্যাপার! লোন ডিসবার্সের ঐ ফাইলটি তো আমারই কাছে! ঠিক আছে, বিকেল ঠিক পাঁচটায় ঘরে থাকবেন, আমি নিজেই ওগুলো দিয়ে যাব।

আমি মনে মনে বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ!'

ভদ্রলোক সময় মানেন। ঠিক পাঁচটা পাঁচ মিনিটে এলেন তিনি ডাকবাংলোতে, আমার কামরায়। এগিয়ে দিলেন ভাঁজ করা কিছু কাগজ। আমার যা যা দরকার, সবকিছুই ফটোকপি করে এনেছেন তিনি।

বসতে দিলাম তাঁকে। বসলেন। ডাকবাংলো চৌকিদারকে দিয়ে চা-বিস্কিট আনতে পাঠালাম। 'চা আসুক ততক্ষণে এটা চলুক' বলে বেনসন এগিয়ে দিলাম একশলা, আর, পঞ্চাশ টাকার আরেকটি নোট। বললাম, 'ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'দিন বাদে বগুড়ার শিল্পকারখানার সমস্যা, শিল্পঋণ এবং তার ব্যবহার, নানারকম অনিয়ম আর দুর্নীতি এইসব বিষয়ে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো 'সংবাদে'। একাধিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হলো। পত্রিকায় চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন পাঠক।

অনেক কাজের চাপে ও মানুষের ভিড়ে বগুড়ার সেই ম্যানেজার সাহেবের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম তাঁর সেদিনের ব্যবহার-ঘটনা-স্মৃতি। কিন্তু বহুদিন পর, আবার, তাঁর সাথে দেখা হয়ে গেল ঢাকায়, এক অনুষ্ঠানে। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন, এগিয়ে এসে সহাস্যে হাত বাড়ালেন, বললেন, 'স্লামালেকুম। কেমন আছেন?'

বললাম : ভালো আছি। তা আপনি কেমন?

: ভালো।

তারপর এটা-ওটা কথা। সেই বড় বড় চোখের চাহনি। উদাস-উদাস ভাব। একসময় বললেন, 'মোনাজাত সাহেব, আপনার সেই রিপোর্টগুলো পড়েছি। বেশ ভালো হয়েছে। তা, বলুন তো ঐ ডাটা-টাটাগুলো পেয়েছিলেন কোথায়? সবকিছু একেবারে কারেক্ট কারেক্ট ...!

আমি বললাম : সত্যি কি জানতে চান ঐসব ইনফরমেশন কে দিয়েছিল?

: হ্যাঁ, বলুন না! ... আপনার ঐ রিপোর্ট ছাপা হবার পর হেড অফিস থেকে বারবার শুধু জানতে চাইছিল, ঐ ডাটা আমি দিয়েছি কিনা! আমি তো খুব টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম ভাই ...

আমি হেসে বললাম : তা আপনার আবার টেনশনের কি ছিল? ইনফরমেশন তো আপনি আর দেননি! দিয়েছিলেন আপনার ঐ পিআরও সাহেব!

২

সেবার সিরাজগঞ্জে যে ঘটনাটি ঘটল, তার পুরো দোষ আমার। না, ঠিক দোষ নয়, বলতে পারেন ভুল। ১ বছর আগের একটি ঘটনার ফলো-আপ সংবাদ আমি রাখিনি। তাই, যাকে বলে ফেঁসে গেলাম। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর ভাঙন আবার শুরু হয়েছে, শহরটি হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, এরকম একটি ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরার শাটার টিপেছি কয়েকটা, এবার শহরে ফিরে যাব, এই সময় লক্ষ করলাম আমার চারপাশে সস্তা সিনেমার গুণ্ডা বা মস্তানের স্টাইলে দাঁড়িয়ে আছে জনা পাঁচেক যুবক। এদেরই একজন, দুতিন যুগ আগেকার খলনায়কদের মতো দুহাত কোমরে রেখে তির্যক চোখের চাহনি হেনে বলে উঠল, আইজকা যাইবা কই বাপধন? তারপর যা জানা গেল, তাতে মাথা চক্কর দিয়ে উঠল আমার, যমুনার পানির পাকের মতোই। সিরাজগঞ্জের স্থানীয় ভাষার টান ও সুরে জানান দিল ওরা : আমি এখন 'ঘিরাও' হয়ে গেছি। আজ আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানানো হবে। আরেক গুণ্ডা প্রচণ্ড চিৎকারে কোনো জনসভার প্রস্তাব পাঠের মতো করে বলল, 'না খালি মারলে অইবো না, শালারে বাঁইধা আইজ নদীত্ ফ্যালায়্যা দিমু! আরেকজন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ফিল্টার টিপড় ফুঁকছিল, হেঁড়ে কণ্ঠে বলল, যা তো রে, কয়েকখান দড়ি নিয়া আয়! তারপর সে স্ত্রীর সাথে রাতে যে কর্মটি করে থাকে, সেই প্রসঙ্গ এবং প্রসঙ্গের সঙ্গে ভাই সম্পর্কযুক্ত করে বর্ষণ করল কিছু গালি। তখন শুধু আমার মাথা ঘুরছে তা-ই নয়, বুঝতে পারি হার্টবিট বেড়ে গেছে, মেরুদণ্ডে শিরশির অনুভূতি হচ্ছে। কলমা পড়ছি খুব দ্রুত। আল্লাহ, তুমি আমাকে বাঁচাও আল্লাহ!

দ্রুত এদিকে-ওদিকে তাকাই। দেখে নিই পেছন দিকটা। না, পালানোর পথ নেই, আমার ঠিক পাঁজরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে সর্প-চক্ষু এক যুবক। চাপা প্যান্ট, মোটা বেল্ট, বাঘের মতো ডোরাকাটা জামার বুক-বোতাম খোলা, লোমভরা বুকে সোনার একটি চেইন ঝিলিক দিচ্ছে, যেন আমাকে বিদ্রূপ করছে সেই নারী-প্রিয় অলঙ্কারটি। নিষ্ঠুর মুখাকৃতির ঐ যুবকের এক হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো, আরেক হাতে হাত দুয়েক লম্বা একখানা কাঠখড়ি এবং এখন তা দিয়ে নিজের হাঁটুতে ধীরে ধীরে বাড়ি মারছে। আমার সাথে চোখাচোখি হতেই সে ঠোঁট বাঁকিয়ে এমন বিচিত্র হাসল যে, সত্যি সত্যি বুকখানা কেঁপে উঠল।

এদিকে-ওদিকে তাকানোর উদ্দেশ্য : আমি আমাদের আবদুল কুদ্দুসকে খুঁজছিলাম। দীর্ঘদেহী এবং দেহের মতো সরল-সোজা কুদ্দুস আমাদের সিরাজগঞ্জের নিজস্ব সংবাদদাতা। একটু আগেও ছবি তোলার সময় সে আমার পাশে ছিল, এখন এই বিপদের মুহূর্তে গেল কোথায়? আমাকে সে এই ঘেরাও থেকে উদ্ধার করবে এমনটি আশা করার চেয়েও আমার এই মুহূর্তে প্রয়োজন তার হাতে ক্যামেরাটি দিয়ে দেওয়া। দামি ক্যামেরাটি আমার নয়, বগুড়া থেকে ধার করে আনা, তারওপর আবার এর ভেতরে আছে কিছুক্ষণ আগে তোলা যমুনার ভাঙনের কিছু ছবি। আছে কংক্রিট বোল্ডারের নামে বালির বস্তা নিক্ষেপের দৃশ্য, আছে ইটবিহীন বাঁশের খাঁচার ছবি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মানুযায়ী বাঁশের বড় বড় খাঁচার ভেতরে ইট ভরে তা নদীতে নিক্ষেপের কথা। কিন্তু কিছু বদমাশ ঠিকাদার বাঁশের খাঁচা নদীতে নিক্ষেপ করছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার ভেতর এক টুকরো ইটও ছিল না। নদীর ভাঙন ঠেকানোর নামে সিরাজগঞ্জে কী কাণ্ড-কারখানা চলছে তা বোঝানোর জন্যে এই ইট-শূন্য বাঁশের খাঁচার ছবিটিই যথেষ্ট।

আবদুল কুদ্দুসকে দেখা গেল। সরল-সোজা বোকা-দৃশ্য মানুষটি ঘটনার আকস্মিকতায় নিজেও আরও বোকা-বোবা হয়ে গেছে যেন। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না, এইরকম ভাব নিয়ে বুকে দুই হাত বিছিয়ে ইতি-উতি তাকাচ্ছে। ঐ ঘেরাওয়ের ভেতর থেকেও ইশারায় তাকে ডাকি, উঁচিয়ে ধরি গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটি। কিন্তু আমাকে উদ্ধারের ব্যাপার তো নয়-ই, ছবি গ্রহণ যন্ত্রটি কিভাবে নেবে সে হাতে, তা-ও বুঝে উঠতে পারছে না। এই মুহূর্তে আমি দেখলাম, ঘেরাও থেকে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের দুই সিপাই, হাতের লাঠি বগলে গুঁজে একজন ধরিয়ে দিচ্ছে আরেকজনের সিগারেট। আমি ডাকলাম চিৎকার করে : এই যে ভাই, আপনারা এদিকে একটু আসুন তো। একটা দিয়াশলাই দিন, নাহয় ঐ সিগারেটের আগুনটাই দিন ... সিগারেট ধরাব, আমার কাছে ... এই বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পকেট হাতড়াতে থাকি। সিপাই এগিয়ে আসেন না। না আমাকে উদ্ধার করতে, না সিগারেটের জন্যে আগুন দিতে। বরং তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ জরুরি বিষয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা করছেন এরকম ভঙ্গিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, আরও কিছুটা দূরত্বে চলে যান। পরে বুঝতে পারি, এরা সাধারণ পুলিশ নন, জেল পুলিশ। যমুনার ভাঙনের মুখে যে জেলখানাটি, তার ভেতরের কয়েদিদের ইতোমধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পাবনা জেলে। এখন ভেতরে বা বাইরের গেটে ডিউটি নেই, তাই যমুনার পাড়ের এই জটলার কাছে এসে তারা আর সবার মতো মজা দেখছিলেন। আর করবেনই বা তারা কী? জেলখানার ভেতরে যারা থাকে, শুধু তাদের পাহারা দেওয়ার 'দায়িত্ব' তাদের, জেলখানার বাইরের কোনো হামলা-হাঙ্গামা তাদের কর্তব্য-আওতার বাইরে।

জেলপুলিশ দুজন সরে যাবার পর আমি কুদ্দুসকে ডাকি। কৌশলে বলি, কুদ্দুস, আপনার কাছে কি সিগারেট হবে? দিন তো দেখি একটা! আসলে সিগারেট চাওয়াটা এই মুহূর্তের ছলনা মাত্র, আমি চাই সে কাছে আসুক, ক্যামেরাটা অন্তত হাতে দিই!

: কি কন?

সিগারেট নয়, প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে আসে আবদুল কুদ্দুস। কিন্তু গুণ্ডাদের একজন তাকে বাধা দেয়, হঠাৎ এক ঘুষি মেরে বসে পিঠে। কুঁকড়ে ওঠে কুদ্দুস, পরমুহূর্তে সোজা হয়ে যায়। ঘুষির বেগে হোক, কিংবা সত্যিকার অর্থে আমাকে উদ্ধারের জন্যেই হোক, কুদ্দুস আমার দিকে এগিয়ে আসে আরও কয়েক পা। আমি ঘেরাওকারীদের একজনের মাথার ওপর দিয়ে ক্যামেরাটি ছুঁড়ে দিই। ধরে ফেলে কুদ্দুস। আমি বলি, আপনি সরে যান। ওরা আমাকে মারবে মারুক, আপনি চলে যান। না, পুলিশে খবর দেওয়ার দরকার নাই ... যান আপনি।

AMARBOI.COM

ইতোমধ্যে মজমার মতো ভিড় জমে গেছে গুণ্ডাদের ঘেরাওকে ঘিরে। সবাই মজা দেখছে, এরকম একটা ভাব। কেউ দাঁত বের করে হাসছে, কেউ এটা-ওটা প্রশ্ন চালাচালি করছে। ব্যাপারটা কি? এই লোকটা কে? কেউ কেউ সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করে, বাড়ি কোথায় জানতে চায়, জানতে চায় এখানে কেন এসেছি। এদের অধিকাংশই ঠিকাদারদের নিয়োজিত লোক। যমুনাগর্ভে বাঁশের খাঁচা ফেলার কাজ করছিল, এখন এখানে মজা দেখার জন্যে জড়ো হয়েছে।

: বাড়ি কনে আপনার? প্রশ্নের উচ্চারণে সিরাজগঞ্জের লম্বা টান কণ্ঠে নিয়ে আবারো জানতে চায় একজন। আমি বলে উঠি একই উচ্চারণভঙ্গিতে : কনে আবার বাড়ি? এহানেই তো বাড়ি আমার! ঐ রায়পুরে। চৌধুরীবাড়ি।

আসলে সব মিথ্যা কথা। বাড়ি আমার আদৌ সিরাজগঞ্জে নয়। তবু বলে ফেলি এলাকাটার নাম। চৌধুরীবাড়িও তাৎক্ষণিক কল্পনাপ্রসূত। আমার বাড়ি অজ্ঞাত এইসব লোকজনের কাছে রায়পুরের মতো এক এলাকায় কোনো 'চৌধুরীবাড়ি' থাকতেও পারে। তা, এই নিরেট মিথ্যে কথা বলবার উদ্দেশ্য হলো : আমি বাইরের কেউ নই, এই সিরাজগঞ্জ জেলারই লোক, এই মুহূর্তে এটা জানানো। পরে ধরা পড়ে গেলে যা হয় হবে, এখন তো অন্তত ওদের 'নিজের জায়গার লোক' হয়ে যাই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ যে ঘেরাওকারী যুবকদের কথা বলছিলাম, তারা কিন্তু পেশাদার গুণ্ডা বদমাশ নয়। এরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদার কিংবা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ। বছরখানেক আগে এদেরই কারও কারও অসাধুতার ওপর 'সংবাদে' একটা সচিত্র প্রতিবেদন বেরিয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষার নামে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদাররা যে কংক্রিট বোল্ডার বানিয়েছে তা অতি নিম্নমানের। সিমেন্টের পরিমাণ এত কম আর বালুর পরিমাণ এত বেশি যে যমুনায় ফেলবার সাথে সাথে তা গলে গেছে। প্রতিবেদনের সাথে ছিল বোল্ডারের স্তূপের ছবি। ইনসেটের একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছিল : বোল্ডার পানিতে ফেলবার আগেই তা কিভাবে ভেঙে-গুঁড়িয়ে গেছে!

ঐ প্রতিবেদন ছাপা হবার পর আর সিরাজগঞ্জে আসা হয়নি। প্রকাশিত প্রতিবেদন নিয়ে পরবর্তীকালে কী ঘটেছে না ঘটেছে, তাও জানি না। পরে শুনলাম, ঐ ঘেরাওকারীরাই উষ্মার জবানিতে বলল, 'সংবাদে' ঐ রিপোর্ট আর ছবি ছাপা হবার পর সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্তা ঘটনাটি সরজমিনে দেখবার জন্যে বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জে আসেন। তিনি আসেন সরাসরি যমুনার পাড়ে। দেখেন, পত্রিকার বিবরণ সঠিক। একেকটা বোল্ডার তুলে দুতিন হাত ওপর থেকে মাটিতে ফেলা মাত্রই তা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে! সেনাকর্তা স্বাভাবিকভাবেই রাগান্বিত হন, ঠিকাদারদের তৈরি সমস্ত বোল্ডার তৎক্ষণাৎ বাতিল করবার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বলা হয়, এসব অতি নিম্নমানের বোল্ডার যারা বানিয়েছে তাদের বিল যেন পরিশোধ করা না হয়।

তখন ছিল সেনা শাসন। পানি উন্নয়ন বোর্ড অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ মানে। তারা ১২ জন ঠিকাদারের মোট ৬০ লাখ টাকার বিল আটকে দেয়। বেশি বালু মিশিয়ে বেশি লাভ করবার যে প্রবণতাটি ছিল, তা ঐ বোল্ডারের মতোই গুঁড়িয়ে যায়।

সেই থেকে ওরা, ঐসব ঠিকাদার, আমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে ছিল। এবার সিরাজগঞ্জে নামামাত্রই আমার এক সাংবাদিক-বন্ধু, তিনি আবার একজন ঠিকাদারও বটে, ওদের কাছে খবরটি পৌঁছে দেন যে, 'এবার মোনাজাতউদ্দিন এসে গেছে, ধরো তাকে।'

এবং এই 'ধরার' জন্যে গত ২ দিন ধরে ওরা খুঁজছিল আমাকে। গিয়েছিল শহরে বিভিন্ন হোটেলে, কিন্তু পায়নি। খুঁজতে গিয়েছিল আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর বাসায়, সেখানেও পায়নি। আর, এখন, ঘটনাচক্রে যমুনার পাড়ে ওদের আস্তানায় বাগে পেয়ে গেছে আমাকে।

তবু ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও যদি গন্ধ পেতাম আমি, এখান থেকে সটকে পড়তাম। কিন্তু তা হয়নি। দ্বিতীয়বারের মতো আবার সেই বোল্ডার পারকোপাইন ফেলা নিয়ে অপকর্ম হচ্ছে এই ছবি তোলার জন্যে একেবারে বাঘের মুখে এসে পড়েছি। আগে জানলে এদিকটা তো মাড়াতামই না বরং চম্পট দিতাম সিরাজগঞ্জ শহর থেকেই। কে চায় বেঘোরে প্রাণটা দিতে! তাও আবার একবছর আগেকার এক রিপোর্টের কারণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আর কী করা যাবে! ঘেরাওয়ের মধ্যে যখন পড়েছি, তখন উদ্ধার পেতেই হবে, অন্তত প্রাণটা বাঁচাতে হবে। কিন্তু কৌশলটা কী? ওরা পাঁচজন, দেখলেই বোঝা যায় একেকজনের শরীরে শক্তি কত! একটা ঘুষি মুখে পড়লে থেঁতলে যাব। আর এখানে তো ওরা পাঁচজন শুধু নয়, ভাঙন ঠেকানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিক, শ্রমিক সর্দার, এমনকি পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাতি-কর্মচারীরাও তাদের দলে। এই অবস্থায় আমি মাথাটা খুব ঠাণ্ডা করে নিলাম। যেন বরফ ঢাললাম মাথায়। কিন্তু রক্ষা পাবার কৌশলচিন্তা কাজ করছে খুব দ্রুত। একটা ছেলে গেছে দড়ি আনতে। কী কারণে তার দেরি হচ্ছে জানি না, তবে যতক্ষণ সে ফিরে না আসে, ততক্ষণ রক্ষা। আমাকে ঘিরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ... এখনও মারপিট শুরু করেনি।

হঠাৎ আমি ঘেরাওকারীদের একজনকে, যে আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। বললাম, 'আপনি কি আমাকে একটা সিগারেট দিতে পারেন? আপনাদের দড়ি আসুক, আমি ততক্ষণে একটা সিগারেট খেয়ে নি। এই বলে মিছিমিছি পকেট হাতড়াতে থাকি। বলি, 'শালার সিগারেটের প্যাকেটটা যে কোথায় পড়ে গেল!'

যুবকটি হঠাৎ এগিয়ে আসে। একেবারে আমার সামনে। খুব ভয় পেয়ে যাই। তার ভঙ্গি দেখে বুক কাঁপে, এই বুঝি ঘুষি মেরে বসে। শরীরটা টানটান করি। প্রস্তুত আমি। থির চোখে লক্ষ করছি তার ডান হাত। না, ঘুষি আটকাব না, কিন্তু ডান হাতটি ওঠার মুহূর্তে সরিয়ে নেব মাথা। কিন্তু সে আমাকে সেই সুযোগ দিল না। ঘুষি ঠেকানোর জন্যে যখন আমি ভীষণ প্রস্তুত, তখন সে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ল, বা হাত দিয়ে আচমকা এক বিদ্যুৎ-বেগ ঘুষি ছুড়ে মারল আমার তলপেট লক্ষ করে।

তলপেটে লাগলে কী হতো জানি না, কিন্তু ঘুষি লক্ষচ্যুত হলো। লাগল ডানদিকের উরুতে। উরু দুহাতে চেপে ধরে আমি কঁকিয়ে উঠলাম এবং যতটা না লেগেছে তার চেয়ে বহুগুণ ব্যথা ও আতঙ্কে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলাম : 'ওরে বাবারে, আমাকে মেরে ফেলল রে!'

যমুনার গর্জন ছাপিয়ে উঠা সেই চিৎকারে যে-কোনো খুনিরও বুঝি আত্মা কেঁপে ওঠার কথা, কিন্তু আমার সেই মুহূর্তের এই কৌশলটি ছিল অন্যরকম। প্রথমত, আমি এই গুণ্ডা ঠিকাদারটিকে বোঝাতে চাই, আমি তার ঘুষির চোটে খুবই ব্যথা পেয়েছি। দ্বিতীয়ত. চিৎকার করে জটলায় জড়ো করতে চাই আরও কিছু লোক। এখানে, এই সমাবেশেও থাকতে পারেন এমন কেউ যিনি আমার হয়ে একটি অন্তত কথা বলবেন। দেশ ও সমাজ তো সবটাই আর গুণ্ডা-মস্তানদের দখলে চলে যায়নি!

হ্যাঁ, এলেন একজন এগিয়ে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় একজন নেতা। আমি জানে পানি ফিরে পেলাম। কিন্তু হায়, এ কি কাণ্ড! ভিড় ঠেলে সামনে এসে সেই লোকটি উল্টো বর্ষণ করতে লাগল যাচ্ছেতাই গালাগালি। যুবকদের উদ্দেশে উপদেশ বর্ষণ করল : 'আইজ বালা কইরা বানাও এই ব্যাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্বাদিকরে।' তারপর তিনি যা বললেন, তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল : এই যে প্রগতিশীল দলের রাজনৈতিক নেতা, ইনিও আমার ওপর ক্ষুব্ধ। কেননা ঐ যে ১২ জন ঠিকাদার, গতবারের ঘটনায় যাদের ৬০ লাখ টাকার বিল আটকে গিয়েছিল, ইনিও তাদের একজন।

ভণ্ড রাজনীতিক চরিত্র নিয়ে চিন্তা করবার সময় তখন নয়। আমি উদ্ধার পেতে চাই। ওরা মারবে জানি, কিন্তু যতটা সম্ভব সে মার এড়াতে হবে। দড়ি বেঁধে যমুনায় নিক্ষেপ করবার আগেই আমাকে সরে যেতে হবে এখান থেকে।

কিন্তু কিভাবে?

চিন্তাশক্তি যেন শীতল হয়ে যাচ্ছে। মানসিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ সেই মুহূর্তে সামনে ভেসে ওঠে আমার মৃত পিতার মুখ, আমার মায়ের মুখ, আমার স্ত্রীর মুখ, সন্তানদের মুখ। প্রথম ঘুষিটি খেয়ে 'ওরে বাবারে' বলে মিছিমিছি চিৎকার করে উঠলেও আমি কাঁদিনি, কিন্তু এবারে মনে হচ্ছে সত্যি আমি কেঁদে ফেলব। বাঁচার শেষ ভরসা হিসেবে যে লোকটিকে ভেবেছিলাম আমার ত্রাণকর্তা, তার গালাগালি ধমক আর 'এবার বানাও এই সাম্বাদিকরে' শুনে মানসিকভাবে দারুণ আপসেট হয়ে গেলাম।

না, বাঁচতে হবে।

উদ্ধার পেতে হবে।

উপস্থিত শত্রুকে পরাজিত করতে হবে।

সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট লিখে এসে এতদিন পর এই পাঁচ-ছজন লোকের দৈহিক শক্তির কাছে তুমি পরাজিত হবে মোনাজাতউদ্দিন?

AMARBOI.COM

আমি হঠাৎ চিৎকার করে উঠি। জনসভায় নেতাদের বক্তৃতার মতো হাত নেড়ে নেড়ে বলতে থাকি : ভাইসব, আপনারা আমাকে মারবেন, মারেন, আমার তাতে আপত্তি নাই। আপনারা আমাকে দড়ি বেঁধে যমুনায় ফেলে দেবেন, দিন, আপত্তি নাই। তবে যা-ই করেন, আগে আমার একটা কথা আপনাদের শুনতে হবে ভাইসব ...

গোটা সমাবেশ হঠাৎ স্তব্ধ। যুবকেরা, যারা ঘেরাওকারী, বুঝতে চাচ্ছে আমি কী বলতে চাচ্ছি। লক্ষ করি, দাঁড়ানোর পূর্ব-ভঙ্গি একটুখানি বদলে গেল তাদের। আমি একই কণ্ঠে বলতে থাকলাম : ভাই ঠিকাদারেরা, আপনারা আমাকে মারেন। ইচ্ছা মতোন মারেন। কিন্তু একটা কাজ করেন। একসাথে সবাই আমাকে মারপিট শুরু করবেন না। এক কাজ করেন, আমাকে আপনারা একজন একজন করে মারেন।

সমাবেশ এখনও স্তব্ধ। আমি আবারো বলতে থাকি : ঠিকাদার ভাইগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি এখানে একা, তার ওপর চেহারা দেখেও বুঝতে পারছেন আমার গায়ে শক্তি নাই। আমি একটা লম্বা-রোগা-দুর্বল মানুষ। এই অবস্থায় আপনারা পাঁচ ছয় জন লোক আমাকে যদি একসাথে মারতে থাকেন, তাহলে আমি হয়তো মারা যাব, তাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষতি হবে আপনাদেরই ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে বলতে মুহূর্তের জন্যে থামি। উপস্থিত কুলি-কামিন, লোকজন, প্রগতিশীল সেই রাজনৈতিক নেতা তথা ঐ যুবকগণও হা হয়ে আমার কথা শুনছে। আমি তৎক্ষণাৎ আবার শুরু করি : ভাইসব, আপনারা হয়তো প্রশ্ন করবেন, আপনাদের আবার কী ক্ষতি হবে? তাই না? হ্যাঁ, ক্ষতি হবে। এই মারপিটের ঘটনা যখন একটু পরে সিরাজগঞ্জ শহরে ছড়িয়ে যাবে, তখন লোকে আপনাদের ধিক্কার দেবে, ছি ছি করবে, আপনাদের গায়ে থুথু ছিটাবে। তারা বলবে ... তারা বলবে ... আপনারা পাঁচ-ছয়জন স্বাস্থ্যবান যুবক হাতের কাছে পেয়ে মাত্র একটি রোগা লম্বা মানুষকে মেরেছেন! ছি ছি ছি!

সচেতন আছি, কথা আবার বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা, কিংবা ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিনা। নিস্তব্ধ জনতার উদ্দেশে দেওয়া আমার বক্তব্যে একই কণ্ঠে বলতে থাকি : ভাইয়েরা আমার, আপনারা তাই এক কাজ করুন। আমি পালাব না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব, কিন্তু আপনারা একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নিন, কে আমাকে প্রথমে মারবেন, তারপর কে মারবেন, তারপর কে মারবেন এবং এইভাবে একজন একজন করে মারলে অনেকক্ষণ ধরে আমাকে মারা যাবে। ... আর এই যে আমাদের চারদিকে উপস্থিত জনতা, তারাও অনেক সময় ধরে এই মারপিটের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন ...। নাকি বলেন ভাইসব? ঠিক বলি নাই? প্রশ্নের চোখ নাচাই চারিদিকে।

আমি কথা বলেই যাচ্ছি। যতক্ষণ গুণ্ডাদের পক্ষ থেকে হামলা না আসে, কথা আমি বলেই যাব। আমি সময় নিচ্ছি, ইচ্ছে করেই বেশি কথা বলে বেশি সময় নিচ্ছি। এটা একটা সাধারণ মনস্তত্ত্ব যে, যে বা যারা আপনাকে মারবে, তারা যদি উত্তেজনার গরম গরম অবস্থায় সেই কর্মটি সম্পন্ন না করে, তাহলে পরের মুহূর্তে সেই মারমুখিতা তাদের আর না-ও থাকতে পারে।

কথা বলেই যাচ্ছি। পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। পনেরো মিনিট। সবাই চুপচাপ। দুয়েকজন দেখি দাঁত বের করে হাসছে আমার কথা শুনে। সিগারেট ধরালো দুই গুণ্ডা পাশাপাশি এসে। চোখের সেই সর্প-চাহনি এখন আর নেই। ফুরফুর করে ধোঁয়া ছেড়ে আবার আমার কথায় ওরা কান দিল ...।

... এই সময়, লক্ষ করি, ভিড়ের দিকে এগিয়ে আসছে দুই যুবক। এদের একজনকে চিনে ফেলে মনে মনে আমি হঠাৎ খুব উৎফুল্ল। সে স্থানীয় কলেজ ছাত্র সংসদের এক নেতা। দুতিন বছর আগে সিরাজগঞ্জেরই এক বাসায় দেখা হয়েছিল। আমি আমার কথা থামিয়ে হাত তুলে সেই ছেলেটির দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

: কী হয়েছে এখানে!

প্রশ্ন করে ছাত্রনেতা। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে আমাকে সে ভুলে গিয়েছে কি-না এই ভেবে আমি তার উদ্দেশে বক্তৃতার সুরেই চিৎকার করে উঠি : এই যে, এদিকে আসুন। আমার নাম মোনাজাত, আমি সংবাদের রিপোর্টার, ঐ যে আপনার সাথে সেবার পরিচয় হয়েছিল!

: মোনাজাত ভাই? আপ্‌নে? আপ্‌নে এখানে? কি অইচে?

আমি অতি সংক্ষেপে এবং দ্রুত ঘটনাটি তাকে জানাই। শুনে হঠাৎ হুংকার দিয়ে ওঠে ছাত্রনেতা। তার সাথীকে বলে, যা তো রে, কলেজে যা, দৌড় দিয়া গিয়া সবগুলান ছাত্রদের ডাইকা আন্! যা ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রদের ডাকতে হয় না। লক্ষ করি, ঐ পাঁচ যুবক, এখন ল্যাজ গুটানো কুকুরের মতো অবস্থা, সুরসুর করে সরে যাচ্ছে আমার চারদিক থেকে, ভেগে যাচ্ছে তাদের চেলা-চামুণ্ডা, ভেঙে যাচ্ছে উৎসাহী জনতার সমাবেশ। আমি মুক্ত। তবু ছাত্রনেতাটি বলে, 'আসেন মোনাজাত ভাই, আপনে আমার সাথে আসেন!' তারপর আমাকে টেনে নিয়ে যমুনা পাড়ের এলাকা ত্যাগ করতে থাকে। বুঝতে পারি সে খুব রেগে গেছে। আমাকে সাথে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গালি বর্ষণ করছে ঐ মস্তানদের উদ্দেশে : 'শালারা! বদমাইশের দল! কার গায়ে হাত তোলো তোমরা! তোমাদের বাপের গায়ে হাত তোলো গিয়া যাও!' এই বলে সে আমার কাছে কৈফিয়ত চায় : আমাদের আগে খবর দেন নাই ক্যান্ মোনাজাত ভাই? কে কারে নদীতে ফ্যালে, দেখাইতাম! শালা খবিশের জম্মা! হারামির টাকা বানাইবো আবার তা ল্যাখ্লে সাংবাদিকের ওপর হামলা করব! কুত্তারা, এখন পালাইলা ক্যান? আসো না দেহি!'

ছাত্রনেতাটি আমাকে ধারেকাছের এক বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি গৃহকর্তা আমার পূর্ব পরিচিত, শহরে যথেষ্ট প্রভাবশালী, একটি সেবা-সংস্থার প্রধানকর্তা, 'সংবাদে'র পোকা পাঠক। চা খেতে খেতে তিনি ঘেরাও ঘটনাটি শোনেন। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে নির্দেশ দেন একজনকে, 'যা তো, ওদের এখানে ডেকে নিয়ে আয়! আমার কথা বল!'

মিনিট দশেক পরে ওরা একত্রে পাঁচ জনই হাজির। প্রথমে বাইরে ইতস্তত, তারপর ঘরে ঢোকে সারিবদ্ধ। নতমুখ সবার। তারপর কিছুক্ষণ গৃহকর্তার এটা-ওটা গালাগালি হজম করার পর তাদের 'নেতা বলে উঠে : আমাদের মাফ করে দেন ভাই। আমরা আপনার ছোট ভাইয়ের মতোন ... ভুল কইরা ফালাইচি।

আমি হাসতে থাকি। বলি, মাফ আপনাদের করা যায় না। কেননা আপনারা শরীরে মস্তান, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধিতে এককেটা আহাম্মক।

ওরা নতমুখ। কেউ মাথা চুলকায়, কেউ হাত কচলাতে থাকে। আমি আবার বলি : আহাম্মক কেন বললাম, বুঝেছেন?

দলনেতা মুখ তোলে হা করে। পরক্ষণেই আবার নত হয়। আমি বলি, আরে বাপু, কাউকে মারতে হলে সময় নেওয়া বা দেওয়া যায় না। গরমাগরম মেরে দিতে হয়। আমি যে সময় নেওয়ার জন্যে খামাকা ঐ বকর বকর করছিলাম, তা আপনারা বোঝেননি? গাধারও তো গায়ের জোর আছে ... কিন্তু মাথায় বুদ্ধি নেই ... আপনাদের অবস্থা হয়েছে ঐ রকম!

দলনেতা বলে উঠে, 'আর লজ্জা দিয়েন না মোনাজাত ভাই। মাফ করেন। তারপর হাত চুলকিয়ে বলে, চলেন, আপনি কোথায় উঠেছেন, চলেন, আপনাকে আমরা পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আমি বলি, ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারব।

গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিই। ঐ ছাত্রনেতাটির সাথে করমর্দন করি। আপনাকে ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর কুদ্দুস আর আমি, বাড়ির ভিড় মাড়িয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে। সামনে পাওয়া একটা রিকশায় চেপে বলি, কুদ্দুস, আমাকে একটা স্টুডিও-তে নিয়ে চলেন। ছবি প্রিন্ট করতে হবে। ধারেকাছে কিছু নিউজপ্রিন্ট পাওয়া যাবে তো? একটা বড় খাম? ভুয়াপুরের সর্বশেষ লঞ্চটা ছাড়ে কখন?

কুদ্দুস প্রশ্ন করে : ক্যান? রিপোর্ট কি আজি পাঠাবেন নাহিন?

ছবি বেরিয়ে আসে ডার্করুম থেকে। ঘণ্টাখানেক বাদে লেখা হয়ে যায় কয়েকঘণ্টা আগে সংগৃহীত ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন। ছবিটি মোটামুটি ভালোই হয়েছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যমুনাবক্ষে নিক্ষেপের জন্যে যে বাঁশের খাঁচা বানানো হয়েছে, তা ফাঁকা, একটিও ইট নেই। প্রতিবেদনে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে শহররক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা আর ঠিকাদারদের দুর্নীতির।

স্টুডিও থেকে লঞ্চঘাট। ছবি ও প্রতিবেদনের একটি প্যাকেট বাহক মারফত চলে যায় ঢাকায়, 'সংবাদে'। লঞ্চঘাট থেকে চলে আসি আমার আস্তানায়। ব্যাগপত্র গুছিয়ে সোজা রেলস্টেশনে। রাতে নামি ঈশ্বরদী জংশনে।

পরদিন দুপুরে ঈশ্বরদীতে পত্রিকা এসে পৌঁছুলে দেখি : 'সংবাদ' এ প্রতিবেদনটি প্রথম পাতায় লিড আইটেম হিসেবে ছেপেছে। সঙ্গে আছে ছবি। ইট-শূন্য সেই বাঁশের খাঁচা।

AMARBOI.COM

মস্তান ঠিকাদারদের ঘুষিতে আমি কাঁদিনি। কিন্তু সদ্য প্যাকেট খোলা 'সংবাদ' সামনে মেলে ধরে এই মুহূর্তে বিচিত্র এক অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসে। গলার কাঁটার কাছে শিরশির করছে। চোখ ঠেলে নির্গত হচ্ছে অশ্রু।

আমি বুক সোজা করি। না, আমাকে কেউ নত করতে পারবে না। আসুক শত হামলা, তবু আমি সত্য লিখব।

'টাকাটা দ্যেন ছার।' পত্রিকার হকার হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ থেমে যায় তার কথা। অপলক চোখে সে তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। তারপর, আমি যখন পকেট থেকে খুচরো টাকা বের করতে ব্যস্ত, তখন সে থেমে থেকে জিজ্ঞেস করে, কী হইচে ছার? কাঁদেন ক্যান আপনে?

আমি চোখ মুছতে মুছতে বলি : না, এমনি ...

আরেক ঘেরাও

সিরাজগঞ্জের ঘেরাও ঘটনার পর প্রায় একই রকম ঘটল আমনুরায়। আমনুরা একটি জংশন স্টেশন : রাজশাহী থেকে রেলপথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বা নাচোলের দিকে যদি যান, মাঝখানে পাবেন এই আমনুরা।

না, আমনুরা নয়, গিয়েছিলাম নাচোলে। যেখানে একটা বিদ্রোহের বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে এখন এত যুগ পর রাজনৈতিক সচেতনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটি কি রকম, তা-ই দেখতে গিয়েছিলাম। দেখব সেখানকার বর্তমান কৃষককুলের অবস্থাটা কী, সাঁওতালদের বংশধর কেউ আছে কিনা, নাচোল বিদ্রোহ সম্পর্কে এই প্রজন্ম কতটা কী জানে, এইসব আর, ইচ্ছে ছিল ঐ এলাকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থা, খাবার পানিপ্রাপ্তির উৎস, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, এইসব সামাজিক সমস্যা-বিষয়ের ওপর বিস্তারিত একটা জরিপ চালাব।

জরিপ শেষ হলো। নাচোল থেকে ফিরে আসছি রাজশাহীতে। একটা লোকাল ট্রেনে চেপেছি। সে ট্রেনে এমনই ভিড় যে, তিল ধারণের জায়গা থাকলেও মানুষ দাঁড়ানোর মতো জায়গা সত্যি ছিল না। টয়লেটে পর্যন্ত এক চাপ নরনারী, তারওপর আছে ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগি, চালের বস্তা, আর ভারত থেকে আসা চোরাচালানির বিভিন্ন মাল। ছাদে মানুষ, ভেতরে মানুষ, মানুষ পা-দানিতে; এমনকি দুই বগির সংযোগ-স্থানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাটিতেও।

কামরায় দাঁড়িয়ে থাকতে জান বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থা। এই সময়ে প্যাসেঞ্জার কাম-গুডস ট্রেনখানা ফোঁসাতে ফোঁসাতে আমনুরা জংশনের প্লাটফরমে এসে দাঁড়ালো। এত মানুষ ও মালামাল বহন করে যন্ত্রশকটটি যেন গাঢ়-ঘন নিঃশ্বাসের সাথে দারুণ হাঁপাচ্ছে।

আমনুরায় কিছুক্ষণ 'লেট' করবে ট্রেনখানা। এই শুনে জানালা গলিয়ে অতিকষ্টে প্লাটফরমে নামলাম। একটুখানি বাতাস এবার পাওয়া গেল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গেছে। 'বৈঠক' করে নিলাম বারকয়েক। তারপর এদিক-ওদিকে হাঁটছি। এই সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আরেকখানা ট্রেন ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পড়ল। এটিও একটি লোকাল ট্রেন।

ঐ ট্রেনখানা দাঁড়ালো প্লাটফরমের আরেকদিকের লাইনে। নামল যাত্রী। এই সময়ে হঠাৎ চোখ পড়ল ইঞ্জিনের ওপর। ইঞ্জিনের এধারে, আমি যেদিকটা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে বস্তার ঢিপ। ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের বস্তা।

তা কী আছে বস্তায়?

একটু এগিয়ে যাই।

দেখি, বস্তাগুলো নামানো হচ্ছে। আর পাশে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম-পরা এক গার্ড সাহেব। ওমা! তিনি দেখি প্রকাশ্যে টাকা তুলছেন। ইঞ্জিনের বডিতে বহন করে আনা চালের বস্তা যাদের, তারা খুব সুশৃঙ্খল না হলেও লাইনমতো করে দাঁড়িয়েছে। এদের একজন একজন করে ঐ গার্ড সাহেবের কাছে আসছে, প্রথমে গার্ডের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে, তারপর নিজ নিজ বস্তা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা যেমন দুঃখের, তেমনি আবার মজাও লাগল। দুর্নীতির নানা রূপ আমি দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে দেখেছি, কিন্তু রীতিমতো লাইন করে দাঁড়িয়ে রেল কর্মচারীর হাতে টাকা-পয়সা ধরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার আগে কোথাও কখনো দেখিনি।

ছবিটি তুলতে পারলে তা হবে 'সংবাদ' পাঠকদের জন্যে উপভোগ্য। আমি ভাবছি, ওয়াইড লেন্স থাকলে সুবিধে হতো : পুরো লাইন এবং ইঞ্জিন সবটারই ছবি ফ্রেমে ধরা যেত। ভাবছি, সুবিধে হতো টেলিলেন্স থাকলে। তাহলে দূর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিটি তোলা যেত, ওরা কেউ টের পেত না, টাকা দেওয়া-ওয়োর 'অ্যাকশন' পাওয়া যেত। কিন্তু ক্যামেরার সাথে ঐধরনের মূল্যবান লেন্স ব্যবহার করবার মতো সৌভাগ্যবান সাংবাদিক তো আমি আর নই!

আসল ব্যাপার, যেটা আমার চিন্তা করা উচিত ছিল, করিনি। ক্যামেরা খুলতে খুলতে এগিয়ে গেলাম, খুব কাছে গিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে শার্টার টিপলাম কয়েকটা। এই মুহূর্তে আমি খুব উত্তেজিত। ছবি নিলাম ইঞ্জিনের বগিতে চালের বস্তার স্তূপের। ঐ গার্ড সাহেবের টাকা তোলার। বস্তা মালিকদের 'কিউ'-এর। তারপর, আত্মতৃপ্তির সাথে যখন ক্যামেরার খোলস লাগাচ্ছি, আমার ট্রেনের কাছে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার পথ রুদ্ধ। খবর পেয়ে কয়েক মুহূর্তেই এসে জুটেছে ওরা। আমি ঘেরাও হয়ে গেছি।

সিরাজগঞ্জের মতো এবারেও বুক কেঁপে ওঠে। কাঁপে বুঝি পা। ঘেরাওকারীদের একজনের কর্কশ প্রশ্ন : আপনি কে? সাম্বাদিক? কোন্ পেপারের সাম্বাদিক?

চোখ ঘোরাই। আমার ডানে-বায়ে-সামনে-পেছনে রেলওয়ের স্টাফ। স্টেশন মাস্টার থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত। আছেন ঐ গার্ড সাহেব, চেকার সাহেব, পয়েন্টসম্যান থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী। এমনকি কিছু কুলিও জোগাড় করে এনেছেন ওরা। কেউবা নেহায়েত মজা দেখবার জন্যে হাজির।

: কথা বলেন না ক্যান? কে আপনি? ক্যানো এই পিক্চার তুললেন?

প্রশ্নবাণ চলছেই। আমি ভয় পাই। এ আবার কী বিপদে জড়িয়ে পড়লাম! না, এভাবে হুট করে ছবি তোলা তো আদৌ ঠিক হয়নি!

আমি কথা বলছি না। সময় নিচ্ছি ভাবনাচিন্তায়। সাংবাদিক পরিচয় দেব? তাহলে তো নির্ঘাত মারপিট করবে। ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে পারে। না, এই মুহূর্তে পেশাগত পরিচয়টি দেব না। বলব শৌখিন ফটোগ্রাফি করি, কিংবা ভ্রমণে বেরিয়েছি, শখ করে এইসব ছবি তুললাম। কিন্তু না, এতেও বিপদ হতে পারে। ওরা দলে অনেক। কেউ যদি হুট করে আমার বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে বসে, বিপদ ঘন হয়ে যাবে। বেরিয়ে আসবে সংবাদের আইডেনটিটি কার্ডখানা।

না, ভাবনায় অত সময় দেওয়া যাবে না। কেননা 'মব' খুব উত্তেজিত। আমার মুখে কোনো কথা নেই, এতে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল, 'শালার ক্যামেরাটা আগে নেন গাড্ সাহেব। খুলে দেখেন কী কী পিক্চার শালায় উঠাইছে!' আরেকজন বলল, 'ও শালায় কথা কয় না ক্যান্? দেন না দেখি কয়েকখান্ থাপ্পড়।'

ঐ গার্ড সাহেব, যার ছবি তুলেছি একটু আগে, তিনি খুব ধীরস্থির কিন্তু রাগে মুখের পেশি লাফাচ্ছে। তিনি আমার একেবারে মুখোমুখি এসে খুব গম্ভীর, কর্কশ এবং নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন, 'চলেন, আমার সাথে চলেন। মাস্টারের ঘরে যাই। দেখি কোন্ আইনে আপনি আমাদের ছবি তুললেন!'

: না, আমি যাব না। যা বলবার বা করবার, এখানেই করুন। আমি রাগের কণ্ঠে বললাম। নরম করে কথা বললে এরা আরও পেয়ে বসবে হয়তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: যাবেন না?

: না।

: তা ফটো তুললেন ক্যেন? জানেন না এটা সরকারি জায়গা? সরকারি জায়গায় ফটো তুললে পারমিশন লাগে! আছে আপনার পারমিশন?

: পারমিশন লাগে আমার জানা নেই। আর আমার দুলাভাই, তিনি আমাকে কোনো পারমিশনের কথা বলেন নি!

: দুলাভাই? কে আপনার দুলাভাই?

: আপনার ঐ রেলওয়ের হেড। রেলের চেয়ারম্যান।

মিথ্যা কথা মুখে চলে আসে। এই মুহূর্তে 'দুলাভাই' ভাঙিয়ে যদি এই ঘেরাও আর অবশ্যম্ভাবী হামলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়! কিন্তু না, ওরা বিশ্বাস করল না। বোধহয় চেহারায় রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবের শালা বলে মনে হলো না আমাকে। একজন বলল, 'শালা মিছা কথা কয়। চলেন, ওরে মাস্টারের ঘরে নিয়া যাই।' আরেকজন বলল, 'একটু বানান্ দেই, নাইলে সত্য কথা কইবে না।' গার্ড সাহেব বললেন, 'আপনি যে-ই হোন, পরে দেখা যাবে। এখন ক্যামেরার 'রীল' খুলে দিন।' তার কণ্ঠে ধমক।

ইতোমধ্যে এসে গিয়েছিল দুজন রেল পুলিশ। চালের বস্তা থেকে আদায় করা টাকার ভাগ এরাও পায়, সে কারণে 'সরকারি জায়গায় ফটো তোলার মতো অপরাধ' বিবেচনা করে তারাও ক্ষিপ্ত। ওদের একজন আমার এক হাত বগলদাবা করল। তাদের মুখে তুই-তোকারি। চলো মিয়া, আমাদের ফাঁড়িতে চলো।

আমি খুব অসহায়। ঈশ্বরকে ডাকছি। এই সময়, ঈশ্বর যেন সত্যি সাড়া দিলেন। ভিড়ের ওপাশ থেকে কয়েকজনের কণ্ঠ : কী হয়েছে এখানে! কী হয়েছে!

লম্বা মানুষের কিছু যেমন অসুবিধা, তেমনি সুবিধাও আছে। ভিড়ের মধ্যেও দূরের জিনিস দেখা যায়। দেখি, ভিড়ের ওপাশে সুঠামদেহী জনা-আষ্টেক যুবক। বেশবাস ফিটফাট। আমার অনুমান ভুল না হলে ওরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

: আপনারা কারা ভাই? রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র? আমি চিৎকার করে জানতে চাই।

: হ্যাঁ, আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। কী হয়েছে আপনার? কে আপনি?

আমি একই কণ্ঠে বলি, বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে বাঁচান। আমার নাম মোনাজাতউদ্দিন, আমি সংবাদ পত্রিকার এক সাংবাদিক। এখানে একটা ছবি তুলছিলাম ...

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে যাব। দরকার হলো না। 'আপনিই মোনাজাতউদ্দিন?' বলল একজন ছাত্র। কিন্তু লাফিয়ে এগিয়ে এলো ওরা সবাই, একসাথে। 'সরেন, সব সরেন! ভাগেন! নইলে একটাকেও আস্ত রাখব না, সরেন! কণ্ঠে চিৎকার আর দুহাতে ভিড় সরিয়ে ঘেরাওয়ের মধ্যখানে ঢুকে গেল ওরা আটজন এবং আমাকে ঘেরাও করে ধরল।

AMARBOI.COM

রেলপুলিশ দুজন, যারা আমাকে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল, তারা এখন তর্ক শুরু করল। কিন্তু ক্ষান্ত হলো পরমুহূর্তে। ছাত্রদের একজন চিৎকার করে বলে উঠল : ‘বেশি বেশি কথা বলবেন না! যাবেন না রাজশাহীতে? যাবেন না আমাদের ইউনিভার্সিটি স্টেশনে? একেবারে হাড় গুঁড়ো করে দেব! ভাগেন!

আরেকজন বলল, ছবি তুলেছে তো তুলেছে! কী হয়েছে তাতে? টাকাও কামাবেন আবার দেমাকও দেখাবেন! আসুন তো মোনাজাত ভাই আমাদের সাথে, দেখি কে কী করে! আসুন!

চলন্ত ঘেরাও অবস্থায় ছাত্রের দলটি আমাকে সরিয়ে নিয়ে এলো দুষ্কৃতকারীদের ঘেরাও থেকে। প্রায় টেনে এনে তুলল রাজশাহীগামী আমার ট্রেনটির কামরায়। পরমুহূর্তে এ ট্রেনের গার্ডের বাঁশি। ছেড়ে দিল ট্রেনখানা। গুড বাই আমনুরা।

পরে শুনলাম, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে পড়ে, কিন্তু একে অন্যের বন্ধু। আমনুরায় আরেক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। এদের কেউ কেউ নিয়মিত বা অনিয়মিত ‘সংবাদ’ পড়ে। আমার নাম ও লেখার সাথে অনেকদিন থেকেই পরিচিত। আমি বললাম, ‘আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’

আমনুরা স্টেশনে ইঞ্জিনের বডিতে চাল বহন ও টাকা তোলার ছবি ও প্রতিবেদন কয়েকদিন পরে ‘সংবাদে’ ছাপা হয়েছিল। গঠিত হয়েছিল একটা তদন্ত টিম। কিন্তু তারা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছিলেন। শুধু ঐ তদন্তের সময়ে দুচারদিন ইঞ্জিনে চালের বস্তা বহন ও টাকা তোলা বন্ধ ছিল, তারপর আবার তা আগের মতোই শুরু হয়ে যায়। এখনও সমানে চলছে।

আমনুরার সেই ঘটনা মনে হলে ছাত্রদলটির কথা স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে। এতদিনে পাস করে বেরিয়ে এখন তারা হয়তো চাকরি কিংবা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কিন্তু বন্ধুগণ, যেখানেই থাকুন, যেভাবেই থাকুন, ভালো থাকুন আপনারা।

অপারেশন : র. মে. ক. হা.

হঠাৎ আমার বুকের ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ধড়াস্ করে পড়ে গেলাম মাটিতে। প্রতিবেশী কতিপয় যুবক তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স ডেকে এনে নিয়ে গেল হাসপাতালে। প্রথমে এমারজেন্সি ওয়ার্ড, সেখান থেকে জেনারেল ওয়ার্ড, তিনদিন বাদে একটি কেবিনে।

দেশের প্রায় সবগুলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমি দেখেছি। এগুলোর সমস্যা কমবেশি একই রকম। তা, আমার পক্ষে সবগুলো হাসপাতালের সমস্যার ছবি তোলা সম্ভব নয়, তাই একটি হাসপাতাল অন্তত পাঠকের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। এখানে কয়েকটি সুবিধে আমি পাব, যেমন ডাক্তারদের অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত, পরিচিত কলেজের বেশকিছু বলিষ্ঠ চরিত্রের ছাত্র। এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, চায় সত্য বেরিয়ে আসুক, জনমত সৃষ্টি হোক, সমস্যার দিকে সরকারি মহলের নজর পড়ুক। আরেক সুবিধা হলো : বাসার কাছাকাছি হাসপাতাল, সে কারণে লাগেজ বহন, খাবার ও যাওয়া-আসায় সুবিধে হবে।

সাধারণভাবে হাসপাতালের সমস্যার ওপর যেসব ছবি তোলা হয়ে থাকে, তেমনটি আমিও করতে পারতাম। কিন্তু তবু রোগী সেজে ভর্তি হলাম কেন? এর কারণ হলো : শুধু সাংবাদিক নয়, একজন রোগী হিসেবে আমি হাসপাতালের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চাচ্ছিলাম। এতে ডাক্তারদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করা যাবে, দেখা যাবে নার্স আর সাধারণ কর্মচারীরা কী করছেন, ওষুধ চুরি কিভাবে হচ্ছে, রোগীদের খাবার কোন্ পথে সরানো হচ্ছে ইত্যাদি। আর আমার ভেতর এই চিন্তাটি কাজ করছিল যে, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছবি তুলতে হলে বাইরে থেকে সাংবাদিক হিসেবে ওখানে গেলে চলবে না। কেননা যেমন ধরুন, অভিযোগ রয়েছে হাসপাতালের বিদ্যুৎ চলে গেলে অপারেশন থিয়েটারে টর্চলাইট জ্বালিয়ে অপারেশন কর্ম চালু রাখা হয়। এই ছবি আমি কিভাবে পাব? কিভাবে তুলব? আমি হয়তো সন্ধ্যায় গিয়ে বসে আছি, সঙ্গে ক্যামেরা, কিন্তু ঐ রাতে কারেন্ট একবারের জন্যেও ট্রিপ করল না। তখন কি করব? সারারাত বসে-জেগে থেকে ফিরে আসব? আবার, এমনও তো হতে পারে যে, আমার উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ চলে গেল, কিন্তু সে সময় কোনো অপারেশন চলছে না। সেক্ষেত্রেও শুধু অপেক্ষা আর হতাশ হওয়া ছাড়া আর কিছু থাকবে না। তাই, এক ডাক্তার-বন্ধু, যিনি চাচ্ছিল রংপুর হাসপাতালের সঠিক চিত্রটি বেরিয়ে আসুক, তিনি পরামর্শ দিলেন : 'তুমি দোস্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও।' তিনি আরও জানালেন, প্রয়োজনীয় সবধরনের সাহায্য তোমাকে করা হবে।

এখানে, সুহৃদ পাঠকদের জন্যে বলে রাখি, আপনারা যখন কোনো সাংবাদিকের কিংবা আলোকচিত্রীর সাড়া জাগানো কোনো রিপোর্ট বা ছবি দেখে বিস্মিত হন, যখন ভাবেন এই সিরিয়াস ঘটনাটি কিভাবে বেরিয়ে এলো, তখন অনুগ্রহ করে স্মরণ করবেন যে, এর পেছনে আছেন অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো 'সোর্স'। হ্যাঁ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ 'সোর্স'-ই, এক বা একাধিক, তাঁরা সাংবাদিককে নানাভাবে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেন। তবে এঁরা সংবাদপত্রের জন্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ হলেও থেকে যান পাঠকদের অজানা।

একবার হলো কী, সরকার এক সার্কুলার জারি করে বসলেন, কোনো সরকারি কর্তা-কর্মচারী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে পারবেন না। ঐ চিঠিটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু পরদিন দেখা গেল সেই সরকারি চিঠির ফটোকপিটাই পত্রিকার প্রথম পাতায় বিরাট করে ছাপা হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই পাঠক খুব বাহ্বা দিলেন সাংবাদিককে।

আসলেই প্রশংসা পাবার মতো কাজ করেছেন সাংবাদিক-বন্ধুটি। একদিকে সরকার উপদেশ দেবেন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার, বলবেন দেশে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, অন্যদিকে সচিবালয়ের কর্তাদের বলবেন 'সাংবাদিকদের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলা বারণ।' মুখে এক কথা, কাজে অন্যরকম—এই নীতিটি উলঙ্গ হয়ে পড়ল ঐ সাংবাদিকটির তৎপরতায়। কিন্তু, ঐ গোপন সার্কুলারটির ফটোকপি কিভাবে সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে এলো সাংবাদিকের হাতে? সে খবর তো সাধারণ পাঠক রাখেন না। হ্যাঁ, ঐ সময় সরকারের একজন কর্মকর্তাই ঐ সার্কুলারের ফটোকপি সাপ্লাই করেছিলেন।

অবশ্য না, শুধু সোর্স-ই যে পাঠকের কাছে অজানা থাকেন, তা নয়। থাকেন আরও অনেক মানুষ, তাদের শ্রম-ঘাম। তথ্যশূন্যতার কারণে সাংবাদিক বলতে অধিকাংশ সাধারণ পাঠক বুঝে থাকেন 'রিপোর্টার'কে। কখনো বোঝেন ফটোগ্রাফারকে। কেউ কেউ সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় লেখকদেরও সাংবাদিক বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু এর বাইরেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ : যেমন বার্তা সম্পাদক, চীফ সাব এডিটর, শিফট ইনচার্জ, সাব-এডিটর। অনেক ধৈর্য ও পরিশ্রমে এঁরা দেশ-বিদেশ থেকে আসা খবরগুলো অনুবাদ করেন, কেউ সম্পাদনা করেন, কেউ হেডিং লিখে দেন, পেজ মেকআপ করেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকের চোখের আড়ালে থাকেন তারা। পত্রিকায় এঁদের নাম ছাপা হয় না, 'কী দারুণ খবর' বলে প্রশংসা করেন না সাধারণত কেউ। নাম দিয়ে কিছু খবর ছাপা হয় বলে মোনাজাতউদ্দিনের মতো অতিস্বল্প শিক্ষিত সাংবাদিককে কতিপয় 'সংবাদ'-পাঠক চেনেন বটে, কখনো-সখনো অভিনন্দনও জানান, উপহার দেন প্রশংসাবাক্যও। কিন্তু অজানা থেকে যান তিনি, যিনি দীর্ঘসময় ধরে ঐ খবর সম্পাদনা করেন, হেডিং দিয়ে কম্পিউটারে পাঠান এবং গভীর রাতে মেকআপ পর্যন্ত করেন। অজ্ঞাত থাকেন আমাদের শিফট ইনচার্জ, বহুসংখ্যক সাব-এডিটর। অথচ এঁরাও প্রত্যেকে একেকজন পরিশ্রমী সাংবাদিক। কথিত মফস্বলের পাতার খবর ও ছবি-ফিচার পড়ে অনেক পাঠক কথিত মফস্বল-সাংবাদিকটির উদ্দেশে বলেন, 'বাহ, ভালোই তো লিখেছে।' কিন্তু তারা কি জানেন কত দীর্ঘসময়ের পরিশ্রম থাকে ঐসব গ্রামীণ-সংবাদ কাটা-ছেঁড়া করা, হেডিং দেওয়া, এমনকি পেজ মেকআপ করার পেছনে? একজন পাঠকের রাতের ঘুম যখন আধাআধি হয়ে যায়, কিংবা হয় ভোর, তখন নিউজ এডিটর, শিফট ইনচার্জ, সাব-এডিটর বাসায় ফেরেন কর্মক্লান্ত দেহে। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে যান কম্পোজিটর, রীডার, পেস্টার, অফসেট ক্যামেরাম্যান, প্রেস ম্যানেজার, সার্কুলেশন সুপারভাইজার, মেশিনম্যান, বাইন্ডার, গাড়ি চালক, মায় পিয়ন পর্যন্ত। এদের কর্মদক্ষতা, সময়ানুবর্তিতা এবং দুঃখকষ্টের কথাকাহিনী কোনোদিন জানতে আসেন না কেউ। অথচ পরদিন সকালে রাজধানীর অনেক পাঠক তাঁর পছন্দের কাগজটি হাতে না পেলে অস্বস্তিতে ভোগেন, রাজধানীর বাইরে পত্রিকা না পৌঁছুলে ছটফট করেন অনেক পাঠক।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের নেপথ্য পদ, পদমর্যাদা, কর্মতৎপরতা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপার-বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক বুদ্ধিজীবী-পাঠকও খুব একটা খবর রাখেন না। জানেন না বেশকিছু রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীও। ঢাকায় কোনো হরতাল হলে এর প্রমাণ মেলে। ৯০-এর গণআন্দোলনকালে যখন ২৪ ঘণ্টা হরতাল হচ্ছিল, তখন রামপুরার কাছে একদল রাজনৈতিক-কর্মী আটকে দিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাংবাদিক' বোর্ড টাঙানো একটি বেবীট্যাক্সি। ভেতরে ছিলেন বার্তা সম্পাদক ও শিফট ইনচার্জ। বাসা থেকে অফিসে আসছিলেন তাঁরা। কিন্তু বারংবার পরিচয় দেওয়ার পরেও ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো তাঁদের। বলা হলো : আপনারা যদি সাংবাদিক হন, তাহলে ক্যামেরা কোথায়?

আসলে তাদের ধারণা, সাংবাদিক মানে কাঁধে একটি ক্যামেরা থাকতে হবে। এধরনের 'বোঝা'র ব্যাপারটি কেন হয়েছে বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে, শুধু ঐ বার্তা সম্পাদক বা শিফট ইনচার্জ নন, হরতালের সময় অনেক সাংবাদিক এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গিয়েছেন, এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।

ধান ভান্‌তে শিবের গীতের মতো ব্যাপারটা দাঁড়ালো হয়তো, তবু রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেই ছবি তোলার কাহিনী ও সোর্স-সহযোগিতার কথা বলতে গিয়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার নেপথ্য-ক্ষুদ্র অংশ পাঠকদের এ জন্যেই জানালাম যে, খবরের নেপথ্যে যেমন থাকে খবর, থাকে অলিখিত ঘটনা-বর্ণনা, তেমনি প্রতিদিন প্রত্যুষে প্রকাশিত প্রতিটি সংবাদপত্রের কপিতে থাকে বহু মানুষের সমন্বিত প্রয়াস, তাদের মেধা, শ্রম, রক্ত-ঘাম। অথচ, অনেকেই সে খবর রাখেন না এবং অনেকক্ষেত্রে (সাধারণত) সাংবাদিকতার স্বীকৃতি দেওয়া হয় শুধু রিপোর্টারকে, ছবির ক্ষেত্রে আলোকচিত্রীকে। ঢাকার একাধিক অনুষ্ঠানে আমি দেখেছি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কিংবা ব্যাজধারী ভলান্টিয়ার সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে অখ্যাত পত্রিকার অতি জুনিয়র রিপোর্টারকে হাত ধরে টেনে এনে 'প্রেস গ্যালারি' কিংবা একেবারে সামনের সারিতে যত্ন-আদরে বসিয়ে দিয়েছেন। আর ঐ সমাবেশেই ফোর্থ ফিফ্‌থ্ রো-তে বসানো হয়েছে অন্য পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কিংবা বার্তা সম্পাদককে। আমি আর মন্টুদা (মোজাম্মেল হোসেন মন্টু মরহুম, সংবাদের ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক) '৮৮ সালে গিয়েছিলাম এক অনুষ্ঠানে। দুজনের জন্যে আলাদা কার্ড ছিল। কিন্তু মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল যখন উদ্যোক্তাদের একজন 'আসেন আসেন আসেন, আমরা খুব খুশি হয়েছি' ইত্যাদি বলে আমাকে অন্য কর্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, প্রায় ঘাড়ে ধরার মতো করে বসিয়ে দিলেন সামনের সোফায়। আমি আমার বার্তা সম্পাদককে কয়েকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, কিন্তু লক্ষ করলাম তাঁর সাথে তেমন কেউ কথা বলছেন না। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মন্টুদাকে নিয়ে যাওয়া হলো পেছনের দিকে। আমি খুব অস্বস্তিতে ভুগছি, ঘাড় ঘুরে তাকালাম। বিব্রতকর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মন্টুদা হাত ইশারা করলেন : যার অর্থ : 'ঠিক আছে আমি এখানেই বসছি, আপনি ওখানে থাকুন।'

বিরাট হৃদয়ের যে মানুষটি, আসনের আগু-পিছুতে তাঁর কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা খারাপ লাগল। উঠে গেলাম পেছনে, তাঁর কাছে। 'কী হলো, কী হলো' বলে প্রায় ছুটে এলেন উদ্যোক্তাদের একজন। ভীষণ কিছু অনর্থ ঘটে গেছে এইরকম কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আবার এখানে বসলেন কেন? আসুন আসুন, সামনে আসুন। আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে কথা বলতে চান!' এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে তিনি হাত টানাটানি করতে লাগলেন। আমি আবারো বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'ইনি বিশিষ্ট একজন সাংবাদিক, সিনিয়র সাংবাদিক, আর নিউজ এডিটর, এঁকে রেখে আমি সামনে বসতে পারি না। মাফ করবেন।'

তারপর দুজনকেই সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। মন্টুদা নিম্নকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কী যে করেন আপনি! কী ক্ষতি ছিল আমি পেছনে বসলে!' তারপর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে স্বভাবগত হাসি ঝরিয়ে হিউমার করেছিলেন, 'ওরা তো মোনাজাত-উদ্দিনকে চেনে! ঠিকই করেছে ওরা!'

আমি মন্টুদার শীর্ণ হাতে হাত রেখে বলেছিলাম, 'মন্টুদা, প্লিজ, আর লজ্জা দেবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন।'

প্রথমে রংপুর মেডিকেল হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ড। যেখানে আমার 'বেড' দেওয়া হলো, সেটা একটা কর্ণার। আমিই এমনটি চেয়েছিলাম। এক কোণায় থাকলে গোটা ওয়ার্ডটা ওয়াচ করা যাবে। কিন্তু বিপত্তি বাধল। জানালায় ফ্রেম আছে গ্লাস নেই। হুহু করে বাতাস ঢুকছে। একটু বাদে সাঁটানো হলো কাগজ, তা-ও আবার একটি সিনে পত্রিকার রঙচঙে উপর-পৌতা। বিশাল ছবিতে বিকিনি পরা বিদেশি নায়িকা মাথার ওপর এমন ভঙ্গিতে বসে আছেন যে, সেদিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না। এটি ধারেকাছে কোথাও থেকে জোগাড় করে এনেছে আমার এক সহকারী। কিন্তু, সে-ও বোধহয় লক্ষ করেনি যে, এই পত্রিকার যিনি পাঠক ছিলেন, তিনি এমনই দুষ্ট যে, নায়িকার নাকের নিচে বক্রাকার গোঁফ এঁকে দিয়েছেন। তা-ও নাহয় সহ্য করা যায়, কিন্তু যখন পড়ি যে নায়িকার বিশেষ স্থানের নিচে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা 'এটা আমি খাব', তখন আর সহকারীর সাহায্য নেই না, নিজেই বেডের ওপর দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি খুলে ফেলি। নায়িকার বদলে কিছুক্ষণ পর ঐ কাচহীন জানালায় লাগানো হয় একখণ্ড পিচবোর্ড।

আমার গতি নাহয় হলো। কিন্তু পাশের রোগী? মিনিট পাঁচেক আগে বেডে এসেছেন তিনি, তাঁর পাশের জানালাটিরও একই দশা। ঠাণ্ডা বাতাসে তিনি কাঁপছেন। ঘণ্টা আধেক বাদে তার প্রতিরক্ষার জন্যে আনা হলো একটি ছাতা। বাতাস যাতে গায়ে না লাগে, সেজন্যে তিনি ছাতা মেলে বসলেন বেডের ওপর। আর সব বেডের রোগী এবং তাদের দর্শনার্থীরা এই দৃশ্য দেখে হাসছেন আর মন্তব্য করছেন নানানটা। আমি ভাবছিলাম, এখনি ক্যামেরাটা সাথে থাকলে ভালো একখানা ছবি হতে পারত!

কিন্তু না, ক্যামেরা এখুনি নয়। আগে অবস্থাটা দেখি। প্রথমদিনেই 'অ্যাকশন' শুরু করে দিলে ব্যাপারটা গোল বেঁধে যাবে। আমি এখনও সাংবাদিক নই, এখানে আমার ভর্তি হবার উদ্দেশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানেন না। আমি একজন সাধারণ রোগী মাত্র যার বুকে 'মাঝে মাঝে দারুণ ব্যথা।'

ডাক্তার আসেন। আসেন ইন্টার্নি ডাক্তার। সবার গম্ভীর মুখ। নানা রকম প্রশ্ন। কী যেন কথা হয় নিজেদের মধ্যে, বুঝি না। একেই সব ডাক্তারিশাস্ত্রের কথাবার্তা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা-ও দুর্বোধ্য ইংরেজিতে। কিন্তু এটা বুঝতে পারি, এঁদের মধ্যে দুয়েকজন আমাকে চিনতে পেরেছেন। একজনের প্রশ্ন : আপনার নাম যে লেখা আছে মোনাজাতউদ্দিন?

বলি, হ্যাঁ, ডাক্তার, আমার নামই মোনাজাতউদ্দিন।

: আপনি কি সাংবাদিক? মানে আমাদের সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন?

: হ্যাঁ, আমি-ই।

ডাক্তার অতি বিস্মিত। এর-ওর দিকে তাকান। বলেন, তা আপনি এখানে?

আমি বলি, কী করব! অসুখ হয়েছে, তা-ই এসেছি! তা আপনি খুব অবাক হয়েছেন

মনে হচ্ছে ডাক্তার?

: না না না, অবাক হব কেন? না না, অবাক হইনি। আমি ভাবছিলাম কি ... কথা অসমাপ্ত রেখে ডাক্তার সাহেব এবার টুল টেনে নিয়ে বসলেন। ইন্টার্নি ডাক্তাররা একে অন্যের সাথে কী যেন বলাবলি করতে লাগলেন আমাকে নিয়ে। ডাক্তার সাহেব এবার আদরের কণ্ঠে বললেন, আপনাকে তো তাহলে ভালো করে দেখতে হয়! শোন শোন, আরাম করে শোন ... পা লম্বা করে দিয়ে শোন ...। আপনার প্রব্লেমটা আবার বলুন তো শুনি!

'প্রব্লেম' বলি। ডাক্তার হালকা প্রেসক্রিপশন দেন। আরেকটা কাগজে লিখে দেন কী কী পরীক্ষা করতে হবে। করতে হবে এক্সরে, ইসিজি। রক্ত এবং মলমূত্র পরীক্ষাও চাই। ডাক্তার খুব মিষ্টি করে জানান দিলেন, 'আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের এখানেই এক্সরে আর ইসিজিটা হয়ে যাবে। পারলে ব্লাড ইউরিন শুধু বাইরে থেকে করিয়ে নিন।' আরও পরামর্শ দিলেন তিনি : 'কাল সকালেই করিয়ে নেবেন এসব। আমি আপনার জন্যে স্পেশালি বলে দিচ্ছি।'

ডাক্তারদের দল চলে গেলেন। বুঝলাম, এক্ষুনি এই খবর রাষ্ট্র হয়ে যাবে। হলোও তাই। ডাক্তার প্রস্থানের পাঁচ মিনিটের মাথায় এলো ফিনাইল-স্যাভলন। আমার বেডের চারদিকের মেঝে মোছা শুরু হয়ে গেল। এলো ধোয়া চাদর, নতুন কেনা বালিশ। 'সাংবাদিকের জন্যে স্পেশাল' নার্স এসে ঘন ঘন টেম্পারেচার মাপতে লাগলেন। এলো ওষুধ। রাতে যে মশারি প্রয়োজন হবে তা বিকেলেই এনে রাখা হলো। ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধায়ক এসে দারুণ এক অবস্থা সৃষ্টি করে ফেললেন। এতক্ষণেও 'ভালো কম্বল' দেওয়া হয়নি দেখে তিনি নিম্নপদ কর্মচারীকে পারেন তো মারেন। না, মারলেন না, শুধু ডাইরেক্টর সাহেবের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন এটা জানিয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে ফ্রেশ কম্বল এল। কম্বল-বাহক হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমার হাঁটুতে। 'ছার, আপনি আমারে বাঁচান ছার। কাইল যদি রেপোর্ট দিয়া দেয়, তাইলে মারা যাব ছার।'

লোকটা কোনোমতেই আমাকে ছাড়বে না। শেষে বলতে হয়, 'ঠিক আছে, ডাকেন আপনার ওয়ার্ড মাস্টারকে।'

হাসপাতালের প্রত্যেক রোগী যদি এরকম আদর-সমাদর পেত তাহলে দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার চিত্র অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু না, এখন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এটা খুব অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। বিশাল ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগী, যারা বেডে বসতে পারেন, তারা সবাই আমার বেডের দিকে মুখ করে বসেছেন। কেউবা ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন, কারও চোখে কৌতূহল। কয়েকজন দর্শনার্থী আমার বেডের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালেন এবং ছুঁড়তে লাগলেন নানা প্রশ্ন। কে আপনি? নাম কী? কী করেন? কিন্তু প্রশ্নের চেয়েও বিব্রতকর মনে হতে লাগল আমার বেড ঘেরাও করে রাখার ব্যাপারটা। বললাম, আপনারা অনুগ্রহ করে এখন যান, আমার একটু বাতাস দরকার।

কিন্তু এই 'বাতাস দরকার' কথাটা বলে যে-ই ছটফটের ভণিতা শুরু করলাম, তক্ষুনি শুরু হলো আরেক বিব্রতকর অবস্থা। চারপাশে জমে ওঠা মজমার মতো ভিড় তো ভাঙলই না, বরং বাতাস দরকার শুনে ছুটে এলেন হাসপাতালের দুই কর্মী, তাদের একজনের হাতে ভাঙা-প্রায় একটা তালপাখা, আরেকজনের হাতে একখণ্ড পিচবোর্ড। দর্শনার্থীদের ভিড় ঠেলে ওরা ঘেরাওয়ের ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং কনুইয়ের গুঁতো মেরে বৃত্তটির আয়তন বৃদ্ধি করলেন। তারপর, যতদূর পারা যায় দুহাত ডানে-বায়ে নেড়ে শুরু করলেন বাতাস। একজন দাঁড়িয়েছেন শিয়রে, অপরজন পায়ের কাছে। আমি এসময় ধৈর্যের বাঁধ নিজেই গুঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলাম : থামান আপনাদের পাখা! ভাগেন আমার সামনে থেকে!

আসলে চিৎকারটা বেশি হয়ে গিয়েছে। কর্মী দুজন আমাকে শীতল করবার ইচ্ছেতেই এসেছিলেন বোধ করি, কিন্তু ধমক খেয়ে মিইয়ে গেলেন, কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন তারা। তারপর আমার মাথার ওপর অচল যে বৈদ্যুতিক পাখাটি, তিন ডানা মেলে দীর্ঘদিন স্থির, কালিঝুলি মাখা, সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বললেন এবং ধীরে ধীরে সরে গেলেন ভিড় ঠেলে। এবার চিৎকার নয়, জোড়হাত এবং বিনয়ের কণ্ঠে ঘেরাওকারীদের উদ্দেশে বললাম, ভাইসব, আপনারা এবার যান, আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি। আমাকে একা থাকতে দিন।

তারপর বুক চেপে ধরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম বেডের ওপর।

চোখ বুজে ভাবছি, কী করা যায়! না, এভাবে 'জেনারেল বেড'-এ থাকা যাবে না। বিশেষ করে ডাক্তার নার্স কর্মচারী এবং দর্শনার্থীরা ইতোমধ্যে যা শুরু করেছেন তাতে আমার 'অপারেশন' শুরু করা তো সম্ভব নয়, সম্ভব নয় ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তাভাবনা পর্যন্ত। হাড়ে হাড়ে তা টের পেতে শুরু করলাম। নাস্তা এবং খাওয়া আসতে লাগল 'স্পেশাল'। বিশেষ করে ঐ ডাক্তার সাহেব আমাকে পরীক্ষা করে যাবার পর যত্নের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে লাগল। ধোয়া-মোছা ঝকঝকে প্লেটে সকালের নাস্তা এলো, তাতে সাজানো টোস্টেড ব্রেড, ছোট্ট বাটিতে চিনি, বড় সাইজের 'মালভোগ' কলা, দুটি হাফবয়েল ডিম। খাবার পানির গ্লাসটি পরিষ্কার, পানিও মৃদু উষ্ণ। এসবও সহ্য করা গেল, কিন্তু আমার মেজাজ বিগড়ে দিলেন 'খাবার ঘরের দায়িত্বে' নিয়োজিত এক কর্মী। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। বাহকের হাতে নাস্তার প্লেট পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এলেন মিনিট খানেক বাদে, আমার সামনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মুখে বিনয়ের হাসি। কোটের দুই পকেটে দুই হাত। আমি তাঁকে কিছু বলতে যাব, তার আগেই হাত দুটি পকেটের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো। আমি বিস্মিত এবং পরমুহূর্তে রক্ত চেপে গেল মাথায়। দেখি, তাঁর এক হাতে আরও একজোড়া ডিম এবং অপর হাতে এক প্যাকেট সিগারেট! ঠোঁটে ঝোলানো হেঁ হেঁ ধরনের নিঃশব্দ হাসি। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম কাঁপতে কাঁপতে, আয়ত্তের বাইরে চলে গেলাম নিজের, চিৎকার করে উঠলাম : 'গেট আউট ... গেট আউট ... বেরিয়ে যান এখান থেকে ...' কয়েকজন রোগী ধড়মড় করে জেগে উঠলেন, ছুটে এলেন নার্স, এলেন দর্শনার্থী, বারান্দায় অপেক্ষারত আমার দুজন সহকারী।

আমার স্বভাব সম্পর্কে যারা জানেন, জানেন 'অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী' হিসেবে ফুট্‌ফাট্‌ দুয়েকটা ইংরেজি যেমন বেরোয়, তেমনি নয়-ছয় দেখলে বা শুনলে মাথায় হঠাৎ রক্ত চেপে যায়। বদমাইশ! রোগীদের জন্যে দাও পচা রুটি, এক চিমটি চিনি, খুব জোর আঙুল সমান কলা, কিংবা কখনো থাকে ঘুঘুর ডিমের সমান মুরগির ডিম, তাও অতি সেদ্ধ, কিংবা পচা দুর্গন্ধযুক্ত। আর আমার জন্যে টোস্টেড ব্রেড! এক হালি ডিম! সিগারেট! বিনয়ের হাসি! সাংবাদিক কি বাজারের পণ্য যে তোমরা কিনবে তাকে ক্যাশে বা কাইন্ডে? এই হাসপাতাল, যেখানে তোমরা চিকিৎসাকর্ম করতে চাও, অসুস্থকে সুস্থ করে তুলতে চাও, সেখানে সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়েছ? ওষুধের রাজ্যে থেকেও কি তোমরা খবর রাখো কী করে কারা কোথায় মাথা বিক্রি করে দেয়? একমুঠো টাকা কিংবা অন্য কোনো উপঢৌকনের বিনিময়ে কেনা গোলাম হয়ে যায় এক শ্রেণীর নষ্ট সাংবাদিক?

না, এসব বলতে চাই; পারি না। রাগে কাঁপতে থাকি এমনই যে, শুধু ঐ 'গেট আউট বেরিয়ে যান' উচ্চারণের পর আর কোনো কথা বের হয় না। পরিবর্তে জিহ্বা এবং ঠোঁট গলিয়ে বেরিয়ে আসে ফেনার মতো কিছু থুথু এবং তা নিজের শরীরের ওপর ঝরে পড়তে থাকে, মেঝে-লেপ্টে যেতে থাকে, দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে ভীষণ।

জেনারেল ওয়ার্ডে থাকা যাবে না। আদর-আপ্যায়ন এমনই যে, প্রতিমুহূর্তে বিব্রত হতে থাকি। ডিস্টার্ব বোধ করতে থাকেন অন্যান্য রোগী, তাদের দর্শনার্থী। দ্বিতীয়ত, আমি বুঝতে পারি, আলাদা একটা রাখঢাক কামরা হলে কাজের জন্যে সুবিধে হবে। আমার একজন সহকারীকে বললাম, খরচপত্র একটু বেশি পড়বে, তবু খুব তাড়াতাড়ি একটা কেবিন ম্যানেজ করুন।

দশ মিনিটেই 'কেবিন' পাওয়া গেল। রোগী এবং দর্শনার্থীদের বিস্ময়, প্রশ্ন এবং এটা-ওটা মন্তব্যের ভেতর দিয়ে চলে গেলাম সেখানে। কিন্তু খানিকবাদেই এক গোল বাধল। এই ফাঁকে সেই ঘটনাটি বলি।

ব্যাপারটা হয়েছিল কী, আমি যখন জেনারেল ওয়ার্ডের বেডে, তখন আমার ইসিজি করা হয়েছিল। কেবিনে ট্রান্সফার হবার পরপরই সেই ইসিজি রিপোর্টটা আনতে গেলাম উপরতলায়। এটা দরকার, কেননা কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তার রাউন্ডে আসবেন এবং ঐ রিপোর্ট দেখতে চাইবেন নিশ্চিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসিজির কামরায় ঢুকে দেখি টেবিলে মাথা গুঁজে এক কর্মচারী বিশ্রাম করছেন। বিশ্রামের ভঙ্গিটি বিচিত্র বটে। মাথা টেবিলে ঠেকিয়ে রাখলেও হাঁটু কাঁপাচ্ছেন তিনি এবং সেই কাঁপুনির তালে তালে গুনগুন করছেন। গানের কলি স্পষ্ট বোঝা যায় না।

: স্লামালেকুম।

শান্তি কামনার পাল্টা কিছু পাওয়া যায় না, বরং তিনি, ঐ কর্মচারী, বিরক্তি-লেপা মুখ তুলে তাকান। আমার পরনে ময়লা একখানা লুঙ্গি, গায়ে জড়ানো ছেঁড়া বিবর্ণ চাদর, দাড়ি-গজানো মুখ। সাধারণ রোগী যেমন ব্যবহার পান, তেমনি করেই তিনি জানতে চাইলেন : কী চান?

: আমার রিপোর্টটা দিন তো। কাল ইসিজি করিয়েছিলাম।

: কী নাম আপনের?

: মোনাজাতউদ্দিন।

: মনতাজ উদ্দিন?

: না, মনতাজ নয়, মোনাজাতউদ্দিন।

নামের কারণে, নাকি চেহারার দৈর্ঘ্য দর্শনে, নাকি সাধারণ এক রোগীর তাচ্ছিল্যতায়, অথবা হতে পারে এটাই তার স্বভাব, তিনি মুখ তুলে আমার আপাদমস্তক চোখের ক্যামেরা ঘোরান, তারপর খুব গম্ভীর গলায় বলেন, রাখেন, দেখি।

টেবিলে কিছু কাগজ। ইসিজি রিপোর্ট এগুলো। দ্রুত ওল্টাতে থাকেন এবং একসময়, সামনে যেন লাশ দেখছেন এমন ভঙ্গিতে আঁতকে উঠেন তিনি, লাফিয়ে উঠেন চেয়ার ছেড়ে। আমার মুখোমুখি, দ্রুত হাত রাখেন আমার কাঁধে : পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময় কণ্ঠে নিয়ে বলে ওঠেন : আ ... আপনি এখানে? এখানে এসেছেন কিভাবে? বেড থেকে এখানে আপনাকে আসতে দিল কে? সর্বনাশ!

এ লোকটি চিনে ফেলেছে আমাকে। এটাই ভাবলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে সে ভুল ভাঙল। না, চিনতে পেরে চমকাননি তিনি। তাঁর ভাষ্য হলো এরকম : আমার হার্টের অবস্থা ভীষণ রকম খারাপ, এই অবস্থায় যে-কোনো মুহূর্তে অক্কা পেতে পারি। আর আমি কি-না বেড ছেড়ে উঠে এসেছি এখানে! কর্মচারীটি প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে লাগলেন : আপনি নিজে এসেছেন ক্যান? আপনার সঙ্গে কোনো লোকজন নেই? ওয়ার্ডে কি কেউ ডিউটিতে নেই? কে আপনাকে এখানে আসতে দিল?

আমি হা। বুক টিপ্ টিপ্ শুরু করেছে। তিনি চোখের সামনে মেলে ধরেছেন ফিতের মতো লম্বা সাদা কাগজ, আঁকাবাঁকা রেখা। বললেন, কী আশ্চর্য! আপনার যা অবস্থা দেখছি তাতে তো যেকোনো সময় আপনি 'কলোপ্স্' করে যাবেন মিয়া! এই অবস্থায় এখানে পর্যন্ত এলেন কি করে?

'আমার ঘাম ছুটছে'—একথা বললে হয়তো খুব বাড়িয়ে বলা হবে। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারি বেশ ঘামছি আমি। হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। এ কী হলো আমার? অসুখ-বিসুখ কিছু-না-কিছু প্রায় সবারই থাকে, যেমন আমারও আছে হাতের ব্যথা, বাতের ব্যথা, এসিডিটি। কিন্তু যে-কোনো সময়ে 'কলাপস্' করতে পারে এরকম হয়ে উঠেছে আমার হার্ট?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশে একটা টুল ছিল, বসে পড়ি ধপ্ করে। কর্মচারীটির সহানুভূতি হয় বুঝি। তিনি চিৎকার করে একজনকে কাছে ডাকেন, তারপর দুজন ধরাধরি করে আমাকে টেনে তোলেন, নিয়ে যেতে থাকেন ঘরের বাইরে। ওয়ার্ডের বেড পর্যন্ত ওরা আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে চান।

এই সময়, হঠাৎ সামনে আসেন দুজন লোক। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ইসিজি বিভাগের কর্মচারীটির উদ্দেশে বলেন, ভাই, আমাদের একটা রিপোর্ট আছে, দ্যেন তো। জরিপউদ্দিন নাম।

ঐ দুজনের মধ্যে একজন, কণ্ঠে তার আকুতি। ভাই, একটু তাড়াতাড়ি দ্যেন। ডাক্তার সাহেব রোগী দেখবেন, জরিপউদ্দিনের অবস্থা খুব খারাপ ...।

খেঁকিয়ে উঠেন কর্মচারীটি : 'রাখেন মিয়া আপনার কথা। এই রোগী মরে মরে অবস্থা, তাকে আমরা আগে রেখে আসি। দাঁড়ান আপনারা এখানে, আমরা আসছি।'

ধমকে কাজ হয় না। কর্মচারীর হাত চেপে ধরেন ওরা দুজনেই। ভীষণ আকুতি তাদের কণ্ঠে, যেন কাঁদছেন।

আমাদের রিপোর্টটা আগে দিয়ে দিন ভাই। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ... একটা দিন অপেক্ষা করার পর অনেক কষ্টে ডাক্তার সাহেবকে পেয়েছি ... তিনি চলে গেলে...।

কর্মচারীটি বিরক্ত। তার সঙ্গের লোকটিও। তবু কী জানি কেন মায়া হয় আকুতিতে, আমাকে বাইরে নিতে গিয়েও দাঁড় করান, আবার বসিয়ে দেন টুল টেনে এনে, তারপর দ্রুত চলে যান রিপোর্টের গাদি রাখা টেবিলের কাছে। জিজ্ঞেস করেন : কী নাম বললেন আপনার রোগীর?

: জরিপউদ্দিন।

কর্মচারীটি বিড়বিড় করেন। জরিপউদ্দিন ... জরিপউদ্দিন ... জরিপউদ্দিন ...। একের পর এক দ্রুত রিপোর্ট ওল্টাচ্ছেন তিনি। পেয়ে যান জরিপউদ্দিনের ইসিজি রিপোর্ট। তারপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই ধমকে ওঠেন : ও মিয়া! কী বলেন সব বাজে কথা? কোথায় আপনার রোগীর অবস্থা খারাপ! এ তো দেখি সম্পূর্ণ নর্মাল আছে! যান যান নিয়ে যান! দেখান ডাক্তারকে!' রিপোর্টটি ছুঁড়ে দেন জরিপউদ্দিনের লোকের হাতে। তারপর আবার ওরা এগিয়ে আসেন আমার দিকে। টুল থেকে টেনে তোলেন। আমি তাদের হাতে সমর্পিত হই। অসহায় আমি। ইতোমধ্যেই ভীষণরকম কাহিল হয়ে পড়েছি শারীরিক ও মানসিকভাবে। মৃত্যু ধেয়ে আসছে। আমি অতিকষ্টে বললাম, ভাই, আমাকে কেবিনে নিয়ে চলুন। ওয়ার্ডেই ছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কেবিনে চলে এসেছি ...।

: কেবিনে?

: হ্যাঁ।

: কত নম্বর কেবিন?

বললাম নম্বরটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবিনে এসে শুয়েছি কেবল। লম্বা। বুকে হাত। ভাবছি ... কিন্তু না, বাধা পড়ল। শব্দ করে খুলে গেল কেবিনের ভেজানো দরজা। সেই লোকটা। ইসিজি বিভাগের কর্মচারী। ভীষণ উদ্বিগ্ন তিনি। বললেন, 'দেখি দেখি আপনার রিপোর্টটা দেখি!'

: কী হলো আবার?

: দ্যেন না দেখি রিপোর্টটা!

বালিশের পাশে রাখা ইসিজি রিপোর্ট তুলে দিলাম তার হাতে। এক পলক চোখ বুলিয়ে যে গতিতে কেবিনে ঢুকেছিলেন, তার চেয়েও দ্বিগুণ গতিতে বেরিয়ে গেলেন। আমি বিস্মিত। উদ্বিগ্ন। তবু কে যেন ভেতর থেকে শক্তি জোগাচ্ছে। উঠে বসলাম বিছানায়।

হাসব না কাঁদব এই পরিস্থিতিতে পড়লাম মিনিট পাঁচেক বাদে। আবার আমার কেবিনে ঢুকলেন ঐ কর্মচারী। পেছনে জরিপউদ্দিনের সেই দুই লোক। কর্মচারীটির মুখ কাঁচুমাচু।

: ভাই ...

: কি হয়েছে?

: ভুল হয়ে গেছে ভাই ... ভীষণ ভুল হয়ে গেছে ...

: ভুল? কি রকম?

: মানে ... মানে ...

: মানে মানে করছেন কেন? কী ভুল? কীসের ভুল?

মাথা চুলকাতে থাকেন ইসিজি কর্মচারী। যা বলেন তাতে আমার গোটা শরীরটাই বিচিত্র অনুভূতিতে কাঁপতে থাকে আবার। কর্মচারীটি যা বললেন, তার সার হলো : আসলে এটা একটা দারুণ ভুল হয়ে গেছে। ইসিজি মেশিন থেকে আঁকাবাঁকা যা বেরিয়ে এসেছে তাতে কোনো ভুল নেই। উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে নামের। অর্থাৎ আমার রিপোর্ট শীটে উঠেছে জরিপউদ্দিনের নাম, আর একইভাবে জরিপউদ্দিনের অতি সংকটজনক অবস্থার রিপোর্ট শীটে লেখা হয়েছে মোনাজাতউদ্দিনের নাম।

শীতল একটা অনুভূতি। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যাচ্ছে ঘাম। হা আল্লাহ!

২

কেবিনে যাবার তিনদিনের মাথায় 'অ্যাকশন' শুরু হলো। শুরু হলো ছবি তোলা।

ছবি তোলা শুরু করলাম আমি। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি খাদ্য পাচারের, ওষুধ চুরির। আমার সঙ্গে দুটি ক্যামেরা। এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা। আছে জুম। টেলি। দূরের দৃশ্য সটাৎ করে চলে আসে চোখের সামনে। ছবি তুলি ময়লা বাথরুমের, দেয়ালের ফাটল ও ছত্রাকের, ভাঙা বেসিনের, আবর্জনায় জমে উঠা ড্রেনের। ছেঁড়া তোষক, তুলো বেরিয়ে এসেছে। ফাটা চাদর, ফুটো মশারি, নোংরা কম্বল। এদিকে-ওদিকে পড়ে আছে মলমূত্র, রক্ত-পুঁজ মোছা তুলো-ব্যান্ডেজ। খাবার পানি নেই, বয়ে আনতে হচ্ছে দূর থেকে। জানালায় গ্লাস নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যানের ডানা উধাও। হোল্ডারে বালব নেই। কুকুর বিড়াল বিচরণ করছে অবাধে। প্রধান ফটকে দর্শনার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে টাকা। ডাক্তার ও হাসপাতালকর্মীর আসন ফাঁকা। ইত্যাদি অনেক।

ছবি তুলি অনেক। সাতটি রোল। একটা করে শেষ হয়, তৎক্ষণাৎ বাইরে পাঠিয়ে দিই। এরই মধ্যে নানান ব্যক্তিগত ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে ভর্তির খবর শুনে ছুটে আসেন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ফ্যান, পরিচিতজন। হরলিক্সের বোতল, কমলা আপেল আঙুর, বিস্কিটের প্যাকেট ইত্যাদির ঢিপ লেগে যায়। বকা লাগায় স্ত্রী। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কারণে রোগী সাজার জন্যে নয়, আসলেই তার কষ্ট হচ্ছে তিন বেলা খাবার বহন করে আনতে। জোক করে আমার বড় মেয়েটি : আব্বু তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাও তো! তুলেছ তো অনেক ছবি, চলো এখন বাসায়!

হ্যাঁ, ছবি তোলা হয়েছে অনেক। কিন্তু বাকি আছে একটা। বিদ্যুৎ চলে গেলে টর্চ-লাইট জ্বালিয়ে অপারেশন চালানো হয় এই হাসপাতালে। এই ছবিটাই এখনও তোলা হয়নি।

গত কয়েকদিনে বিদ্যুৎ যায়নি তা নয়। গেছে। কিন্তু ছবি তুলতে পারিনি। বিদ্যুৎ ট্রিপ করবার সাথে সাথে ছুটে গেছি কেবিন থেকে অপারেশন থিয়েটারে। কিন্তু দরজা ঠেলে ঢুকবার আগেই আবার বিদ্যুৎ চলে এসেছে। ফিরে আসতে হয়েছে ক্যামেরা গুটিয়ে। আবার, এমনও হয়েছে যে, বিদ্যুৎ চলে গেছে, আমি ওটি-তে গেছি, কিন্তু গিয়ে দেখি সে-সময় কোনো অপারেশনই হচ্ছে না।

সাতদিনের মাথায় বিদ্যুৎ ট্রিপ করল। দিনে নয়, রাতে। তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। শুয়ে আছি। কেবলি তন্দ্রা ধরেছে। বিদ্যুৎ চলে গেল।

তৎক্ষণাৎ বিছানা ছাড়ি। তড়িঘড়ি করে গায়ে জড়িয়ে নিই একটা বেডশীট। ভেতরে ক্যামেরা। কামরা ছেড়ে বেরুনোর আগে ফ্লাশ লাগাই। বোতাম টিপি। চার্জ হয়ে থাকুক। সঙ্গে নিই বাড়তি একটা রিফিল।

দরজার তালা লাগানোর সময় নেই। প্রয়োজনও নেই। ছুট দিই অপারেশন থিয়েটারের দিকে। এগিয়ে যাই অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে। সঙ্গে একটা টর্চ থাকলে ভালো হতো। তা নেই যখন, কী করা যাবে! দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাই। এভাবে একটু এগোই, কাঠি নেভে। আরেকটা জ্বালাই। এগোই। কী অন্ধকার রে বাবা!

ওটি-র সামনে এসে পড়েছি। অনেক মানুষের কান্না। ভিড় করে আছে দরজার সামনে। জ্বালাই আরেকটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি। মৃদু-সামান্য আলোয় দেখি ওদের চোখেমুখে দারুণ উদ্বিগ্নতা।

: ভেতরে কি কোনো অপারেশন হচ্ছে?

: হ্যাঁ।

: কী অপারেশন?

: অ্যাপেনডিসাইটিস ...

দেখি, একটু জায়গা দিন, আমি ভেতরে যাব।

: কে আপনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: পরিচয় পরে, আগে যেতে দিন। প্লিজ, সরুন ...

দরজা খুলেছি। ভেতরে ঢুকব। পেছন থেকে বাধা। কে যেন একজন টেনে ধরেছে আমার চাদর।

: কে? কে আপনি? ছাড়ুন ...

: না, ভেতরে যেতে পারবেন না ...

: কে আপনি?

: আমি এই হাসপাতালের লোক ...

: ছাড়ুন আমার চাদর ...

: না ...। আসুন ... এদিকে আসুন ...

বাধা। কিন্তু এটা অতিক্রম করতে হবে। ছবি আমার চাই। আমি জানি অপারেশনের সময় বাইরের কেউ ওটি-তে ঢুকতে পারেন না। তবু আমি ঢুকবই। দেখতে চাই বিদ্যুৎ যাবার পর এখন কী করা হচ্ছে। দেখতে চাই টর্চলাইট জ্বালিয়ে অপারেশন করা হচ্ছে কি-না। হলে পরে ঐ ছবি আমি তুলবই।

পেছন থেকে চাদরে টান বাড়ছে। আমি সামনের দিকে ঝুঁকে আছি। এই ঝুঁকে থাকা মানে সামনে ও পেছনের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি করা। কেননা এক্ষুনি আমি ঝট্ করে চাদরটি খুলে ফেলব এবং তক্ষুনি যেন বাধা প্রদানকারী ঐ লোকটি, যিনি পেছন থেকে আমার চাদরটি আঁকড়ে ধরে আছেন, তিনি যেন পেছনে চিৎপটাং হন। হ্যাঁ, আমি তাই করলাম। শরীর সামনে টেনে নিয়ে মুহূর্তে খুলে ফেললাম চাদর। লোকটির অবস্থা দেখবার অবকাশ নেই। লুঙ্গি এবং সার্ট পরা আমি, কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা-ফ্ল্যাশ, টুপ্ করে ঢুকে গেলাম ভেতরে। তার আগে খুলে ফেললাম স্যান্ডেল। ওটি-তে খালি পায়ে ঢোকার নিয়ম।

ঢুকেই দেখি বিচিত্র এক দৃশ্য। দুটি আলোর রেখা। তার মানে দুদিক থেকে দুজন উঁচিয়ে ধরেছে টর্চলাইট। অপারেশন চলছে। আবছা আলোয় দেখা যায় কিছু মুখ। সাদা কাপড় জড়ানো। সেই মুহূর্তে এগিয়ে আসে একটি ছায়ামূর্তি। আসে আমার খুব কাছে।

: মোনাজাত সাহেব?

: হ্যাঁ।

: এই নিন। এটা মুখে বাঁধুন।

এই বলে নিজেই আমার মুখে সাদা কাপড় জড়িয়ে দেন তিনি। ইনি আমার এক ডাক্তার-বন্ধু। আমার অনেক সোর্স-এর একজন।

: ছবি তুলতে পারি? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করি।

: পারেন। তবে একটা মাত্র।

: ফ্লাশ জ্বললে অসুবিধা হবে?

: না। তবে যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন!

একটু সামনে এগোই। টর্চলাইটের আলোয় ফোকাস ঠিক করে নিই মুহূর্তে। শার্টার টিপি। ভিউফাইন্ডারেই বুঝতে পারি আলোর ঝিলিক দিয়েছে। না, ওঁদের কাজের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছেন ওঁরা, কজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শল্যচিকিৎসক। খুলে ফেলি ফ্লাশ। এ্যপারেচার নামিয়ে আনি একেবারে নিচে, ফ্লাশ ছাড়াই শার্টার টিপি দুবার। ক্যামেরা ধরা হাত স্থির রেখেছি। একটু কাঁপলেই ছবিটি নষ্ট হয়ে যাবে। লেন্স এখন প্রায় ওপেন। আমি চাই এমন একটি ছবি যাতে দেখা যাবে আলোর দুটি রেখা। আশপাশে সাদা কাপড় জড়ানো কয়েকটি মুখ।

বেরিয়ে যাব ওটি থেকে। কাজ শেষ আমার। কিন্তু না, ঐ লোকটার কথা মনে পড়ে। আমি বসে পড়ি ওটি-র মেঝেতে। দ্রুত হাতে খুলে ফেলি ক্যামেরার খোলস। ফিল্ম রি-উইন্ড করি হাত আন্দাজে। বের করে নিই একটু আগের তোলা ছবির রিফিল। পকেটে ছিল আরেকটা রিফিল, সেটা ভরিয়ে নিই হাত আন্দাজে। অযথা শার্টার করি কয়েকটা। তারপর আবার খোলস লাগিয়ে বেরিয়ে আসি ওটি থেকে। তক্ষুনি জ্বলে উঠে আলো। এবার স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যায় বাইরে অপেক্ষারত সবার মুখ। এরা দোয়া-দরুদ পড়ছেন।

ভিড়ের মধ্যে একজন। চিনতে পারলেন আমাকে। মোনাজাত ভাই? আপনি? আপনি ভেতরে গিয়েছিলেন?

: হ্যাঁ। ছবি তুললাম। টর্চলাইট জ্বালিয়ে অপারেশন করা হচ্ছে, সেই ছবি তুললাম।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তা-ই ঘটল।

সেই যে লোকটি, হাসপাতালের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, বাধা দিয়েছিলেন ওটি-তে ঢুকতে, চাদর টেনে ধরেছিলেন, তিনি পাকড়াও করলেন আমাকে। 'দাঁড়ান আপনি।'

: মানে!

: মানে আপনি দাঁড়ান। এভাবে ছবি তুললেন ক্যানো? ওটি-তে ঢুকলেন ক্যানো? আশ্চর্য সাহস আপনার!

আমি তাকে সরিয়ে যেতে চাই। পারি না। লোকটির গায়ে জোর আছে বটে! প্রায় ঠেসে ধরেছেন আমাকে। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যেই তিনি জুটিয়েছেন আরও ২/৩ জন কর্মচারী। তারা ঘেরাও করে ধরেছে আমাকে। এদের একজন ধমকের সুরে বললেন, আপনি যেতে পারবেন না। আমরা ডাইরেক্টর সাহেবকে খবর দিয়েছি। তিনি আসছেন।

: ডাইরেক্টর সাহেবকে খবর দিয়েছেন আপনারা?

রাগে আমার গা জ্বলে যায়। ঠিক আছে, আসুক আপনার ডাইরেক্টর সা ...

কথা শেষ হয় না। কর্তা এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন লোক।

: আপনি?

: আমি মোনাজাতউদ্দিন। সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক।

: ছবি নাকি তুলেছেন আপনি?

: হ্যাঁ।

: ওটি-তে ঢুকে ছবি তুলেছেন?

: হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তার অবাক চোখ এবং অত্যন্ত বিরক্ত তিনি। রুষ্ট। আর কোনো প্রশ্ন না করে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন : দিন, আপনার ক্যামেরাটা দিন!

: মানে? ... ইয়ে ... ।

আমি তো-তো করি। আসলে এটা ঘাবড়ে যাবার ভণিতা।

দিন ক্যামেরা! কর্তার কণ্ঠে ধমক।

: না ... এতে ছবি আছে। অত্যন্ত কষ্ট করে তুলেছি জনাব ... আপনি ... প্লিজ ...

: রাখুন আপনার কথা! আবারো প্রচণ্ড ধমক। বললাম তো ক্যামেরা দিন! নইলে বুঝতেই পারছেন, জোর করে নেব। দিন!

আমি কাঁপতে কাঁপতে ক্যামেরাটা তুলে দিই কর্তার হাতে। উত্তেজনার হাতে ক্যামেরার খোলস খোলেন তিনি। নিজের হাতে ফিল্ম রি-উইন্ড করেন, তারপর খটাং শব্দ করে খুলে ফেলেন ক্যামেরা। রিফিলটি বেরিয়ে আসে তাঁর হাতে। তৎক্ষণাৎ সেটা পকেটে চালান করে দেন তিনি। মুখে মৃদু তৃপ্তির হাসি। ছুঁড়ে দেবার মতো করে ফিরিয়ে দেন খোলা ক্যামেরাটা। 'যান এবার, যান!' তারপর ধমক : এবার শুধু ফিল্ম খুলে নিয়ে ছেড়ে দিলাম মিস্টার রিপোর্টার। আর কখনো যদি এমনটি করেন তাহলে ... হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে উচ্চারণ করেন তিনি : 'ইডিয়ট! ননসেন্স!' তারপর যেমন এসেছিলেন, ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন একই ভঙ্গিতে। শুধু পার্থক্য এটুকুই যে, এখন তিনি বেশ তৃপ্ত। আমার তোলা ছবি এখন তাঁর পকেটে।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি ওটির সামনের বারান্দায়। হায় হায় করে উঠি। এটাও ভণিতা। কর্তা তো চলে গেলেন, কিন্তু কর্মচারীরা আছেন আমার পাশেই। আমি তাদের বোঝাতে চাই : ভীষণ একটা ক্ষতি হয়ে গেল আমার। এত কষ্ট করে তোলা ছবিগুলো কর্তা নিয়ে গেলেন। মাঠে মারা গেল সব। আমার হায়-আফসোস শুনে ফুসুর ফুসুর হাসেন ঐ কর্মচারী গং।

তারপর ফিরে আসি কেবিনে। দরজা বন্ধ করেই হেসে উঠি হা হা করে। পকেট থেকে বের করি কিছুক্ষণ আগে অপারেশন থিয়েটারের ভেতর থেকে তোলা ছবির ক্যাসেটটি।

কাল সকালেই হাসপাতাল ছেড়ে যাব আমি।

বলাবাহুল্য, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেই ছবিগুলো ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় 'সংবাদে'।

অনেকদিন ধরে যাঁরা সংবাদ পড়েন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই ছবিগুলোর কথা। সিরিজটি প্রকাশের পর হাসপাতাল ভবন সংস্কার হয়েছিল, রোগীদের জন্যে দেওয়া খাবারের মান বেড়েছিল, অল্পদিনের জন্যে হলেও বন্ধ হয়েছিল ওষুধ চুরি। নতুন ফ্যান ও বালব কেনা হয়েছিল কিছু। কুকুর বেড়াল তাড়ানো হয়েছিল।

আর হাসপাতালের জন্যে এসেছিল বিদ্যুতের 'এমারজেন্সি লাইন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে চিঠি ২০ বছর পর খোলা হলো

ডিসেম্বর '৯১-এর এক সন্ধ্যা। সারাদিন 'সংবাদে'র টেবিলে কাজ করবার পর চলে এলাম শাহবাগের আড্ডাখানায়। মনে নানা ভাবনা। আহমদুল কবির সাহেব তো কিছুদিনের জন্যে নিয়ে এলেন ঢাকায়, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টিমতো কাজ করতে পারব কি? একেই আমি অসুস্থ, তার ওপর মেট্রোপলিটন সিটিতে সাংবাদিকতার মতো কাজটি করা সম্ভব আমার পক্ষে? ত্রিশটি বছর ধরে আমি গ্রামীণ-সাংবাদিকতা করেছি, আমার কর্মক্ষেত্র উত্তরাঞ্চলের শহর-বন্দর-গ্রাম, সেখানে হঠাৎ করে এই তিলোত্তমা নগরীতে নিজেকে মেলাব কী করে? সোর্স বিল্ড-আপ করা কি সহজ কথা! আর জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতার জন্যে যে বিদ্যা, স্মার্টনেস, কলাকৌশল প্রয়োজন, তারও ঘাটতি রয়েছে। আর কেউ যা-ই বলুক, আমি তো আমাকে কিছুটা অন্তত বুঝি!

কিন্তু উপায় নেই। সম্পাদক সাহেবের নির্দেশ। মানতেই হবে। নেমে পড়লাম কাজে। ঈশ্বর শুধু মান-সম্মানটুকু রাখুন! মনে মনে এটাই কামনা।

খুব ক্লান্ত। তবু শাহবাগের আড্ডায় এসে একটুখানি ভালো লাগল। কী মনে হলো, আমার সহকারী আনসার আলী রেজাকে বললাম, চলেন, মানুষ দেখে আসি!

রেজা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। মানুষ? মানে? আমি বললাম, আরে না, মানুষ মানে মানুষ নয়। মামুনের নাটক মানুষ। নাটকের কথা শুনে আড্ডাপ্রিয় রেজা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। তারপর ছোলাভাজা চিবুতে চিবুতে ফুটপাথ ধরে হাঁটা। শাহবাগ থেকে বাংলামোটরের দিকে।

AMARBOI.COM

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বন্ধু মামুনুর রশীদের নতুন নাটক 'মানুষ' প্রদর্শিত হচ্ছে। না এটা আরণ্যকের নয়, বাংলা থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা। বাংলাদেশে মামুন-ই প্রথম নিয়ে এলেন এই নাট্য-পদ্ধতি। ছোট হলঘর, গুটিকতক দর্শক, সেখানেই একদিকে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হচ্ছে। পদ্ধতিটি ভালো লাগল এ কারণে যে, এখন এই ঢাকায় আর নাটক শুধু মহিলা সমিতি বা গাইড হাউস মঞ্চে গণ্ডিবদ্ধ থাকবে না। যে-কোনো এলাকায় মঞ্চ বেঁধে দেখানো যাবে।

'মানুষ' শুরু হবে। কিন্তু তার আগে আছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প। মুক্তিযুদ্ধের গান। বিজয়ের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ আয়োজন।

গল্প শেষ হলো। মঞ্চে বসলেন একজন কণ্ঠশিল্পী। তাঁকে চিনি, কেননা টিভির পর্দায় মাঝে-মধ্যে দেখি, পত্রিকায় ছবি দেখি। তা ঐ শিল্পী, মলয় কুমার গাঙ্গুলি, করলেন কী, গান গাইবার আগে একটুখানি ভূমিকা-বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। অনেক দর্শক কিছুটা বিরক্ত। পেছন থেকে একজন মন্তব্য করলেন, 'যেখানে সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাসটা আমাদের গেল না। গাইবে গান, সেখানেও শুরু হলো বক্বকানি ...'

পেছন ফিরে রেজা বললেন, 'ভাই, প্লিজ চুপ করুন, শুনতে দিন।'

মলয় গাঙ্গুলি তাঁর কথা দীর্ঘ করেন না। তবে শুধু শেষ পর্যায়ে এটুকু বলেন যে, তিনখানা ট্রাঙ্ক, যা তিনি মুক্তিযুদ্ধের শেষে বয়ে এনেছিলেন বাংলাদেশে, তা আজও অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাঙ্ক? ৩টি ট্রাঙ্ক? কোথায় আছে? ভেতরে কী আছে? কোত্থেকে এনেছিলেন মলয় গাঙ্গুলি? এরকম নানা প্রশ্ন আমার ভেতর তোলপাড় করতে থাকে। গান শেষ হবার পর ওঁর সাথে কথা বলা দরকার। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে? গানের পরে শুরু হবে নাটক, তখন দর্শকের আসনে বসা ঐ শিল্পীর সাথে ফিসিরফিসির কথা বলা সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত নিই : 'ঠিক আছে, নাটক শেষ হোক, তারপর নাহয় বলা যাবে কথা।

কিন্তু না, মলয় গাঙ্গুলি সে সুযোগ দিলেন না। গান শেষ হবার সাথে সাথে তিনি দর্শকদের নমস্কার জানালেন এবং তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চের পাটাতন থেকে সরাসরি বেরিয়ে গেলেন বাইরে। পরমুহূর্তে হলের আলো নিভে গেল, জ্বলে উঠল শুধু মঞ্চের রঙিন বাতি। আলোকসম্পাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ঠাণ্ডু রায়হান নাটকের নির্দেশকের কথামতোই কাজ করেছেন। মঞ্চে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন মানুষরূপী মামুন।

আমি তখন উত্তেজিত। মলয় গাঙ্গুলি কি চলে গেলেন? কোথায় গেলেন? তাঁকে যে আমার দরকার! কোন্ ট্রাঙ্ক-রহস্যের কথা বলে গেলেন তিনি? কী আছে ট্রাঙ্কে? কোথায় আছে ট্রাঙ্ক? রেজার হাতে দিলাম ব্যাগ, তড়িঘড়ি, আসন ছাড়লাম, যতটা সম্ভব মাথা নিচু করে দরজার দিকে এগুতে লাগলাম। কিন্তু আশপাশের কিছু নাট্য-মনোযোগী দর্শক ব্যাপারটা সহজভাবে নিলেন না। 'বসুন বসুন' ধ্বনি উঠল, মন্তব্য উড়ে এলো নানানটা। কিন্তু শিল্পীকে আমার চাই। পায়ের সাথে পায়ের ঠোক্কর লাগল এক ভদ্রমহিলার। 'স্যরি ম্যাডাম' বলার পরেও উপহার পাওয়া গেল : 'ননসেন্স!'

আসলে ছোট্ট ঘর। ঠাসা চেয়ার। ভরা দর্শক। বেরুনো খুব কষ্টকর। তবু, ননসেন্স, রাবিশ, এইসব শব্দ কানে গুঁজে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলাম অডিটোরিয়াম থেকে। ইতোমধ্যে গাঙ্গুলি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চত্বর পেরিয়ে রাস্তায়। রিকশায় চেপে বসেছেন। 'এই যে মলয় গাঙ্গুলি বাবু' বলে পেছন থেকে টেনে ধরলাম রিকশার হুড। রিকশা থামল বটে, কিন্তু পেছন ফিরে তাকিয়ে মলয় যেন আঁতকে উঠলেন। অপরিচিত এক লোক তার রিকশা আটকিয়েছে, ভুল বুঝলেন তিনি, লাফিয়ে নামলেন রিকশা থেকে। হাইজ্যাকার হাইজ্যাকার বলে চিৎকার করতে যাবেন বুঝতে পেরে তার আগেই হাতজোড় করে জোরকণ্ঠে বলে উঠলাম : মলয় বাবু, আমার নাম মোনাজাতউদ্দিন, সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক। তারপর সামনে বাড়িয়ে দিলাম হাত। মলয় বাবু হাঁফ ছাড়লেন। বললেন, ও! আপনি! তা আপনাকে তো চিনি দাদা। দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু লেখা তো রোজই পড়ি ... অনেকদিন থেকেই পড়ি ...। তা দাদা, কি ব্যাপার বলুন তো! আমার একটা নেমতন্ন আছে দাদা ... এক্ষুনি যেতে হবে। ঘড়ি দেখলেন তিনি।

আমি বললাম, আপনার সময় নষ্ট করব না দাদা। শুধু বলুন ঐ ট্রাঙ্ক তিনটির কথা। কিসের ট্রাঙ্ক? কী আছে ওতে? কোথায় আছে?

মাত্র ৩ মিনিট সময় দিলেন মলয় গাঙ্গুলি। বললেন ট্রাঙ্কের পাত্তা। ওগুলো পড়ে আছে, অনেকদিন ধরে, রেডিও'র ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার অডিটোরিয়ামে ফিরে আসা। নাটক। 'মানুষ' ইতোমধ্যে এগিয়েছে অনেক। ডলি জহুর যখন পতিতা সন্ধ্যা রাণী, মান্নান হীরা তার দালাল আফাজউদ্দিন, তখন আমার কিছুই ভালো লাগে না। মনটা কেন জানি ছটফট করছে, উত্তেজনা বোধ করছি। ৩টি ট্রাঙ্ক! স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বয়ে আনা! তার ভেতর আছে মুক্তিযুদ্ধের দলিল! কিন্তু পড়ে আছে অযত্ন-অবহেলায়! কেউ খুলে পর্যন্ত দেখেনি! ইতোমধ্যে কেটে গেছে ২০টি বছর!

মলয় গাঙ্গুলিকে বিশ্বাস করা যায়? নিশ্চয়ই যায়। তিনি অন্তত আমার প্রাথমিক সোর্স। তবে নিশ্চয়ই ব্যাপারটি বাজিয়ে দেখতে হবে। চাই কনফারমেশন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে শাহবাগ। রেডিও'র পুরাতন ব্রডকাস্টিং হাউস। ২০ বছরে কতবার এসেছি এখানে! আর, আজ, এই রাতে, প্রধান ফটকের সামনে পায়চারি করছি। এমন কাউকে কি পাওয়া সম্ভব যার কাছ থেকে জানা যাবে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের স্টোর কিপারের বাসাটা কোথায়!

না, সম্ভব হলো না।

পরদিন। সকালেই রেডিও'র কয়েকজন বন্ধুর বাসায় টেলিফোন। কপাল মন্দ। বাসার ফোনে রিং হয় তো রিসিভার উঠান না কেউ। আবার কেউ ফোন ধরেন তো জানা যায় গৃহকর্তা বাসায় নেই।

AMARBOI.COM

কোথায়?

সাহেব অফিসে গেছেন!

অফিসে পাকড়াও করবার চেষ্টা করি। বেশ কটা নম্বর। কপাল এবং টেলিফোনের মতো যান্ত্রিক ব্যবস্থাটা এমনই বিগড়ে গেছে যে, কিছুতেই আজ যেন কাউকে পাওয়া যাবে না। হা ঈশ্বর, এই মহানগরীতে কত স্টাফ রিপোর্টার গ্রাহাম বেল আবিষ্কৃত কেবল এই দূরালাপনী যন্ত্রটির সাহায্যেই বিরাট-বিশাল দফতর থেকে এক্সক্লুসিভ খবর টেনে বের করে আনছেন, আর আমি কিনা কারও সাথে সংযোগটি পর্যন্ত স্থাপন করতে পারছি না!

বোতাম টিপতেই থাকি। কিন্তু শাহবাগের ট্রান্সক্রিপশন ভবনের সমস্ত নম্বর যেন আড়ি দিয়ে বসে আছে। কিংবা ঘুমাচ্ছে। বারকয়েক রং নম্বর, ক্রস কানেকশন এইসব একাধিক ঘটনার পর একটি টেলিফোনের নম্বর যদিও ধরল, কিন্তু কর্তাটিকে পাওয়া গেল না। পিয়ন জানালেন, সাহেব ছুটিতে। আমি অবাক! বললাম, বাসা থেকে যে ভাবী সাহেব বললেন সাহেব অফিসে! পিয়ন কোনো জবাব না দিয়েই রিসিভার রেখে দিলেন। আমি আরেকটা নম্বরে ডায়াল করলাম, পাওয়া গেল কর্মকর্তাকে, কিন্তু সোজা জানিয়ে দিলেন, ঐ ট্রাঙ্ক-ফ্রাঙ্কের ব্যাপারে কিছুই তিনি বলতে পারবেন না। সাংবাদিকদের সাথে সরকারি কর্তাদের কথা বলতে মানা। আমি বললাম, সে তো সাহেব পুরানা দিনের কথা! এখন গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার দিনে সেইসব বাধানিষেধ কিংবা বিধিনিষেধ কি আর আছে? আর, আমি তো আপনাকে কোট্ করব না! ভদ্রলোক খুব কড়াকণ্ঠ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিয়ে দিলেন, এইসব কথা আমাকে বলে লাভ নেই। সেই হাকিম নেই, কিন্তু হুকুম তো আছে এবং সেই হুকুম এখনও বাতিল করা হয়নি! 'আমি খুব দুঃখিত' এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেন ইংরেজিতে, খুব স্টাইল করে, তারপর খটাস করে রেখে দিলেন রিসিভার।

কিন্তু ছাড়া যাবে না। ট্রাঙ্কের ব্যাপারটি জানা চাই-ই। খবরটি সত্য হলে এটা একটা ভালো খবর। বক্স হতে পারে। এক্সক্লুসিভ তো বটেই। কিন্তু পুরানা পল্টন থেকে শাহবাগ, কতই বা দূর, খুব জোর দেড় দু মাইল। অথচ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যোগাযোগ সম্ভব হলো না। এদিকে অফিস সময় পেরিয়ে যাচ্ছে প্রায়!

যোগাযোগের ব্যর্থতায় খুব টেনশনে পড়েছি, আঙুল কামড়াচ্ছি হাতের, এই সময় 'সংবাদে' এলো একটি টেলিফোন। অপারেটর জানালেন আমার সাথেই কথা বলতে চান কেউ। 'হ্যালো স্লামালেকুম' বলতেই অপরপ্রান্ত থেকে যার কণ্ঠ শোনা গেল, তিনি আমার এক জুনিয়র ফ্রেন্ড, রেডিও'র শাহবাগ অফিস থেকেই ফোন করেছেন। বেশ কিছুদিন আগে বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে পড়ে এক শ টাকা ধার নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু এতদিন দিতে পারেননি। বন্ধু বললেন, মোনাজাত ভাই, আমি আপনার অফিসে চলে আসি?

এই মুহূর্তে ভেতরে ভেতরে আমি ভীষণ উত্তেজনা ও আনন্দ অনুভব করছি। যে অফিসে সেই সকাল থেকে শত চেষ্টা করেও মেলাতে পারছি না কাউকে ফোনে, আর কী কাকতালীয় ব্যাপার, সেখান থেকেই পাওয়া গেল বন্ধুর ফোন। আমি তড়িঘড়ি করে বললাম, শোনেন, যদি লাইনটা কোনো কারণে কেটে যায়, তাহলে কিন্তু আবার ফোন করবেন সঙ্গে সঙ্গে। আপনার সাথে জরুরি এবং অত্যন্ত জরুরি কথা আছে! বন্ধু বললেন, ঠিক আছে।

লাইন কাটল না। বরং, এতদিনে ঐ ধারের এক শ টাকা দিতে না পারার জন্যে বারবার লজ্জা প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা ঐ বন্ধুটির। আমি বললাম, 'না না ভাই, ঐসব টাকা ফাকার কথা ছাড়েন এখন। আপনার কাছে আমার দরকার একটা খবর।'

: খবর! কী খবর?

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম ব্যাপারটা। কিন্তু তিনি উড়িয়ে দিলেন। 'ধুর! ঐ ধরনের কোনো ট্রাঙ্ক-ফ্রাঙ্ক থাকলে আমি জানব না?' তারপর, আবার আমার অনুরোধের চাপে কিংবা অন্য কোনো কারণে তিনি রাজি হয়ে গেলেন স্টোরে খবর নিতে। বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি অপেক্ষা করুন, আপনাকে আমি একটু পরেই ফোন করছি।'

অপেক্ষা।

না, বেশি নয়, ঠিক দশ মিনিটের মাথায় তার ফোন এলো। কণ্ঠে উত্তেজনা। 'মোনাজাত ভাই, আই অ্যাম সরি মোনাজাত ভাই, আপনার কথাই ঠিক। তিনটা ট্রাঙ্ক আছে স্টোরে এবং ওগুলো মলয় গাঙ্গুলি এনে রেখেছেন অনেকদিন আগে। এগুলোর ভেতরে নাকি আছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনেক দলিল!'

: আপনি কি নিজের চোখে ট্রাঙ্ক তিনটা দেখে এসেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: হ্যাঁ। এক্ষুনি আমি স্টোর থেকে এলাম।

আমি বললাম : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

: 'তা মোনাজাত ভাই ...' বন্ধুর কণ্ঠে মিনমিনে ভাব। বললেন, আপনার ঐ টাকাটা! অফিস ছুটির পর আমি একটু আসি?

বললাম, থাক। কাল-পরশু আমিই যাব আপনাদের ওখানে। নিজে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসব।

মলয় কুমার গাঙ্গুলির প্রাথমিক তথ্য-বিবরণ, বন্ধুর কাছে থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য। এটাই আপাতত যথেষ্ট। এক টুকরো সংবাদ লেখা হয়ে গেল ঘণ্টাখানেক বাদে। জমা দিয়ে এলাম। পরদিন সকালে 'সংবাদ' মেলেই দেখি বেশ গুরুত্বের সাথে ঐ ৩টি ট্রাঙ্কের খবরটি ছাপা হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। প্রধান শিরোনামের পাশেই। সেদিনটি ছিল ১৪ ডিসেম্বর।

ছোট্ট খবরটি বেরুনোর পরই বেশ একটা রিঅ্যাক্‌শন শুরু হয়ে গেল। অস্থায়ী সম্পাদক কে. জি. মুস্তাফা সাহেবের সাথে দেখা হতেই তার প্রথম কথা : 'থ্যাঙ্ক ইউ মোনাজাতউদ্দিন।'

আমি জবাবে বললাম, 'আপনাকেও ধন্যবাদ।'

AMARBOI.COM

তবু কেন যেন তৃপ্তি পাচ্ছি না। মনের গভীরে খচখচ কিছু একটু বিঁধছে। আমার দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র যে এলাকাটি, সেখানে আমি অধিকাংশ প্রতিবেদন লিখেছি সরজমিনে। শহর এলাকার খবর-সবর, নিতান্তই প্রয়োজনে সংগ্রহ করেছি টেলিফোনে, কিন্তু গ্রামের বেলায় সেটা অসম্ভব। যেখানে ঘটনার তদন্ত করতে হয়, চালাতে হয় অনুসন্ধান, চরিত্রের সাথে কথা বলতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং তুলতে হয় ছবি, সেখানে নিজে ঘটনাস্থলে না গিয়ে উপায় কি?

দীর্ঘ বছরের অভ্যাস। হঠাৎ করে এই মহানগরীর গণ্ডিতে এসে বাদ দেওয়া যায় না। আর, মনেও নানা সন্দেহ। প্রশ্ন। ট্রাঙ্কের খবর তো বেরুল, কিন্তু ট্রাঙ্ক কি ৩টি-ই? কত বড় সাইজের ট্রাঙ্ক? কি কি দলিল আছে এর ভেতর? দীর্ঘদিনেও কেন এগুলো খোলা হলো না? দেওয়া হলো না কেন যাদুঘরে কিংবা আর্কাইভে? ট্রান্সক্রিপশনের স্টোরে পড়ে আছে কিন্তু খাতায় এন্টি নেই কেন?

এদেশে সাধারণত কাজির গরু কেতাবে থাকে, গোয়ালে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে তো এ ব্যাপারটা একেবারে উল্টো! স্টোরে আছে, খাতায় নেই!

ছটফট মন। কী করা যায়? ঢুকে পড়ব কি ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে? পুরো ব্যাপারটা দেখে আসব? সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত। ৩৬ পুরানা পল্টন থেকে শাহবাগে। রেডিও অফিসে।

গেট পাস দরকার। জোগাড় করা গেল। আমার ভণিতাটা এরকম : আমি একজন লোক, গ্রাম থেকে আসা বোকা সরল ভাব। হাতে মোটা ব্যাগ। কারও সাথে দেখা করতে এসেছি। জানি এটা বেশিক্ষণ টিকবে না। এখানে পরিচিতজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশকিছু। তবু, গেট পেরিয়ে হাঁটতে থাকি, মাথা নিচু করে। সোজা গিয়ে উঠি ট্রান্সক্রিপশন ভবনে, একেবারে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে, স্টোরে। ঢুকেই দেখি ঘরে মাত্র একজন, টেবিলে ঝুঁকে কী যেন লিখছেন। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এগোই। তিনি সাদা কাগজে লিখছেন চিঠি। সম্বোধন আর প্রথম লাইনের কয়েকটি শব্দ চোখে পড়তেই বুঝি, ব্যক্তিগত চিঠি।

তাঁর খুব কাছে আসি। বলা যায় একেবারে মাতার ওপর। কিন্তু এতই তিনি নিমগ্ন যে, ঘরে কেউ ঢুকেছে, টের পান না। আমি খুব গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করি :

স্লামালেকুম!

চিন্তা-বিভোর কিংবা পাঠ-মনোযোগী কোনো লোকের কানের কাছে যদি হঠাৎ গিয়ে 'কুউহ্' শব্দ করা যায়, তাহলে যেমনটি ঘটবে, তেমনিভাবে চমকে–আঁতকে উঠেন তিনি। সটাৎ করে আড়াল করেন চিঠি, একটা খাতার নিচে চালান করেন তা এবং সামনে অপরিচিত একজনকে এভাবে দেখে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ান।

: স্যার ...

: আমি আপনার স্যার নই। একজন সাংবাদিক। নাম মোনাজাতউদ্দিন। আপনার এখানে ৩টি ট্রাঙ্ক ছিল, সেগুলো আপনি সরিয়ে ফেলেছেন কোথায়?

: স্যার ...

: কোথায় সরিয়েছেন ট্রাঙ্ক?

: স্যার, আমি স্যার, বলতে পারব না স্যার? স্টোর কিপার জানেন ... কিন্তু তিনি ছুটিতে ... আমি ওনার অ্যাসিসটেন্ট!

: ও!

: স্যার ...

: তা আপনি কি জানেন না কোথায় ঐ ট্রাঙ্কগুলো? কবে এখান থেকে সরানো হলো? আপনি সে সময় ছিলেন না?

: আপনি কোন্ ট্রাঙ্কের কথা বলছেন স্যার? ঐ স্বাধীন বাংলা বেতারের ট্রাঙ্ক?

: হ্যাঁ

: তা স্যার, এ ট্রাঙ্ক তো সরানো হয়নি! এখানেই আছে! ঐ যে ওখানে ...

তার আঙুলের ইশারার সাথে সাথে আমার চোখ যায়। দেহ সামনে টেনে নিয়ে গলা উঁচিয়ে দেখি, এক ঢিপ কাগজ এবং বিভিন্ন মালমাত্তার ওপাশে কালো ট্রাঙ্ক। আড়াল সরাই। হ্যাঁ, ৩টি ট্রাঙ্কই আছে তাক তাক সাজানো। জং ধরা তালা ঝুলছে, ধুলোর আস্তর, মাকড়সার জাল।

: স্যার ... বসেন স্যার ...

: ধন্যবাদ। পরে আবার দেখা হবে।

বেরিয়ে আসি স্টোর থেকে।

এখানে একটুখানি ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। পাঠক স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করবেন আমি স্টোরে ঢুকেই 'ট্রাঙ্ক ৩টি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কোথায়' এই প্রশ্নটি করলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? আসলে এটা ছিল আমার ব্যক্তিগত কৌশল-প্রশ্ন। নেগেটিভ ধরনের প্রশ্নটি ছুড়ে আমি ঐ কর্মচারীটির মুখ থেকেই জবাব বের করে আনতে চেয়েছিলাম যে, ট্রাঙ্ক ৩টি স্টোরের ভেতরেই আছে। দ্বিতীয়ত, পরে ভুলটি বুঝতে পারলেও আমার প্রথম ধারণা ছিল যে, ট্রাঙ্ক ৩টি হয়তো স্টোরের কোথাও লুকিয়ে-ছাপিয়ে রাখা হয়েছে এবং সে কারণে চাপমূলক প্রশ্ন করলে সহজেই স্টোর কিপার তা বলে ফেলবেন বা দেখিয়ে দেবেন।

আরও একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সরাসরি ট্রান্সক্রিপশনের পরিচালক সাহেব বা অন্য কোনো কর্মকর্তার কাছে না গিয়ে আমি সোজা স্টোরে ঢুকলাম কেন? এটাও আমার অভ্যাসগত ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো এ্যাসাইনমেন্টে আমি প্রথম 'টপ লেভেল'–এ যাই না। নিচের দিক থেকে ওপরে আসি। হাঁড়ির ওপর দিকের একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায় তা ফুটেছে কিনা, কিন্তু খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, দেখেছি, নিচের দিকের সূত্রের খবর কিংবা ভেতরের খবর আগে থেকেই হাতে থাকলে বড়কর্তাদের সাথে কথা বলতে সুবিধে হয়। এখানেও এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছি। অবশ্য কথা উঠতে পারে যে, সরকার এবং জনগুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের স্টোর রুমে আমি ঢুকে পড়লাম কেন? এটা কি বৈধ হয়েছে? আমি স্বীকার করি, হয়নি। কিন্তু আমার মনে বিশ্বাস ছিল। সরকার বা তার সিস্টেম যা-ই থাক, রাষ্ট্রের প্রতি আমার বিশ্বস্ত মন ও সত্তা-ই আমাকে এই সাহস জুগিয়েছে।

AMARBOI.COM

যাই হোক, স্টোর থেকে এলাম নিচে। ট্রান্সক্রিপশনের পরিচালক সাহেবের কামরায়। হাসান জামাল সাহেব আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, স্বাগত জানালেন, অর্ডার হাঁকলেন চায়ের। তাঁর টেবিলে বেশ ক'টি দৈনিক, তবে 'সংবাদ' উপরেই। আলাপের শুরুতেই, লক্ষ করি, তিনি কিছুটা বিব্রত। সংবাদখানা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন তো কিসব লিখেছেন? কোথায় আপনার ট্রাঙ্ক। কিসের ট্রাঙ্ক? আমার স্টোরে ট্রাঙ্ক আছে আর আমি জানি না! আপনি খবর লিখে দিলেন!

আমি মনে মনে হাসছি। মিনিট কয়েক আগে যে ট্রাঙ্ক আমি নিজের চোখে দেখে এলাম, 'এই রেজিস্টার দেখতে পারেন। কোথাও কোনো ট্রাঙ্কের উল্লেখ পাবেন না।'

: রেজিস্টার দেখবার দরকার নেই হাসান জামাল সাহেব।

: কেন?

: কেননা আমি নিজেই দুমিনিট আগে আপনাদের স্টোরে ঐ ট্রাঙ্ক তিনটি দেখে এসেছি!

: ব ... বলেন কি?

: হ্যাঁ, আপনিও দেখতে পারেন। আপনি একা যান, ইচ্ছে হলে আমাকেও নিতে পারেন।

: ওহ মাই গড!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি চেয়ার ছাড়লেন। ইতোমধ্যে কামরায় এসে গিয়েছেন আরও কয়েকজন। আপেল মাহমুদ, আশরাফুল আলম, রেডিও কর্মকর্তা মেসবাহউদ্দিন আহমদ সবাই মিলে আমরা উঠলাম উপরতলায়, স্টোরে। তারপর ঢুকেই পরিচালক সাহেব বিস্ময়ে প্রায় হতবাক। স্টোরের লোকটি ট্রাঙ্কের সামনের দিকেই মালপত্র সরিয়ে ফেলেছেন। চোখের সামনে স্পষ্ট-পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ২০ বছর আগে বাংলাদেশে নিয়ে আসা সেই ট্রাঙ্ক ৩টি।

একটি ট্রাঙ্ক খোলা হলো। না, চাবি নেই। তালাও ভাঙতে হলো না। ২ দশক আগেকার তালা, ছোট, মরচে ধরা, টান দিতেই খুলে গেল। ট্রাঙ্কের ডালা মেলে ধরতেই বিস্মিত আমরা সবাই। চাপ চাপ সাজানো রয়েছে কাগজপত্র, পাণ্ডুলিপি, খাতা, প্যাকেট খোলা টেপ। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিল যেন হঠাৎ একসাথে নানা কথা বলে ওঠে। সেকথা ছাপিয়ে ওঠে পুরাতন কাগজ ও বিনষ্ট টেপের ভ্যাপসা গন্ধ-চোখ ফিরিয়ে দেখি আপেল মাহমুদ আর আশরাফুল আলমের চোখে জল। ইতিহাসের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন শব্দ-সৈনিক আপেল মাহমুদ, আশরাফুল আলম।

ট্রাঙ্কের উপর দিকে কয়েকটি প্যাকেট। পুরু খাম। একটি খাম খোলা হলো। একগাদা চিঠি। প্রত্যেকটার মুখ আটকানো, অর্থাৎ খোলাই হয়নি। এগুলো '৭১-এর ডিসেম্বরে এসেছিল বিভিন্ন স্থান থেকে। কিন্তু যুদ্ধ-বিজয়-পরবর্তী আনন্দ, উত্তেজনা-ব্যস্ততা, কিংবা হতে পারে তড়িঘড়ি করে দেশে ফিরে যাবার তাগিদে সেই মুহূর্তে এগুলো খোলা হয়নি। গুছিয়ে, বড়-মোটা খামে ভরে, ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐ ট্রাঙ্কে। উপস্থিত সকলের সামনে, আমি, ২০ বছর আগেকার সেই চিঠি একে একে খুলে ফেলতে লাগলাম।

www.amarboi.com

পরদিন অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর '৯১ 'সংবাদে'র প্রথম পাতায় ঐসব চিঠির ফটোকপিসহ ৩ কলাম শিরোনামে প্রতিবেদন : 'যে চিঠি ২০ বছর পর খোলা হলো।'

বিভিন্ন জায়গা থেকে এলো অভিনন্দন। ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে গায়েব হলো পচে পাওয়া টেপ। তদন্ত কমিটি গঠিত হলো তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে। ঐ ট্রাঙ্ক তিনটিতে নতুন করে তালা লাগল। কর্মকর্তারা তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁদের চিন্তাভাবনা : ট্রাঙ্ক তিনটি হস্তান্তর করবেন তাঁরা যাদুঘরে।

ঢাকায়, যে মহলেই যাই, শান্তি কামনার পর প্রথমে ওঠে ঐ ট্রাঙ্কের কথা। অভিনন্দনের পাশাপাশি নানারকম প্রশ্ন। বিচিত্র সব প্রশ্ন। খবরটি কেউ নিজে পড়েছেন, কেউ অন্যের মুখে শুনেছেন। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হই, কখনো আবার ভালোও লাগে। এত লোকে পড়েন আমাদের 'সংবাদ।' বাহ্!

রেডিও থেকে আসে টেলিফোন। প্রথমে সালাম, অভিনন্দন, তারপর প্রচণ্ড হাসি উপহার মেলে : এবার একখানা দিয়েছেন মোনাজাতউদ্দিন! দিয়েছেন অছিলা বাঁশ! হা হা! আসুন এক কাপ চা খেয়ে যাবেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: অছিলা বাঁশ মানে!

প্রশ্নে বুঝি একটুখানি রাগের ঝাঁজ থাকে। রেডিও'র বন্ধু বুঝতে পারেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে নিতে চান তিনি। আমি রাগের মাথায় বরফ ঢেলে ব্যাপারটা তাঁকে বোঝাতে চাই। বলি, বন্ধু, একটা খবর ছাপা হলে পাঠকরা তা নানাভাবে রিঅ্যাক্ট করেন, সাধারণভাবে কেউ মনে করেন যে বিশেষ কোনো বিভাগ কিংবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে খবরটি লেখা হয়েছে। কিন্তু আপনার মতো একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এমনটি ভাবছেন কেন? আপনার কি ধারণা যে আমি রেডিও'র বিরুদ্ধে লিখেছি? কিংবা ট্রান্সক্রিপশনের পরিচালক হাসান জামাল সাহেবের বিরুদ্ধে লিখেছি? না। কখনই না। আমি শুধু চেয়েছি ঘটনাটি প্রকাশ করতে। সরকার মহল এবং পাঠকদের তথ্য জানাতে। এটাই সাংবাদিকের কর্তব্য। এর মধ্যে অছিলা বাঁশ পেলেন কোথায়?

আমার কথা বন্ধুটির পছন্দ হয় না। যেহেতু হাসান জামাল সাহেবের ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত খবর এবং যেহেতু দাপ্তরিক ব্যাপার-স্যাপারে দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সে কারণে ঐ খবরটি প্রকাশের পর খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছেন তিনি। ট্রাঙ্ক তিনটি দীর্ঘ ২০ বছর পর উদ্ধার করা হলো, এটা তার জন্যে খুশির ব্যাপার নয়, এ সম্পর্কে কোনো কথাবার্তাও নেই, তাঁর শুধু এটুকুই আনন্দ যে ট্রান্সক্রিপসনের পরিচালক হাসান জামাল জব্দ হয়েছেন। তাই, আমার কথা শুনে তিনি বেজার হলেন। চলে গেলেন আলাপের অন্য প্রসঙ্গে।

আসলে সমাজে বিচিত্র সব মানুষ, বিচিত্রতর তাদের মনমানসিকতা, চিন্তাভাবনা। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, এদেশের বহু মন্ত্রী-আমলা-কর্তা, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী—এঁরা সবাই সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চান, এ নিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতিতে কিংবা আলাপচারিতায় সুযোগ পেলেই উপদেশ খয়রাত করেন। কিন্তু এঁদের অধিকাংশেরই সাধারণ মানসিকতা এরকম যে : সবার অনিয়ম অনাচার দুর্নীতি গাফিলতি নিয়ে লেখো, কিন্তু শুধু আমাকে বাদ দিয়ে এবং একইভাবে, বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সম্পর্কিত অনিয়ম অনাচার দুর্নীতি গাফিলতির খবর ছাপা হলে অনেকেই ভেবে বসেন যে, লেখাটা ঐ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে গেছে, তারা বেশ জব্দ হয়েছেন। এটা একটা বিকৃত-তৃপ্তি, একের বিরুদ্ধে অন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মজা পাওয়া। গোটা সামাজিক পরিস্থিতি যখন দারুণ অসুস্থ, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অবক্ষয়ের কীট কেটেকুটে খাচ্ছে সমাজের প্রায় সমস্ত দেহ, যখন মূল্যবোধ হৃত; তখন একটি সংবাদ হয়ে যায় বিরুদ্ধের ব্যাপার। সে কারণে কারও কারও তৃপ্তির ব্যাপার।

আর এটা আছে বলেই সংবাদপত্র কারও কারও অপপ্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো সাংবাদিককে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করবার প্রবণতা রয়েছে।

এ থেকে নিশ্চয়ই মুক্তি চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও নানারকম প্রতিক্রিয়া রেডিও'র ট্রাঙ্ক-সম্পর্কিত খবরটি নিয়ে। প্রশ্ন নানারকম। বিচিত্র।

কী করে ঐ ট্রাঙ্কের খবরটি পেলাম, এটা জানতে চান অধিকাংশই। এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। খবরের পেছনের খবর জানার ব্যাপারে পাঠক উৎসাহী। কিন্তু এরকম প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয় :

: খবরটি যে লিখেছেন, সত্যি কি তা সঠিক? আপনি কি সত্যি সত্যি নিজে গিয়ে ট্রাঙ্ক দেখে এসেছেন?

আরেকজনের প্রশ্ন : স্টোরে ২০ বছর ধরে পড়ে আছে ৩ খানা ট্রাঙ্ক, কিন্তু বলুন তো কর্মকর্তারা সেটা জানতেন না কেন?

: ব্যাপারটি কি ষড়যন্ত্রমূলক কোনো ব্যাপার?

: ট্রাঙ্কগুলো পড়েছিল, সেটা নিয়ে এতদিন পর ঘাঁটাঘাটি কেন?

এসব প্রশ্ন শুনে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। তবু মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। পাঠক-ই আমাদের লক্ষ্মী, তাঁদের জন্যেই আমরা লিখি। তাই রাগ করলে চলে না।

কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তখনি যখন আমার এক সাংবাদিক-বন্ধুই প্রশ্ন করেন : ট্রাঙ্কের খবর তো ভালোই লিখলেন, কিন্তু এদ্দিন পরে লিখলেন কেন? ২০টি বছরে একবারও কি সময় পেলেন না? করলেন কী?

আমি গর্জে উঠতে চাই। হাত নিশপিশ করে ওঠে। তবু পরমুহূর্তে সামলে নিই নিজেকে। এ এমন এক পেশা যেখানে ধৈর্য হারালে চলে না।

তাই ভড়ং করি। ভণিতা করি। বন্ধুর প্রশ্ন শুনে হয়ে যাই নতমুখ। মিনমিনে কণ্ঠে বলি, বন্ধু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত। ২০ বছরে এ খবর লিখতে পারিনি, এটা সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

বেশ একটা স্টাইল করে বন্ধুটি কাঁধ ঝাঁকি দেন, মৃদু ঠোঁট উল্টান, বিচিত্রভাবে প্রসারিত করেন হাত এবং হাতের সবগুলো আঙুল। তারপর, 'এদেশে সাংবাদিকদের দিয়ে কিসসু হবে না' এরকম একটা হতাশা সাইনবোর্ডের মতো চোখেমুখে ঝুলিয়ে দ্রুত সরে যান সামনে থেকে।

তবে যাবার আগে বাঁ হাত বাঁকিয়ে ঘড়ি দেখেন তিনি। সময় নয়, শুধু ঘড়িটিই দেখেন। বলেন, 'ঠিক আছে মোনাজাত, সি ইউ এগেন। আমার একটু তাড়া আছে। সেক্রেটারিয়েট যেতে হবে।'

সেজদার মতো মাথা নত করে আমি বলে উঠি : ইয়েস স্যার। সি ইউ এগেন।

হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই। আমি দেখতে চাই। আমি কালো বাক্সের ভেতরটা দেখতে চাই। আমি আমার আশপাশের মানুষদের হৃদয় চিরে দেখতে চাই। দেখতে চাই তাদের বিভিন্ন রূপ ও রং।

শ্রদ্ধেয় জনাব আহমদুল কবির, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ১৬ বছর ধরে গ্রামে কাজ করা আপনার মোনাজাতউদ্দিনকে আপনি সাময়িকভাবে এই মেট্রোপলিটন সিটিতে নিয়ে এসেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আমি ফিরে যাব। তার আগে নিশ্চয়ই দেখে যাব আরও কিছু কালো বাক্স। খুলে দেখব আরও কিছু কালো চিঠি।

(রচনাকাল : ১৫ জানুয়ারি '৯২)

সেই 'কুষ্ঠ রোগী'

(শ্রদ্ধেয় ফয়েজ আহমদ ও শামসুজ্জামান হীরা-কে)

'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' ফয়েজ ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে। এঁর পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। ইনি সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক জোটের নেতা। স্বৈরাচার হটানোর আন্দোলনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর ভূমিকা ছিল কিরকম তা আমার মুখে বলা শোভা পায় না।

'কেমন আছ কেমন নেই' এই ধরনের টুকিটাকি আলাপ। তারপর যখন বিদায় নেবার পালা, তখন তিনি হঠাৎ করে হলঘরের এককোণে টেনে নিয়ে গেলেন। ভাবখানা এরকম যে, তিনি আমার সাথে গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি গোপনীয় কিছু কথা বলতে চান। কিন্তু আমার অন্য একটা ব্যস্ততা ছিল, তাই বিরক্ত হই। ফয়েজ ভাইয়ের কথার পাল্লায় যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, সহজে তিনি ছাড়তে চান না।

তা আমার ঐ মুহূর্তে বিরক্ত হবার কারণ কিন্তু তাঁর কথার পাল্লায় পড়বার ভয়ে নয়, আমার আসলেই একটা কাজের তাড়া ছিল। নইলে, অনেকদিন দীর্ঘসময় ধরে কত কথাই না তাঁর শুনেছি!

: ফয়েজ ভাই, আজ আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। একটু কাজ আছে ...

: আরে শোনোই না একটুখানি। তেমন কিছুই না, ছোট্ট একটা কথা ...

এই বলে তিনি খুব কাছে টেনে নেন, বন্ধুর মতো হাত রাখেন পিঠে। হতে পারে এটা আদরের জন্যে, কিংবা দীর্ঘ শরীরের আমাকে আরও কাছে টেনে নেওয়ার জন্যে যাতে কথা বলতে তার সুবিধে হয়। পিঠে হাত রাখতে দেওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই একটুখানি কোমর বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হয় আমাকে।

: তুমি কি ঐ খবরটা পড়েছ? ঐ যে কদিন আগে বেরিয়েছিল একটা লোক ফার্মগেটের ওভারব্রিজ থেকে ধরা পড়েছিল! ভিক্ষে করার জন্যে কুষ্ঠরোগী সেজেছিল লোকটা! পড়েছ?

: হ্যাঁ, পড়েছি। কী হয়েছে তার?

: তুমি একটুখানি খবর নাও না ভাই। লোকটা এখন কোথায়, হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে কিনা, কী কারণে গায়ে কাপড় আর চট পেঁচিয়ে ভিক্ষা করত, এসব খবর নাও, মনে হয় একটা ভালো খবর পেয়ে যাবে!

কিছুদিনের জন্য ঢাকায় এসে কাজ করছি সেটা আগেই যেন কার কাছ থেকে শুনেছিলেন ফয়েজ ভাই, সে কারণেই বুঝিবা এ খবরটি অনুসন্ধানের দায়িত্বটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন। কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্যকথা। একেই শরীরের অবস্থা ভালো নয়, তারওপর অফিসের কাজের চাপ, দুটো বই বেরুবে তার টাকা-পয়সা জোগাড় করতে হবে, এ অবস্থায় কুষ্ঠরোগীর বেশে যে ভিক্ষুকটি পুলিশের হাতে পাকড়াও হয়েছে, তার ওপর ফলো-আপ কাজটি কি সম্ভব হবে? এটা তো ফুড, পিডিবি-ডেসা, বিএডিসি কিংবা অন্য কোনো সংস্থা নয় যে টেলিফোনে খবর নিয়ে 'এক্সক্লুসিভ' একখানা মেরে দেব! এজন্যে যেতে হবে থানায়, ঐ কুষ্ঠরোগীর টঙ্গি বস্তিতে, কোর্টে এবং লোকটা এখন পর্যন্ত হাজতে আটক থাকলে যেতে হবে কারাগারে। সেখানেই বা দেখা পাব কী করে? সাংবাদিক পরিচয় দিলেই কি জেল কর্তৃপক্ষ তার সাথে দেখা করতে দেবে?

তবু, ফয়েজ ভাইকে বলি, ঠিক আছে, আমি দেখি কাজটা করতে পারি কিনা! ফয়েজ ভাই বলেন, 'পারি কিনা বললে চলবে না মোনাজাত। নিশ্চয়ই তোমাকে পারতে হবে এবং পারবেই তুমি।' তার কথার মধ্যে এমন একটা সুর থাকে, যা আমাকে ভেতর থেকে চিতিয়ে দেয়।

ফয়েজ ভাই 'সংবাদে'র কেউ নন। তবু কেন যে আমাকে দায়িত্বটি দিলেন তা বুঝলাম না। ব্যাপারটি আমার কাছে পরিষ্কার হলো তখনই, যখন তিনি বললেন, 'জানো, ঐ যে কুষ্ঠরোগী, নাম শাহা আলম, সে একজন পঙ্গু। মুক্তিযুদ্ধের সময় মাইন ফেটে পা হারিয়েছিল!

: বলেন কি!

: হ্যাঁ, তাই। আমি নিশ্চিত। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো—

আমার তখন ভীষণ বিচিত্র একটা অনুভূতি হচ্ছে। আশ্চর্য এই দেশ! রাজাকার পেয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর মুক্তিযুদ্ধের সময় পা-হারানো একজন এই তিলোত্তমা নগরীতে এসে ন্যূনতম মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনি, ভিক্ষের জন্যে শরীরে পেঁচাতে হয়েছে নোংরা ন্যাকড়া এবং চট, সাজতে হয়েছে কুষ্ঠরোগী! আর, এ সমাজে, যার দেহে প্রকৃতপক্ষেই দগদগে ঘা, কিন্তু দালানকোঠা, সোডিয়াম বাতি, ঝলমলে পোশাক আর মেকআপ দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে, সেই রোগ কিংবা রোগী চিহ্নিত হচ্ছে না, চিকিৎসা হচ্ছে না! ঘায়ে পচে যাওয়া সমাজের একজনকে কুষ্ঠরোগী সেজে ভিক্ষে করতে হয়, কেউ স্যুটকোট গায়ে চাপিয়ে লুকিয়ে রাখে নিজের কালো চেহারা। সমাজ ধ্বংস করে যারা সম্পদের পাহাড় গড়ছে, প্রাচুর্য বিলাসে গা ভাসাচ্ছে, তারা তো ধরা পড়ে না কারও হাতে! আর যে লোকটি কি-না সমাজের কারও কোনো ক্ষতি করেনি, কারও টাকা ছিনিয়ে নেয়নি, সন্ত্রাসে দেশ কাঁপায়নি, সে ধরা পড়ল কেন? কুষ্ঠরোগী সেজে ভিক্ষে করা নিশ্চয়ই একটা প্রতারণা, হয়তো আইনের চোখে অপরাধ, কিন্তু সে তো সমাজের জন্যে ...

আবেগ আমাকে পেয়ে বসে। কিংবা হতে পারে আক্রোশ। হঠাৎ করে বলে ফেলি : ঠিক আছে ফয়েজ ভাই, এ কাজ আমি করব। অন্তত চেষ্টা করব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ফাঁকে, একটা কথা বলে রাখি, সাধারণভাবে কোনো পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন যে, 'সংবাদে' প্রকাশিত আমার তাবৎ প্রতিবেদন-পরিকল্পনা বুঝিবা আমার নিজের। কিন্তু তা নয়। 'সংবাদে'র ১৬ বছরে সম্পাদক সাহেব অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন, অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন সন্তোষদা, বজলু ভাই, তোহা খান ভাই, আওয়াল ভাই, হারুন ভাই, মন্টুদা, আতাউর ভাই। কিন্তু এর বাইরেও অসংখ্য প্রতিবেদন রয়েছে যার পরিকল্পনা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি মলয় ভৌমিক, রেডিও বাংলাদেশের বার্তা বিভাগের হাসান মীর, ইত্তেফাকের সংবাদদাতা আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, আড্ডা-আসরের বন্ধুগণ এবং এই লেখায় উল্লিখিত ফয়েজ ভাইয়ের মতো অনেকে। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ফয়েজ ভাইয়ের দেওয়া পরিকল্পনাটা মাথায় ছিল। কিন্তু সময় করে উঠতে পারি না। আজ এটা কাল ওটা। কাজের পরে কাজ। বিএডিসি : ডিপটিউবওয়েল, শ্যালো, পাওয়ার পাম্প, ব্যর্থ সেচ কার্যক্রম। বরেন্দ্র প্রকল্প : সাড়ে ৫ বছরের ব্যবধানে 'একনেক'-এ দুই বার অনুমোদন। বিএভিএস : অনিয়ম-দুর্নীতি, কার্যক্রম বন্ধ, ৪শ ডাক্তার-কর্মচারী বেকার। পিডিবি, ডেসা : সিস্টেম লস, সেট-আপ আসে নি। তথ্য সংগ্রহ আর পাতার পর পাতা লেখা।

এ সময় হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায় মানিকের সাথে। জুলফিকার আলি মানিক। ফ্রি-লান্স সাংবাদিক। মতিউর রহমান চৌধুরীর নিউজ ব্যুরোর হয়ে মাঝেমধ্যে প্রতিবেদন লেখে। তার সাথে ছিল লিটন, আরেক ফ্রি-লান্স সাংবাদিক। দুজনে আমার অতিপ্রিয়। কথাবার্তা শেষে হঠাৎ কী খেয়াল হলো, ওদের বললাম, ডিসেম্বরে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের তিনটি ট্রাঙ্কের স্টোরি আপনারা কি পড়েছিলেন?

: হ্যাঁ। পড়েছি। খুব ইন্টারেস্টিং।

: ওরকম আরেকটা কাজ করতে চাই। বলতে পারেন অভিযান। আপনারা কি সাহায্য করবেন আমাকে?

বিষয় না শুনেই রাজি হয়ে গেল ওরা। 'ঠিক আছে, যা করতে বলবেন তাই করব।' আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, বুঝলাম এ অ্যাসাইনমেন্টের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে উঠেছে এ প্রজন্মের দুসাংবাদিক। আমাদের অভিযান-পরিকল্পনা সাজানো হয়ে গেল মিনিট পনেরোর মধ্যেই। আমি বললাম, 'যতক্ষণ না অভিযানে সাকসেসফুল হচ্ছি, ব্যাপারটা থাকবে খুব কনফিডেন্সিয়াল। ওরা দুজনেই বলে উঠল : 'নিশ্চয়ই।'

কিন্তু মূল কাজে হাত দেওয়ার আগে অফিসে একবার জানান দেওয়া দরকার। আতাউর রহমান, ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক ছুটিতে গেছেন। অস্থায়ী সম্পাদক কে.জি. মুস্তাফা ভাই নিউজ দেখেন। তাকেই সরাসরি জানালাম ব্যাপারটা। সাথে সাথে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। অভিযানে সফল হতে পারলে প্রথম পাতার জন্যে ভালো স্টোরি হবে একখানা। 'গো অ্যাহেড' বললেন তিনি। ডিসেম্বরের ২০ তারিখে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে কুষ্ঠরোগীর বেশে যে ভিক্ষুক যুবক, সে এখন কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজতে? নাকি ছাড়া পেয়েছে? হাজতে থাকলে কোন্ অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাকে? জামিন হয়নি কেন? তার স্ত্রী পুত্র পরিজনের অবস্থাটা কি রকম? কিভাবে দিন চলছে তাদের? চোখ-মুখ দেখে বুঝি, আমার প্রতিবেদন পরিকল্পনাটা ভালো লেগেছে অস্থায়ী সম্পাদক সাহেবের।

পরদিন সকাল থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে তেজগাঁও থানা। থানা থেকে মুখ্য মহানগর হাকিমের দফতর। সেখান থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। টঙ্গী বস্তি। বিশেষ একটি কাজের জন্য লিটন আমাদের সাথে থাকতে পারল না, অভিযানে শুধু দুজন : আমি আর মানিক। অল্প বয়স হলেও অত্যন্ত চালাক ছেলে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত হিসেব করে ফেলা। হালে এদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি অনেক তরুণ এগিয়ে এসেছে পেশাদার কিংবা শৌখিন সাংবাদিকতায়। সমাজের সর্বক্ষেত্রের উন্নাসিক কেউ কেউ 'এ যুগের তরুণদের দিয়ে কিসসু হবে না' যারা বলেন, এ মানিককে দেখলে নিশ্চয়ই তাদের সে ভুল ভাঙবে।

কথিত 'স্বাভাবিক' পথে কেন্দ্রীয় কারাগারে শাহা আলমের দেখা পেতে বেশ কয়েকদিন লেগে যেত। কিন্তু তা সম্ভব হলো মাত্র দুঘণ্টায়। কথা হলো তার সাথে, তার স্ত্রী ফিরোজা বেগমের সাথে। সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর ১৬ জানুয়ারি ৯২ বৃহস্পতিবার সকালে, ঠিক সোয়া ন'টায় লিখতে বসলাম 'কুষ্ঠরোগী' শাহা আলমের কাহিনী। দুপুর একটায় শেষ হলো। সংবাদের স্টাফ হলে প্রতিবেদনটি হয়তো দুজনের নামেই ছাপা হতো, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাই শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলো। প্রতিবেদনের শেষে লেখা হলো জুলফিকার আলি মানিকের নাম।

শাহা আলমের কাহিনী সত্যি বিচিত্র। অন্তত আমার কাছে। সে ছিল ঢাকার কালীগঞ্জের শোমথানা এলাকার এক দুরন্ত কিশোর। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বয়স তার ৯ বছর। নিজে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধ করেনি, বয়স অনুযায়ী সে সাধ্যও ছিল না। কিন্তু কালীগঞ্জ এলাকায় তৎপর ছিল যে মুক্তিযোদ্ধারা, তাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। এটা-ওটা ফুটফরমায়েশ খাটত, এখানে-ওখানে থেকে 'ইনফরমেশন' যোগাড় করে আনত। কিন্তু একদিন, মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেল তার বাঁ পায়ের নিম্নাংশ। তবু বেঁচে রইল সে। বুঝিবা মুক্তিযোদ্ধাদের আজকের যে গ্লানি, তা বহন করার জন্যে।

অতি গরিব ঘরের সন্তান শাহা আলম। একটু বয়স বাড়লে কাজের সন্ধান শুরু করল। কিন্তু 'খোঁড়া' যুবকটিকে কে দেবে কাজ? চলে এলো সে ঢাকা শহরে। এখানেও শতচেষ্টা করে একই ব্যর্থতা। কাজ মিলল না। টঙ্গী এলাকার এর-ওর কাছে হাত পাতা। ভিক্ষে মিলল, তবে খুব কম। দিনে ১০/১২ টাকার বেশি পাওয়া যায় না। এতে সংসার চলে না। কেননা ইতোমধ্যে সে বিয়ে করেছে, সন্তান হয়েছে।

ইট-সিমেন্ট বাঁধানো এই মহানগরীতে কত ধান্ধাবাজ। সবার সাথে না হোক তাদের কারও কারও সাথে সে ক্রমশ পরিচিত হলো। তাদের ধান্ধার কৌশল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখল। তারপর মাথায় এলো এক বুদ্ধি। ভেক না ধরলে ভিখ মিলবে না। বেশি টাকা আয়ের জন্যে নিতে হবে এমন কৌশল যাতে 'মানুষের' করুণার উদ্রেক হয়, বেশি করে ভিক্ষের পয়সা মেলে। সে করল কী, নোংরা কিছু কাপড় জড়ালো শরীরের বিভিন্ন অংশে, জড়ালো চট। সে যেন এক কুষ্ঠরোগী। এসে দাঁড়ালো ফার্মগেট ওভারব্রিজের ওপর। শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। কণ্ঠে কোনো আর্তি নেই, ভিক্ষের আবেদন নেই, ঊর্ধ্বমুখে শুয়ে থাকল চুপচাপ, যেন মরা। পথে পথে হাত পেতে যে ভিক্ষুকটি ১০/১২ টাকা পেত, সে কিনা প্রতিদিন ওভারব্রিজের একই জায়গায় শুয়ে থাকে রোজগার করতে লাগল ৮০/৯০ টাকা। বুদ্ধিমান শাহা আলম চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেও পা দুখানা ফাঁক করে রাখত, দেখে যেন মনে হতো টিকচিহ্ন। এই ভঙ্গিটির উদ্দেশ্য যে কেবল বেশি জায়গা দখল বা পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ তা–ই নয়। দুপায়ের ফাঁকে কেউ সিকি আধুলি ছুঁড়ে দিলে তা গড়িয়ে যেতে পারত না। হাতিয়ে নিতে পারত না টাকা।

শাহা আলম রুটিনমাফিক কাজ করত। ঝড়-বাদলার দিন ছাড়া প্রতিদিন সে সকাল ৭ টায় বস্তি থেকে বেরুত, ঘরে ফিরত রাত ১০/১১ টায়। দুপুরের আহার সারত ঐ ব্রিজের উপরেই। এক পিচ্চিকে দিয়ে ধারে-কাছে থেকে আনিয়ে নিতো খাবার। এজন্যে ছেলেটিকে দিত ২/৩ টাকা।

AMARBOI.COM

ধনী হতে চায়নি শাহা আলম। কালো টাকা বানাতে চায়নি। ছিনিয়ে নিতে চায়নি অন্যের সম্পদ। সে শুধু স্ত্রী আর দুসন্তান নিয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। লোভ ছিল না তার, বড় কোনো স্বপ্ন ছিল না, শুধু এটুকু চেয়েছিল যে, মেয়েটিকে লেখাপড়া করাবে। তাই ভর্তি করে দিয়েছিল টঙ্গী বস্তির কাছে স্কুলে। কিন্তু এইসব গুঁড়িয়ে দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এক পুলিশ তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল থানায়। থানা থেকে কোর্ট। কোর্ট থেকে কারাগার।

অবশ্য এই পাকড়াও ঘটনা এমনিতে ঘটেনি। একটি পত্রিকার প্রথম পাতায় ২০শে ডিসেম্বর '৯১ ছাপা হয় ফার্মগেট ওভারব্রিজের উপর শুয়ে থাকা শাহা আলমের একটি ছবি। সেটি দেখে পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তেজগাঁও থানায় ফোন করেন, লোকটিকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। যিনি শাহা আলমকে ধরে এনেছেন, তিনিও অবশ্য জানতেন না যে লোকটি আসলে কুষ্ঠরোগী নয়। ঐ ন্যাকড়া আর চট তার আবরণ মাত্র।

পরিণাম যাচাই-চিন্তা না করে এরকম ছবি শুধু শাহা আলমের নয়, আরও ছাপা হয়েছে অনেক। এর মধ্যে একটি ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। একটি পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেল সরকারি জমির উপর অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বস্তির। ঐদিনই সকাল ১০ টার মধ্যে বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিল গোটা বস্তিটি। নিরাশ্রয় হলো হাজারো মানুষ। বস্তি থেকে পথের ধুলোয় খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিল তারা। আমাদের নগরপিতাগণ করিতকর্মা বটেন! তাঁরা নগরবাসীর সুবিধার জন্যে প্রকৃত যা প্রয়োজন সে ব্যবস্থা নেন না, পানি সরবরাহ করতে পারেন না, বিদ্যুৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরি বন্ধ করতে পারেন না, ভাসমানদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন না, কিন্তু কাগজে ছবি ছাপা হওয়া মাত্রই বস্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে হাজার হাজার নরনারী শিশুকে পথে বসান। আমাদের সরকার এবং সমাজ-কাঠামো এমনই যে, এখানে শাহা আলমদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে পারেন না, কিন্তু জীবনের ওভারব্রিজ থেকে পথে টেনে আনেন তাকে একেবারে থানায়, তারপর কেন্দ্রীয় কারাগারে। ওদিকে শাহা আলমের স্ত্রী, দুটি সন্তান নিয়ে অসহায় সম্বলহীন অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে। অপরাধ-প্রবণতা রোধের কী চমৎকার তৎপরতা!

১৭ জানুয়ারির 'সংবাদে' শাহা আলমের কাহিনী প্রকাশিত হয়। শিরোনাম : 'সেই কুষ্ঠরোগী শাহা আলম এখনও কারাগারে মুক্তির দিন গুনছে।'

এ প্রতিবেদনটি নিয়েও সৃষ্টি হয় বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া। কেউ অভিনন্দন জানায়। খুব ভালো একখানা লিখেছেন মোনাজাতউদ্দিন। থ্যাংক ইউ। কেউ জানতে চায় কারাগারে গিয়ে শাহা আলমের সাথে দেখা করার বিশেষ কৌশলটি কী ছিল? কেউ রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, আপনি যে কৌশল অবলম্বন করে জেলখানায় ঢুকেছেন সেটা কি বৈধ হয়েছে? কেউ আবার সামনে বলেন, 'ফাইন ফাইন, বিউটিফুল বিউটিফুল', আবার পিছনে গিয়ে বলেন, 'শালা! মহা কাজ করে ফেলেছে! সাংবাদিকের দায়িত্ব কি গোয়েন্দাগিরি নাকি! সবকিছু খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতে হবে!' দেশের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জানতে চান, 'এই যে আপনি একটা অপরাধের কাহিনী বের করতে গিয়ে নিজেই অপরাধ করে ফেলেছেন, সেটা কি ন্যায়সংগত হলো?

কথা মালা। প্রশ্ন। বিতর্ক। প্রশংসা। বিদ্রূপ।

তখন আমি মনে মনে আমার নিজের জীবনের হিসেব মেলাই। নিজেই নির্ণয় করার চেষ্টা করি নিজের রোগ। পথ থেকে পথের 'নিজস্ব রিপোর্ট'-এর আয়নাটি এবার নিজের দিকে ফিরিয়ে নিই। মুখ দেখি। হাত পা বুক পেট এইসব দেখি। 'কুষ্ঠরোগী' শাহা আলমকে দেখি আমার মুখের বদলে।

এবং সেই আয়নায় তিলোত্তমা নগরীর ঝলোমলো আলো দেখি, কোনো কোনো মানুষের ঐশ্বর্য প্রাচুর্য বিলাস দেখি, নতুন মডেলের শত শত ধাবমান গাড়ি দেখি, খাদ্য গুদাম, মালঠাসা কাপড়, জুতা, গহনা, কস্‌মেটিক্সের দোকান দেখি। মিছিল জনসভা নেতাদের হাতনাড়ানো ও জনতার শব্দহীন হাততালি দেখি। ভোটের বাক্স দেখি। বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতাভঙ্গি ও বিবৃতি লিখন দেখি। টেলিভিশনে উন্নয়নের রঙিন বন্যা দেখি। আকাশছোঁয়া ভবন দেখি। জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে নির্মিত সুরম্য সংসদ ভবন দেখি। লক্ষ কোটি মানুষ এবং সবুজের জমিনে লাল সূর্য আঁকা পতাকা ও বিশাল মানচিত্র দেখি।

আমি আমাকেই দেখি। শাহা আলমের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। কিন্তু দুজনের মধ্যে এটুকুই পার্থক্য যে, সেই যুবক তার নিরোগ এবং পবিত্র শরীরে পেঁচিয়ে রেখেছে নোংরা কাপড় ও চট। আর আমি, কুষ্ঠ-আক্রান্ত ঘা-দগদগে শরীরটি ঢেকে রেখেছি ফর্সা কাপড়ে, বিভিন্ন মেকআপের আড়ালে।

(রচনাকাল : ১৮ জানুয়ারি '৯২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানসোনার মুখ

উৎসর্গ

মরহুম সাংবাদিক
মোজাম্মেল হোসেন মন্টুর
স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯২ প্রকাশক :মলয় ভৌমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানসোনার মুখ

গ্রামের নাম কানসোনা। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার একটি গ্রাম। উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে নেমে পূর্ব-দক্ষিণে, মরা-প্রায় করতোয়া নদী পেরিয়ে, মেঠোপথে এগুলেই কানসোনা গ্রামটি। উল্লাপাড়া বাজার থেকে কোনাকুনি পথে গেলে এর দূরত্ব হবে মাইল চারেক। কানসোনার পরেই চরপাড়া, সলপ ইউনিয়ন, এখানে কৃষকদের নামে আছে কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী 'কৃষকগঞ্জ বাজার'। আর এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে সলপ রেলস্টেশন। সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী লাইনে ছোট্ট এই স্টেশনটিতে নেমেও কানসোনায় যাওয়া যায়।

কানসোনার নাম ছিল 'কর্ণ-সুবর্ণ', দিনবদলের পালায় লোকের আটপৌরে ব্যবহারে কখন যে সেই 'কর্ণ-সুবর্ণ' কানসোনা হয়েছে কেউ বলতে পারে না, বৃদ্ধ লোকজনেরাও না। এককালের জমিদারশাসিত সলপ ইউনিয়নের এই গ্রামটি ছিল হিন্দুপ্রধান, দেশ বিভাগের পর জমিজমা বেচে দিয়ে তারা প্রায় সবাই চলে গেছে 'ইন্ডিয়ায়'। এখন, গ্রামে ১১৩টি পরিবারের মধ্যে ভৌমিক পরিবারটি কোনোরকমে টিকে আছে। পরিবারপ্রধান রাজশাহী শহর-পার্শ্ববর্তী এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তাঁর ছেলে কল্যাণ ভৌমিক শুধু সস্ত্রীক এ গ্রামে বাস করছেন। তিনি সামান্য জমি-জিরাত দেখাশোনা করা ছাড়াও সলপ হাইস্কুলে শিক্ষকতা এবং 'দৈনিক বার্তা'র স্থানীয় সংবাদদাতার কাজ করেন। এছাড়াও রয়েছে দুতিন ঘর ঘোষ; গাভী আর দুধের কারবারে মার খেতে খেতে এখন নিঃশেষ প্রায়। বাদবাকি সব মুসলমান পরিবার, এদের মধ্যে তাঁতি পরিবার রয়েছে একটি, আর সবাই জমি-আবাদ কিংবা ছোটখাটো চাকরি করেন। গ্রামের অধিকাংশই ভূমিহীন, এদের কেউ ক্ষেতমজুর, পরের জমিতে স্বল্প মজুরিতে একেকটি শ্রমের যন্ত্র; কেউ ক্ষুদ্র বর্গাচাষী, কেউ আবার সম্পূর্ণ বেকার। শিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত যুবক বেকারের সংখ্যাও গ্রামটিতে কম নয়। দীর্ঘদিন ধরে কাজ না পাওয়ার ব্যর্থতায় দারুণ হতাশা বুকে বেঁধেছে ক্ষয়রোগের মতো। এদের মধ্যে দুচারজন ইতোমধ্যেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন দেশের বিভিন্ন শহরে চাকরির সন্ধানে। তাদের দেখাদেখি আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কয়েকজন স্বল্পশিক্ষিত বেকার যুবক পাঠাচ্ছেন আবেদনপত্র বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় : কেরানি কিংবা পিয়নের চাকরির জন্যে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে এরা না পারছেন লাঙলের মুঠো ধরতে, না পারছেন ক্ষুদ্র চাকরিও জোটাতে। গ্রামের সাতাশজন যুবক মিলে গড়েছেন মুক্ত নাটক দলের শাখা। পাণ্ডুলিপিহীন তাদের নাটকে কাহিনী থাকে; কেউ সাজেন শোষক, জোতদার, মহাজন, টাউট, বদমাইশ; কেউ সাজেন ক্ষুদ্র চাষী, বর্গাদার, ভূমিহীন মজুর। কারও বাড়ির উঠোনে হারিকেনের স্বল্প আলোয় গণনাটক যখন জমে ওঠে, তখন বাস্তব ক্ষেত্রে পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলে, গ্রামের শোষণের কীটগুলো বসে থাকে না। নাটকের রাত পোহালেও পরদিন কেউ নতুন জমি কিনে সম্পদের আয়তন বাড়ায়, পাশাপাশি কেউবা হয়ে যায় সম্পূর্ণ ভূমিহীন।

কাজলরেখা এবং তার 'শিশুশিক্ষা'

দেশের আর সব গ্রামের মতো উল্লাপাড়া উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কানসোনার পরিবার ও জমির মালিকানা দ্রুত খণ্ডিত হচ্ছে। দিনে দিনে মানুষ বাড়ছে, কিন্তু কমছে জমির উৎপাদন। যারা ক্ষুদ্র চাষী, নতুন ফসল উঠার পর তা যারা ধরে রাখতে পারে না, তারা কোনো মৌসুমেই পাচ্ছে না উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম, মজুররা পাচ্ছে না শ্রমের ন্যায্য মজুরি, পাশাপাশি, বিভিন্নভাবে গ্রামে গড়ে উঠছে কাঁচা পয়সার মালিক। ... গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, নানা সমস্যাকবলিত ভাঙা ঝরঝরে স্কুল থাকলেও সেখানে সর্বস্তরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। গ্রামে, এমনকি সলপ ইউনিয়নেও নেই কোনো স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র। গ্রামে কিশোর-যুবকদের খেলাধুলা কিংবা সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নেই : মাঝে-মধ্যে দু-একটা মুক্তনাটক ছাড়া। টিভি নেই, রেডিও থেকে 'বাণিজ্যিক কার্যক্রম' ছাড়া শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তেমন কেউ শোনে না, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত একটিমাত্র দৈনিক পত্রিকা এখানে ডাকযোগে এসে পৌঁছায় দুদিন পর, তার পাঠক মাত্র দুজন। গোটা গ্রামের মানুষ রয়েছে তথ্য-শূন্যতায়। ঢাকা-রাজশাহী, এমনকি পাবনা-সিরাজগঞ্জের কোনো ঘটনা এখানে এসে পৌঁছায় বিচিত্র বিকৃতভাবে। বিস্তারিত হয় গুজবের শিকড়।

৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে নাকি বাংলাদেশ বাঁচবে! এই বক্তৃতার বাণী কানসোনার মানুষ আজ পর্যন্ত কানে না শুনলেও তারা সমষ্টির জন্যে নয়, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ করে যাচ্ছে শুধু নিজেকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। নানা সমস্যা-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে, জীবনযুদ্ধের একেকজন সৈনিক এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সুস্থ সুন্দর জীবন সেখানে নিরুদ্দেশ, নেই সেখানে কোনো সুবর্ণ আগামী।

কানসোনা গ্রামে আছে নানা কুসংস্কার, ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রথা, আছে যৌতুক পীড়ন, নারী নির্যাতন, আছে বেকারত্ব। গ্রামে বাড়ছে শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে এমনকি একটি পরিবারের মানুষে মানুষেও চলছে শোষণ। গ্রামটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঠপর্যায়ের কোনো কৃষিকর্মী নেই, জন্মশাসন এবং কথিত বুদ্ধিমান হবার ম্যাসেজ এখানে পৌঁছায়নি, নেই স্বাস্থ্য-শিক্ষা কার্যক্রম, প্রাইমারি শিক্ষাব্যবস্থা পড়েছে প্রায় ধসে। নিজস্ব এক পর্যবেক্ষণমূলক জরিপে দেখা যায়, প্রতি দশ জন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মাত্র তিন জন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হতে পারছে; কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র একজন প্রাইমারি ছাড়িয়ে যেতে পারছে হাইস্কুল পর্যন্ত। দুজনের পাঠ প্রাইমারি অবস্থাতেই ইতি হচ্ছে। এর মূল কারণ অভাব, এছাড়াও আছে পারিবারিক অবহেলা, শিক্ষার ব্যাপারে অসচেতনতা ইত্যাদি। গরিব পিতা তার ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর বদলে পাঠাচ্ছে ভূস্বামীর জমিতে, কাজে। অভাবের সংসারে নগদ পয়সা উপার্জনের যন্ত্র হয়ে উঠছে সেই বালক।

তবু কারও কারও আশা আছে। যেমন স্বামী-অবহেলিত রেজিয়া চায়, সে তার মেয়ে কাজলরেখাকে পড়াবে, নগদে ভর্তি করিয়ে দেবে প্রাইমারি স্কুলে। আর এজন্যে মেয়েটিকে কিনে দিয়েছে এক টুকরো 'শিশুশিক্ষা'। কানসোনার কেবলি সূর্য ওঠা এক-চিলতে উঠোনে কাজলরেখাকে পিঁড়িতে বসিয়ে শত দুঃখের রেজিয়া বেগম, কানসোনা গ্রামের এক মা, বলে, পড় কাজলী, পড়।

কাজলরেখা, শিশুশিক্ষার পাতায় কচি আঙুল টিপে টিপে, শরীর দুলিয়ে, অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করতে থাকে, অ আ ক খ এবং কানসোনার সূর্য তখন চড়া হয়ে ওঠে তরতর করে।

সূর্য ওঠে-ডোবে, দিনের পরে আসে দিন, কাজলরেখা ক্রমশ বড় হতে থাকে। কিন্তু কানসোনার পচাগলা সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিস্থিতিতে আজকের এই কাজলরেখা, ইতিহাস কাহিনীর যোদ্ধা সুলতানা রাজিয়া হবে, নাকি হবে বর্তমানের ভাগ্যবিড়ম্বিত রেজিয়া বেগমের মতোই একজন?

অবহেলার এক শিকার : আনোয়ারা বেগম

কানসোনা গ্রামের বিধবা আনোয়ারা বেগম। তাঁর স্বামী আখতার হোসেন খান ছিলেন ডাক বিভাগের একজন ক্ষুদ্র কর্মচারী; বেতন পেতেন প্রায় বারো শ টাকা। সাড়ে পনেরো বছর ঐ বিভাগে চাকরি করার পর গত বছরের ১০ মার্চ উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগে ভুগে তিনি মারা যান।

আখতার হোসেন খানের দুছেলে, দুমেয়ে, নাবালক এ চার সন্তান নিয়ে বিধবা আনোয়ারা বেগম এখন কোথায় যাবেন? কী করবেন? ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরা জোটানোই মুশকিল, সেখানে তাদের লেখাপড়া করাবেন কী করে? সিরাজগঞ্জের কল্যাণী গ্রামের মেয়ে এখন এই কানসোনায়, যার সামনে কোনো কল্যাণ তো নেই-ই, পেটে-ভাতে বেঁচে থাকাটাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

আখতার হোসেন খানের ৫ বিঘা জমি ছিল। পিতার সূত্রে পাওয়া সে জমি বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি বেঁচে থাকতেই, সংসারের অভাব-অনটন সামলাতে। চাকরির সামান্য বেতনের টাকায় সংসার চলত না, ওদিকে বর্গায় আবাদ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ায় ফসলও তেমন পাওয়া যেত না, সে কারণে আবাদি জমিতে হাত পড়েছিল। শেষদিকে কিছু জমি বেচতে হয় অসুখে চিকিৎসার কারণে। আখতার হোসেন খান মারা যাবার পর এখন আছে মাত্র দশ শতক জমি, একটি টিনের ঘর, চারটি নাবালক সন্তান আর তাদের ক্ষুধা। বড় ছেলে আবুল বাশারের পরীক্ষা, মেয়ে রুবি পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে, ওদের লেখাপড়া শেষ পর্যন্ত হবে কি? অথচ আনোয়ারা বেগমের স্বপ্ন : ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবেন। আত্মীয়স্বজন আর অতি পরিচিত লোকজন এখন কিছু সাহায্য করছে, কিন্তু তা কতদিন পাওয়া যাবে?

ডাক বিভাগ থেকে আনোয়ারা বেগমের 'পারিবারিক পেনশন' পাবার কথা। পায়নি আজও। আবেদন করেছে, কিন্তু তয়-তবদির করার লোক আর 'খরচাপাতি' করার মতো পয়সা নেই। পাবনায় ডিপিএম অফিসে গিয়ে আনোয়ারা বেগম জেনে এসেছে জলদি পেনশনের টাকা পেতে হলে অফিসে কিছু খরচাপাতি করতে হবে এবং সেটাই এখন নাকি 'নিয়ম'। কিন্তু সে সাধ্য কই বিধবা মহিলার!

পাবনায়, গত মাসে ডাক বিভাগে খবর নিয়ে জানা গেল : পারিবারিক পেনশনের কাগজপত্র প্রসেসে আছে। আনোয়ারা বেগম তার আবেদনপত্রের সাথে যে ছবি পাঠিয়েছিলেন তা নাকি সত্যায়িত করা 'নিয়মমাফিক' হয় নি। ইউপি চেয়ারম্যান ঐ ছবিটি সত্যায়িত করেছেন, কিন্তু তা নাকি করতে হবে সিরাজগঞ্জের ডাক বিভাগীয় পরিদর্শক সাহেবকে দিয়ে। সে কারণে ফেরত পাঠানো হয়েছে ছবিটি : আবেদনপত্র পাঠানোর দীর্ঘ আট মাস পর। ছবি সত্যায়িত করাটা যে কথিত 'নিয়মমাফিক' হয় নি, তা পাবনার ডিপিএম অফিসের কর্তারা আট মাস পর আবিষ্কার করলেন; কিন্তু আনোয়ারা বেগমের সংসারের অভাব-অনটন তো আর নখর গুটিয়ে বসে নেই!

AMARBOI.COM

কানসোনা গ্রামের বিধবা আনোয়ারা বেগম কী কারণে ডাক বিভাগের এহেন দীর্ঘসূত্রতার শিকার হলেন, সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কর্তাব্যক্তিরা তা তদন্ত করে দেখবেন কি?

সোহরাব-মজনুর কাহিনী

কানসোনা গ্রামের দিনমজুর সোহরাবের বাবার জমিজমা ছিল, সে-ই বেচে খেয়েছে। শুধু দেহ-সম্বল বড় হয়ে নিরক্ষর সম্পূর্ণ ভূমিহীন সোহরাব মজুরিতে নামে। সম্পদ বলতে একখানা ভাঙা খড়ের ঘর, দৈহিক শক্তি, আর আছে চার ছেলেমেয়ে। স্ত্রীসহ সংসারে মোট খাবারের মুখ ছটি।

সোহরাব মজুরিতে পাকা, খাটতে পারত ভালো, মালিকের পছন্দসই। মজুরির টাকা নিয়ে প্রতিবাদ করত না, দুপুরের খাবার দিলে বেশি চাইত না, যা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা হতো যন্ত্রের মতো তা-ই করে দিত। এসব কারণে অন্যান্য মজুর সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন কাজ পেলেও সোহরাবের ডাক পড়ত প্রতিদিনই।

একদিন এক বাড়িতে গাছ কাটার কাজ করতে গিয়ে সোহরাব ডাল ভেঙে পড়ে গেল, ভেঙে গেল ডান পা খানা। দিন আনা দিন খাওয়া লোকটা বিছানায় পড়ল। হাতে সঞ্চয় ছিল না, তাই চিকিৎসা করাবে কী, খাবারই তো জোটে না! যার বাড়িতে কাজ করছিল, তিনি কোনো আর্থিক সাহায্য করলেন না। সোহরাব গেল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে, তিনি সাহায্যের আশ্বাস দিলেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সাহায্য মিলল না। ঘরের ঘটিবাটি, হাঁস-মুরগি বিক্রি করেও যখন আর কুলোয় না, তখন কর্মীর হাত পরিণত হলো ভিক্ষুকের হাতে। কিন্তু পায়ের অবস্থা এমন যে, কারও বাড়ি বয়ে সাহায্য চাইতে যাওয়াটাও মুশকিল।

পায়ের চিকিৎসার নামে হলো ঝাড়-ফুঁক, গাছের পাতা-শেকড় বাটা লাগানো কিংবা তেল মালিশ। সলপ ইউনিয়ন এলাকায় সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র নেই, ডাক্তার নেই, যেতে হয় উল্লাপাড়া কিংবা সিরাজগঞ্জ-পাবনায়। যাতায়াত কষ্টকর, টাকা-পয়সাও লাগে মেলা, সোহরাব পাবে কোথায়? অপারেশনের জন্যে অনেক টাকা লাগে।

সোহরাবের পা ভেঙেছে দুবছর আগে। দীর্ঘদিন সে বেকার, কোনোরকমে ঘর থেকে দুচার পা বেরোয় লাঠিতে ভর দিয়ে। শুকিয়ে যাওয়া লোকটাকে দেখে কে বলবে দুবছর আগে এর শরীরে প্রচণ্ড শক্তি ছিল, উদয়াস্ত শ্রম দিতে পারত ভূস্বামীর জমি কিংবা বাড়িতে!

পঙ্গু সোহরাবের চার ছেলেমেয়ে। তিন ছেলের মধ্যে বড়জন মজনু, বয়স মাত্র চৌদ্দ। উপায়হীন পিতা এখন তাকেই পাঠিয়েছে কাজে, অন্যের জমিতে। কিশোর মজনু মাস-ঠিকে ভিত্তিতে 'পাইট' খাটে, মাসিক বেতন মাত্র এক শ টাকা। খাওয়া পায়। বেতনের পুরো টাকাটাই বাবার হাতে তুলে দিয়ে যায় ছেলেটি।

কানসোনা গ্রামের মজুরের ছেলে মজনু, এভাবেই বড় হচ্ছে দ্বিতীয় সোহরাব হয়ে। মজনুর পরের দুটি ভাই, ওরাও শিশু অবস্থা থেকে বড় হচ্ছে নিরক্ষর অবস্থায়। কানসোনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে শ্রমের আরও অনেক শরীর।

অসহায় একজন রেজিয়া

মেয়েটির নাম রেজিয়া। উল্লাপাড়ার কানসোনা গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র চাকুরে ফুলজার হোসেনের মেয়ে রেজিয়ার অনেক দুঃখ : স্বামী তাকে নিচ্ছে না, অথচ লোকটি তাকে দিয়েছে ইতোমধ্যেই দুটি সন্তান। বাবার অভাবী সংসারে বোঝা হয়ে থেকে রেজিয়া নিজে কী খায় আর নাবালক সন্তান দুটিকেই বা কী করে মানুষ করে? নিজে নাহয় একবেলা উপোস করেও কাটানো যায়, কিন্তু কচি ছেলেমেয়ে দুজনার ক্ষুধার কান্না থামায় কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ে হয়েছিল রেজিয়ার বছর দশেক আগে। অনেক ধারদেনা করেন গরিব পিতা, বেচতে হয় কিছু জমিও। বিয়ের সময় যৌতুক বাদেও শর্ত হয় জামাইকে চাকরি পাইয়ে দিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি মেলেনি, রেজিয়াকেও এ পর্যন্ত নেয়নি ছেলেটি তার বাড়িতে। ওদিকে, খবর এসেছে, সে নাকি 'আবারও আরেকটা' বিয়ে করেছে অন্যত্র। রেজিয়া ভেবেছিল স্বামী পরিচয়ের লোকটার বিরুদ্ধে মামলা করবে, খোরপোশ দাবি করবে, কিন্তু এখনও তা পারে নি। কেউ বলেছে তাকে মামলা-মকদ্দমায় অনেক ঝামেলা, যেতে হবে গ্রাম থেকে চার মাইল দূরের উপজেলা আদালতে, তার ওপর আবার টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে।

স্বামী তাকে বাড়িতে নেয় নি, কিন্তু সেই 'পুরুষ' বিয়ের পর কয়েক বছর শ্বশুরবাড়িতে এসেছে, রেজিয়াকে দিয়েছে দুটি সন্তান। গ্রামের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পাস রেজিয়া স্বপ্ন দেখত সে তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াবে, কলেজে পড়াবে, 'শিক্ষিত মানুষ' করবে, কিন্তু স্বামীর অবহেলায় গুঁড়িয়ে গেছে সে স্বপ্ন। বড় ছেলেটি গ্রামের স্কুলে যায় বটে; কিন্তু বইপত্র নেই, তেমন জামা-কাপড় নেই। ছোট মেয়েটি, নাম কাজলরেখা, তাকে কিনে দিয়েছে শিশুশিক্ষা। রেজিয়া জানে না, এ মেয়েটির ভবিষ্যৎ কী হবে। এদিকে আবার নিজেও অসুস্থ। অনিয়মিত এবং প্রয়োজনের মুখে সামান্য পরিমাণ খাবারে দেহে বেঁধেছে অসুখ। চিকিৎসার সাধ্য নেই।

· রেজিয়া শুধু কাঁদে। অসহায়ত্ব আর এক বুক যন্ত্রণা অশ্রু হয়ে গাল বেয়ে পড়ে। শাড়ির আঁচল ভেজে, শুকায়, ভেজে, কিন্তু উল্লাপাড়ার অখ্যাত গ্রাম কানসোনা থেকে এক নারীর নীরব এ কান্না সেইসব পুরুষের কাছে পর্যন্ত পৌঁছায় না, যারা শ্বশুরের ওয়াদামতো চাকরি না পাওয়ায় স্ত্রীকে গ্রহণ করে না, বিয়ের পরেও যারা স্ত্রীকে সন্তান দেয় কিন্তু সে সন্তানের দায়দায়িত্ব অসহায় নারীটির ওপর চাপিয়ে দিব্যি চোখ বুজে থাকে।

AMARBOI.COM

পাশাপাশি দুই চিত্র

কানসোনা গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুটা এগুলেই কৃষকগঞ্জ বাজার, সেখানে দাঁড়ালে চোখে পড়ে সলপ হাইস্কুল আর স্কুলের পাশে একটি সদ্যনির্মিত পাকাবাড়ি। বিরাট চত্বরজুড়ে গাছগাছালি, খড়ের গাদা, ছোট পুকুর, সব্জি বাগান। ইট-সিমেন্টে গাঁথা পাকা দেয়ালের ওপর টিনের চালা, তাতে চক্চকে চড়া রোদ প্রতিফলিত হয় অনেক দূর থেকে, দেখা যায় বাড়িটির জৌলুস। এ জৌলুস কানসোনা আর আশপাশের গ্রামের যুবকদেরও চোখে পড়ে : যারা বেকার, হতাশ, না পারে চাষাবাদের কাজ করতে, জোটাতে পাচ্ছে না চাকরি।

বাড়িটি বানিয়েছেন এলাকার একজন যুবক ইব্রাহিম হোসেন। এসএসসি পাস করবার পর তিনিও বেকার অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ ঘটনাক্রমে কুয়েত যাবার 'সুযোগ' হয় তার। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর সেখানে চাকরি করবার পর কিছু টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয় করে দেশে ফিরে এসেছেন, ফিরেছেন গ্রামে। লাখখানেক টাকা ব্যয় করে পাকাবাড়ি বানিয়েছেন, এখন ইব্রাহিম ধান-চাল-সরিষার ব্যবসা করছেন বাকি টাকায়। আয়ের মোটা টাকা যদিও ব্যয় হয়েছে অনুৎপাদনশীল কাজে, তবু দৃশ্যত, যুবকটি 'বিদেশে গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়েছেন' এটাই সাধারণভাবে সবাই বোঝেন। কী করে কত টাকায় সেদেশে যাওয়া যায়, কাজ কেমন, আয়-উপার্জন কিরকম, এইসব বিষয় প্রশ্ন জানতে চায় যুবকেরা। কেউ ঈর্ষান্বিত হয়, কেউ স্বপ্ন দেখে বিদেশ যাত্রার, লাখ টাকা কামাইয়ের। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার পোকা হতাশার রূপ নিয়ে কুটে কুটে খায় তাদের।

প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় একই শহরে ও গ্রামে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শ্রেণী, সৃষ্টি হয়েছে দারুণ অসমতা, বিভেদ। কাঁচা পয়সায় কারও নতুন দালান উঠছে, জমির আয়তন সম্প্রসারিত হচ্ছে, সম্পদ বাড়ছে, পাশাপাশি কেউ হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভূমিহীন, সহায়-সম্বলহীন। আশ্রয়ের শেষ ছাউনিটুকুও তাদের ছিন্নভিন্ন, বেড়াহীন, ধসে পড়ো-পড়ো। কানসোনার আজকের যুবকেরা, যারা নতুন পুরুষ, দেশের আগামী, দেশ-সমাজের জন্যে রাখতে পারে বিরাট অবদান, সামাজিক এই অসমতায় তারা বঞ্চনার জটিল অসুখে ভোগে, বুঝি তাদের আদর্শের পথ স্বাভাবিকভাবেই হয় টলমল। স্বপ্নগুলো চুরমার হয়, বুকের ভেতর বাড়ে এক যন্ত্রণা, বাস্তবিকপক্ষে যা কিনা গোটা সমাজের জন্যেই হয়ে ওঠে ভীষণ ক্ষতিকর।

AMARBOI.COM

দুঃখিনীর মা : দুঃখের মুখ

আসলে তার নাম লক্ষ্মীরাণী, কিন্তু তা কেউ জানে না, প্রয়োজনও বোধ করে না কেউ। গ্রামে সবার কাছে সে 'দুঃখিনীর মা' বলে পরিচিত। কানসোনা গ্রামের ভাগ্যবিড়ম্বিত শত নর-নারীর যাবতীয় দুঃখ ধারণ করে সে সেই কাকডাকা ভোর থেকে অনেক রাত অবধি চরকির মতো ঘোরে কাজের পেছনে, এক গৃহস্থের বাড়িতে।

আজকের দুঃখিনীর মা, যার নাম লক্ষ্মীরাণী, ভাগ্যলক্ষ্মী কখনই প্রসন্ন হয় নি তার জন্যে। বয়স যখন মাত্র ছসাত বছর, নাবালিকা সে, তখন বিয়ে দেয় নিরক্ষর অসচেতন পিতামাতা, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীরাণী হয়ে যায় বিধবা।

এরপর, বয়স কিছু বাড়লে প্রথম সেই বিয়ের কথা গোপন রেখে আবার তার বিয়ে দেওয়া হয় এক জেলের সাথে, একে একে লক্ষ্মীরাণীর যৌবনের কোলে আসে পাঁচটি সন্তান। এদের মধ্যে শেষ মেয়েটি যখন পেটে তখন অসুখে ভুগে মারা যায় তার এ স্বামীটিও। কয়েক মাস পর মেয়ে প্রসব হলে পাড়া-প্রতিবেশীরা নবজাতকের নাম দেয় দুঃখিনী। লক্ষ্মীরাণী তখন থেকে দুঃখিনীর মা হিসেবে পরিচিত। ... এসব অনেক বছর আগের কথা, দুঃখিনী বড় হয়েছে, বিয়ে হয়ে গেছে এক ছেলের সাথে যে একজন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী। তারা থাকে অন্য গ্রামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম স্বামীর কথা আবছা আবছা মনে পড়ে। কিন্তু পরের জন, যার সাথে ঘর-সংসার করেছে দীর্ঘ বছর, আজও তার স্মৃতি জ্বলজ্বলে। বলে, 'মানুষটা খুব ভালো ছিল'। তার কথা উঠলে এখনও দুঃখিনীর মা জোড়হাত ঠেকায় কপালে, বিড়বিড় করে কিছু বলে, তারপর আনমনা হয়ে যায়। গৃহস্থ বাড়ির শতেক কাজের ফাঁকেও ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে পঞ্চাশ বছর বয়সের দুঃখিনী মা।

নিরক্ষর অসচেতন দুঃখিনীর মা'র এখনও নানান কুসংস্কার, নানান শুচিবাই। কিন্তু কাজেকর্মে বয়সের মতোই পাকা-পরিচ্ছন্ন। অন্ধকার থাকতেই ঘর ছেড়ে উঠোনে নামে, উঠোনের চারদিকে গোবর-জল ছিটায়, তারপর কাঠ-কয়লায় দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে, নেমে পড়ে সংসারের কাজে। বাসন মাজা, জল তোলা, ঘরদোর পরিষ্কার, জ্বালানি সংগ্রহ, বাটনা বাটা, রান্নাবান্না করা, সবগুলো কাজ সে যন্ত্রের মতো করে যায় একের পর এক, দিনভর। তাঁর মুখে হাসি নেই, আনন্দে চোখ বদলায় না, সে যেন গৃহস্থ বাড়ির তাবৎ কাজ সমাধা করবার জন্যেই লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধহীন কোনো অলৌকিক জগৎ থেকে ঘটনাক্রমে এই অখ্যাত কানসোনা গ্রামে এসে পড়েছে!

হাসি-কান্না-আনন্দ-আবেগহীন এই নারী, শুধু পেটে-ভাতে বেঁচে থাকবার জন্যে দিনমান নিশ্চুপ কাজ করে যায়। শত কাজের ব্যস্ততায় দুঃখিনীর মা তার দীর্ঘজীবনের শত দুঃখগুলো বুঝি আড়াল করতে চায় কর্মপটু হাতের তালু দিয়ে, উল্লাপাড়ার এই কানসোনা গ্রামে।

AMARBOI.COM

দুই ভাই, কেউ কেনে কেউ বেচে

কানসোনা গ্রামের মতিয়ার রহমান ও আকবর আলী দুই ভাই। মতিয়ার রহমান বড়, তিনি একজন ক্ষুদ্র দোকানদার, কৃষকগঞ্জ বাজারে মরিচ হলুদ লবণ ডাল আদা রসুনের ছোট দোকান। পাঁচ-ছ শ টাকা পুঁজি, দৈনিক আয় ২০ থেকে ২৫ টাকা, পরিবারে সদস্যসংখ্যা সাত। দুবেলা দুমুঠো পেট পুরে খেতে হলে চাল লাগে সাড়ে তিন সের, কিন্তু দোকান থেকে আয়ের টাকায় সে চালটুকু কেনা সম্ভব হয় না পুরো। আধপেটা খেতে হয়। কাঁধে অনেক ঋণের বোঝা। গত ৪৩ বছর ধরে তিনি দোকানদারি করছেন। প্রথম যখন দোকান চালু করেন তখন আদার সের ছিল এক আনা, এখন তা আট টাকা। শুকনো মরিচের সের ছিল চার আনা, এখন তা পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু মতিয়ার রহমানের আয়-উন্নতি বাড়েনি, বরং মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া দুহাজার টাকার দেনা শুধতে পারছেন না, সেখানে সুদের পরিমাণ বাড়ছেই।

এঁর ছোট ভাই আকবর আলী। তিনি গ্রামে থাকেন না, কাজ করেন খুলনায়, একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন পণ্য জাহাজে ভরে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যান; যান অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান। আয়-উপার্জন মন্দ নয়, টাকা নিয়ে মাঝে-মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন নিজ গ্রামে, এই কানসোনায়, কেনেন আবাদি জমি। সেসব জমি বর্গায় আবাদ হয়।

কার জমি কেনেন আকবর আলী? কেনেন পাড়া-প্রতিবেশীর, ভাইয়ের, আত্মীয়-স্বজনের। এইতো কমাস আগে নিজের বড়ভাই মতিয়ার রহমানের জমি কিনলেন তিনি পাঁচ হাজার টাকায়। ঐ টাকায় মতিয়ার রহমান ঋণ শোধ করলেন, কিছু দোকানে লাগালেন, দোকানের আয়ে সংসার চলে না বলে কিছু টাকা সংসারেও খরচ করলেন। ওদিকে ছোট ভাই আকবর আলী হলেন নতুন জমির মালিক। মতিয়ার রহমানের বুকে শেষ-সামান্য জমিটুকু বিক্রির ব্যথা বড় বাজে, আর আকবর আলীর আনন্দ এখানেই যে, 'জমিটুকু অন্য কারও হাতে তো গেল না, নিজেদের মধ্যেই থাকল।'

এভাবেই ৬৮ হাজার গ্রামের এক গ্রাম কানসোনায় কেউ ঋণ আর সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণে জমি হারাচ্ছে, কেউ আবার আয়ের কাঁচা পয়সায় নতুন জমি কিনছে। এ ধরনের ঘটনাগুলো গ্রামের যুবকদের মধ্যে প্রভাব ফেলছে। গ্রাম ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবার আকর্ষণ তাদের মধ্যে, আকাঙ্ক্ষা আকবর আলীর মতো টাকা উপার্জনের। তারা দেখছে, ৪৩ বছর ক্ষুদ্র দোকানদারি করেও বৃদ্ধ মতিয়ার রহমান কি-রকম নিঃস্ব হয়ে গেল, ভূমিহীন হয়ে গেল, আর তারই ছোট ভাই 'বিদেশে' চাকরি করে হাজার হাজার টাকা গুনে কিনে নিল তারই শেষ জমিটুকু!

গ্রামসমাজে এভাবেই বিবর্তন আসছে। তার ধারায় কেউ সম্পদ গড়ছে, কেউ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। দর্শক যুবকেরা তো আকবর আলীর পথে আকর্ষিত হবে। জীবনযুদ্ধে তারা পরাজিত হতে চায় না মতিয়ার রহমানের মতোন।

AMARBOI.COM

আফরোজা ও শাহানার কথা

কানসোনা গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে সলপ হাইস্কুল, সেখানে ব্যবস্থা আছে সহ-শিক্ষার। যারা মোটামুটি সচ্ছল-সচেতন পরিবারের, তাদের মেয়েরা কানসোনা প্রাইমারি পাস করে সেই হাইস্কুল পর্যন্ত যায়। এদের সংখ্যা খুব কম, তার ওপর আবার নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত উঠতে না উঠতেই অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। অবশ্য, এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন কানসোনা গ্রামের আফরোজা। সলপ হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করে সে উল্লাপাড়া কলেজে ভর্তি হয়েছে, সামনে এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। আফরোজা তার গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে সাড়ে তিন মাইল দূরের উল্লাপাড়া কলেজে যাতায়াত করে। ওর বাবা জনাব আবদুল ওহাব একজন তহসিলদার, পরিবারের অন্য ভাইবোনেরাও মোটামুটি শিক্ষিত। পরিবারের লোকজন এমনকি আফরোজাও মনে করে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, আর অল্প বয়সে বিয়ে হওয়াটাও ঠিক নয়। এইসব বোধ থেকে মেয়েটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে, কোনো একটা চাকরি করবে পড়াশোনা শেষ করে, দাঁড়াবে নিজের পায়ে। ... কানসোনা গ্রামের আফরোজাই একমাত্র, যে দীর্ঘপথ হেঁটে উল্লাপাড়া কলেজে যায়-আসে। প্রচণ্ড সাহসী মেয়েটি একা এতদূর চলে-ফেরে, গ্রামের পথে, কিন্তু ভয়-ডর নেই। সাহসই তার নিরাপত্তা।

কানসোনার আরেকজন, শাহানা। সে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে চাকরি করে, ওদিকে জামতৈল কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষাও দেবে এবার। শাহানাও পাস করে আরও বড় চাকরি করতে চায়, স্বাবলম্বী হতে চায়।

... কানসোনা গ্রামের সামগ্রিক চিত্র অবশ্য এরকম নয়। অভাবী পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রাইমারি স্কুল পর্যন্তই যেতে পারছে না, কেউ গেলেও দুয়েক ক্লাস পর পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে আছে কুসংস্কার, পর্দায় রাখ-ঢাক, আছে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা। দুদিন বাদে যেখানে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে, সেখানে কী হবে আর 'অযথা' কলেজে পড়ে? এরকম ধারণা পোষণ করেন অনেকেই। আছে এখানেও নাবালিকা বিবাহ। দেশের আর দশটা গ্রামে যেরকম ভাগ্যবরণ করে মেয়েরা, কানসোনাতেও দেখা যায় তা-ই।

এরই মাঝে, আফরোজা-শাহানা এরা চলে এসেছে সামনে এগিয়ে। তাদের ইচ্ছে, করবে চাকরি, আকাঙ্ক্ষা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর।

অবশ্য কথা আছে। গোটা সামাজিক ব্যবস্থাটাই যেখানে প্রতিকূলে, সেখানে কেবল আফরোজা আর শাহানা নারীশিক্ষা কিংবা নারী অধিকার সচেতনতার কাজ করবে কী করে? তাই, এখন ওরা শুধু আলোর ইশারাই দিয়ে যায়। আফরোজা প্রমাণ করে রোজ রোজ সাড়ে তিন মাইল পথ হেঁটেও উল্লাপাড়া গিয়ে কলেজে পড়া যায়। শাহানা বলে, গ্রামের অবস্থান থেকে চাকরি করেও বড় পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

দুঃখে পোড়া মানুষটি

কানসোনার প্রৌঢ় ফুলজার হোসেনের জীবন ফুলের পাপড়ি বিছানো নয়, বরং নানান দুঃখে পোড়-খাওয়া মানুষটির কাছে জীবন মানে যন্ত্রণা, এক অভিশাপ। সে তার আবাদি জমি হারিয়েছে, কাঁধে রয়েছে বহু টাকার ঋণের বোঝা, ছেলেমেয়েদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তবু সে এখনও রয়ে গেছে বাবার সংসারে। বিয়ের সময় ছেলেপক্ষের সাথে শর্ত হয়েছিল, বিয়ের পর জামাইকে চাকরি জুটিয়ে দিতে হবে; কিন্তু ফুলজার হোসেন এখনও তা পারেনি। চাকরির জন্যে শহরে অনেক অফিসে গিয়েছে সে, ধরনা দিয়েছে বহুবার। কিন্তু কোথাও সোজা বলে দিয়েছে কাজ নেই, কোথাও চেয়েছে 'সেলামি'। কিন্তু ঘুষ দেওয়ার মতো টাকা-পয়সা কোথায় পাবে আজকের কানসোনার দরিদ্র লোকটি?

একসময় সিরাজগঞ্জ মুন্সেফ কোর্টে ফুলজার হোসেন ছোট চাকরি করত। গ্রামে তখন ছিল তার বিঘা দশেক জমি। শহরে চাকরি করত বলে নিজে সে জমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবাদ করতে পারত না, বর্গা দিলে ফসলের ভাগে মার খেত। এ অবস্থায় জমি কয়েক বছর পতিত থাকে, তারপর বিক্রি করে দেয়। সে সময় ফুলজার হোসেন বিয়ে করেছে, সংসারে এসেছে আটটি সন্তান, অথচ চাকরির সামান্য আয়ে বিরাট সংসার চলে না। তাই জমিগুলো একে একে বিক্রি করল আর খেল। এখন তার আছে শুধু কশতক জমি যার ওপর বাড়িটি মাত্র। চাকরিতে অবসর নেওয়ার পর মাত্র এক শ তিরানব্বই টাকা পেনশন পাচ্ছে; কিন্তু ১০ সদস্যের বিরাট পরিবারটি কী করে চলে? দুজন ছেলে চাকরি করছে, তারা মাসে কিছু টাকা দেয়; কিন্তু তাতেও কুলানো যায় না। তাই করতে হচ্ছে ঋণ। অনেক টাকার।

ফুলজার হোসেনের আফসোস, সে সময় আবাদি জমিগুলো বিক্রি করেছে, তাও খুব সামান্য দামে। '৬২-৬৩ সালের দিকে জমি বেচেছে সে মাত্র ১০ টাকা শতক হিসেবে, এখন সেই জমির দাম বিঘাপ্রতি ১৫/১৬ হাজার টাকা।

গ্রামে বিভিন্নজনের কাছে আছে তার ঋণ, হাজার তিনেক টাকার। ঋণ নিয়েছে ব্যাংক থেকেও, বাড়িভিটে (জমি) বন্ধক রেখে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। ফুলজার হোসেন জানে না কী করে এ ঋণ সে শোধ করবে। সামনে শুধু অনিশ্চয়তার অন্ধকার।

তারই মাঝে আছে সামান্য আলোর ইশারা। তার হোমিওপ্যাথ পড়া আছে, কিন্তু কিছু পয়সাকড়ি হাতে থাকলে গ্রামের পাশে কৃষকগঞ্জ বাজারে খুলতে পারত 'ডিসপেনসারি'। ডাক্তারি করে সংসারটা হয়তো কোনোরকমে টেনেটুনে চলত। কিন্তু, যার সহায়সম্বল নেই, সংসারে পান্তা-নুন দুই-ই একত্রে ফুরোয়, কাঁধে যার কয়েক হাজার টাকার ঋণের বোঝা, তাকে নতুন করে কে দেবে ঋণ?

বিরাট সংসার আর তার ভবিষ্যতের চিন্তায় সর্বদা বিমর্ষ ফুলজার হোসেন এখন যন্ত্রণাকাতর। হঠাৎ আলোর ইশারা দেখে পর মুহূর্তেই তা ম্লান হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

মোস্তফা-রাবেয়া সংবাদ

একজন সাংবাদিক, পরিবেশন করেন যিনি বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ফসলের সম্ভাবনা কিংবা আবাদহানি, রোগ-মারী-মৃত্যু, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি-অবক্ষয়, শোষণ-বঞ্চনা আর মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা ইত্যাদির খবরাখবর—তিনিও কি কখনো প্রতিবেদনের বিষয় হয়ে যান?

যেমন গোলাম মোস্তফা, 'সংবাদে'র জেলা বার্তা পরিবেশক। কানসোনা গ্রামে তার বাড়ি। গ্রামটির যেখানে শুরু, সেখানে বড় রাস্তার ধারে বাঁশের নতুন বেড়ার ঘর, টিনের চালা, সামনে ছোট আঙিনা, খড়ের গাদা, আম-সুপারিসহ নানান গাছগাছালি, গোয়ালঘর; সেটাই মোস্তফাদের আবাস। সাড়ে সাত শ টাকা মাসিক বেতনে কিছুদিন আগে বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছে গ্রাম-সাংবাদিক যুবকটি।

একজন সচেতন সাংবাদিক হিসেবে গোলাম মোস্তফা যৌতুকপ্রথা ঘৃণা করে, সে কারণে যৌতুক তো নেয়ইনি; বরং নিজের সঞ্চয়ের টাকায় কনেকে শাড়ি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গহনায় সাজিয়ে ঘরে তুলেছে। গোলাম মোস্তফা বলেন, 'আমি নিজেই যৌতুকপ্রথার বিপক্ষে লিখি, আমি যৌতুক নেব কী করে? কাজের সাথে জীবনের মিল না হলে থাকে আর কী?' ... ন্যায়ের বেশে সমাজের বিভিন্ন অন্যায় অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিরাট যে যুদ্ধ, মোস্তফা এভাবেই তার এক সৈনিক।

মোস্তফাদের বিরাট পরিবার, অনেক ভাইবোন। বাবার জমিজমা ভাগাভাগি হলে একেকজন বিঘা দেড়েকের বেশি পাবে না। অপরদিকে স্বল্প আয়। এসব সামনে রেখেও মোস্তফা জীবনের নতুন পথে নেমেছে। চাটাইয়ের বেড়ার গায়ে পুরাতন পত্রিকা সাঁটানো, টেবিলে নবদম্পতির ফটোস্ট্যান্ড, তাক তাক করা নতুন সুটকেস, জুতা, স্যান্ডেল; আলনায় ঝুলিয়ে সাজানো সাধারণ ছাপা শাড়ি; খাট, বিছানা, বালিশ, আর টেবিলের ওপর কম দামি একটি ঘড়ি। বিদ্যুৎহীন কানসোনা গ্রামের অন্ধকার এবং বিরাট বাড়ির হৈ-হুল্লোড় তোয়াক্কা না করে সে ঘড়িটির কাঁটা ঘুরতেই থাকে।

কানসোনা গ্রামের যুবক সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা নতুন সংসার পেতেছে। সমস্যার বিশাল দেশ-দুনিয়ায় এ কোনো খবর নয় হয়তো। কানসোনায় যখন অধিকাংশ মানুষ ক্রমশ ভূমিহীন-সম্পদহীন হয়ে যায়, খাদ্য উৎপাদন কমে, চারদিকে সমাজকে গ্রাস করে অবক্ষয়-ভাঙন; গ্রামে যখন বাড়ে বেকারত্ব, হতাশা, ক্ষোভ; তখন একজন গোলাম মোস্তফা আর উল্লাপাড়ার মেয়ে রাবেয়া দুজনে যৌতুকবিহীন বিয়ে করে কারও জন্যে কোনো খবর সৃষ্টি করতে পারে?

কানসোনায় অনেক পরিবার, অনেক দম্পতি। অনেক অনেক তাদের সমস্যা। ডালে-ভাতে বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিদিনের সংগ্রামের পাশাপাশি বেকারত্বের কারণে কেউ বয়স পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারছে না, কেউ যৌতুকের দাবি না মেটানোর কারণে বিবাহিতা মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে পারছে না, কেউ তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে, কেউ স্বামী হারিয়েছে কিংবা কোনো যুবক বিদেশে চাকরির নাম করে গিয়ে দীর্ঘদিন স্ত্রী-সংস্রবহীন, নিরুদ্দেশ। এসব দুঃখ-যন্ত্রণার জটিলতায় মোস্তফাদের টেবিলঘড়ির কাঁটা যখন ঘোরে, নতুন জীবনের দুই যুবক-যুবতী কি প্রতিবেদনের কোনো বিষয় হয়ে ওঠে তখন?

ক্ষুদ্র কৃষকের ভূমিকায়

কানসোনা গ্রামে মুক্তনাটক দলের যে শাখাটি রয়েছে, যুবক আলাউদ্দিন তার একজন সদস্য। নাটকে ক্ষুদ্র কৃষক কিংবা বর্গাচাষী সাজে সে, তার সংলাপে ক্ষণিকের জন্যে হলেও চেতনায় ঝলকে ওঠে প্রায়-অন্ধকার উঠোনের দর্শকেরা। নাটকে কাহিনীর প্রয়োজনে আলাউদ্দিনের মতো ক্ষুদ্র চাষীরা যখন মহাজন ভূস্বামীদের শোষণ রুখতে এক পর্যায়ে একতাবদ্ধ হয়ে যায়, তখন মঞ্চে কায়েম হয় যেন জনতাতন্ত্র। যদিও, সাজানো কাহিনীর মতো সংগ্রাম-আন্দোলনের মূল ব্যাপারটা সরল-সোজা নয়, তবু মঞ্চে কিছু সময়ের জন্যে হলেও ধ্বনিত হয়ে ওঠে কিষান-মজুরশ্রেণীর একতাবদ্ধ হবার শ্লোগান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্চের বাইরে আঠারো বছর বয়সের আলাউদ্দিন—পিতা আছিরউদ্দিন সরকার, সলপ ডাকঘরে সে তিন শ বারো টাকা বেতনের ক্ষুদ্র কর্মচারী—সলপ ইউনিয়নের পনেরোটি গ্রামে চিঠিপত্র বিলি করে। তার আবাদি জমি মাত্র দুবিঘা, কিন্তু তাতে ফসল খুব একটা ভালো ফলে না; কেননা আছিরউদ্দিন জমির পেছনে তেমন সময়-শ্রম দিতে পারে না ডাকঘরে চাকরির কারণে। আলাউদ্দিন কখনো থাকে গ্রামে, কখনো উল্লাপাড়ায়, ঘোরে নাটকদলের সাথে। নাটকের মঞ্চে যে যুবক আলাউদ্দিন ক্ষুদ্র কৃষক কিংবা বর্গাচাষী, বাস্তবক্ষেত্রে তার যৌবনকে জমি-জিরাতে ধরে রাখা যায় না। নাটকই তার দিন-রাত্রি। এতদিন তা-ই ছিল।

প্রৌঢ় আছিরউদ্দিন ডাকঘরে ছুটির দিনে কিংবা প্রাত্যহিক কাজের সামান্য অবসরে ঐ দুবিঘা জমি চষে। নিজের হাল বলদ নেই তার, আছে একটিমাত্র গাভী, গ্রামের আরেকজনের একটা গরু ধার করে এনে দুটি মিলিয়ে লাঙলে জুড়ে দেয়। কিন্তু গরু ধার করে কোনোরকমে জমি চষলেও উন্নত বীজ, সুষম রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ কোনোটাই ব্যবহার করতে পারে না লোকটা, ফলে ফসল ঘরে উঠে খুব কম।

কদিন হলো আলাউদ্দিন ঠিক করেছে কানসোনায় থেকে অভিনয়ও করবে, বাবার জমিতে আবাদ-সুবাদের কাজও করবে।

সংসারে অনটনের কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা করতে পারেনি আলাউদ্দিন। কানসোনা প্রাইমারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পাস করে পড়াশোনা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নাটক দলের সাথে জড়িত হয়ে সে বেশ কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছে। অন্তত সে পারে শোষক-প্রবঞ্চকদের চিহ্নিত করতে, পারে শ্রেণীভাগ শনাক্ত করতে, গ্রামের ক্ষুদ্র আয়তনে। ... আলাউদ্দিন বোঝে, নাটক দিয়েও গণচেতনা আনা যায়, মূল্যবান যুবশক্তি পারে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা বদলাতে।

কল্যাণহীন বর্তমানের ওরা দুজন

কানসোনার ময়না ভৌমিক পরীক্ষার খাতায় 'বড় হইলে তুমি কী হইবে' কিংবা 'তোমার জীবনের লক্ষ্য কী' এ প্রশ্নের জবাবে রচনা লিখেছিল, 'আমি শিক্ষিকা হবো'। হয় তাই। কানসোনা গ্রামে বিয়ে হয়ে আসবার পর সে যোগ দেয় সলপের একটা প্রাইমারি স্কুলে। বেতন খুব সামান্য, তবু কাজ করছিল শিক্ষকতার মতো মহান পেশায়। কিন্তু নানান সমস্যা-সংকটে বেশ কমাস থেকে স্কুলটির তালা আর খুলছে না। সেই যে দুর্গাপূজার ছুটি দেওয়া হলো তারপর আর ঘণ্টা বাজে না ক্লাস শুরু অথবা ছুটির। ময়না ভৌমিক এখন বেকার, ঘরকন্নার কাজে আবার নিয়োজিত। রান্নাবান্না, ঘর সাজানো, পূজা অর্চনা, পাড়া বেড়ানো এভাবেই গণ্ডিবদ্ধ হয়েছে জীবন। তার মতে, সামাজিক অবস্থা যেখানে প্রতিকূল সেখানে ইচ্ছে থাকলেই সব কাজ করা যায় না। শিক্ষক, স্বল্প বেতন হলেও যে দায়িত্ব নিয়েছিল আশপাশের গ্রামের ছেলেমেয়েদের অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা দেবার, পরিস্থিতির মুখে সে এখন আবার গৃহবধূ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার স্বামী কল্যাণ ভৌমিক সলপ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন, উল্লাপাড়া থেকে রাজশাহীর দৈনিক বার্তায় খবর পাঠান। জমি আছে ৮ বিঘার মতো, অবশ্য পিতার মালিকানায়। সেটা বর্গা দিয়েছেন। নিজের হালবলদে আবাদ করবেন সে সময় আর পরিস্থিতি নেই। আগে এই কানসোনা গ্রামেই তাদের জমি ছিল প্রায় ৪০ বিঘা, বাবা-দাদারা তা বিক্রি করেছেন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আর বিয়ের খরচের কারণে। এভাবে পরিবারে সদস্যসংখ্যা একদিকে বেড়েছে, অন্যদিকে জমির পরিমাণ কমেছে। আর চারদিকের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয়। এইতো ক'মাস আগে বাড়িতে ডাকাতি হলো, লুট হলো অনেক মালামাল। কিছু জমি নিয়ে মামলাও চলছে। সব মিলিয়ে নিরাপত্তার অভাব, মনে নেই শান্তি।

জমি বর্গায় আবাদ করতে দিয়ে যে ফসল পাওয়া যায়, তাতে মাসতিনেক চলে। বর্গা যারা নেয়, তারা অতি ক্ষুদ্র চাষী—একেই উন্নত আবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অপরদিকে অভাব-অনটনে তারা ভালো বীজ জোটাতে পারে না, সঠিক পরিমাপে রাসায়নিক সার দিতে পারে না, ফসলে পোকা লাগলে বুঝতেই পারে না কী রোগ, কী পোকার আক্রমণ হয়েছে কিংবা সেজন্যে কী ওষুধ দিতে হবে! ফলে ধান গম পাট আদা হলুদ, সব ফসলই উৎপাদিত হয় খুব কম। কিন্তু উপায় কী?

ময়না ভৌমিকের স্কুল বন্ধ, সেবা ব্যাহত। কল্যাণ ভৌমিকের জমি উর্বরা, কিন্তু অযত্ন আবাদ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় না ভালো ফসল। ... এবং এ অবস্থাতেই কানসোনা গ্রামের একটি নিম্নমধ্যম পরিবার কাটাচ্ছে হতাশার দিনরাত্রি, মাড়াচ্ছে কল্যাণহীন বর্তমান।

AMARBOI.COM

বর্গাচাষী আজাহার

কানসোনা গ্রামের সোহরাব আর আজাহার, দুই ভাই। বাবার সূত্রে পাওয়া মাত্র ১২ শতক জমি, তার ওপর বাড়ি।

আজাহার একজন ক্ষুদ্র বর্গাচাষী, মাঝে-মধ্যে মজুরিও খাটে, ১৫ থেকে ২০ টাকা পায় দৈনিক। ছেলেমেয়ে ৬টি, এদের মধ্যে দু ছেলে মাসঠিকে মজুরিতে চাষাবাদের কাজ করে দুজন গৃহস্থের বাড়িতে, মাসে এক শ টাকা করে ওদের 'বেতন', পুরোটাই নেয় আজাহার। নিজের বর্গা চাষের ফসল, মজুরির টাকা, ছেলে দুটির উপার্জন, সব মিলিয়েও ১০ সদস্যের পরিবারটি চলে না। ধারদেনা করতে হয় চড়া সুদে, নিতে হয় ধান কিংবা নগদ টাকা। কৃষিঋণের নামে এ এলাকাতেও ব্যাংক টাকা দিয়েছে, কিন্তু সে ঋণের টাকা আজাহারদের মতো ক্ষুদ্র বর্গাচাষী কেউই পায়নি।

গ্রামের মাহবুবার রহমানের মাত্র ২৫ শতক জমি বর্গা করে আজাহার, সেখানে বোনে দুটি ফসল—ধান আর গম। 'কল্যাণ বাবু'র কাছ থেকে বর্গা নেওয়া মাত্র ৬ শতক জমিতে আবাদ করে হলুদ। নিজের হাল-বলদ নেই, হাল কিনে জমি চষার সামর্থ্য নেই, সে কারণে নিজের হাতে কোদালে কুপিয়ে কুপিয়ে আজাহার জমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি করে। জমি সমতল করে হাতের তালুতে, অর্থাভাবে উন্নত বীজ কিংবা রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারে না, পোকা লাগলে চড়া দামে কীটনাশক ওষুধ কিনে ছিটাতে পারে না। ... আর আজাহার, বাজার বুঝে উৎপাদিত পণ্য ঘরে মজুত রাখতে পারে না বলেই ফসলের ন্যায্যমূল্যও পায় না।

যেমন কল্যাণ বাবুর ৬ শতক জমিতে হলুদ আবাদ করে—তা দুভাগ হয়। কল্যাণ বাবুর ভাগের হলুদ তৎক্ষণাৎ বিক্রি করতে হয় না, ঘরে পড়ে থাকে চড়া বাজার সময়ের জন্যে। কিন্তু আজাহারের সে সাধ্য নেই, ফসল ভাগাভাগি হবার সাথে সাথেই তা বিক্রি করে দিতে হয়, কিনে নেয় গ্রামের ফড়িয়া মহাজন। আজাহার এক সের কাঁচা হলুদ এক টাকা থেকে দেড় টাকা দরে বেচে, সেই হলুদ শহর এলাকায় গিয়ে চড়া সময়ে বিক্রি হয় চড়া দামে। মাটির সাথে প্রকৃত যার সম্পর্ক, সেই মূল উৎপাদনকারী আজাহার ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু কানসোনা নয়, দেশের সবখানেই একই চিত্র।

আজাহার বলে, তার যদি নিজের হাল-বলদ থাকত তাহলে আরও বেশি করে জমি বর্গা নিত, তখন আর কোদাল চালাতে হতো না, ছেলেদের অপরের ক্ষেতে পাঠাতে হতো না। কিন্তু আজাহার জানে না, বেশি করে বর্গা পাবার মতো জমি কোথায়? দেশের সব গ্রামের মতো কানসোনাতেও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে বর্গাচাষীর সংখ্যা। কিন্তু জমি তো সীমিত!

আমেনা খাতুনের অভিযোগ-আক্ষেপ কে শোনে?

কানসোনা গ্রামে আমেনা খাতুনের বাড়ি। আমেনা নামে তাকে কেউ অবশ্য চেনে না, বৃদ্ধা পরিচিত 'লাডুর মা' নামে। তার স্বামী, ছেলে, এখন আর কেউ বেঁচে নেই। একটি মাত্র মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে তার পাশের গ্রামে। মেয়ে-জামাই ওরা কেউ খোঁজখবর নেয় না।

স্বামীহারা আমেনা খাতুন গ্রামে এর-ওর বাড়িতে কাজ করে নিজের পেট চালাতো, দু-চার পয়সা করে জমাত খেয়ে না-খেয়ে। ঘরদোর লেপা, ধান ভানা, কাঁথা সেলাই ছাড়াও খেতখামারে টুকিটাকি কাজ করত সে। অতিরিক্ত শ্রমের পয়সাটা মাটির খুঁটিতে ভরে জমাত। সে খুঁটি লুকিয়ে রাখত মাটির নিচে। এভাবে তার জমেছিল পাঁচ শ টাকা। আমেনা খাতুনের কাছে এটি একটি বিরাট ব্যাপার।

একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে ধান সিদ্ধ ও শুকানোর কাজ করতে গিয়ে পিছলে পড়ে আমেনা খাতুনের মাজা ভাঙল, সেই থেকে অসুস্থ, বেকার-কর্মহীন। লাঠি ভর দিয়ে চলে, এর-ওর বাড়িতে চেয়ে-মেগে খায়। কিন্তু কানসোনার কে বা কারা আছে আমেনাকে দুবেলা প্রয়োজনীয় খাবার দেবে বিনা স্বার্থে? অনুগ্রহ দুয়েক বেলা করা যায়, কিন্তু প্রতিদিন তো নয়। তাই উপোস তার নিত্যসঙ্গী।

ছিল কষ্টে জমানো পাঁচ শ টাকা। কেউ কেউ পরামর্শ দিল ঐ টাকাটা সুদে খাটাতে। এক শ টাকা কর্জ দিলে দশ টাকা সুদ। আমেনা ভাবল ব্যাপারটা মন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। আসল টাকা টাকাই থাকবে, সুদের টাকাটা খাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে ছিল ষড়যন্ত্র, বৃদ্ধা তা বোঝেনি। পুরো পাঁচ শ টাকাই ধার দিয়ে বসল একটি লোককে। চুক্তি হলো শতকরা দশ টাকা হারে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাবে সে। কিন্তু সে লোকটা আর আসল টাকা কিংবা সুদ কোনোটাই পরিশোধ করছে না। আমেনা খাতুন শুধু ঘুরেই মরছে দিনকে দিন।

কানসোনায় পথ হাঁটলে এ বাড়ির উঠোনে, ও বাড়ির আঙিনায় বৃদ্ধা আমেনা খাতুনের দেখা মেলে। সওয়াল করতে বেরিয়েছে সে। কেউ যদি একমুঠো ভাত দেয় কিংবা কিছু চাল!

আর আছে তার অভিযোগ, আক্ষেপ, ক্ষোভ, আফসোস। ধারের টাকা কিংবা সুদ না পাওয়ার, তাকে ঠকানোর ষড়যন্ত্রের। কিন্তু ব্যস্ত কানসোনার মানুষ নিজেদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে। সেখানে এক বৃদ্ধার কথা কে শোনে!

আনোয়ার হোসেন

আনোয়ার হোসেন কানসোনা গ্রামের একজন ক্ষুদ্র দোকানদার। গ্রামের ভাঙা প্রাইমারি স্কুলের পাশে গাছের ছায়ায় তাঁর ডাল লবণ মসলা তেল কেরোসিন ইত্যাদির ছোট্ট দোকান।

পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া আনোয়ারের দোকান গড়ার পুঁজির জন্যে নানারকম চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত বিক্রি করল ৩০ শতক জমি। জমি বিক্রির ১৬ হাজার টাকা থেকে কিছু ঐ দোকানে নিয়োগ করল, কিছু টাকায় সামান্য কিছু জমি বন্ধক নিল। কানসোনা গ্রামে এই ব্যাপারটি আরও কয়েকটা পরিবারে দেখা যায়। ওরা নিজের মালিকানার আবাদি জমি বিক্রি করে, আবার সে টাকায় অপর এক অভাবী কৃষকের জমি নির্দিষ্ট সময়সীমায় বন্ধক নেয়। আনোয়ার হোসেন এ ব্যাপারে বলে, 'টাকা টাকাই থাকে, লাভের মধ্যে ফসলটা খাওয়া যায়'। যেমন আনোয়ার হোসেন নিজের আবাদি ৩০ শতক জমি বিক্রি করে জমি বন্ধক নিয়েছে এবারে গোলজার, কামাল প্রামাণিক আর লুৎফর মিয়ার। এখন তার নিজস্ব মালিকানার আবাদি জমি মাত্র বায়ান্ন শতক। আর আছে সামান্য জমিতে বসতবাড়িটুকু।

আনোয়ারের সংসারে খাবারের মুখ ৬টি। ছোট্ট দোকানটি থেকে দৈনিক আয় গড়ে ২৫ টাকা। এতে চলে না। বন্ধকী জমির ফসল (বোরো ধান) যা পাওয়া যায় তাতে বছরের তিন মাস ঘরের খাওয়াটা চলে। তারপর আবার টানাটানি, ধার-কর্জ।

আনোয়ারের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়জনের বিয়ে দিয়েছে ১২ বছর বয়সে। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার পর মেয়েটিকে বউ সাজতে হলো, প্রতিবাদহীন, যেতে হলো শ্বশুরবাড়ি। জামাইয়ের বয়স ২২ বছর। কানসোনার অভিজ্ঞ কাজী সাহেব অবশ্য বিয়ে রেজিস্ট্রির কাগজপত্রে আনোয়ার হোসেনের মেয়ের বয়স ষোলো বছর দেখিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ারের মেয়ে রত্না, তার বিয়েতে জামাইকে যৌতুক দিতে হলো ৫ হাজার টাকা। অবশ্য ছেলেপক্ষ প্রথমে ১৫ হাজার টাকা দাবি করেছিল, কিন্তু পাকা দোকানদার আনোয়ার হোসেন দরাদরিতেও পাকা, দাবি নামিয়ে এনেছে ১৫ থেকে ৫ হাজার টাকায়।

সামাজিক প্রথা যৌতুক নেওয়া এবং দেওয়া যে ঠিক নয়, এ কথাটা কানসোনা গ্রামে এখনও পৌঁছায়নি। আনোয়ার হোসেনের মতো প্রায় প্রতিটি পরিবারে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া চলছে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। যেমন মোস্তফা-রাবেয়ার বিয়ে।

আরেকটি নিয়ম দেখা যায় এ গ্রামে : যেমন ছেলেপক্ষ সরাসরি টাকা-পয়সা বা অন্যান্য সামগ্রী দাবি না করে বলে, বিয়ের পর ছেলেকে (জামাইকে) চাকরি জুটিয়ে দিতে হবে। আর এ চাকরির জন্যে অফিসে যে সেলামি দিতে হয় তারই মোটা অঙ্ক বহন করতে হয় মেয়ের গরিব পিতাকে। কেউ চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে, কেউ ব্যর্থ হয়, বিবাহিতা মেয়েটি বাপের বাড়িতে পড়ে থাকে বছরের পর বছর।

একজন শিক্ষক : নিজের অঙ্কই যার মেলে না

AMARBOI.COM

জামতৈল স্কুলের শিক্ষক জনাব আবদুল হাকিম খানের বাড়ি কানসোনা গ্রামে। ষাট বছর বয়সের এই শিক্ষক তাঁর নিজের ভাষায় 'আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পাস'। এই বয়সেও সাইকেল ছুটিয়ে জামতৈল যাতায়াত করেন।

দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করে এসে আজ হাকিম খানের নিজের অঙ্কই মেলে না। বছরখানেক আগে মাত্র চার শ টাকা বেতন পেতেন। এখন সরকারিকরণের পর এগারো শ মতো পাচ্ছেন, তা-ও নিয়মিত নয়। আর সাত ছেলেমেয়ের সংসারে ঐ অল্প টাকায় কী-ই বা হয়? দুবেলা খাবার মতো চালের টাকাটাও আসে না বেতন থেকে। জমি আছে বিঘা পাঁচেক, বর্গা দিতেন, ফসল আসত কিছু, কিন্তু অভাবের কারণে সে জমি থেকে দুবিঘা ইতোমধ্যেই বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ দিয়ে যার যৌবন শুরু, তিনি পিতার সূত্রে পাওয়া জমি অপরকে বর্গায় আবাদ করতে দিয়ে জামতৈল স্কুলে যোগ দিলেন।

মানুষকে শিক্ষিত-সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন আবদুল হাকিম খান। সেজন্যেই বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতার মতো মহান পেশা। কিন্তু তাঁর ক্ষোভ, এতেও ঢুকেছে দুর্নীতি। স্কুলের 'গ্র্যান্ড' তোলার জন্যে ওপরে টাকা দিতে হয়। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও কিসব ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে, তারও কিছু কিছু বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কানে এসে পৌঁছায়। হাকিম খান লজ্জা পান, দুর্বল হয়ে পড়েন, কখনো বা ঘৃণা হয়। কিন্তু উপায় কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও অনেক কিছু মেনে নিতে হয় তাঁকে। যাঁর স্বপ্ন ছিল সচেতন সমাজ গড়বেন, গড়বেন সুস্থ সুন্দর মানুষ, কিন্তু সমাজ-সময়-পরিস্থিতি অসুস্থ করে তুলেছে তাঁকে। উচ্চশিক্ষিত এক ছেলের সাথে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন নগদ চার হাজার টাকা : ধারকর্জ করে, একখণ্ড জমি বন্ধক রেখে। কিন্তু বিয়ের আসরে কথা ছিল নগদ টাকায় যৌতুক ছাড়াও জামাইকে চাকরি জুটিয়ে দিতে হবে। চাকরির আক্রার বাজারে তা সম্ভব হয় নি। সে কারণে বিবাহিতা মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে পিতার গৃহে।

আবদুল হাকিম খান যখন বিয়ে করেন, তখন নিজে যৌতুক তো নেননি বরং কনেটিকে ঘরে এনেছিলেন পণ দিয়ে। আজ দিন পাল্টেছে, যৌতুক কিংবা বিভিন্ন ওয়াদা বিড়ম্বিত করে তুলেছে হাকিম খানদের, তাঁর মেয়েদের। 'শিক্ষিত' জামাই তাঁর যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন বৃদ্ধ শিক্ষকটি সাইকেল চালিয়ে জামতৈল স্কুলের দিকে যেতে থাকেন, একপাল ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্যে ... তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যে।

ক্ষেতমজুরি করেও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে

AMARBOI.COM

শহীদুল ইসলাম। কানসোনা গ্রামের সরল-সুন্দর মুখের কেবলি তরতর বেড়ে ওঠা যুবকটি এবারে উল্লাপাড়া কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। পড়াশোনার খরচ জোটাতে সে ক্ষেতমজুরি করে। কলেজ ছুটির দিনে নেমে পড়ে অন্যের জমিতে। দৈনিক আয় পনেরো থেকে বিশ টাকা। এই টাকায় পড়াশোনার খরচ ছাড়াও নিজের জামা-কাপড় ও অন্যান্য খুচরো খরচপত্র করে থাকে সে। শহীদুল যখন সলপ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, তখন থেকেই ক্ষেতমজুরি করে আসছে। এ কাজে তার কোনো লোকলজ্জা বা সংকোচ নেই। সে বলে, 'কে কী মনে করে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি কাজ করি, খাটি, নিজের উপার্জনে চলি।'

কথাবার্তা কম বলে ছেলেটি। বিনয়ী, নম্র স্বভাবের। যখন ও ফর্সা জামা-কাপড় পরে সামনে আসে, কে বলবে এ-ই অল্প বয়সে মাঠে-ক্ষেতে ঘাম ঝরায়? ক্ষেতমজুরির আয়ের টাকায় ওর ভাইবোনরাও স্কুলে পড়ছে। বাবা একজন তাঁতশ্রমিক, কাপড় বুনে সামান্য যা আয় হয়, তাতে বিরাট সংসার টেনেটুনে চলে। জমি আছে মাত্র দুবিঘা, এটুকুও আবাদ করে শহীদুল নিজে। তবে, ফসল খুব একটা ঘরে ওঠে না। উন্নত বীজ, সার—এসব কৃষি উপকরণ জোটানো মুশকিল। তাছাড়াও শরীরে শ্রমের শক্তি আর কলেজে সাধারণ পড়াশোনার মেধা থাকলেও উন্নত পদ্ধতির আবাদ কৌশল এখনও তার জানা হয় নি।

জীবনে শেষ পর্যন্ত কী করবে এখন পর্যন্ত সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যুবক শহীদুল। একবার ভাবে কানসোনাতেই থাকবে, নিজেকে জড়িত রাখবে চাষাবাদের সাথে। কিন্তু সংসারে সদস্যসংখ্যা অনেক, অথচ জমি কম। মাত্র দুবিঘা জমির ফসলে চলবে কী করে! তাহলে কিনতে হয় আরও জমি! টাকা কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই, পরক্ষণেই ভাবে, গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাবার কথা, একটা চাকরি জুটিয়ে নেওয়ার কথা। ব্যবসাপাতি করবার পরামর্শ কেউ কেউ দেয়! কিন্তু পুঁজি কই?

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কানসোনার যুবক শহীদুল। ক্ষেতমজুরি করে পড়াশোনায় এতটা এগুলেও সে জানে না তার আগামী।

বেকারত্বের হতাশায় গ্রামের ক'জন যুবক

কানসোনা গ্রামে সবচেয়ে প্রকট হলো যুবকদের বেকারত্ব। দেশের অন্যান্য গ্রামের মতো এখানেও দ্রুত বাড়ছে জনসংখ্যা, বিভক্ত হচ্ছে পরিবার। বছর পাঁচেক আগে ছিল পঞ্চাশটির মতো পরিবার, এখন হয়েছে এক শ তেরোটি। লোকসংখ্যাও বেড়েছে, এদের মধ্যে শিশু-কিশোর আর যুবক সংখ্যাই বেশি। ঐ গ্রামটিতে প্রায় এক শ যুবক রয়েছে যাদের মধ্যে অর্ধেকই সম্পূর্ণ বেকার। এরা শিক্ষিত : কেউ এইট-নাইন পর্যন্ত পড়েছে, কেউ এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাস করেছে। এরা অধিকাংশই লোকলজ্জা-সংকোচে না পারছে জমিতে কাজ করতে, না পারছে চাকরি জোটাতে। গ্রামের ত্রিশ জন শিক্ষিত কিংবা স্বল্পশিক্ষিত যুবকের ওপর এক পর্যবেক্ষণমূলক জরিপ চালিয়ে দেখা গেল : এদের মধ্যে একজন মাত্র (এসএসসি পাস) ক্ষেতমজুরি করে এবং পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছে (শহীদুল ইসলাম)। অপর একজন যুবক (সলিমুল্লাহ) কাজ করছে তাঁতশ্রমিক হিসেবে, তাও নিয়মিত নয়। বাকি ২৮ জন যুবকের মধ্যে সাত জন চাকরির সন্ধানে গ্রাম ছেড়েছে, গিয়েছে ঢাকায় কিংবা অন্য কোনো শহর এলাকায়। অন্যরা গ্রামে আছে এবং হতাশায় দিন কাটাচ্ছে।

২০ বছর বয়সের আবদুল্লাহ আল মামুদ, পিতা ক্ষুদ্র কৃষক। এইচএসসি পাস করে সে এখন বেকার। শহরে চাকরির চেষ্টা করেছে, সেলামি দিতে পারেনি বলে সফল হয় নি।

২২ বছর বয়সের সোলায়মান হোসেন; এইচএসসি পাস করার পর আর পড়বার সুযোগ হয় নি। বেকার ভূমিহীন দর্জির সন্তান মনিরুল ইসলাম, ১৯ বছর বয়সে এইচএসসি পাস করে এখন ঠিক করেছে চাকরি করবে শহরে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করে ২০ বছর বয়সের জাহাঙ্গীর আলম বেকারত্বের সাথে যুঝছে। এমনি আছে অনেকে, কানসোনার মাটি ও ধুলোয় অনিশ্চিত পড়ে আছে যাদের যৌবন। কিন্তু গ্রাম ছেড়েছে ইসাহাক খান, আলী আসগর, রফিকুল আলম, জহুরুল হক খান, এ-রকম অনেকে। ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী কিংবা ঈশ্বরদীতে বিভিন্ন চাকরি করে তারা। তাদের দেখাদেখি আবদুল্লাহ আল মামুদ চায় সে রেলের 'বুকিং ক্লার্ক' হবে, থাকবে কোনো শহরে। মনিরুল ইসলাম 'অডিট অফিসে' কোনো একটি চাকরি করতে চায়। তারও টান শহরে। ... অথচ কানসোনা গ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকাংশ যুবকই নিজেদের গ্রামসমাজ সম্পর্কে সচেতন, শ্রেণীবিভক্ত, দ্বন্দ্ব এইসব জটিল ব্যাপার হালকামতো হলেও বোঝে, সহজে চিহ্নিত করতে পারে শোষক আর শোষণের কৌশল। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভাঙতে যে আন্দোলন-সংগ্রাম প্রয়োজন, তা অনুভব করে তারা। কিন্তু পথ চেনে না, কৌশল জানে না।

এবং পথনির্দেশকহীন এইসব যুবকের মোটা এক অংশ যতই বলুক যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর কথা, মুখে যতই উচ্চারণ করুক সংগ্রামের সংলাপ, বাস্তবক্ষেত্রে তারা শহরে গিয়ে হতে চায় রেলের বুকিং ক্লার্ক, কিংবা অডিট অফিসের কর্মচারী।

এই জটিল এবং দ্বৈত মানসিকতার কারণ বোঝা দুষ্কর। হতে পারে এর কারণ দারিদ্র্য, প্রকৃত সমাজ-সচেতনতার অভাব কিংবা অন্য কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানসোনা, ৪ বছর পর

গত কয়েক বছরে দেশের গ্রামগুলোতে বেশকিছুটা পরিবর্তন এসেছে। একদিকে বেড়েছে জনসংখ্যা, অপরদিকে কমেছে খাদ্য উৎপাদন। পরিবারগুলো আরও ভাগ হয়েছে, খণ্ডিত হয়েছে জমি। শিকড় পর্যায়ে ঢুকেছে দুর্নীতি। কোথাও বিদ্যুৎ গেছে; গেছে টেলিভিশন, ভিসিআর, পত্রপত্রিকা; কোথাও আবার একেবারেই অন্ধকার, তথ্যশূন্যতা। কেউ ভূমিহীন হচ্ছে, কেউ আবার সেই জমি কিনে সম্পদ বাড়িয়েছে। মানুষ কোথাও হয়েছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, কোথাও বা রাজনীতির নামে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। কিন্তু এটা সাধারণ চিত্র যে, মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় নি বরং মোট জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উল্লাপাড়ার কানসোনা গ্রাম সফর এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর মার্চ মাসের ১১ তারিখ থেকে সংবাদে 'কানসোনার মুখ' সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯টি পর্বে ঐ গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কিছু নর-নারী-শিশুর চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হতাশা-বঞ্চনার কথা লেখা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের মধ্য-মার্চে, অর্থাৎ সিরিজ প্রতিবেদনটি প্রকাশের ৪ বছর পর আবার সেই কানসোনা গ্রামে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হলো : গ্রামটির আজকের অবস্থা কী!

ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতনতা নেই

গ্রামের নাম কানসোনা। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সলপ ইউনিয়নের একটি গ্রাম। উল্লাপাড়া স্টেশন থেকে পূর্ব-দক্ষিণে মরা-প্রায় করতোয়া নদী, স্থানীয় ভাষায় বলে ফুলঝোর, সেই নদী পেরিয়ে মেঠোপথে কিছুটা এগুলেই কানসোনা গ্রামটি। উল্লাপাড়া বাজার থেকে কোনাকুনি পথে গেলে গ্রামটির দূরত্ব হবে মাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারেক। কানসোনার একদিকে সোনতলা; অপরদিকে চরপাড়া, সলপ ইউনিয়ন কেন্দ্র। এখানে আছে কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কৃষকগঞ্জ বাজার। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে সলপ রেলওয়ে স্টেশন। সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী লাইনের ছোট এই স্টেশনটিতে নেমে পায়ে হেঁটে কানসোনায় আসা যায়।

একদা কানসোনার নাম ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'। দিনবদলের পালায় লোকের আটপৌরে ব্যবহারে কখন যে সেই 'কর্ণসুবর্ণ' কানসোনা হয়েছে তা গ্রামের বুড়োরাও বলতে পারেন না। এককালের জমিদারশাসিত সলপ ইউনিয়নের এই গ্রামটি ছিল হিন্দুপ্রধান, '৪৭-এর দেশবিভাগের পর জমিজমা বেচে দিয়ে তারা প্রায় চলে গিয়েছে ইন্ডিয়ায়। এখন গ্রামে একটিমাত্র হিন্দু পরিবার, কোনোরকমে টিকে আছে।

সলপ ইউনিয়নে ৩১টি গ্রাম, এরই একটি হলো কানসোনা। '৮৭ সালের মার্চে 'কানসোনার মুখ' সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় গ্রামে পরিবারসংখ্যা ছিল ১শ ১৩টি, এখন বেড়ে হয়েছে ১শ ১৯টি। গ্রামে এখন মোট লোকসংখ্যা ৭শ ১৩ জন—এর মধ্যে পুরুষ ৩শ ৫৮ জন, মহিলা ৩শ ৫৫ জন।

'৮৭ থেকে '৯১—এই ৪ বছরে কানসোনা গ্রামের ১৫ জন বিভিন্ন রোগ, বার্ধক্যজনিত কারণ, দুর্ঘটনা ও অপুষ্টিজনিত রোগে মারা গেছে, তবে জন্ম নিয়েছে ১শ ৮টি শিশু।

এদের ৯০ ভাগই অপুষ্টি আক্রান্ত অবস্থায় বেড়ে উঠেছে। ৪ বছরে ৪টি পরিবারে যমজ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কিংবা জন্মশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম এখানে এখনও খুব ঢিলেঢালা।

৪ বছরে গ্রামের ২০ জন যুবক বিয়ে করেছে এবং সেই সুবাদে অন্য গ্রাম থেকে এসেছে ২০টি 'বউ'। আবার কানসোনার ২৭টি মেয়ের বিয়ে হবার কারণে গ্রামের বাইরে চলে গেছে তারা। কানসোনায় লক্ষ করা যায় যে, ছেলেরা নিজ গ্রামে নয়, বাইরে কোথাও বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহী। গ্রামে বিয়ে করলে নাকি 'জামাই আদর' ঠিকমতো পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত মেয়ে ঘনঘন বাপের বাড়ি যায়।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গত ৪ বছরে এ গ্রামের ছেলেদের বিয়ে হয়েছে ২২ থেকে ২৮ বছর বয়সে, আর মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ১৫ থেকে ২২ বছর বয়সে। ২৭টি মেয়ের মধ্যে একজনের মাত্র বিয়ে হয় ১২ বছর বয়সে, যাকে বলা যায় বাল্যবিবাহ।

কানসোনা গ্রামে বাল্যবিবাহের প্রবণতা আগের মতো নেই। শিক্ষিতের হার কিছুটা বেড়েছে। ৪/৫ বছর আগে গ্রামে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২৫ ভাগ, এখন তা বেড়ে হয়েছে শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ। মানুষের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা আগের চেয়ে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে লক্ষ করা যায়।

যেমন গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ আসায় দুটি টিভি চলছে, টিভিতে বাংলা সংবাদ দেখবার জন্যে নিয়মিত জড়ো হচ্ছেন জনাবিশেক যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ। বেড়েছে বিবিসি-তে খবর-শ্রোতার সংখ্যা। আগে গ্রামে একটি দৈনিক পত্রিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসত, এখন আসে চারটি। লোকজন দেশ-দুনিয়ায় কী ঘটছে তা জানার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী।

পাশাপাশি অন্য চিত্র। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে অনেকেই সচেতন নয়। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কানসোনা গ্রামে ভোট দিয়েছেন মাত্র ২শ ১৩ জন, অথচ মোট ভোটারের সংখ্যা ৪শ ৫৭। অর্থাৎ ২শ ৪৪ জনই ভোট দেননি।

ঐ ২শ ৪৪ জনের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই মহিলা। ভোট না দেওয়ার কারণ হিসেবে তারা বলেছেন অসুস্থতার কথা, সাংসারিক কাজের চাপের কথা। আলসেমির জন্যেও অনেকে ভোট দিতে যাননি, আবার কেউ এমন উচ্চারণ করেছেন, 'ভোট দিয়ে কী হবে?'

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কানসোনা গ্রামের ভোটারদের জন্যে ভোটকেন্দ্রটি ছিল বেশ খানিকটা দূরে। অনেক মহিলা ভোটারের পক্ষে সেখানে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় নি। যেতে পারেননি জবুথবু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও।

তথ্যশূন্যতা আগের চেয়ে কমেছে

AMARBOI.COM

'৮৭ সালে কানসোনায় বিদ্যুৎ ছিল না, '৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যুৎ এসেছে। বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে ৯টি পরিবার, চলছে ৪টি সেচযন্ত্র। কানসোনার প্রবেশমুখ সন্ধ্যার পর থেকে আলো ঝলোমলো।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিস আছে উল্লাপাড়ায়। সেখানকার কর্মকর্তারা নতুন লাইন টেনেছেন সোনতলা হয়ে কৃষকগঞ্জ বাজার পর্যন্ত, এই লাইনের আওতায় পড়েছে কানসোনা গ্রাম। তবে সবাই নয়, ১১৯টি পরিবারের মধ্যে ১৪টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ গেছে। এদের মধ্যে বিদ্যুৎ ভোগ করতে পারছে ৯টি পরিবার, আর ৫টি পরিবার প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্থাৎ তার, সুইচ, বোর্ড, মিটার বোর্ড, বালবসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম কিনতে না পারায় এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ পায়নি।

বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে কোনো সেলামি বা ঘুষ দিতে হয় নি, তবে লাইন টানার জন্যে গ্রামবাসীকে কিছুটা প্রভাব খাটাতে হয়েছে। কথা ছিল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সোনতলা থেকে গজারিয়া বিল হয়ে শেখপাড়ার পাশ দিয়ে কৃষকগঞ্জ বাজার পর্যন্ত সোজাসুজি বিদ্যুৎ লাইন টানবে। এতে করে কানসোনাবাসীর বিদ্যুৎ পাবার কথা নয়। তখন গ্রামের দুই-তিন জন যুবক উল্লাপাড়ায় গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তয়-তদবির শুরু করেন। তাদের যুক্তি ছিল যে, গজারিয়া বিলটি গভীর এবং বছরের অধিকাংশ সময় এখানকার জমিগুলো পানির নিচে থাকে। যান্ত্রিক সেচের সুবিধা নেই। সেক্ষেত্রে আধ মাইল ঘুরিয়ে হলেও কানসোনা গ্রামের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন টানা হোক। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি শেষ পর্যন্ত তাই করে।

কানসোনার প্রবেশমুখের পথটি এবড়োথেবড়ো, খানা-খন্দক, জংলা। কিন্তু বিদ্যুৎ যাবার পর চোখে পড়বার মতো পরিবর্তন হয়েছে। আগে সন্ধ্যা লাগবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে সাথে অন্ধকারে ডুবে যেত কানসোনা, সেখানে এখন ঝলোমলো আলো। প্রবেশমুখে দুটি বাড়ির সামনে টেলিভিশন দেখবার জন্যে ভিড় জমে ওঠে সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই। বিশেষ করে ধারাবাহিক নাটক, সাপ্তাহিক নাটক, ছায়াছবির গান আর বাংলা ছায়াছবির দিন হলে গ্রামের ঐ দুটি বাড়িতে রীতিমতো সিনেমা হল হয়ে ওঠে। কেউ সঙ্গে আনে পিঁড়ি, মোড়া, কেউ বগলে করে নিয়ে আসে চট কিংবা মাদুর। গ্রামের বিভিন্ন অংশ থেকে ছুটে আসে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত। এমনটি আগে কল্পনাও করা যেত না।

টি.ভি'র নাটোর উপপ্রচার কেন্দ্র 'গোলমাল' করে প্রায়শই। এমনিতে ছবি ভালো দেখা যায় না, আসে ঝিরিঝিরি। অথচ ভালো দেখা যায় ভারতীয় দূরদর্শনের অনুষ্ঠান। হিন্দি ছায়াছবি আর ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান 'চিত্রাহার' ইদানীং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সে কারণে। বিটিভির প্রচার বিঘ্নিত হলেই দর্শকরা হৈ হল্লা শুরু করে দেয়। তাদের দাবি 'ইন্ডিয়া ধরেন', 'ইন্ডিয়া ধরেন'। টিভি মালিকের উপায় থাকে না।

কানসোনা গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে, ১১৯টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৯টি পরিবার ভোগ করছে সে বিদ্যুৎ। কিন্তু এরা কারা?

না, যারা মজুর শ্রেণীর, যারা দুঃস্থ-গরিব, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত, তাদের খড়ের ঘরে জ্বলে সেই আগেকার মতো কেরোসিনের কুপি। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ নিতে পারেনি তারা, পারবেও না। বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছে জনাকয়েক সাধ্যবান ব্যক্তি। এরা প্রভাবশালী, কিছু জমিজমার মালিক, ভালো চাকরি করেন, ব্যাংকে টাকা আছে। এদেরই ঘরদোর এখন আলোকিত।

বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে দুটি টিভি চলছে, এতে দর্শক হয় দৈনিক গড়ে দেড় শ। দেশ-দুনিয়ায় কী ঘটছে জানবার জন্যে বাংলা সংবাদও শোনেন অনেকে। যুদ্ধ, নির্বাচন—এ-সময় দর্শকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল।

'৮৭ সালে কানসোনায় আসত একটি (এক কপি) দৈনিক পত্রিকা, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক বার্তা। পত্রিকাটি আসত ডাকযোগে, দুদিন পর। পাঠকসংখ্যা ছিল দুজন। গ্রামের মানুষ ছিল তথ্যশূন্যতায়। ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা এমনকি সিরাজগঞ্জ শহরের কোনো ঘটনা এখানে এসে পৌঁছুত বিকৃতভাবে, বিস্তারিত হতো গুজবের শিকড়। এখন গ্রামে সংবাদ, ইত্তেফাক, জনতা, দেশ—এই ৪ কপি পত্রিকা আসে। দৈনিক গড়ে ৫০ জন পাঠক নিয়মিতভাবে এই ৪টি পত্রিকা হাতবদল করে পড়েন।

কানসোনা গ্রামে আছে ৩০টি ট্রানজিস্টর সেট। শ্রোতাদের প্রিয় হলো বাণিজ্যিক কার্যক্রম আর ছায়াছবির গান। রেডিও থেকে প্রচারিত কৃষি কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অনুষ্ঠান লোকে তেমন শোনেন না। শোনেন না রেডিও বাংলাদেশের খবর। তবে হ্যাঁ, বিবিসির সান্ধ্যকালীন খবরের শ্রোতা অনেক। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান শুরু হবার আগেই কানসোনা স্কুল মাঠের পাশে, আনোয়ার হোসেনের মুদিখানার মাচানে কিংবা রাস্তার ধারে উঁচু জায়গায় খবর শোনার জন্যে ভিড় জমে ওঠে। একত্রে বসে যায় ৩০/৪০ জন শ্রোতা। ভোয়ার খবরের শ্রোতা অবশ্য বেশ কম, কেননা কানসোনায় রাত ১০টা মানে নিশুতি রাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কানসোনার মানুষজনও বিদেশি বেতার থেকে প্রচারিত খবরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এরা শোনেন এবং পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসও করেন। যে কারণেই হোক, নিজ দেশ থেকে প্রচারিত নিজ দেশের খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। অন্যদিকে, দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরাখবর লোকজনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, খবর নিয়ে আলাপ-আলোচনাও জমিয়ে তোলেন।

কানসোনায় অধিকাংশ মহিলা কিন্তু আছেন তথ্যশূন্যতায়। টিভির ধারাবাহিকতায় অয়োময়ের প্রতিটি চরিত্র যদিও এদের চেনা, চেনেন প্রতিটি পাত্রপাত্রী, তাদের ঢঙ-ভড়ং-চলন-বলন। কিন্তু স্বৈরাচারের পতন হয়েছে কবে, কিভাবে, কে বা কারা এখন দেশ চালাচ্ছেন—জানে না অনেকে। শোনেনি নারীর অধিকার, এ সম্পর্কিত সরকারি আইনকানুন। এসব ব্যাপারে আলাপ করতে গেলে অধিকাংশই হা হয়ে যায়। না, তারা কখনো শোনেনি এসব কথাবার্তা। বলেনি কেউ।

শিক্ষিতের হার বেড়েছে, দুর্নীতি শিকড় পর্যায়ে

AMARBOI.COM

কানসোনা গ্রামে বেকার যুবকের সংখ্যা ৪ বছর আগের চেয়ে কমেছে। '৮৭ সালের মার্চে গ্রামটিতে ছিল প্রায় ১শ যুবক, তাদের মধ্যে অর্ধেকই ছিল সম্পূর্ণ বেকার। এরা ক্লাস এইট থেকে এইচএসসি পাস। ঐ সময় ৩০ জন শিক্ষিত কিংবা স্বল্পশিক্ষিত যুবকের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছিল তারা হতাশায় ভুগছে। চাকরির সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেউ কেউ।

ঐ ৩০ জন যুবকের মধ্যে একজন শহীদুল ইসলাম, সে সময় ক্ষেতমজুরি করে কলেজে পড়ত। এখন ছেলেটি ঘটনাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। অপর এক যুবক সলিমুল্লাহ তখন অনিয়মিতভাবে কাজ করত তাঁতশ্রমিক হিসেবে, এখন সে ঢাকায় এক গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে।

না, কানসোনা কিংবা আশপাশের কোনো এলাকায় কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয় নি। বেকার যুবকদের অধিকাংশই চলে গেছে ঢাকায় এবং কাজ জুটিয়ে নিয়েছে গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিতে। কাজ নিয়েছে সলিমুল্লাহ, লিয়াকত আলী খান, আবদুল্লাহ খান, সোলায়মান হোসেন, মকবুল হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, সানোয়ার হোসেন, রতন খান, রবিউল আলম। এদের মধ্যে কজন আবার গার্মেন্টিসের মহিলাকর্মীকে বিয়ে করেছে এবং দুজনের আয়ে সংসার চালাচ্ছে মোটামুটি ভালোই। জাকির হোসেন কাজ নিয়েছে রেলে, রাজশাহীতে। দুজন যুবক যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনীতে। মনিরুল ইসলাম কাজ করছে একটি ওষুধ কোম্পানিতে।

পাশাপাশি অন্যরকম চিত্রও রয়েছে। যেমন আবদুল হালিম, আলম ও নূর আলম ঢাকার বিভিন্ন গার্মেন্টিসে কাজ করত, ছেড়ে দিয়ে এখন আবার ফিরে এসেছে গ্রামে এবং বেকার। জাহাঙ্গীর খান ছিল গার্মেন্টিসের নিরাপত্তা কর্মী, এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেকার। গোলাম কিবরিয়া এনজিও 'সিডো'তে কাজ করত, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবার পর আবার সে বেকার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কানসোনার বেশকিছু যুবক গারমেন্টসে কাজ জুটিয়ে নিয়ে ঢাকায় বাস করছে, অপরদিকে গার্মেন্টিস ছেড়ে এসে অনেকে হয়েছে বেকার। পেশার নিশ্চয়তা এদের নেই। গ্রামে নতুন বেকারও সৃষ্টি হয়েছে কিছু। যেমন আবুল বাশার, জাহাঙ্গীর, হুমায়ুন, আলাউদ্দিন খান, বাহাদুর আলী খান— এই পাঁচ জন '৮৭ সালে বেকার তালিকায় ছিল না, এখন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যুবকে এবং বেকার যুবকে পরিণত হয়েছে তারা।

যারা গার্মেন্টিস, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তাদের কেউ কেউ ঈদে-পরবে গ্রামে আসে, দুচারদিন কাটিয়ে চলে যায়, এছাড়া নাড়িপোঁতা গ্রামের সাথে তাদের সম্পর্ক হয়ে পড়েছে ক্ষীণ : জীবনধারণের মতো রূঢ়-কঠিন বাস্তবতার কারণে।

কানসোনা গ্রামের ওপর ফলোআপ করতে গিয়ে দেখা যায় : '৮৭ সালে একজন বেকার যুবক আবদুল্লাহ আল মাসুদ চেয়েছিল যে রেলের বুকিং ক্লার্ক হবে। চাকরির জন্যে সে সময় চেষ্টা-তদবিরও করছিল। সে পরবর্তীকালে কাজ নিয়েছে গার্মেন্টিসে, অতি স্বল্প বেতনে। মনিরুল ইসলাম চেয়েছিল অডিট অফিসে কোনো একটা ভালো চাকরি করবে, সে কাজ পেয়েছে একটা ওষুধ কোম্পানিতে। স্বপ্ন পূরণ না হোক, আয়-উপার্জন যতই স্বল্প হোক, বেকারত্ব ঘুচেছে এটাই ওদের কাছে অনেক বড়।

AMARBOI.COM

সেই প্রাইমারি স্কুল

কানসোনা গ্রামে শিক্ষিতের হার বেড়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। '৮৭-র আগে গ্রামটিতে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২৫ ভাগ, এখন ('৯১) হয়েছে শতকরা ৩২ ভাগ।

কানসোনায় এসে দেখা গেল, গত ৪ বছরে চোখে পড়বার মতো উন্নয়নের মধ্যে বিদ্যুতের আগমন ছাড়াও কানসোনা প্রাইমারি স্কুলটি আধাপাকা হয়েছে। ইট-সিমেন্টের দেয়াল, ওপরে নতুন টিনের চাল। আগে ছিল কালো পুরাতন টিনের চাল ও চাটাইয়ের বেড়া ঘেরা ভাঙা ঘর। এই ভাঙা ঘরেরই একটি অংশের ছবি '৮৭-তে ছাপা হয়েছিল 'কানসোনার মুখ' সিরিজ প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল : প্রাইমারি স্কুলের ভাঙা বেড়ার ফাঁক গলিয়ে ক্লাসে ঢুকছে দুজন কিশোর। কিন্তু '৯১-এর মার্চে গ্রামে এসে দেখা গেল, সেই ভাঙা স্কুলটি এখন বেশ লম্বা, ওপরে নতুন টিন, পাকা দেয়াল। নির্বাচনের পোস্টার ও দেয়াল লিখনে ইতোমধ্যেই নোংরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলভবনটির নির্মাণকাজে ব্যয় হয়েছে নিম্নমানের নির্মাণ-সামগ্রী। তবু গ্রামের লোকজন খুশি যে, অনেক দাবির পর স্কুলটি শেষ পর্যন্ত আধাপাকা তো হলো! স্কুলের উন্নয়ন কাজ কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনের পরেও ৭/৮ বছর ধরে ঝুলে ছিল।

স্কুলটি কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পাকা হয় নি। সাড়ে ৫ হাজার টাকা সেলামি দিতে হয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিস, ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট ও উপজেলা প্রশাসনের একশ্রেণীর কর্মকর্তাকে। গ্রামবাসী জানালেন, 'ঘুষ দিতে আমরা বাধ্য হই, কেননা তারা সোজাসুজি বলে দিয়েছিল টাকা না দিলে হাজার চেষ্টা করলেও কাজ হবে না।'

ঘুষের টাকা পেলেন কোথায় অতগুলো? গ্রামবাসী প্রশ্নের জবাবে জানান, স্কুলের পুরাতন যে টিনের ঘরটি ছিল তা ১৬ হাজার টাকায় গ্রামের এক অবস্থাপন্নের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেই ১৬ হাজার থেকেই সাড়ে ৫ হাজার টাকা ঘুষ গুণে দেওয়া হয়েছে, বাকি টাকা হাতে রয়েছে।

আধাপাকা হবার পর স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। '৮৭ সালে ছাত্রছাত্রী ছিল প্রায় আড়াইশ, এখন ৪শর ওপরে। উপস্থিতির হার ভালো।

স্কুলটির উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি এটাও সত্য যে, স্বৈরশাসক আমলের দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণের ঢেউ দেশের আর সব গ্রামের মতো লেগেছে এই কানসোনাতেও। নইলে, একটি প্রাইমারি স্কুল আধাপাকা করবার জন্যে গ্রামবাসীকে সাড়ে ৫ হাজার টাকা ঘুষ গুণে দিতে হয়?

AMARBOI.COM

মজুরির হার বেড়েছে, বেড়েছে সুদের হারও

কানসোনা। '৮৭ থেকে '৯১। দেখা যাক এই ৪ বছরে গ্রামটিতে কী কী উন্নয়ন কাজ হয়েছে!

প্রাইমারি স্কুলটি হয়েছে আধাপাকা, ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩ লাখ ৩৭ হাজার টাকা, এই উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে '৯০ সালে।

গ্রামে ৪ বছর সময়ে মাত্র ১শ ফুট দীর্ঘ একটি নতুন কাঁচা রাস্তা হয়েছে কানসোনা-কালীবাড়ি থেকে আসাদুজ্জামান খানের বাড়ি পর্যন্ত। এছাড়া গ্রামের অন্য কোনো সড়ক-সংস্কার হয় নি, হয় নি সেচের জন্যে খাল খনন, হয় নি গাছ লাগানো। গ্রামবাসীর অনেকদিনের দাবি উল্লাপাড়া থেকে কানসোনা পর্যন্ত মানুষ যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারে সেজন্যে গ্রামের প্রধান সড়কটি (করতোয়া নদীর পাড় পর্যন্ত) সংস্কার করা হোক। হয় নি। সড়কটি এমনই এবড়োথেবড়ো, ভাঙাচোরা যে রিকশা চলাচল করা মুশকিল, সাইকেল চালাতে গেলেও বার বার নামতে হয়। প্রধান সড়কের উপর একটি ব্রিজও কিছুদিন আগে ধসে পড়েছে, সংস্কারের নাম নেই।

উন্নয়নের কথা বলতে গেলে বিদ্যুতের কথা আসে। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে এবং ১১৯টি পরিবারের মধ্যে ৯টি পরিবার তা ভোগ করছে। বিদ্যুতে চলছে অগভীর নলকূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৮৭ সালে গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাবার মতো টিউবওয়েল ছিল ১১টি, এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৭টি। এর মধ্যে দুটি মাত্র সরকারি পর্যায়ে প্রাপ্ত। পানিতে 'আয়রন' বেশি এবং তা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর, সে কারণে পানি শোধনের মিনি প্ল্যান্ট বসেছে একটি, পোস্টমাস্টারের বাড়ির সামনে। আশপাশের খুব জোর ৫টি পরিবার এখান থেকে আয়রনমুক্ত খাবার পানি নিতে পারে, কিন্তু আর সব পরিবার? গ্রামে পাকা পায়খানা ৪টি, পাটের পায়খানা ৩টি। ফলে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারটি এখানে এখনও অর্থহীন হয়ে আছে। গ্রামের অনেকে যেমন এখনও কুয়ো-ইন্দারার পানি খায়, বাসাবাড়ির কাজে পুকুর ও খালের পানি ব্যবহার করে, তেমনি আবার মলমূত্র ত্যাগ করে মাঠে, ঝোপে-ঝাড়ে। জনশিক্ষা কার্যক্রম এই গ্রামটিতে পরিচালিত হয় নি বা হচ্ছে না।

'৮৭ সালে কানসোনায় অগভীর নলকূপ ছিল আবদুস সাত্তার, শুকুর মাহমুদ, আসাদুজ্জামান ও খবিরউদ্দিনের। সে ৪টি এখন আর তাদের মালিকানায় নেই, 'পোষাতে না পেরে' বিক্রি করে দিয়েছে। ব্যাংকের ঋণ তারা পরিশোধ করে নি, মাথার উপর ঝুলছে সার্টিফিকেট মামলা। কৃষি উৎপাদন মার খাওয়া, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, পানির টাকা বকেয়া, এসব কারণে অগভীর নলকূপ বিক্রি করে দিয়েছে তারা ৪ বছরের বিভিন্ন সময়ে।

পুরাতন মালিকদের ৪টি সেচযন্ত্র বিক্রি হয়ে গেলেও দেখা যাচ্ছে, নতুন ৩টি অগভীর নলকূপ বসেছে গ্রামে। এগুলোর মালিক আলমগীর হোসেন, আবদুল ওয়াহাব, আবুল শিকদার। এর মধ্যে ২টি অগভীর নলকূপ বিদ্যুতে চলছে। জ্বালানি তেলচালিত সেচযন্ত্রটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

গ্রামের কৃষি উৎপাদন সন্তোষজনক নয়। উফশী গম ও বোরোর জমি বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু একরপ্রতি উৎপাদন কমেছে। ৪ বছর আগের তুলনায় গম ও বোরোর একরপ্রতি ফলন কমেছে ৫ থেকে ১০ মণ। তবে উৎপাদন বেড়েছে শাকসব্জির। শাকসব্জি আবাদকারীরা তাদের ফসল সরাসরি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা এলাকায় নিয়ে যায় এবং আয়-উপার্জন করে ভালোই। কানসোনা থেকে সাড়ে ৩ মাইল দূরের উল্লাপাড়ায় শাকসব্জি নিয়ে গেলে মধ্যস্বত্বভোগকারীর পাল্লায় পড়তে হয়, পয়সাও পাওয়া যায় কম। অথচ, সরাসরি বেলকুচিতে নিয়ে গেলে গতর খাটুনি বেশি হয় বটে, কিন্তু অর্থ মেলে দ্বিগুণ।

গ্রামে স্থানীয়ভাবে দেওয়া ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪ বছর আগে ১শ টাকায় ১০ টাকা সুদ নেওয়া হতো, এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৫-২০ টাকা। মাসিক ভিত্তিতে টাকা দেওয়া-নেওয়া হয়ে থাকে। '৮৭ সালে এই কানসোনায় দেখেছি, কেউ ১ হাজার টাকা ঋণ নিলে পরিশোধের সময় তাকে মূল ১ হাজার টাকা ছাড়াও ২ মণ ধান দিতে হতো। এখন মূল টাকা ছাড়াও দিতে হয় ৫-৭ মণ ধান। এই প্রথাকে কেউ অবশ্য সুদ বলে না, বলে 'লাভ'। বোরো, গম ও শাকসব্জির আবাদ মৌসুম শুরুর আগে-আগে অবস্থাপন্নদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ধুম পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামে মজুরির হার বেড়েছে। '৮৭ সালে দৈনিক মজুরি ছিল ১৫/১৬ টাকা, এখন তা হয়েছে ২০/২২ টাকা। আবাদের ভরমৌসুমে মজুরি ২৫-৩০ টাকা পর্যন্ত ওঠে। মজুরির সাথে সাথে বেড়েছে চাল, আটা ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। '৮৭তে চাল ও আটার দাম ছিল যথাক্রমে ৯ টাকা ও সাড়ে ৬ টাকা। এখন তা হয়েছে ১২ টাকা ও ৯ টাকা।

গ্রামে '৮৭ সালে এনজিওর তৎপরতা ছিল না। এখন 'ব্র্যাক' উন্নতজাতের মোরগ-মুরগি বিতরণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, প্রকল্প পরিচালনা করছে দুঃস্থ মাতাদের নিয়ে। '৮৮ সালে 'সিডো' নামের একটি এনজিও তৎপরতা শুরু করে কিন্তু অনেক মানুষ প্রতারিত হয়, টাকা-পয়সা গচ্চা যায় তাদের। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামে সমিতি গঠন করেছে এবং কানসোনার দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে ঢেঁকি ঋণ দিচ্ছে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিয়েছে তারা বিভিন্ন প্রকল্প।

আনোয়ারা বেগমের ছেলেমেয়েরা

'৮৭ সালের ১৩ মার্চ কানসোনার মুখ সিরিজের তৃতীয় পর্বে প্রকাশিত হয় আনোয়ারা বেগমের কাহিনী। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'অবহেলার এক শিকার আনোয়ারা বেগম'। ঐ প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে বলা হয়, বিধবা আনোয়ারা ডাক বিভাগের দীর্ঘসূত্রতার কারণে তার মৃত স্বামীর পারিবারিক পেনশনের টাকা পাচ্ছে না।

প্রতিবেদনটি ছিল এ-রকম : কানসোনা গ্রামের বিধবা আনোয়ারা বেগমের স্বামী আখতার খান ছিলেন ডাক বিভাগের একজন ক্ষুদ্র কর্মচারী, বেতন পেতেন প্রায় ১২শ টাকা। সাড়ে ১৫ বছর ঐ বিভাগে চাকরি করার পর '৮৬ সালের ১০ মার্চ উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগে ভুগে তিনি মারা যান।

আখতার হোসেন খানের নাবালক ৪ সন্তান, এদের নিয়ে বিধবা আনোয়ারা বেগম এখন কোথায় যাবেন, কী করবেন? ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরা জোটানোই মুশকিল, সেখানে তাদের লেখাপড়া করাবেন কী করে? আখতার হোসেন খানের ৫ বিঘা জমি ছিল। পিতার সূত্রে পাওয়া সে জমি বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি বেঁচে থাকতেই। আখতার হোসেন খান মারা যাবার পর এখন জমি আছে মাত্র ১০ শতক, একটি টিনের ঘর, চারটি নাবালক সন্তান আর তাদের ক্ষুধা! বড় ছেলে আবুল বাশারের পরীক্ষা, মেয়ে রুবি পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে, তাদের লেখাপড়া শেষ পর্যন্ত হবে কি?

ডাক বিভাগ থেকে আনোয়ারা বেগমের 'পারিবারিক পেনশন' পাবার কথা। পায়নি আজও। আবেদন করেছে, কিন্তু তয়-তদবির করার লোক আর খরচাপাতি করবার মতো পয়সা নেই।

ঐ প্রতিবেদনের শেষাংশে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কানসোনা গ্রামের বিধবা আনোয়ারা বেগম কী কারণে ডাক বিভাগের এহেন দীর্ঘসূত্রতার শিকার হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কর্তাব্যক্তিরা তা তদন্ত করে দেখবেন কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে সাথে তা ডাক বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং একমাসের মধ্যে পারিবারিক পেনশন ও অন্যান্য দাবির টাকা পরিশোধ করে দেওয়া হয়। অপরদিকে বগুড়া থেকে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান দান হিসেবে আনোয়ারা বেগমকে আড়াই হাজার টাকা দেন। 'সংবাদে' আনোয়ারার কাহিনী পড়ে কুয়েত থেকে ২ হাজার টাকা সাহায্য পাঠান সেখানে বসবাসকারী বাংলাদেশের এক যুবক। 'পোস্টাল কল্যাণ তহবিল' থেকে দেওয়া হতে থাকে মাসিক ২শ টাকা করে। প্রাপ্ত টাকা সংসারের বিবিধ উপকারে আসে, বিশেষ করে তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চলতে থাকে।

'৯১-এর মার্চে কানসোনায় এসে দেখা গেল, আনোয়ারা বেগম এবং তার ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর আনোয়ারা অতি দ্রুত পারিবারিক পেনশনের টাকা পেয়েছেন, পেয়েছেন অর্থ সাহায্য, এজন্যে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আনোয়ারা বেগমের ছেলেমেয়েরা ৪ বছরে স্বাভাবিকভাবেই বেশ বড় হয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় ('৮৭) আনোয়ারার মেয়ে রাণী অষ্টম শ্রেণীতে পড়ত, সে এখন এসএসসি পাস করে উল্লাপাড়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। সাড়ে ৩ মাইল পায়ে হেঁটে নিয়মিত কলেজে যাতায়াত করে। বড় ছেলে আবুল বাশার এসএসসি পাস করতে পারেনি, সে এখন বেকার, কোনো কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছে। তৃতীয় সন্তান রাসেল খান সলপ স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে, সে ক্লাসের সেকেন্ড বয়। ছোট মেয়ে দীপা কানসোনা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছে, সেও পড়াশোনায় ভালো।

AMARBOI.COM

পারিবারিক পেনশন ও পোস্টাল কল্যাণ তহবিল থেকে পাওয়া টাকায় আনোয়ারা বেগম কিছু জমি 'কট' (বন্ধক) নিয়েছে। জমি আবাদ হয় বর্গায়, যে ফসল মেলে তাতে বছরের ৫/৬ মাস কোনোরকমে চলে যায় ৫ সদস্যের পরিবারটির।

আনোয়ারা বেগম তার বড় ছেলেটিকে নিয়ে চিন্তিত নয়। কোনো না কোনো কাজ সে পাবেই। কিন্তু বড় মেয়ে রাণীকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, আর ঘরে রাখা যায় না।

রাণী তো কেবল কলেজে ভর্তি হলো, সে আরও পড়ুক! কিন্তু সে কথা শুনতে রাজি নয় আনোয়ারা বেগম। মেয়ের বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত যেন তার স্বস্তি নেই।

শহীদুল, শফিকুল ও আলাউদ্দিনের কথা

'৮৭-তে কানসোনার মুখ সিরিজ প্রতিবেদনে শহীদুল ইসলাম নামে এক যুবকের কথা লেখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল শহীদুল ক্ষেতমজুরি করেও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবেদনটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন শহীদুল উল্লাপাড়া কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। পরবর্তীকালে সে পরীক্ষা দেয়, প্রথম বিভাগে পাসও করে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে পরীক্ষা দেয় এবং মনোনীত হয়, কিন্তু অর্থাভাবে তার ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। এই পর্যায়ে 'শহীদুলের ইচ্ছে পূরণ হলো না' শিরোনামে 'সংবাদে' আরেকটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এটি দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সে সময় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্পাদক ড. আতিউর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি আমার মাধ্যমে শহীদুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করে ছেলেটিকে কানসোনা গ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে তিনি শহীদুলকে (অক্টোবর '৮৮) ভর্তির ব্যবস্থা করেন। ড. আতিউর রহমানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তার পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাবার মতো অর্থ-সাহায্য দেন। এর আগে সংবাদের প্রতিবেদন পড়ে বগুড়া সদর উপজেলার চেয়ারম্যান হায়দার আলী শহীদুলের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সুবিধার্থে আড়াই হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করেন।

শহীদুল ইসলাম এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে (তৃতীয় বর্ষ) পড়ছে। ক্লাস করে সে নিয়মিত, তার ওপর বাড়তি পয়সা আয়ের জন্যে টিউশনি করে থাকে।

কানসোনা গ্রামের শহীদুল ইসলাম যখন উল্লাপাড়া সলপ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ত তখন থেকেই ক্ষেতমজুরি করত। ক্ষেতমজুরির আয়ের টাকায় নিজে পড়ত, পড়ত ওর ভাইবোনেরা। ওর বাবা একজন তাঁতশ্রমিক, আয় সামান্য। শহীদুল যখন এসএসসি পাস করে উল্লাপাড়া কলেজে ভর্তি হয়, তখনও চলতে থাকে ক্ষেতমজুরি। কলেজ করত দিনের বেলা, গ্রামে ফিরে এসে ক্ষেতে কাজ করত বিকেলে-সন্ধ্যায়, এমনকি রাতেও। কলেজ ছুটি থাকলে কাজ করত তামাম দিন। দৈনিক আয় হতো ১৫ থেকে ২০ টাকা। সে সময় (১৯৮৭) শহীদুল বলত, ক্ষেতমজুরি করতে তার লোকলজ্জা বা সংকোচ নেই। সে বলত, কে কী মনে করল তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি কাজ করি, খাটি, নিজের উপার্জনে চলি। (সংবাদ ২৮-৩-৮৭)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর থেকে এ পর্যন্ত শহীদুলের স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে, চলনে-বলনে হয়েছে স্মার্ট। তার গায়ের বর্ণ ছিল কালো, হালকা-পাতলা, সরল মুখে ঝুলে থাকত বিনয়ের হাসি, এখন শরীরে বেশ মাংস লেগেছে, উজ্জ্বল হয়েছে গায়ের রং, কিন্তু হাসিটি বদলায়নি। হয় নি সে গ্রামবিচ্ছিন্ন। শহরে বসবাস করার পর গ্রাম সম্পর্কিত উন্নাসিকতা পেয়ে বসেনি তাকে। ছুটি হলেও কানসোনায় ছুটে আসে। শহীদুলের বাবা খুব খুশি। আনন্দে তার চোখে অশ্রু গড়ায়। সে সংবাদপত্র পড়তে পারে না, তবে এটুকু জানে যে এতে দেশ-দুনিয়ার খবর ছাপা হয়, লোকে এগুলো কিনে কিনে পড়ে। আর ছেঁড়া-পুরাতন পত্রিকা সে ব্যবহৃত হতে দেখেছে লবণ-মসলার ঠোঙা হিসেবে। কিন্তু এখন সংবাদপত্র তার কাছে বিরাট বিস্ময়ের কিছু এবং বিশ্বাসের। সে বলে, পত্রিকায় শহীদুলের কাহিনী ছাপা না হলে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পেত না, হয় মজুর হয়ে থাকত, কিংবা থাকত আর সব যুবকের মতো বেকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৯১-এর মার্চে কানসোনায় গেলে অশ্রুসিক্ত নয়নে ছুটে আসে শহীদুলের বাবা। হাত জড়িয়ে ধরে জানায় সে কৃতজ্ঞতা। সে জানায়, শহীদুল মাঝে-মধ্যেই বাড়ির জন্যে টাকা পাঠায়, ছোট ভাইবোনদের জন্যে জামা-কাপড়। শহীদুলের আয়ের টাকাতেই তার ৪ ভাইবোন গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করছে। শহীদুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবার সুযোগ পাওয়ায় তার শ্রমিক পিতা আশাবাদী যে, তার অপর ৪টি সন্তানও লেখাপড়া শিখবে, 'মানুষের মতো মানুষ' হয়ে উঠবে।

শহীদুল প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে জানা গেল, কানসোনা গ্রামে আরও কজন কিশোর-যুবক রয়েছে যারা পড়াশোনায় খুবই ভালো এবং তারা মজুরি করে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে আবদুস সামাদের ছেলে শফিকুল ইসলাম ও আবদুল জলিলের ছেলে মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। এরা সলপ হাইস্কুলে যথাক্রমে অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে।

শফিকুল ও আলাউদ্দিন দুজনেই কানসোনা সরকারি প্রাথমিক স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়েছে পঞ্চম শ্রেণীতে। এরা দুজনেই এখনও ক্ষেতমজুরি করে। সপ্তাহে ৪ দিন স্কুলে যায়, বাকি দিন কাজ করে গৃহস্থের ক্ষেতে, গম কাটে কিংবা ধানের চারা রোপণ করে। মজুরি পায় দৈনিক গড়ে ১৫ টাকা। এই টাকায় শফিকুল ও আলাউদ্দিন দুজনেই নিজেদের পড়াশোনার খরচ চালায়, কিছু টাকা তুলে দেয় বাবার হাতে।

শফিকুল ও আলাউদ্দিন দুজনেই নিজ নিজ ক্লাসে 'ফার্স্ট বয়'। মজুরি করে আগামীতে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার ইচ্ছে তাদের।

সোহরাব সুস্থ, রেজিয়া মারা গেছে

কানসোনার মুখ সিরিজ প্রতিবেদনের চতুর্থ পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল সোহরাব-মজনুর কাহিনী।

সোহরাব একজন সম্পূর্ণ ভূমিহীন দিনমজুর। মজুরিতে পাকা, খাটতে পারে ভালো, তাই অন্যান্য মজুর সপ্তাহে ৪/৫ দিন কাজ পেলেও সোহরাবের ডাক পড়ত সপ্তাহের সবকটি দিনেই। সেই সোহরাব একদিন এক বাড়িতে গাছ কাটার কাজ করতে গিয়ে ডাল ভেঙে পড়ে যায়, ভেঙে যায় ডান পা-খানা। দিন এনে দিন খাওয়া লোকটি বিছানায় পড়ে। যার বাড়িতে কাজ করছিল, সে কোনো সাহায্য করে না, হাত পেতে ব্যর্থ হতে হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারের কাছ থেকে। সাহায্য মেলে না বলে সোহরাবের চিকিৎসা তো হয়-ই না বরং জীবনধারণের জন্যে বিক্রি করতে হয় ঘরের ঘটিবাটি, হাঁস-মুরগি পর্যন্ত, অতঃপর কর্মীর হাত পরিণত হয় ভিক্ষুকের হাতে। পায়ের চিকিৎসা যে একেবারেই হয় না তা নয়, হয় চিকিৎসার নামে ঝাড়-ফুঁক, গাছের পাতা-শেকড় বেটে লাগানো, কিংবা তেল-পড়া মালিশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহরাবের ৪ ছেলেমেয়ে। ৩ ছেলের মধ্যে বড়টির নাম মজনু, বয়স ১৪ বছর। উপায়হীন পিতা বাধ্য হয় মজনুকে অন্যের জমিতে মজুরি করতে পাঠাতে। ১শ টাকা মাসিক বেতনে সে (মজনু) পাইট খাটা শুরু করে। '৮৭-তে 'সংবাদে'র প্রতিবেদনে বলা হয়, কানসোনা গ্রামের এক মজুর সোহরাবের ছেলে মজনু, এভাবেই বড় হচ্ছে দ্বিতীয় সোহরাব হয়ে। মজনুর পরের দুটি ভাই, ওরাও শিশু অবস্থা থেকে বড় হচ্ছে নিরক্ষর অবস্থায়। কানসোনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে শ্রমের আরও অনেক শরীর।

'৯১-এর মার্চে কানসোনা গ্রামে এসে জানা গেল, সোহরাবের পা ভালো হয়েছে। কাঠ ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম তাকে কিছু অর্থ-সাহায্য দিয়েছেন, তাই দিয়ে সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে সোহরাবের পায়ে অপারেশন হয়েছে। এখন সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে, আগের মতো ভারী কাজ করতে পারে না, কিন্তু করতে পারে ক্ষেত নিড়ানি ও বসে বসে ফসল কাটার মতো হালকা কাজ। সোহরাব দৈনিক আয় করছে ২০-২৫ টাকা। অতি কষ্টে হলেও সংসারটি চলে যাচ্ছে। সোহরাবের ছেলে মজনু আগে পাইট খাটত, এখন সে তাঁতশ্রমিক। কানসোনা গ্রামেই থাকে কিন্তু পার্শ্ববর্তী শেখপাড়ায় গিয়ে তাঁত বোনে, সপ্তাহে আয় করে ২০০-২৫০ টাকা। বয়স বৃদ্ধি ও পেশা বদলের সাথে সাথে আয়-উপার্জন বেড়েছে তার, বলাই বাহুল্য। মজনুর এক ছোট ভাই বেলকুচির এক বাড়িতে বছর-ঠিকে ভিত্তিতে কাজ করছে।

AMARBOI.COM

সোহরাব-পরিবার সম্পর্কে গ্রামের লোকজন বলল, 'আগের মতো দুর্দশা নেই, বরং ওরা বাপ-বেটায় মিলে আয় করছে এবং আল্লার রহমতে ভালোই আছে।' হ্যাঁ, পা ভালো হয়ে যাবার পর যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে সোহরাব। নিয়মিত কাজে যায়।

'অসহায় এক রেজিয়া' এই শিরোনামে ছাপা হয়েছিল কানসোনা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র চাকুরে ফুলজার হোসেনের মেয়ের কাহিনী।

বিয়ে হয়েছিল রেজিয়ার বছর দশেক আগে। বিয়েতে অনেক ধার-দেনা করে গরিব পিতা, বেচতে হয় কিছু জমিও। বিয়ের সময় শর্ত হয়, যৌতুক বাদেও জামাইকে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি নিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি, রেজিয়াকেও এ পর্যন্ত নেয়নি ছেলেটি তার বাড়িতে। (সংবাদ, ১৫.৩.৮৭)।

ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, রেজিয়ার অনেক দুঃখ যে স্বামী তাকে নিচ্ছে না, অথচ লোকটি তাকে দিয়েছে ইতোমধ্যেই দুটি সন্তান। বাবার অভাবী সংসারে বোঝা হয়ে থেকে রেজিয়া এখন নিজে কী খায়, আর নাবালক সন্তান দুটিকেই বা মানুষ করে কী করে? নিজে নাহয় একবেলা উপোস করে কাটানো যায়, কিন্তু কচি ছেলেমেয়ে দুজনার ক্ষুধার কান্না থামায় কী করে?

'৯১-এর মার্চে কানসোনায় এসে জানা গেল, রেজিয়া ক্যান্সারে মারা গেছে '৯০ সালের আগস্ট মাসে। প্রথমে গ্রামেই কবিরাজি চিকিৎসা হয়, পরে শেষ মুহূর্তে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই সে মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। যে স্বামী এতদিন রেজিয়াকে নিজ বাড়িতে নেয়নি, মৃত্যুর সময় সে রেজিয়ার পাশে ছিল। চিকিৎসার জন্যে কিছু নাকি খরচও দিয়েছে।

জানা গেল, রেজিয়ার আরেকটি সন্তান হয়েছিল। স্বামী গ্রহণ না করলেও সে বছরে ২/১ দিন কানসোনায় আসত, সেই সুবাদে রেজিয়া গর্ভধারণ করে।

রেজিয়ার মেয়ে কাজলরেখা '৮৭ সালে বাড়িতেই 'শিশুশিক্ষা' পড়ত। এখন তার বয়স প্রায় ৮ বছর, সে কানসোনা প্রাইমারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলগমন অনিয়মিত। বড় ছেলে রেজাউল এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে।

'দুঃখিনীর মা : দুঃখের মুখ' শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয় কানসোনার মুখ সিরিজে। দুঃখিনীর মা, যার নাম লক্ষ্মীরাণী, সে এক গৃহস্থের বাড়িতে কাজ করত যন্ত্রের মতন। হাসি-কান্না আনন্দ আবেগহীন এই নারী, শুধু পেটে-ভাতে বেঁচে থাকবার জন্যেই দিনমান নিশ্চুপ কাজ করে যেত।

'৯১-এর মার্চে জানা গেল, দুঃখিনীর মা গৃহস্থের বাড়িতে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়েছে কানসোনা গ্রাম। সে এখন সলপে থাকে।

লক্ষ্মীরাণী ওরফে দুঃখিনীর মা, তার ২ ছেলে। একজন মাছ ব্যবসায়ী, অপরজন চাষাবাদ করে। তারা এখন মনে করে যে, তাদের মা অপরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করবে সেটা 'মান সম্মানের ব্যাপার'।

দুঃখিনীর মা একমাস বড় ছেলের বাড়িতে থাকে, আরেক মাস ছোটজনের বাড়িতে। নাতি-নাতনিদের দেখাশোনা করে আর অবসর সময়ে জ্বালানি কাঠ ও গোবর কুড়োয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শরীর ভেঙে গিয়েছে তার।

AMARBOI.COM

মতিয়ার রহমান এখন ভূমিহীন

কানসোনা গ্রামের মতিয়ার রহমান ও আকবর আলী দুই ভাই। মতিয়ার রহমান বড়, সে একজন ক্ষুদ্র দোকানদার, কৃষকগঞ্জ বাজারে মরিচ হলুদ লবণ ডাল আদা রসুন বিক্রি করে।

দৈনিক আয় ২০-২৫ টাকা, এ টাকায় সাত সদস্যের পরিবারটি দুবেলা পেটভরে খেতে পারে না। ৪৩ বছর ধরে সে দোকানদারি করছে। তার মাথার উপর ঋণের বোঝা, সে ঋণ শুধতে বিক্রি করতে হয় আবাদি জমি। জমি কিনে নেয় তার ছোট ভাই আকবর আলী।

আকবর আলী গ্রামে থাকেন না, খুলনায় একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জাহাজে কাজ করেন, উপার্জন করেন কাঁচা টাকা। সেই টাকায় কিনে নেন বড় ভাইয়ের আবাদি জমি। 'দুই ভাই, কেউ বেচে কেউ কেনে' এই শিরোনামে '৮৭ সালে 'কানসোনার মুখে' প্রকাশিত হয় মতিয়ার রহমান ও আকবর আলীর কাহিনী। যিনি জমির মালিক, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, সেই লোকটি ক্রমশ ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে, আর সেই জমির মালিক নব্য কাঁচা পয়সা উপার্জনকারী। প্রতিবেদনটিতে তাই তুলে ধরা হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বিদেশে' চাকরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বিস্তর অর্থ উপার্জন ও গ্রামে এসে আবাদি জমি কিনে নেওয়ার মতো ঘটনা গ্রামের যুবকদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে গ্রাম ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবার প্রবণতা।

'৯১-এর মার্চে কানসোনায় এসে দেখা গেল, মতিয়ার রহমান সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে গেছে, তার তাবৎ জমি কিনে নিয়েছে আকবর আলী। আকবর এখন চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে নিজ গ্রামে, বর্গায় আবাদ করাচ্ছে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে কিনে নেওয়া জমি-জিরাত। দেখা যায়, মতিয়ার রহমান এখনও কৃষকগঞ্জ বাজারের ক্ষুদ্র দোকানদার। আয়-উপার্জন বাড়েনি তার। বাজারের একধারে তার নিজস্ব দখলে একটি দোকান (চালাঘর) ছিল, সেখানে নিজের দোকানে বসাতো। কিন্তু এখন সেই দোকানেরও 'পজেশন' সে বিক্রি করে দিয়েছে 'সংসারের অভাব' মেটাতে। মতিয়ার এখন হাটে যেখানেই জায়গা পায়, সেখানে অস্থায়ীভাবে দোকান সাজিয়ে বসে। অর্থাৎ, গত ৪ বছরে সে জমি হারিয়েছে, হারিয়েছে ব্যবসা করবার মতো দোকানের জায়গাটুকুও।

'কানসোনার মুখ' সিরিজে আফরোজার কথা বলা হয়েছিল। '৯১-এর মার্চে জানা গেল, মেয়েটি এইচএসসি পাস করেছে দ্বিতীয় বিভাগে এবং এখনও উল্লাপাড়া কলেজে পড়ছে। সামনে বিএ পরীক্ষা দেবে। আগের মতোই সাড়ে ৩ মাইল পথ পায়ে হেঁটে সে উল্লাপাড়া কলেজে পড়তে যায়।

আফরোজা লেখাপড়া আরও চালিয়ে যাবে। নিজের চেষ্টায় সে টিউশনি করে এবং আয় করে মাসে প্রায় ৩শ টাকা।

কানসোনা গ্রামের আরেকজন শাহানা। সে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে চাকরি করে। '৮৭ সালে, শাহানার ইচ্ছে ছিল চাকরির ফাঁকেও পড়াশোনা করবে, জামতৈল কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। পাস করে আরও বড় চাকরি করতে চেয়েছিল সে। '৯১-তে দেখা গেল, শাহানার পড়াশোনা হয় নি, ৪ বছরে হয় নি তার চাকরির প্রমোশন। তবে চাকরি করে জমানো কিছু টাকায় সে কিনেছে ৪২ শতক আবাদি জমি। প্রাপ্ত ফসলের টাকা জমাচ্ছে 'ভবিষ্যতের জন্যে'।

'কল্যাণহীন বর্তমানের ওরা দুজন' শিরোনামে বলা হয়েছিল কানসোনার ময়না ভৌমিক ও তার স্বামী কল্যাণ ভৌমিকের কথা।

'৮৭ সালে ময়না ভৌমিক একটি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করত। এখন ('৯১) কাজ পেয়েছে কানসোনা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে কিছুটা। হয়েছে একটি ছেলে। ভৌমিক দম্পতি এখন শিক্ষকতা আর সন্তানের যত্ন-পরিচর্যা নিয়ে দিনমান ব্যস্ত।

কল্যাণ ভৌমিকের বাড়িতে বিদ্যুৎ এসেছে। আগে ঘরে ছিল খড়-চাটাইয়ের বেড়া, এখন সেখানে টিন লেগেছে। কল্যাণ ভৌমিক এখন সলপ স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক। আগে দৈনিক বার্তার সংবাদদাতা ছিল, এখন খবর পাঠায় দৈনিক দেশে। এর আবাদি জমি ছিল '৮৭ সালে ৮ বিঘা, এখনও তা-ই। কিছু জমিজমা নিয়ে চলছে মামলা, তাই রয়েছে মানসিক অশান্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্গাচাষী আজাহার সম্পর্কে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল কানসোনার মুখে। '৯১-এর ফলোআপে দেখা গেল, আজাহার এখন আর বর্গা আবাদ করে না, শুধু মজুরি করে সে। আগে দৈনিক মজুরি পেত ১৫/১৬ টাকা, এখন পায় ২৫/৩০ টাকা।

আজাহার বর্গাচাষী থেকে মজুর হয়েছে। কিন্তু সংসারে কিছুটা এসেছে সচ্ছলতা। কেননা তার দুই ছেলের মধ্যে একজন কার্গো-তে কাজ করে খুলনা-বরিশাল এলাকায়। সে বাড়িতে একটি ঘর তুলে দিয়েছে, এক বোনের বিয়ে দিয়েছে, বাড়িতে প্রতিমাসে কিছু টাকাও পাঠায়। দ্বিতীয় ছেলেটি গ্রামেই দিনমজুরি করে।

বড় ছেলে 'বিদেশে' (খুলনা-বরিশাল) চাকরি করায় আজাহারের পরিবারের সচ্ছলতা এসেছে বলে সে মনে করে।

গ্রামের রাজনীতি ও সংস্কৃতি

কানসোনা গ্রামে মুক্তনাটক দলের একটি শাখা রয়েছে। লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি নয়, মুখে মুখে কাহিনী ও সংলাপ তৈরি করে অভিনয় হয় গণনাটক। সাধারণত একপক্ষে থাকে জোতদার মহাজন শোষক, অন্যপক্ষের চরিত্র খেটে খাওয়া শ্রমিক-মজুর। নাটকে ক্ষুদ্র চাষীরা মহাজন-ভূস্বামীর শোষণ রুখতে এক পর্যায়ে একতাবদ্ধ হয়ে যায়, মঞ্চে কায়েম হয় জনগণতন্ত্র।

বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বলতে গেলে অনুপস্থিত। বরং অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃতির নামে ঢুকেছে অপসংস্কৃতি। সেখানে কানসোনা ব্যতিক্রম বটে। কিন্তু আজকাল সে পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। '৮৭ সালে, কানসোনার মুখ সিরিজ প্রতিবেদনটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন মুক্তনাটক দলের নাটক মঞ্চস্থ হতো বছরে ১০/১২টি। এখানকার দল নাটক করে আসত আশপাশের গ্রামে, রাজশাহীতে, এমনকি ঢাকাতেও। সে কার্যক্রম এখন ঢিলে হয়ে গিয়েছে। সদস্যরা জানালেন, খুব বেশি হলে এখন প্রতিবছর ২/৩টি নাটক করা সম্ভব হয়। এর কারণ দুটি। এক গ্রামে মৌলবাদী শক্তি বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তৎপর হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলরা। তারা এখন শোষণ-বঞ্চনা ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে কথা বললে আপত্তি তোলে, নানা কথা বলে বেড়ায়। দুই. গ্রামের যুবক, যারা মুক্তনাটক করত, তারা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়েছে অনেকে। কেউ নিজের জীবনযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। তবু কোনোরকমে নাটক দলটিকে টিকিয়ে রেখেছে আনোয়ার হোসেন, কল্যাণ ভৌমিক, আলমসহ জনাদশেক যুবক। মাঝে-মধ্যে তারা সমবেত হয়, নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুক্ত নাটকের রিহার্সেল করে, কাহিনী সাজায়, সংলাপ বাঁধে। নাট্যদলের অন্যতম সংগঠক কল্যাণ ভৌমিক জানালেন, 'নাটকের ব্যাপারে আগের মতো উৎসাহ এখন আর নেই, খুব কষ্টে শুধু অতীত ঐতিহ্যটুকু ধরে রাখবার চেষ্টা আমরা করছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন এসেছে পরিবর্তন, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও। এই সিরিজের প্রথম পর্বে বলা হয়েছে, গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে সচেতন নয়। কিন্তু যারা সচেতন, তারা রাজনীতি নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তাভাবনা করেন, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার-বিবেচনা করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভালো-মন্দ।

কানসোনা গ্রামে কয়েক বছরে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরপর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ আওয়ামী লীগ সমর্থক ছিলেন। জামায়াতের তৎপরতা কল্পনাও করা যেত না। এখন দিনবদলের পালায় বিএনপি সমর্থক যেমন অনেক, তেমনি জামায়াতেরও। এমন অনেকে আছেন যারা আগে আওয়ামী লীগের সমর্থনে অন্ধ ছিলেন, এখন নানা কারণে মনমানসিকতা পরিবর্তন করেছেন।

এখানে দু-একটি উপমা দেওয়া যায়। যেমন মওলানা আবদুল হাকিম, বয়স ৬০ বছর, ইন্টারমিডিয়েট পাস, ৪ বিঘা জমির মালিক। তিনি শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের একজন অন্ধ-সমর্থক। একদা তিনি শেখ হাসিনাকে প্রাইভেট পড়িয়েছেন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে তিনি আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছেন, ভোটের সময় একে-ওকে বলেছেন নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্যে। একইভাবে এক সময় আওয়ামী লীগ করতেন, এখনও তার অন্ধ-সমর্থক—এঁরা হলেন বদরুল খান, ফজলার রহমান খান, আলম হোসেন, কল্যাণ ভৌমিক, কুদ্দুস খান। এই চিত্রের পাশাপাশি আবদুস সাত্তার, বয়স ৫৪, এন্ট্রান্স পাস, ২০/২২ বিঘা জমির মালিক, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে, আগে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন, এখন 'বয়সের কারণে' জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করেন (সদস্য নন)। অপর একজন সরকারি কর্মচারী নবীর হোসেন, অভাবের কারণে কিছু জমিজমা বিক্রি করে খেয়েছেন, তিনি আগে আওয়ামী লীগার ছিলেন কিন্তু এবারের নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি কাজ করেন। শাহজাহান আলী (৪৫), পড়াশোনা পঞ্চম শ্রেণী পাস, পেশা গেঞ্জির ব্যবসা, ইনি '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে-পরে ছিলেন আওয়ামী লীগার, হঠাৎ করে ধর্মকর্মের দিকে ঝুঁকে যান এবং সমর্থন করতে থাকেন জামায়াতে ইসলামীকে (ইনি অবশ্য আওয়ামী লীগের বিরোধী নন)। গোলাম মোস্তফা, বয়স ৩৮ বছর, ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগ করতেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং স্বাধীনতার পর জাসদে যোগ দেন। এখন, বছর চারেক হলো জাসদ ছেড়ে বাকশাল করছেন। জাসদ করলেও গোলাম মোস্তফা উল্লাপাড়া গিয়ে যাদের সাথে উঠাবসা করতেন তারা ছিলেন বাকশালের কর্মী। এভাবেই একদা তিনিও কর্মী হিসেবে যোগ দেন বাকশালে।

কানসোনায় এমন অনেক আছেন যারা রাজনীতি ও দলের ব্যাপারে একনিষ্ঠ নন। আজ এ-দল, কাল ও-দল সমর্থন করেন তারা। এই গ্রামে মাত্র চারটি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক দল ও একটি ছাত্র সংগঠনের সদস্য বা সমর্থক রয়েছেন। এদের মোট সংখ্যা প্রায় ৩০। রাজনীতিসচেতন মহিলার সংখ্যা গ্রামে মাত্র একজন।

গ্রামে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের অফিস কিংবা গ্রামভিত্তিক সংগঠন নেই। ইউনিয়ন (সলপ) পর্যায়ে কমিটি আছে। জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের।

উল্লাপাড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে এবারের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী জয়ী হন; কিন্তু সলপ ইউনিয়নের ভোটচিত্রে দেখা যায়, জামায়াত ভোট পেয়েছে বেশি, তারপর ধানের শীষ ও নৌকা প্রতীকের অবস্থান। তিন দলের প্রার্থী ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ৩৮০০, ৩৪৩৭, ৩২১৩টি।

কানসোনা গ্রামের মহিলারা, যারা গ্রামের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, তারা রাজনীতির ব্যাপারে অসচেতন রয়েছেন এ সম্পর্কিত তথ্যশূন্যতায়। ২/১ জন ছাড়া কেউই ২/৩টির বেশি রাজনৈতিক দলের নাম বলতে পারেন না, জানেন না নেত্রী বা নেতার নাম। শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার নাম এরা শুনেছেন, কিন্তু অধিকাংশই চোখে দেখেননি, কে কোন্ দলের নেত্রী তা বলতে পারেন না সঠিকভাবে।

(প্রতিবেদন রচনা ও প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতকান্দি গ্রামে

এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনটি লিখেছি এপ্রিল '৯০-এর প্রথম সপ্তাহে। প্রথম ৪টি লেখা ১২ থেকে ১৫ এপ্রিল '৯০-তে সংবাদের পঞ্চম পাতায় প্রকাশিত হয়। এ-সময় 'মফস্বল পাতা' সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল। প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করেছেন : করতকান্দি গ্রামের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সরকার, সাংস্কৃতিক কর্মী নির্মল সরকার, তপন দাশ, স্বদেশবন্ধু সরকারসহ অনেকে।

করতকান্দি গ্রামে

শহর থেকে অনেক দূরের গ্রাম করতকান্দি। রাজধানী থেকে প্রায় সোয়া শ মাইল আর পাবনা শহর থেকে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল হবে গ্রামটির দূরত্ব। উপজেলা : ভাঙ্গুরা, ইউনিয়ন : খানমরিচ।

বিশাল চলনবিলের মাঝখানে এই গ্রামটির যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। সে হিসেবে এটি দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর একটি। গ্রামে যেতে হলে যে কাউকে প্রচুর ধৈর্য ও সময় ব্যয় করতে হবে। বগুড়া শহর থেকে সড়কপথে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ হয়ে যাওয়া যায় ঐ গ্রামে, কিন্তু সে যাত্রা অনিশ্চিত। বগুড়া থেকে শেরপুর-ভুঁইয়াগাতি-নিমগাছি হয়ে আসতে হবে তাড়াশ উপজেলা এলাকায়, সেখান থেকে উলিপুরহাট দিঘি হয়ে নওগাঁ বাজার। তাড়াশ থেকে নওগাঁ বাজার পর্যন্ত একটি বাস যায়, কিন্তু পেরুতে হয় ৭ মাইল কাঁচা রাস্তা। সামান্য বৃষ্টি নামলে বাস বন্ধ থাকে। যেতে পারেন উল্লাপাড়া থেকে, সেক্ষেত্রেও পায়ে হাঁটতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামটি পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত। পাবনা থেকে করতকান্দি গ্রামে আসতে হলে প্রথমে ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ রেলপথে আসুন ভাঙ্গুরার বড়ালব্রিজ স্টেশনে। সেখান থেকে নৌকা করে করতকান্দি। কিন্তু শুকনো মৌসুমে বড়াল নদীতে পানি থাকে না, নৌকা বন্ধ, পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। বড়ালব্রিজ এলাকা থেকে করতকান্দির দূরত্ব ৯ মাইল প্রায়।

করতকান্দি গ্রামটির অবস্থান এক বিচিত্র। গ্রামের পূর্ব ঘেঁষে উল্লাপাড়া উপজেলার তেলিপাড়া গ্রাম, পশ্চিমে চাটমোহর উপজেলার ব্রিরায়নগর, উত্তরে তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ বাজার একটি বড় ব্যবসায় কেন্দ্র, দক্ষিণে পাবনার ভাঙ্গুরা উপজেলার খানমরিচ, সুলতানপুর। অর্থাৎ, করতকান্দি গ্রামের তিনদিকে তিনটি উপজেলার সীমানা ঠেকেছে। উল্লিখিত জনপদ ছাড়াও এই করতকান্দি গ্রামের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ঘিরে রয়েছে বেলাই, বৃদ্ধমরিচ, মিসমেথইর, রায়নগর ও নাটোর জেলার কাছিহাটা গ্রাম।

করতকান্দি গ্রামের বৈশিষ্ট্য হলো : ১. মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে অপূর্ব এক সম্প্রীতি; ২. গ্রামে শিক্ষিতের হার বেশি, ভূমিহীনের হার কম; ৩. এখানে রয়েছে নিজস্ব বিচার-শালিস ব্যবস্থা; ৪. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গ্রামের যুব সম্প্রদায়ের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা; ৫. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো, গ্রামে এখনও ঢোকেনি অপসংস্কৃতি, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি।

আসলে ব্যাপারগুলো কী ও কেমন, গ্রামটির আর্থ-সামাজিক চেহারা কি-রকম, কদিন ধরে তা খতিয়ে দেখলাম। এগুলো এখন আমি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

মিলেমিশে আছে ওরা

করতকান্দি। দুটি পাড়া। পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া। পূর্বপাড়ায় মুসলমানদের বাস, পশ্চিমপাড়ায় হিন্দুদের। দুসম্প্রদায়ের মানুষ গলাগলি করে আছে এখানে : যেন আত্মীয়। একে অপরকে ডাকে দাদা, কেউ ডাকে ভাই।

এটা ঠিক যে, দেশের অন্যান্য এলাকার মতো এই গ্রামটিতেও পরিবারগুলো ভাঙছে। ভাগাভাগি হচ্ছে বাবা-ছেলে, পৃথক হয়ে যাচ্ছে ভাই-ভাই, আলাদা হচ্ছে মা আর ছেলে, ছেলে বউ। খণ্ডিত হচ্ছে জমি, ভিটা। কিন্তু সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে ভালোবাসা, প্রীতি-সম্প্রীতি, তা এই করতকান্দিতে বিচ্ছিন্ন হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়নি এখানকার আকাশে-মাটিতে।

গ্রামে মুসলমান-পরিবার প্রায় ৮৫টি, হিন্দু পরিবার ৫৪টি। এদের মধ্যে কোনো রকম গোলমালের ঘটনা অতীতে কখনো ঘটেনি, ঘটে না এখনও। বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন মুসলমান অপর হিন্দুর বিপদে ছুটে যায়; হিন্দু এগিয়ে আসে মুসলমানের সাহায্যে। অভাব-আকালের সময় একে অপরকে ধার-কর্জ দেয়, অর্থ-সাহায্য করে। জানা গেল, এ গ্রামে হিন্দুদের পূজার সময় মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দেয় কিন্তু তা কেউ 'শেরেকি গুনাহ' বলে মনে করে না। একইভাবে, গরিব কোনো মুসলমানের মেয়ের বিয়েতে অর্থ-সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসে অবস্থাপন্ন হিন্দু। মসজিদে মাগরিবের আযান ধ্বনিত হয়, হিন্দুবাড়িতে বাজে শাঁখ। যার যা ধর্ম পালন করছে তারা শান্তির শামিয়ানার নিচে।

পুরুষানুক্রমে ভাই-ভাই হিসেবে বসবাস করছে এই গ্রামের মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়। সম্পত্তি দখল, মেয়ে ছিনতাই কিংবা জোর করে বিয়ে, উপাসনালয়ে হামলা, এমনকি একের বিরুদ্ধে অপরের সামান্য কটু মন্তব্যও উচ্চারিত হয় না এই গ্রামের কোথাও।

জানতে চেয়েছি, এতটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবার কারণ কী? অধিকাংশ লোকজনের কাছ থেকে এর জবাব মেলেনি। বরং, তারা উল্টো প্রশ্ন করেছে, কিজন্যে সম্প্রীতি নষ্ট হবে? কী কারণে হবে গোলমাল? কোনো তো কারণ ঘটে না!

সম্প্রীতি সম্পর্কে গ্রামের একজন স্কুলমাস্টার মনে করেন, এখানকার মানুষজন সচেতন, তারা শান্তি-শৃঙ্খলা চায়। একজন উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক বলেন, গ্রামের লোকজন শিক্ষিত, তার প্রভাব রয়েছে। একজন প্রৌঢ় ব্যবসায়ী বলেন, করতকান্দি গ্রামে স্থানীয় যে বিচারব্যবস্থা রয়েছে, তা অত্যন্ত কড়া। কেউ কোনো গোলমাল করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

AMARBOI.COM

স্বৈরাচারের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু পাবনা শহর থেকে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল দূরের যাত্রা-কষ্ট প্রত্যন্ত গ্রামটিতে তার সামান্য হাওয়া এখনও লাগেনি। মুসলমান কি হিন্দু, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে পেটে-ভাতে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করছে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে তারা চলনবিলের মাঠে-প্রান্তরে। জমি কর্ষণ, শস্য বপন এইসব নিয়ে তারা ব্যস্ত। ক্ষুধার অন্ন জোগাতে গিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছে, রক্ত পানি করছে।

এখানে জীবনযুদ্ধ। কখনো রুক্ষ কঠিন মাটি, কখনো চলনবিলের বিশাল ঢেউয়ের তোড়। তাই বুঝি মাথা তুলতে পারে না সাম্প্রদায়িকতার ফণা।

বিদ্যুৎ খরচ বেশি পড়ে বলে

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। শহর থেকে গ্রামে চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। কৃষি উৎপাদনে, বিশেষ করে সেচযন্ত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, বিদ্যুতে চলছে ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবনার করতকান্দি গ্রামেও বিদ্যুৎ গেছে। পল্লীবিদ্যুৎ। ১৫ মাইল দূরের চাটমোহর উপজেলা থেকে চলে গেছে বিদ্যুতের টানা লাইন। ঐ গ্রামটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় '৮৩-৮৪ সালে।

কিন্তু গ্রামে গিয়ে লক্ষ করা গেল, বিদ্যুৎ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা ব্যবহারের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে লোকজন। গ্রামের বেশ কজন জানালো, তাদের কাছে বিদ্যুতের চেয়ে কেরোসিনই ভালো। হারিকেন কিংবা কুপি জ্বালালে খরচ পড়ে অনেক কম। আর, সে কারণেই, করতকান্দির পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ার প্রায় ৪০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক এখন আর বিদ্যুৎ নিচ্ছেন না। হয় নিজেরা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন কিংবা লাইন কেটে নিয়ে গেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকজন। স্থানীয় লোকজন জানালেন, বিদ্যুৎ বিল প্রতিমাসে দিতে হয় কমপক্ষে ৪৫ টাকা, অথচ কেরোসিনের বাতি জ্বালালে মাসে তেল লাগে ৩ সের। ২৬/২৭ টাকায় মাস চলে যায়। এ এলাকায় '৮৭ ও '৮৮ সালের খরা-বন্যায় কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে, ফসল মার খাওয়ায় তারা অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু-প্রায়। এ অবস্থায়, অতি বাস্তব ব্যাপার হলো, বিদ্যুতের উজ্জ্বল-ঝলমলে আলোর চেয়ে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে তারা কেরোসিন, হারিকেন কিংবা কুপি।

বিদ্যুতের বিল দিতে পারেনি গ্রামের অনেকে। টাকা বকেয়া পড়ায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তাদের। অনেকে আবার টাকার বোঝা বেড়ে যাবে বলে নিজেরাই বিদ্যুৎ বিভাগের লোক ডেকে এনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে করতকান্দি পূর্বপাড়ার কৃষক সরাবত আলী, কামাল উদ্দিন, মনছের আলী, পশ্চিমপাড়ার কৃষক পরিমল সরকার, মুরারী মোহন সরকার, সন্তোষ সরকার, কল্পনাথ সরকার। এরা ক্ষুদ্র ও নিম্ন-মধ্যম অবস্থার কৃষক। গ্রামে পল্লীবিদ্যুৎ আসবার পর খুব উৎসাহের সাথে তারা তাদের ভাষায় 'কারেন' (কারেন্ট) নিয়েছিল। আজ তাদের ঘরে বালবের বদলে জ্বলে কেরোসিনের বাতি।

বাসাবাড়ির বিদ্যুতের ব্যাপারে শুধু নয়, সেচকাজে যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, সেখানেও একই দশা, একই সমস্যা। দেখা যাচ্ছে, একেবারে হাতের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ডিজেলচালিত অগভীর নলকূপ ব্যবহার করছেন মধ্যম-কৃষক বিশ্বনাথ সরকার। আফসার আলী মিয়ার অগভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল, কিন্তু বিদ্যুতে সেচের পানির খরচ বেশি পড়ায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তিনি এখন ডিজেলে তার সেচযন্ত্র চালাচ্ছেন। কৃষকরা বলেন, বিদ্যুতে সেচযন্ত্র চালালে ধান উৎপাদনের ব্যয় খুব বেশি পড়ে যায়, আমাদের পোষায় না।

গ্রামে বিভিন্নজনের সাথে কথা বলে বোঝা গেল, বিদ্যুতের নতুন সংযোগ নেওয়ার ব্যাপারে কেউ তেমন উৎসাহী নন। সবার একই কথা : বিদ্যুৎ খরচ বেশি পড়ে। কেরোসিনই তাদের জন্যে সস্তা।

আলো ঝলমলে রাজধানী কিংবা জেলাশহর থেকে অনেক অনেক দূরের গ্রামে, করতকান্দিতে, বিদ্যুৎ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানুষ ক্রমশ পেছনে যাচ্ছে। বাল্‌ব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোল্ডার-তার ইত্যাদি গুটিয়ে রেখে এখন আবার সেই কেরোসিনের বোতল, সেই হারিকেন, কুপি। বিদ্যুতের এই বুঝি উন্নয়ন আর সম্প্রসারণ!

যৌতুক ছাড়া কোনো বিয়ে হচ্ছে না

যৌতুকবিরোধী আন্দোলনের কথা এন্তার উচ্চারিত হলেও এর সামান্যতম স্লোগান-ধ্বনি পাবনার প্রত্যন্ত গ্রাম করতকান্দিতে এসে পৌছায়নি। এ গ্রামটিতে কোনো বিয়েই যৌতুক ছাড়া হচ্ছে না। এমন কোনো উদাহরণ নেই যে, অতীতে একটি বিয়েও যৌতুক ছাড়া হয়েছে এই এলাকায়। অথচ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো : গ্রামটিতে শিক্ষিতের হার দেশের অন্যান্য অনেক গ্রামের তুলনায় বেশি। প্রায় ঘরে আছে গ্র্যাজুয়েট ছেলে, অনেকে এইচএসসি পাস। এসএসসি পাস ছেলে তো আছে মেলা।

এ গ্রামে নগদ টাকার যৌতুক ছাড়া বিয়ে তো হচ্ছেই না, সে টাকা আবার পুরোটাই ছেলের বাবা কিংবা ছেলের হাতে গুণে দিতে হয় আগাম। নগদ টাকা ছাড়াও দিতে হয় টেলিভিশন, রেডিও, সাইকেল, ঘড়ি, খাট, বিছানাপত্র, জামা-জুতো, বাক্স-সুটকেস, ছাতি। এর ওপর অলংকার তো আছেই। ৫/৭ ভরির নিচে কথা নেই। গরিব ঘরের মেয়ে হলে কমপক্ষে ১ ভরি।

নিজস্ব সংগৃহীত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ২ বছরে করতকান্দি এবং আশপাশের তেলিপাড়া, ব্রিরায়নগর, মিসমেথুইর, সুলতানপুর, নওগাঁ বাজারসহ ১০টি গ্রামে ১৬ জন মেয়ে এবং ২৪ জন ছেলের বিয়ে হয়েছে। ঐ মোট ৪০টি বিয়ের কোনোটাই যৌতুক ছাড়া হয় নি। মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মালামাল ছাড়াও নগদ দিতে হয়েছে সর্বনিম্ন ৩ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত। তবে, ৮০ ভাগ মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বাবাকে নগদ ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা গুণে দিতে হয়। যৌতুকের এই টাকা যোগাতে মেয়ের বাবা আবাদি জমি বিক্রি করেছেন, কেউবা চড়া সুদে ঋণ নিয়েছেন। অবশ্য কারও কারও ঘরে কিছু কিছু জমানো টাকাও ছিল।

যে ২৪টি ছেলের বিয়ে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসএসসি, এইচএসসি, এমনকি এমএ পাস করা ছেলেরাও নিজ গ্রামে বিয়ে করে নি। যৌতুকের বিনিময়ে তারা 'কনে এনেছে' বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী এমনকি ঢাকার। অবশ্য, এই গ্রামে টাকা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটিকে এখন আর সরাসরি যৌতুক বলা হয় না, মেয়ের বাবা নাকি 'খুশি হয়ে' জামাইকে কিছু টাকা 'উপহার' দেন।

শিক্ষিত ছেলেরা নগদ টাকা চায়। নেয়। কিন্তু যারা অপেক্ষাকৃত নিরক্ষর, তারা টাকার পরিবর্তে চায় সোনা, মালামাল। চায় গরু, টিন, রেডিও, সাইকেল, জামা-জুতো। ঘড়ি আদৌ পরে না এমন ছেলেও ঘড়ি দাবি করে, আদায় করে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের পর তা বিক্রি করে দেয়। একজন দিনমজুর সেও দাবি করে ২ থেকে ৩ হাজার টাকার সামগ্রী এবং কলমা কিংবা মন্ত্র পড়ার আগে তা বুঝে নেয়। দাবিকৃত মোট টাকার অংশবিশেষ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মেয়েকে 'তুলে নেওয়া' হয় নি কিংবা বিয়ে স্থগিত থেকেছে এমন ঘটনার উদাহরণও রয়েছে অনেক।

শুধু করতকান্দি গ্রামের অবস্থা দেখা যাক। গত এক বছরে এ গ্রামের ৫টি ছেলে বিয়ে করেছে। এদের মধ্যে একজন দিনমজুর। যৌতুক নিয়েছে ২ হাজার টাকা। অপর চারজন যৌতুক নিয়েছে ৩০ হাজার থেকে ৬৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। এরা বিয়ে করেছে গ্রামের বাইরে।

বর্তমানে করতকান্দির পূর্বপাড়ায় ৩৬ জন ও পশ্চিমপাড়ায় ২১ জন (মোট ৫৭) জন বিবাহযোগ্য মেয়ে রয়েছে। যৌতুক দিতে না পারার কারণে এদের বিয়ে হচ্ছে না। বলা হয়েছে, গত ৫ বছরে ৬ দফা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলহানি ঘটবার পর মধ্যম অবস্থাপন্ন কৃষকদেরও অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। এই অবস্থায় আবাদি জমি বেচে যৌতুক দিলে সংসারের খাওয়া-পরা চলবে কী করে?

গ্রামের অনেক পরিবারে এমন ধারণা রয়েছে যে, যৌতুক নেওয়াটা একটা 'মান-মর্যাদার' ব্যাপার। যারা যত টাকা আদায় করতে পারে, তারা মনে করে তাদের 'পারিবারিক মর্যাদা' তত বেশি।

AMARBOI.COM

'এরশাদ ফেন্টু' : অনেক গরিব পরিবারে নিত্যদিনের খাবার

দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে বিভিন্ন রকম খাবার। নিজস্ব প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে তৈরি এসব খাবার এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয়।

করতকান্দি গ্রামে একটি খাবারের নাম 'এরশাদ ফেন্টু'। কেউ বলে এরশাদ ঘাঁটি। '৭৪ সালে মূলত এই খাবারটি উদ্ভাবিত হয়, তখন এর নাম দেওয়া হয় 'মুজিব ফেন্টু'। এরশাদ সরকারের আমলে হয়েছে 'এরশাদ ফেন্টু'। '৭৪-এর খাদ্য সংকট পরিস্থিতিতে এই গ্রামীণ খাবারটির প্রচলন হয়, সে কারণে 'মুজিব ফেন্টু' নাম হয়েছিল বলে লোকজন জানায়। পরে নামের বিবর্তন ঘটে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে নাম পরিবর্তন অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যেমন, নিক্সন মার্কেট হয়ে যায় কার্টার মার্কেট কিংবা তারও পরে রিগান মার্কেট। ব্যাপারটা সেরকম।

পার্থক্য হলো : মুজিব ফেন্টু ছিল গাঢ়, আর এখনকার এরশাদ ফেন্টু পাতলা।

ফেন্টু তৈরি হয় দুভাবে। ভাতের ফ্যানে আটা মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। মিশ্রিত হয় লবণ, মরিচ। কেউ কেউ আবার শুধু আটাই পানিতে গুলিয়ে গরম করে নিয়ে পরে লবণ-মরিচ মাখিয়ে খায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবের সময় যে খাবারটির প্রচলন, তা এখন অনেক গরিব পরিবারে নিত্যদিনের খাবার। ‘ফেন্টু’ নাস্তা হিসেবে প্রধানত ব্যবহৃত হয়, এছাড়াও অনেকে খায় দুপুরে কিংবা রাতে : প্রধান খাবার হিসেবে। কামলা-মজুরদের এ গ্রামে খাবার দেওয়ার নিয়ম সাধারণত নেই, তবু যদি দয়া করে কেউ দেয়, দেয় এই ‘ফেন্টু’। গ্রামে এখনও অনেক পরিবার আছে যারা ভাতের বদলে ফেন্টু খেয়ে থাকে। কার্তিক কিংবা চৈত্রের অভাবের সময়, ভাতের যখন দেখা মেলা ভার, দিনমজুর পরিবারের সদস্যরা দিনের পর দিন ফেন্টু খায়।

করতকান্দি গ্রামে সরিষা ফুলের বড়া বড় প্রিয়। চালের গুঁড়োর সাথে সরিষা ফুল মিশিয়ে বড়া তৈরি হয়। পচা নারিকেল কুরে নিয়ে লবণ-মরিচ মাখিয়ে তৈরি হয় আরেক ধরনের বড়া।

গ্রামের আরেক খাবার ‘বেতাকা’। বেতের আগার কচি অংশ ভাতে দিয়ে সেদ্ধ করে, পরে তিল ও সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে খায়। ‘তেলাপুচ্ছা’ নামের এক ধরনের লতানো গাছ দেখা যায় গ্রামে। এর কচি ডগা কেটে, ন্যাকড়ায় পেঁচিয়ে, ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে সেদ্ধ করে নিয়ে ভর্তা মতো করা হয়। এই খাবারের নাম ‘তেলাপুচ্ছা’। দুধের ছানা চালের গুঁড়ার সাথে মিশিয়ে হলুদ লবণ মসলাপাতি মিশিয়ে তেলে ভাজি করা হয়। এটি পরে আলু-পেঁপে দিয়ে তরকারি রান্না হয়। ‘ছানার ঝোল’ বলে একে।

আরেক খাবারের নাম ‘কদমা’। আটা ভিজিয়ে মুঠি সাইজের দলাদলা করে আগুনে পোড়ানো হয়, যেমন করে ভর্তার জন্যে পোড়ায় আলু। পোড়া আটার দলা গুড় মিশিয়ে খাওয়া হয়। গ্রামের অনেক অভাবী পরিবারে এটা সকালের নাস্তা।

প্রত্যন্ত গ্রাম করতকান্দিতে আরও আছে হরেক রকম খাবার। কালের বিবর্তনে কোনোটা বিলুপ্ত, আবার নিতান্ত প্রয়োজনে কোনোটা এসেছে নতুন।

অপরদিকে, সাধারণ খাবারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। খাদ্যাভাসও বদলে গেছে। ২০ বছর আগে এ গ্রামের লোকজন তিনবেলা ভাত খেত। পরে ভাতের পাশাপাশি এলো রুটি। এখন ঘরে ঘরে রুটির প্রচলন। সেই আটা থেকে এসেছে ফেন্টু, কদমা ইত্যাদি। ... এখন আবার দেখা যাচ্ছে, গমের আটার পরিবর্তে ক্রমশ আসছে ভুট্টার আটা।

মাছে ভাতে বাঙালি। দুধে ভাতে বাঙালি। আজ কোথায় সেই মাছ-মাংস-দুধ-ডিম! যে মজুর-পরিবারের দৈনিক আয় ১০/১২ টাকা, অথচ সদস্যসংখ্যা ৬/৭ জন, সেখানে ফেন্টু কিংবা কদমা ছাড়া গতি কী?

মেয়েদের আলাদা নাটকের গ্রুপ আছে এখানে

দেশের কোথাও কি মেয়েদের নিয়ে আলাদা নাটকের গ্রুপ আছে? ঢাকায় কিংবা অন্য কোনো শহরে-গ্রামে? না, নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা থেকে সোয়া শ মাইল দূরের গ্রাম করতকান্দিতে রয়েছে এরকম একটি মেয়েদের নাট্যদল। মেয়েরাই পাণ্ডুলিপি তৈরি করে, অভিনয় করে, পরিচালনায়ও রয়েছে মহিলা। 'পুনর্যাত্রা' ও 'আগুন' নামে ইতোমধ্যেই দুটি নাটক তারা মঞ্চস্থ করেছে। জানা গেল, মেয়েরা গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ করলে মহিলা দর্শক খুব বেশি হয়। কিশোরী-যুবতী তো বটেই, প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাটক দেখতে আসেন। নাটকে বখাটে ছেলেদের উৎপাত হয় না।

মেয়ে নাট্যকর্মীদের বয়স ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এরা স্থানীয় কিংবা ভাঙ্গুরা উপজেলা সদরের স্কুল-কলেজে পড়ে, কেউ পড়ার পাট চুকিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকে এখন।

'৮৭ সালে মেয়েদের আলাদা নাট্যগ্রুপটি গঠিত হয়। নিজস্ব নাটক ছাড়াও গ্রামের নীলাঞ্জন নামের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নাটকেও অংশগ্রহণ করে থাকে তারা। মেয়েদের নাট্যগ্রুপে সদস্য সংখ্যা ২৬ জন, এদের মধ্যে তৎপর ২০ জন। দলটিতে একই পরিবারের একাধিক সদস্যা রয়েছে।

করতকান্দি ও আশপাশের গ্রামগুলোতে রাজনৈতিক তৎপরতা তেমন না থাকলেও সাংস্কৃতিক তৎপরতা ভালো। এখানে 'নীলাঞ্জন' নামে একটি গোষ্ঠী আছে যারা গত ১০ বছর ধরে বেশকিছু মুক্তনাটক, যাত্রা ও বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠান করেছে। নীলাঞ্জনের সদস্যসদস্যা সংখ্যা ৬৫ জন, এদের মধ্যে ৪৫ জন সংগঠনে তৎপর। ১০ বছর আগে অশোক সরকার, মিলন দাশ, উৎপল সরকার, স্বদেশবন্ধু সরকার ও তপন দাশ নামের ৫ জন যুবকের উদ্যোগে নীলাঞ্জন গঠিত হয়। শেষের দুজন ঢাকায় থাকেন, অপর ৩ জন নিজ নিজ পেশা নিয়ে গ্রামেই রয়েছেন।

করতকান্দি হলো ভাঙ্গুরার খানমরিচ ইউনিয়নের একটি গ্রাম। ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ৩৮টি। এগুলোর মধ্যে নীলাঞ্জন গড়ে উঠেছে করতকান্দি, মিসমেথুইর, ব্রিরায়নগর, নওগাঁ বাজার, পংরৌহালি গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তবে কোনো অনুষ্ঠান হলে তা উপভোগ করতে আসে চাঁদপুর, সুলতানপুর, রায়নগর, দাশবলাই, ঘোষবলাই, বানিয়াবহু, তেলিপাড়াসহ বেশ কটি গ্রামের মানুষজন।

করতকান্দি ও আশপাশের গ্রামে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৩৯ সালে করতকান্দি, ব্রিরায়নগর ও মিসমেথুইর গ্রামের উৎসাহী লোকজনকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'কেবিএম অপেরা' নামের একটি শৌখিন যাত্রাদল। পরবর্তীকালে এই যাত্রাদলকে কেন্দ্র করেই মূলত গড়ে ওঠে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।

করতকান্দির আশপাশের গ্রামগুলোতে আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ক্লাব রয়েছে, যেমন সাংস্কৃতিক একাডেমী, ঝঙ্কার, নবীন সংঘ, পাঁচতারা ক্লাব, সূর্যোদয় ক্লাব। এদেরও কিছু তৎপরতা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে পরিবার পরিকল্পনার কাজ তেমন হচ্ছে না

করতকান্দি এবং আশপাশের গ্রামগুলো চলনবিল এলাকার মধ্যে। রোপা আমন ধান আবাদ হয় না এখানে, হয় কিছু গভীর পানির ধান। প্রধান ফসল হিসেবে কৃষকরা আবাদ করে থাকে বোরো ধান, গম। আবাদ হয় সরিষা, ডাল জাতীয় শস্য, কিছু শাকসব্জি।

এক সময় মাছপ্রধান এলাকা ছিল ভাঙ্গুরা উপজেলার এই জনপদ। এখন মাছ কমেছে। বর্ষা কিংবা বর্ষা-পরবর্তী মৌসুমে সামান্য যা মাছ পাওয়া যায় চলে যায় উপজেলা এলাকায়, সেখান থেকে শহরে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের সাধ্য নেই চড়া দামে সে মাছ কিনে খায়।

গ্রামে ভূমিহীনের হার কম। শতকরা ২০ ভাগ। তবে, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীর হার বেশি। প্রায় ৭০ ভাগ। বাকি ১০ ভাগ মানুষের হাতে (পরিবার প্রধান) গ্রামের মোটা পরিমাণ জমি। এঁরা নিজেরা 'পাইট' খাটিয়ে কিছু জমি আবাদ করেন, কিছু দেন বর্গা।

গ্রামে মজুরির হার খুব কম। খাওয়া নেই, শুধু নগদ দেওয়া হয় দৈনিক ১০ টাকা। ধান-গম কাটা-মাড়াইয়ের ভরমৌসুমে মজুরি ওঠে ১৫ থেকে ২০ টাকা। দেখা গেল, বোরো ধান আবাদ করলেও অধিকাংশ কৃষক ক্ষেতের যত্ন-পরিচর্যায় তেমন উৎসাহী নয়। সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় না, রোগ-পোকা দেখা দিলে কীটনাশক ওষুধ ছিটানো হয় না প্রয়োজনমাফিক। এর পাশাপাশি, মাটিতে কমেছে জৈব পদার্থের হার, অথচ জৈব সার ব্যবহারের ব্যাপারে কেউ উৎসাহী নয়, নয় উদ্বুদ্ধ। এসব কারণে, দেখা যাচ্ছে, বোরো ধান ও গমের মতো প্রধান ফসলের একরপ্রতি ফলন কমে যাচ্ছে। ৫ বছর আগেও যেখানে একরে ৫০ থেকে ৬০ মণ ধান পাওয়া যেত, এখন মেলে ৪০ থেকে ৪৫ মণ। গম পাওয়া যায় একরপ্রতি ১০-১৫ মণ। একইভাবে সরিষা-ডালসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে।

গ্রাম ঘুরে অনেক চেষ্টা করেও কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ কৃষক চেনে না পর্যন্ত তাকে। ভাঙ্গুরা উপজেলা কিংবা পাবনা জেলা কৃষি অফিস থেকে কর্মকর্তারা এলাকা সফর করতে আসেন খুব কম। উচ্চপর্যায় থেকে যে তদারকি প্রয়োজন, তা যথাযথভাবে হচ্ছে না।

গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার কাজও খুব ঢিলেঢালা। সক্ষম দম্পতিরা জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ নন। গ্রাম সফরকালে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কোনো কর্মীকে দেখা যায়নি।

জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় না গ্রামটিতে। গ্রামের অনেক পরিবার ডোবা-পুকুরের পানিতে গোসল করে, কাপড় কাচে, সেই নোংরা পানি রান্নাবান্নার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেও ব্যবহৃত হয়। খাবার পানির জন্যে টিউবওয়েল আছে ৩০টির মতো, অধিকাংশই অকেজো থাকে দিনের পর দিন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে খাবার পানির সংকট ঘনিয়ে ওঠে ভীষণ। টিউবওয়েলে পানি পাওয়া যায় না পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায়। দূরের অগভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি অতিকষ্টে বয়ে আনে মানুষজন।

করতকান্দির মতো বিরাট গ্রামটিতে কোনো গভীর নলকূপ নেই। বরাদ্দ হয়েছিল একটি গভীর নলকূপ, কয়েক বছর আগে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এখনও তা বসানো হয় নি।

প্রাত্যহিক জীবনযাপন

প্রত্যন্ত গ্রাম করতকান্দিতে দুয়েকটা পরিবারে টুথপেস্ট-ব্রাশ গেছে, গেছে সুগন্ধি তেল-সাবান, আধুনিক বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী; কিন্তু অধিকাংশ পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতি রয়ে গেছে অনেক বছরের পুরনো। এখনও এ গ্রামের মহিলারা কাঠ-কয়লা কিংবা ছাই দিয়ে দাঁত মাজে, মাথার চুল পরিষ্কার করে আঠালো এক ধরনের মাটি কিংবা 'ক্ষার' দিয়ে। ক্ষার তৈরি হয় কলাগাছের বাকল পুড়িয়ে। ক্ষার ব্যবহৃত হয় কাঁথা-কাপড় ধোয়ার কাজেও। গ্রামের লোকজন জানালো, এখনও করতকান্দির মানুষজন মুখ পরিষ্কার করে তামাক পাতা পুড়ে তার ছাই দিয়ে, গোসলের সময় গা ঘষে খড় দিয়ে, চোখে ব্যবহার করে হাতে বানানো কাজল। ঠোঁট কিংবা গাল রং করবার জন্যে পুঁইয়ের পাকা-লাল বিচি ঘষে দেওয়ার প্রচলন এখনও আছে। পায়ের গোড়ালি কেন ফাটে জানে না অধিকাংশ মানুষ; তবে জানে, পা ফাটলে গোবর লেপে দিতে হয়, কিংবা দিতে হয় খৈ-এর লেই।

কিছু নতুন প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে করতকান্দির মেয়েরা যা স্থানীয়ভাবে তৈরি। যেমন তারা কপালে দেওয়ার 'ফোঁটা' (টিপ) তৈরি করে কালো রঙের গাভীর দুধ, কেশুর গাছের রস, রান্নাঘরের ঝুলকালি এবং কালোবরণ মহিলার (মাতা) স্তনের দুধ একত্রে মিশিয়ে। এসব উপকরণ একত্রে মিশালে একরকমের কালো রঙ তৈরি হয়, এই রং মেয়েরা বিশেষ করে কিশোরী-যুবতীরা কপালে ফোঁটা দেয়। একে বলে 'সোহাগ ফোঁটা'। চালের গুঁড়োর সাথে সাদা পুঁইয়ের রস মেশালে একরকম রং তৈরি হয়, তা দিয়ে বাড়ির আঙিনায় কিংবা ঘরের দেয়ালে আলপনা আঁকে মেয়েরা। মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করলে কেউ খৈল দেয়, কেউ দূর্বাঘাস বেটে দেয়।

প্রচার মাধ্যমে খাবার স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি বহুদিন থেকে বহুবার বলে দেওয়া সত্ত্বেও গ্রামের অধিকাংশ গরিব পরিবারের মানুষই জানে না কী করে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানাতে হয়। এ ব্যাপারে তারা তেমন উৎসাহী নয়। পেট ফাঁপলে তারা আদার রস খায়, পেট ভালো রাখবার জন্যে চিরতার রস খায়, শরীরের কোনো জায়গা কেটে গেলে দুর্বাঘাস কিংবা গাঁদাফুল গাছের পাতা বেটে লাগায়, পেট ব্যথা করলে প্রাথমিক পর্যায়ে হলুদ গুঁড়ো ও পরবর্তীকালে ব্যথা আরও বেড়ে গেলে সোডা খায়।

গ্রামে কোনো এমবিবিএস ডাক্তার নেই, আছেন দুজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত চিকিৎসক। কোনো সাধ্যবান পরিবারে ডাক পড়লে 'বড়ি' লিখে দেন তারা, কিন্তু গ্রামের দুঃস্থ পরিবারগুলোতে এখনও চলছে সেই ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তুম্বা, পানি-পড়া। অধিকাংশ মাতা সন্তান প্রসব করেন গ্রামের নিরক্ষর প্রশিক্ষণহীন দাইয়ের হাতে। নাড়ি কাটার জন্যে ব্যবহৃত হয় বাঁশের চাটাই, খুব বেশি হলে ব্লেড।

তথ্যশূন্যতায় রয়েছে মানুষজন

AMARBOI.COM

গ্রামের ১৩৯টি পরিবারের মধ্যে টেলিভিশন সেট রয়েছে ৪টি, কিন্তু প্রচারিত সংবাদ—বাংলা কিংবা ইংরেজি—শোনেন খুব কম লোক। রেডিওর খবর শোনেন খুব জোর বিবিসি, ভোয়া; তা-ও হাতেগোনা কয়েকজন এবং তা অনিয়মিত। রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত সংবাদ বুলেটিনের ওপর শিক্ষিতদের আস্থা নেই বলে জানালেন অনেকে। গ্রামে মাত্র দুখানা দৈনিক পত্রিকা যায় ঢাকা থেকে প্রকাশের ৩/৪ দিন পর। বর্ষা মৌসুমে ৬/৭ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। পত্রিকার পাঠক বিভিন্ন হাতবদলের পরেও ১০ জনের বেশি নয়। এরা আবার পাঠক হিসেবে অনিয়মিত।

বিরাট তথ্যশূন্যতা। দেশ-দুনিয়ার কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, রাজধানী এমনকি পাবনা শহরে কোথায় কী ঘটছে, এসব ব্যাপারে তেমন খোঁজখবর রাখেন না গ্রামের সাধারণ মানুষ। এ ব্যাপারে উৎসাহীও নন। দেশের অসংখ্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৪/৫টি দলের নাম এবং সেগুলোর নেতার নাম বলতে পারেন অপেক্ষাকৃত সচেতন কিছু মানুষ : শিক্ষক, কলেজ ছাত্র, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য, ক্ষুদ্র সরকারি কর্মচারী এঁরা। কিন্তু মহিলারা অধিকাংশই অন্ধকারে।

মহিলারা মনে করে, কী লাভ এসব খবর-সবর রেখে! জীবনসংগ্রামে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। যেমন দিনমজুর সাবেরের স্ত্রী আমেনা। ৯ সদস্যের পরিবারে অন্ন জোগানোর কারণে স্বামীকে সাহায্য করবার জন্যে সে বেরিয়ে এসেছে ঘরের চৌহদ্দি থেকে বাইরে। উপার্জন করছে সে। কিন্তু তবু অভাব যায় না। একটি মাত্র শাড়ি তার, গোসলের পরে শরীরেই শাড়ি শুকায়। তার ছেঁড়া ব্লাউজ একখানা থাকলেও সায়া নেই। তার কোনো প্রসাধন নেই, চিত্তবিনোদন নেই, বাড়তি সাধ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্লাদ নেই। নেই তার দেশ-দুনিয়ার খবর রাখার সময় এবং প্রয়োজন। সে জানে না দেশের রাষ্ট্রপতি কে, তাকে দেখেনি কোনোদিন। সে জানে না চেনে না শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া কিংবা অন্য কোনো দলের নেতা-নেত্রীকে। ... শুধু আমেনা নয়, আরও অনেকেরই এ ব্যাপারে অনীহা। যেমন একজন স্কুল-শিক্ষকের স্ত্রী, সংসারের শতেক কাজে দিনমান ব্যস্ত, মাথার ওপর দুটি বিবাহযোগ্য মেয়ের চিন্তা, তেমনি 'ভালো ছেলের খোঁজ কোথায় পাওয়া যায়' কিংবা 'সেই ছেলের ডিমান্ড কত হতে পারে'—এসব খবর রাখেন বটে, কিন্তু এসব ব্যাপারে আদৌ জানতে আগ্রহী নন যে, দেশের কোথায় কারা কিভাবে নারীমুক্তির আন্দোলন করছেন। নারী নির্যাতন কিরকম ঘটছে, নির্যাতন প্রতিরোধে কার কী ভূমিকা, তারা কোন্ সংগঠনের কে, এসব কোনো ব্যাপারেই জানেন না তিনি। জানতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। বরং বলেন, 'আমরা কী করব বাবা, আপনেরাই ওসব খোঁজখবর রাখেন। আমাদের খবর-সবর কে নেয়, কন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজস্ব রিপোর্ট

মোনাজাতউদ্দিন

নিজস্ব রিপোর্ট

উৎসর্গ

বজলুর রহমান

শ্রদ্ধাভাজনেষু

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

স্যুট ও সফর

ঢাকার বাইরে কাজ করে কিংবা 'কর্মরত সাংবাদিক' নয় এমন কারও সাধারণত বিদেশ গমন হয়ে ওঠে না। তা-ও আবার রাষ্ট্রপতির সাথে। সে এক ভীষণ আশ্চর্য ব্যাপার। বিকৃত এবং তাচ্ছিল্যের উচ্চারণে যে যুবকটি কোনো কোনো উন্নাসিক সাংবাদিকের কাছে 'মফস্বল করসপানডেন্ট', সে তো ছেঁড়া পাজামা-পাঞ্জাবি আর ক্ষয়ে যাওয়া স্যান্ডেল পরে 'মফস্বল' শহর কিংবা গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। তার পকেটে থাকবে পরিচয়পত্র, বগলে কাগজ ঠাসা ডায়রি, কাঁধে লম্বা করে ঝোলানো অল্পদামী ক্যামেরা একখানা। কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ বর্ষিত হলে পাবে সে কিছু লাইনেজ বিল, ছবির জন্যে টাকা, সেই সাথে খুব হলে লেখনীভাতা সামান্য। তাছাড়াও আছে কেউ, যারা টাকা পয়সা তো নয়ই, পায় না খবর লেখার প্যাড-খাম, এমনকি পত্রিকার এক কপি সৌজন্য সংখ্যা পর্যন্ত। গ্রাম পর্যায়ে কাজ করে এমন সাংবাদিকের সাধারণ চিত্র এ রকম-ই। হালে অবশ্য এ পরিস্থিতির মৃদু উন্নতি ঘটেছে। কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক থেকে জেলা পর্যায়ে নিয়োগ করা হয়েছে কিছুসংখ্যক স্টাফ রিপোর্টার। তারা ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন-ভাতা পায়, কাউকে দেওয়া হয় প্রতিমাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের কিছু টাকা। টেলিফোন তো আছেই, বেশ কয়েকটি জেলা শহরে ফ্যাক্স-সুবিধা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি (প্রয়াত) জিয়াউর রহমানের সময়কার কথা। তখন রাজশাহীতে বন্যা পরিস্থিতির ওপর কাজ করছি। একটানা একমাস ধরে দৈনিক ১২/১৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে করতে শরীরের অবস্থা কাহিল, কাপড়-চোপড় দারুণ নোংরা হয়ে গেছে, স্যান্ডেলের ক্ষয়ে যাওয়া তলায় একাধিক তালি, এই সময় হঠাৎ এক সকালে 'সংবাদ' থেকে সন্তোষদার টেলিফোন মেসেজ পৌঁছুল এক বন্ধুর কাছে। 'মোনাজাতকে আজই ঢাকা রওনা দিতে বলুন।'

ব্যাপারটা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষদা তখন বার্তা সম্পাদক। তাঁকে মেলাই। কিন্তু সে-সময় মাইক্রোওয়েভ গোলযোগ এমনই যে, সে ভীষণ এক সাঁই-সাঁই বোঁ-বোঁ শব্দ, কারও কথা কেউ বুঝতে পারি না।

লাইন কেটে যায়।

আবার কল বুক করি।

সেই একই ব্যাপার।

এভাবে পাঁচবারের মাথায় হাল ছেড়ে দিয়ে চলে আসি আস্তানায়। ব্যাগপত্তর গুটিয়ে ঢাকার পথে। মাথার ভেতর টগবগানি, হঠাৎ জরুরি তলব?

সংবাদ অফিসে ঢুকেই শুনি, যেতে হবে সিঙ্গাপুরে! রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় সফরে সে দেশে যাচ্ছেন, থাকবেন বেশকিছু সফরসঙ্গী, তাঁদের মধ্যে কজন সাংবাদিক এবং এদের কজন আবার ঢাকার বাইরের। কথিত 'মফস্বল সাংবাদিকরা' কি জাতে উঠেছে!

আমার অবশ্য অনুভূতি তখন অন্যরকম। রাজশাহীতে পদ্মা ফুঁসে ওঠা বানে ভাসা হাজারো নর-নারী, শিশুর মধ্যে ছিলাম কয়েক ঘণ্টা আগে, কানে এখনও বাজে নদীর ভাঙনে নিরাশ্রয় মানুষের আহাজারি, ত্রাণবঞ্চিত মানুষের অভিযোগ, ক্ষুধার্ত শিশুটির কান্না, সর্বস্বান্ত মায়ের মুখে একখণ্ড বস্ত্রের আবেদন, প্রমত্তা পদ্মার পানির তোড়ের মাঝেও কলাগাছের ভেলায় চড়ে কোনোমতে শুধু বেঁচে থাকার আকুতি আর সেইসব ছেড়ে এখন চলে যাবো জৌলুস ও প্রাচুর্যের এক দেশে!

না না করে উঠি। কিন্তু আহমদুল কবির সাহেবের কামরায় ঢোকার পর সবকিছু গুলিয়ে যায়। ব্যাপারটা স্বভাবগত। তবু মিনমিনে কণ্ঠে কিছু বলি, কিন্তু পা, গলা এবং বুকের কাঁপুনি আরও বেড়ে যাওয়ার তুঙ্গ অবস্থায় কবির সাহেব বলে ওঠেন, 'হাতে সময় কম, তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট করে নিয়ে এসো। যাও—'

পাসপোর্ট করতে যাওয়ার গরজে নয়, ধমকের মতো নির্দেশের তোড়ে 'আচ্ছা যাচ্ছি' বলে দ্রুত বেরিয়ে আসি তাঁর কামরা থেকে। সাংবাদিকতার কাজে এদেশের বহু বাঘ এবং বেড়াল স্বভাবের মানুষ 'ফেস্' করেছি আমি, কিন্তু এক আমার পিতা এবং দ্বিতীয়জন এই আহমদুল কবির সাহেব, এ দুজনের সামনাসামনি হলে কি কারণে যে গায়ে কাঁপুনি ধরে, জিহ্বা হয়ে ওঠে পাথর-ভারী, এটা নিজের কাছে নিজের রহস্যের প্রশ্ন।

পাসপোর্ট অফিসে একটা টেলিফোন গেল 'সংবাদ' থেকে। মনে হলো বজলু ভাই বাহাউদ্দিন সাহেবের সাথে কথা বললেন। এদিকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের ডার্করুম থেকে প্রসেস হয়ে এলো পি পি সাইজের ছবি। আমি আর হিসাব বিভাগের মহিউদ্দিন (এখন সংবাদে নেই) পাসপোর্ট অফিসের এক কর্মকর্তার কামরায় ঢুকতেই হাসিমুখের অভ্যর্থনা মিলল, চা মিষ্টি এলো, দশ মিনিটের মাথায় হাতে এলো একখানা 'গেটিস্' পাসপোর্ট। ইস্যু রেজিস্ট্রারে সই নেওয়ার সময় বাঁকা চোখে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলেন মধ্যবয়স্ক করণিক। ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা অতি-দীর্ঘ ভাঙা চেহারার লোকটির সাথে কল্পনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাংবাদিক' কোনোভাবেই মেলে না বুঝি! তিনি কথা বলেন না, কিন্তু চোখে-মুখে ঝুলিয়ে রাখেন এমন একটি প্রশ্ন : এ আবার কোন্ ধরনের সাংবাদিক রে বাবা! এ-ই আবার যাবে প্রেসিডেন্টের সাথে বিদেশে!

পাসপোর্ট যেমন পাওয়া যায় অল্প সময়ে, তেমনি মেলে ফরেন কারেন্সি। প্রয়োজনীয় কিছু গাইড লাইন যেন উড়ে চলে আসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। আমি কিছু টাকা ধার করে নতুন কাপড় কেনার কথা ভাবি, কেননা হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়, কাপড় কিনে দর্জির দোকানে যাওয়ার ফুরসত কিছুটা আছে বটে, কিন্তু সেগুলো সেলাই করার সময় সত্যিই নেই। ঠিক এই সময়ে তাজুল ইসলাম সাহেবের বার্তা এসে পৌঁছায় : রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গীদের অবশ্যই স্যুট পরে যেতে হবে।

কী এক মুশকিল! এই সময়ে আবার স্যুট পাব কোথায়?

কেউ কেউ বলেন, 'অসুবিধা কী, নাহয় আর্জেন্ট চার্জ দিয়ে বানিয়ে নিন একখানা।' কিন্তু টাকা? আর তা-ও নাহয় আমাদের ক্যাশিয়ারের কাছে হাত পাতা গেল, বেতন পেলে শোধ করা যাবে, কিন্তু এই অল্প সময়ে স্যুট বানাবে আলাদিনের চেরাগ পাওয়া কোন্ দর্জি? না, এ অসম্ভব।

রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী যারা হবেন তাদের তালিকা আমার হাতে। টেলিফোনে কথা বলি তাদের একজনের সাথে। তিনিও এক সাংবাদিক। প্রায়শই হিল্লি-দিল্লি করেন। জানালেন, স্যুট সম্পর্কিত তাজুল সাহেবের মেসেজটি তিনিও পেয়েছেন এবং তিনি 'রেডি'।

আমি এখন কী করি বলুন তো? আমার প্রশ্ন এবং তারপরে আমার একখানা স্যুট নেই শুনে তিনি এমন বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, যে ঘরের ভেতর বসে কথা বলছেন তার ছাদ বুঝি মাথায় ভেঙে পড়তে যাচ্ছে তার। 'আপনার তাহলে স্যুট নেই! যাবেন কী করে তাহলে! ইস!' আমি অসহায়ের মতো টেলিফোন ছেড়ে দিই। তাকে কী করে বোঝাবো যে, এরকম পরিস্থিতির জন্যে আদৌ আমি তৈরি ছিলাম না। আর আমি বহু বছর ধরে কাজ করছি গ্রাম-গ্রামান্তরে, কখনো জেলা শহরে, পরি পাজামা-পাঞ্জাবি প্যান্ট-শার্ট, সেখানকার জীবনযাত্রা এবং পেশাগত পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে স্যুট বানিয়ে ব্যাগে রাখবার প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত একমাস ধরে আমি বাড়ির বাইরে, বন্যাদুর্গত এলাকায় ট্যুর করছি ...

ব্যাপারটা কবির সাহেবের কানে যায়। গ্রাম পর্যায়ে কাজকরা একজন সাংবাদিকের আবার সঙ্গে স্যুট রাখবার প্রয়োজন কী, এরকম সত্যটি তার কাছে সহজ এবং সেই সহজ ভঙ্গিতেই তিনি খবর পাঠান : 'মোনাজাতকে আমার বাসায় চলে যেতে বলো।' তাঁর একখানা স্যুট নিশ্চয়ই আমার গায়ে লাগবে।

কিন্তু না, হয় না। দৈর্ঘে ঠিকই আছে বটে, কিন্তু যেটাই পরি হয়ে যায় কোমর ঢোলা। বোতাম লাগালে আপনাআপনি খুলে পড়ে। বেল্ট বাঁধি। সামনের দিকে বিশ্রী রকম ফুলে ওঠে। না, এতে চলবে না। একটি শার্ট এবং টাই বেছে নিয়ে ইন্দিরা রোড ধরে হাঁটা দিই ঘামে ভেজা শরীরে। প্রচণ্ড টেনশনের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব অসহায় বোধ হচ্ছে। মাথায় নানারকম চিন্তার ঝড়। সবকিছু গুছিয়ে আনবার পর কেবল একখানা স্যুটের অভাবে সফর বাতিল করতে হবে! অফিসে, আত্মীয়স্বজনের বাসায় এমনকি বন্ধুদের কাছে পর্যন্ত খবর পৌঁছে গেছে যে মোনাজাতউদ্দিন প্রেসিডেন্টের সাথে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে। 'কনগ্রাচ্যুলেশন' আর ওদেশ থেকে কার জন্যে কী কী আনতে হবে সেই ফর্দে পকেট ইতোমধ্যে ভর্তি-প্রায়। কারও জন্যে সিগারেট, কারও শৌখিন ছাতা, ছেলেমেয়েদের খেলনা-পুতুল, এটা-ওটা, কাপড়, তেল, সাবান, সুগন্ধি, ঘড়ি, হুইস্কির বোতল, মায় জুতা-স্যান্ডেল পর্যন্ত কিনে নিয়ে আসার আব্দার বা অর্ডার। ... পাসপোর্টের ভেতরে মাত্র পঁয়তাল্লিশ ডলার, কিন্তু সবাই বলছেন, 'নিয়ে আসেন, পয়সা দিয়ে দেব।' এইসব জ্বালাতন ছাপিয়েও যে টেনশনটি কাজ করে তা হলো, এখন কোনো কারণে সফর বাতিল হলে তা বোধকরি ভীষণ লজ্জা বা অপমানের হয়ে যাবে। হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকি। তারপরও এটাই বাস্তব, আমাদের একশ্রেণীর মানুষ এবং সমাজ মানসিকতা এমনই যে, একটি স্যুটের কারণে রাষ্ট্রপতির সাথে বিদেশ-ভ্রমণ হয় নি শুনলে পরে তা অনেকের কাছে হয়ে উঠবে যেন নিতান্তই প্রহসনের ব্যাপার। এইসব ভেবেচিন্তে একসময় আমার এমন মনে হতে থাকে যে, নিশ্চিতভাবেই স্যুটের মতো মূল্যবান পোশাক এই সভ্য সমাজে অত্যন্ত জরুরি এবং অতি প্রয়োজনীয় প্রচ্ছদ-পরিচ্ছদ। স্তরবিশেষে এটা না হলেই চলে না। ... পাশাপাশি, এরকম বাস্তব চিন্তাও পেয়ে বসে যে, এখন সফর বাতিল হয়ে যাওয়া মানে একটি পত্রিকা-প্রতিষ্ঠানের প্রেস্টিজ ইস্যু। আমার কর্মক্ষেত্র, কালো-ভাঙা দরিদ্র মানুষ, নিরানন্দ গ্রাম-জীবন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর দুমুঠো খাবারের জন্যে আকুলি-বিকুলি, এইসব ছাপিয়ে অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো বড় হয়ে দেখা দেয়, রাষ্ট্রপতির সাথে বিদেশ সফর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লোভনীয় ব্যাপার।

এবং আমাকে যেতেই হবে।

আজ রাতের মধ্যে একটি স্যুট আর স্যুটকেস আমাকে ম্যানেজ করতেই হবে।

কাল দুপুরে ফ্লাইট।

না, পাচ্ছি না।

জুতা পাওয়া গেল।

শার্ট-টাই।

ঘড়ি।

একটি স্যুটকেস।

কিন্তু স্যুট এখনও মিলল না।

হঠাৎ করে রাত এগারোটার দিকে স্যুটের আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, এক বন্ধু খবর দিলেন; 'স্যুট ইনশা আল্লাহ ম্যানেজ হয়ে যাবে। এক্ষুনি চলে যাও হারুন হাবিবের বাসায়। হারুন প্রায়ই প্রেসিডেন্টের সাথে বিদেশে যায়, এবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে না। তা ও তো তোমার মতোই লম্বা, গড়নও একই রকম, নিশ্চয়ই ফিট্ হয়ে যাবে।'

হারুন হাবিব, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চৌকশ রিপোর্টার, মুক্তিযোদ্ধা, আগে ছিলেন অন্য একটি সংবাদ সংস্থায়, স্বাধীনতার পর বাসস-এ। এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বহুবার বহু দেশে গেছেন নিউজ কভার করার জন্যে। তিনি আমার অতি অন্তরঙ্গ, বিশেষ করে বগুড়ায় নীহারবানু হত্যা মামলার বিচারের সময় একটানা দেড়মাস দুজনে একই কামরায় ছিলাম, তাতে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে যায়।

তৎক্ষণাৎ হারুন হাবিবকে টেলিফোন। অফিসেই ছিলেন। বিস্তারিত বলার প্রয়োজন হলো না, 'রাষ্ট্রপতির সফর আর স্যুট' এটুকু শুনেই তরুণ গল্পকার-নিবন্ধকার ও সমাজসচেতন হারুন খুব অন্তরঙ্গকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন তার বাসার ঠিকানা। বললেন, 'আমি এক্ষুনি বাসায় চলে যাচ্ছি, আপনি সোজা চলে আসুন।' গভীর রাতে, রাজধানীর প্রায় ফাঁকা রাস্তা ধরে রিকশা ছুটে চলে হারুন হাবিবের বাসার দিকে।

... আরও অনেক রাতে ভাত খাওয়ার পর হারুন হাবিব আমাকে ডেকে নেন তার বেডরুমে। দীর্ঘ মলিন এবং অসংখ্য ভাঁজ পড়া খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি খুলে ফেলি। গায়ে খাপ খাবে কি খাবে না এরকম টেনশনে দ্রুত চাপিয়ে দিই শার্ট প্যান্ট কোট ইত্যাদি। নিজ হাতে টাই বেঁধে দেন সফর-অভিজ্ঞ সাংবাদিক-বন্ধু। তারপরে টেনে নিয়ে যান আপাদমস্তক দেখা যায় এমন একটি আয়নার সামনে। এদিকে-ওদিকে একটুখানি টেনেটুনে বলে ওঠেন, 'ওহ্! ফাইন! খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে!' ... তারপর ইংরেজিতে যা উচ্চারণ করলেন তার অর্থ হলো, ' ... কামনা করি আপনার এ সফর সুন্দর এবং আনন্দময় হোক।'

দেয়ালঘড়িতে তখন রাত দেড়টা। পূর্ণ আরশির সামনে দাঁড়িয়ে আমি হাসছি। হারুন হাবিবের কাছ থেকে ধার করে গায়ে চাপানো এই নতুন পরিচ্ছদে আমি এখন আমাকেই চিনতে পারছি না। মনে হচ্ছে আপাতত আমি এক সামাজিক অদ্ভুত জীব, আজ এদেশে আছি, কাল উড়ে চলে যাব অন্যদেশে, কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় শপিং করব, স্যুটকেস এবং হ্যান্ডব্যাগ ভরাব, পাঁচতারা হোটেলে থাকব, আয়েশের বিছানায় ঘুমাব, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার করব, মদ্য পান করব, কালচারাল প্রোগ্রামে যোগ দেব, তারপর একদিন ফিরে এসে 'সিঙ্গাপুরে যা দেখলাম', কিংবা 'সিঙ্গাপুরে কয়েকদিন' বিষয়ক ধারাবাহিক রচনা লিখব।

আমি আবারও হাসি।

কোথাও কোনো ভাঁজ কিংবা খুঁত থাকল কি-না ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখি।

এবং অট্টহাস্য করে উঠি। সেই হাসি আরও বেগবান করবার জন্যেই বুঝিবা, কিংবা হতে পারে নির্মম কৌতুক পরিহাসে আমাকে বিদ্ধ-জর্জরিত করার জন্যে রাজশাহীর পদ্মা চরের একপাল অনাহারক্লিষ্ট এবং প্রায়-উলঙ্গ নর-নারী শিশু তাদের ক্ষুধার কান্না ভুলে যায়, ভুল করে হা হা হেসে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২
প্যাকেট

এই কয়েক বছর আগেও 'মর্স' সিস্টেমে আমাদের প্রেস টেলিগ্রাম ঢাকায় যেত। টরে-টক্কা। রাত আটটার পর বন্ধ হয়ে যেত টেলিগ্রাম অফিস। টেলিফোন কল বুক করলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হতো পাবলিক কল অফিসের সামনে পাতা বেঞ্চে। লাইন মিললেও সে কী প্রচণ্ড চিৎকার করতে হতো! যেন গলা ফেটে যায়, আশপাশের চা-পান দোকানদার, পথচারী, এরা চারিদিকে মজমার মতো ভিড় জমিয়ে তুলত। কারও বাসা থেকে কল বুক করলে বারংবার রিমাইন্ডার, অপারেটরকে হাতে পায়ে ধরার মতো অনুনয়-বিনয় তারপর যখন অনেক রাতে লাইন মিলল, নিউজ প্রেসে পাঠানোর সময় তখন আর নেই। কখনো কপালগুণে সকাল-সকাল লাইন পেয়ে গেলে হয় 'ওয়ান সাইডেড' হয়ে গেছে, কিংবা লাগানো হয়েছে নষ্ট কড। এমন চিৎকার করতে হতো যে শিশুদের ঘুম ভেঙে যেত, কান্না-চিৎকার শুরু করে দিত তারা। পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই ছুটে আসতেন হেরিকেন হাতে, কেউ ডাকাত পড়েছে ভেবে রড-লাঠি নিয়েও ছুটে আসতেন। ... আজকের যেসব তরুণ সাংবাদিক-বন্ধু জিরো-টু ঘোরাতেই এন. ডব্লিউডি সিস্টেমের মাধ্যমে ঢাকার লাইন পেয়ে যান, কিংবা খবর পাঠান ফ্যাক্সে, তারা কল্পনাও করতে পারবেন না যে জেলাশহরের সাংবাদিকদের কি-রকম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে দুদশক আগে। এমনও সময় গেছে যে, একটানা দশ-বারো দিন টেলিফোন লাইন অকেজো থেকেছে, টেলিগ্রাম গেছে 'ডাকে'। লিড হবার মতো অনেক খবর বাসি হয়ে গেছে কিংবা পরে ছাপা হয়েছে ভেতরের পাতায়।

এখন অনেকগুলো কুরিয়ার সার্ভিস হয়েছে, আছে ডাক বিভাগের গ্যারান্টিড পোস্টাল সার্ভিস। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'প্যাকেট' ডেলিভারি হয়ে যায়। সন্ধ্যায় ছবি-প্রতিবেদন বুক করলে পত্রিকার টেবিলে পৌঁছায় পরদিন নয়-দশটার মধ্যে, পরেরদিন ছাপা হয়ে বেরোয়। কয়েকটি এলাকায় আছে বিমান-সুবিধা। ছবি পাঠানো যায় দ্রুত। চট্টগ্রাম, খুলনার মতো শহর বাদেও সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, বগুড়া এমনকি উত্তর সীমান্তের দিনাজপুর থেকেও ছবি বা স্টোরি ফ্যাক্সে চলে যাচ্ছে। অথচ কবছর আগে টরে-টক্কা, টেলিফোনে গলাফাটা চিৎকার আর নির্ভর করতে হতো ডাক বিভাগের ওপর। সে চিঠি, যার ওপর লেখা থাকত 'প্রেস ম্যাটার', ঢাকা পৌঁছুত ৪/৫ দিন পরে। কখনো আরও দেরি হতো। পোস্ট অফিসে সকাল-বিকাল ডিউটি করতেন সরকারের একটি গোপন-বিভাগের লোক, যাকে আমরা বলতাম 'সিআইডির লোক'। তিনি প্রেস-ম্যাটার লেখা প্যাকেটগুলো খুলে খুলে দেখতেন, কখনো কিছু টুকে নিতেন কিংবা কখনো আবার বগলদাবা করে নিয়ে যেতেন অফিসে বা বাসায়, পরদিন দিয়ে যেতেন। প্রকৃতপক্ষে কী কারণে প্রেস ম্যাটার খুলতেন তিনি, বুঝতাম না। আমি আজাদে পাঠানো প্যাকেটগুলোর ওপর প্রেস ম্যাটার লিখতাম না, বুক-পোস্ট না করে সাধারণ চিঠির মতো মুখ সেঁটে দিতাম এবং লাগাতাম ওজনমাফিক টিকিট। কিন্তু এতেও কাজ হতো না। দেখতাম প্রেস ম্যাটার লেখা না থাকলেও পত্রিকার নাম ঠিকানা দেখেই তা খোলা হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝামেলা এড়ানোর জন্যে কৌশলের ওপর কৌশল ধরলাম। ঢাকায় গিয়ে আজাদ অফিসের পাশের এক বাসায় লোকজনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললাম। খামের ওপর লেখা হতে থাকত সেই বাসার ঠিকানা। খামের ভেতর থাকত পত্রিকায় পাঠানো ছবি আর প্রতিবেদনের আলাদা একটি প্যাকেট। ঐ বাসার কলেজ-পড়ুয়া একটি ছেলে সরাসরি দুদু ভাইয়ের হাতে (তৎকালীন মফস্বল বার্তা সম্পাদক) প্যাকেটটি দিয়ে আসত। এই কৌশল অবলম্বনের পর লক্ষ করেছি, সিআইডির লোক আমার প্যাকেট আর খুলে পড়তে পারছেন না।

প্রথম প্রথম দুদু ভাইয়ের মনে সন্দেহ ছিল যে, 'প্যাকেটের ভেতর প্যাকেট' পদ্ধতিতে বোধহয় নিয়মিত পৌঁছবে না আমার প্যাকেটগুলো। ছেলেটি হয়তো গাফিলতি করবে। কিন্তু না, ঐ এক শুক্রবার বাদে প্রতিদিন সে প্যাকেট দিয়ে আসত। দুদু ভাই বলতেন আমাকে, 'আপনার মাথায় তো দেখি ভীষণ বদ বুদ্ধি!'

টেলিফোনে-টেলিগ্রামে অতি জরুরি খবরগুলো নাহয় অতিকষ্টে পাঠানো যায়, কিন্তু বড় প্রতিবেদন! ছবি! ফিচার! ডাক বিভাগ চিঠি পৌঁছুতে দেরি করে। সেক্ষেত্রে '৭৬ সালে 'সংবাদে' আসার পর ঠিক করি, হাতে হাতে প্যাকেট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শহর থেকে প্রতিদিন 'ঢাকার কোচ' ছাড়ে। পৌঁছায় বিকেলে বা সন্ধ্যায়। সেই বাসের যাত্রীর হাতে প্যাকেট দেব। দিনে দিনে পৌঁছে যাবে। আজকের পাঠানো খবর কিংবা ছবি ছাপা হয়ে যাবে কাল। ... এবং এই পদ্ধতিতে আমি '৭৬ থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত চৌদ্দ বছরে দেড় হাজারের মতো প্যাকেট পাঠিয়েছি। '৯০-এর পর থেকে প্যাকেট বহন করছে সুন্দরবন, পাইওনিয়ার, কন্টিনেন্টাল, ড্রিমল্যান্ডসহ বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিস।

এই যে হাতে হাতে প্যাকেট পাঠানো, একটা নয় দুটো নয়, এক শ দু শ নয়, প্রায় দেড় হাজার, তা নিয়ে আছে কত কথা-কাহিনী। ভাবি, বিষয়টি সরস হলে আলাদা করে এ নিয়ে হয়তো লেখা যেত। নেতা-নেত্রী, কর্মী, মন্ত্রী-আমলা, সাধারণ চাকুরে, শিল্পীসাহিত্যিক, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিক, এনজিওকর্মী, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এরকম বহু খ্যাত-অখ্যাত মানুষ প্যাকেট বহন করে নিয়ে গেছেন ২৬৩ বংশাল রোডের ঠিকানায়, কিংবা পরে ৩৬ পুরানা পল্টনে। ওঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের সাহায্য সহযোগিতায় বহু সাড়া জাগানো ছবি এবং প্রতিবেদন 'সংবাদে'র প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে এবং ছাপা হয়েছে ভেতরের পাতায়।

প্যাকেট পাঠানো এবং ঠিক সময়মতো তা 'সংবাদে'র বার্তা সম্পাদক সাহেবের হাতে যাতে পৌঁছায়, তার ব্যবস্থা করা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। গাড়ি ছাড়বার অনেক আগেই বাসস্ট্যান্ডে হাজির হতে হয়, পরিচিত হতে হয় যাত্রীর সাথে, কয়েক মিনিটে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় যাতে করে দূরপাল্লার ভ্রমণক্লান্তির পরেও একজন প্যাকেটবাহক 'সংবাদ' অফিসে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রংপুর থেকে প্যাকেট পাঠাতে বেগ পেতে হয় না খুব। আবাল্য পরিচয়ের শহর, বাসস্ট্যান্ডে গেলেই ৪৫-৫০ জন যাত্রীর মধ্যে অর্ধেকেই থাকে অতিপরিচিত। হয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, সংবাদের পাঠক, নয়তো চেনা-জানা। কিন্তু দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসব শহরে উপায় কী? হঠাৎ কখনো পরিচিতজনের দেখা মেলে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় অচেনা-অজানা যাত্রীর সাথে ভাব জমিয়ে তুলতে হয় এবং এক শ ভাগ নিশ্চিত হবার পর তার হাতে তুলে দিতে হয় প্যাকেট।

আমার কৌশল ছিল নানারকম। তার মধ্যে একটি হলো : ভোরবেলা বাসস্ট্যান্ডে গিয়েই চুপচাপ একদিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম, হাঁটা-ফেরা লক্ষ করতাম বিভিন্ন যাত্রীর। খুঁটিয়ে দেখতাম মুখ। তারপর অনেক যাত্রীর মধ্য থেকে একজনকে পছন্দ করে নিতাম। আমার হিসেব ভুল হতো না। কেননা '৭৬ থেকে '৯০ পর্যন্ত পাঠানো প্রায় দেড় হাজার প্যাকেটের মধ্যে ১টি মাত্র 'সংবাদ' অফিসে ডেলিভারি হয় নি। প্রতিটি প্যাকেট সন্ধ্যা থেকে খুব জোর রাত ১১টার মধ্যে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন বাহক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের খরচে। বাহক ছাত্র হলে তাকে রিকশা কিংবা স্কুটার ভাড়া দিয়েছি।

AMARBOI.COM

প্যাকেট বহনের কাজে আমার সবচেয়ে পছন্দনীয় ছিল ছাত্র। ওরা খুব সিনসিয়ার হয়, একবার কথা দিলে কথা রাখে। আর সাংবাদিক, সাংবাদিকতা, পত্রিকা অফিস, এসব ব্যাপারেও তাদের বেশ উৎসাহ-অনুসন্ধিৎসা রয়েছে। এ-কারণে উত্তরবঙ্গের যে কোনো শহরের বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে প্রথমে একজন ছাত্র খুঁজতাম। ব্যাপারটা একসময় এমন হয়ে গিয়েছিল যে, বয়স, হাঁটাচলা, কথাবার্তা, এসব মিলিয়ে আমি প্রায় মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারতাম, ছেলেটি ছাত্র কি-না!

তার সামনে গিয়ে আমিই প্রথম উচ্চারণ করতাম সালাম। প্রতিউত্তর মিলত এবং ছেলেটি তাকাতো অবাক চোখে। আমি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দিতাম। সে-ও করমর্দন করত।

: আপনি কি ছাত্র?

: হ্যাঁ। মৃদু মাথা নাড়ায় সে।

তার চোখে চঞ্চল প্রশ্ন, কে এই লোকটা? চেনা কি? কোথাও পরিচয় হয়েছিল অথচ এখন তা মনে নেই?

: আমি আপনার সাথে পরিচিত হতে চাই। আমার নাম ...। নাম-পরিচয় বলেই তার নাম, কোথায় বাসা, কোথায় পড়ছে, এসব জেনে নিই। বয়সে কম হলেও তাকে 'আপনি আপনি' সম্বোধন করি। ইচ্ছে করেই করি। ছেলেটি নিজেই তখন বলে ওঠে, আমি তো বয়সে আপনার ছোট, আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলুন।

এভাবে দ্রুত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। প্যাকেটের কথাটি আগে বলি না, বলি শেষে। তখন আর না করবার অবকাশ থাকে না এবং সে কথাও দিয়ে ফেলে, যেভাবেই হোক প্যাকেটটি সে সংবাদ অফিসে পৌঁছাবেই এবং হয়েছেও তা-ই। রাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোন করা মাত্র জানতে পেরেছি বার্তা সম্পাদক সাহেব, শিফট ইনচার্জ কিংবা সহকর্মী বন্ধু বলছেন, 'প্যাকেট পেয়ে গেছি আপনার।'

এই প্যাকেট নিয়ে বহু ঘটনা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পড়তে হয়েছে নানা বিব্রতকর অবস্থায়। যেমন একবার রাজশাহী অঞ্চলে বন্যা-পরবর্তী অবস্থা কভার করতে গিয়ে দেখলাম ত্রাণশিবিরে রেডক্রস (তখনও রেডক্রিসেন্ট হয় নি) যে শিশুখাদ্য বিতরণ করছে তা মেয়াদোত্তীর্ণ। পোকা কিলবিল করছে। টিনের গায়ে কাগজে ছাপানো লেবেল ছিল তাতে ছিল খাদ্য প্রস্তুতের সাল এবং কত বছর পর্যন্ত তা ব্যবহার করা যাবে। ঐ লেবেল, ছবি, প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিলাম প্যাকেটে ভরে। পরদিনই প্রথম পাতায় বিরাট করে ছাপা হয়ে এলো। পত্রিকা রাজশাহী শহরে পৌঁছানোর আগেই ঢাকার টেলিফোন নির্দেশে বন্ধ হলো ঐ পোকাধরা শিশুখাদ্য বিতরণ।

কিন্তু বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল ছবি-প্রতিবেদনের প্যাকেট বহনকারীকে নিয়ে। ঢাকা থেকে ফিরে এসে আমার ওপর খুব চোটপাট। 'আমারই হাতে আমার সর্বনাশটা করলেন আপনি?' আমি আর বলব কি! ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

আসলে উপায় ছিল না। প্যাকেট নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলে রেডক্রসেরই পূর্ব-পরিচিত স্থানীয় কর্মকর্তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তার হাতেই প্যাকেটটি দিই। তিনি বুঝতে পারেননি সে প্যাকেটের ভেতরে কী যাচ্ছে। রাতে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসেন তা সংবাদ অফিসে। পরদিন পত্রিকা খুলেই চক্ষু চড়কগাছ। রাজশাহীতে ফিরে ভীষণ ক্ষিপ্ত। শেষ পর্যন্ত আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন তিনি।

AMARBOI.COM

প্যাকেট পাঠাতে গিয়ে অপদস্ত হতে হয়েছে। সে ঘটনাটিও রাজশাহীর। বন্যা পরিস্থিতির ডে টু ডে রিপোর্ট টেলিফোনে পাঠাচ্ছিলাম কিন্তু হিউম্যান স্টোরিগুলো যাচ্ছিল প্যাকেটে। সাথে থাকত ছবি। সন্ধ্যায় ছবি প্রসেস হতো, রাত বারোটা কি একটা পর্যন্ত ফিচার লিখতাম, রাতেই প্যাকেট রেডি। পরদিন ভোরে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে পূর্ববর্ণিত কৌশলে প্যাকেটটি দিয়ে আসতাম বাহকের হাতে। একটানা একমাস এভাবে কাজ করেছি, প্রতিটি প্যাকেট সময়মতো 'সংবাদ' অফিসে পৌঁছেছে। নিয়মিত ছাপাও হয়েছে তা।

ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া থাকত। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় উঠি। প্যাকেট হাতে চলে যাই বাসস্ট্যান্ডে। সাড়ে ছটায় গাড়ি ছাড়ে। এই সময়ের মধ্যে বাহক খুঁজে বের করতে হয়।

একদিন কী কারণে এলার্ম বাজল না। ঘুম ভাঙতেই দেখি সর্বনাশ! সোয়া ছটা! আর মাত্র পনেরো মিনিট সময় হাতে! অথচ প্যাকেট যেটা যাবে তার ভেতরে আছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ছবি আর স্টোরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুটে বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। হাতে প্যাকেট। পাজামা পরবার সময় নেই, থাকে একমাত্র লুঙ্গিটি। পথে ছুটতে ছুটতে পাঞ্জাবি চাপাই গায়ে। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। গাড়ি ধরতেই হবে এবং ধরতে পারলে ইউনিভার্সিটি কিংবা আরও কিছুটা দূরে চলে যাব। চলন্ত অবস্থায় খুঁজে নেব যে-কোনো একজন বাহক। প্রচণ্ড টেনশনের সাথে এ-রকম একটা নিশ্চিত বিশ্বাসও ছিল।

আস্তানা থেকে বাসস্ট্যান্ড খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু কপাল মন্দ। রিকশার চেন পড়ল দুবার। তারপরেও যখন পৌঁছুলাম, দেখি বাসচালক ইতোমধ্যে ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছেন। একজন মালপত্র বাঁধছিল ছাদে, সে-ও দেখি পেছনের মই বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

বাসের চাকা একটুখানি এগুলো। আমি লাফিয়ে উঠে পড়লাম বাসের পাদানিতে। দরজার ডানপাশেই সিট, গাঁট হয়ে বসেছেন দুই ভদ্রলোক।

: আমি একজন সাংবাদিক। আমাকে কি একটুখানি সাহায্য করতে পারেন ভাই? এই প্যাকেটটা ... অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছবি ...

ইঞ্জিনের শব্দে নাকি অন্য কোনো কারণে 'সাংবাদিক' 'প্যাকেট' 'ছবি' এইসব কথা শুনতে পাননি তারা, শুধু কানে গেছে 'সাহায্য' শব্দটি এবং আমার কথা শেষ না হতেই আঘাত আসে। একজন ধাক্কা মারেন আমাকে। সামলাতে গিয়েও নিচে পড়ে যাই। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে আবার দ্রুত উঠে পড়ি। দুজনের একজন অপরজনকে বলছেন, 'দেখুন না কী অবস্থা! ব্যাটা জোয়ান যুবক, কাজ-কাম করে খেতে পারে না, বেগিং করছে! সাহায্য চায়!' অপরজন বলছেন, 'কী যে ভাই হয়ে যাচ্ছে দেশের অবস্থা!'

AMARBOI.COM

আমার ওসব শোনার সময় নেই। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। চলন্ত বাসে আবার লাফিয়ে উঠে পড়ি। টলতে টলতে যাত্রী সারির মাঝপথ দিয়ে সামনে পা বাড়াই। ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রও কি পাওয়া যাবে না?

: মামা, তুমি! যাচ্ছ কোথায়?

কণ্ঠ ভেসে আসে একেবারে শেষ সারির দিক থেকে। চোখ ফেলতেই দেখি আমার মামার এক ভগ্নিপতি। অর্থাৎ সম্পর্কে আমারও মামা। একটি কলেজের শিক্ষক। রাজশাহীতে একসময়ে দীর্ঘদিন কেটেছে ওদের বাড়িতে। আমি যেন অকূলে কূল পেলাম। যাত্রীদের বাক্স-পেটরা লম্বা পায়ে মাড়িয়ে চলে গেলাম তার পাশে। বেশি বলবার প্রয়োজন হলো না। 'আমাকে দাও ওটা, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব ক্ষণ' বললেন তিনি খুব সহজকণ্ঠে।

: মামা, অবশ্যই আজ রাতে এটা পৌঁছুতে হবে। অত্যন্ত জরুরি কিছু ছবি আছে। আমি তার হাত চেপে ধরি।

: বললাম তো মামা, আজকেই তোমার অফিসে পৌঁছে যাবে এটা। যাও, নেমে যাও ...

গাড়ি কাজলায় একটুখানি দাঁড়ালো। দুজন ছাত্র উঠল। আমি টুপ করে নেমে গেলাম। তবে তার আগে দরজার কাছে বসা যাত্রী দুজনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'জনাব, আমি ভিক্ষুক নই ... একজন সাংবাদিক। একটা অত্যন্ত জরুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যাকেট ঢাকায় পাঠানোর ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম ...। যা-ই হোক, ধন্যবাদ আপনাদের।'

গাড়ি ছেড়ে দিল। যাত্রীদ্বয়ের দুইজোড়া বিস্মিত চোখ সটাৎ করে সরে গেল সামনের থেকে। আমি ওদের পাল্টা আঘাত করতে চাইনি। শুধু ভুল ভেঙে দিতে চেয়েছি। চেহারা এবং পোশাকের এই দশায় ভিক্ষুক মনে করা অস্বাভাবিকও ছিল না। একটানা একমাস দিনে-রাতে পরিশ্রমে চোয়াল দেবে গেছে, বেশ কদিন দাড়ি কামানো হয় না। বিধ্বস্তপ্রায় শরীরে অতিপুরাতন লুঙ্গি আর ময়লা পাঞ্জাবি, ক্ষয়ে যাওয়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল এবং ঐ 'সাহায্য' শব্দটি শুনে যাত্রীদ্বয় তা-ই ভেবেছেন। তবে যুবক, যুব বেকারত্ব, সেই সাথে দেশ-সমাজের অবস্থা নির্ণয় এবং কাউকে ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে ফেলে দেওয়ার মধ্যে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের মতো আদৌ কিছু ছিল কি?

পরে কাউন্টার থেকে সিট নম্বর ধরে ওদের দুজনার নাম সংগ্রহ করলাম। টিকিট বিক্রেতার কাছেই পাওয়া গেল তাদের পরিচয়। রাজশাহী শহরেও ওরা বেশ পরিচিত। দুজনে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা।

আমি সব জেনেশুনে মনে মনে বলি, বাহ্! বেশ! এরাই তাদের বক্তৃতার বন্যায় কিংবা ক্ষমতার গদিতে বসে দেশের যুব-বেকারত্ব ও দারিদ্র্য সমাধান করবেন!

AMARBOI.COM

আমার সাংবাদিকতার জীবনের প্যাকেট কাহিনী দীর্ঘ-পুরু-ভারী। সেগুলোর মধ্যে আর একটি মাত্র বলব। সেই যে প্যাকেট, দেড়হাজারের মধ্যে একটিমাত্র, 'সংবাদে' পৌঁছেনি, তারই কাহিনী। নগরবাড়ি-আরিচা ফেরিতে বাস পেরুনোর সময় প্যাকেটটি যমুনাবক্ষে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

প্যাকেটটিতে অতি জরুরি একটি প্রতিবেদন ছিল। উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর লেখা। বজলু ভাইয়ের দেওয়া এক অ্যাসাইনমেন্ট। তিনি তখন বার্তা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। ... রিপোর্টটি ছিল ১২ স্লিপের। টেলিফোনে পাঠানো সম্ভব ছিল না। আর দরকারই বা কী! সকালে পাঠালে তো সন্ধ্যার পরপর পৌঁছে যাবে 'সংবাদে'র টেবিলে। ছাপা হয়ে আসবে পরদিন।

প্যাকেটটি পৌঁছুবে সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। কেননা সেটা বহন করছিলেন আমার অতিঘনিষ্ঠ একজন। একই পেশার মানুষ। উত্তরের একটি জেলাশহরের বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে তাকেই পেয়ে গেলাম প্রথমে। ঢাকা যাচ্ছেন তিনি। কিছু সওদাপাতি করবেন। সঙ্গে আছে তার এক কর্মচারী। সাংবাদিকতার পাশাপাশি আমার বন্ধুটি কিছু ব্যবসাও করেন।

কিন্তু প্যাকেটটি তিনি পৌঁছালেন না। এদিকে আমি প্রচণ্ড টেনশনে। রাত বাড়বার সাথে সাথে আরও বেড়ে যায় তা।

রাত আটটায় ফোন করি। না এখনও কেউ প্যাকেট দিয়ে যায় নি। আধঘণ্টা পর আবার ফোন। একই জবাব। গাড়ি কোথাও বিগড়াল নাকি? দুর্ঘটনায় পড়ল? বিআরটিসির বাসটি তো খুব বেশি হলে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কমলাপুরে পৌঁছে যাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা! ফোন করলাম কমলাপুর ডিপোতে। জানান হলো, ঐ গাড়িতো পাঁচটার আগেই এসে গেছে।

তাহলে এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন বন্ধুটির সংবাদে পৌঁছুতে? নানারকম চিন্তা। আবার অফিসে ফোন। দশটায়। সাড়ে দশটায়। এগারোটায় এবং সর্বশেষ রাত বারোটায়। না, প্যাকেট পৌঁছেনি। তাজ্জব ব্যাপার! কোনো প্যাকেট না-পৌঁছুনোর অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা উদ্বিগ্নতাই কাজ করতে থাকে যে, বজলু ভাইয়ের ধমক খেতে হবে। লেখা কিভাবে পাঠানো হলো, বাহক তা পৌঁছে দিলেন কি দিলেন না এসব কথা-কৈফিয়ত শুনবেন না তিনি। তিনি অ্যাসাইনমেন্টের লেখা হাতে চান।

হোটেলে ফিরে আসি। তথ্য-উপাত্ত নোটবুকে ছিল, আবার লিখে ফেলি সেই প্রতিবেদন। প্যাকেট তৈরি করি। পরদিন সকালে ঐ একই পদ্ধতিতে তা পাঠানো হয়। এবারে বাহক একজন ব্যবসায়ী। সন্ধ্যার আগেই প্যাকেটটি বংশালের ঠিকানায় পৌঁছে যায়। বড় শিরোনামে প্রকাশিত হয় পরদিন।

পরদিন ঐ শহর ছাড়ি। এক শহর থেকে আরেক শহরে। সেই বাহক-বন্ধুটির গাফিলতির কথা ভুলতে পারি না। কী এমন ঘটনা ঘটেছিল যে যথাসময়ে ঢাকা পৌঁছুনোর পরেও প্যাকেটটি তিনি দিয়ে আসেননি 'সংবাদে'? রাজধানীর পথে কি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিলেন? ব্যাগপত্র হারিয়ে ফেলেছিলেন? সিরিয়াস কোনো অসুখ? ব্রিফকেসের উপর দিকেই প্যাকেট রেখেছিলেন তিনি আমার সামনেই। ডালা খোলা মাত্রই চোখে পড়বার কথা। আর ঐ কর্মচারী ছেলেটি ওর সাথে ছিল, তাকেও আমি বলে দিয়েছিলাম ঢাকায় নেমেই যেন 'সাহেব'কে ঐ প্যাকেটের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মনে পড়ে, কর্মচারীটির সাথে কথা বলবার সময় বন্ধুটি বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনি তো দেখি খুব খুঁতখুঁতে? ওকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে নাকি'! ... তারপর হেসে বলেছেন, 'অত চিন্তা করবেন না। আমি যদি ঢাকা পৌঁছাই, ঠিকই পৌঁছে যাবে আপনার প্যাকেট।'

তবু পৌঁছুল না।

তবুও পৌঁছুল না। বন্ধুটির সাথেও আর দেখা নেই। অনেকদিন ঐ জেলাশহরে যাওয়া হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে তাঁর কথা মনে পড়ে। ঐ প্যাকেটটির কথা মনে পড়ে। কথা দেওয়া সত্ত্বেও কী কারণে পৌঁছাননি তিনি প্যাকেটটি। কত অচেনা-অজানা মানুষ প্যাকেট বয়ে নিয়ে গেছেন, একটিও হারায়নি, পৌঁছে গেছে ঠিকঠিক, কিন্তু একই পেশার মানুষ, আমার অতিঘনিষ্ঠ তিনি ...

সাত আট মাস পর কী একটা কাজে আবার ঐ জেলাশহরে গেলাম এবং গেলাম বন্ধুটির সাথে দেখা করতে। তিনি শহরের বাইরে। বিয়ে খেতে গেছেন। ফিরবেন কাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানের কর্মচারীটি কই? খোঁজ করি তার। নেই। মাস দুয়েক আগে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। পিয়নের চাকরি নিয়েছে একটা অফিসে।

কোথায়? কোন্ অফিসে? পাত্তা মিলল। গেলাম সেখানে। চিনল সে। কিন্তু তার চোখেমুখে কেমন যেন একটা ভাব। চঞ্চলতা, ভয়, অপরাধী অপরাধী চোখের চাহনি। কৌশলে প্রশ্ন করি তাকে। সরাসরি এবং অনুমাননির্ভর। মিথ্যাও থাকে। এটা-ওটা কথার পর ঐ বাহক বন্ধুটির নাম ধরে বলি, উনি বললেন প্যাকেটটা নাকি তোর হাতে দিয়েছিলেন, তুই হারিয়ে ফেলেছিস?

ঠিক জায়গায় আঘাত পড়েছে। চঞ্চল চোখে যেন আগুনের ফুলকি জ্বলে হঠাৎ। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে। 'এই কথা বলেছেন? আমি প্যাকেট হারিয়ে ফেলেছি?'

: তা-ই তো বললেন। বললেন তার দোষ নেই ... তুই-ই নাকি ...

কথা শেষ হয় না। একটি গালি উচ্চারিত হয়। 'মিথ্যা কথা বলেছেন আপনাকে।' মুখের পেশি লাফাতে থাকে তার। রাগে গা কাঁপছে। 'না, মিথ্যা কথা। আমার হাতে কখনো প্যাকেট দেয়নি। বরং ...'

: কী হয়েছিল তাহলে ... বল ...

: বরং আপনার ঐ প্যাকেট নিজেই উনি ফেলে দিয়েছেন নদীতে। আমরা যখন ফেরিতে নদী পার হচ্ছিলাম ... তখন ... জানালা দিয়ে ... ।

আর শোনার প্রয়োজন হয় না। ছেলেটার হাতে দশ টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে চলে আসি। শুধু বলি, এটা রাখ, চা টা খাস। ... আর একটা কথা, আমি যে তোর সাথে কথা বলে গেলাম তা যেন উনি না জানেন। একেবারে চুপ থাকবি।

ছেলেটি কী বুঝল জানি না। আমি তার দিকে চোখ বড় করে তাকাচ্ছিলাম। সে মাথা নাড়িয়ে ভয়-মেশানো কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা'।

বন্ধুটির সাথে পরে দেখা হয়েছে। স্বাভাবিক আচরণ তার। আমিও প্যাকেটটির প্রসঙ্গ তুলিনি। তিনিও বলেন নি কিছু। বরং সেই আগের মতো সমাদর করেছেন, চা-সিগারেট খাইয়েছেন, পেশাগত বিভিন্ন ব্যাপার বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে।

মানুষের জীবন যেমন জটিল, তেমনি জটিল রহস্যে ঘেরা তার মনোজগত। আমার পক্ষে এই কঠিন বিষয়টির বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। জানা সম্ভব নয় কী লুকানো আছে প্রত্যেকের মনের প্যাকেটের ভেতর।

কী কারণে তিনি, আমার ঐ বন্ধু, প্যাকেটটি যমুনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তা আজও আমার কাছে রহস্য।

মানুষের মনের কথা পড়বার মতো যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয় নি আজও।

৩

ক্ষুধা ও খাদ্য

এ এক বিচিত্র পেশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথের ধারে ধুলোয় লুটিয়ে কাতরাচ্ছে একজন বৃদ্ধ। তার অসংখ্য ভাঁজ পড়া পেটে ক্ষুধার হা। থির থির করে কাঁপছে দেহ। মোক্ অ্যাকনা খাবার দ্যাও বাহে, মুঁই নাতে মরি যাইতোচোঁ ...। আমি তখন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তার ছবি তুলছি। প্রচণ্ড টেনশন। এক্ষুনি প্রসেস করতে হবে ছবি। পাঠাতে হবে ঢাকায়।

লোকটা ভিক্ষুক নয়। মজুর। চিলমারী থেকে এসেছে একদার রঙ্গরসে ভরপুর রংপুর শহরে। আশা ছিল এখানে কাজ পাবে, খাবার পাবে। পায়নি। শেষে হাত পেতেছে, ভিক্ষে মেলেনি। সাহেব-বাবুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে, কিন্তু গৃহকর্তা 'মাফ' চেয়েছেন এবং সেই বৃদ্ধ মজুর, উপবাসী, অনাহারে থাকতে থাকতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, এখন জেলা প্রশাসন ভবনের রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে ধুলোর ওপর। আর আমি মূল্যবান একটি ক্যামেরায় তার ছবি তুলছি। কাল কিংবা পরশু এই ছবি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয়ে যাবে।

পীচঢালা রাস্তায় জনস্রোত। একের পর এক ছুটে যাচ্ছে কার জীপ বাস ট্রাক রিকশা। দাঁড়াবার ফুরসত নেই। তবু কেউ কেউ, পথচারী, দাঁড়িয়ে পড়ে পাশে। কঙ্কালসার বৃদ্ধের ওধারে দাঁড়ায় কেউ। দাঁতের পাটি বের করে। ইশারা করলে সরে না, ধমক দিতে হয়। একটু আগে হাসছিল, এখন অতি বিরক্ত সে।

ছবি তোলা শেষ হলে বৃদ্ধের কাছাকাছি যাই। ক্যামেরা গুটিয়ে ফেলেছি ইতোমধ্যে, এখন আমার হাতে নোটবুক। কলম। ওর সাথে কথা বলা দরকার। নাম ধাম জানতে হবে। পাঠক বস্তুনিষ্ঠ খবর চায়। সরকারও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের 'উপদেশ' দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে শুধু ছবি নয়, ছবির সাথে তথ্য-উপাত্ত চাই। লোকটা রহিম না করিম? যদু না মধু? বাড়ি কুড়িগ্রামে না গাইবান্ধায়? এই শহরে এসে পড়ল কিভাবে? কবে এলো? কী তার পেশা? সংসারে লোকসংখ্যা কত? কতদিন কাজ পায় না? উপোস করছে কতদিন?

দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি। জবাব মেলে না। বসে পড়ি ওর মাথার কাছে। কথা নেই, শুধু গোঙায়। একেবারে কানের কাছে মুখ নিই।

: কী নাম আপনার?

: মোক অ্যাকনা ভাত দ্যাও ...

: কোথায় বাড়ি? গ্রামের নাম কি?

: মুই মরি যাইতোচোঁ, মোক এ্যাকনা খাবার দ্যাও ...

: কত দিন ধরে আপনি অনাহারে?

: মোক বাঁচান ...

আমার সাবজেক্ট কোনোভাবেই প্রশ্নের জবাব দেয় না। কিন্তু আমি তথ্য জানতে চাই। পাঠক সঠিক তথ্য জানতে চান। আমাকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।

তবু কি সন্তুষ্ট তারা?

অনেকেই তর্ক জুড়ে দেবেন, এ হয়তো কোনো ভিক্ষুকের ছবি। পেশাদার ভিক্ষুক, এভাবে ভেক ধরেছে ভিক্ষের জন্যে। সরকারি মহল বলবেন, এ ছবি সাজানো। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পয়সা দিয়ে লোকটাকে পথের ধারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কেউ অনাহারে নেই। বাংলদেশে কেউ অনাহারে মরে না। এরকম ছবি ছাপিয়ে সরকারের 'ভাবমূর্তি' ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। পাত্তা লাগাও সাংবাদিকের। পত্রিকার বিজ্ঞাপন কমিয়ে দাও।

বৃদ্ধের ছবি তোলার এ অভিজ্ঞতা চুয়াত্তর সালের। বিরাশির। অষ্টআশির। নব্বইর। একানব্বইর। প্রায় প্রতিবছরের। আর সব বাদ থাকুক, প্রথম মৌলিক চাহিদাটুকু পূরণ করতে পারে নি কোনো সরকার। মানুষ মরছেই। তবে সবসময় সরাসরি অনাহারে মৃত্যুর কথা বলা যায় না। বলতে হয় 'ডায়রিয়া'। অপুষ্টি। খাদ্যাভাবজনিত অপুষ্টি।

বৃদ্ধের ছবি তোলার যে দৃশ্য-বর্ণনা, তা চুয়াত্তর সালের। কিন্তু ভোলা যায় না। কেননা এত বছর পর এখনও সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। একানব্বইতেও হয়েছে। সেই একই সুরে বলা হয়েছে মানুষের ক্ষুধা আর অসহায়ত্ব নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। সংসদে তর্ক জমে ওঠে উত্তপ্ত। আকাল না মংগা এই নিয়ে ঝড়। মানুষ ওদিকে মরতেই থাকে। তারপর একসময় পর্যাপ্ত খাদ্যসাহায্য আসে। ইতোমধ্যে আমন ধান কাটা-মাড়াই শুরু হয়ে যায়। ফিরে আসে মজুর পরিবারগুলোর খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা।

AMARBOI.COM

চুয়াত্তর। চলেছি চিলমারীর দিকে। সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। ইতোমধ্যে মারা গেছে বহু মানুষ। বস্ত্রাভাবে জাল পরে আছে বাসন্তি-দুর্গাতি। লাশ দাফন হচ্ছে কলাপাতায় জড়িয়ে। গাইবান্ধায় মানুষ মানুষের বমি চেটে খেয়েছে। রংপুরে ৫২ জন মেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় পতিতাবৃত্তিতে নেমেছে। চারদিকে উদ্বেগ। বিশেষ করে ইত্তেফাকের শফিকুল কবীর আর আফতাব আহমেদ চিলমারী ঘুরে যাবার পর যে ছবি আর প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, তাতে দেশবাসী উদ্বেগ-আকুল।

চিলমারীতে নামি। রমনা স্টেশনে শতশত মানুষ। থানা সদরে রিলিফের জন্যে দীর্ঘ লাইন। ভাঙা দেহ, শতছিন্ন বস্ত্র, কোটরাগত চোখ, হাতে হাতে সানকি। মাঠময় হৈ-হল্লা, কান্না, ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি। সবাই কিছু বলছে, কেউ কাতরাচ্ছে, কিন্তু বোঝা যায় না। শুধু গমগমে একটা ভারি আওয়াজ বাতাস যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে। লঙ্গরখানায় রান্না হচ্ছে খিচুরি। তারই একটি মুঠোর জন্যে হাজারো নর-নারী-শিশুর অপেক্ষা। লাঠি হাতে একদল স্বেচ্ছাসেবক, কিছু চৌকিদার, আনসার সদস্য, হিমশিম খাচ্ছে পরিস্থিতি সামলাতে।

খিচুরি রান্না শেষ। ডেকচি আসছে একের পর এক। উত্তেজনা আর চিৎকার তুঙ্গে ওঠে। ভেঙে যায় লাইন। লাঠির বাড়ি খেয়ে আবার ঘাসের উপর বসে পড়ে ক্ষুধার্ত মানুষ। বিচিত্র বাঁকা লাইন, সামনে মাটির থালি, টিনের থালি, কেউ কলাপাতা পেতেছে, কারও হাতে পাতিলের টুকরো, মগ, টিনের কৌটো। একজন তা-ও জোটাতে পারেনি, নিজের ছেঁড়া-বিবর্ণ শাড়ির আঁচলটিই সামনে মেলে ধরেছে। খাবার চাই।

আমি কথা বলতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় এদের বাড়ি? নাম কী? কে কতদিন খায় নি? রিলিফ কি পায় নি একটুও? কবে এসেছে লঙ্গরখানায়?

প্রশ্নের জবাব দিতে কেউ তেমন আগ্রহী নয়। সবাই মাথা উঁচিয়ে লক্ষ করছে ডেকচি বাহক ও খিচুরি পরিবেশনকারীর গতিবিধি। কতক্ষণে ওরা আসবে এদিকে! তর যে সং না। সেই সকাল থেকে অপেক্ষা। আসে আসে করেও খাবার আসে না। এদিকে বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। আর আমারও কেমন যেন বোধ হতে থাকে। প্রশ্নগুলো নিজের কানে বেঁধে, মনে হয় যেন প্রহসনের সংলাপ বলছি। ক্ষুধার সারিতে ওরা এখন এক। এদের আলাদা বাড়িঘর নেই, এদের আলাদা গ্রাম নেই, এদের আলাদা নাম নেই। এরা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের মানুষ। এরা সবাই অনাহারী। রহিম করিম যদু মধু এক হয়ে গেছে, মুসলমান-হিন্দু এক হয়ে গেছে, পুরুষ-মহিলা-শিশু এক হয়ে গেছে। ক্ষুধার রাজ্যের মানুষ এরা।

থানা প্রশাসনের সামনে বড় লাল সূর্য সাঁটা পতাকা উড়ছে। দমকা বাতাস উঠলে গোটা জমিন দৃশ্যমান হয়, আবার খুব অসহায়ের মতো নেতিয়ে পড়ে। আবার উড়ে। পতাকার তলে হাজারো ক্ষুধাতুর মানুষের চোখ, যদিও গর্তে ডোবানো কিন্তু তবু ঐ সূর্যের লালের মতো জ্বলছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কি মণি?

না, তা হয় না। বরং হঠাৎ একটি সারিতে হল্লা বেড়ে ওঠে। ভেঙে যায় শৃঙ্খলা। দীর্ঘ অপেক্ষা আর ভিড়-চাপে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এক বৃদ্ধ। লুটিয়ে পড়েছে ঘাসের উপর। তাকে ধরাধরি করে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এক স্বেচ্ছাসেবক লোটাভরা পানি এনেছে এবং বৃদ্ধের মাথায় ঢালছে।

AMARBOI.COM

ছুটে যাই। জটলা দুহাতে সরিয়ে বৃদ্ধের কাছে পৌঁছি কোনোরকমে এবং বাগিয়ে ধরি ক্যামেরা। একটার পর একটা শার্টার। মাথায় পানি ঢালার কাজে স্বেচ্ছাসেবকটি আরও তৎপর হয়ে ওঠে সামনে ক্যামেরা দেখে। সে দুহাতে ঠেলে ভিড় সরায়, জটলার মাঝখানে আয়তন বৃদ্ধি করে, তারপর লোটা হাতে নিয়ে বৃদ্ধের মাথায় পানি ঢালতে থাকে। তার চোখ ক্যামেরার দিকে থির। দাঁত বের করে হাসছে।

: ফটোক তোলা হইচে? কোন্ পেপারের রেপোটার তোমরা? মোক একখান ফটোক পাঠে দিবার পাইমেন?

মেজাজ বিগড়ে যায়। তবু শীতল থাকি। একেই দাঁত বের করে হাসছিল লোকটা, তার ওপর এখন আবার ছবি চায়! বদমাশ কোথাকার! দাঁত চেপে রাগ দমন করি। কিন্তু লোকটা এসব পাত্তা দেয় না বরং বৃদ্ধটিকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে কোথাও ছুটে যায়। আমি যখন আরও কয়েকটি ছবি তুলে বৃদ্ধের স্ত্রীর কাছ থেকে তার নাম ধাম পরিচয় শুনছি, টুকে নিচ্ছি, সে সময় ভিড় ঠেলে আবার সামনে উপস্থিত সেই লোকটা। তার হাতে একটুকরো কাগজ।

নাম ঠিকানা লিখে এনেছে সে। সম্ভব হলে এই ঠিকানায় যেন পাঠিয়ে দিই 'এক কপি' ফটোক। চিরকুটখানা পকেটে রাখি। সে আরও কাছে আসে। 'পাইসা কত দ্যেওয়া নাগবে, তাক যে কইনেন না!' সেই আগের মতো দাঁত বের করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসে সে। ... এবং এক টাকার কয়েকটি নোট দলা পাকানো অবস্থায় গুঁজে দেয় হাতে।

অন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি হলে নিশ্চয়ই লোকটা মার খেত। কিন্তু চিলমারীর ক্ষুধার রাজ্যে এসে আমি নিজেই বিহ্বল, স্বাভাবিকভাবেই আবেগ ভর করেছে, সারাদিন পেটে খাবার নেই, সে কারণে শারীরিকভাবেও দুর্বলবোধ করছি। চারদিকে অজস্র মানুষের ক্ষুধা-আহাজারি, ঠেলাঠেলি, ঘামের দুর্গন্ধ, সামনে অজ্ঞান এক বৃদ্ধ লম্বা হয়ে পড়ে আছে ঘাসের উপর। এই অবস্থায় কাউকে আহত করতে ইচ্ছে হয় না। শুধু চোখ বড় করে লোকটার দিকে কটমট করে তাকাই। ফিরিয়ে দিই টাকা। চাহনিতেই লোকটা ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা হাত বাড়িয়ে তা ফিরিয়ে নেয় এবং তৎক্ষণাৎ সরে যায় সামনে থেকে। বিড়বিড় করে কিছু বলে। বোঝা যায় না।

আরও কিছু ছবি তুলি। খিচুরি পরিবেশিত হচ্ছে। ক্ষুধার্তরা মুখে তুলছে গ্রাস। এক মা তার দুপাশে বসা দুটি শিশুর মুখে লোকমা তুলে দিচ্ছে। কেউ কেউ কলাপাতে জড়িয়ে খাবার বেঁধে নিচ্ছে আঁচলে। বাড়ি নিয়ে যাবে। সেখানে হয়তো এরকম ক্ষুধা নিয়ে অপেক্ষা করছে স্বামী কিংবা সন্তান।

ছবির পর ছবি। ক্ষুধা এবং খাদ্যের সিরিজ। এর কটিই বা ছাপা হবে! তবু তুলি। কপালের ঘাম চুয়ে পড়েছে চোখে। ভীষণ জ্বালা করছে। আস্তিনে চোখ ঘষি। জ্বালা আরও বেড়ে যায়।

AMARBOI.COM

কিন্তু শুধু চোখের জ্বালা নয়, কিছু অপমানও আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল যন্ত্রণা। ঐ যে বৃদ্ধ, ক্ষুধার জ্বালা আর ভিড়ের চাপে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, তার সর্বশেষ অবস্থা জানবার জন্যে ভিড় সরিয়ে আবার মাঠের ওধারে যাই। দেখি জটলা আছে আগের মতোই। তবে গুঞ্জন বেড়েছে, শুনতে পাচ্ছি কারও কান্না।

: সরেন তো দেখি।

পথ করে দেয় ভিড়ের মানুষ। কিন্তু থমকে দাঁড়াই। একখণ্ড কাপড় দিয়ে বৃদ্ধের মুখ ঢেকে দিয়েছে কেউ। আর তার পৌঢ়া স্ত্রী পাশে হুমড়ি খেয়ে বসে বিলাপ করছে। ক্ষুধা বুঝি চুষে শুষে নিয়েছে চোখের জল, সে শুধু গোঙাচ্ছে সদ্যমৃত স্বামীর পাশে। তার অস্পষ্ট অথচ কাতর সংলাপ : মোর এ কি হইল্ রে মোক্ ছাড়িয়া বুড়া কোনটে গেইলে রে। অর্থাৎ সে বলছে, এ কী হলো, আমাকে ছেড়ে বুড়ো (স্বামী) কোথায় চলে গেল।

মারা গেছে বুড়ো এবং মারা গেছে অত্যন্ত অসহায়ভাবে। কিছুক্ষণ আগে আলাপকালে শুনেছি গত দুদিন লোকটি নাকি কিছু খায়নি। গতরাতে এখানে এসেছে খাবার দেওয়া হবে শুনে। মাঠের ওপর শুয়েছিল। সকালে বসে লাইনে। খিচুরি পরিবেশন যখন শুরু হলো, সেই সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মারাও গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আমি ক্যামেরা তাক করি। কিছুক্ষণ আগে এই বৃদ্ধের ছবি তুলেছি। তখন ছিল অজ্ঞান। এখন সে মৃত। সেই মৃত ব্যক্তিটির একটি ছবি চাই।

ভিউফাইন্ডারে চোখ রাখি। সামনে লাশ। পাশে তার স্ত্রীর বিলাপ। মারাত্মক ছবি একখানা মোনাজাতউদ্দিন। শার্টার টেপো। তোমার কি হাত কাঁপছে?

কিন্তু না, তা নয়। আসলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল বৃদ্ধের মুখের ওপর বিছানো কাপড়ের টুকরো। ওটা সরিয়ে দিতে পারলে বুঝি আরও ভালো হতে পারত ছবিটা। সামনে এগোই। ঝুঁকে পড়ি সামনে। একটানে সরিয়ে দিই কাপড়খানা। লাশের চোখ খোলা। থির হয়ে আছে আকাশের দিকে।

কী হয় বুঝি না। মুখ থেকে কাপড়ের টুকরোখানা সরাতেই, প্রৌঢ়া জরিমন, ঐ বৃদ্ধের স্ত্রী, হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। প্রায় লাফিয়ে আসে আমার সামনে, একেবারে কাছাকাছি। মুহূর্তে টান মেরে ছিনিয়ে নেয় কাপড়খানা, ফেটে পড়ে এবং বিচিত্র ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে বলতে থাকে 'কি উগ্‌লা বালের ফটোক তোলেন! কি হইবে ঐ ফটোক তুলি!' একটু দম নেয় দুর্বল মহিলা, যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তারপর আবার, এবার স্বগতোক্তি করতে থাকে, 'হামরা না খায়া মরি যাই আর ওমরা খালি ফটোক্ তোলে! খালি ফটোক্ তোলে!'

AMARBOI.COM

চুয়াত্তর থেকে বিরানব্বই। আঠারো বছর। এরই মধ্যে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পানি গড়িয়েছে অনেক। এক সরকার গেছে, এসেছে। এসেছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু সংকট কাটেনি। আশ্বিন-কার্তিকে দেশের উত্তর জনপদের অভাবী এলাকাগুলোতে কর্ম ও খাদ্যের যে অভাব তা দূর করবার মতো সন্তোষজনক ব্যবস্থা আজ গৃহীত হয় নি। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ কাতরাচ্ছে। মজুরির হার কুড়িগ্রাম গাইবান্ধার গ্রাম জনপদে ৪-৫ টাকা। শহরগুলোতে অপেশাদার ভিক্ষুকের চাপ। চালের দাম অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় কম, তবু তা কেনার মতো ক্ষমতা মজুর ও দুঃস্থ মাতা পরিবারগুলোর নেই। সরকারি গুদামে চাল-গম রাখবার জায়গা নেই সামান্য, অনেকস্থানে চাল পচে যাচ্ছে। এই অবস্থার পাশাপাশি বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে নীরব দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। একই ধরনের বিবৃতি দিয়েছেন গণতন্ত্রী পার্টির সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল (সংবাদ ১০-১০-৯২)। কর্মহীন মজুরদের জন্যে খাদ্যশস্য বরাদ্দের আহ্বান জানানো হয়েছে।

মানুষ এখনও মরছে। অনাহারে নয়, 'ডায়রিয়ায়'। এ-রকম 'ডায়রিয়ায়' মৃত্যুর খবর মিলল নীলফামারী থেকে। গেলাম সেখানে। সিভিল সার্জন সাহেব অকপটে স্বীকার করলেন মৃত্যুর খবর। তবে তার দফতর থেকে ঢাকার উপরমহলে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে অপুষ্টির কারণে মৃত্যুর কথা। একইভাবে 'ডায়রিয়ায়' বেশকিছু লোক মরল রংপুরের গঙ্গাচড়ার অভাবী গ্রামে। সেখানে স্যালাইন পাঠানো হলো না, ওষুধ পাঠানো হলো না। বরং বরাদ্দ হলো খাদ্যশস্য। অর্থাৎ একটা ব্যাপার অন্তত বোঝা যায় : সেখানে খাদ্য সংকট ছিল এবং ঐ কথিত 'ডায়রিয়ার' সাথে খাদ্যাভাবের ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে স্বীকার করা হয় নি। দুয়েকটি ছাড়া আরসব পত্রিকায় খবর ছাপা হয় নি। ভয়, ছাপলে পরে সংবাদপত্রগুলোকেই অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হবে। এখন আর মধ্যরাতের টেলিফোন নেই, সেই আগেকার মতো প্রেস অ্যাডভাইস নেই। সে সবের প্রয়োজনও হয় না। এখন নতুন থিওরি দেওয়া হয়েছে। সংবাদ হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ। নইলে বিজ্ঞাপন মিলবে না।

সংবাদপত্রের কাজ সত্যকে তুলে ধরা। সাংবাদিকের কাজ সত্য লেখা। এটাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। কিন্তু খাদ্য সংকট আর মৃত্যু সম্পর্কে চুয়াত্তরে যা লিখতে পেরেছি, আশি-বিরাশিতে যা লিখতে পেরেছি, অষ্টআশিতে যা লিখতে পেরেছি, এমনকি একানব্বইতে যা লিখতে পেরেছি, বিরানব্বইতে তা পারলাম না। এ যে কী যন্ত্রণা! আমি দেখলাম, শুনলাম, বস্তুনিষ্ঠতার স্বার্থে সরজমিনে বিবরণ সংগ্রহ করে আনলাম, কী সে তথ্য দেশের মানুষ জানতে পারলেন না। এই যে ভেতরের জ্বালা, কখনো গনগনে হয়ে ওঠে, কখনো পরিস্থিতির কথা ভেবে খুব অসহায় বোধ করতে থাকি। বিশেষ করে বক্তৃতায় যখন শুনি সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, সাংবাদিকরা আগের চেয়ে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করছে, তখন স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী থেকে অনেক দূরে নীলফামারীতে কি গঙ্গাচড়ায় কুড়িগ্রামে কি লালমনিরহাটে কিংবা গাইবান্ধার গ্রামে একটি লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আমি ছটফট করতে থাকি। এ লাশ আমারই।

AMARBOI.COM

চুয়াত্তরের সেই জরিমন, অনাহারে মৃত বৃদ্ধের স্ত্রী, ভর্ৎসনায় আমাকে বিচলিত করে তুলেছিল চিলমারীতে, সে এখন বেঁচে আছে কি মরে গেছে জানি না। তবে আছে অসংখ্য জরিমন এবং তাদের মিছিল এখন শহরে।

এবং বৃদ্ধের লাশের ছবি তোলার সময় তার, সেই জরিমনের যে ক্ষোভ, ভর্ৎসনা তা হয়েছে সম্প্রসারিত। এখন তাদের মুখ ফুটেছে। শুধু কি তুমি খাবে? আমি খাব না?

গত আশ্বিনের এক দুপুর। খেতে বসেছি লালমনিরহাটের এক বাসায়। অনেক খাদ্য-খাবারের আয়োজন। আমার প্লেটে পরিবেশিত হচ্ছে ধোঁয়া ওঠা ভাত, এ সময় বাইরের দরজায় কড়া নড়ার শব্দ পাওয়া গেল। কোনো অতিথি এসেছে ভেবে গৃহকর্তা দরজা খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই টানা কর্কশ নারীকণ্ঠ : 'একনা ভাত দ্যাও বাবা, দুইদিন থাকি কিছু খাও নাই ... ।'

বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে খাবারের টেবিলের চারদিকে। গৃহকর্ত্রী স্বগতোক্তি করে ওঠেন, 'এদের জ্বালাতনে আর পারা যায় না। সকাল নেই দুপুর নেই বিকাল নেই ... একটার পর একটা আসছে আর আসছেই। কতজনকে আর ভিক্ষে দেওয়া যায়!'

গৃহকর্তা ভাতের সাথে ভর্তা মাখছিলেন, গ্রাস তুলতে গিয়ে থেমে যান, উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'মাফ করো বাবা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: 'খালি মাপ করো আর মাপ করো!' নারীকণ্ঠ এখন যেন আরও চড়া। সে বলতে থাকে, 'ক্যানে, তোমরা তো দেখি খাইতোচেন! হামরা খাবার নই?' অর্থাৎ সে বলছে, কেন, আপনারাতো দেখছি খাচ্ছেন। আমরা খাব না?

চমকে উঠি। গৃহকর্তা পেছন ফিরে তাকান। সেদিকে চোখ যায় আমারও। বারান্দার জানালা খোলা। চৌকাঠের ফ্রেমে এক প্রৌঢ়ার মুখ। মুখ নয়, এমনি শীর্ণ-ভাঙা-তোবড়ানো যে, মনে হয় একটি কঙ্কালের খুলি। হাড়ের সাথে চাপা চোয়ালে-থুতনিতে রাগ, চোখের মণিতে ক্ষুধার আগুন ঠিকরে পড়ছে। সে বলছে, আমি ভিক্ষুক নই, আমি চাল-পয়সা চাই না, আমাকে একটুখানি খাবার দাও ... বলতে বলতে সে জানালায় তুলে ধরে একটি শিশু। উলঙ্গ, কঙ্কালসার, মৃতপ্রায়। 'এই যে আমার ছেলেটি, এ-ও কিছু খায়নি বাবা! দাও একটুখানি ভাত ...।'

গৃহকর্তা চিৎকার করে ওঠেন। কাজের ছেলেটিকে ধমকান : 'জানালা ক্যান খোলা রাখছিস হারামজাদা! যা, বন্ধ করি দিয়া আয়,' জানালা বন্ধ করতে ছুটে যায় ছেলেটি। তার আগেই প্রৌঢ়ার অসহায় কণ্ঠ ভেসে আসে। সে যেন তার বাঁচামরার প্রশ্নে তর্ক জুড়ে দিয়েছে এবং পরাজয় বরণের পর এখন বলছে, 'জানালা বন্ধ করে দিলেই কি আমার ক্ষুধা নিভবে কর্তা! আমি যে মরে যাচ্ছি! আমার শিশুটি যে মরে যাচ্ছে!' তারপর সে কাঁদতে থাকে। ভর্তা শাক চচ্চড়ি ডাল মুরগির রান এবং মাছের তৈলাক্ত পেটিতে তখন যেন আগুন লেগেছে, জ্বলছে, জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

জানালা বন্ধ হলেও গৃহকর্ত্রীর অনুগ্রহে এক থালা ভাত পায় প্রৌঢ়া। আমি ভাবতে থাকি তার উচ্চারিত কথাগুলো। আপনারাতো খাচ্ছেন! আমরা খাব না?

'কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না' এরকম ছন্দোবদ্ধ স্লোগান শহরের পথে শুনেছি। কিন্তু দূরগ্রামের বাসিন্দা নিরক্ষর এবং রাজনৈতিকভাবে অসচেতন এই প্রৌঢ়ার কণ্ঠে কী করে তা উঠে এলো? কোথায় শিখল সে তার অধিকারের কথা?

শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, রাজনীতি সংগঠিত করে দাবি আদায়ের সংগ্রামে। কিন্তু নুন খাওয়া গ্রামের মেয়েটি, যে জীবনে শিক্ষার সুযোগ পায়নি, রাজনীতি বোঝে না, সমাজ-সরকার বোঝে না, গ্রামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সে কোথায় পেল এই প্রতিবাদের ভাষা? ক্ষুধার আগুন কি তার ন্যূনতম এবং ন্যায্য অধিকার উস্কে দিয়েছে?

চুয়াত্তরে জরিমন বলেছিল, আমরা না খেয়ে মারা যাচ্ছি আর আপনি ছবি তুলছেন! বিরানব্বইতে নুনখাওয়া গ্রামের প্রৌঢ়া বলল, আপনারা খাচ্ছেন, কিন্তু আমরা খাব না? বহু বছরের ব্যবধানে এই যে দুটি সংলাপ, ভর্ৎসনার তাচ্ছিল্যের অধিকারের যা-ই হোক, একসূত্রে গাঁথতে চাই। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের হিসেব মেলাতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পারি কই? আমি নিজেই রাজনৈতিকভাবে মূর্খ। ব্যক্তি চরিত্রগতভাবে সুবিধেবাদী। মানুষকে পণ্য করে খাই। ক্ষুধার্ত প্রৌঢ়ার সংলাপটি নিয়ে কিভাবে লেখা যাবে, সেটাই ভাবছি। ফলত পড়ে থাকে হিসেব-নিকেশ।

'মাছটা কেমন?' গৃহকর্তা জানতে চান। 'সাত কেজির মাছ, কিন্তু পেয়ে গেলাম খুব সস্তায়। মাত্র এক শ আশি টাকা কেজি। নিন না আরেকটা টুকরো!' গিন্নীকে তাড়া দেন তিনি, 'দাও গো, আরেকটা মাছ দাও সংবাদিক সায়েবকে।' হ্যাঁ সাংবাদিক শব্দটি উচ্চারণে 'সংবাদিক'। বিচিত্র শোনায়। কেমন যেন সঙ সঙ গন্ধ।

অতঃপর বিরাট মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আপাতত বন্ধ ঐ জানালাটার পাশে পুরু গদি মোড়া বিছানায় গা এলিয়ে দিই।

লম্বা ঢেঁকুর ওঠে। আলহামদুলিল্লাহ! এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

৪

নাচোলের হালিম ও আজাহার

নাচোল।

রুক্ষ-কঠিন লাল মাটি। মানুষগুলো রোদ-পোড়া তামাটে। না, ঠিক তামার মতো নয়, কালো রঙের লেপন তাতে একটুখানি বেশি। তবে মাটি আর মানুষের রং লাল-কালো যাই হোক, মনের রং সাদা। কষ্ট-উৎপন্ন ফসলের মাঠে উদয়াস্ত পরিশ্রমের ভারে যে কিষান-মজুর নুয়ে পড়েছে, বেঁকে গেছে কোমর এবং পিঠ, সেই লোকটি এতই সোজা-সরল যে, আপনি নাচোলের মেঠোপথে হাঁটলে একটুখানি থমকে দাঁড়াবে, অবাক চোখে আগন্তুক দেখবে, যেন বা ভয় পেয়েছে এমন করে সরে দাঁড়াবে পথের কিনারে এবং সেই সরে যাওয়া যে বা ভয় বা চমকানো নয়, আসলে বিনয়, সেটি প্রমাণ করবার জন্যে নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার টানে সালাম উচ্চারণ করবে আর লোকটি হিন্দু হলে জানাবে প্রণাম।

শক্ত মাটিতে বাঁধা পথের ওপর দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় শুষ্ক-ফাটা জমি, কোথাও সমতল আবার কোথাওবা অতি-বিস্তৃত সিঁড়ির মতো তাক তাক। কোথাও দশ-বারোটি ঘর নিয়ে ক্ষুদ্র কৃষক কিংবা মজুর পল্লী, কোথাও বিচ্ছিন্ন ছিন্নভিন্ন ঘর। মাটির তৈরি দেয়াল, উপরে খড়ের চালা। তালগাছ আছে, খুব উঁচু যেহেতু, সেহেতু পাতার রং সবুজের বদলে কালো দেখায়। এছাড়া বাবলা আম ঘোড়ানিম বটপাকুড় কুল সজিনা গাছের পাতায় পীতের চাইতে হলুদ রঙের ছোপ বেশি। মাটির গভীরে রস কম, শিকড়ের বিস্তার ঘটলেও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানির অভাবে কাণ্ড ও ডালপালা সরু, পাতা ঝরে দ্রুত, যেন দেহ ও কপালপোড়া মানুষগুলোর মতোই অতিকষ্টে প্রাণে বেঁচে আছে।

সড়ক থেকে নামলেই ঘন আইল। ফাটা-চেরা ক্ষুধার্ত জমিন, দেখে মনে হয় ঐ ফাটা যেন আঁকাবাঁকা এবং বিচিত্ররকম দীর্ঘ হা, তাকিয়ে আছে আকাশ পানে, কখন বৃষ্টির মওসুম আসবে তারই অপেক্ষায়। ... কোনো উঁচু অবস্থান থেকে নিপুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে মাটি কেটে কেটে কিংবা ফাটিয়ে বড় বড় মানচিত্র এঁকেছে অসংখ্য ক্ষুধার রাজ্যের।

এর ধারেকাছে কালো চামড়ায় খুব টাইট করে বাঁধা পাঁজর ও বুকের হাড় সর্বস্ব মানুষ। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, একটি কঙ্কাল বুঝি চামড়া দিয়ে শক্ত বাঁধা, ভাঙা চোয়াল, কোটরাগত চোখ, গর্তে ডুবে যাওয়া পেট। মাজাটি এমনই নড়বড়ে হয়ে গেছে যে প্রতি পদে পদে দোলে। তবু সে যখন হাঁটে খালি পায়ে, শীর্ণ পায়ের পাতা ফেলে ফেলে, তখন কষ্ট হলেও বিশ্বাস করতেই হয় যে, সেই লোকটি খাদ্যশস্য ফলানো কামলা-কিষান, সে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকতে চায়। নিতান্তই ঈশ্বরের কৃপায় সে বেঁচেও থাকে।

ইলা মিত্রের নাচোল।

কৃষক আন্দোলনের নাচোল।

অধিকার আদায় সম্পর্কিত সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এক জনপদ।

একসময় এখানকার গ্রামে গ্রামে লাল ঝাণ্ডা উড়ত, হঠাৎ ঢাকের শব্দে উচ্চকিত হয়ে উঠত সমস্ত সাঁওতাল-পল্লী। পেশিবহুল বুকের ভেতর রক্ত টগবগ, একেকটা হাত যেন ঝকঝকে ধারালো তরবারি, তেজি কণ্ঠে বিভিন্ন স্লোগান, দলে দলে ছুটে আসত লাল পিঁপড়ের মতো সারিবদ্ধ মানুষ। একত্র হতো তারা নির্দিষ্ট একটি বটগাছের তলায়। সকালে দুপুরে বিকেলে রাতে এমনকি গভীর রাতেও ঢাকের গুড়গুড় আর সম্মিলিত কণ্ঠের রৈ-রৈ শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠত নাচোল। তারপর কত যুদ্ধ, কত রক্ত, দলে দলে লাশ হয়ে যাওয়া কিংবা অমানুষিক বিভিন্ন জুলুম, শারীরিক নির্যাতন। ইতিহাসের পাতায় কালো হরফে লেখা রয়েছে সেইসব রক্তগাথা।

কিন্তু আমি যখন নাচোলে গেলাম, দেখলাম, দুয়েকজন ছাড়া সেই আন্দোলনের সময়কার কেউ বেঁচে নেই, যারা গল্প-কাহিনী শুনেছেন তাদের অনেকের স্মরণশক্তি হৃত। আর যারা যুবক, তাদের অধিকাংশই ইলা মিত্রের নামটি শুনলেও একটুকু জানে না যে, তিনি কে ছিলেন, এই জনপদে কী ভূমিকা ছিল তার। জানেন না তিনি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন। বর্তমান প্রজন্ম, এরা কেউ কেউ জানে দেশের রাষ্ট্রপতির নাম, হাসিনা খালেদার নাম, রাষ্ট্রপরিচালনা ও রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা, কিন্তু বহু বছর আগে সংগ্রামী যে নারী জীবন-স্বচ্ছন্দ্য ছুঁড়ে ফেলে এসে এদের পিতা-পিতামহদের অনেককেই আন্দোলন-সংগঠিত করেছিলেন, তার সামান্য বর্ণনা-বিবরণ সম্পর্কে তারা অজ্ঞাত। ফলে ইলা মিত্র সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করলে এরা এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, বিস্ময়ে হা হয়ে যায়। এমনকি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ডাকটি দিয়েছিলেন কে, কী তার রাজনৈতিক দলের নাম এসব পর্যন্ত জানে না এখানকার কৃষক সন্তান।

অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। যেমন মস্তাজ আলীর ছেলে হালিমের ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্র কৃষকের সন্তান, বারো বছর বয়সে কামলা খাটা শুরু করে, এখন কুড়িতে এসে পূর্ণ ক্ষেতমজুর, সপ্তাহে চারদিন কাজ জোটাতে পারে, দৈনিক মজুরি গড়ে দশ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর গৃহস্থের অনুগ্রহে কোনো কোনো দিন 'দুপুরের খাবার' হিসেবে পায় একখানা খেসারির রুটি। যৌবনের শুরুতেই জীবন যার এ-রকম, শুধু নিজের নামটি জানা ছাড়া আর কোনো শিক্ষা পায়নি, যেতে পারেনি প্রাইমারির প্রথম চৌকাঠ পর্যন্ত, যার কাছে দেশ মানে নাচোলের কয়েকটি গ্রাম মাত্র, যার জীবনকর্ম বা দায়িত্ব মানে উদয়াস্ত ঘাম ঝরিয়ে এসে ভূস্বামীর বাড়িতে আঙিনায় মজুরির জন্যে বসে থাকা, একসময় ঐ দশ টাকা গুণে নিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ পিতার হাতে টাকা কটি তুলে দেওয়া, সে আবার কখন কিভাবে দেশ-দুনিয়ার খবর রাখে? তার কাছে ইতিহাস, ভূগোল বিজ্ঞান, রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, অধিকার আন্দোলন নেতা নেতৃত্ব, এইসব কল্পনাও অকল্পনীয়। নাচোল স্টেশনে গিয়ে সে রেলগাড়ি দেখেছে বটে, দেখেছে শহর থেকে আসা দুয়েকটি মোটরগাড়ি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে উড়োজাহাজ দেখে নি, টেলিভিশন দেখে নি, বিজলি বাতি দেখে নি, সিনেমা বায়স্কোপ, এমনকি আজ পর্যন্ত চোখে দেখে নি নেতানেত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি। ইতোমধ্যেই মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে যার, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বুকের সবকটি হাড়, কুড়ি বছর বয়সেই উরু ও হাঁটু ফাঁক করে হাঁটে হাইড্রোসিলের কারণে এবং অর্থাভাবে অপারেশন তো দূরের কথা গ্রামের কবিরাজের কাছেও যেতে পারোনি এখন পর্যন্ত। তার কাছে তথ্যশূন্যতার কারণে 'সবার জন্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা' পৌঁছে দেওয়ার সরকারি ওয়াদার সংলাপটিও পৌঁছে নি। পৌঁছুলে এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তা মেলানোর চেষ্টা করলে হালিম নিশ্চয়ই কোনো প্রহসন নাটক দেখার মতোই হয়তো হাসত।

www.amarboi.com

সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, খবরের কাগজ, বিনোদন, রাজনীতি-সমাজনীতি এসব তো সে জানেই না, এমনকি চেনে না ক্যামেরা কী জিনিস। ভূস্বামীর জমির কিনারে, আইলের উপর হাঁটু ভেঙে বসে হালিম যখন লবণ মরিচ গোলা এক বাটি পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে কলাইয়ের রুটি চিবোচ্ছিল, সেরে নিচ্ছিল দুপুরের আহার, অর্থাৎ যাকে বলে লাঞ্চ, তখন আমি মাইক্রো-টেলি লাগানো ক্যামেরা তাক করলাম।

রুটি চিবানোর দৃশ্যটি খুব ক্লোজআপে আমার প্রয়োজন, যার ক্যাপশন হতে পারে 'আহার'। কিন্তু মুখ তুলে তাকাতেই কী যে হলো, হালিম প্রচণ্ড রকম আঁতকে উঠল। রুটির খণ্ড ফেলে, লবণ মরিচ গোলানো পানির বাটিটি শুকনো ঠা ঠা মাটিতে উল্টে দিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে দিল দৌড়। কুড়ি বছরেই প্রায় ভেঙে যাওয়া শরীর নিয়ে সে বিচিত্র ভঙ্গিতে দৌড়ুচ্ছে আর চিৎকার করে কাঁদছে। পরে তাকে থামানোর পর আবার যখন খোলা আসমানের নিচের খাবারস্থলে ডেকে আনা হলো, বিভিন্ন আলাপে-সালাপে কাটল ভয়-ভীতি, তখন জানালো সে, আসলে 'ফটোক' তোলার যন্ত্রটিকে সে ভেবেছিল বন্দুক এবং ছবি তোলা নয়, তাকে বুঝি গুলি করা হচ্ছিল! ... তারপরে, আরও পরে, আইলের উপর বসে বন্ধুত্বসুলভ আলাপের এক পর্যায়ে হাতে তুলে নিল সে আমার ক্যামেরা, হাতের তালু ঝাঁকিয়ে ওজন দেখল, ভিউফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে দেখল। জীবনে এই প্রথম ক্যামেরার সাথে পরিচিত হলো সে এবং এটা দিয়ে হালিমদের মতো মানুষদের ছবি তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়া হয় শুনে গর্তে ডোবা চোখ জোড়া বেশ কিছুক্ষণ থির হয়ে রইল আমার দিকে।

ছবি তোলার মতো কর্মটি করে হবেটা কী? তার প্রশ্নের মুখে যতটা পারা যায় বোঝাই, তাতে ওর বিস্ময় যেন চিন্তার বোঝা হয়ে ওঠে। জানতে চায়, কী হবে এই ছবি তুলে?

: পত্রিকায় ছাপা হবে এই ছবি। হালিম, লেখা হবে তোমার কথা। তোমার গ্রামের কথা, তোমার পরিবারের কথা, মজুরি প্রাপ্তি আয়-উপার্জন পাওয়া-বঞ্চনা এইসব জানানো হবে সুধীজনদের। শুনে ক্যামেরা তাক করা দেখে ভয় পাবার চেয়ে বেশি মাত্রায় সে বিস্মিত হয়। পত্রিকা, পেপার, লেখা, পাঠক, সুধীজন, এইসব তার আজই প্রথম শোনা।

যাতে করে সহজে ব্যাপারটি সম্পর্কে ধারণা পায়, সেজন্যে আলাপ জুড়ে দেই।

: হালিম তুমি ঐ হাটে যাও নি কখনো?

: গিয়েছি। মাথা দোলায়।

: চা-মিষ্টির যে দোকান দুটি আছে, ঢুকেছ সেখানে কোনোদিন?

: না। মাথা নাড়ে সে।

: দোকানের সামনেও দাঁড়াওনি কখনো? দেখো নি সেখানে দেয়ালে সাঁটানো আছে বড় বড় ছাপা কাগজ? আছে বড় বড় ছবি? দেখো নি?

এবার হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়। আইলের ওপর নড়েচড়ে বসে সে, পরনের ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গিখানা হাঁটুর ওপর টেনে নিয়ে তলপেটের নিচে ঘসাঘস করে চুলকাতে থাকে, বোধকরি, 'পত্রিকা' এবং 'ছবি' আবিষ্কারের উত্তেজনায়। তারপর বলে ওঠে, হ্যাঁ দেখেছি, ঐ শাবানা আর রেজ্জাক। না?

আমি তো বিস্মিত! আগেই দেখেছি হাটের চায়ের দোকানে সিনেমার পত্রিকা সাঁটা, শহর থেকে সের দরে কিনে এনে লাগানো হয়েছে, পত্রিকা না চিনলেও সেই শাবানা-রাজ্জাকের প্রায়-চুম্বনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া দুইজোড়া ওষ্ঠ চায়ের দোকানের দেয়ালের মতো নাচোলের এই ক্ষেতমজুর হালিমের মনেও সেঁটে আছে!

: তুমি কি সিনেমায় দেখেছ ওদের? কিভাবে ওদের নাম জানলে? জবাবে হালিম যা জানায়, তার সার হলো : না, কখনো সিনেমা দেখে নি সে, কিন্তু তার এক মামা সম্পর্কের লোকের মুখে গল্প শুনেছে। সেই মামাই একদিন, হাটের ধারের চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবার সময় খানিক দাঁড়িয়ে ঐ যুগল ছবি দেখিয়েছিল হালিমকে, 'শাবানা ও রেজ্জাকের' সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বিশাল সেই ছবি, কী সুন্দর চেহারা, গায়ের রং-টং, তা ছাপিয়েও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ওদের দুজনের নাম, আর ঠোঁট কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি।

এইরকম স্মরণশক্তি, বোধ, ক্যামেরা সম্পর্কিত কৌতূহল, প্রশ্ন, জেনে-শুনে মনে হলো হালিম যদি গরিব কৃষকের ঘরে না জন্মে শহুরে কোনো বিত্তবানের দুধে-ভাতে লালিত-পালিত হতে পারত, নিশ্চয়ই সে মেধাবী হতো, এখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, এই নাচোলে ইলা মিত্র যে কাজটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন নি তা-ই নিয়ে হয়তো চিন্তাভাবনা করত সে। থাকতে পারত রাজপথে, মিছিলে।

ইলা মিত্রের কথা মনে হওয়ায় হালিমকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করি, শাবানা আর রাজ্জাকের নাম তো বেশ মনে রেখেছ, ছবির কথাও ভোলোনি, কিন্তু তুমি ইলা মিত্রের নাম শুনেছ কখনো?

প্রশ্নটি উচ্চারণের পরমুহূর্তেই বুঝতে পারি এ আরেক বোকামি হয়ে গেল। হালিম ঠোঁট উল্টায়, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। মামা-বর্ণিত সিনেমার গল্প এবং জুটির পাশে ইলা মিত্রকে মেলাতে পারে না হালিম। তবু সে কিছু একটা স্মরণ করার ভান করে, আইলের শুকনো ঘাস ছেঁড়ে, আবার মাথা নাড়ে। না, এ নামের কোনো 'মেয়ে মানুষের' কথা মামা বলে নি তাকে এবং আমাকে বেয়াকুফ সাজানোর জন্যেই বুঝিবা হালিম প্রশ্ন ছোঁড়ে এ রকম : কেন? এর কথা জানতে চান কেন? শাবানা-রেজ্জাকের ছবির পাশে ঐ পেপারে তারও কি কোনো ছবি আছে?

আরও লজ্জা পাবার জন্যে অপেক্ষা না করে আইল ছেড়ে উঠে পড়ি। নাচোল কলেজে যাই। সেখানে একদল ছাত্রছাত্রীর সাথে আলাপ। পরে লিখিত প্রশ্নের ওপর একটি জরিপ সম্পন্ন করি। ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অধিকাংশই ভুল বানানটি ভুল করে, কবি শামসুর রাহমানের নাম জানে না, দুয়েকজন জানলেও তার নামের বানান লেখে 'শামসুর রহমান' কিংবা 'শামছুর রহমান'। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এদের জানা সামান্যই। এরা সবাই ভাগ্যে নয় কর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু অপর এক প্রশ্নের জবাবে সবাই আশা করে কোন্ লটারিতে টাকা পেলে তা দিয়ে ভাগ্য ফেরাবে। এরা বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোথায়, কোন্ গ্রামে জানে না, এমনকি জানে না নাচোল বিদ্রোহ কোন্ সালে হয়েছিল। ইলা মিত্রের নাম কেউ কেউ শুনেছে বটে, কিন্তু সংগ্রামে তাঁর অবদান কী ছিল, এখন তিনি কোথায় কী অবস্থায় আছেন, এসব বলতে পারেন নি একজনও।

একজন পারলেন। অল্প কিছু। তিনি পড়ুয়া নন, যুবকও নন, একজন বৃদ্ধ, তার নাম আজাহার আলী। নাচোল বিদ্রোহের সময় ইলা মিত্রের সহযোদ্ধা যাঁরা ছিলেন তাদেরই একজন এই দীর্ঘদেহী শ্মশ্রুমণ্ডিত আজাহার। নাচোল প্রশাসনিক ভবনের কাছে হঠাৎ করে তাঁর সাথে দেখা।

সে সময়ে বয়সে তরুণ হলেও আজাহার কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। পরে হন কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় পর্যায়ের নেতা। অনেক জেল-জুলুম এবং এখন দারিদ্র্য সয়ে সয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য, নানা রোগাক্রান্ত। তাকে দেখলাম পরনে মলিন লুঙ্গি, ছেঁড়া পাঞ্জাবি, খালি পা। ইলা মিত্রের এই সাথী এখন নিভৃত এক গ্রামে থাকেন এবং শুনে অবাক হলাম যে এর-ওর কাছ থেকে পাঁচ-দশ টাকা যা পান তাই দিয়ে সংসারটি চলে না, সে কারণে আজাহার আলীর স্ত্রী গৃহস্থ বাড়িতে ধান ভানার কাজ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে নাচোল থেকে ফিরে আমি আজাহার আলীকে নিয়ে প্রতিবেদন লিখেছিলাম। সাথে তার ছবিও ছাপা হয়েছিল। কিন্তু অনেক পাঠক বিশ্বাস করেন নি। টেলিফোনে কিংবা কেউ মুখের ওপর প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, আপনি কি নাচোলে গিয়ে এসব লিখেছেন, নাকি কারও মুখে শুনে লিখেছেন? শহরে বসে বানানো?

সমাজের প্রতিটি স্তরে বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে। একেই ভাঙন ফাটল শ্রেণীভেদ, শোষণ প্রক্রিয়া, মানবতা নিরুদ্দেশ, মানবিক মূল্যবোধগুলো ভূলুণ্ঠিত, হিংসা-দ্বেষ-কুৎসা-হীনম্মন্যতাবোধ, সে অবস্থায় মা তার সন্তানকে বিশ্বাস করছে না, সন্তান তার পিতাকে বিশ্বাস করছে না, বন্ধু বন্ধুকে বিশ্বাস করছে না, নেতা জনগণকে বিশ্বাস করছে না; তেমনি জনগণ বিশ্বাস করছে না নেতাকে। এই সামাজিক অবস্থায়, আজাহার আলীদের জন্যে আমরাতো কিছু করতে পারি না। এমনকি তিনি আজ হাত পেতে খাচ্ছেন কিংবা তার স্ত্রী ধান বানছেন এমন তথ্যটি মনে হয় অবিশ্বাস্য। এটাই বুঝি স্বাভাবিক।

তবুও কিছুদিন পরে রাজশাহীতে যখন আবার দেখা হলো, আজাহার জানালেন, এক ব্যক্তি 'সংবাদে' ঐ প্রতিবেদনটি পড়ার পর কিছু অর্থসাহায্য করেছেন। ভদ্রলোক নাম পরিচয় প্রকাশ করতে চান না। টাকা কটি পেয়ে আজাহার আলীর খুব নাকি উপকার হয়েছে।

এর কিছুদিন বাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনুশীলন' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দেখি, আজাহার আলীকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। ঐ সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ একজন লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রাম থেকে। খুব কড়া আলোর মঞ্চে একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে উপবিষ্ট আজাহার আলীর হাতে ছিল ফুলের তোড়া। আলোর প্রখরতায়, কিংবা হতে পারে আবেগে তার চোখ অশ্রুভেজা এবং তা দর্শকের সারিতে বসেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আজাহার আলীকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বৃদ্ধ কাঁপছিলেন, ওদিকে দর্শকের সারিতে প্রচণ্ড হাততালি পড়ছিল। আজকের প্রজন্ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণপ্রাণ ছাত্রছাত্রী, অতীত দিনের এক বিদ্রোহের কর্মীকে কাছে পেয়ে আনন্দিত, আবেগ-আপ্লুত। করতালি যেন থামতে চায় না। অনুষ্ঠান শেষে যখন দেখা করতে গেলাম, বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন তিনি। কথা বলতে পারছিলেন না। ফুলের তোড়াটি শুধু হাতে তুলে দিলেন আমার।

আমি গ্রহণ করলাম এবং তৎক্ষণাৎ ফেরত দিলাম, তার হাতে। কমরেড, এটা আপনার জন্যে এবং শুধু আপনার জন্যেই।

নাচোলে আমি যখন যাই, তখন ছিল শুষ্ক দিন। শক্ত মাটি। যেন লোহার পাতের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

কিন্তু ফিরে আসার দিন খুব বৃষ্টি নেমেছিল এবং মাটি ও প্রকৃতির অন্যরকম চেহারা। রুক্ষ শক্ত লাল মাটি, পানিতে গলে একেবারে আঠালো কাদা। স্যান্ডেল পরে হাঁটা যায় না। কয়েক পা সামনে বাড়াতেই স্যান্ডেলের তলা চটচটে কাদায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরু-ভারী হয়ে ওঠে। আর এমনই পিচ্ছল হয়ে ওঠে পথ, যেন একটু শরীর টললেই ভূপতিত হয়ে যেতে হবে।

অতঃপর স্যান্ডেল খুলে, পায়ের আঙুল টিপে টিপে এগুতে হয় পায়ের পাতা-ডোবা কাদা মাড়িয়ে। নিজের কাছেই মনে হতে থাকে আমি যেন বা পা টিপে টিপে চুপি চুপি অন্ধকার এক গ্রাম থেকে পালিয়ে আসছি। পেছনে পড়ে থাকে হাজারো হালিম। আজাহার।

বরেন্দ্রর শক্ত মাটি এক পশলা বৃষ্টির পানিতে গলে যায়। কিন্তু মাটির মতো সরল-নরম যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী, তাদের স্বাধীন দেশে সরকারের পর সরকার আসে, আসে আর যায়, কিন্তু ওদের ভাগ্য কোনোমতেই বদলায় না।

৫

বিভিন্ন বিড়ম্বনা

ক

যাদের নিয়ে নিরেট খবর কিংবা ফিচার লিখি তারা মাঝে মাঝে বিড়ম্বনায় ফেলে দেয় এবং সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দুঃখ-যন্ত্রণার, কিংবা অপমানের।

'৯২-এর জুলাইতে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে গিয়েছি আমি আর হাসিবুর রহমান বিলু, সংবাদের বগুড়া প্রতিনিধি। ওখানে ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের ধারে বাস করে যেসব নদীভাঙা মানুষ, তাদের নিয়ে একটা সিরিজ প্রতিবেদন তৈরি করতে চাই। পরিকল্পনা তৈরি ছিল আগেই, সিরিজটির নাম হবে 'বাঁধের ধারে বাঁধা জীবন'। এখানে পাঠকদের অবগতির জন্যে বলতে চাই, যমুনা নদীর তীরে যে দীর্ঘ মাটির বাঁধটি রয়েছে, রংপুরের কাউনিয়া থেকে পাবনা পর্যন্ত বিস্তৃত, তার দুধারে খুপরির মতো ছোট ছোট ঘর বেঁধে বসবাস করছে হাজার হাজার পরিবার। কেউ আছে অনেকদিন ধরে, কেউ এসেছে হালে। একদা এদের অধিকাংশের জমি-জিরাত ছিল, যমুনা সবকিছু গ্রাস করার পর এখন সম্পূর্ণ ভূমিহীন। মজুরি করে খায়। কিন্তু একেই নিয়মিত কাজ মেলে না, মিললেও মজুরির হার অত্যন্ত কম, অথচ পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৫/৬ জন। উপোস-কাপাসে মানবেতর জীবন যাপন করছে তারা।

সারিয়াকান্দি সদরে প্রাথমিক কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করি। এরপর আমরা যাব বাঁধের বিভিন্ন অংশে। লোকজনদের সাথে কথা বলতে হবে, তাদের জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে দেখতে হবে, তুলতে হবে কিছু ছবি।

কিন্তু রাত কাটানোর মতো ঠাঁই মিলবে কোথায়? খাওয়া-দাওয়া? পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'রেস্ট হাউস' পাওয়া গেল। কিন্তু মন খচখচ করছে। এদের ঘরে থেকে এদেরই দুর্নীতির ফিরিস্তি লিখতে হবে। কেননা আগেই অভিযোগ পেয়েছি, বাঁধ সংস্কারের নামে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা আর ঠিকদার অতীতেও যাচ্ছেতাই করেছে, এখনও লোপাট করে দিচ্ছে অর্থ। কিন্তু উপায় কী? হাসিবুর রহমান বিলু বলল, চিন্তা করে লাভ নেই, কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরাতো পয়সা দিয়ে ওদের ঘরে থাকব, নিজেদের খরচে খাব। মনস্তাপের কারণ নেই।

প্রাথমিক কাজ শেষ। ইতোমধ্যে দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। একেই ক্লান্ত দেহ, তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। ধুলো কাদা আর ঘামে গা ঘিনঘিন করছে। এখন আশ্রয়ে ফেরা দরকার। অন্তত গোসল সারতে না পারলে অস্বস্তি ঘুচবে না। বিলুর এক ওয়াক্তের নামাজ 'কাজা' হয়ে গেছে, আছরের সময় হয়ে এলো প্রায়।

কিন্তু মাঝপথে ঝরঝরে মোটরসাইকেলখানা বিগড়ে গেল। গীয়ারের তার ছিঁড়ে গেছে। মেকারের দোকান মিলল বটে ধারেকাছেই, দোকানও খোলা, কিন্তু কোনো লোকজন নেই। খেতে গিয়েছে। কখন সে আসবে, আশপাশের কেউ বলতে পারে না।

মোটরসাইকেল এখানেই থাক। পরে এসে ঠিকঠাক করা যাবে। এখন চলেন ঘরে ফিরি। বললাম আমি। কিন্তু মুখে বললেই হয় না, যাব কী করে? রেস্টহাউস বেশ দূর। সারিয়াকান্দিতে ইদানীং বেশকিছু রিকশা হয়েছে, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে একটিও চোখে পড়ছে না। নেই কোনো ভ্যানগাড়ি। এদিকে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। দুজনে এতই ক্লান্ত যে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে, পায়ে কে যেন বেঁধে দিয়েছে পাথর। রোদের তেজও প্রখর। প্রচণ্ড গরম। আমাদের আবার যেতে হবে পশ্চিমের দিকে।

একখানা খালি রিকশা পাওয়া গেল। খড়বড়ে রাস্তায় হাপুস-হুপুস প্যাডেল মেরে রিকশাওয়ালা সামনে দিয়ে চলে গেল। আমাদের ডাকে বিদায় জানানোর মতো করে হাত নাড়ল সে। যাব না ভাই, ঘরে রুগী আছে আমার। হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরছি। আমরা অসহায়ের মতো শুধু বললাম, সামনে কোনো রিকশা পেলে পাঠিয়ে দিয়েন বাবা।

না, ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হলো না। সামনের পার্শ্ব-সড়ক থেকে খালি রিকশা এসে পড়ল একখানা। একেবারে নতুন, ঝকঝকে। কিন্তু চালক একটি বালক। মাত্র ৯/১০ বছর বয়স। সিটে বসতে পারে না, রডে বসে অতিকষ্টে শরীর দুলিয়ে-বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক প্যাডেল চাপ দিচ্ছে।

: যাবেন ছার?

আমি আর বিলু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই। দুজনে দুজনার মনের কথা বুঝে ফেলি। এর যাত্রী হওয়া যায়? এই কিশোরটি আমাদের টেনে নিয়ে যাবে? মাথা নাড়ি। না বিলু, এ অসম্ভব। বিবেক কোনোমতেই সায় দেয় না। আমরা দুজনে ওর রিকশার গদিতে বসে আছি আর বালকটি সেই রিকশা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরকম দৃশ্য কল্পনা করতেই অস্বস্তিবোধ হতে থাকে।

না, আমরা যাব না। ছেলেটিকে জানাই। ও নেমে পড়ে। বোধহয় বেশ দূর থেকে এসেছে, ঘেমে নেয়ে উঠেছে ঐটুকু শরীর। সিটের নিচ থেকে একখানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যাকড়া বের করে ঘাম মুছছে সে। পেট দেখে মনে হচ্ছে দুপুরে কিছু খায়নি এখনও।

টুকটাক কথা বলি ওর সাথে। বাড়ি কোথায়? পরিবারে কে কে আছে? এই অল্প বয়সে রিকশা চালানো শুরু করেছে কেন? ও আঞ্চলিক ভাষায় জবাব দিয়ে যায়। তবে নোটবুকে টুকে নিতে গেলে বিস্মিত হয় সে এবং যেন ঘাবড়ে গেছে। এসব কথা আবার লিখে নিচ্ছেন কেন? কে আপনারা ছার? আমি অভয় দিই। তোর এই শ্রমের কথা পত্রিকায় ছাপা হবে। বৃদ্ধ পিতাকে সাহায্য করার জন্যে স্কুলে পড়ার বয়সে তুই রিকশা চালনার মতো শ্রমে নেমেছিস। মনে মনে বলি, হিউম্যান ফিচারের একটি খাসা চরিত্র তুমি হে বালক। আমি এখন তোমার যে ছবিটি তুলব, তার দাম পঞ্চাশটি টাকা। কদিন কতক্ষণ ঝাম ঝরাতে হয় তোমাকে এই পঞ্চাশ টাকা রোজগারের জন্যে? আমার তো এক মুহূর্তের ব্যাপার।

মনের কথা মনেই থাকে। কিন্তু প্রকাশ্য-উচ্চারিত কথাগুলোও সে বুঝতে পারে না। বোঝে না পত্রিকা, বোঝে না সেই পত্রিকায় কী ছাপা হবে, আর কেনইবা ছাপা হবে। অসহায়ের মতো সে আমাদের মুখের দিকে তাকায়। তার চোখে আকুতি। যা-ই করুন, আমার কোনো ক্ষতি করবেন না তো ছার?

ক্যামেরা বের করি। বলে অনেক দূর থেকে এসেছি, একটু জিরিয়ে নিই। বাঙালি-নদীর ঘাট থেকে একটি 'পরিবারকে' (দম্পতি) টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভেতর গ্রামে। ফিরে আসার সময় বয়ে এনেছে ধানের বস্তা। এখন সে পাল্টা আমাদেরই প্রশ্ন করছে। কবে এসেছি সারিয়াকান্দিতে? ফিরে যাব কখন? মোটরসাইকেল কী করে খারাপ হয়ে গেল? এইসব এবং সে যখন জানতে পারল আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, ফিরব রেস্টহাউসে, মেরামত না হওয়া পর্যন্ত বাহনটি এই দোকানের সামনেই থাকবে, তখন সে বলে উঠল, তাহলে আপনারা অযথা এখানে অপেক্ষা করছেন কেন? চলেন, আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি! আমিতো চিনি ওয়াপদার অফিস! সেখানেই যাবেন তো?

তৎক্ষণাৎ রিকশা ঘুরিয়ে নেয় কিশোর। ন্যাকড়া দিয়ে সিট মোছে দ্রুত। তারপর কচি হাতে থাপ্পর মারে গদিতে। ওঠেন ছার!

: তোর রিকশায় যাব না আমরা। তুই যা। অন্য কোনো রিকশা আসুক!

: ক্যান? সে অতি বিস্মিত। ক্যান যাবেন না আমার রিকশায়? আমি কি চালাতে পারি না? উঠেই দেখুন না! পথ বেশি দূরে নয়, এক্ষুনি পৌঁছে দেব।

ছেলেটি কথা বলেই যাচ্ছে। আমরা এদিকে-ওদিকে তাকাই। যতদূর চোখ যায় একটি রিকশাও দেখা যাচ্ছে না। অথচ আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত। গোসল করা দরকার। বিলুর নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। এদিকে সময়ও সংক্ষিপ্ত। বিকেলে আবার কাজে বেরুনোর কথা আমাদের! এখানকার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকর্মীর সাথে কথা বলা দরকার। নদী-ভাঙন রোধের ব্যাপারে তাদের দাবি-দাওয়া কিরকম, দুর্নীতির কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে কি-না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: ওঠেন ছার।

এ কী বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম? একজন শিশু-শ্রমিকের ওপর লিখব বলে কিছুক্ষণ আগে যার ছবি তুলেছি, যার যাবতীয় জীবনকথা টুকে নিয়েছি, এখন তারই বাহনে সওয়ার হয়ে আরামের আস্তানায় ফিরতে হবে আমাদের? ভীষণরকম একটা অপরাধবোধ মনের ভেতর কাজ করতে থাকে। কুরে কুরে খেতে থাকে যন্ত্রণার কীট।

: ওঠেন ছার!

: ওঠেন!

: উঠেই দেখেন আমি চালাতে পারি কি-না!

: অনেক দিন থেকেই রিকশা চালাচ্ছি আমি। নির্বিঘ্নে আস্তানায় পৌছে দেব আপনাদের।

সময়, পরিস্থিতি এবং সামাজিক অবস্থার শিকার আমরা। আমাদের পেটে ক্ষুধা। আমাদের পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। আমাদের বিশ্রাম চাই। ... এবং আমরা, ঐ বালকের রিকশায় উঠে পড়ি। ও রিকশাখানা টেনে নিয়ে যেতে থাকে, বিচিত্র দেহভঙ্গিতে উঠে পড়ে রডের ওপর। তার হাঁসফাঁস নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি ঘামের ধারা পিঠ বেয়ে নামছে। সারিয়াকান্দির উঁচু নিচু খড়বড়ে সড়ক ধরে আমরা সামনে চলেছি। পীচ ক্ষয়ে যাওয়া পথ, স্থানে স্থানে ইট-খোয়া উঠে গেছে, যেন অজস্র ভাঙা-নোংরা দাঁত, হি হি করে হাসছে। দুদিন বাদে এই শিশু-শ্রমিকটিকে নিয়েই হিউম্যান স্টোরি লিখবে তোমরা, হে সাংবাদিক!

www.amarboi.com

অপরাধবোধ। মায়া। করুণা। পাঁচটাকার জায়গায় দশটাকার একটা নোট গুঁজে দিই বালকের হাতে। যা, বাকি টাকাটা তুই খেয়ে নিস। এটা তোর বকশিস।

লাফিয়ে উঠে পড়ি রেস্টহাউসের বারান্দায়। কামরায় ঢুকে পড়ি। দ্রুত ছাড়তে থাকি কাপড়। চৌকিদার, পানি আছে তো বাথরুমে? খাবার তৈরি? নিয়ে আসুন এক্ষুনি।

: ছার।

বাইরে ঐ বালকের গলা। আবার ডাকে সে। কী হলো আবার? কী বলতে চায় আমাদের হিউম্যান স্টোরির চরিত্র? ও চলে যায় নি কেন এখনও?

কামরার বাইরে আসি। দেখি বালকটি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপে। তার হাতে একটি পাঁচটাকার নোট। হাত বাড়িয়ে দেয় সে। টাকাটা নেন ছার। বকশিশ লাগবে না। আমার ন্যায্য ভাড়া পেয়েছি আমি। এতেই আমি খুশি। নোটটি হাতে গুঁজে দিয়ে রিকশার কাছে যায় সে। ধীরে ধীরে টানতে থাকে। চলে যায়।

বিদেশি সাহায্যের টাকায় গড়ে উঠা রেস্টহাউসের বারান্দায় আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ

পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেক কিছু করতে বাধ্য করে। অনেকক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া যায় না সবকিছু। কিশোর বালকের রিকশা চালনার ছবি-কাহিনী সংগ্রহের পর যেমন তার-ই বাহনে চড়ে আস্তানায় ফিরতে হয়, তেমনি চোরের ঘরে খেতে হয় খাবার। চুরি করে আনা সামগ্রী।

বছর বিশেক আগের কথা। একটি থানা এলাকায় গিয়েছি। কয়েকজন চোর এবং ছিঁচকে চোরের সাক্ষাৎকার নেব। কোন্ অবস্থায় চুরি করতে নামে তারা? তাদের অতীত কী ছিল? বাপ-দাদারা কী ধরনের পেশা করত? জমি-জমা হারাল কিভাবে? তাদের পারিবারিক অবস্থা কি-রকম? চুরির কায়দা-কৌশল শেখে কোত্থেকে?

চোর তো নানা ধরনের। সমাজের কোন্ স্তরে নেই? ছোট চোর, বড় চোর, পাকা চোর, কাঁচা চোর। গ্রামের চোর, শহরের চোর। কেউ ধরা পড়ে, কেউ থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে। এখন অবশ্য পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে। চুরি করে কেউ কেউ সেই গল্প গর্বের সাথে জাহির করে বেড়ায়। সমাজে তারা এমনই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী যে তাদের টিকিতে কেউ হাত দিতে পারে না।

আমি গ্রামে গিয়েছিলাম ছিঁচকে চোরদের জীবন-কাহিনী শুনতে। ওরা কেউ ভাত চুরি করে, কেউ চুরি করে ক্ষেতের ধান, আলু-কুমড়ো-বেগুন-লাউ-শশা। কেউ কাপড় নিয়ে যায়, কেউ ঘটি-বাটি, বাসন-কোসন। কেউ সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকে, অন্যান্য মালামাল ছাড়াও টাকা-পয়সা-অলংকার এসব সাফ করে নিয়ে যায়। সামাজিক শ্রেণীভেদের মতো চোরদেরও স্তরভেদ আছে। আছে এলাকা, অবস্থান, সময় এবং মওসুম ভেদ। শুক্লপক্ষে খুব কম চোর-ই সিঁদ কাটতে বেরোয়, ভাত চুরির হিড়িক পড়ে আশ্বিন-কার্তিকের মঙ্গার সময়। ভাতচোর ভাতই চুরি করে, সিঁদ কেটে গৃহস্থের শোবার ঘরে ঢুকবার মতো ঝুঁকি নেয় না সে।

চুরি একটি ঘৃণিত পেশা। ঝুঁকিরও বটে। সেই অবস্থায় একজন কি শখে চুরি করতে নামে? নাকি সে বাধ্য হয়? সামাজিক অবস্থাই বাধ্য করে তাকে। কাজ থাকলে, ঘরে খাবার থাকলে, ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হলে কী কারণে একটি লোক রাতের আঁধারে খুরপি-শাবল হাতে সিঁদ কাটতে বেরুবে? আর চুরি করা, অন্তত সিঁদ কেটে চুরির মতো ব্যাপারটি সহজ নয় মোটেও। জানতে হয় বিভিন্ন তথ্য এবং কৌশল। গৃহস্থের ঘরে কোথায় কোন্ মালামাল আছে, তারা ঘুমায় কখন, কোন্ জায়গায় সিঁদ কাটলে সহজে ঘরে ঢোকা যাবে—এসব তথ্য নেওয়া ছাড়াও নেংটি পরা, গায়ে তেল মাখা, একান্তই ধরা পড়ে গেলে পিটুনি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কোন্ ভেক ধরলে, এসব কৌশল জানতে হয়। থানা কিংবা কোর্টে চালান হয়ে গেলে জামিন আনতে যাবে কে, কিংবা জামিনের খরচাপাতি কে কোত্থেকে জোগাবে তা-ও ঠিকঠাক থাকে আগে থেকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরি তো হরহামেশাই হচ্ছে। চোরও আছে ম্যালা। কিন্তু আমি কী করে তাদের সন্ধান পাই! আর, আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে তো চোর বলা যায় না।

থানার ওসি আমার পূর্ব-পরিচিত। তিনি সমাদর করলেন। কিন্তু তার এলাকার চোরদের সাথে কথা বলতে চাই শুনে ঘাবড়ে গেলেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির কথা লিখুন, কোন্ মাসে কতটা চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি হয়েছে সেসব ফিগার (তথ্য-উপাত্ত) দেওয়া যাবে। কিন্তু চোরের সাক্ষাৎকার, সে-ও আবার রিপোর্টের বিষয়! তিনি শেষে বললেন, 'আর আমার এলাকায় চোর-ই বা কই? দুয়েকজন যা আছে, বাইরে চলে গেছে, তাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

অসম্ভব সম্ভব হলো যখন তার উপরওয়ালার চিঠি দেখালাম। কথাবার্তাই পাল্টে গেল তার। স্যার চিঠি দিয়েছেন? সে কথা আগে বলবেন তো? এল চা মিষ্টি, দামী সিগারেট। রাতের আশ্রয় এবং খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। গ্রামে যাবার মতো মোটরসাইকেলও জোগাড় হলো একখানা। অবশ্য ওসি সাহেব বলছিলেন যে, থানাতেই ধরে আনবেন কয়েকজন চোর। আমি জানালাম, না, বাড়িতেই যাব। ওদের ঘর-গেরস্থালির অবস্থাটাও চোখে দেখতে চাই। কথা বলতে চাই চোরের বউ এবং তার ছেলেমেয়েদের সাথেও।

থানায় রক্ষিত চোরের তালিকা দীর্ঘ। কেউ দাগী, কেউ নতুন। কেউ একাধিকবার ধরা পড়েছে, জেল খেটেছে, কেউ এ লাইনে নতুন। আমি কয়েকজন দাগী ছিঁচকে চোরের নাম-ঠিকানা টুকে নিলাম। ওসি সাহেব সঙ্গে একজন পুলিশ দিতে চাইলেন। আমি বাদ দিলাম তা। মোটরসাইকেল দেখলে ভড়কে যেতে পারে, সে কারণে চড়ে বসলাম সাইকেলে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে পুরাতন জামা। চোরের বাড়ি চিনিয়ে দেবার জন্যে আমার সঙ্গে থাকল এক ইনফরমার। না, পুলিশ বিভাগের ইনফরমার নয়, একজন ক্ষুদ্র দোকানদার। কিছুদিন আগেও সে চুরি করত, এখন ছেড়ে দিয়ে দোকান দিয়েছে। সে পুলিশের কাছে তথ্য সরবরাহ করে। শুনলাম প্রতিটি থানায় পুলিশের হাতে এ-রকম কিছু অপেশাদার 'ইনফরমার' রয়েছে। এদের কেউ কেউ বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত ছিল কিংবা আছে। এদের ধরা হয় না, তবে হাতে রাখা হয়। এরাই ধরিয়ে দেয় চোর-ডাকাত। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা আর কী! কিংবা বলা যায় ঘুঘু দিয়ে ঘুঘু ধরা।

বেশ কজন চোরের সাথে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। হলো না। কেউ বাড়িতে নেই, কেউ হাজতে বাস করছে, কেউ আবার গলার আওয়াজ পাওয়ামাত্র বাড়ির পেছন দিক দিয়ে দিল ছুট। চোরের বউ গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়ল আর লোকটি তখন ধান ক্ষেত, ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে দৌড়ুচ্ছে। সে এক অভিজ্ঞতা। ওসি সাহেব বলেছিলেন, থানায় চোর ধরে আনবেন, তা-ই করলে ভালো হতো। এভাবে সরজমিনে আসা ঠিক হয় নি।

পাওয়া গেল মাত্র একজনকে। ঐ ইনফরমারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ধরা পড়ে দুবার এবং সাজাও খেটে এসেছে। তার একটি পিতৃপ্রদত্ত নাম আছে বটে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে সে নামে কেউ চেনে না। গ্রামবাসীদের কাছে সে 'গাঁটিয়া চোর' নামে পরিচিত। লোকটি বেঁটে খাটো এবং সে-কারণেই গাঁটিয়া নাম হয়েছে। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে বেঁটে লোককে 'গাঁটিয়া' বলা হয়ে থাকে।

গাঁটিয়ার জ্বর হয়েছে। সপ্তাহখানেক ধরে বিছানায়। 'কাজে' বেরুতে পারে নি। আর একদিন 'বেকার' থাকাতেই ঘরে অভাব-অনটন হামলা করেছে তার। দুটি অপুষ্টি আক্রান্ত শিশু, তারওপর বউটি আবার পোয়াতি।

শতছিন্ন কাঁথা-জড়ানো গাঁটিয়া বেরিয়ে এল ছিন্নভিন্ন খড়ের ঘর থেকে উঠোনে। মৃদু কোঁকাচ্ছে এবং খুক খুক কাশছে। বয়স কত হবে, পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বছর। ভাঙা চোয়াল, গর্তে ডোবা চোখ, গুটি-বসন্তের ঘন গভীর দাগ, থুতনিতে একটুখানি দাড়ি। মাথার চুল ছোট ছোট, বলা যায় কদমছাঁট। ভালো করে জড়ানোর জন্যে সে যখন ছেঁড়া কাঁথাখান খুলল, চমকে উঠি। খালি গা এবং বুকের সবকটি হাড় গোনা যাচ্ছে, গলার নিচের কাঁটা দুটো প্রকটভাবে সামনে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

সালাম উচ্চারণ করি। সে-ও প্রতিউত্তর দেয় বিমর্ষকণ্ঠে। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সামনে। চোর-গিন্নী ইতোমধ্যেই একটি টুল এবং দুটি পিঁড়ি পেতে দিয়েছে। আমি পিঁড়িতে বসতে যাই, কিন্তু ইনফরমার কিছুতেই তা হতে দেবে না। অপেক্ষাকৃত উঁচু আসনটি আমার জন্যে এবং তার ভাষায় আমি 'সম্মানী লোক'।

ইনি কে? এরকম প্রশ্ন করে গাঁটিয়া তার আত্মীয়-সম্পর্কের ইনফরমারের দিকে তাকিয়ে। আমি ভাবি, পরিচয় গোপন রাখব কি? না, থাক, এর সাথে ছলনা-ভণিতা করতে মন চাইছে না। পেশা পরিচয় জানাই তাকে। পেপার, রিপোর্টার, এসব কিছুই বোঝে না সে। শুধু হা করে তাকায়। তবে বুঝি, অজানা অচেনা অতিথি ঘরে আসায় এতক্ষণ যে ভয় কিংবা শঙ্কার ছায়া তার চোখে-মুখে ছিল, তা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। আগের মতো কোঁকাচ্ছে না, কাশিটাও কম। প্রথমে আমার মুখ থেকে সালাম উচ্চারণ, টুল ছেড়ে পিঁড়িতে বসতে চাওয়া, অন্তরঙ্গ সম্বোধন, খোলামেলা কথা, সব মিলিয়ে গাঁটিয়া বুঝে নিয়েছে আমি হয়তো তার জন্যে ক্ষতিকর কেউ নই।

নীল শাড়ি পরা বউটি দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। চোখে তার থির সন্দেহ। কিন্তু গাঁটিয়া একটি গালি উচ্চারণ করল। নির্দেশ দিল গুয়া পান সাজিয়ে আনবার জন্যে এবং তৎক্ষণাৎ ঘরের ভেতর অদৃশ্য হলো মেয়েটি মুচকি হেসে। আমাদের কথাবার্তায় এতক্ষণ সে আমার সম্পর্কে কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না, কিন্তু এখন স্বামী আমাদের জন্যে পান সাজিয়ে আনতে বলায় মুহূর্তে সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে।

কথা হলো দীর্ঘক্ষণ। তার জীবন-কাহিনী শুনলাম। তিস্তাপাড়ে বাড়ি ছিল তার, পিতা ছিল তিন বিঘা জমির মালিক। কিন্তু একরাতে, ভোর পোহাতে না পোহাতেই পথে এসে দাঁড়ালো সাত সদস্যের পরিবারটি। ঘর তো নয়, নয় টিন-বেড়া, ঘরের জিনিসপত্রও সরিয়ে নেওয়ার সময় মেলে নি। শুধু ঘটি বাটি থালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকচি আর কিছু কাঁথা-কাপড় বের করে আনা সম্ভব হয়েছিল। পরদিন, সকাল হলে দেখা গেল, গোটা একটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তিস্তার করাল গ্রাসে।

খোলা আকাশের নিচে কাটল দুতিন দিন। মাথার ওপর ছাউনি নেই, খাবার নেই। তার ওপর নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। মনে আছে এ সময় পাশের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় চেয়েছিল, পায় নি। সে বাড়িতে ঘর কম, লোক বেশি। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি মাথায় করে উঠল গিয়ে মাইলখানেক দূরের এক স্কুলঘরে। একটানা চারদিন ছিল সেই 'কার্তিকের সাতাও'।

তারপর মংগা। কলেরা। গাঁটিয়া এবং তার এক বোন বাদে বাবা-মা-ভাই সবাই মারা গেল। গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এলো ওরা এতিম দুজন। কিন্তু, যেখানে আশ্রয় মিলল, সেটা ছিল একটি চোরের আখড়া। রাতের বেলা কেউ সেখানে থাকত না, জড়ো হতো ভোরের দিকে। চুরির মাল ভাগাভাগি হতো। নিজেরাই রান্না করে খেয়ে ঘুমাত সবাই। গাঁটিয়া জানালো, নয়-দশ বছরের বোনটাকে 'অংপুর টাউনে' এক বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিয়ে ঐ দলের সাথে ভিড়ে গেল সে।

: চুরি না করে কোনো কাজ করতে পারতেন আপনি?

: না, আমি চুরি করতে চাই নি। বিশ্বাস করেন, আমি গৃহস্থ ঘরের ছেলে, চুরি করব কেন? কিন্তু উপায় ছিল না সায়েব। কপালে আমাকে টেনে নিয়ে এলো। ... আমি ঐ চোরের দলের আখড়া ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তা দেয় নি। বলত, তাদের সাথে কাজে না বেরোলে আমাকে নাকি পুলিশে ধরিয়ে দেবে। আমি অনেক কান্নাকাটি করি, কিন্তু আমাকে তবু ছাড়ে নি। তারপর ...

নিয়মনীতি অনেক আছে গাঁটিয়ার। নিজের গ্রামে কখনো চুরি করতে নামে না সে। চলে যায় দূরে কোথায়। অন্য থানায়। শুনে অবাক হয়ে গেলাম যে, নিজের পাড়ার মসজিদে শুক্রবারে সে নামাজ পড়তে যায় এবং ঐদিন রাতে নাকি 'কাজে' বেরোয় না। কাজ করে না রোজার মাসে, শবেবরাতে, ঈদের দিনে। নানারকম কুসংস্কার পালন করলেও কাজে বেরোনোর আগে সে দোয়া পড়ে। তার সংস্কারগুলোর মধ্যে একটি হলো : যে রাতে 'কাজে' যায়, স্ত্রীর চুলের বেণী কিংবা খোঁপা খুলে দেয় নিজের হাতে। ধারণা : এতে করে গৃহস্থ বা পুলিশের হাতে ধরা পড়বে না সে। 'ঘর' থেকে বেরোনোর আগে বিড়ালকে সে স্মরণে আনে। বলে, 'বিলাই তোর পাঁও ধরো।' অর্থাৎ বিড়াল তোর পায়ে ধরি। গাঁটিয়ার ধারণা : এমনটি করলে, সে যদি গৃহস্থের ধরাও পড়ে, কিলও খায়, তবু সে কিল গায়ে লাগবে না। বিড়ালের শরীর নরম। মারলে নাকি আঘাত পায় না। গাঁটিয়ার ধারণা তাই এবং ঘর থেকে বেরোনোর আগে বিড়ালকে কল্পনায় আনে। অনেক ফুটবলার যেমন মাঠে নামবার আগে মাটি ছুঁয়ে কপালে ঠেকায়, তেমনি গাঁটিয়া তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ সালাম করে রাতের বেলা কাজে বেরোনোর আগে।

অনেকেই বলেন, চোরের নাকি নীতিবোধ নেই। 'চোরে শোনে না ধর্মের কাহিনী', এ-রকম একটি প্রবাদ তো সর্বত্রই চালু রয়েছে। কিন্তু গাঁটিয়া চোরের জবানিতে মনে হলো, পরিস্থিতি যাকে একদিন চুরি পেশায় নামতে বাধ্য করেছিল, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি নামাজ পড়ে, রোজার মাসে অবসর নেয় এবং অন্তত নিজের গ্রামে চুরি করতে নামে না।

কথা বলতে বলতে একসময় আবার স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে গাঁটিয়া। কই রে, আনলু গুয়া-পান? এবার ঘর থেকে গুটিগুটি পায়ে বেরিয়ে আসে নীল শাড়ি-পরা বধূটি, এখন বেশ ঘোমটা টানা, তার হাতে বড় সাইজের একটা কাঁসার থালা। আরেক হাতে পিরিচ। থালায় সাজানো কয়েক মুঠো চিঁড়া, পিরিচে একদলা গুড়। এটুকু খেয়ে নিন, গুয়া পান দিচ্ছি। এই বলে সে পাত্র দুটি সামনে রাখল, ধীর পায়ে ঘরে চলে গেল। আবার ফিরে এলো। এবার ইনফরমারের জন্যে খাবার এনেছে সে। তবে দুটি নয়, একটি পাত্র। চিঁড়া-গুড় একসাথে। পরিমাণেও সামান্য।

: ন্যেন সাইব, খান।

আমি এই মুহূর্তে বিড়ম্বিত। জীবন-কাহিনী শুনতে এসেছি, কিন্তু এক চোরের বাড়িতে এসে চিঁড়া-গুড় খেতে হবে, এটা আমি কল্পনাও করি নি।

এখন কী করি আমি? ফিরিয়ে দেব খাবার? এতে কি আহত হবে না গাঁটিয়া দম্পতি? কিন্তু জেনেশুনে খাই-ই বা কী করে? কোথায় পেল চিঁড়া? এ কি কোনো গৃহস্থের বাড়ি থেকে চুরি করা? নাকি চুরির টাকায় কেনা? আর গুড়? এই বাসন? থালা বাটি? নিশ্চয়ই কোথাও থেকে চুরি করে এনেছে গাঁটিয়া?

: সাইব, খান। হামরা গরিব মানুষ। তোমাক্ আর খাতির-যত্ন করি কি দিয়া? ন্যেন, খান।

আমার ভেতরটা তোলপাড়। প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। চোরের বাড়িতে এসে এই খাবার খাব কি খাব না! নিরক্ষর অথচ চালাক-চতুর গাঁটিয়া তা কি বুঝতে পারে? পারে। তাই সে হঠাৎ বলে ওঠে, 'সাইব, আমি বুঝতে পারছি আপনি খেতে চাচ্ছেন না!'

চমকে তাকাই লোকটার মুখের দিকে। চঞ্চল তার কুঁতকুঁতে চোখের মণি। সে আবার বলে ওঠে, সাহেব, আপনি কি ভাবছেন যে এক চোরের বাড়িতে খেলে আপনার জাত যাবে? আপনি ছোট হয়ে যাবেন? কিন্তু ... কিন্তু আমিও তো মানুষ সাহেব! ... চোর হলেও আমি মানুষের বাইরে নই। গলা কাঁপছে তার।

চৈত্রের বিকেলে তখন দমকা বাতাস উঠেছে। বুকের ভেতর ঝড়। শহর থেকে অনেক দূরের অখ্যাত এক গ্রামে, এই মেঘ-বাতাসের বিকেলে, গাঁটিয়ার উঠোনের টুলে বসে আমার গলার নিচে বিচিত্র একটা শিরশির অনুভূতি হতে থাকে। আমিও তো মানুষ সাহেব!

চিঁড়ার থালাটি হাতে তুলে নিই, যেন হেঁচকা টানে। চিঁড়ার থালাতে নিই একদলা গুড় এবং মুঠো ভরে মুখে তুলে দিই তা। ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় যে কান্না, তা ঠেকানোর জন্যে অস্বাভাবিকরকম মুখ ও মাড়ি নাচিয়ে চিবুতে থাকি শুকনো চিঁড়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ

এ-রকম আরও অনেক ঘটনা মনে পড়ে। সংবাদের বিষয় কিংবা ফিচারের চরিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে, কিন্তু পরে আমি পড়েছি বিভিন্ন বিড়ম্বনায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়। আসাম থেকে নেমে এলো ঢল, সয়লাব হয়ে গেল উত্তরের বিভিন্ন জনপদ। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে রংপুর অঞ্চলে। পানি আর পানি। অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে মানুষ। ব্রহ্মপুত্র যমুনা তিস্তা তীরবর্তী গ্রাম-জনপদে ভীষণ এক সংকট পরিস্থিতি। কাজ নেই, খাবার নেই, একটুখানি সাহায্যের আশায় কোমর কিংবা বুক সমান পানি ভেঙে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসছে মানুষ শহরে।

পত্রিকায় ভয়াবহ বন্যার খবর ছাপা হয়। হেলিকপ্টারে উড়াল দিয়ে আসেন মন্ত্রী। পরিস্থিতি সরজমিনে দেখবেন তিনি। প্রাথমিকভাবে কিছু ত্রাণও বিলি বিতরণ করবেন। অন্তত ছবি তোলার জন্যে। তারপর কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ হবে আরও রিলিফ।

আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী তখন মতিউর রহমান। এলেন তিনি। বেশ কয়েকটি বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা রংপুরের কজন সাংবাদিক। দুপুরের কিছু আগে গাড়ির বহর ছুটে চলল হারাগাছ এলাকার দিকে। শহর থেকে মাইলদশেক দূরে, তিস্তা নদীর তীরবর্তী এই জনপদ, তামাক ব্যবসা ও বিড়ির জন্যে বিখ্যাত। এখন সংখ্যা কমে গেলেও সে সময় শত শত বিড়ি প্রস্তুত কারখানা সেখানে ছিল। ছিল যেমন ন্যায্য মজুরি-বঞ্চিত বিড়ি কারিগর, তেমনি বেশ কিছু ধনী ব্যক্তির বাস সেখানে। হারাগাছ মানে রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলের একটি অর্থ-সম্পদশালী এলাকা। টাকা-পয়সা আছে তামাক ও বিড়ি কারখানার মালিকদের হাতে। সরকার যেমন এদের কাছ থেকে প্রতিবছর মোটা রাজস্ব পান, তেমনি অনেকে আবার ব্যক্তিগতভাবে দানশীল। প্রতিবছর ঈদে-পরবে লাখ লাখ টাকা যাকাত দেন তারা গরিব মিসকিনদের।

www.amarboi.com

মন্ত্রী এলাকা ঘুরে দেখবেন। দেখবেন তিস্তার ভাঙনকবলিত এলাকা। কয়েকটি সমাবেশে বক্তৃতা করবেন। তবে তার আগে দুপুরের আহার সারবেন পরিচিত এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে।

গাড়ির বহর চাকা-সমান পানি মাড়িয়ে ঐ বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। সামনে আরও বেশি পানি। গাড়ি যাবে না, হেঁটে যাওয়াও সম্ভব নয়, যেতে হবে নৌকায়।

হারাগাছ পৌঁছে দেখি কী বিচিত্র ব্যাপার। সড়কের উপর পর্যন্ত পানি, অথচ তারই উপর নয়-দশটি বিরাট বিরাট তোরণ সাজানো হয়েছে। মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অসংখ্য ফুলের মালা। হাঁটু কিংবা কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে আছে দলা দলা মানুষ, হাতে তাদের মালা এবং ব্যানার। ব্যানারে লেখা 'স্বাগতম মন্ত্রী মতিউর রহমান'। ইত্যাদি।

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাঁর বাড়িতে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা, তাঁর বিশাল ঘরে ঢুকে আমি হা। খাবার নয়, খাবারের সে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি বিশাল আয়োজন। কোরমা, পোলাও, মাংস, মাছ, ভাত, ভর্তা, ভাজি কত পদ যে রান্না হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একটি চৌকির উপর চাটাই বিছিয়ে তার উপর থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ইলিশ ভাজি। যেন একটা ঢিবি। কত মণ মাছ ভাজি করা হয়েছে সেই মুহূর্তে অনুমান করাও সম্ভব নয়। দেখি, ঘরের কোণে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দৈ-এর বড় বড় সাইজের অগুনতি হাঁড়ি। বগুড়া থেকে আনা হয়েছে বিশেষ লোক-বাহন পাঠিয়ে।

অতিথিকে আদর-সমাদর করতে পারেন বটে হারাগাছের ধনী ব্যক্তিগণ। একান্তই গরিব যারা, তারাও এর ব্যতিক্রম নন। বহুবার ঐ জনপদ সফর করে আমি দেখেছি, যতই গরিব হোন, ঘরে অতিথি এলে না খাইয়ে ছাড়বেন না কোনোক্রমেই। জবাই করবেন বাড়ির একমাত্র পোষা মুরগিটিও।

কী এত রান্না করল কী করে? কে রান্না করল? কতক্ষণে রান্না করল? শুনলাম, রান্নার জন্যে দুজন নামকরা বাবুর্চি নিয়ে আসা হয়েছে ঢাকা থেকে। উনুন জ্বালানো হয়েছে গত মধ্যরাত থেকে।

টেবিলে সাজানো হয়েছে খাবার। ফর্সা কাপড়ের ওপর সুন্দর সাজানো প্লেট গ্লাস। জগ ভরা পানি। হাত ধোয়ার জন্যে চিলমচি। পাশের একটি ঘরে দ্রুত হাতে গুয়া পান সাজাচ্ছেন একদল মহিলা। মন্ত্রী-অতিথি শুধু নয়, এলাকার আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি খাবেন, তাঁদেরও নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মধ্যাহ্নভোজে।

খেতে বসলেন মন্ত্রী। তাঁর দলবল। প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ। বসলাম আমরাও। আমার স্বাভাবিকভাবেই খারাপ লাগছিল, আদৌ পছন্দ হয় নি বিশাল এই আয়োজন। একদিকে বানের পানিতে মানুষ ভাসছে, চলছে ভাঙন, বিভিন্ন গ্রামে মানুষ রয়েছে চরম এক দুর্দশায়, একটুখানি ত্রাণের জন্যে এ জেলারই বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে আহাজারি, সেই পরিস্থিতিতে তোরণ নির্মাণ, ফুলের মালা, মানপত্র এবং ঘরভর্তি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করায় ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম আমি। অবশ্য এখন বুঝতে পারি দোষটা ছিল বয়সের।

মন্ত্রীর সাথে বন্যা ও ভাঙনদুর্গত এলাকা দেখতে এসেছি। খবর লিখব। হয়তো লিখব তাদের রিলিফ না পাওয়ার কথা, উপোস-কাপাসের আহাজারি, প্রশাসনের ব্যর্থতা কিংবা শম্বুকগতি, বরাদ্দ-স্বল্পতা, বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতি। কিন্তু তার আগে, নিজেই যা পছন্দ করছি না, তা-ই খাব?

সবাই খেতে বসলেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই। আমিও পরিস্থিতির শিকার। পেটের ক্ষুধার জ্বালাটি ইতোমধ্যে চিতিয়ে উঠেছে। বসে পড়ি টেবিলে। আমি এখন আর সাংবাদিক নই। খাদক মাত্র।

সন্ধ্যায় ফিরে আসি শহরে। টেলিফোন-কল বুক করি 'আজাদে'। দুর্গত এলাকায় মন্ত্রী আপ্যায়নের বিবরণ। পরদিন বড় শিরোনামে ছাপা হলো : 'আসাম থেকে বন্যা, ঢাকা থেকে বাবুর্চি, বগুড়া থেকে দৈ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠক খুশি হলেন। অনেকে দিলেন বাহবা। প্রশাসন ক্ষুব্ধ। মন্ত্রী বেজার হলেন। 'তুমি আমাকে এভাবে ডোবাবে, কল্পনাও করি নাই মোনাজাত।' তিনি, মন্ত্রী সাহেব, স্নেহ করতেন আমাকে, কিন্তু এরপর থেকে কথা বলা বাদ দিলেন। সামনাসামনি হলে রাগে মুখ ফিরিয়ে নেন।

কিন্তু অপমানের আরও বাকি ছিল। কদিন বাদে বন্যা তখন আর নেই, শহরের পথে হাঁটছি, পেছনে গাড়ির তীব্র হর্ন। আমি রাস্তার ধার দিয়ে হাঁটছিলাম, হর্নের শব্দে চমকে উঠি, আরও সরে যাই, পেছন ফিরে দেখি একটি নীল রঙের কার।

খটাস্ করে দরজা খুলে গেল। সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি, হারাগাছে যাঁর বাড়িতে সেদিন খেয়েছিলাম। গম্ভীর তিনি। হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন।

: তুমি সেই রিপোর্টার না?

: জি চাচা।

: তোমার বাবা আমার বন্ধু মানুষ। জানো?

: জি।

: কিন্তু তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে?

আমি কী বলব! তোতলাতে থাকি। মাথা চুলকাই। তিনি বলেন, 'আলিমুদ্দিনের ছেলে তুমি, রিপোর্টার হয়েছ, কিন্তু এতবড় নিমকহারাম তুমি? আমার ঘরে খেলে ... আবার আমার বিরুদ্ধেই রিপোর্ট লিখলে ... নিমকহারাম!'

আমি ভয়ে লজ্জায় অপমানে কাঁপতে থাকি। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে কান্না। তিনি তৎক্ষণে আবার গাড়িতে উঠে বসেছেন। সশব্দে দরজা বন্ধ হলো। সাঁ করে সামনে ছুটে গেল কার।

AMARBOI.COM

ঘ

'আজাদ' থেকে 'সংবাদে' আসার পর এ-রকম বহু অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে আটাত্তর থেকে অষ্টআশি পর্যন্ত সরজমিন প্রতিবেদন এবং দুর্নীতির ওপর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন লেখার সময়টিতে নানা বিড়ম্বনা পোহাতে হয় আমাকে। সে কাহিনী বিরাট-দীর্ঘ। অনেক দুঃখ-কষ্ট আর অপমান-ভর্ৎসনার। দুঃস্থ মাতার গম আত্মসাত করেছে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, অথচ সেই ঘটনার সরজমিন তদন্তে গিয়ে তার পয়সায় খাদ্য-খাবার খেতে হয়েছে, পরে প্রতিবেদন ছাপা হবার পর হজম করতে হয়েছে অকথ্য গালাগালি। জেলা প্রশাসক সাহেব গাড়িতে করে বন্যাদুর্গত এলাকায় নিয়ে গেছেন, বাসায় আদর করে খাইয়েছেন, কিন্তু সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণে অনিয়ম আর কারচুপির বিস্তারিত ঘটনা ছাপা হলে পরে করেছেন লাঞ্ছিত। এক বাঘা মন্ত্রী, যাঁর সাথে আমার অনেকদিনের বন্ধুত্ব, বিরোধী দলে থাকার সময় একত্রে বহু অঞ্চল সফর করেছি, রাত কাটিয়েছি একই ছাদের নিচে, একজনের খাবার দুজনে ভাগ করে খেয়েছি, পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের কাহিনী লিখলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে তাঁর কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি এসেছে। প্রকাশ্য সমাবেশে তিনি দেশ-প্রধানের কাছে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন। 'মোনাজাতউদ্দিন যা লিখেছে, মিথ্যা লিখেছে স্যার। আমাকে অপদস্থ করতে চায় সে।' এবং পরে মন্ত্র দিয়েছেন 'তাকে গ্রেফতার করা হোক' ... কিন্তু বেঁচে গেছি ঈশ্বরের কৃপায়। রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, একটি বিশেষ বিভাগের গোপন রিপোর্টও তাঁর জানা ছিল।

বিড়ম্বনা বেশি হয় যদি কোনো খবর চলে যায় আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধুর বিরুদ্ধে। প্রথমে খবর বন্ধের জন্যে চাপ আসতে থাকে, পরে ছাপা হয়ে গেলে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পাঠকমহল থেকে প্রশংসা এলেও অতি ঘনিষ্ঠজনের কাছে সৎ-সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে নিছক পাগলামো। এসব কী শুরু করেছ তুমি? কোথায় লেখা আছে সবাইকে নিয়ে খবর লিখতে হবে?

ব্যতিক্রমও আছে। একাধিকবার দুর্নীতির ওপর প্রতিবেদন লেখার পরও এখন পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে যার সাথে, তিনি এখন একজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি অতীতের সেই প্রতিবেদনগুলোর প্রসঙ্গ উঠলে বলেন, 'কষ্ট যে আমি পাই নি তা নয়। ভাবতে পারিনি আপনারই হাতে লেখা হবে আমার খবর। কিন্তু পরে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছি। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন।' একটু থেমে তিনি বলেছেন আবার, 'আমি যদি দেখতাম যে আপনি আইনের চোখে ক্ষতিকর এমন কোনো অপরাধ ঘটিয়েছেন তাহলে কি বন্ধুত্বের কারণে ছেড়ে দিতাম আপনাকে? আমার হাতে ক্ষমতা আছে, ঠিকই আটকে ফেলতাম।'

অনেকে আবার খুশিও হন। খোলাখুলি কথা বলেন আজকাল। কথার মধ্যে তাচ্ছিল্য থাকে, থাকে শ্লেষ, তবে বাস্তববর্জিত নয়। যেমন কিছুদিন আগে এক থানা এলাকায় গিয়েছি, সেখানকার সমস্যা-সংকটের ওপর একটা সিরিজ লিখব। তথ্য-উপাত্ত নেবার জন্যে একপর্যায়ে প্রশাসনের একটি দফতরে গেলাম। কর্মকর্তাটি আমার নামের সাথে পরিচিত, খুব সমাদর করলেন, দিলেন প্রয়োজনীয় ডাটা। তারপর দুদফা কফি, শীতল পানীয়, বেনসন ইত্যাদির পর তিনি বলে উঠলেন, 'আমার একটা উপকার করতে পারেন মোনাজাত ভাই?'

: কী উপকার?

মুখ সামনে টেনে আনলেন তিনি। ভঙ্গিটি এমন যে যেন কোনো গোপন কথা বলবেন। দু'হাত জড়ো করে মাথাটি ভর করালেন তাতে। বললেন, আমার বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট লিখবেন আপনার পত্রিকায়?

আমি বিস্ময়ে হতবাক। বলেন কী! এবার তিনি হে হে করে হেসে উঠলেন, হাতের ভর ছেড়ে তড়াং করে হেলান দিলেন গদিআঁটা চেয়ারের পিঠে। বললেন, কম দুঃখে কি কথাটা বললাম ভাই! অনেকদিন ধরে কত চেষ্টা-তদবির করছি, কোনোমতেই ট্রান্সফার হতে পারছি না। তা এবার যদি আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট-টিপোর্ট ছাপা হয়, উপরওয়ালা অ্যাকশন নেবেন। ট্রান্সফারটা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হা হয়ে যাই। এ কি নিতান্তই ঠাট্টা-মশকরা করছেন তিনি? সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা সম্পর্কে কী করে তাঁর এমন হালকা ধারণা জন্মাল? চেষ্টা-তদবিরে কাজ হচ্ছে না, এখন 'বিরুদ্ধে' খবর ছাপলে বদলি ত্বরান্বিত হয়ে যাবে? এই ধারণা তার কিভাবে হলো?

আমি বিরক্তিবোধ করি। আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন? শরীর দুলিয়ে হা হা করে ওঠেন তিনি। আমার কথায় মাইন্ড করেছেন? সরি, মাফ করবেন আমাকে। আসলে ... আমি ...

কথা শেষ হবার আগেই চেয়ার ছাড়ি আমি। রাগে এবং দুঃখে বেরিয়ে আসি কামরা থেকে।

৬

কিন্তু না, এক কামরা থেকে বেরুলেও সবার সব কামরা থেকে বেরোনো যায় না। যেমন : মফিজার রহমানের বাসা থেকে সহজে বেরুতে পারিনি আমি। তার বাসায় দীর্ঘক্ষণ থাকতে হয়েছে, দুপুরে ও রাতে খেতে হয়েছে নানারকম খাদ্য-খাবার। 'এতদিন পর পেয়েছি যখন কোনোমতেই ছাড়ব না'। তিনি নিজে গিয়ে বাজার থেকে বড় মাছ আনলেন, রাতে আয়োজন করা হলো কোরমা-পোলাও ছাড়াও বারো-তেরো পদের খাবারের। এড়িয়ে যাবার জন্যে নানারকম কায়দা-কৌশল করলাম, কিন্তু তবু রেহাই মিলল না। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার জীবনের। সকাল দশটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তেরটি ঘণ্টা আমি মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছি এবং কী আশ্চর্য, আমাকে খেতে হয়েছে, ভিসিআর-এ ছবি দেখতে হয়েছে, পারিবারিক অ্যালবাম দেখতে হয়েছে, মফিজার রহমানের জীবন-কাহিনী শুনতে হয়েছে। ... ঘরে ফিরে সে রাতে আমি বিন্দুমাত্র ঘুমোতে পারিনি। মফিজার রহমান কি অতিথি আপ্যায়ন করলেন, নাকি করলেন চরম নির্দয় এক কৌতুক? তিনি বার বার বলছিলেন, মোনাজাত সাহেব, আপনার জন্যেই আমার এই ভাগ্যবদল ... এবং ভীষণ এক উপকার করেছেন আপনি। নইলে আজ আমি কোথায় পড়ে থাকতাম! হা হা।

ঢাকা শহরে বাড়ি তুলেছেন মফিজার রহমান। নতুন গাড়ি কিনেছেন। ব্যবসা এখন তার তুঙ্গে। যিনি ছিলেন একটি জেলাশহরে মধ্যম শ্রেণীর এক কর্মকর্তা, তিনি এখন রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বয়সের সাথে মেদ বেড়েছে, দাড়ি রেখেছেন এবং কপালে কালো দাগও পড়েছে। বহুবছর বাদে ঘটনাক্রমে একটি ছাপাখানায় তাঁর সাথে দেখা। আমার 'পথ থেকে পথে' বইটি ছাপার কাজ চলছিল, একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাপানোর জন্যে মফিজার রহমান গিয়েছিলেন সেখানে।

আমি তাঁকে ভুলে গিয়েছিলাম। কত মানুষ কত মুখ কত ঘটনা ... সব কি মনে থাকে? কিন্তু তিনি চিনলেন আমাকে। একরকম জোর করে তুললেন গাড়িতে। 'কোনো কথাই শুনব না আপনার। গরিবখানায় যেতেই হবে এবং আজই, এক্ষুনি আমার সাথে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথায় কথায় হেঁ হেঁ করে হাসেন তিনি। গাড়িতে তুলে নিয়েই বললেন, আমাকে কি আর মনে আছে আপনার? সেই যে কতবছর আগে দেখা, তা-ও একবার, একটু সময়ের জন্যে ...

মনে পড়ে। মনে পড়ে আর ভীষণ রকম অস্বস্তিতে ভুগতে থাকি। এ কী এক প্রহসনের মঞ্চে টেনে নিয়ে এল আমার ভাগ্য। ... আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির ... মুখে কথা সরছে না ... দম কি বন্ধ হয়ে যাবে আমার? অথচ মফিজার রহমান বেশ সহজ স্বাভাবিক। কথা বলেই যাচ্ছেন। হাসছেন। বাসায় নিয়ে যাবার পর বাঁধিয়ে ফেললেন প্রায় হুলুস্থুল। পরিচয় করিয়ে দিলেন স্ত্রীর সাথে। এই সেই মোনাজাতউদ্দিন, রিপোর্টার, যার কথা ...

সালাম বিনিময়ের পর লক্ষ করি, ভদ্রমহিলা আমাকে হাঁ করে দেখছেন। বিচিত্র চাহনিতে ছিল বুঝি কৌতুক, তার সাথে ঘৃণা। আমি অপরাধীর মতো মাথা নামিয়ে নিই। পরে, আমাকে ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলতে দিয়ে মফিজার রহমান যখন নিউমার্কেটে গেলেন বাজার করতে, আমি তখন ভাবছি, পালিয়ে যাব কি এখন?

বহুবছর আগের ঘটনা। তখন আজাদে কাজ করি। একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের দায়ে মফিজার রহমান প্রথমে সাময়িক বরখাস্ত হন, পরে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত সম্পন্ন হবার পর চাকরি চলে যায় তার। ... মনে পড়ে অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি বছর দুয়েক ধরে চাপা পড়েছিল, কিন্তু পত্রিকায় আমার একটি প্রতিবেদন ছাপা হবার পর প্রথম জনসমক্ষে বেরিয়ে আসে তা। ঢাকার কর্মকর্তারা পত্রিকায় খবরটি পড়েই সাময়িক বরখাস্তের চিঠি পাঠিয়ে দেন।

সেই মফিজার রহমান চাকরি হারিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। বরখাস্ত হলেও কোনো মামলা হয় নি তার বিরুদ্ধে। হাতে টাকা-পয়সা যা ছিল, তা দিয়ে শুরু করেন ব্যবসা ... এবং আজ তিনি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত।

সে কারণেই বার বার বলছিলেন, সেদিন আমার খবর লিখে ভালোই করেছিলেন রিপোর্টার। নইলে আজ কোথায় পড়ে থাকতাম আমি! হয়তো দুয়েকটা প্রমোশন হতো, কোনো জেলায় পড়ে থাকতাম ...

আমি ভাবতে থাকি। মফিজার রহমান নিজেইতো ব্যাপারটিকে সহজ-স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন! অর্থ আত্মসাতের খবরটি প্রকাশ করে দেওয়ায় উপকার হয়েছে তাঁর এবং তাঁরই ভাষায় 'জীবনের মোড়' তাঁর ঘুরে গেছে। আমি কেন গ্লানিতে ভুগছি?

কিন্তু তবু মন মানে না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধছে। সে কাঁটা কি পেশার অবমাননার? নাকি অন্য কিছু?

নিজের দংশনের জ্বালায় বিচলিত হয়ে উঠি। অস্থির লাগছে। তুমি আমাকে শান্তি দাও ঈশ্বর।

: কী হলো, খাচ্ছেন না কেন? মাছটা কেমন বললেন না তো! মফিজার রহমান ভাত চিবাতে চিবাতে বলতে থাকেন : ওগো, রিপোর্টার সাহেবকে আরেক টুকরো মাছ দাও ...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

নিজের খবর

সব খবরই খবর? সব খবরই ছাপা হয়? না। বাতিল হয়ে যায়। ব্ল্যাক-আউট হয়। 'কিল' হয়। কম্পোজ, মেকআপ এমনকি ছাপা হয়ে যাবার পরেও পাঠকের সামনে আসে না তা।

নিজের জীবনের ঘটনাই বলি। বাহাত্তর সালের কথা। তখন 'আজাদে'র নিজস্ব সংবাদদাতা। হাতে সময় প্রচুর। ভাবলাম রংপুর থেকে একখানা দৈনিক পত্রিকা বের করলে কেমন হয়? মিনি সাইজের দৈনিক, দাম থাকবে খুব কম। জাতীয় নয়, এতে থাকবে শুধু স্থানীয় খবরগুলো। এ অঞ্চলে কলকারখানা নেই, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনও তেমন মিলবে না, তবে পরে যখন সরকারি বিজ্ঞাপন মিলবে তখন বড় আকারের করা যাবে কিছু।

ছোট হোক বড় হোক, পত্রিকা বের করতে হলে টাকা লাগে। কিন্তু পাব কোথায়? 'আজাদ' তখন কিছু টাকা-পয়সা দেয় বটে, কিন্তু সংসারই চলে না তাতে।

অর্থ-জোগানদার একজন পাওয়া গেল। ব্যবসায়ী। বাড়ি পাবনার গ্রামে, অনেকদিন হলো রংপুরে আছেন। খুব দিলদরিয়া মানুষ, পড়াশোনার দিকে বেশ ঝোঁক আছে। শুনলাম তিনিও নাকি অনেকদিন ধরে ভাবছিলেন একখানা পত্রিকা বের করার কথা। না, নাম প্রচারে তাঁর দরকার নেই, এমনকি প্রিন্টার্স লাইনে প্রকাশক হিসেবে নামও থাকবে না তাঁর। নেপথ্যে থেকেই তিনি সংবাদপত্রের 'সেবা' করে যাবেন।

পত্রিকার নাম ঠিক হলো। দৈনিক রংপুর। ডিক্লারেশন মিলল সহজেই। সম্পাদক আমি। কয়েকজন তরুণ রিপোর্টার যোগ দিলেন।

এক পাতার দৈনিক। মাত্র পাঁচ পয়সা দাম। এমন সব খবর পরিবেশন করা হতে থাকল যে, গরম পিঠার মতো বিক্রি হয়ে যায়। পত্রিকা পাবার জন্যে অনেক পাঠক সেই ভোরবেলা প্রেসে এসে হাজির হন। প্রচার-সংখ্যা বাড়তে থাকে দিনে দিনে।

কিন্তু শুধু কাটতি হলেই পত্রিকা চলে না। দরকার বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপন না আসা পর্যন্ত কিছু লোকসান হতেই থাকবে। হকারদের কমিশন দেওয়ার পর যে টাকাটা আসে, তা পুরো নয়। টাকা বাকি থাকে। প্রাপ্ত টাকায় নিউজপ্রিন্ট কেনা যায়, প্রেসের খরচ জোগান দেওয়া যায় না। আমার অবশ্য এসব নিয়ে তেমন চিন্তা নেই। টাকা জোগান দিয়ে যাচ্ছেন সেই ব্যবসায়ী-বন্ধুটি।

পত্রিকা নিয়মিত বেরুচ্ছে। সকালে ঘর ছাড়ি, ফিরি রাত তিন-চারটায়, প্রেসে ছাপা শুরু হবার পর। 'আজাদ প্রেসে' একটা পা-চালিত যন্ত্রে ছাপা হয় 'দৈনিক রংপুর'। প্রেসের মালিক কাশেম, আমার বাল্যবন্ধু, দৈনিক পত্রিকা বের করার কারণে ঢাকা থেকে নতুন কিছু টাইপ নিয়ে এলো, কিন্তু প্রুফ কপি বের করতে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালির ওপর ভেজা নিউজপ্রিন্টের টুকরো চাপিয়ে, পা দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে। আর বিদ্যুৎ প্রায়-ই থাকত না, মেশিনম্যান একটা কুপি জ্বালিয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দে একেকটা কপি বের করতেন ট্রেডল মেশিন থেকে।

পত্রিকার কাটতি ভালো। কিন্তু আয় নেই। এভাবে দিন গড়াচ্ছে। আলাদা একটা অফিস ভাড়া নেওয়া হলো। ছোট্ট এক কামরার একটি টেবিল, তিন চারটে চেয়ার। কখনো রিপোর্টাররা বসেন, কখনো সার্কুলেশনের লোকজন। লিড আইটেম আমিই লিখি। একেবারে টাটকা ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা দালালি করেছিল তাদের কাহিনী থাকে প্রতিদিন। তখন পাঠকদের কাছে এর চাহিদা বেশি। বিভিন্ন অফিসের দুর্নীতির খবর-সবরও পছন্দ করেন তারা।

এক সন্ধ্যায়, খবর পেলাম শ্যামপুর চিনিকল থেকে রংপুর শহরে চিনি আনতে গিয়ে মাঝপথে ৪০ বস্তা গায়েব হয়ে গিয়েছে। সে সময় চিনি, গুঁড়ো দুধ এসব অত্যন্ত সেনসেটিভ ব্যাপার। বাজারে দাম অত্যন্ত চড়ে গেছে। কালোবাজারিরা চুটিয়ে ব্যবসা করছেন।

৪০ বস্তা চিনি গায়েবের খবরটি তৎক্ষণাৎ লেখা হয়ে গেল। এটাই লিড আইটেম। প্রেসের মালিক কাশেমের হাতে খবরটি দিয়ে বললাম, কেউ যেন জানতে না পারে এই খবরটির কথা। জানবি তুই, আর কম্পোজিটার সাহেব। প্রুফ আমি নিজে দেখব।

খবরটি পড়ল কাশেম। মাথায় হাত দিয়ে বসল। এ খবর কী করে ছাপবি?

: নিশ্চয়ই ছাপা হবে।

: তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

: তুই যা-ই বল, খবরটা ছাপা হবেই।

কম্পোজ হয়ে গেল। দেখা হলো প্রুফ। মেকআপের পর গভীর রাতে 'ম্যাটার' প্রেসে উঠল। বিদ্যুৎ ট্রিপ করেছে। কুপির স্বল্প আলোয় আমাদের ছায়া কাঁপছে দেয়ালে। মেশিনের ঘটাং ঘটাং শব্দ।

এ সময়, প্রেসের সামনে রিকশা থেকে লাফিয়ে নামলেন কেউ। ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন একজন। পত্রিকার অর্থ-জোগানদাতা। ভীষণ উত্তেজিত তিনি, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তোলা লুঙ্গি, জামার বোতাম তড়িঘড়ি করতে গিয়ে উপর-নিচ হয়ে গেছে, এলোমেলো চুল, কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছেন : 'আমার বিরুদ্ধে নাকি খবর যাচ্ছে?'

চিনি গায়েবের হোতা দৈনিক রংপুরের ঐ অর্থ-জোগানদার। ব্যবসায়ী। বুঝলাম, যেভাবেই হোক খবরটি লিক্ হয়ে গেছে। গভীর রাতে, তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, সর্বনাশের খবরটি দেওয়া হয় তাঁকে। ছুটে এসেছেন।

কাশেম যেখানে বসে, তার পেছনে কাঠের খাটো বেড়া। বেড়া ডিঙিয়ে তিনি মেশিনের কাছে যান। দ্রুত হাতে কপি তুলে নেন একখানা, কুপির সামনে এনে শিরোনামে চোখ বুলান। খবরটি পড়ার দরকার হয় না। তিনি রাত কাঁপিয়ে ইংরেজি বাংলায় চিৎকার করে ওঠেন, 'নো নো, এ খবর ছাপা হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে চিৎকারে মেশিনম্যানের হাত থেমে যায়, ঘেউ ঘেউ করে ওঠে পথের কুকুর, ধুলোয় শুয়ে থাকা ছিন্নমূল মানুষের ঘুম ভাঙে। কিন্তু কাশেম থির-গম্ভীর, হাতের একটা স্কেল দিয়ে টেবিলে খটাস খটাস করে আঘাত করছে। আমি ধীরকণ্ঠে বলে উঠি : এদিকে আসুন আপনি। ও খবর ছাপা হবে।

বেড়া ডিঙিয়ে আমার সামনে আসেন তিনি। কাঁপছেন উত্তেজনায়। আমার টাকায় পত্রিকা বেরোয়, সেই পত্রিকায় আমারই বিরুদ্ধে খবর ছাপা হবে? আপনি কি পাগল নাকি?

: শান্ত হোন। এ খবর ছাপা হবে। সত্য ঘটনা। আমি নিজে লিখেছি। ...

: না, অসম্ভব ... অসম্ভব ... ইম্পসিবল।

: ছাপা হবেই এ খবর। এবার আমি গলা চড়িয়ে কথা বলি। তিনি কণ্ঠ শুনে ভড়কে যান। ভীত চোখ। মুখ নিচু করলেন। আবার তোলেন। হাতের ওপর কাঁপা হাত রাখেন তিনি। মোনাজাত ভাই ...

: এ খবর ছাপা হবে ...

: না, এ খবর ছাপতে পারবেন না। আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে যায় তাঁর। টাকার প্রস্তাব দিয়ে বসেন। মোনাজাত ভাই ... আপনার সংসার আছে ... টাকার দরকার আছে ...

: না, এ খবর ছাপা হবে।

: এক হাজার টাকা দেব।

: না ...

: দু হাজার দেব আপনাকে।

: না ...

ভেতরে মেশিনম্যান এবং বাইরে এক পাহারাদার আর ফেরিওয়ালা আমাদের এই সংলাপ শুনছে। কৌতূহলের চোখে থাকে বুঝি কিছু উদ্বিগ্নতাও। কাশেম এখনও থির। মাথা নিচু করে আছে সে।

কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে অটল। খবর ছাপা হবেই। নইলে কী থাকল তার সৎ সাংবাদিকতার! আমি পত্রিকা বের করব, সবার দুর্নীতির খবর লিখব, ছাপব, শুধু চাপা থাকবে আমারটা? না, তা হতে পারে না। টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব নয় সত্য এ বিবরণ।

হাতে ধরে কাজ হয় না। টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ হয় না। তিনি এবার পরিবারকে টেনে আনেন। মোনাজাত ভাই, আপনার মেয়ে হয়েছে না। আমি সেই মেয়ের দোহাই দিয়ে বলছি ... সেই মেয়ের মাথার কিরা (দিব্যি) দিয়ে বলছি, এ খবর আপনি ছাপতে পারবেন না ...

বয়স তখন কম। সৎ-সাংবাদিকতার নেশায় মত্ত। রক্ত টগবগ। নীতি-আদর্শের কথা বলি। কিন্তু সংস্কারমুক্ত নই। আমার মেয়েটি ... কয়েকমাস আগে যার জন্ম হয়েছে ...

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চমকে উঠি। হঠাৎ বিচিত্র একটা আবেগ আমাকে পেয়ে বসে। আমার মেয়ে ... আমার অতি আদরের কন্যা ... তার ...। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করি : কাশেম, ম্যাটার নামাতে বল।

বাহাত্তর থেকে বিরানব্বই। দু' দশক। সমাজ যেমন বদলেছে তেমনি আমার মন-মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। আমি এখন আর নীতি-আদর্শ সততার কথা বলি না, সৎ-সাংবাদিকতার কথা ভাবি না, জীবনের চরম বাস্তবতার এমন শিকার যে; চোখে দেখা ঘটনা এড়িয়ে যাই। আমি এখন বহুজনের মতো ...।

৭
বাঁশ ও খুঁটি

কিছু কিছু মানুষ দেখবেন যারা মজুরির বাইরেও বাড়তি কিছু চায়। যেমন চায় বখশিশ, থাকলে পুরাতন কাপড়-চোপড়, এটা-ওটা। পেশাদার ভিক্ষুক যারা, তাদের ক্ষেত্রেও এ-রকম ঘটে। পয়সা দিলে বলে একটু খাবার দেন। খাবার দিলে বলে ছেঁড়া ফাটা লুঙ্গি কিংবা শার্ট দেন। আবার, বিভিন্ন অভাবী অঞ্চলে এমনও দেখেছি, একই ব্যক্তি দিনের বেলা মজুরি খাটে, সন্ধ্যার পরে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে খাবার মাঙে। অত্যন্ত অসহায় এরা। ৮-১০ টাকা মজুরিতে সংসার চলে না, হাত পাততে হয় ভিক্ষের।

নুরুল ইসলাম ওরফে পাখি অবশ্য ক্ষেতমজুর নন, নন ভিক্ষুক। তিনি একজন জুতা পালিশওয়ালা। শহরের সাধ্যবানের ঘরে পালিশের কাজ করতে এলে পয়সার পরেও তিনি বাড়তি কিছু চান। তবে টাকা নয়, খাবার নয়, কাপড় নয়, চান একটা বাঁশ।

: বাঁশ! বাঁশ দিয়ে কী করবেন আপনি? পাখিকে জিজ্ঞেস করি। পাখি বলেন, 'ঘরটি আমার কাত হয়ে পড়েছে স্যার, কয়েকটা খুঁটি দিতে না পারলে একেবারেই পড়ে যাবে যে।'

কিন্তু কে একটি বাঁশ সাহায্য করবে পাখিকে! এমনিতেই ন্যায্য পাওনাটুকু মেটায় না অনেকে, চার টাকার জায়গায় তিন টাকা দিয়ে বলে, যা ব্যাটা ভাগ। সেখানে আবার বাঁশ কিনে দেবে ৪০-৫০ টাকা দিয়ে? ফলত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তার বাঁশ-সাহায্য প্রার্থনা। একজনের কাছে পান না, আরেকজনের কাছে যান। এভাবে অপরজনের কাছে এবং এভাবে, বাঁশ প্রার্থনা এখন তার ম্যানিয়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসল নাম মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। বাপ-মায়ে আদর করে ডাকত নুরু। কিন্তু নুরুল ইসলাম বা নুরু নামে রংপুর শহরে পরিচিত নন তিনি। কে যেন নাম দিয়েছে তার পাখি এবং সে নামেই সবাই চেনে। সুদীর্ঘ বাইশটি বছর ধরে জুতা স্যান্ডেল পালিশ করেন, হাত অত্যন্ত পাকা, চমৎকার তার কাজ। মাথা ঝাঁকিয়ে এত দ্রুত ব্রাশ চালান, মুহূর্তে চকচকে করে তোলেন জুতার পিঠ, সে এক তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার মতো দৃশ্য বটে। তবে পাখি নামের ইতিহাসটি অজানাই থাকে। পাখি যেমন এ ডালে ও ডালে ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ে, তেমনি লোকটি পালিশের কাজে চলে যান শহরের এখান থেকে ওখানে, মনে হয় সে-ই থেকে কেউ পাখি নামটি দিয়ে থাকবেন।

পাখি নামটি যেমন সুন্দর, যেমন চমৎকার তার হাতের কাজ, দ্রুত চলাফেরা, সহজ-সরল ব্যবহার, কিন্তু চেহারা দেখলে গা ঘিনঘিন করে। ঝড়ে ভাঙা পাখির বাসার মতো মাথার চুল, থুতনিতে একগোছা আধাপাকা দাড়ি, দেবে যাওয়া চোয়াল ও চোখ, বাঁকা পিঠ, বুকের প্রতিটি হাড় গোনা যায়। পরনে শতচ্ছিন্ন লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি একখানা, পা তো খালি-ই তা-ও আবার গোড়ালি ফাটা। তার এই ভাঙা-নোংরা চেহারা দেখলে মনে করা অতি দুষ্কর যে, এর-ই হাতে শহরের সাহেব-বাবুদের মলিন পাদুকা নিমিষে কত ঝকঝকে তকতকে হয়ে ওঠে! অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি অসুন্দরের মাঝেও সুন্দরকে খুঁজে বেড়ান। পাখি তাঁদের সামনাসামনি হলে পরে নিশ্চয়ই তেমন বাস্তব একটি চরিত্রের সন্ধান পাবেন তাঁরা। তবে হিসেব মিলবে না শুধু গোড়ালি ফাটা পায়ের কাছে এসে। সেই ফাটা যেন উপহাসের হাসি। এদেশের কিষান-মজুর খাদ্য-শস্য ফলিয়েও যেমন থাকে উপোসে, তেমনি পাখি, বহুজনের পাদুকা চকচকে করে নিজের পায়ের গোড়ালিতে ঘা তৈরি করেছে। দেহে কিসের ঘাটতি থাকলে পা ফাটে জানেন না পাখি, তার সাধারণ ধারণা 'হাঁটতে হাঁটতে' এ অবস্থা হয়েছে। সেই ভোর থেকে সন্ধ্যাঅব্দি শুধু হেঁটে বেড়াতে হয় শহরময়।

AMARBOI.COM

একসময় তার বসবার জায়গা ছিল। রংপুর শহরের পুরাতন হাসপাতালটি যেখানে, তার সামনে বাক্স সাজিয়ে বসতেন তিনি। কিন্তু একদিন সেখানে নির্মিত হলো সারিবদ্ধ পাকা দোকানঘর। উচ্ছেদ করা হলো পাখিকে। এক জায়গা থেকে এখন অনেক জায়গায়।

এ-রকম জায়গা বদল-ই যেন পাখির জীবন। তার বাড়ি ছিল বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুরে। গ্রামের নাম ঘড়িসার-কার্তিকপুর। বাপের ছিল ২০ বিঘা জমি, অর্থাৎ সে যুগে সচ্ছল কৃষক তারা। কিন্তু নদী গ্রাস করল সমস্ত জমি-জমা। নদীর ছোবলের মুখ থেকে ১৪ বার বাড়ি সরালেন, তবু রক্ষা পেলেন না কৃষক। সম্পূর্ণ ভূমিহীন অবস্থায় চলে গেলেন ফরিদপুর থেকে চাঁদপুরের এক গ্রামে, সপরিবারে। ছেলেমেয়েদের নাবালক অবস্থায় রেখে কলেরায় মারা গেলেন নুরু ওরফে আজকের পাখির বাবা-মা।

চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা। আবার চাঁদপুর। সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জে। তারপর একদিন ভাগ্য তাকে টেনে নিয়ে এলো রংপুরে। এতিম নুরু আশ্রয় পেলেন তিস্তা এলাকার এক গৃহস্থের বাড়িতে। করিমউদ্দিন তার নাম। তিনি হয়ে উঠলেন নুরুর ধর্মপিতা।

কৃষক-সন্তান নুরুল ইসলাম জীবিকার প্রয়োজনে ইতোমধ্যে জুতা পালিশওয়ালা হয়েছেন। তিস্তা থেকে এলেন রংপুর শহরে। যে যুগে এক কৌটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালির দাম ছিল সাড়ে পাঁচ আনা, ক্রিমের দাম তেরো আনা, সাড়ে ছআনা হলে একটা ব্রাশ মেলে, তখন তার এই পেশার শুরু। পরে হলেন নুরু থেকে পাখি। কিন্তু নামের পরিবর্তন হলেও বয়স এবং সন্তান বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু হয় নি তার। বরং আয়-উপার্জন কমেছে। হাসপাতালের সামনে যখন বসতেন, দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ টাকা কামাই হতো। উচ্ছেদ হবার পর পথে পথে ঘুরে কাজ, মেলে ২৫ থেকে ৩০ টাকা। অথচ ঘরে 'খানেওয়ালা' ৬ জন। ৪টি সন্তান আর স্বামী-স্ত্রী দুজন। একার আয়ে সংসার চলে না বলে কদিন হলো বড় ছেলে আলালকেও জুতা পালিশের পেশায় নামিয়েছেন। ছেলেটি ১০-১২ টাকা আয় করে। এর পরেরটি দুলাল, এখনও ছোট। পাখি অপেক্ষা করছেন কবে এই ছেলেটিও 'লায়েক' হবে এবং পালিশের কাজে নামানো যাবে তাকে। পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়েছে পাখির, আগের মতো নাকি চলতে-ফিরতে পারেন না। এখন ঐ ছেলেরাই তার 'ভবিষ্যৎ'।

সন্তানদের লেখাপড়ার কথা ওঠে। পাখি হাসেন ঠোঁট বাঁকিয়ে। কী তামাশার কথা বলছেন সাহেব! স্কুলে পড়ে হবেটা কী? কাজ-কাম করতে হবে না? খেটে খেতে হবে না? আমি তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, আর কতদিন কাজ করতে পারব?

: আপনি কি জানেন দেশে সকলের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার করছেন? বাধ্যতামূলকভাবে প্রাইমারি স্কুলে যেতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় সহজ করে কথাগুলো বলি। তিনি আদৌ কিছু বোঝেন না। তবে একটু আগের ঠোঁট-বাঁকানো হাসির জায়গায় চোখেমুখে ভয়ের ছায়া জমে। ওরা কি জোর করে ধরে নিয়ে যাবে আলাল-দুলালদের? তাহলে আমার সংসার চলবে কী করে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না। শিশুশ্রমের ওপর বহু প্রতিবেদন আমি লিখেছি, লিখেছি গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার হাল হকিকত, বহু ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে পারছে না, বাবার সাথে জমিতে শ্রম দিচ্ছে, পরিবারের চাকাটি গড়িয়ে নেওয়ার জন্যে বাড়তি আয় করছে তারা। বলেছি সবার জন্যে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু এতদিন পরে পাখির মুখে প্রশ্ন শুনে মনে হয়, না, বাস্তব অবস্থাটি ভিন্ন। প্রচলিত যে সামাজিক ব্যবস্থা তা ভেঙে গুঁড়িয়ে না ফেলা পর্যন্ত 'সবার জন্যে শিক্ষার' কথা বলে লাভ নেই। ভূমিহীন এবং স্বল্প আয়ের মানুষ, পাখিগণ এবং তাদের সন্তানেরা যখন শ্রমের যন্ত্রের মতো, যাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, থাকলেও কয়েকটি খুঁটির অভাবে তা পড়ো-পড়ো, তাদের কাছে সর্বজনীন শিক্ষা কিংবা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা মানে হয় ঠোঁট-বাঁকানো হাসি, নয়তো কারও কাছে আতঙ্কের : 'তাহলে আমার সংসার চলবে কী করে সাহেব?'

পাখির নিবাস বদরগঞ্জে। রেলওয়ের জমির ওপর কয়েক হাজার দুঃস্থ-দুঃখী পরিবারের বাস, সেখানেই ওর একটিমাত্র খড়ের ঘর। তা-ও এখন পড়ো-পড়ো। তাইতো একটি বাঁশ চান তিনি। পুরাতন খুঁটি বদলাবেন। নইলে মাথার ওপর ভেঙে পড়বে চাল। ফরিদপুরের যে কৃষকটির ২০ বিঘা আবাদি জমি ছিল, টিন আর খড়ের ঘর ছিল সাতখানা, আজ তারই সন্তানের এ কী অবস্থা! এবং এরপরে? আলাল-দুলালেরা যুবক হয়ে সংসার পাতবে কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। পাখির বিস্তারিত জীবন-কাহিনী শুনবার জন্যে জিজ্ঞেস করি : আপনিতো নারায়ণগঞ্জ থেকে এলেন তিস্তায়। সেখান থেকে বদরগঞ্জে গেলেন কিভাবে?

: সে আরেক কাহিনী সাহেব। পাখি বলেন।

: কী-রকম?

: এলাম আমি তিস্তায়। আশ্রয় পেলাম। প্রথমে করিমউদ্দিনকে ডাকতাম চাচা। পরে ধর্মপিতা ডাকলাম তাকে। বিয়ে করলাম তার মেয়েকে।

পাখি তার কাহিনী বলে যান। প্রথমে তার নাকি আপত্তি ছিল। যাকে ধর্মপিতা বানিয়েছেন, তার মেয়েকে বিয়ে করবেন? কিন্তু করতে বাধ্য হলেন। মেয়েটা নাকি নুরুকে বিয়ে করবার জন্যে 'পাগল' হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমি আজকের বৃদ্ধ ভাঙা অপরিচ্ছন্ন এবং পিঠ বাঁকা—গেঁয়ো পাখিকে অতীতের সাথে মেলাই, কল্পনায় খুঁজি তার যৌবন। কী-রকম দেখতে ছিলেন তিনি? 'পাগল' করে তুলেছিলেন একটি নারীর হৃদয়!

: আমি ঐ গ্রামেই থাকতে চেয়েছিলাম স্যার। কিন্তু পারিনি। আমার শ্বশুরের ছিল দুই বউ। বড় বউয়ের ঘরে দুই বেটা। আমার স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের। তা ঐ বড় বউয়ের বেটা দুজন করল কী, পিতার সমস্ত জমি জাল করে নিজেদের নামে লিখে নিল। তারপর একদিন পিতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল এবং আমাদেরও। গৃহস্থ মানুষ আমার ধর্মপিতা, শ্বশুর, তিনি অপরের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন, শুরু করলেন ভিক্ষা।

নিজের সন্তানদের কুচক্রে কৃষক থেকে ভিক্ষুকে পরিণত হলেন এক পিতা। তারপর উপোস-কাপাসে থাকতে থাকতে পড়লেন পেটের ব্যারামে। একদিন ... বলতে বলতে বিমর্ষ হয়ে ওঠেন পাখি।

: পেটের অসুখে মারা গেলেন তিনি?

: না স্যার।

: তাহলে?

: মারা গেলেন ঘর চাপা পড়ে।

আমি চমকে উঠি।

: হ্যাঁ স্যার, তিনি ছিলেন অসুস্থ। পেটের ব্যারাম। ঘা হয়েছিল। ঘর থেকে বেরুতে পারেন না, বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, এ-রকম অবস্থায় একরাতে ঝড় উঠল ...। কথা অসমাপ্ত রেখে একটু থামলেন পাখি। একটু পরে ধীর এবং নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'স্যার ... যে ঘরে তিনি থাকতেন তার খুঁটি ছিল পুরাতন। অনেকদিন বদলানো হয় নি ... ভেঙে পড়ল তার শরীরের ওপর। বুড়োকে বের করে আনার সুযোগ ছিল না।

'তারপর আমরা, আমি আর আমার স্ত্রী, তিস্তার গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম বদরগঞ্জে। তেরো-চৌদ্দ বছর হলো সেখানেই আছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি-বাদলার দিন ছাড়া প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘর ছাড়েন পাখি। ট্রেনে চেপে আসেন রংপুর শহরে। ঘরে ফিরে যান সন্ধ্যায়। কোনো কোনো দিন রাতও হয়ে যায়। দুপুরে ভাত জোটে না; খান ছোলা, মুড়ি, খুব হলে একটুকরো রুটি। অর্ধাহারে থাকা লোকটি, পঞ্চান্ন বছরের পাখি, শহরের সাহেব-বাবুদের পাদুকা ঘষে-মেজে চকচকে করেন, নিজের দেহ এবং জীবন যাপন থাকে ময়লা-নোংরা। আমাদের সমাজব্যবস্থা এমনভাবে গড়া নয় যে, এখানে কামলা কিষান কুলি মুচি মেথর পালিশওয়ালা সবাই পরিচ্ছন্ন সুন্দর জীবন যাপন করবেন।

এ বুঝি কল্পনা মাত্র!

ধসে পড়ো-পড়ো ঘর মেরামতের জন্যে পাখির একটা বাঁশ দরকার। এমনিভাবে বাঁশ দরকার হয়েছিল রহমান মিয়ার জন্যেও। বাঁশ এবং কাফনের কাপড়। গোলাপজল আগরবাতি। কবর খনন। সবমিলিয়ে শ আটেক টাকা লাগে। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, ৬টি অল্পবয়সী সন্তান আর মাত্র বাহান্নটি টাকা।

পাখি যেমন শহরময় ঘুরে ঘুরে জুতা পালিশ করেন, তেমনি রহমান মিয়াও ছিলেন একজন পত্রিকা হকার। একসময় তার নিজস্ব দোকান ছিল, কিন্তু পাখির মতো উচ্ছেদ হয়ে যান। অতঃপর শহরে-গ্রামে ঘুরে ঘুরে পত্রিকা বিক্রি করতে থাকেন। রংপুর শহরে এমনকি আশপাশের থানা জনপদগুলোতেও তিনি ছিলেন অতি পরিচিত। আব্দুর রহমান নামের লোকটি, মৃত্যুর আগে বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বছর, তিনি বিভিন্ন মহলে পরিচিত ছিলেন রহমান মিয়া কিংবা কারও কাছে রহমান ভাই সম্বোধনে। স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে গভীর সখ্য ছিল তার। সুসম্পর্ক ছিল মোহাম্মদ আফজালের সাথে, যিনি একসময় ছিলেন এনএপি-তে, এখন গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

রংপুরে থাকাকালে প্রায়শই দেখা হতো আমার সাথে রহমান মিয়ার। যেহেতু 'সংবাদ' নিয়মিত পড়তেন তিনি এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন, সে কারণে আক্রমণ চালাতেন সামনাসামনি হলেই। কোনো খবর উনিশ-বিশ হলে রক্ষা নেই। 'কী ল্যাখতাছেন আপনারা এইসব?' বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু-সম্পর্কিত কোনো খবর কিংবা ছবির ইল-ট্রিটমেন্ট হলে তাঁর সামনে দাঁড়ানো যেত না। অনেকদিন আগের কথা, একবার কী কারণে যেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে সিঙ্গল কলাম ছবি ছাপা হলো, খবরটিও ছিল বেশ ছোট। রহমান মিয়া কামড়ে ধরলেন। সে কী তর্জন গর্জন! 'জাতির পিতারে স্মরণ করতে অবহেলা আপনাদের? অফিসে কইয়া দিবেন এইভাবে করলে সংবাদ কেউ পড়ব না।' ... আমি তাঁকে থামাতে চাই। এটা-ওটা বলি। বলি, আসেন রহমান মিয়া এককাপ চা খাই। তবু তার গোসা ভাঙে না। 'না, চা টা খামু না আমি।'

এই চা না খাওয়া যে শুধু অভিমান, তা নয়। পরে বুঝি সেটা। শুনে অবাক হয়ে যাই—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক অন্ধ ভক্ত, এক মফস্বল শহরের পত্রিকা বিক্রেতা রহমান মিয়া, যিনি রোজা করেন না, নামাজ পড়েন না, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের একটি দিন উপবাস করেন। সে দিনটি হলো ১৫ আগস্ট, জাতির পিতার মৃত্যুদিবস।

আওয়ামী লীগের পাঁড় সমর্থক ছিলেন রহমান মিয়া। বঙ্গবন্ধু কিংবা তার কন্যা শেখ হাসিনা সম্পর্কে কেউ যদি বিপক্ষে কিছু বলতেন, উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠতেন তিনি, তর্ক জুড়ে দিতেন, খনখনে কণ্ঠে ভীষণ এক সোরগোল বেঁধে যেত। সে দৃশ্য আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। তবে আমার আবেগ সৃষ্টির কারণটি ছিল ১৫ আগস্টে তার উপবাসের ব্যাপারটি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দলের অনেক নেতা তাঁর লাশ ডিঙিয়ে ক্ষমতার গদিতে বসেছেন, কুচক্রী ছিলেন নিজেরই মানুষ এবং এখন হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে এবং সদম্ভে ঘোষণা করেন খুনের স্বীকারোক্তি; সে সময় একটি মানুষ, অনেকেরই তুচ্ছতাচ্ছিল্য কিংবা কৌতুকের লোকটি, রহমান মিয়া, উপবাসের মধ্য দিয়ে তাঁর জনককে স্মরণ করেন।

নরসিংদীর আলীপুরায় রহমান মিয়ার জন্ম। তরুণ বয়সে শহরে এসে পানের দোকান সাজিয়ে বসেন। কিন্তু দোকানের মালিকানা নিয়ে বন্ধুর সাথে বাঁধে বিবাদ। অপরদিকে পিতার সম্পত্তির সামান্য ভাগ থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। এই অবস্থায় রহমান মিয়া, অভিমানহত, নরসিংদী ছাড়েন, এক চাচার সাথে চলে আসেন রংপুরে। প্রথমে এখানকার বাবুপাড়ায়, তারপর মিস্ত্রিপাড়ায়, শালবনে, এমনিভাবে বহু অবস্থান বদলের পর ঘর তোলেন নিউ জুম্মাপাড়ায়, একখণ্ড সরকারি জমির ওপর। এখানে ছিল তাঁর দুটি ঘর, এখন একটিমাত্র। অপর ঘরটির খুঁটি ছিল অতিপুরাতন, নড়বড়ে, বদলাতে পারেননি। ঝড়ে পড়ে গেছে তা রহমান মিয়ার মৃত্যুর ৪১ দিন পর। ... এখন ঐ একটিমাত্র ঘরে থাকছে তাঁর ছেলে জাকির হোসেন, ওর মা, ৬ ভাই-বোন। জাকির হোসেন হয়েছে পত্রিকার হকার, ছোট ভাইটিকেও এ লাইনে নিয়ে এসেছে। বাড়তি আয়ের জন্যে জাকির একটি দৈনিকের ব্যুরো অফিসে পার্ট-টাইম কাজ জুটিয়ে নিয়েছে ৮শ টাকা বেতনে। কোনোমতে চলে যাচ্ছে কষ্টের সংসার। পাখির ঘরের খুঁটি যেমন নড়বড়ে এবং সংসারের খুঁটি তার কিশোর সন্তান, তেমনি রহমান মিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, খুঁটির অভাবে ঘর ভেঙে পড়লেও পিতার মৃত্যুর পর জাকির দাঁড়িয়েছে এক খুঁটির মতো। ৭ সদস্যের পরিবারটি খাড়া করে রেখেছে। অপরিপক্ব কাঁধে।

রহমান মিয়া নরসিংদী থেকে রংপুরে আসেন বহু বছর আগে, সেই যুবক বয়সে। কলেজ রোডে যে জায়গাটি এখন 'পুরাতন বগুড়া বাসস্ট্যান্ড' নামে পরিচিত, সেখানে একটি পানের দোকান দেন তিনি। এর আগে ডালায় সাজিয়ে পান বেচতেন শহরের পথে ঘুরে ঘুরে।

কলেজ রোডে পানের দোকানটি অনেকদিন ছিল। পরে সেখানে পানের পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা ঝুলিয়ে রাখতে থাকেন। তাঁর ছোট্ট দোকানটির সামনে লেখা ছিল 'এই তো দাদা পানের দোকান'। পরে ঐ পত্রিকা ঝোলানোর ফলে সেই কাঠের খণ্ডটি ঢাকা পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসাথে পান ও পত্রিকার দোকান ভালোই চলছিল। কিন্তু না, একদিন তা সরাতে হলো। কেননা সড়কটি হলো সম্প্রসারিত। উন্নয়ন এমন একটি ব্যাপার-বিষয় যা কারও জন্যে উন্নত এবং স্বাচ্ছন্দ্য জীবন এনে দেয়, কেউ আবার ঠাঁই-ঠিকানাহীন হয়ে যায়, পথে বসে।

না, ঠিক পথে বসেননি রহমান মিয়া। বরং বলা যায়, পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। শুরু করেছেন পথে পথে ঘুরে পত্রিকা বিক্রি। দৈনিক ৮০ থেকে থেকে ৯০ টাকা আয় করতেন তিনি। বাকি-বকেয়ার ব্যাপার ছিল না।

পত্রিকা-হকার বলতে যেমনটি বোঝা যায়, ভোরবেলা সাইকেলে কিংবা পায়ে হেঁটে বাসাবাড়িতে পত্রিকা পৌঁছানো, মাসের শেষে বিল আদায়, এ-রকম ছিল না তাঁর কাজ। রহমান মিয়া কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে পত্রিকা রাখতেন, হাজির হতেন শহরে, দোকানে কিংবা অফিসে। নগদানগদ বিক্রি। কিন্তু বিচিত্র চরিত্রের মানুষটির মধ্যে কিছু বৈপরীত্য লক্ষ করা যেত। চার টাকার একটা পত্রিকা কিনে পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিলে পুরোটাই তিনি পকেটে পুরতেন অনেক সময়, অবশিষ্ট এক টাকা ফেরত চাইলে খনখনে কণ্ঠে বলতেন, যান যান, রাখেন! ঘরে এসে কাগজ দিয়ে যাচ্ছি, একটা টাকা বেশি নেব না!' কিংবা বলতেন, 'থাক, কাল কাগজ নিয়ে এক টাকা কম দিয়েন।' ... অথচ তিনি কারও অনুগ্রহ চাননি, নেননি। আমি বেশ কজন মানুষের কথা জানি যাঁরা রহমান মিয়াকে খুব ভালোবাসতেন, অর্থসাহায্য করতে চাইতেন, কিন্তু তাঁদের দান তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, 'থাক, রাখেন! রোজগার করে খাই, আপনার সাহায্যের দরকার নাই।' ... আসলে প্রত্যেকের জীবনে কিছু-না-কিছু বৈপরীত্য থাকে, আছে এবং এই জীবনসংগ্রামী মানুষটি এর বাইরে ছিলেন না।

খুব ভোরে ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ঘর ছাড়তেন তিনি। ফিরতেন রাত বারোটা-একটায়। নিয়মিত নাওয়া-খাওয়া হতো না। তিনি শুধু রংপুর শহরে নয়, কাগজ নিয়ে চলে যেতেন মিঠাপুকুর শটিবাড়ি পীরগঞ্জ এমনকি সেই ধাপেরহাট পর্যন্ত। যাতায়াত করতেন বাসে-ট্রাকে, পরিচিতজনের মোটরসাইকেলের পেছনে। কালো ভাঙা শরীরের শুকনো বেঁটে-খাটো মানুষটি, তাকে কেউ কখনো বসে থাকতে দেখেনি। রোদ-বৃষ্টি, কুয়াশার ভেতর, ছেঁড়া-নোংরা-অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদের রহমান মিয়া, শহর ও গ্রামের বহু মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দিয়ে গেছেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। তাঁর কিছু বিচিত্র নেশা ছিল। একটি দুটি নয়, তার কাঁধে থাকত ছয়-সাতটি ঝোলা। একটিতে থাকত দৈনিক পত্রিকা, একটিতে সাপ্তাহিক বা মাসিক, বাকি ঝোলাগুলোতে তিনি সংগ্রহ করতেন পত্রিকার প্যাকেট হয়ে আসা ছেঁড়া নিউজপ্রিন্ট, দড়ি-সুতলি। এগুলো ঘরে এনে জমাতেন তিনি। জমতে জমতে ঢিপ হয়ে গিয়েছিল। কাগজ ও দড়ি কী কারণে তিনি সংগ্রহ করতেন, জমিয়ে রাখতেন, সে রহস্য জানা যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর ঘরের কোণে স্তূপীকৃত সেই ফেলনা কাগজ, দড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

জীবন-সংগ্রামী রহমান মিয়া '৯২-র ৩১ মার্চ দিবাগত রাত তিনটায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। দিনের বেলাতেও প্রতিদিনের মতো পত্রিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছিয়েছেন তিনি পাঠকের দ্বারে। পরদিন সকালে তার মৃত্যুর সংবাদ শহরে পৌঁছুলে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় হকাররা পত্রিকা বিলি বন্ধ করে দেন, বন্ধ থাকে বুকস্টলগুলো। স্থানীয় দৈনিকে খবর ছাপা হয় 'রহমান মিয়া আর নেই।' রংপুরের হকার সমিতি শোকসভা করে। আয়োজন হয় মিলাদ মাহফিলের।

এগুলো হয় প্রকাশ্যে। কিন্তু পত্রিকা বিক্রি-ব্যবসার সাথে শিকড় পর্যায়ে জড়িত থাকা মানুষটি, সবার প্রিয় রহমান মিয়া, তাঁর জন্যে প্রয়োজন হয় কিছু বাঁশ, কিছু কাপড়। ঘরের খুঁটির জন্যে নয়, এতদিন বাদে এসে তার ফর্সা-পরিচ্ছন্ন পোশাকের জন্যে নয়, তার দাফন-কাফনের প্রয়োজন। অথচ ঘরে সঞ্চয় মাত্র বাহান্নটি টাকা। ... এদেশের লাখো রহমান মিয়া, জীবন-সংগ্রামের একেকজন সৈনিক, আমৃত্যু ঘাম ঝরাচ্ছেন নিজ নিজ কাজের গণ্ডিতে, কিন্তু নিম্নতম মৌলিক চাহিদাগুলোতো তাদের মিটছেই না, মৃত্যুর পরেও জোটে না দাফন-কাফনের সামগ্রী।

বাঁশ কিনতে হবে।

কাপড় কিনতে হবে।

আরও কিছু উপকরণ দরকার।

সংবাদবাহক রহমান মিয়ার রেখে যাওয়া খুঁটি—তার সন্তান, জাকির হোসেন, সেগুলোর সন্ধানে শহরময় এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছে। পিতার মৃত্যুর শোক ছাপিয়ে বাস্তব যে উদ্বিগ্নতা অশ্রুর বদলে ঠাঁই নিয়েছে ছেলেটির চোখের মণিতে, তা হলো, এখন তার কিছু টাকা দরকার।

AMARBOI.COM

৮

মন ও মানুষ

'পাগল' কথাটি সমাজের সকল স্তরেই ব্যবহৃত। উল্টো-পাল্টা কিংবা বাড়াবাড়ি কিছু হতে দেখলেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উক্তিটি করা হয়ে থাকে, অথবা কখনো 'পাগল' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কৌতুকের সাথে, কখনো কাউকে অপদস্থ করবার জন্যে। বেশি কাজ করলে তাঁকে 'কাজ-পাগলা' বলি কেউ কেউ। কিন্তু লিপিবদ্ধ যে আইনটি রয়েছে, তা হলো, ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিকে প্রধান করে গঠিত মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকদের একটি বোর্ড যতক্ষণ না লিখিত সিদ্ধান্ত নেবেন, তার আগে কাউকে পাগল বলা আইনের চোখে অপরাধ। কেউ কাউকে পাগল বললে তার বিরুদ্ধে আদালতে দায়ের হতে পারে মানহানির মামলা।

কাউকে 'পাগল' বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা সমাজের একশ্রেণীর মানুষের মজ্জাগত দোষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা শিক্ষিত, পোশাক-পরিচ্ছদে ভদ্রলোক, কথাবার্তায় পাকা এবং উচ্চকণ্ঠ। কৃষকের হাতে অতিকষ্টে উৎপন্ন ফসল ভক্ষণ করেন শহরে বসে, কিন্তু 'চাষা' কথাটা তাঁদের মুখে হরহামেশা গালি। গ্রামের সহজ সরল মানুষটি তাঁদের কাছে 'গেঁয়ো' এবং এটি একটি ভর্ৎসনার তাচ্ছিল্যতুল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গালিও বটে। সমাজ-মানসিকতাটাই এ-রকম। উত্তরের গ্রামে বেশকিছু লোক আমি পেয়েছি, যাদের পিতৃপ্রদত্ত নাম ধরে ডাকা হয় না। যেহেতু শরীর ভাঙা, বেশ-বাস এলোমেলো, কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না, সেহেতু তাদের 'বাউরা' বলে ডাকা হয়। বাউরা মানে 'পাগলা'। একইভাবে, শহর-সমাজেও পুরুষ ও মহিলাকে পাগলা বা পাগলি বলে ডাকা হয়। রাজধানীর একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের কথা জানি যাদের আদিবাড়ি এ অঞ্চলে, কাজের বুয়াকে 'পাগলি' ডাকেন। মেয়েটি মানসিক প্রতিবন্ধী ধরনের, একটু পা টেনে টেনে হাঁটে। এজন্যেই 'পাগলি' নামকরণ হয়েছে। ওর আসল নাম জাহানারা খাতুন।

'পাগল' তো বলি-ই, এমনকি কেউ উল্টো-পাল্টা কিছু বললে কিংবা নয়-ছয় করলে পাবনায় পাঠিয়ে দিতে চাই তাকে। 'পাঠিয়ে দাও ব্যাটাকে হেমায়েতপুর।' এ-রকম হামেশাই শুনি 'ভদ্রলোকদের' মুখ থেকে। পাবনার হেমায়েতপুর নামটি প্রায় সবার কাছে পরিচিত। এখানে আছে মানসিক ব্যাধি নিরাময় হাসপাতাল।

তাচ্ছিল্যের সংলাপে হেমায়েতপুর উচ্চারিত হলেও জায়গাটি কিন্তু খুব সুন্দর। আপনি যদি কখনো পাবনায় যান, সময়-সুযোগ পেলে ঐ এলাকাটি ঘুরে আসতে পারেন। এটি পাবনা সদর থানার একটি ইউনিয়ন। শহর থেকে বেশি দূরে নয়, রিকশায় ২০-২৫ মিনিটের পথ। পাকা সড়কের দুধারে ফসলের জমি, কোথাও সদ্যচষা কালো মাটি, উদয়াস্ত পরিশ্রমী মানুষের ঘর-গেরস্থালি, গাছগাছালি, ঝোপ-জঙ্গল। মানসিক হাসপাতালটির কাছাকাছি আছে বেশকিছু বাবলা আর খেজুর গাছ। হাসপাতাল-চত্বরটি বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার, যদিও ভেতরে হাজারো সমস্যার পোকা কিলবিল করছে।

AMARBOI.COM

পেশাগত কাজে বহুবার গিয়েছি হেমায়েতপুরে, ঐ মানসিক ব্যাধি নিরাময় হাসপাতালে। সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাদা করে লিখব আমি। এখানে কেবল দুয়েকটি ঘটনা জানাবো।

হাসপাতালটিতে প্রথম যাই স্বাধীনতার পরপর। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক সেনাদের নির্যাতনে যাঁরা মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের ওপর একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন লিখতে। সেটি আজাদে ছাপা হয়। সে-সময় কিছুটা সাড়াও জাগায়। কিন্তু দৈনিক বাংলার পাবনাস্থ নিজস্ব প্রতিনিধি মীর্জা শামসুল ইসলাম তারও আগে মানসিক রোগীদের কেসহিস্ট্রি ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন, তা অত্যন্ত সাড়া জাগায় পাঠক মহলে। পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যাও বেড়ে যায়। আমার মতে, মীর্জা সাহেবের ঐ বিরাট প্রতিবেদনটি এদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সর্ববৃহৎ এবং পাঠক-আকর্ষণকারী ধারাবাহিক প্রতিবেদন—যা ছিল তথ্যসমৃদ্ধ, সহজ ভাষায় লিখিত। সিরিজের প্রতিটি লেখা ছিল হৃদয়গ্রাহী, মানবিক আবেদনে ভরপুর।

'সংবাদে' যোগ দেওয়ার পর একবার ঐ মানসিক হাসপাতালে গেলাম। ইচ্ছে ছিল মীর্জা শামসুল ইসলামের স্টাইলে একটা সিরিজ প্রতিবেদন তৈরি করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন কেসহিস্ট্রি সংগ্রহ করছি। সকাল-বিকাল একটানা কাজ। বাড়তি সংযোজন হিসেবে আমি চাচ্ছিলাম কিছু ফলো-আপ করতে। ব্যাধিমুক্ত হবার পর যাঁরা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান, সমাজে কিভাবে পুনর্বাসিত হন তাঁরা। কিন্তু এ বিষয়টির গভীরে গেলে মানুষের জীবনের নতুন একটি দিক উন্মোচিত হলো। সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠবার পরেও সমাজে তো নয়-ই, পরিবারেও একজন মানুষ ঠাঁই পান না। কেউ বাড়ি ফিরে গেলেও তিনি 'পাগল'-ই থেকে যান। পাড়া-প্রতিবেশী তাকে 'পাগল' বলে ক্ষ্যাপান, পরিবারটিও অনেকক্ষেত্রে 'বাড়িতে একজন পাগল আছে' এ-রকম লজ্জা-শরমে কিংবা হীনম্মন্যতায় ভোগেন। হাসপাতালের একজন ডাক্তার জানালেন, একজন রোগী সুস্থ হবার পর তাঁর অভিভাবকদের ঠিকানায় একের পর এক চিঠি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপনাদের সন্তান এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তাঁকে আপনারা নিয়ে যান। কিন্তু শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবক আসেন না, একদা ভর্তি করে দেওয়া রোগীটিকেও নিয়ে যান না, এমনকি অনেকক্ষেত্রে চিঠির জবাবও দেন না। এর পেছনে মূল কারণটি হলো, সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের অনেক সদস্য তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। এখানে পারিবারিক 'মান-সম্মানের' ব্যাপার থাকে। 'বংশে পাগল আছে' এমন জানলে নাকি বিয়ে ভেঙে যায় অনেক মেয়ের। ... মানসিক হাসপাতালে এমন কিছু নর-নারীর সন্ধান সে-সময় পাই যাঁরা সুস্থ হবার পরেও বছরের পর বছর ধরে হাসপাতালেই রয়ে গেছেন। এদের কেউ কেউ আবার মানসিক রোগীদের সংশ্রবে থাকতে থাকতে পুনরায় ব্যাধি-আক্রান্ত হয়ে গেছেন।

রিলিজ করে নিয়ে যাবার চিঠি পাঠানোর পর অনেক অভিভাবকের কাছ থেকে এমন জবাবও আসে যে, 'ওকে আমরা নিতে চাই না, আপনাদের হাসপাতালেই রেখে দিন।' এখানে আমাদের সমাজ-মন-বৈকল্যটি ধরা পড়ে। এমনটি দেখেছি আমি নীলফামারী-ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে কুষ্ঠরোগীদের ওপর প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে। সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠবার পরেও অনেকের ঠাঁই জোটে না পরিবারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জুটলেও তিনি পান চরম অবহেলা। ঘরে কেউ থাকতে চান না, এমনকি অনেকক্ষেত্রে পরিচয় পর্যন্ত অপরকে জানাতে লজ্জাবোধ করেন। এ-রকম পারিবারিক ও সামাজিক অবহেলা পেতে পেতে অনেকে শেষ পর্যন্ত ঘরছাড়া এমনকি গ্রামছাড়া হয়েছেন। আত্মহননের ঘটনাও ঘটেছে।

মানসিক হাসপাতালে কাজ করছি। একপর্যায়ে শুনলাম, শুধু মানসিক ব্যাধি-আক্রান্তই নয়, সুস্থ মানুষকেও ভর্তি করানো হয় এখানে। জোর-জবরদস্তি করে। বল প্রয়োগ ছাড়াও থাকে নানান কৌশল, ষড়যন্ত্র। সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে কাউকে 'পাগল' বানানো হয়, ধরে বেঁধে ভর্তি করে দেওয়া হয় মেন্টাল হাসপাতালে। কী নির্মম! একটি সুস্থ মানুষ কত অসহায়ভাবে দিন কাটাতে থাকে হাসপাতালের চার দেয়ালের ভেতর এবং একসময় সে সত্যি সত্যি 'পাগল' হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনের কাহিনী শুনলাম। আদৌ মানসিক ব্যাধি-আক্রান্ত নন, অথচ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগত আক্রোশে।

লোকটি পুলিশ বিভাগে চাকরি করেন একটি বড় শহরে। কনস্টেবল। কিন্তু অন্যায়-অবিচার সহ্য করেন না। কাউকে দুর্নীতিতে জড়িত থাকতে দেখলে প্রতিবাদ করে ওঠেন।

বেতন নেবার দিন। পুলিশ সুপারের অফিসে এসেছেন ঐ কনস্টেবল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছিলেন তিনি একজন কর্মকর্তার দুর্নীতির। এ কথাটা ঐ কর্মকর্তার কানে গেল। তিনি করলেন কি, 'সমুচিত শিক্ষা' দেবার জন্যে ফন্দি-ফিকির আঁটলেন। জেলার সিভিল সার্জন তাঁর বন্ধু, টেলিফোন করলেন তাঁকে। 'আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি' জানালেন স্বাস্থ্যকর্তা।

স্বাস্থ্যকর্তা চিঠি লিখলেন একখানা। কনস্টেবল অমুকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন। ঐ চিঠি বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো পাবনার হেমায়েতপুরে, ঐ মানসিক হাসপাতালে। সঙ্গে ঐ কনস্টেবল। হাত-পা বেঁধে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। কেউ তাঁর কোনও কথা শুনতে রাজি নয়। কর্মকর্তার আদেশ পালন করতে হবে। কনস্টেবলটি যতই বলেন, 'আমি পাগল নই, আমাকে ছেড়ে দাও' বাঁধন ততই শক্ত হয়। 'সব পাগলই নিজেদের ও-রকম বলে'—বলেন তাঁর সহকর্মীরা।

মানসিক হাসপাতালে জোর করে ভর্তি করে দেওয়া হলো কনস্টেবলকে। একে একে কেটে গেল ছয় মাস। ডাক্তারদের নয়, প্রথমে ব্যাপারটি চোখে পড়ল সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার। হ্যাঁ, পাবনা মানসিক হাসপাতালে সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা ছিলেন একজন, তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নন, সমাজসেবা পরিদপ্তরের আওতায়।

সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা ঐ কনস্টেবলটিকে বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছিলেন। সহজ-স্বাভাবিক মানুষ, চলাফেরা, কথাবার্তায় মানসিক রোগের কোনও লক্ষণ নেই। নিয়মিত গোসল সারেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, নামাজ পড়েন। মনে সন্দেহ হয় তাঁর। লোকটির ওপর নজর রাখতে থাকেন তিনি আরও মনোযোগের সাথে।

না, এ লোক মানসিক রোগী হতেই পারে না। কিছুদিন বাদে স্থির বিশ্বাস জন্মালো সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার মনে। তাঁকে ডেকে নিয়ে কথা বললেন। কেঁদে কেঁদে কাহিনী বর্ণনা করলেন তিনি বিস্তারিত। 'আমি শুধু বলেছিলাম যে স্যার ঘুষ খায় ...'

সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা বসে থাকলেন না। পুরো ব্যাপারটি তিনি ঢাকায় লিখে জানালেন। উপরওয়ালার কাছে তার আবেদন : আমি কনস্টেবলের ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখতে চাই। অনুমতি মিলল ফিরতি ডাকে।

প্রথমে ময়মনসিংহের গ্রামে গেলেন সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, যেখানে ঐ কনস্টেবলের বাড়ি। খোঁজখবর নিলেন। বংশে মানসিক ব্যাধি-আক্রান্ত কেউ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী জানালেন স্বামীর স্বভাব-চরিত্র। সন্তান সম্পর্কে বললেন পিতা-মাতা। এমনকি পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের লোকজন, তাদের সাথেও কথা বললেন। সন্তুষ্ট হলেন তিনি।

পাবনায় ফিরে এসে আবার চিঠি লিখলেন উপরে। ঐ শহরে যেতে চাই যেখানে কনস্টেবল কর্মরত ছিলেন। কথা বলতে চাই পুলিশ কর্মকর্তার সাথে। হ্যাঁ, ক্ষমতা পেলেন তিনি। এক সদস্যের তদন্ত কমিটির ঐ কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তার সাথে কথা বলার একটি ক্ষমতাপত্র নিয়ে ঐ শহরে গেলেন। কর্মকর্তার সাথে আলাপতো করলেনই, অনুসন্ধান চালালেন পাকা এক গোয়েন্দার মতো। নানা জেরার মুখে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করা হলো যে, কনস্টেবলটি আসলে 'পাগল' নয়, তাঁকে জোর করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা পাবনা ফেরার পরে মুক্ত করা হলো কনস্টেবলকে। চাকরি ফিরে পেলেন তিনি, পেলেন অবরুদ্ধ মাসগুলোর বকেয়া বেতন। তবে তাঁকে বদলি করা হলো অন্য এক জেলায়।

'সংবাদে' এই কাহিনী এবং ফলো-আপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে একাধিক। পাঠকমহলে সে-সময় তা সাড়াও জাগিয়েছে। কিন্তু অবাক ব্যাপার, যিনি ষড়যন্ত্র করে লোকটিকে 'পাগল' বানিয়েছেন, হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন ধরে-বেঁধে, যে স্বাস্থ্যকর্তা চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের কারও কিছু হয় নি। শাস্তি তো হয় নি এমনকি পরিচালিত হয় নি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় তদন্ত। আসলে আমাদের সমাজে এই-ই হয়।

জানি না ঐ সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা এখন কোথায়! এই একটি ঘটনার জন্যে পুরস্কার পাওনা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু পেয়েছেন কি? একজন সুস্থ মানুষকে 'পাগল' বানানোর জন্যে ঐ পুলিশ কর্মকর্তা আর সিভিল সার্জন এতদিন বাদে এসে বিবেক দংশিত হন? আর ঐ কনস্টেবল? তিনি কি এখনও অন্যায়-অবিচার আর কর্মকর্তার দুর্নীতির প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন? ...

মানসিক হাসপাতালে কদিন পরপর 'বোর্ড' বসে। দেশের বহুস্থান থেকে নিয়ে আসা হয় রোগী, তাদেরকে ঐ বোর্ড-এর সামনে হাজির করা হয়। এখানে শোনা হয় রোগীর জীবন-বৃত্তান্ত, প্রাথমিক লক্ষণ, এর আগে কোনোরকম চিকিৎসা হয়েছে কি-না। বোর্ডের সদস্যগণ যাঁরা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, তাঁরা রোগীর সাথে কিছু কথা বলতেই রোগের রকমফের নির্ণয় করেন। কেউ সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত, কেউ ম্যানিয়াক। যাদের রোগ জটিল-কঠিন তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হয়, তবে লঘু ধরনের রোগীদের দেওয়া হয় ব্যবস্থাপত্র। বাড়িতে বসেই এদের চিকিৎসা সম্ভব।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একবার 'বোর্ড'-এর সাথে বসি। এভাবে কেস-হিস্ট্রি নেওয়া সহজ। ডাক্তারগণ রোগীর সাথে কথা বলে যাচ্ছেন, রোগী কিংবা তার অভিভাবক জবাব দিচ্ছেন, আমি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো টুকে নিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেসহিস্ট্রির বাইরেও অনেক তথ্য মেলে। যেমন : দেখা যায় শতকরা ৯০ ভাগ মানসিক রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা হয় গ্রামের কবিরাজ-ওঝা দিয়ে। চলে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তুম্বা। জীনের আছর হয়েছে ভেবে মারপিট করে সারিয়ে তোলার চেষ্টা চলে। অনেককে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তেলপড়া। কিন্তু রোগতো সারেই না বরং লঘু অবস্থা থেকে গুরুতর পরিস্থিতিতে চলে যায়। তারপর একসময় এই হাসপাতালে আগমন ঘটে। ডাক্তারগণ বললেন, লঘু অবস্থায় হাসপাতালে এলে বহু রোগী অল্প সময়ে এবং স্বল্প ওষুধে ভালো হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু একেই রয়েছে অসচেতনতা, অবহেলা, তার ওপর অনেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপারও কাজ করে যে, 'পাগলা গারদে' গেলে বুঝি পারিবারিক অমর্যাদার ব্যাপারটি রাষ্ট্র হয়ে যাবে। হ্যাঁ, গ্রামের নিরক্ষর-অসচেতন মানুষ এমনকি কোনো কোনো মূর্খ 'ভদ্রলোক'ও মানসিক হাসপাতালকে 'পাগলা গারদ' বলে থাকেন।

অনেক রোগী, বিশেষ করে যারা সিজোফ্রেনিয়া-আক্রান্ত, রোগ খুব গুরুতর অবস্থায় পৌঁছেছে, তাদের মারপিট করা হয়, শিকল কিংবা দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে আনা হয়। অনেকক্ষেত্রে লঘু পর্যায়ের রোগীরাও এই মারপিট ও বন্ধন-যন্ত্রণা ভোগ করেন। এর কারণ রয়েছে। রোগীর অভিভাবক চান যে একে হাসপাতালে ভর্তি করাবেন, কেননা বাড়িতে খুব 'ঝামেলা' হচ্ছে। অথচ ডাক্তারদের কাছে লঘু মনে হলে হাসপাতালে জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে 'রোগ খুব বেড়ে গেছে' এ-রকম বোঝানোর জন্যে সিরিয়াস নয় এমন রোগীকেও হাত-পা বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে বোর্ড-এর সামনে হাজির করা হয়ে থাকে। সুস্থ মানুষেরাও কখনো কখনো এভাবেই উলঙ্গ করে দেন তাঁদের মন-বৈকল্য! মানসিক রোগ ও রোগীর ক্ষেত্রে কেন, সমাজের কোনো পর্যায়ে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না?

'বোর্ড'-এর সামনে হাজির হয় অনেক রোগী। বাইরে প্রচণ্ড ভিড়। তাড়া। রোগী ভর্তি করিয়ে অনেকেই ট্রেনে-বাসে ফিরে যাবেন দূরাঞ্চলে। সে কারণে কে বা কারা আগে কামরায় ঢুকবেন তা-ই নিয়ে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, তর্ক-ঝগড়া, এমনকি হাতাহাতিও হয়। কেউ কেউ একজন কর্মচারীর হাতে গুঁজে দেয় টাকা। 'আমাদের নামটা একটু আগে ঢুকিয়ে দাও বাবা।'

একজন ডাক্তার চিনেবাদাম কিনেছেন। তা-ই খেতে খেতে বোর্ড-এর পরীক্ষা কাজ চলে। এ সময় বাইরে হল্লা বেঁধে যায়। একজন রোগীকে লম্বা দড়ি দিয়ে মাঠের একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাকে মারপিট করা হচ্ছে। এ লোকটি যে 'ভীষণ রকম পাগল' হয়ে গেছে এটা বোঝানোর জন্যে। এই অমানবিক নির্যাতনের ছবিটি তুলে নিই। পরে সংবাদে ছাপা হলে একটা কাজ হয় যে, হাসপাতালে বোর্ড-এর সামনে আর কাউকে এভাবে বেঁধে রাখতে দেওয়া হয় নি বেশ কিছুদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবি তোলার পর আবার আসি বোর্ডকক্ষে। মনটা খুব বিচলিত। একের পর এক কাহিনী শুনতে শুনতে ভেতরে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। কত বিচিত্র বিচিত্রতর কাহিনী, প্রত্যেকটি অত্যন্ত করুণ, বেদনাময়। ডাক্তারগণ অভ্যস্ত, অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কাহিনী শুনছেন, যত্নের সাথে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন। কিন্তু আমি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছি। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, কেন যে তার এ অবস্থা হয়! ঐ মুহূর্তে মনে হতে থাকে, এই মানসিক ব্যাধির মতো জটিল-কঠিন বুঝি এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই!

এই সময়ে কামরায় ঢুকলেন এক দম্পতি। স্বামীটি সামনে, তার পরনে অতি ময়লা পাঞ্জাবি, গোড়ার দিকে ছেঁড়া রঙচটা লুঙ্গি, পায়ে অতি পুরাতন স্পঞ্জের স্যান্ডেল। বাবরি চুল এলোমেলো, ভাঙা চোয়াল ও থুতনিতে আধাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখ গর্তে ডুবে গেছে, মুখ হাঁ করা, যেন কামরার এই পরিবেশে দারুণ বিস্মিত তিনি। চেয়ারের পিঠ ধরে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। অন্য হাতে একটা পুঁটলি।

পেছন পেছন এলেন তাঁর স্ত্রী। বেশ স্বাস্থ্যবতী, বাসে অনেকদূর সফর করে এলেও হলুদ শাড়িটি দেখে মনে হয় যেন সদ্যধোয়া। বেণী বাঁধা চুল, অতিমাত্রায় তেল দেওয়াতে কপালেও তার ছোপ। হলুদ শাড়ির সাথে বড় লাল টিপ। বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে। তবে মনে হলো একটু একটু হাঁপাচ্ছেন তিনি।

স্বামীকে পাশ কাটিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি। বললেন, 'দেখুন তো ডাক্তার সাহেব, আমার স্বামীকে।' ভাষা শুনে বুঝি, বাড়ি এদের কুষ্টিয়ায়।

হাঁ করে থাকা প্রায়-বিধ্বস্ত লোকটিকে দেখছি আমি। নিশ্চয়ই কৃষক, ক্ষয়ে গেছেন এখন। কিন্তু মানসিক ব্যাধি-আক্রান্ত হলেন কী করে? কী তার নেপথ্য কাহিনী? এক্ষুনি জানা যাবে যাবতীয় বিবরণ। বোর্ড সদস্যগণ এখনও এর সাথে কথা শুরু করতে পারেন নি। তাঁরা আগের রোগীর লোকজনদের বোঝাচ্ছেন যে কী কী কারণে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর প্রয়োজন নেই। ওরা বেরিয়ে যাবার আগেই কামরায় ঢুকে পড়েছেন এই দম্পতি।

পূর্ববর্তী রোগী এবং অভিভাবক বিদায় হলেন। ডাক্তার এবার মনোযোগী হলেন দম্পতিটির প্রতি।

: কী নাম?

লোকটি নাম বললেন তাঁর।

: বাড়ি কোথায়?

বললেন।

তারপর প্রশ্ন। একের পর এক। জবাব দিয়েই যাচ্ছেন লোকটি। কোনো কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন মহিলাটিই। আঞ্চলিক ভাষার টান থাকলেও কথা বলেন তিনি বেশ স্পষ্ট-পরিষ্কার। কুষ্টিয়ার ভাষাতো এমনিতে মিষ্টি, তার ওপর এঁর কণ্ঠও চমৎকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবরণ শোনার পর কাগজে কিছু লিখছেন একজন ডাক্তার। ধরিয়ে দিলেন দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষটির হাতে। আমার একটুখানি খটকা লাগল। ব্যবস্থাপত্র তো রোগীর হাতে নয়, দেওয়ার কথা তার সঙ্গে আসা মহিলাটির হাতে। তাঁকেই তো ওষুধ সেবনের নিয়ম বুঝিয়ে বলার কথা! ... কিন্তু আমার এই প্রতিক্রিয়া পাশে বসা আরেকজন ডাক্তার বুঝতে পারলেন। বিশেষজ্ঞ তো! তিনি চেয়ারের হাতলে গা এলিয়ে কাছে টেনে আনলেন মুখ, কৌতুকের কণ্ঠে চাপাস্বরে বললেন, রিপোর্টার সাহেব, আপনি ভেবেছেন ঐ লোকটি বুঝি রোগী?

আমি বিস্ময়ে বলি, তাহলে উনি রোগী নন?

: না। রোগী ঐ মহিলা। আর তার রোগের ধরনটি হলো ...

কথা শেষ হয় না। এবার মহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। দাঁড়িয়েই স্বামীটির দিকে মুখ ঘোরান, চোখ বড় বড় করে ধমকে ওঠেন, 'চোপ্ ব্যাটা, চোপ্!'

আমি হতভম্ব। হাঁ করে দেখছি মহিলাটিকে। এবার আমার দিকে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল। ধমকে উঠলেন 'তিনি, কী দেখছিস রে হারামজাদা!'

সেই ধমকে আত্মা কেঁপে ওঠে। একটু আগের স্নিগ্ধ-শান্ত মহিলা, যিনি খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেছিলেন, দেখুন তো ডাক্তার সাহেব আমার স্বামীকে, তিনি এবার মেঝেতে পা দাপিয়ে আমাকে ধমক দিয়ে ওঠেন আবার : 'চোপ্!'

আমি ভয়ে চোখ নামিয়ে ফেলি।

AMARBOI.COM

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে শুনেছিলাম বাংলাদেশে প্রায় দেড়কোটি নরনারী বিভিন্ন পর্যায়ের মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। কারও ব্যাধি লঘু, কারও মধ্যম পর্যায়ের আবার কেউ রয়েছেন গুরুতর অবস্থায়। এখন সেই সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে। কিন্তু চিকিৎসা-সুবিধা সম্প্রসারিত হয় নি তেমন। পাবনা মানসিক হাসপাতালে বেড-সংখ্যা বাড়েনি, রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের অভাব। সরকার কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মানসিক রোগীদেব জন্যে ১০ বেডের যে পৃথক ইউনিট চালু করেছেন, সেগুলোর দশা অত্যন্ত শোচনীয়।

আমরা সুখী-সমৃদ্ধ দেশের কথা বলি। মনোজগতের হাজারো কথা-কাহিনী থাকে আড়াল-অজ্ঞাত। বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনেছি, যারা মানসিক ব্যাধি-আক্রান্ত হন, তাদের অধিকাংশেরই নেপথ্যে লুকিয়ে থাকে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিরই কারণ।

লক্ষ-কোটি অজ্ঞাত মানুষের আজ যে দুর্দশা, তা ঘোচাতে হলে মন-হারানো দুঃখী মানুষগুলোর সুচিকিৎসার ব্যবস্থাতো প্রয়োজন, সেই সাথে দরকার হলো আরও অধিকসংখ্যক মানুষ যাতে করে মানসিক ব্যাধির শিকার না হন, তার ব্যবস্থা নেওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯
ইন্দ্র-সংবাদ

ইন্দ্র মারা গেল। বলতে গেলে হঠাৎ-ই। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সে। প্রখ্যাত সার্জন রশিদ-ই-মাহবুব প্রথমদিকে আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, কিছুটা সময় নিলেও রোগী ভালো হয়ে উঠবে। কিন্তু না, ভেতরে ভেতরে অসুখটা এতই গুরুতর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, বাঁচানো সম্ভব হলো না তাকে। রাত দেড়টার দিকে হাসপাতাল থেকে টেলিফোন পাওয়া গেল : ইন্দ্র মারা গেছে।

ঐ রাতেই শবদেহ নিয়ে যাওয়া হলো বীরগঞ্জের রণগাঁও গ্রামে। পার্শ্ববর্তী কাহারোল থানার চককৃষ্ণপুর শ্মশানে তার চিতা জ্বলল। পরের দিন ইন্দ্রর মৃত্যুসংবাদ ছাপা হলো পত্রিকায়। না, পাইলস-এর কথা বলা হয় নি, লেখা হয়েছে অন্য অসুখের কথা।

আঞ্চলিক এবং স্থানীয় দৈনিক তো বটেই, আজকাল অনেক জাতীয় দৈনিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ থানা সদর কেন্দ্রে 'নিজস্ব সংবাদদাতা' নিয়োগ করা হয়েছে। এমনই একটি থানা হলো বীরগঞ্জ : দিনাজপুর জেলাধীন। ইন্দ্র, শ্রী ইন্দ্রমোহন রায়, ঐ বীরগঞ্জ এলাকার নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল 'দৈনিক সংবাদে'র। তবে পার্শ্ববর্তী কাহারোল খানসামা এমনকি মাঝে মাঝে দিনাজপুর জেলা এলাকার বিভিন্ন খবরাখবর পরিবেশন করেছে সে গত সাত বছরে। টেলিফোনে পাঠানো তার বহু আইটেম 'সংবাদে'র প্রথম পাতায় গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়। নিজস্ব জমিতে কৃষিকাজের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও নিজ কর্ম-এলাকার খবর কখনো মিস করে নি। দায়িত্বের প্রতি তার ছিল নিষ্ঠা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ছুটেছে গ্রাম থেকে গ্রামে, ঘটনাস্থলে। শরীরের প্রতি নজর ছিল না, নাওয়া-খাওয়ায় হতো অনিয়ম। অনেকদিন বাড়িতে না গিয়ে বীরগঞ্জ সদরের হোটেলে অতিমাত্রায় ঝালমিশ্রিত খাবার খেত। 'পাইলস' হয় বুঝি সে-কারণেই। কিন্তু কী কারণে যে ছেলেটি রোগ গোপন রেখেছিল, কেন যায় নি ডাক্তারের কাছে, তা জানা যায়নি। বরং নিতান্তই বোকার মতো কাজ করে সে। গ্রামের এক মূর্খ কবিরাজের শরণাপন্ন হয়। এক হাজার টাকার বিনিময়ে সে হাতুড়ে পদ্ধতিতে অপারেশন করায় এবং গুরুতর অবস্থায় চলে যায় রোগ। প্রথমে বীরগঞ্জ হাসপাতাল, সেখানে ব্যর্থতার পর নিয়ে আসা হয় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম। কিন্তু তাকে চেনা যায় না। শুকিয়ে কঙ্কালসার। মুখে এমন ঘা হয়েছে যে কথা বলতে পারে না, শুধু ইশারা করে। ... আমরা দুজনে দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করেছি, গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেরিয়েছি শিকড়-পর্যায়ের সরজমিন প্রতিবেদন লেখার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে, সেই প্রাণোচ্ছল ইন্দ্রমোহন রায়ের এ কী অবস্থা! অসহ্য সেই সাক্ষাৎ ঘটনা দৃশ্য। করুণ বিকৃত শব্দ নির্গত হচ্ছে তার কণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে, গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘোলা অশ্রু। সে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদল অনেকক্ষণ। ইশারা করল কিছু। প্রথমে বুঝতে পারি না। হাত ইশারায় যেন বোঝাতে চাইছে কাউকে কিছু লিখতে হবে। আমি ভাবি, বোধকরি 'সংবাদ' অফিসে কিছু লিখতে বলেছে সে এবং তা বুঝি পাওনা লাইনেজ বিলের জন্যে। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে হয়তো টাকা-পয়সা দরকার। আমি তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি 'মফস্বল' ডেস্কের কার্তিক চ্যাটার্জিকে আর মঞ্জুরুল আহসান বুলবুলকে জানালাম। হিসাব বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, না তার কোনও পয়সাকড়ি পাওনা নেই, বরং সংবাদের সার্কুলেশন বিভাগই কিছু টাকা পাবে। বলা দরকার, নিজের এলাকায় 'সংবাদ' চালু করবার জন্যে নিজের নামে এজেন্সি নিয়েছিল সে। এক লোক বীরগঞ্জ থেকে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে এসে পত্রিকার প্যাকেট নিয়ে যেত। সে-ই পত্রিকা বেচত, মাসিক গ্রাহকদের কাছ থেকে বিল আদায় করত। এমন এজেন্সি নেওয়ার ব্যাপারটি ঘটে আমার জন্যেই। আমি ইন্দ্রকে বলতাম, 'শুধু খবর লিখে বা ছাপিয়ে লাভ কি? আপনার এলাকার খবর রোজ ছাপা হচ্ছে অথচ এখানকার লোকজনই তা পড়তে পারছেন না! দেখুন না একজন এজেন্ট এখানে নিয়োগ করা যায় কি-না।' ইন্দ্রমোহন কোনও এজেন্ট খুঁজে পায়নি, নিজের নামেই পত্রিকা নিতে শুরু করেছে। এটা তার ব্যবসা ছিল না, কেননা শুধু 'সংবাদ'-ই যেত তার কাছে। কমিশনের টাকা পেত নিয়োজিত পত্রিকা-বিক্রেতা। পরবর্তীকালে বীরগঞ্জে গিয়ে দেখেছি, আগে যেখানে দুতিন কপি সংবাদ নিয়ে আসা হতো দিনাজপুর থেকে, সেখানে ৪০-৫০ কপি পত্রিকা চলছে। থানা সদর কেন্দ্রই শুধু নয়, আশপাশের গ্রামেও যাচ্ছে কাগজ।

আসলে ইশারায় কী বলতে চেয়েছিল ইন্দ্র, তা সঠিক বুঝতে পারিনি। কাউকে কিছু লিখতে হবে এ-রকম ভঙ্গি দেখে যদিও ধারণা হয়েছিল যে, সে 'সংবাদে' চিঠি দিতে বলছে এবং ভেবেছিলাম টাকা-পয়সা চায়। কিন্তু না, পরবর্তীকালে পারিবারিক সূত্রে জেনেছি, ঐ মুহূর্তে চিকিৎসার জন্যে অর্থ তার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। নিজের মালিকানায় রয়েছে ১২ বিঘা আবাদি জমি, ফসল বিক্রির টাকাও কিছু হাতে ছিল। তাহলে কী বলতে চেয়েছিল ইন্দ্র? কাকে কী সংবাদ দিতে চেয়েছিল? লিখতে বলেছিল কি নিজের অসুস্থতার খবরটি? তা-ই বা কী করে হয়! যার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, দেহ ভেঙে গেছে, বিছানায় উঠে বসতে পর্যন্ত পারে না, কথা বলতে পারছে না, নিজের খবরটি পত্রিকায় ছাপা হোক মনের এমনটি ইচ্ছা কি ঐ মুহূর্তে জাগ্রত হয়েছিল তার? না, তা নয়। অন্য কিছু হতে পারে। কিন্তু তা কী? ... এবং এ-ও আমার কাছে এক বিরাট প্রশ্ন যে, সমাজসচেতন ইন্দ্র, একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিল, নিজেও গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার করুণ চিত্রের ওপর বহু প্রতিবেদন লিখেছে, এক শ্রেণীর নিরক্ষর এবং ঠগবাজ ওঝা-কবিরাজকে নিয়ে ফিচার লিখেছে, সে কী করে এক কবিরাজের কাছে হাতুড়ে পদ্ধতির অপারেশন করাতে গেল? মৃত্যুর পর এ ব্যাপারে তার বড় দাদার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, আপনারা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধা দিতে পারতেন। ওর দাদা বলেছেন, 'বিশ্বাস করুন দাদা, আমরা এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানতাম না। এমনকি ওর স্ত্রীকেও কিছু জানায়নি।'

বিকলাঙ্গ ছিল ইন্দ্রমোহন রায়। পা দুটো নষ্ট ছিল তার। জন্মগত। পায়ের পাতা উল্টানো। এজন্যে খালি পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত সে। শরীর দুলিয়ে বেশ দ্রুত পা ফেলত সামনে। গ্রামে গেলে কোনো একজনকে ম্যানেজ করে তার সাইকেলের সামনে বা মোটরসাইকেলের পেছনে উঠত, কিংবা বাহন ছিল রিকশা। ... খালি পায়ে সে গেছে বীরগঞ্জের অফিস-আদালতে, দিনাজপুর শহরে বিভিন্ন দফতরে, কর্মজীবনের সাত বছরে বেশ কয়েকবার গিয়েছে 'সংবাদ' অফিসেও। লাইনেজ বিল নেওয়ার জন্যে।

বীরগঞ্জ ও দিনাজপুরে লক্ষ করেছি অনেকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা করুণার চোখে দেখছে ইন্দ্রকে। পা দুটির কারণে এবং তারা ভদ্রলোক। ... একবার দিনাজপুরে এক কর্মকর্তার কাছে গিয়েছি কিছু তথ্যের জন্যে। আমার কাছে জানতে চাইলেন 'বীরগঞ্জ থেকে একটা ছেলে এসেছিল সেদিন, কী যে নাম ... খোঁড়া ... সে কি আপনাদের 'সংবাদের রিপোর্টার?' শুনেই মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই ... এবং ...।

এই পা নিয়ে ভেতরে ভেতরে খুব যন্ত্রণায় ভুগত ইন্দ্র। চোখের কাতর চাহনিতে প্রায়শই ফুটে উঠত তা। কখনো খুব খোলা হয়ে উঠত তার মনের গভীরে লুকানো ব্যথা। ইন্দ্রর দাদা একদিন সে কাহিনী শোনালেন। বললেন, একা ঘরে থাকলে ইন্দ নাকি তার ভাইয়ের জুতার গর্তে পা ঢুকাতো, কিছু একটা হাতে ধরে সামনে এগুনোর চেষ্টা করত কেবলি হাঁটতে শিখছে এমন শিশুর মতো এবং একা থাকলে সে নাকি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। ... আমি অবশ্য দেখেছি তার অন্যরকম চেহারা। সামনাসামনি হলেই সে দ্রুত হাঁটত, পা দুটি যে সাংবাদিকতার কাজে কোনো বাধা নয় ভাবভঙ্গিতে এমনটিই যেন প্রমাণ করতে চাইত। হ্যাঁ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার। নিজস্ব সংবাদদাতা থেকে হতে চেয়েছিল দিনাজপুরের জেলা বার্তা পরিবেশক। বলত, 'দাদা, অফিসে বলুন না একটু আমার কথা।' আমি চুপ থাকতাম। প্রশ্ন করত সে, 'আপনি কি মনে করেন জেলা বার্তা পরিবেশকের কাজ করতে পারব না আমি?' সন্তোষদা আমাকে যেমন একদা বলেছিলেন, তেমনি করে আমি শুধু বলেছি, 'ইন্দ্র, সুপারিশ করে সাংবাদিকতা হয় না, আমার পক্ষে তা সম্ভবও নয়। আপনার কাজ দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।' এবং এই পর্যায়ে তার কাজ কিছুদিন বেশ ব্যাপকভিত্তিক হতে থাকে। থানা পর্যায়ের সংবাদদাতা হওয়া সত্ত্বেও সে আশপাশের এলাকা এমনকি দিনাজপুর শহরে গিয়েও জেলাভিত্তিক কিছু প্রতিবেদন লিখতে থাকে। এর স্বাক্ষর রয়েছে 'সংবাদে'র পাঁচ কিংবা ছয়ের পাতায়।

একটি অপরাধবোধ থেকে ইন্দ্র-সংবাদ লিখতে শুরু করেছি। এক কৃষকসন্তান, ১২ বিঘা আবাদি জমির মালিক, কামলা লাগিয়ে আমন কিংবা বোরো ধান ফলাতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি কাজ করত গ্রামীণ সাংবাদিকতার, এসব ব্যাপার-বিষয় এইমুহূর্তে আমার কাছে প্রধান কিছু নয়। কিংবা তুলে ধরতে চাইনি তার অসহায়ত্ব। দেশের সংবাদপত্র-শিল্প এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে কে কতটা সুস্থ আছি আমরা?

না, সেসব প্রসঙ্গ নয়, আমি ইন্দ্রের সাথে যে অবিচারটি করেছি 'নিজস্ব রিপোর্টে' তারই অনুশোচনা-অনুভূতি ব্যক্ত করতে চাই।

একবার হলো কী, ইন্দ্রমোহন রায়ের সাথে দূর এক গ্রামাঞ্চলে গেলাম। ভূমিহীনদের জমি ভোগ করছে এমন কিছু ব্যক্তি, যারা আদৌ ভূমিহীন নয়—এরা বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে এবং একজন প্রভাবশালীর সাথে জোট পাকিয়ে রাজস্ব অফিসে ঘুষ দিয়ে জমি হাতিয়ে নিয়েছে। আর এলাকার প্রকৃত যারা ভূমিহীন তারা আশ্রয়হীন। এই বিষয়ের ওপর একটা সরজমিন প্রতিবেদন লিখব।

ঐ গ্রামে গিয়ে এক ব্যক্তির উঠোনে আমাদের মোটরসাইকেল থামল। লোকটির জমি আছে নিজস্ব মালিকানায়, তার ওপর আবার কাঠমিস্ত্রি, দৈনিক ৮০-৯০ টাকা আয় করে। এ লোক ভূমিহীনদের জন্যে বরাদ্দ জমি পাবে কেন?

লোকটি আমাদের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলো। আমি সালাম জানালাম। প্রতিজবাব দিল সে। আমি প্রশ্ন করলাম : আপনার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে না? সে মাথা দোলাল। ইন্দ্র খুব বিস্মিত। 'দাদা আপনি বুঝলেন কী করে যে ওর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে? আগে থেকেই কি জানতেন?' আমি নিম্নকণ্ঠে বললাম, দূর বোকা! এটাও বোঝেন না! ওর কথা শুনেই তো বোঝা যায় যে বাড়ি কোথায়?

ইন্দ্র বলল 'ও!'

তারপর অনেক কথা। কী করে ভূমিহীন সেজে খাস জমি নিয়েছে সে-কথা লোকটা স্বীকার করল গড়গড় করে, প্রশ্নের কৌশলে। আমি বললাম, জমি তো আপনি নিজের নামে নেন নি, তাই না?

মাথা দোলাল লোকটি। হ্যাঁ স্যার, আমার নামে নয়, আমার স্ত্রীর নামে নিয়েছি।

: আপনার তো তিন স্ত্রী। এখানে দুজন চাঁপাইনবাবগঞ্জেও একজন আছে। তাই না?

: হ্যাঁ স্যার ...

: তাহলে কোন্ স্ত্রীর নামে জমি নিলেন? প্রথম স্ত্রীর নামে? তাই না?

: হ্যাঁ স্যার ...

কাজ শেষ করে ফিরে আসি বীরগঞ্জ সদরে। ইন্দ্রমোহন রায় আমার পিছু ছাড়ে না। 'ভাষা শুনে নাহয় বুঝলেন যে লোকটার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ। কিন্তু তিনটি বউ আছে এটা জানলেন কি করে?' সে জানতে চায়।

আমি হাসি। ইন্দ্র, এটা একটা ধারণার প্রশ্ন ছিল। লেগে গেছে।

: বলেন কী! ইন্দ্র খুব অবাক।

আমি বলি, এক বউ তো আমাদের সামনেই ছিল। সে বয়স্কা মহিলা। কিন্তু ওদিকে আরেক ঘর থেকে একটি মুখ উঁকি দিচ্ছিল। তাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা করি। আর দেশান্তরী লোকটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জেও যার বাড়ি-ভিটে আছে, সেখানে আরেক স্ত্রী থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর এইসব মিলিয়ে তিন বউয়ের কথাটা বলেছি। লোকটা স্বীকারও করেছে।

: 'আপনি বুঝলেন কী ক'রে যে লোকটা বড় বউয়ের নামে জমি নিয়েছে?' ইন্দ্র আবার প্রশ্ন করে।

আমি বলি, এটাও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ইন্দ্র। ছোট বউ যুবতী, দেখতে সুন্দরী, তাকে সে রাজস্ব অফিসে নিয়ে যাবে না। বরং বড় বউ দেখতে বয়স্কা, ভাঙা চেহারা, দেখতে দুঃস্থ দুঃস্থ ভাব। ভূমিহীনদের জমি বাগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এই মহিলাকেই প্রদর্শন করবে সে। তাই নয় কি?

কথা শেষ হতেই ইন্দ্র পায়ে হাত দিয়ে বসল। 'দাদা, আজ থেকে আপনি আমার ওস্তাদ।' 'করেন কী, করেন কী' বলে ছিটকে সরে আসা সত্ত্বেও পায়ের ধুলা কপালে ঠেকায় সে। আমি বলি, 'ওস্তাদ-টোস্তাদ বাদ দিন। চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করে যান ...।'

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে ইন্দ্রমোহন রায় তল্পিতল্পাসহ রংপুরে এসে হাজির। তার আগমনের উদ্দেশ্য তাকে নাকি 'ভালো রিপোর্ট' লেখা শিখতে হবে। জানালো এখানে একটি হোটেলে উঠেছে।

এ এক ঝামেলা বটে। ভালো রিপোর্ট লেখার কী শেখাই তাকে? কিন্তু না বলতে পারি না। ও যেন কোনোভাবেই এমনটি মনে না করে যে, ওকে আমি অবহেলা করছি। পা নিয়ে একেই মানসিক একটা যন্ত্রণায় ভোগে সে, তার ওপর চাহনিটি এতই করুণ যে, আহত করতে ইচ্ছে হয় না। সাংবাদিকতার কি কখন কোথায় কিভাবে এইসব গদবাঁধা বাক্য আউরাই। পড়তে দিই মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের সাংবাদিকতার ওপর লেখা দুটি বই।

ইন্দ্রর শেখার খুব আগ্রহ ছিল। দুদিন 'তালিম' দেওয়া হলো তাকে। কিন্তু হাতের লেখা ওর খুব খারাপ। নিজের লেখা নিজেই বুঝতে পারে না। অসংখ্য বানান ভুল। পূর্বদিক লিখতে রেফ্ দেয় উল্টো দিকে, আমি রেগে যাই। রেফ্ দেওয়াটাও জানেন না? ভয়ে কেঁপে ওঠে ইন্দ্র।

অতঃপর হাতের লেখা এবং বানান শুদ্ধ করার প্রাণান্তকর এক চেষ্টা। একটানা তিনদিন ওকে হাতের লেখা শেখাচ্ছি। বড় একটা কাগজে আমি অ আ ক খ গ ঘ লিখে দিই। ইন্দ্র তার ওপর কলম ঘষে। হোটেল কক্ষে সে এক দৃশ্য বটে। বড় বড় অক্ষরের ওপর কলম টেনে যাচ্ছে ৩৫-৩৬ বছরের ইন্দ্র। ... তিনদিনের মাথায় দেখা গেল সে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। আগের কাঁকড়ার পায়ের ছাপের মতো লেখা কোথায় উধাও, ইন্দ্র নিজেই পার্থক্যটা বুঝতে পেরে কপালের ঘাম মোছে, তৃপ্তির হাসিতে ভরে যায় ওর সরল চোখমুখ।

কিন্তু চতুর্থদিনের মাথায় ঘটল ঘটনাটা। আমি সকালবেলা হোটেলে এসেই বললাম, 'হাতের লেখা তো ভালো হয়েছে, এখন লিখুনতো একটা রিপোর্ট। দেখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন হয়!' বেশ উৎসাহের সাথেই সে লিখতে বসল। আমি ডিকটেশন দিচ্ছি: 'বীরগঞ্জ থেকে প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে রাধারামপুর গ্রামে ... ।'

বিছানার ওপর প্রায় উবু হয়ে বসে ইন্দ্র লিখছে। আমি মেঝেতে পায়চারি করছি। থমকে দাঁড়িয়ে দেখি ওর লেখা। হঠাৎ পূর্বদিকের বানানটির ওপর চোখ আটকে যায়। আবার সেই ভুলটি করেছে ইন্দ্র। রেফ্ দিয়েছে উল্টোদিকে, শুধু তা-ই নয়, ভুল করেছে পূর্ব এবং রাধারামপুর বানানটিও। প-এর নিচে উ-কারের বদলে দিয়েছে উ-কার। রাধারামপুরকে লিখেছে বাধারামপুর।

কী জানি কী হয়। মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। নিজের সমস্ত কাজকর্ম ফেলে একটানা শ্রম দিলাম, তার ফল এই! আমি গর্জে উঠি। মুখ তুলতেই সামনে গিয়ে গালে কষে মারি প্রচণ্ড এক চড়। 'ওরে বাবারে' বলে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে 'সংবাদে'র এক নিজস্ব সংবাদদাতা ইন্দ্রমোহন রায়। আমি কি তখন পশু হয়ে গিয়েছিলাম?

পরে আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম। প্রতিউত্তরে আমার হাত চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল ইন্দ্র। বলেছিল, 'আমার লাগেনি দাদা।'

'আমার লাগেনি দাদা।'

বড় যন্ত্রণা দেয় তিন শব্দের ছোট্ট কথাটি। বিভিন্ন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, করুণা এবং বিকলাঙ্গ দেহটি নিয়ে যে ছেলেটি বড় হয়েছে, ক্ষেতে শস্য ফলিয়েছে।

AMARBOI.COM

১০

ভাত ও ভাতার

অনেক ঘটনা, হয়তো খুব ছোট, অনেকদিন আগে ঘটেছিল, তবু তা স্মৃতিতে থেকে যায়। সেই স্মৃতি কোনোটা দুঃখ-বেদনার, কোনোটা আবার আনন্দেরও।

একাশি সালে একবার কুড়িগ্রামের চিলমারীতে গিয়েছি। চর এলাকার মানুষগুলো কিভাবে জীবনযাপন করে তা সরজমিনে খতিয়ে দেখবার জন্যে। থানা সদর থেকে মাইল পনেরো দূরের একটি চর এলাকা বেছে নেওয়া হলো যেখানে বাস করে শ দেড়েক পরিবার। এদের মধ্যে ১টি পরিবার-প্রধানের হাতে মোটা পরিমাণ এবং ৩টি পরিবারের মালিকানায় সামান্য জমি রয়েছে। বাদবাকি সবাই ভূমিহীন। মাত্র ১টি করে কুঁড়েঘর। বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্যে অবস্থাপন্ন একটি বাড়িতে শুধু টিউবওয়েল রয়েছে, তা থেকে পানি কাউকে নিতে দেওয়া হয় না 'কল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে' বলে। বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি পান করে তারা, শুকনো মৌসুমে প্রায় কারবালার দশায় পড়ে। মল-মূত্র ত্যাগ করে ওরা খোলা জায়গায়, ঘরে ঘরে কৃমি, অপুষ্টি, রাতকানা ও চর্মরোগ। শুনলাম মজুর পরিবারগুলোর অনেকেই মঙ্গার সময় মধুয়ার গোড়া চিবিয়ে রস খায়, খায় চরের বালুতে জন্মানো একধরনের ঘাসের গোড়ার ক্ষুদ্রকার মূল, যাকে বলে 'কেশুর'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাতের দেখা মেলা ভার, খায় তারা কাউনের ভাত, কলার থোড় সিদ্ধ, কচুর মুড়ো, কোনো কোনো পরিবারে মধ্যাহ্নভোজ মানে কয়েক মুঠো ছোলা ভাজি এবং তা ভাগাভাগি করে খাওয়া। একেকটি পরিবারে সদস্যসংখ্যা পাঁচ ছজন। অবস্থাপন্ন পরিবারটিতে মুরগি জবাই হয়, থাকে মাছ, সবজি, ডিম, দুধ; কিন্তু এরই পাশাপাশি, ধান বপন বা রোপণ, যত্ন পরিচর্যা, কাটা মাড়াই, বহন এবং দূরের হাটে নিয়ে বিক্রি করে আসার কাজগুলো যারা করে থাকে তারাই অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, উপোস-কাপাস তাদের নিত্যসঙ্গী। বয়সে যুবক, খুব জোর ত্রিশ-বত্রিশ বছর, কিন্তু হাঁটতে গেলে কোমর দোলে, বুকের সবকটা হাড় গোনা যায়, চোয়াল ভাঙা, কোটরাগত চক্ষু—যেন জীবন্ত একেকটা কঙ্কাল। কিন্তু গা লাগোয়া ঘর-বসতি হলেও ওদের হাড়ে হাড়ে ঘষা লাগে না। লাগলে হয়তো আগুন জ্বলে উঠত, ভূ-স্বামীর গোলাঘর পুড়ে খাক হতো। কিন্তু নয় ওরা সচেতন, নয় সংগঠিত।

সারিবদ্ধ ঘরবাড়ি। আমরা একটার পর একটায় যাচ্ছি। খোঁজ-খবর নিচ্ছি খুঁটিনাটি ব্যাপার-বিষয়গুলোর। ঘরে সহায় সম্পদ বলতে কী কী আছে, খাদ্য সঞ্চয় কতটুকু এবং কতদিনের, মজুরি কে কেমন পায়, অসুখ-বিসুখ এবং দেশ দুনিয়ার খবরাখবর ওরা কতটুকু রাখে, রাজনৈতিকভাবে সচেতন কিনা, ভোটদানে উৎসাহ কেমন, এক কথায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বিস্তারিত একটি জরিপ কাজ চলছিল। অনেক পাঠক আছেন যাঁরা শুধু কাহিনী-বর্ণনায় সন্তুষ্ট নন, তথ্য চান তাঁরা। এ জন্যেই শহর থেকে এতদূরে হেঁটে আসা। না, এখানে পথ বলতে কিছু নেই, ব্রহ্মপুত্রের চরের বালুর ওপর দিয়ে কেবল দিকনির্ভর হাঁটা। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

: নাম কি?

: বাইগুনি।

: স্বামীর নাম?

বলে না। লজ্জায় মুখের ওপর টানে ছেঁড়া ময়লা বিবর্ণ আঁচল। স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে নেই। আবার প্রশ্ন করলে বলে, 'তার নাম খোকার বাপ'। তারপর গুঁতো মারে পাশের ঘরের বধূটিকে, 'কও ক্যানে রে'। অর্থাৎ তুই বলে দে না। নাম বলে মেয়েটি বাইগুনির স্বামীর। তার নাম মন্তা। মন্তা মানে মন্তাজ।

: মন্তাজ আলী না হোসেন?

: মন্তাজ আলী।

: ছেলেমেয়ে কটি?

: পাঁচ-ছয় জন।

: এটা একটা কথা হলো? ঠিক করে বলুন, পাঁচ জন না ছয় জন?

: ছয় জন।

: ছেলে কজন, মেয়ে কজন :

: পাঁচ বেটা একনা বেটি।

: ওরা কোথায়?

: খড়ি কুড়বার গেইচে। আর বেটি কোনা বাড়িতে আচে। ঐ যে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাই বাইগুনির চোখ অনুসরণ করে। ঘরের দরজা থেকে সরে যায় একটি মুখ ঝট করে। পরে শুনি, পিতার একটি মাত্র যে লুঙ্গিটি, তারই একটি খণ্ড তার পরনে। শুধু কোমরে পেঁচানো যায়, কিশোরীর বুক উদোম। শহর থেকে 'লোক' আসায় অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় সে বেরুতে পারছিল না ঘরের বাইরে। শুনি, লুঙ্গির বাকি যে অংশটুকু, তা দু টুকরো করে লেংটি বানিয়ে নিয়েছে বড় ছেলে দুটি। পরে গেছে জ্বালানি সংগ্রহ করতে। অপর তিনজন লেংটাই থাকে। ছোট ওরা।

পাশের ঘরে আসি। উঠোনে, হেলে পড়া ঘরের ছায়ায় লম্বা শুয়ে আছে এক প্রৌঢ়া। একখণ্ড চটের ওপর শোয়া, গায়ে একখানা শতছিন্ন কাঁথা। ডায়রিয়া হয়েছে এর, দুদিন ধরে পড়ে আছে এইভাবে, সামান্যতম ওষুধ জোটেনি। কামলা স্বামীটি ছিল বাইরে, আজ সকালে ফিরে এসেই ছুটে গেছে পাশের গ্রামে, কবিরাজের কাছে। ... আমাদের দেখেই সে ঘোলা চোখ মেলল এবং বোবা চাউনিতে ঝরাল আকুতি।

: কাঁয় তোমরা? মোক ... মোক একনা খাবার দ্যেও ...। অসুখের চেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় সে খুব কাহিল। মূলত অনাহার-অর্ধাহার থেকে সৃষ্ট যে 'ডায়রিয়া', তা নিরাময়ের জন্যে এই মুহূর্তে স্যালাইন কিংবা ওষুধের চেয়ে বেশি প্রয়োজন কিছু খাবার। ... এবং এখানে সাংবাদিকতা চলে না, প্রশ্ন করা এবং একের পর এক নোটবুকের পাতা ভরে ফেলা নিজের কাছেই ঠেকে অপরাধের মতো। না, তার নাম দরকার নেই, তার পরিচয় দরকার নেই, কতদিন সে খায়নি জানা দরকার নেই, এখন সে বাংলাদেশের লাখো ক্ষুধার্ত মানুষের একজন, যে কি-না মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

AMARBOI.COM

কয়েক টুকরো বিস্কিট ছিল ব্যাগে। সহকারী তা-ই বের করে দেয়। এক লোটা ঘোলা পানি খুঁজে পাওয়া যায় তিন ঘর পরের এক বাড়ি থেকে। বিস্কিট দেখামাত্র উঠে বসতে চায় প্রৌঢ়া, পারে না, আধশোয়া অবস্থায় এসেও আবার কাত হয়ে পড়ে যায়। 'তুমি মুখ খোলো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি', সাহায্যে এগিয়ে আসে পাশের বাড়ির এক কামলা-বধূ। হাঁ মেলে প্রৌঢ়া। বিস্কিটের টুকরো তার মুখে দেওয়া হচ্ছে। বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখ-চোয়াল নাড়াচ্ছে সে। ... আমার ভীষণ এক অনুভূতি হচ্ছে গলার কাছে, সহকারীটির চোখে জল। দীর্ঘ অনাহারী এক মায়ের বিস্কিট ভক্ষণের এই দৃশ্য মৃত্যুর চেয়েও যেন মর্মান্তিক, সহ্য করতে পারছি না, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি ঘরের পেছন দিকে। শিকড় পর্যায়ের প্রতিবেদন লিখতে এসে এ কী ভক্ষণ দৃশ্য দেখলাম আমি! ক্ষুধার এ কী যন্ত্রণা! মুখে গরিব দেশ বললেও এদেশে এক শ্রেণীর মানুষের প্রাচুর্য-বিলাসের কমতি নেই, এদেশে খাদ্য অপচয় কম হয় না, সরকারি খাদ্য গুদাম এবং ভূস্বামীর গোলায় ঠাসা থাকে ধান-চাল-গম, অথচ খাদ্যাভাবে মরছে একই দেশের আরেক শ্রেণীর মানুষ এবং তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

বিস্কিট ভক্ষণের পর সে কি একটু বল ফিরে পায়? পায় বুঝি। কেননা লোটা ভরা পানি সবটুকু পান করে সে কাঁধ এবং মুখ উঁচিয়ে। 'আল্লারে' উচ্চারণের সাথে সাথে এলিয়ে পড়ে আবার। বন্ধ করে আছে চোখের পাতা। তার সাথে আর কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলি না। প্রতিবেশীর মুখ থেকে শুনি, এর স্বামী বৃদ্ধ কাশেম আলী এক সময় মাঝারি কৃষক ছিল, কিন্তু নদী ভঙ্গের শিকার হয়, পরিণত হয় সম্পূর্ণ ভূমিহীনে। এখন কামলা খাটে। আশপাশে কাজ জোটে না বলে দিন পনেরো আগে চলে গিয়েছিল দিনাজপুরে। সেখানে কাজ পেয়েছে কি-না কিংবা টাকা-পয়সা কিছু আনতে পেরেছে কি-না এখনও তা জানা যায়নি। বাড়ি ফেরামাত্র প্রিয় স্ত্রীর এই অবস্থা দেখেই ছুট দিয়েছে সফর ক্লান্ত বৃদ্ধ। শুধু বলেছে, 'অক তোমরা দ্যেখেন, মুঁই ঐষোদ ধরি আইসো।' ওকে তোমরা দেখো, আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।

জানা গেল, এই দম্পতিটির ঘরে আর কোনও সদস্য নেই। দুটি ছেলে ওদের। সেয়ানা হবার পর বিয়েশাদি করে আলাদা হয়ে গিয়েছে। ওরাও মজুর, থাকে কুড়িগ্রামের শহর-পার্শ্ববর্তী বাঁধের ধারে। পিতা-মাতাকেও সেখানে যেতে বলেছিল, কিন্তু 'নিজের দেশ' ছেড়ে যেতে রাজি হয় নি আবুল কাশেম। রাক্ষুসী ব্রহ্মপুত্র, ভিটা-জমি কেড়ে নিয়েছে, কৃষক থেকে মজুরে পরিণত করেছে, সেই বৃদ্ধ তার কাছাকাছি থাকতে চায় বুঝি আমৃত্যু।

একেই মর্মস্পর্শী দৃশ্য, ভুখা-নাঙ্গা মানুষের জীবন-কাহিনী শ্রবণ, নোট করা, ছবি তোলা, বেশ কাহিল লাগছে। প্রৌঢ়ার ক্ষুধা বুঝি ভীষণ কোনো রোগের মতো সংক্রামিত হয়েছে আমাদের মাঝেও। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে যেখানে, এখান থেকে বেশ দূর, এদিকে আমাদের কাজও শেষ হয় নি। আর মাত্র চার-পাঁচ ঘর বাকি আছে কথা বলা।

: কতক্ষণই বা লাগবে। কাজটা একেবারেই শেষ করে ফেলি। আবার এখানে আসা কষ্টকর হবে। বলল সহকারী। তার উৎসাহে আমিও একটু চাঙ্গা হই। 'কী হবে দুপুরে না খেলে! এখানে কত মানুষ তো অনাহারে আছে, আমরা পারব না!'—এ-রকম হালকা কথাও ভাবি।

এ-সময়ই হঠাৎ গন্ধ পাই ভাতের। বাতাসে ভেসে আসে মাড়ের ঘ্রাণ। আশ্চর্য! চুলো জ্বলছে একটি বাড়ির উঠোনে। উনুনে চাপানো হাঁড়ি। মুখের ঢাকনা আধখোলা। স্পষ্ট দেখা যায় টগবগানি, ফুঁসে ওঠা ফেটে যাওয়া ফেন ও ফেনার বুদ্বুদ। সকাল থেকে এই প্রথম আমরা কোনো বাড়িতে ভাত রান্না হতে দেখছি।

বধূটি, আমাদের সাড়া পেয়ে ঘোমটা টানল। উনুনের ভেতর ঠেলে দিল আরও কিছু শুকনো পাতা। ভাতের মতো প্রধান খাদ্য রন্ধন নিয়ে এতই ব্যস্ত সে, আমাদের দিকে ফিরে দেখবার মতো ফুরসত তার নেই। বরং সে ব্যস্ত হাতে হাঁড়ির ঢাকনি খুলল, বাঁশের তৈরি 'নাকরি' দিয়ে ভাত তুলে টিপল। তার সেই টেপার ভঙ্গিতেই বুঝতে পারি, ভাত ফুটেছে প্রায়।

সহকারী গলা খাঁকারি দেয়। যেন খুশখুশে কাশি হয়েছে এমন শব্দটি করার উদ্দেশ্য হলো আমাদের উপস্থিতি বোঝানো।

: বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। ঘোমটা আরেকটু টেনে সলজ্জকণ্ঠে বলে মেয়েটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছেও না সে। উঠোনের একধারে, যেখানে একটি ভ্যারেন্ডা গাছের টুকরো ছায়া, সেখানে আমি বসে পড়ি বাঁশ কেটে তৈরি লম্বাটে পিঁড়িতে। সহকারী বসে পাশে পড়ে থাকা খড়ের উপর, পুরাতন পত্রিকা বিছিয়ে। ক্ষুধা ভুলে যে ছেলেটি এতক্ষণ আমাকেই কাজ করে যেতে উৎসাহিত করছিল, ভাত ও মাড়ের গন্ধে নাড়িতে বুঝি টান পড়েছে। আহ্ শব্দে এমন করে সে বসল যেন ঐ ভাত তারই জন্যে রান্না হচ্ছে এবং এক্ষুনি সামনে এসে পড়বে।

ব্যাপারটা কী? আমি ভাবি। বাড়িতে আর কেউ নেই, একা এই বধূটি ভাত রাঁধছে! কার জন্যে! নিজের জন্যে! না, হাঁড়ির সাইজ এবং ফেনার ফুঁসে উঠা দেখে বোঝা যায় কমপক্ষে একসের চালের ভাত রান্না হচ্ছে।

: আপনার স্বামী কোথায়?

: গাও ধুবার গেইচে। আগের মতোই লজ্জা অবনত, অনুচ্চকণ্ঠে জবাব দেয় মেয়েটি।

স্নান সারতে গেছে ওর স্বামী। নিশ্চয়ই ধারেকাছে কোথাও! নাকি দূরে! তা যেখানেই যাক, খানিক বাদে ফিরে আসবে সে। আমি কল্পনার চোখে দেখি, আমি যে পিঁড়িটিতে বসেছি, তাতে গাঁট হয়ে ভেজা শরীর ভর করেছে কোনো এক যুবক। তার সামনে সানকি। ধোঁয়া ওঠা ভাত সেই মাটির পাত্রে পরিবেশন করছে বউ।

: তরকারি কী রেঁধেছেন?

না, যেভাবে লিখছি সেভাবে নয়, কথা বলি আঞ্চলিক ভাষায়। সঙ্গে বাহে সম্বোধন। কোনো কোনো অঞ্চলে বাহে কথাটি নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা কৌতুক পরিহাস করা হয়ে থাকে, কিন্তু এটি 'বাপু হে'র অপভ্রংশ এবং বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সম্বোধন।

মেয়েটি ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছে। সে জানায়, তরকারি রেঁধেছে সে ঠাকরি কালাই (মাষকলাই)-এর ডাল, আর সঙ্গে আছে একটুখানি শুটকি ভর্তা। জানা গেল তার স্বামীটি এই চরপল্লীর আর সবার মতো একজন কামলা। শহরে গিয়েছিল, কাল অনেক রাতে ফিরেছে, সঙ্গে এনেছে সের দুয়েক চাল, কিছু ডাল, লবণ, এটা-ওটা। সেই চাল থেকে আধাআধি রান্না করা হয়েছে। শহরে গিয়ে স্বামীটি কোথায় ছিল, কী কাজ করেছে, কী খেয়েছে জানে না মেয়েটি, তবে গত পনেরো ষোলো দিন পর এই প্রথম এ বাড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে। শহরে যাবার সময় স্বামী হাতে দিয়ে গিয়েছিল মাত্র দশটি টাকা, তা ফুরিয়ে যাবার পর মেয়েটি কোনো বেলা খেয়েছে শাকপাতা সিদ্ধ, থোড় সিদ্ধ, কাঁচা কলা সিদ্ধ, প্রতিবেশীর কাছ থেকে পাওয়া একটুখানি জাউ। কোনোবেলা থেকেছে উপোস। না, নিজের নাকি কষ্ট হয় নি, ছেলেটির ক্ষুধার কান্না থামাতে বেগ পেতে হয়েছে। শুনলাম ঐ ছেলেটি, বয়স যার তিন বছর, সে গেছে বাবার সাথে স্নান করতে। তার নাম কালটু।

কথা বলতে বলতে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। শরীর দেখে বুঝি, সে আবার গর্ভবতী। ঘোমটা সরে যাওয়ায় এখন তার মুখ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। দীর্ঘদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাহার, অর্ধাহার সত্ত্বেও মুখটি বেশ ফোলা, পানি জমেছে, ফ্যাকাশে রং, চোখ কোটরাগত। চমকে উঠি। পাণ্ডুর রোগাক্রান্ত হয়ে উঠেছে মেয়েটি। এতক্ষণ কণ্ঠ শুনে আদৌ বুঝতে পারি নি এমন চেহারা তার দেখতে হবে। লজ্জায়, নাকি ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখটি আড়াল করবার জন্যে এতক্ষণ সে ঘোমটা টেনেছিল, এখন অসুস্থ এই মুখ ও দেহ প্রকাশিত হবার পর ভীষণ রকম এক প্রতিক্রিয়ায় মন তোলপাড় হয়ে উঠছে। ঘোমটাই কি ভালো ছিল?

হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে বসল।

এবং এর জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। কল্পনাও করি নি দুপুরের চড়া রোদের ভেতর, আমরা শহর থেকে আসা দুজন, ঐ ভাত সম্পর্কিত দুর্ঘটনা-দৃশ্য দেখব। বধূটি পাট দিয়ে বানানো 'নুচনা' হাঁড়িটির মুখে জড়িয়ে ভাত নামালো, ঘরে নিয়ে যেতে থাকল সে। এ সময়, হঠাৎ করে, কী যে হলো, হাত থেকে খসে পড়ল হাঁড়িটি! থপাস্ করে শব্দের সাথে 'বাবারে মরি গেনু রে' বলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা-চিৎকার। সাদা সাদা এক হাঁড়ি ভাত, মাড়, তার পায়ের ওপর পড়েছে। আমরা তড়াক করে উঠে দাঁড়াই, ছুটে যাই মেয়েটির দিকে। কিন্তু তার আগেই সে পা টেনে আনে, যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ে উঠোনের ধুলোতে। তার কান্না ও চিৎকারে আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে আসে কয়েকজন মহিলা, গুটিকতক শিশু-কিশোর, হাঁপানি-আক্রান্ত এক বৃদ্ধ। সবার কণ্ঠে এক প্রশ্ন : কি হইচেরে কালটুর মাও?

উঠোনে ভাত ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে সবাই হল্লা জুড়ে দেয়। এহেন সর্বনাশের ঘটনা দেখে আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে সবার মাথায়। ভাত ও মাড় পায়ে পড়ে কী দশা হয়েছে ফিরেও দেখছে না কেউ, সবাই শুধু একটি কথাই বলছে, কালটুর বাপ অর্থাৎ মেয়েটির স্বামী আজ তার স্ত্রীকে মেরে শেষ করে ফেলবে। ঐ যে দূরে দেখা যায়, চরের বালুর ওপর দিয়ে কালটুকে কাঁধে নিয়ে আসছে ওর বাবা।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা দুজন হতভম্ব! এ কী হলো! অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকি। একটা মানসিক দুর্বলতা কাজ করছে। আমরা এখানে এসে কথা বলছিলাম এবং সেই আলাপের অমনোযোগিতার কারণেই কি ভাতের হাঁড়িটি খসে পড়ল মেয়েটির হাত থেকে? পড়শিরা বলছে, মেয়েটির স্বামী ঘরে ফিরে নাকি পিটিয়ে শেষ করে দেবে। প্রচণ্ড মেজাজি সে এবং এখন নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। ভাত বাড়তে একটুখানি দেরি হওয়ায় গ্রামে তালাক উচ্চারিত হয়ে যায় রাগী স্বামীর মুখ থেকে; সেক্ষেত্রে, আভাস যা পাচ্ছি, তাতে কী ঘটবে মেয়েটির কপালে! ... এদিকে বধূটি, এখন যার পরিচয় কালটুর মা, সে কাঁদছে। পায়ের পাতা শাড়ির আঁচলে চেপে ধরে কাতরাচ্ছে। উচ্চারিত সংলাপে বুঝি, না তার এ কান্না গরম ভাত ও মাড় পায়ে পড়বার জন্যে নয়, কালটুর বাপ ফিরে এসে পিটুনি দেবে সেই ভয়ে। সে বলছে, 'তোমরা কাঁয়ো মোক ছাড়ি যান না, কালটুর বাপ আইজ মোক মারি ফ্যালাইবে।' অর্থাৎ তোমরা কেউ আমাকে ছেড়ে যেও না, কালটুর বাবা আজ আমাকে মেরে ফেলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি একটুখানি নারিকেল তেলের সন্ধান করি। পায়ের চামড়ায় ফোস্কা তো পড়েই গেছে ইতোমধ্যে, তবু একটু তেল মাখলে যন্ত্রণার উপশম হতে পারত। কিন্তু ধারেকাছে কারও বাড়িতেই নেই। দুই-তিন টাকা দিনমজুরি যে অঞ্চলে, যেখানে একমুঠো খাবার মানে স্বপ্নের ব্যাপার, সেখানে এই মজুরপল্লীতে, কে ঘরে রাখবে মাথায় মাখার নারিকেল তেল!

শোরগোল বেড়ে যায়। সেই সাথে চড়ে ওঠে বধূটির কান্না! তাকে ঘিরে আছে কেউ, একজন একটি 'তস্তি' (চাল ধোয়ার জন্যে ব্যবহৃত মাটির পাত্র) এনে তাতে 'হাতা' দিয়ে তুলছে ছড়িয়ে পড়া ভাত। ... এ সময় উঠোনে এসে হাজির হয় সেই বউ পেটানোয় অভ্যস্ত পুরুষটি, কালটুর বাপ।

: কি হইচে রে? কি হইচে?

কাঁধে ছিল কালটু, তাকে ধপ্ করে নামায় লোকটি। দুপুরের জনপূর্ণ উঠোনে গভীর রাতের মতো নিস্তব্ধতা। সবার চোখে ভয়, বিস্ময়ে থির হয়ে দেখছে সবাই কালটুর, বাপকে। এক্ষুনি বুঝি বাঘের মতো হামলে উঠবে সে। 'কি হইচে রে' প্রশ্নে এমন চড়া তেজ, গমক, যেন এখন নিজের উঠোনে লোকটি নিজেরই স্ত্রীর মৃত্যুদূত।

আমার বুক ধুক ধুক করছে। ভাত পড়ে যাওয়ার দৃশ্য, বধূটির যন্ত্রণাকাতর বিলাপ, স্বামীর হাতে মার খাওয়ার আতঙ্ক, এতক্ষণ ধরে কালটুর বাপের মেজাজ বর্ণনা শ্রবণ, সব মিলিয়ে এক বিচিত্র অনুভূতির ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছি। এখন সামনে ঐ লোকটি, ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে থির, যেন ঝড়ের আগে আকাশ। তার মাথায় মেলে রাখা ভেজা গামছা, হাঁটুর ওপর তোলা ভেজা-ল্যাপ্টা লুঙ্গি, হাড় বের হওয়া উদোম বুক, পেটে ক্ষুধার গর্ত। তার চোখের দিকে তাকাই। ধক ধক করে জ্বলছে মণি। বসন্তের দাগ-স্পষ্ট মুখের চোয়াল-চাপা চামড়া কাঁপছে। গোসল সেরে এসে গরম ভাত খেতে বসবে যে লোকটি, এখন কি সে গিলে খাবে তার স্ত্রীকে? পাড়া-প্রতিবেশীদের? এবং আমাদেরও?

ফুঁসছে লোকটা। বধূটির স্বামী। কালটুর বাপ। সফর কর্ম ও ক্ষুধাক্লান্ত এক কামলা। স্বামীর উপস্থিতি টের পেয়ে মেয়েটির বিলাপধ্বনি বেড়ে গেছে। সে কাঁদছে আর বলছে, 'মোক মারেন না ... মুঁই মরি যাইম ... ফির মুঁই ভাত চড়েয়া দিতোচো ...।' আমাকে মেরো না ... মারলে আমি মরে যাব ... আবার আমি ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি ...। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই, প্রচণ্ড এক চিৎকারে ভাত ও মানুষ ছড়ানো উঠোন কাঁপিয়ে তোলে সেই লোকটা। 'চুপ কর হারামজাদী, চুপ কর! কান্দিস না! ওঠেক অটে থাকি! ঘরোত যা!'

তারপর ভাঙা চেহারার ক্ষুধার্ত মানুষটি 'বউ পিটানি ভাতার' বলে পল্লীতে সর্বপরিচিত, ধীর-শ্লথ পায়ে এগিয়ে যেতে থাকল স্ত্রীর দিকে। বধূটিকে ঘিরে রাখা জটলা সরে গেল। পায়ের কাছে বসল সে। 'দ্যেকো, কি হইচে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোস্কা-ওঠা পায়ে স্বামীর হাতের স্পর্শ পেয়ে মেয়েটি আরও জোরে কেঁদে ওঠে। সে বলছে, 'পাঁও ছাড়ি দ্যেও। বেটি ছাওয়ার পাও ধরা যায় না। গোনা হয়।' পা ছেড়ে দাও, স্ত্রীর পা ধরা যায় না, গুনাহ্ হয়।

স্বামীটি ধমকে ওঠে, 'চুপ কর'। তারপর মুখ ঘুরিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে একটি কিশোরকে বলে, 'যা তো রে হবি, মণ্ডল সাইবের বাড়িতে এ্যকনা নাইরকোলের ত্যাল পাওয়া যায় নাকি দ্যেখেক তো!'

উঠোনে গড়িয়ে পড়া মাড় তখন ঘন হয়ে উঠেছে। মাছি ভন ভন করছে। ধুলো-বালি মিশ্রিত কিছু ভাত ঝাঁট দিয়ে জড়ো করছে একটি কিশোরী। পড়শি দুই মহিলা বলাবলি করছে, 'কালটুর বাপের কি হইল্? তায় কি বাউরা হয়া গ্যেলো নাকি? কালটুর বাবার কি হলো! সে কি পাগল হয়ে গেল!

বেড়াহীন ঘর, ভ্যারেণ্ডা গাছ, মানুষ, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় ছায়া। উদয়াস্ত পরিশ্রমী অথচ অনাহারী কামলা কিষান মানুষের ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং ছোট ছোট ভালোবাসা—এইসব হৃদয়ের নোটবুক ও ক্যামেরায় ভরে নিয়ে আমরা দুজন হাঁটতে থাকি আস্তানার দিকে ...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ

উৎসর্গ

শ্রী সন্তোষ গুপ্ত

শ্রদ্ধাভাজনেষু

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাঁরা রংপুর-দিনাজপুরের দিকে বেড়াতে যান, কিংবা যান দাপ্তরিক ও সাংগঠনিক কাজে, তাঁদের অনেকেই হয়তো পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়ার বিলুপ্তপ্রায় বাড়িটি দেখে এসেছেন। অবশ্য বাড়ি বলতে যা বোঝায় তার কিছুই এখন আর দেখা যাবে না। একটি উঁচুমতো ভিটার ওপর ইংরেজি 'টি' অক্ষরের আকারে দাঁড়ানো পিলার। এটি বেগম রোকেয়ার আঁতুড়ঘরের পূর্বাংশ। ধসে পড়ো-পড়ো এই স্তম্ভটি ছাড়া রোকেয়ার পিতৃগৃহের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আছে ভিটার এদিকে-ওদিকে কয়েকটি খেজুরগাছ, খণ্ড খণ্ড ঝোপ, কচুগাছ, ইটের টুকরো, এটা-ওটা আবর্জনা। এরই মাঝে মহিলা পরিষদ-নির্মিত একটি ছোটখাটো স্মৃতিস্তম্ভ, পাকা, চৌকোণা, বহু বছর ধরে মাটি আর বুনোঘাসের সাথে সেঁটে আছে। রোকেয়ার আঁতুরঘরের সর্বশেষ অংশটি ধসে পড়লে এই স্মৃতিস্তম্ভটি ছাড়া আর কোনো চিহ্ন থাকবে না যে এখানে একদা কারও কোনো আবাস ছিল, বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল সাবের পরিবারের বাড়ি। রোকেয়ার জন্মস্থানের শেষ চিহ্নটুকু সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্যে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বহুবার দাবি তোলা হয়েছে। সরকার এসেছেন, গেছেন, এসেছেন, কখনোবা প্রতিশ্রুতিও মিলেছে, কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি। স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেননি স্থানীয় প্রশাসন। অথচ কত টাকাই-বা খরচ হতো!

জন্মভিটার একদিকে রোকেয়ার স্মৃতি নিয়ে আছে 'এল' প্যাটার্নের দুটি বিদ্যাপীঠ। বেগম রোকেয়া প্রাইমারি স্কুল আর বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল। আছে একটি মসজিদ, সড়কের ধারে আছে 'বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদ', সদ্য গড়ে-উঠা কিছু ছোট ছোট দোকান, রুই-কাতলা মাছে ভরা বিরাট পুকুর। আরেকদিকে আছে বিছানাপত্র ও আসবাবহীন একটি রেস্টহাউস যেখানে রাতে ছাগল থাকে। পাশেই ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের পাকা ভবন। ভিটার পশ্চিমদিকে এলোমেলো কিছু খড়-ছাওয়া ঘরবাড়ি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, খিরার খণ্ড খণ্ড ক্ষেত, কলাগাছের ঝোপ, বাঁশঝাড়, নানা গাছগাছালি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাঁশঝাড় আর গাছে ঢাকা যে ঘরবাড়ি, তা খড়-চাটাই নির্মিত, বাঁকা ভাঙা ফুটো, কোনোটায় চাল নেই, কোনোটার বেড়া উধাও, দেখেই বোঝা যায় এগুলোতে বসবাস করে কোমরভাঙা মজুর, রিকশাচালক, চায়ের দোকানের কর্মচারী, বিধবা কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলা। আছে এদের ঘরে ক্ষুধা, অনাহার-অর্ধাহার আর অপুষ্টি-আক্রান্ত একপাল শিশুকিশোর। উলঙ্গ অথবা প্রায়-উলঙ্গ এইসব পায়রাবন্দের আগামী-মানুষ, এখন হাত লিকলিকে, মাথা মোটা, পেট ফোলা, অনেকে রাতকানা রোগে ভুগছে। মাথায়-পিঠে অনেকের ঘা, হাতেপায়ে খোসপাঁচড়া চুলকানি। ডায়রিয়া ঘরে ঘরে, অথচ গুড় চিনি পানি দিয়ে খাবার স্যালাইন বানানো যায় সে খবরটুকুও এখন পর্যন্ত পৌঁছেনি এদের অধিকাংশেরই কাছে।

ভাঙা ঘর, মাটির ওপর পোয়ালের বিছানা, খুব বেশি হলে তার ওপর ছেঁড়া মাদুর কিংবা চট। শুকিয়ে গেছে মায়ের বুক, একফোঁটা দুধ জোটে না, চিকিৎসা বলতে খুব জোর গলায় ঝুলছে কালো সুতোয় বাঁধা মোমঠাসা তাবিজ। সবার জন্যে শিক্ষার মতো মধুর-শ্রুত শ্লোগানের সময়ে এইসব শিশুকিশোরের অধিকাংশেরই দিন কাটে উঠোনের ধুলো-আবর্জনায়, আশপাশের ক্ষেতে বা আইলে, খুব বেশি হলে বেগম রোকেয়া স্কুলের মাঠে এবং ঐ মাঠ পর্যন্তই তাদের দাঁড়িয়াবান্ধা, ছিবুড়ি, হাডুডু, গোল্লাছুট খেলার দৌড়। প্রাইমারির প্রথম চৌকাঠ মাড়াতে পারেনি তারা এখনও। আসলেই পায়রাবন্দের সমাজ-জীবন-বাস্তবতা এমনই যে, শত বছরেরও বেশ আগে বেগম রোকেয়া যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন, সেই বাড়িভিটা থেকে শত গজ দূরের ছেলেমেয়েরা আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে আজও পাঠশালায় আসতে পারছে না।

আর আসবেই-বা কী করে? ছবিরন নামের মেয়েটি, বয়স ৮ বছর, বাবা একজন দিনমজুর, দৈনিক মজুরি পায় ৮ থেকে ১০ টাকা, পরিবারে খাবারের মুখ ৬টি, উপার্জনের টাকায় দৈনিক একবেলাও ভাত বা রুটি জোটে না পেটভরা, সে কী করে পরনের প্যান্ট-ফ্রক পাবে? কী করে শ্লেট-পেন্সিল খাতা-কলম কিনবে? প্রাথমিক শিক্ষার বইটি নাহয় সরকার থেকে বিনামূল্যে পাওয়া গেল, কিন্তু একদিস্তা কাগজের দাম কত? একটা বলপেন কিংবা নেহায়েত শুরুর ক্লাস হলে কাঠপেন্সিলের দাম যোগ দিতে হয়। ৮-১০ টাকা মজুরি-পাওয়া সম্পূর্ণ ভূমিহীন পিতার পক্ষে এসবও নাহয় কল্পনায় ধরা যাক সম্ভব, কিন্তু পেছন-ফাটা বোতাম-খোলা একটিমাত্র বিবর্ণ-মলিন প্যান্ট পরে ছবিরনের এ স্কুলে পড়তে যাওয়া অসম্ভব। অন্তত একখানা ফ্রক গায়ে না থাকলে শুকনো কালো যে বুক এবং ফোলা নাড়িভাসা পেট, তা নিয়ে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভের বেঞ্চে বসবার সুযোগ বেগম রোকেয়ার পায়রাবন্দে কেন, বাংলাদেশের কোনো বিদ্যালয়েই নেই। ছবিরন সে কারণে বাড়িতেই থাকে, সকালবেলা শুধু পানি দিয়ে উপবাস ভঙ্গ (ব্রেকফাস্ট)-করা মেয়েটি, ৮ বছর বয়সের ছবি, সাধ্যবান পরিবারে জন্মালে এখন যার থ্রি বা ফোর-এ পড়বার কথা, সে ধারেকাছের কোনো ভূস্বামীর বাড়িতে চলে যায়। গোয়াল পরিষ্কার, ঘর-উঠোন ঝাড়ু, পানিকল টেপা, কাঁথা-কাপড় ধোয়া, ধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধর জন্যে জ্বালানির যোগান, লেপা-মোছা, এইসব শতেক কাজের ফাঁকে স্কুলের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, শোনা যায় হৈ-হুল্লোড় চিৎকার, সেইসাথে 'এ্যই হারামজাদি ছুঁড়িটা কোনোয় কাম্ পারে না' বলে খালাআম্মা চাচিআম্মার (বাড়ির মালিক-গিন্নি) তর্জনগর্জন। তারপর বেলা গড়িয়ে গেলে জোটে এক সান্‌কি পোড়া-ঠাণ্ডা ভাত, একটুখানি শাক-সোলকা কিংবা 'আলু-বাইগোনের নাবড়া'। ছবিরন অর্ধেক খায়, বাকিটুকু কলাপাতায় ঢেকে নিয়ে যায় বাড়িতে। অসুস্থ-বুভুক্ষু মা, কোলের ভাই কিংবা বোন সেখানে অপেক্ষা করছে, পায়রাবন্দের সকল মানুষের ক্ষুধার জ্বালা-যন্ত্রণা জঠরে নিয়ে। সবার জন্যে খাদ্য, সবার জন্যে শিক্ষা, সবার জন্যে স্বাস্থ্য, এইসব গালভরা বুলি যখন উচ্চারিত হয় শাসকদের সভায়, রাজনীতিকদের সমাবেশে, উন্নয়নের নামে লক্ষকোটি টাকা ব্যয়-করা এনজিওগুলোর সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে, যখন রেডিও টেলিভিশন আর পত্রপত্রিকায় উন্নয়নের বান ডাকে, তখন পায়রাবন্দের শিকড় সংবাদ এমনই যে, অগুনতি ছবিরন, আধপেটা-খাওয়া প্রায়-উলঙ্গ এবং কর্মক্লান্ত কিশোরীটি, অন্ধকার ঘরের মেঝেতে বিছানো খড়ের ওপর ঘুমে বিভোর থাকে।

এই যে পায়রাবন্দ, বেগম রোকেয়ার নামে খ্যাত পায়রাবন্দ, সেটি রংপুর শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। হবে প্রায় নমাইল। পাকা রাস্তা। আপনার যদি জ্বালানিচালিত যান থাকে তা হলে তো সহজ, তবে রিকশা করে যেতেও সময় লাগবে না। আর আপনি যদি ঢাকার দিক থেকে এসে সরাসরি যেতে চান পায়রাবন্দে, তা হলে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের ধারে দমদমা ব্রিজের পূর্বদিকে নেমে পড়বেন। এখানে খুব কাছাকাছি লক্ষ করবেন মাঝারি ধরনের চওড়া একটি পাকারাস্তা চলে গেছে ডানে, গ্রামের ভেতর। চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়, কেননা এই শাখাসড়কের যেখানে শুরু, সেখানে আছে সিমেন্ট-বাঁধানো ফলকের উপর বড় অক্ষরের লেখা, আর তীর আঁকা স্পষ্ট দিকচিহ্ন : 'বেগম রোকেয়ার পায়রাবন্দ'।

দিকচিহ্নের এই 'পয়েন্ট' থেকে মাইলদুয়েক দূরে বেগম রোকেয়ার সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি, আঁতুরঘরের থাম, অসমতল ভিটে। প্রায় সাড়ে তিন শ বিঘা জমি ছিল বেগম রোকেয়াদের, পিতার সম্পত্তি, কিন্তু এখন তার অধিকাংশই ভোগদখল করছে গ্রামের ধনী-গরিব উভয়শ্রেণীর মানুষ। কেউ মূল ভবনের ইট লোহা কাঠ খুলে নিয়ে নিজস্ব বাড়িঘরের কাজে লাগিয়েছে, কেউ আবার আবাদি জমিতে চালিয়েছে নিজস্ব লাঙল, কেউ একখানা ভাঙা কুঁড়েঘর তুলে কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে।

রোকেয়ার বাড়িভিটার খুব কাছাকাছি ঐ জোড়া স্কুল, প্রাচীরঘেরা, মূল ফটকের ধারে প্রাচীন গাছ। এর নিচে ছিল পায়রাবন্দের চালা-ভাঙা ছোট হাট, চায়ের স্টল, সাইকেল-রিকশা মেরামতের দোকান, মজাগুয়া আর পানের দোকান, দর্জিঘর। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে অসুবিধা হয় বলে হাটটি এখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কিছুটা উত্তরে। তবে এখানে পথের ধারে দাঁড়ায় কিছু রিকশা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথের অপরাধারে ছোট মুদিখানা ও পান-দোকান রয়েছে। গত ৪/৫ বছরে নতুন রিকশাচালক হয়েছে অনেক, পায়রাবন্দের আশপাশের গ্রামগুলোর। এরা ছিল ক্ষুদ্র কৃষক, কেউ বর্গাচাষী, অভাবে জমি গেছে, ভিটেমাটি এমনকি শোবার ঘরটিও বন্ধক, কিনেছে রিকশা। বছর কয়েক আগেও যে-যুবকটি লাঙল চষত, কাজ করত নিজের ছোট্ট জমিতে, যতটুকুই হোক ফলাতো ফসল, সে-লোকটি এখন সম্পূর্ণ ভূমিহীন, দেহগতভাবে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। কোমর বাঁকা, বুকের প্রতিটি হাড় গোনা যায়, গলার নিচে কাঁটা দুটো স্পষ্ট-প্রকট, এখন রিকশা টানে পায়রাবন্দ থেকে রংপুর শহর পর্যন্ত। বিশ-পঁচিশ বছর আগে এই সড়কটি ছিল অধিকাংশই কাঁচা, দুয়েক জায়গায় সুরকি বিছানো, বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুলের একখানা ঘোড়ার গাড়ি চলত দূরের ছাত্রীদের আনা-নেওয়ার কাজে, চলত গরুর গাড়ি, সাইকেল। তবে বেশির ভাগ মানুষ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করত। এখন রাস্তা পাকা হয়েছে, পায়রাবন্দ ইউনিয়ন কেন্দ্র এবং আশপাশের কোনো কোনো অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে, রোকেয়ার ভিটের খুব কাছাকাছি পর্যন্ত গাড়ি চলে যায়, যায় রিকশা। কিন্তু সড়ক ও পরিবহন যোগাযোগ-ব্যবস্থার এ-রকম উন্নয়ন ঘটলেও দুয়েকজন ছাড়া এলাকার কৃষক-পরিবারগুলোর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়নি। সমাজ ও পরিবার ভাঙনের কারণে সেদিনের বড় কৃষক পরিণত হয়েছে মধ্যম কৃষকে, মধ্যম কৃষক হয়েছে ক্ষুদ্র আর ক্ষুদ্র কৃষক বর্গাচাষী এরা হয়েছে ভূমিহীন। এদের কারও কারও শুধু ঘর-ভিটেটুকু আছে, কিন্তু আবাদি জমি নেই। কারও আবার ভিটেটুকুও নিঃশেষ, বেচে খেয়েছে, এখন থাকে অন্যের জমির ওপর। দ্বিতীয় ভাগের লোকেরা দিনমজুর, কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল, তবে মজুরি পায় খুব কম, ৮-১০ টাকা। আশ্বিন-কার্তিক মাসে মজুরির হার আরও নেমে আসে—৫ থেকে ৬ টাকায়। এরা ঐ ছবিরনদের পিতা। খাদ্যশস্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, কিন্তু নিজেরাই থাকে উপোস।

গ্রামে গ্রামে আছে অসংখ্য বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা যুবতী কিংবা প্রৌঢ়া। এদের জীবনযাপনের ব্যাপারটি মানুষের মতো নয়। আশ্বিন-কার্তিকের মঙ্গার সময়ে এদের অনেকে প্রধান খাদ্য হিসেবে একটানা তিন-চার দিন কচুর মুড়ো সিদ্ধ, শাকপাতা সিদ্ধ, কলার থোড় বা মোচা, মিষ্টিআলু, চালকুমড়ো, মিষ্টিকুমড়ো সিদ্ধ খায়, তারপর হয়তো কপালগুণে জোটে একটুখানি ভাত বা রুটি। অবশ্য হালে কিছু দুঃস্থ মাতা পরিবার অর্থাৎ যারা বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা; গ্রামীণ ব্যাংক এবং 'নিজেরা করি'-র অধীনে বেশকিছু গ্রুপ গঠন করেছে, এটা-ওটা টুকিটাকি ব্যবসাপাতি করছে, দুচার পয়সা সঞ্চয় করছে।

তবে এই পায়রাবন্দে, নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জন্মস্থানে আজও রয়েছে বাল্যবিবাহ, ভীষণরকম যৌতুক-নির্যাতন। যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারলে গালিগালাজ, মারপিট, তারপর বছরের পর বছর স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে ফেলে রাখা এবং মাঝেমধ্যে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে নিষ্ঠুর ও অবিবেচক স্বামীর সন্তান উপহার দান। এই গ্রামে আছে শতেক কুসংস্কার, চল-প্রচলন। আপনি যদি পায়রাবন্দে বেড়াতে আসেন তা হলে কিছুটা সময় হাতে নিয়ে আসবেন, মিশবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের গভীরে, জানতে পারবেন এই গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক অসচেতনতার অন্ধকারে এমনভাবে ডুবে আছে যে, তারা মুখের হাঁ বড় করে না ভাতের গ্রাস মুখে তোলার সময়। ভাত চিবোয় না। তাদের ধারণা, হাঁ একটু বড় করে পূর্ণগ্রাস ভাত মুখে তুললে 'সংসারের অকল্যাণ' হবে। বিয়ের রাতে স্বামীর পায়ের বুড়ো আঙুলধোয়া পানি পান করত অনেকে এই কবছর আগেও। এখন সে প্রথা নেই বটে, কিন্তু এ-যুগেও অনেক স্ত্রীর বদ্ধমূল ধারণা, স্বামী মারপিট করলে তা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। কেননা মারপিট ধর্মসিদ্ধ ব্যাপার। কেউ-কেউ আবার এমনও মনে করে যে, একজন স্বামী তার শরীরের যেসব স্থানে মারবে সেসব জায়গা রোজ কিয়ামতের পরে যাবে বেহেশতে।

'গ্রাম সমাজে নারী' এই বিষয়ের ওপর একটা সিরিজ প্রতিবেদন লিখতে চাই। কিন্তু প্রয়োজন তথ্য-উপাত্ত। কোন্ গ্রামে কাজ করা যায়? বেছে নিলাম পায়রাবন্দ গ্রামটিকে। নারী জাগরণের বেগম রোকেয়া যে-গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন শতবর্ষ পূর্বে, আজ সেখানে মেয়েদের অবস্থাটা কী? খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

সাত বছর আগে, এক প্রত্যুষে রংপুর শহর থেকে পায়রাবন্দ গ্রামে। মাত্র নমাইল দূরের এলাকা, কেউ বলতে পারেন যে রংপুর শহর থেকেই তো যাওয়া-আসা করা যেত। কিন্তু আমার ভাবনা ছিল অন্যরকম। সকাল আট-নটা থেকে রাত এগারো-বারোটা পর্যন্ত কাজ করব একটানা। ১৫/১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করবার পর শহরে ফেরা মুশকিল।

সাতদিন ধরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রাামের নর-নারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের একটা পরিকল্পনা হাতে নিই। রাতে থাকবার জায়গা হয় পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের পাকা-ভবনের একটি কামরায়। ওদের অফিসের পাশে কর্মচারীদের বাসভবন, সেখানে একটা বাসা ফাঁকা ছিল, তল্পিতল্পা নিয়ে উঠে পড়ি। দুপুরে ও রাতের আহার পাশের বাসায়, কিছু টাকার বিনিময়ে।

গ্রামীণ কোনো বিষয়ের ওপর যেভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করি, তেমনটি পায়রাবন্দেও। প্রথমে গ্রামের যুবকদের সাথে ঘনিষ্ঠ হই, আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানাই। আমি একটা সার্ভে করতে চাই, আপনারা সাহায্য করতে পারবেন?

পায়রাবন্দের যুবক রাজু আহমেদ। সে-সময় বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদের অন্যতম সংগঠক। তার নেতৃত্বে দশ জন যুবক জরিপকাজে নেমে পড়ে। তবে কাজ শুরুর আগে ওদের দিই একদিনের প্রশিক্ষণ, সরবরাহ করি কাগজ-কলম, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। 'গ্রাম সমাজে নারী' এই বিষয়ে একটা সিরিজ প্রতিবেদন রচনার জন্যে কী কী তথ্য আমার দরকার, কীভাবে তা সংগ্রহ করতে হবে, কথা বলার কৌশল হবে কী-রকম, কীভাবে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে হবে সবকিছুই জানাই। নতুন কিছু করার সুযোগ পেয়ে যুবকেরা খুব খুশি। প্রশিক্ষণের পরদিনই নেমে পড়ে কাজে এবং সাতদিনের মাথায় পায়রাবন্দের গ্রামগুলোর পুরো চিত্র, এমনকি অতি খুঁটিনাটি ব্যাপার-বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে। গ্রামে কতজনের বাল্যবিবাহ হয়েছে, কত বিধবা, কতজন স্বামী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিত্যক্তা, যৌতুকের শিকার হয়েছে কারা কীভাবে, সাধারণ জীবনযাপন, এমনকি গ্রামের মেয়েদের কতটি শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া আছে, কতজন মাথায় দেবার তেল-সাবান পায়, সোনা-দানা কতটুকু, সঞ্চয় কী-রকম, কোন্ মহিলা তার স্বামীর হাতে কতবার প্রহৃত হয়েছে, এইসব তথ্যও পেয়ে যাই। সে-সময় এখানে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ছিল না, 'নিজেরা করি' তখনও আসেনি। পায়রাবন্দে তাদের গ্রুপ গঠন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও সঞ্চয় প্রকল্প শুরু হয় 'সংবাদ'-এ ধারাবাহিক প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরে।

সে-সময়ে বেশকিছু চরিত্রের সাথে আমার পরিচয় ঘটে, এদের মধ্যে তিনটি চরিত্র মনে খুব নাড়া দেয়। পরে এরা প্রতিবেদনের বিষয় হয়েছিল। তবে আমার আফসোস, আমি যদি উপন্যাস-লিখিয়ে কিংবা নিদেনপক্ষে গল্পকার হতে পারতাম, কিছু অন্তত লিখতে পারতাম ওদের নিয়ে। কিন্তু তা হয়নি। সুরমা, হাওয়া বিবি, মাকড়া বুড়ো—এরা শুধু কিছু সচিত্র ফিচার হয়ে আছে। 'সংবাদ'-এর পাতায়।

পায়রাবন্দের অনেক চরিত্র। এদের একজন হলেন মাকড়া বুড়ো। বয়স তার ৯৪ বছর। যখনকার কথা বলছি, অর্থাৎ সাত বছর আগে, ১৮টি স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি ১৯তম বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর বয়স মাত্র ১৪ বছর।

মাকড়া বুড়ো গ্রামের যুবকদের কাছে 'বিয়েপাগলা নানা' হিসেবে পরিচিত। বয়সের ভারে কুঁজো, দাঁত নেই, কানে শোনেন কম, তবু শেষবয়সে এসে এক তরুণীকে বিয়ে করেছেন। মাকড়া বুড়ো বলেন, 'কী করব, বিয়ে করে বউ না আনলে এই বয়সে আমায় দেখবে কে? সেবা-শুশ্রূষা করবে কে?' আসলেই বউ নয়, শেষবয়সে এসে একটি কাজের লোক প্রয়োজন ছিল তাঁর, প্রয়োজন ছিল বাঁদি, তাই মেয়েটিকে ঘরে তুলেছেন ধর্মসিদ্ধভাবে। ছেলে আছে মাকড়া বুড়োর, আছে মেয়ে-জামাই, তাদের আলাদা আলাদা সংসার। ওরা কেউ বুড়ো বাবাটাকে দেখে না।

মেয়েটি, মাকড়া বুড়োর ঐ তরুণী স্ত্রী, সেও বেশ! কত স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে বুড়োর সাথে বিয়ের ব্যাপারটা! সে আমাকে পরিষ্কার বলল, 'আমি তো নিজের ইচ্ছায় এ বিয়ে করেছি!'

: তা-ই নাকি?

: হ্যাঁ, তা-ই। ... আমি এখন এই স্বামীর পদসেবা করব। এতে আমার সওয়াব হবে। তারপর কদিন বাদে বুড়ো মারা গেলে তার সম্পত্তির মালিক হব। তখন একটা যুবক ছেলেকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করব।

চৌদ্দ বছরের মেয়েটির এই স্পষ্ট ভাষণ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকি। মাকড়া বুড়ো খ্যা খ্যা করে হাসেন। মেয়েটি বলে, 'বুড়োকে ভাত রেঁধে খাওয়াই, বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে পেচ্ছাব-পায়খানা করাই, মাথায় তেল ঘষে দেই, গোসল করাই, ঘুম পাড়াই, এসব কাজ করলে সওয়াব হবে না? আপনিই বলুন!' তারপর একটু থেমে সে বুড়োর দিকে ইশারা করে বলে, 'ঐ দেখেন বুড়োর অবস্থা! মরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কদিন! তারপর আমি ভালো একটা ভাতারের হাত ধরে কোথাও চলে যাব। টাকাপয়সা আর চাষের জমি থাকলে অনেকেই বিয়ে করতে চাইবে আমাকে। না কী বলেন?'

আমি আর কী বলি?

আরেকজন সুরমা। তার সাথে প্রথম দেখা যখন, তখন সে নবছর বয়সের। বেগম রোকেয়া প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের একপর্যায়ে সুরমার সাথে পরিচয়। শুনে অবাক হলাম, রোকেয়ার জন্মভিটা থেকে মাত্র এক শ গজ দূরে বাস করে যে-মেয়েটি, নাবালিকা সুরমা, সে বিবাহিতা! সুরমা যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, অর্থাৎ বয়স মাত্র পাঁচ বছর, তখন এক কলেজ-ছাত্রের সাথে ওর বিয়ে হয়। বিয়ের আগে ঐ ছেলেটি সুরমাদের বাসায় লজিং থাকত। একদিন সুরমার বাবা মার কী 'শখ' মাথায় চাপে, একাদশ শ্রেণীতে পড়ে এমন একটি ছেলের সাথে বিয়ে পড়িয়ে দেয় নিজের মেয়ের। গ্রামের কাজী সাহেব বিয়ে রেজিস্ট্রির কাগজপত্রে সুরমার বয়স লেখেন ষোলো বছর। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গণ্যমান্য, এমনকি এলাকার মোড়ল মাতবর জনপ্রতিনিধি এঁরা ঐ বিয়েতে এসেছিলেন, খাওয়াদাওয়া করেছেন, কিন্তু বাধা দেননি, কেউ প্রশ্ন তোলেননি সুরমার বয়স নিয়ে, তার বাল্যবিবাহ নিয়ে।

সুরমার সাথে কথা হয়। বিয়ে মানে সে বোঝে না। ঐ বয়সে বোঝার কথাও নয়। ওদের ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ছিল বর-কনের একটা ছবি। বিয়ের পর রংপুর শহরে গিয়ে একটা স্টুডিও থেকে তোলা। ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিতে কলেজ-ছাত্রটি একটি চেয়ারে বসে আছে, তার কোলের ওপর পাঁচ বছর বয়সের সুরমা, ফ্রক পরা, চোখে মোটা দাগের কাজল, কপালে বড় টিপ, দাঁত বের করে হাসছে।

আমি সুরমাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি জানো ঐ ছেলেটা, ঐ যে যার কোলে বসে আছ, সে তোমার কী হয়? চেনো ওকে?

সুরমা ফিক করে হাসল। বলল, চিনব না ক্যান? ও তো আমার ভাইয়া!

: ভাইয়া না স্বামী? জানো না ওর সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে?

সুরমা তার ছোট্ট হাতের মুঠোয় একটা কিল পাকালো। আমার দিকে দূর থেকেই তা ছুড়ে দিয়ে বলল—দূর! কী যে আপনি অসভ্য কথা বলেন!

মাকড়া বুড়োর খবর কী? খবর কী তার স্ত্রীর? কোথায় আছে? কেমন আছে? বাল্যবিবাহের সেই সুরমা, এতদিন বাদে কীভাবে কাটছে মেয়েটির বিবাহিত জীবন?

'৯২ সালের মার্চে আবার পায়রাবন্দে যাই। শুনি, মাকড়া বুড়ো মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে মাকড়া তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে গিয়েছিলেন বিঘাখানেক জমি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার দখল পায়নি। বুড়োর মৃত্যুর পরদিনই তার কজন ছেলে এসে মেয়েটিকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বলে, 'এতদিন বুড়োর খেয়েছিস পরেছিস, আবার জমি চাস? যা, ভাগ! নইলে জানে মেরে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকড়া বুড়োর বিধবা স্ত্রীটি নাকি খুব কেঁদেছিল। লাভ হয়নি। গ্রামে এর-ওর কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু কেউ তা শোনেনি। পরে, একদিন সে গ্রামছাড়া হয়ে যায়। এখন সে কোথায় আছে, কেউ জানে না।

তবে সুরমা গ্রামেই আছে। ঐ ছেলেটি, যার সাথে বিয়ে হয়েছিল, পাঁচ বছর আগে একদিন গ্রাম ছাড়ে, চলে যায় নীলফামারীর ডোমারে আর আসেনি। পরে সুরমার বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেয় যে, ছেলের কাছে তালাকের কাগজপত্র পাঠিয়ে দেবে। তা-ই করেছে।

সুরমা পড়াশোনায় ভালো, স্বভাবে শান্তশিষ্ট। তবে হঠাৎ কখনো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এখন বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই কান্না জুড়ে দেয়। সে বলে, 'আমার বাবা-মা ভুল করেছে, সেজন্যে আমি ভুগতে রাজি নই। আমি এখন আমার ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছি। আমি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চাই, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।'

সুরমা লেখাপড়া শেষ করে কোনো -কটা চাকরি করতে চায়, থাকতে চায় কোনো শহরে।

পায়রাবন্দের প্রতিটি মৌজা এবং গ্রামে বাল্যবিবাহের ঘটনা রয়েছে। ৭ বছর আগে গ্রাম জরিপকালে শখানেক মেয়ে কিংবা ছেলে পেয়েছিলাম যাদের বাল্যবিবাহ হয়েছে। '৯২-এর মার্চে গোটা ত্রিশেক ঘটনা অবগত হই। এগুলোর মধ্যে কোহিনুর ও শহীদুলের বিয়ের ব্যাপারটি আমাকে নাড়া দেয়। নিজেদের কোনো ছেলে হয়নি বলে নাবালিকা কোহিনুরের বিয়ে দিয়েছিল ওর মা-বাবা।

WWW.AMARBOI.COM

আমরা যখন জয়রামপুর-আনোয়ার গ্রামে ঘুরছিলাম, তখন দেখি পথের ধারে ধুলোবালিতে ঘর বানানো আর পুতুল বিয়ের খেলা করছে কটি শিশু। প্রিন্টের সেলোয়ার পরা একটি মেয়ে, গায়ে ফ্রক বা কামিজ পর্যন্ত নেই, গলায় একটি পাতলা চেন দুলছে, এমন একটি মেয়েকে দেখিয়ে আমার সঙ্গী রাজু আহমেদ বলল, 'কত বাল্যবিবাহের ঘটনা এখানে চান? এই দেখেন, ছাপা সেলোয়ার পরা মেয়েটা, ওর নাম কোহিনুর, এই বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে!'

ওদের খেলাঘরের কাছে আসি। কোহিনুরকে দেখি। শুকনো কালো চেহারা, বয়স খুবজোর ৭ বছর, সে একটা পুতুলের গায়ে কাপড়ের টুকরো পেঁচাচ্ছিল। আমি সরাসরি বিয়ের প্রসঙ্গ তুলি না, কেননা হয়তো ভড়কে যেতে পারে, পালিয়ে যেতে পারে লজ্জায়। বরং বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে কৌশলে প্রশ্ন করি, 'এই তোর স্বামী কোথায় রে?' বলা দরকার, কথা বলি রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায়। শহুরে কথাবার্তা বললে গ্রামের মানুষজনের সাথে সহজে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না।

কোহিনুর বুঝেই নেয় যে আমরা ওর বিয়ের ব্যাপারটা জানি। ফলে সে ভড়কায় না, লজ্জাও পায় না। পুতুল সাজাতে সাজাতেই মুখ তুলে ইশারা করে ডানে, একটু দূরে সড়কের অপর ধারে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরাও ঘুরে দাঁড়াই। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে পাঁচ-ছ শ গজ দূরে, একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর ব্যস্তহাতে জমির আবর্জনা পরিষ্কার করছে। রাজু বলে, 'ঐ তো শহীদুল! কোহিনুরের স্বামী!'

: ডাকব ছেলেটাকে?

আমি বলি, 'না থাক, ওর সাথে কথা বলব পরে। চলেন আগে কোহিনুরদের বাড়িতে যাই। কোথায় ওদের বাড়ি?'

রাজু চোখের ইশারায় একটি ঘর দেখায়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশেই বাঁশের ঝাড়, এটা-ওটা গাছগাছালি, লাউয়ের মাচান, চাটাইয়ের বেড়াঘেরা অতি পুরাতন টিনের ঘর। এটাই কোহিনুরদের বাড়ি। 'আসেন' বলে রাজু সেদিকে হাঁটা দেয়, পিছুপিছু আমি। আমি জানতে চাই এ বাল্যবিবাহের নেপথ্য কারণটি কী ছিল। বাবা-মা রাজি হলে কোহিনুর আর শহীদুলের একটা ছবিও তুলতে হবে।

'হই খলিল! বাড়িত্ আছিস নাকি রে!' রাজু হাঁক ছাড়ে। ঘরের ভেতর থেকে শোনা যায় অস্পষ্ট একটা গোঙানির শব্দ। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ি। দেখি, খালি একটা চৌকির ওপর চিত হয়ে আছে এক যুবক, ছিন্ন বিবর্ণ লুঙ্গি পরনে, খালিগা, ভগ্নস্বাস্থ্য, একটু একটু কাতরাচ্ছে। এরই নাম খলিলুর রহমান, কোহিনুরের বাবা। ওর স্ত্রী ইচিরন নেছা, পানি আনতে গিয়েছিল, ফিরে এসে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে কোথায় আমাদের বসতে দেবে এই নিয়ে। রাজুকে সে চেনে, কিন্তু ঘরের ভেতর চলে আসবে এ-রকম বুঝি কল্পনাতেও ছিল না। তার ওপর আবার সঙ্গে অপরিচিত আরেকজন। চেয়ার খোঁজার জন্যে পাশের বাড়িতে ছুট দেয় সে, তার আগেই আমি একটা পায়া নড়বড়ে টুলে বসে পড়ি, রাজু বসে খলিলের চৌকির এক কোণে। ইচিরন নেছা আমাদের জন্যে আসন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে যখন দেখল আমরা ইতোমধ্যে বসে পড়েছি, তখন সে তার ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যেই হোক কিংবা হোক সৌজন্যবোধের কারণে, গুয়া পান সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অসুস্থ খলিল আর অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত ইচিরন দুজনের চোখেমুখে ঝোলানো প্রশ্ন : কী কারণে তাদের ঘর পর্যন্ত চলে এসেছি আমরা! রাজু আমার পরিচয় দেয়, কিন্তু মুখের ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় সংবাদপত্র, সাংবাদিক এসব সম্পর্কে সামান্যতম এরা জ্ঞাত নয়। গ্রামের নিরক্ষর অসচেতন দম্পতি, পত্রিকা মানে তাদের কাছে লবণ-মশলার ঠোঙা, হাতে-বানানো বিড়ির কাগজ, কখনোবা হাটের চায়ের দোকানে বেড়ায় সাঁটানো সিনেমার নায়ক-নায়িকার ছবি।

কথাবার্তা শুরু হয়। নিজস্ব কৌশলের কারণে কোহিনুরের বিয়ের কথাটা তুলি না। ওটা আরও পরে, আগে খলিলের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া যাক। কী হয়েছে খলিলের? অমন করে শুয়ে থেকে কাতরাচ্ছে কেন?

খলিলুর রহমান আগে ছিল ক্ষুদ্র কৃষক। জমি হারিয়ে দিনমজুর। কিন্তু একেই মজুরি কম তাতে আবার কাজ জোটে না নিয়মিত। ধারদেনা করে পুরাতন রিকশা কিনল একখানা, কিছুদিন চালালো। কিন্তু হঠাৎ দেখা দিল পেটের ব্যথা। অসহ্য যন্ত্রণায় পথের মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল একদিন। পড়ল বিছানায়। ডাক্তারের কাছে যেতে পারেনি, জানতে পারেনি পেটের ব্যথাটা কীজন্যে হচ্ছে এবং আসলে রোগটা কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচিরন নেছা আগে থেকেই কিছুটা কাজ জানত সেলাই মেশিনের। বেকার খলিলের সংসারতরী যখন টালমাটাল তখন ইচিরনই পরামর্শ দিল রিকশা বেচে দিয়ে সেলাই মেশিন কিনবার। তা-ই করল খলিল। ইচিরন এখন গ্রামের এর-ওর কাপড় সেলাই করে, দৈনিক আয় হয় ৪০ থেকে ৫০ টাকা। ওদের ভাষায় : 'কোনোরকমে সংসারটা চলে যাচ্ছে।'

খলিলের কাছ থেকে জানা গেল : স্থানীয় দুতিনজন কবিরাজ তার পেটের ব্যথা উপশমে ব্যর্থ হলে পরে সে খবর পায় রংপুরের বদরগঞ্জে এক কামেল ফকির নাকি বিনা অস্ত্রে অপারেশন করে, পেটের ঘা সারিয়ে তোলে। নিজের পেটে ঘা হয়েছে এমনটি নিজে নিজেই নিশ্চিত হয় খলিল এবং কদিন আগে বদরগঞ্জে চলে যায়। একটা অন্ধকার ঘরে অজ্ঞান করে সেই কামেল ফকির কী করেছে খলিল জানে না, বুঝতেও পারেনি। এক শটি টাকা খসেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পর দেখা যাচ্ছে পেটের ব্যথা আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেছে। থেকে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। বিছানা থেকে উঠতে পারে না, এমনকি কাত হয়ে শুতে পর্যন্ত পারছে না এখন। এতদিনে তার হুঁশ হয়েছে। ধারদেনা করে হলেও রংপুরের শহরে যাবে, ভালো কোনো ডাক্তার দেখাবে। কোঁকাতে কোঁকাতে তাই বলল সে।

কোহিনুরের বিয়ের কথা উঠল। কথাবার্তায় বোঝা গেল এ বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি তাদের কাছে অস্বাভাবিক কোনোকিছু নয়। অল্প বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া যে আইনসিদ্ধ নয় এ খবরটুকুও জানে না তারা, কেউ বলেনি। আলাপের পরবর্তী পর্যায়ে কী জানি কী কারণে ইচিরনের কণ্ঠ চড়া হলো। হয়তোবা আমাদের মুখ থেকে আইন-কানুনের ব্যাপারটি শোনার পর ভয় পেয়ে গেছে সে। সেই ভয় তাড়ানোর জন্যেই বুঝিবা সে চড়া গলায় বলতে থাকল, 'আমাদের মেয়ে আমরা বিয়ে দিয়েছি, তাতে সরকারের কী?' এই কথা কটি উচ্চারণের পরই হঠাৎ গলা খাদে নেমে এলো তার, বলতে থাকল, 'ঘরে আমাদের মেয়ে আছে কিন্তু ছেলে নেই। সেই ছেলে পাওয়ার জন্যেই তো কোহিনুরের বিয়ে দিলাম। আর জামাইটি ভালো, তাকে আমরা ছেলের মতো দেখি।' কথা শেষ হবার সাথে সাথেই হঠাৎ সে চেপে ধরল রাজুর হাত। যে-রাজুকে সে এতক্ষণ 'ভাই' সম্বোধন করছিল, আতঙ্ক এবং উত্তেজনা এসে হয়ে উঠল 'বাবা'। বলল, 'বাবা রাজু, আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

রাজু হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'দুর ভাবি! কী যে কন আপনি!'

আসলে পরে বুঝলাম, খলিল-দম্পতির সাথে সাক্ষাৎকারের বিবরণ আমি নোট করছিলাম, ভয় পাবার কারণ সেটাই। তার ধারণা হয়েছিল এ-রকম যে, আমি সরকারি লোক এবং এই বিয়ের ঘটনাটি টুকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে জানিয়ে দেব। পরে পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যাবে।

ইচিরন জানায়, তার দুটি মেয়ে। এরপর ছেলে নেওয়ার আশা ছিল। কিন্তু হলো না। একদিন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের এক লোক এসে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল তাকে, নগদ টাকা আর শাড়ির লোভ দেখিয়ে 'অপারেশন' করালো। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কী করা যাবে! ছেলের আশা বাদ দিতে হয়েছে। জামাই ঘরে এনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হচ্ছে।

ওদের দুই মেয়ে। কোহিনুরের বয়স ৭ বছর, পায়রাবন্দ প্রাইমারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ছোটটি গোলেনুর, বয়স ৫ বছর, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। দুজনের কারও স্কুলগমন নিয়মিত নয়। কোহিনুরকে জিজ্ঞেস করি, 'স্কুলে যাও না কেন?' সে কথা কয় না, শুধু ফিক ফিক করে হাসে।

'৯২-এর ফেব্রুয়ারিতে কোহিনুরের বিয়ে হয় একই গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষক দরজ আলীর ছেলে শহীদুল ইসলামের সাথে, বয়স তার ১৫ বছর। শহীদুল স্কুলে পড়েনি, বাবাকে সাহায্য করবার জন্যে এই বয়সে ক্ষেতমজুরিতে নেমেছে, দৈনিক ১০-১৫ টাকা পায়। অল্প বয়স হলেও গ্রামে ওর চাহিদা বেশি। কাজে চটপটে, সময়সীমা নিয়ে রা নেই। ডাকলে পরে ভোরবেলা ক্ষেতে নেমে পড়ে, সূর্য ডোবার পরেও কাজ করে যায় বিশ্রামহীন। সকালে বা দুপুরে এক সান্‌কি পান্তা হলে সে খুব খুশি।

এ বিয়েতে নাকি শহীদুলের মায়ের মত ছিল না। কিন্তু স্বামীর চাপে পড়ে রাজি হয়। স্বামীর চাপ দেওয়ার মূল কারণ টাকার লোভ। কথা হয়েছে, এ বিয়ে হলে ৩ হাজার টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে। যৌতুক অবশ্য এখনও পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি খলিলের পক্ষে এবং খলিলের অর্থনৈতিক অবস্থা যা তাতে করে ঐ ৩ হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। নিশ্চিতভাবে বলা যায় ওদের তালাক হয়ে যাবে। কোহিনুর যখন সাবালিকা হবে, হবে সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি, তখন দুষবে তার বাবা-মাকে।

AMARBOI.COM

গ্রামের এক ইমাম, ওয়ারেস মিয়া, ৫০ টাকা নিয়ে বিয়ে পড়ায়। বিয়ে এখনও রেজিস্ট্রি হয়নি।

বিয়েতে আনুষ্ঠানিকতা বাবদ খলিলুর রহমানের ব্যয় হয় প্রায় ২ হাজার টাকা। কিছু ধার, কিছু ইচিরনের সেলাই মেশিন থেকে আয়ের সঞ্চয়। বিয়েতে গ্রামের জনা-পঞ্চাশেক লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা মাংস-ভাত খেয়েছেনও। এ বিয়ের অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী আব্দুস সাত্তার, গ্রামের মোড়ল মাওলা মিয়া, ছেলের মামা প্রভাবশালী জব্বার আলী, অবস্থাপন্ন কৃষক লুৎফর মিয়া ও কয়েকজন যুবক উপস্থিত ছিলেন। বিয়েতে এঁরা বাধা দেননি, বাল্যবিবাহ নিয়ে কোনোরকম প্রশ্ন তোলেননি, বরং বর-কনেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল ছিলেন।

আমরা যখন বিয়ের প্রসঙ্গে আলাপ করছিলাম, কোহিনুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে। সর্বাঙ্গে ধুলোমাখা, উদোম গা, মেয়েটি মিটিমিটি হাসছিল। মাঝে মাঝে লজ্জা পাবার ভান করছিল সে। আমি যখন ছবি তোলার কথা বললাম, তখন খুব খুশি। ছুটে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলো, ফ্রক গায়ে চাপালো, চোখে কাজল টানল এবং হাসিমুখে দাঁড়ালো ক্যামেরার সামনে।

আমি বললাম, 'কোহিনুর, হাসো তো একটুখানি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসল কোহিনুর। কিন্তু পেছনে দাঁড়ানো ইচিরন নেছা শঙ্কিত। বার বার প্রশ্ন করছিল সে রাজুকে। 'বাবা রাজু, ফটো যে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের আবার কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

রাজু ধমকের সুরে বলল, 'ভাবি, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমাকে ডাকেন ভাই, এখন বার বার বলছেন বাবা!'

ইচিরন বলে, 'আমার বুক শুকিয়ে গেছে ভাই। কথাবার্তা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।'

বেগম রোকেয়ার জন্মস্থানে এমনি অসংখ্য বাল্যবিবাহের ঘটনা রয়েছে। এমনও দেখা গেছে যে, বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র সাড়ে ৭ মাস বয়সের মেয়ের সাথে হাঁটি হাঁটি পা পা করা ছেলের। যেমন ইসলামপুর গ্রামের ক্ষেতমজুর বাদশা মিয়ার মেয়ে ইসমত আরা, বর্তমান বয়স প্রায় ৪ বছর, তার বিয়ে হয় সাড়ে ৭ মাস বয়সে, একই গ্রামের আব্দুল কাদের-সাহিদা খাতুন দম্পতির পুত্রসন্তান মুকুল মিয়ার সাথে।

নানা কারণে হচ্ছে এ বাল্যবিবাহগুলো। কোনো পিতামাতা ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে নিতান্তই শখের বশে, কারও ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ে দেওয়া হয়েছে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের পিতার বন্ধুত্ব পাকা করবার জন্যে, কেউবা বিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর আগে বউমা কিংবা জামাই বাবাজির মুখদর্শন করে যাবার জন্যে। অল্পবয়সে বিয়ে হলে অল্প যৌতুকে মেয়ে বিদায় করা যাবে, এ ধরনের মানসিকতাও কারও কারও ক্ষেত্রে কাজ করেছে। তবে মূল কথা হলো, প্রতিটি বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে রয়েছে পিতামাতার অসচেতনতা। এই পায়রাবন্দে এখনও অনেক বাবা-মা মনে করেন যে, অল্পবয়সে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিলে আল্লায় আলাদা কিছু সওয়াব দেয়!

যেসব পরিবারে বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেগুলোর পরিবার-প্রধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর, অসচেতন। রংপুর শহর থেকে মাত্র নমাইল দূরে হলেও পায়রাবন্দ এলাকার বহু পিতামাতা আজও জানে না—দেশে বাল্যবিবাহ আইনসম্মত নয়, যৌতুকের আদান-প্রদান বেআইনি। এমনকি বালক-বালিকার বিয়ে যাঁরা পড়িয়েছেন কিংবা যে কাজী সাহেব বিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন, তাঁরাও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞাত, কেউ আবার অর্থলোভী। মাত্র ৫০ থেকে ১০০ টাকার বিনিময়ে বিয়ে পড়িয়েছেন তাঁরা, ৬ বছর বয়সকে কাগজপত্রে দেখিয়েছেন ১৬ বছর, ছেলের বয়স দেখিয়েছেন ২৫ থেকে ২৮ বছর। বিরাট জালিয়াতির ঘটনা, অথচ এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েননি। পায়রাবন্দের বিয়ে পড়ানোর মৌলবিসাহেবগণ এবং সরকারস্বীকৃত কাজী সাহেব আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত ও শাস্তি পাওয়ার বদলে গ্রামের ছোটবড় সকলের শান্তি কামনা নিয়ে ভালোই আছেন।

বাল্যবিবাহের ব্যাপার নিয়ে মৌলবি আব্দুল আলিম এবং কাজী গোলজার হোসেনের সাথে পরে আমার কথা হয়। দুজনের কেউ-ই বাল্যবিবাহ পড়িয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা রেজিস্ট্রি করিয়েছেন একথা কোনোমতেই স্বীকার করলেন না। আমি যখন বর-কনের নাম-ধাম উল্লেখ করালাম তখন হাসিমুখে তা উড়িয়ে দিলেন তাঁরা, বললেন, 'এ বিয়ে তো আমি পড়াইনি, অমুক মৌলবি পড়িয়েছে।' কাজী সাহেবেরও একই রকম কথা। কাজী মোহাম্মদ গোলজার হোসেন, বাড়ি ইসলামপুর গ্রামে, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা, প্রায় ন'বছর ধরে এ পেশায় নিয়োজিত, এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শ বিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন। বিয়ে পড়িয়েছেন আনুমানিক দু শ। তিনি স্রেফ অস্বীকার করে বসলেন যে, পাঁচ শর মধ্যে একটিও বাল্যবিবাহ রেজিস্ট্রি তিনি করেননি। আরেক মৌলবি সাহেব—পায়রাবন্দে নয়, পার্শ্ববর্তী ভাঙনি ইউনিয়নে বাড়ি, বয়স প্রায় ৪৫ বছর, পায়রাবন্দ সালেকিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক, স্থানীয় মসজিদে ইমামতিও করেন—ইনি ৫০-১০০ টাকার বিনিময়ে কমপক্ষে দু ডজন বাল্যবিবাহ পড়িয়েছেন পায়রাবন্দের বিভিন্ন গ্রামে। কিন্তু কোনোক্রমেই তা স্বীকার করলেন না। 'খোদার কসম, নাবালকের একটি বিয়েও আমি পড়াইনি।' বললেন তিনি। নাম উল্লেখ করলেন অপর একজন মৌলবির। সব বাল্যবিবাহ নাকি সেই মৌলবিই পড়ায়।

মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, নাদুস-নুদুস চেহারার লোকটি কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছে। শরীর কাঁপছে ভয়ে। কিন্তু তার মুখ থেকে মিথ্যা কথা শুনে মেজাজ বিগড়ে যায়। আমি আশপাশের গ্রামের কয়েকটি ছেলেমেয়ের নাম উল্লেখ করি যাদের বিয়ে এই মৌলবি সাহেব পড়িয়েছেন। তারপর বলি, 'আপনি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন, এক্ষুনি প্রমাণ হয়ে যাবে। চলেন ওদের বাড়ি যাই। আপনিই যে বিয়ে পড়িয়েছেন তা ওরা নিজেই আমার কাছে বলেছে। আর এখন আপনি তা অস্বীকার করছেন?'

কথা শেষ হতে-না-হতেই লাফিয়ে সাইকেলে চেপে বসেন মৌলবি সাহেব। জোর পায়ে প্যাডেলে চাপ দেন। তাঁকে বলতে শুনি, 'আমার এখন একটু তাড়া আছে, পরে আপনার সাথে দেখা করব।'

আমার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে তাঁর সাইকেল আটকাই। লোকটাকে নিয়ে যাই সর্বনাশের ঘটনাস্থলে। বুঝতে পেরে বাধা দিল আমার পায়রাবন্দের সঙ্গী কজন যুবক। মৌলবি সাহেবকে এই মুহূর্তে এভাবে খেপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তিনি বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য, তা ছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গেলে হৈচৈ হবে, গোলমাল বাধতে পারে। এতে করে আমাদের পক্ষে গ্রাম-অনুসন্ধান করা হয়ে উঠবে মুশকিল।

আমি রাগ দমন করি। ঠিকই বলেছে আমার সাহায্যকারীরা। আমাকে বেশ কদিন গ্রামে থাকতে হবে, সে কারণে কাউকে খেপিয়ে তোলা কোনোমতেই ঠিক হবে না।

পায়রাবন্দের বাল্যবিবাহের এই যে সংখ্যাধিক্য তা নিয়ে গত ১৬/১৭ বছরে বহু সচিত্র প্রতিবেদন লিখেছি 'সংবাদ'-এ। সেখানে বর-কনের নাম-ধাম দিয়েছি, ছবি দিয়েছি, মূলত কী কারণে বা কাদের কারণে এসব বাল্যবিবাহ হচ্ছে তা-ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। কিছু প্রতিবেদন পাঠকদের মনে সাড়া জাগিয়েছে, পরবর্তীতে বিদেশি পত্র-পত্রিকায় অনূদিত হয়ে ছাপা হয়েছে বাল্যবিবাহের কিছু প্রতিবেদন আর ছবি। বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকে সম্পাদকীয় কিংবা উপসম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে। ঢাকায় সভাসমাবেশ সেমিনারে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে বাল্যবিবাহের বিষয়টি। পরবর্তীতে সরকার থেকে ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দে বাল্যবিবাহের যে ঢল, তা রোধ হয়নি। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তি, যুবকগণ, কেউ বাধা দেননি, বরং দেখা যায় অনেকে তাঁরা ঐসব বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন, খানাপিনা করেছেন। মাত্র ক মাইল দূরে মিঠাপুকুর প্রশাসন, সেখান থেকেও বাল্যবিবাহ বন্ধের ব্যাপারে উদ্যোগ নেননি কেউ। রংপুরের জেলা প্রশাসনও এ ব্যাপারে বোবা-কালার ভূমিকায় থেকেছেন। গ্রামীণ ব্যাংক দীর্ঘদিন থেকে পায়রাবন্দের গ্রামে ঋণদান কার্যক্রম চালাচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণসচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারেও কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি। 'নিজেরা করি'র মতো একটি এনজিও ৬/৭ বছর ধরে এখানে তৎপর। তারা ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক এবং দুঃস্থ মাতাদের নিয়ে বহু গ্রুপ গঠন করেছে, সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে, গ্রুপের মাধ্যমে সচেতন করে তোলার ব্যাপারেও বেশ খানিকটা এগিয়ে। কিন্তু এদের চারপাশে এই যে এত বাল্যবিবাহের ঘটনা, তা তারা দেখছে না কেন? প্রতিরোধ করছে না কেন? বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপটি যদি দূর করা না যায়, তা হলে আর গণসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সফলতা আসবে কী করে?

বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি নিয়ে 'নিজেরা করি'র কয়েকজন মাঠকর্মীর সাথে আলাপ করলাম। কথাবার্তায় মনে হলো এ সম্পর্কে এঁদের অধিকাংশই তেমন কিছু জানেন না। এনজিও-র স্থানীয় অফিস থেকে দু তিন শ গজ দূরের বাড়িতে লাকি নামের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে মাত্র ৬ বছর বয়সে, বরের বয়স ১৩ বছর। লাকির বাবার নাম হাফিজুর রহমান, পেশায় একজন ঘর-নির্মাণ মিস্ত্রি। মূলত শখের কারণে এ বিয়েটি সম্পন্ন হয়, মেয়ে এবং ছেলের বাবা দুজনে বন্ধু, সেই বন্ধুত্ব পাকাপোক্ত করার জন্যে তাদের শখের উদ্রেক হয়। ১০ হাজার ১ টাকা দেনমোহরানায় বিয়ে পড়ান মৌলবি আব্দুল আলিম, এক শ টাকা নিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন কাজী সাহেব।

শুনে অবাক হলাম যে, এ বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি এনজিও কর্মীরা নাকি জানেন না!

পায়রাবন্দে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার উপায়টি কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয়। গ্রামে যেসব মৌলবি সাহেব বিয়ে পড়ান কিংবা বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন যে কাজী সাহেব, তাঁদের ডেকে একত্র করে যদি মানা করে দেওয়া যায়, একান্তই অনুরোধ রক্ষা না করলে যদি একজনকে অন্তত তুলে দেওয়া যায় আইনের হাতে, তা হলে ভালো ফল লাভ হতে পারে। কোনো বাবা-মা পায়রাবন্দের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে তো তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবেন না! এ প্রস্তাবটি ব্যক্তিগতভাবে আমি রংপুর এবং মিঠাপুকুর প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দিয়েছি। কিন্তু প্রথম প্রথম উৎসাহ দেখালেও পরে তাঁরা ঝিমিয়ে পড়েছেন। 'ফাইল ওয়ার্ক' নিয়ে তাঁরা এতই ব্যস্ত যে পায়রাবন্দের কোথায় কার বাল্যবিবাহ হচ্ছে তা নিয়ে সময় নষ্ট করার সময় তাঁদের নেই। আমাদের প্রশাসনের অবস্থাটাই এ-রকম। শিকড়ে ঘুণ, নানা অব্যবস্থা-অনিয়ম, বিভিন্নভাবে সামাজিক অবক্ষয় ঘটছে আর কর্তাদের অধিকাংশই রাজধানী, জেলা-শহর কিংবা থানা-সদরের পাকা-সুসজ্জিত কামরায় বসে 'ফাইল-ওয়ার্ক' করে যাচ্ছেন। দিনের পর দিন তাঁদের মাথা ঘামছে দেশের বড় বড় সমস্যা নিয়ে। পায়রাবন্দের সুরমা, কোহিনুর, ইসমতআরা কিংবা লাকির ভাগ্যে কী ঘটল আর না-ঘটল, তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। অথচ বক্তৃতায় হামেশাই বুলি কপচানো হয় : প্রশাসন নাকি গ্রামের জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে!

পায়রাবন্দের ২১টি গ্রামে অসংখ্য বাল্যবিবাহের ঘটনা উদ্ঘাটনের পর নিজের কাছেই খারাপ লাগে। আমার যুবক-বন্ধুদের সাথে কথা বলি, আমরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু-একটা করতে পারি কি না! কী করে বাল্যবিবাহের ঢল রোধ করা যায়!

সন্ধ্যার পর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে যুবকদের এক সভা ডাকি। উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহ রোধে গ্রামের যুবশক্তিকে ব্যবহার করা যায় কি না।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর 'রোকেয়া ব্রিগেড' গঠিত হয়। এর কোনো কমিটি থাকবে না, গঠনতন্ত্র প্রয়োজন নেই, দরকার নেই অফিসঘরের। শুধু কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্যে যুবকেরা স্কুলের মাঠে কিংবা হাটের চায়ের দোকানে মাঝেমধ্যে মিলিত হবে।

প্রতিটি যুবকের জন্যে কর্ম-এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়। নিজ নিজ এলাকায় যাতে একটিও বাল্যবিবাহের ঘটনা না ঘটে, সে ব্যাপারে তারা কড়া নজর রাখবে। কারও বাড়ি থেকে বিয়ের খবর পেলে প্রথমে বাবা-মাকে বোঝাবে তারা, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জ্ঞাত করবে, প্রচলিত আইন-কানুন জানাবে। এতে কাজ না হলে বল প্রয়োগ করে বিয়েতে বাধা দেবে তারা। প্রয়োজন হলে মিঠাপুকুরে গিয়ে ছেলেমেয়ের বাবা-মা এবং বিয়ের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে। সিদ্ধান্ত হয় : প্রতিটি ব্রিগেড-সদস্যদের অধীনে থাকবে একাধিক শিশু-কিশোর 'ইনফরমার'। গ্রামের কোন্ বাড়িতে কার বিয়ে হচ্ছে, সে খবরটি এদের কাছ থেকে জানা সম্ভব দ্রুত।

টুকিটাকি খরচপত্র চালানোর জন্যে তাৎক্ষণিক একটি তহবিল গঠিত হয়। কেউ দেয় নগদ টাকা, কেউ দেয় আধ মণ থেকে এক মণ ধান। ব্রিগেড পরিচালনার দায়িত্ব পায় রাজু আহমেদ আর জাহাঙ্গীর। অন্য সদস্যরা হলো : নুরুল ইসলাম, ফয়জার রহমান, ফাইফুল, তাজুল, মুকুল, দুলাল, মকবুল, ফাত্তার, রফিকুল, গোলাম আজম, শাহীন, আলম, মজনু, হারুন, আনিসুর। পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকে অ্যাডভোকেট নিকুঞ্জচন্দ্র বর্মণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রোকেয়া ব্রিগেড' গঠিত হবার পর অন্ধকার স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই হাতের উপর হাত রাখে, উচ্চারণ করে শপথবাক্য : 'আমরা আমাদের নিজ নিজ কর্ম-এলাকায় আর একটিও বাল্যবিবাহ হতে দেব না।'

আসলে এই কার্যক্রমের ব্যাপারটি ছিল পরীক্ষামূলক। দেখা যাক না কী ধরনের ফল পাওয়া যায়!

ব্রিগেড গঠিত হয় '৯২-এর মার্চে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যখন এই পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি তখন খবর পেলাম : পায়রাবন্দে বাল্যবিবাহের হার আগের চেয়ে বেশ কমে গেছে। ব্রিগেড-সদস্যরা সবাই না হলেও অধিকাংশই এখনও তৎপর। কোনো বাড়িতে বাল্যবিবাহ হচ্ছে এমন খবর পেলেই সেখানে বাধা দিতে ছুটে যায় তারা।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, ক্ষমা করবেন। পায়রাবন্দের বাল্যবিবাহের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত তৎপরতার প্রসঙ্গ এসে গেল। কিন্তু 'রোকেয়া ব্রিগেড' তথা যুবকদের তৎপরতার কথা না জানিয়ে পারলাম না। '৯২ সালের প্রথমভাগে পায়রাবন্দ ইউনিয়নের ২১টি মৌজায় বাল্যবিবাহের যে তথ্যচিত্র, বছরের শেষভাগে এসে তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, দেখা যাবে বাল্যবিবাহের হার কয়েক মাসের ব্যবধানে অনেকটা কমে এসেছে।

কিন্তু এর নেপথ্য কারণ কী? ব্যাপারটি জানা থাকা দরকার। অন্তত নিজেদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ঐ গ্রামের যুবকদের অবদান থাকুক লিপিবদ্ধ।

AMARBOI.COM

২

যৌতুক দেওয়া-নেওয়া ছাড়া বিয়ে হয়েছে বা হচ্ছে, এমনটি পায়রাবন্দ এলাকায় দেখা যায় খুবই কম। ৭ বছর আগে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে যে জরিপটি চালিয়েছিলাম তাতে দেখা গিয়েছিল : প্রতি ১শ বিয়ের মধ্যে ১শই সম্পন্ন হয়েছে যৌতুক দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে। আর '৯২-এর জরিপ-তথ্য হলো : শতকরা ৯৮ ভাগ বিয়েতে যৌতুক আদান-প্রদান করা হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সাত বছরের ব্যবধানে যৌতুক-পরিস্থিতির তেমন হেরফের হয়নি। অনেকেই বলেন, শহরের মতো বাংলাদেশের গ্রামগুলোতেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সঠিক বটে। কিন্তু না, যৌতুকের অভিশাপ এখনও প্রতিটি পরিবারের কাঁধে সিন্দাবাদের সেই বুড়োর মতো চেপে বসে আছে। পায়রাবন্দে এই চিত্র আরও প্রকট। যৌতুকবিরোধী আইন বা এ-সম্পর্কিত কোনোরকম মেসেজ এখানকার পরিবারপ্রধানরা এখনও পাননি।

যৌতুক দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ আছে। যারা অবস্থাপন্ন তারা এ ধরনের মনে করেন যে, যৌতুকের আদান-প্রদান সামাজিক মান-মর্যাদার ব্যাপার। মেয়ের বিয়েতে তাই তাঁরা যেমন যৌতুকের টাকা গুনে দেন, তেমনি আবার ছেলের বিয়েতে আদায়ও করে থাকেন। এটা একটা ট্রাডিশনে পরিণত হয়েছে। আর গরিবঘরে যৌতুকের ব্যাপারটি যেন বাধ্যতামূলক কোনোকিছু। একটু সচ্ছল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের বিয়েতে নগদ টাকা ছাড়াও দেওয়া-নেওয়া হয় আবাদি জমি, হালের বলদ, টিন, সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও। গরিবঘরে নগদ টাকার সাথে দিতে হয় কাপড়চোপড় ছাতা টুপি এইসব। কেউ আবার শ্বশুরের কাছে রিকশা কিংবা সাইকেলের বায়না ধরে। দিতে না পারলে স্ত্রীকে ফেলে রেখে যায় বাপের বাড়িতে। বিবাহিতা মেয়েটি গরিব পিতার কাঁধে দিনের পর দিন বোঝা হয়ে থাকে, তারই অন্ন খায় আর জামাই বাবাজি মাঝেমধ্যে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়ে যায়। যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে বছরের পর বছর বাপের বাড়িতে থেকেছে এবং স্বামীর ঔরসে একাধিক সন্তান জন্ম দিয়েছে এমন হতভাগ্য মহিলার ঘটনাও পায়রাবন্দের গ্রামে রয়েছে। পায়রাবন্দে রয়েছে যৌতুকের দাবির টাকা না পাওয়ায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে শালীকে নিয়ে যাবার মতো ঘটনাও।

ইসলামপুর গ্রামের এক ক্ষুদ্র কৃষক ধজীর মিয়া, তার মেয়ের নাম রীনা বেগম। নগদ ৫ হাজার টাকা এবং একখানা সাইকেল যৌতুক দিতে হবে এই শর্তে ব্যবসায়ী খাতের আলীর সাথে রীনা বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ে পড়ানোর সময় নগদ দেওয়া হয় ৫শ' টাকা। বলা হয় বাকি টাকা এবং সাইকেল পরে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল মার খাওয়া, মহাজনের ঋণ ও সুদের বোঝা—এসব কারণে ধজীর মিয়া অবশিষ্ট টাকা কিংবা সাইকেল কিছুই দিতে পারে না। অথচ যৌতুকের দাবি ছাড়তে খাতের আলী নারাজ। টাকা ও সাইকেলের জন্যে অনবরত চাপ দিতে থাকে সে, চলে ঝগড়া ফ্যাসাদ মারামারি। শেষে একদিন খাতের আলী তার স্ত্রী রীনা বেগমকে ফেলে রেখে তার ছোট বোন অর্থাৎ শালী রাণী বেগমকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে চলে যায়। তাকে বিয়ে করে অন্য গ্রামে নিয়ে গিয়ে।

খাতের আলী রীনা বেগমকে তালাক দেয়নি। এখনও সে পিতৃগৃহে পড়ে রয়েছে, অবশ্য ক্ষেতমজুরি করে নিজের পেট চালায়। যৌতুক না পাওয়ায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে তার ছোট বোনকে নিয়ে যাবার ঘটনাটি নালিশ আকারে পাড়া-প্রতিবেশীকে জানিয়েছিল রীনা বেগম। অভিযোগ করেছিল গ্রামের মোড়ল মাতবর ও মওলানা সাহেবের কাছে। কিন্তু তাতে কোনো ফললাভ হয়নি। মওলানা সাহেব ফতোয়া দিয়েছেন যে, সে (খাতের আলী) যখন শালীকে বিয়ে করেছে তখন আপনাআপনি তালাক হয়ে গেছে রীনা বেগম। সেক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপনের অধিকার তার নেই।

এ এক আশ্চর্য ফতোয়া। তবু তা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে রীনা বেগম। অবশ্য এই মেনে নেওয়া ছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। মিঠাপুকুর আদালতে গিয়ে মামলা করার সুযোগ ছিল, কিন্তু টাকা পাবে কোথায়? দ্বিতীয়ত. ছোট বোনের সংসার সে ভাঙতে চায়নি।

রীনা বেগমের এই কাহিনী শোনার পর ইচ্ছে হয় তার সাথে দেখা করি। নিশ্চিত হতে চাই যে আসলেই কি রীনা বেগমের বোন রাণী বেগমকে খাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী জোর করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেছে? নাকি রাণীর সাথে তার ছিল পূর্ব কোনো প্রণয়-সম্পর্ক? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে যে, স্ত্রীকে ফেলে রেখে সুন্দরী যুবতী শ্যালিকাকে বিয়ে করেছে কেউ। শুধু গ্রামে নয়, শহর-সমাজেও এমনটি ঘটে থাকে।

রীনা বেগমের সাথে দেখা করবার জন্যে ইসলামপুর গ্রামে যাই আমি আর আমার সাহায্যকারী তাজুল ইসলাম। তাজুল ওদের বাড়িটি চেনে।

রীনাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। সে কাজ করতে গেছে মাঠে। অতঃপর আমরা বহুদূর পথ হেঁটে সেখানেই হাজির। একদল মেয়ের সাথে রীনাও এক জোতদারের জমিতে আলু তোলার কাজ করছিল। প্রথমে সে দারুণ ঘাবড়ে যায়, পরে আলাপের কৌশলে হয়ে ওঠে সহজ। ক্ষেতের আইলের ধারে বসে আলাপ হয় দীর্ঘক্ষণ।

লম্বাটে চেহারা, কালো বরণ, ভাঙা শরীর, রং-জ্বলে-যাওয়া একটি ছেঁড়া সবুজ শাড়ি পরনে রীনার। বয়স ২০-২২ বছর। প্রথমদিকে সংকোচ থাকলেও পরে তা টুটে গেল, গড়গড় করে বলে গেল তার বিয়ের কাহিনী, স্বামীর নির্যাতন, যৌতুকের টাকা আর সাইকেল কী কারণে ওর বাবা দিতে পারেনি, সে-কথা। সে জানালো : ছোট বোন রাণী বেগমের সাথে খাদেমের আলীর কোনো প্রণয়-সম্পর্ক ছিল না। গায়ের জোরেই সে রাণীকে নিয়ে গেছে। পরে জানা গেছে, 'জানে মেরে ফেলবে' এই ভয় দেখিয়ে বিয়েতে কবুল করিয়েছে।

রীনা বেগমের সাথে যখন আমাদের আলাপ হয় তখন ছিল চড়া রোদ, ধুলোর ঝাপটা। লক্ষ করি, রীনার গভীর বেদনামাখা চোখ দুটি বার বার ভিজে উঠছে। শাড়ির ছেঁড়া আঁচল দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছছে সে। এ-সময় খুব অসহায় বোধ করতে থাকি। রীনা বেগমের নীরব কান্না সংক্রমিত হয় আমার গলার নিচে, একটা বিচিত্র শিরশির অনুভূতির ভেতর। গ্রামের শিকড়-সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে এই যে কান্নার সংবাদ খুঁজে পাই, তা আমি কাকে জানাবো?

যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারায় একে একে তিনবার তিন স্বামীর কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে, এমন ঘটনাও পায়রাবন্দের গ্রামে রয়েছে। যেমন জোহরার কথা এখানে বলা যায়।

খোর্দ মুরাদপুর গ্রামে তার বাড়ি। পিতা দিনমজুর, দৈনিক আয় ৬-৮ টাকা। পরিবার সদস্যসংখ্যা ৫, উপোস-কাঁপাস নিত্যসঙ্গী।

জোহরার বয়স এখন ২২ বছর। ৮ বছর বয়সে প্রথম তার বিয়ে হয়। যৌতুকের দাবি ছিল ৩শ টাকা। দিতে পারেনি বলে তালাক হয়েছে। ১৫ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে হলো, যৌতুক দেবার কথা ৫শ টাকা, মজুরির সঞ্চয়কৃত অর্থে জোহরার বাবা জায়েদ আলী দিতে পেরেছিল মাত্র ৫০ টাকা, কিন্তু বাকি সাড়ে ৪শ টাকা পরিশোধের ব্যর্থতায় আবার সে পিতৃগৃহে ফিরে এলো হলো তালাকপ্রাপ্তা। ২১ বছর বয়সে তৃতীয়বারের মতো বিয়ে হয় তার, দিনমজুর আক্তার আলীর সাথে। যেহেতু জোহরা একাধিকবার তালাকপ্রাপ্তা সে কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্তারের যৌতুকের দাবি ছিল বেশি। নগদ ৫শ টাকা ছাড়াও দিতে হবে একটি ছাগল আর মেয়ে-জামাই বসবাসের জন্যে একটা ঘর তুলে দিতে হবে।

বাড়িতে একটি ছাগল ছিল, জোহরাকে নিয়ে যাবার সাথে সাথে আক্তার সেটিও নিয়ে যায়। কিন্তু টাকা এবং ঘর পায়নি। '৯২-এর মার্চে যখন পায়রাবন্দে যাই, শুনতে পেলাম দিনদশেক আগে আবার সে তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এখন সে পিতৃগৃহে।

জোতষষ্টি গ্রামের জাহেদার কাহিনী একটু অন্যরকম। দীর্ঘ ৪ বছর 'ভালোবাসা' করার পর ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় মেয়েটির। পাড়া-প্রতিবেশী বলেন, বিয়ের আগে ওদের দুজনার সম্পর্ক ছিল নাকি খুবই 'গভীর'। বিয়ে না হলে মেয়েটি আত্মহত্যা করবে এমন কথাও নাকি বলত।

কিন্তু বিয়ের পর পরিস্থিতি পাল্টে গেল।

বিয়ের মজলিশে 'ছেলেপক্ষ' যে নগদ টাকা এবং সাইকেল দাবি করেছিল কয়েকদিন ঘর-সংসার করতে-না-করতেই তা দাবি করে বসল ছেলের মা। ৭ দিনের মধ্যে টাকা আর সাইকেল চাই, নইলে জাহেদাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সময়-সীমা শুনে মেয়ের অভিভাবকরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। বিয়ের সময় কথা দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টাকা-সাইকেল দেওয়া ছিল তাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু জাহেদা ব্যাপারটি প্রথমদিকে তেমন পাত্তা দেয়নি। যৌতুক দাবি করছে শাশুড়ি, স্বামী তো নয়। আর দীর্ঘদিন প্রেম করে বিয়ে হয়েছে তাদের। কিন্তু ভুল ধারণা করেছিল জাহেদা স্বামী সম্পর্কে। কেননা একদিন, স্বামীটিই যৌতুকের টাকা-সাইকেল চেয়ে বসল। তার বক্তব্য এ ধরনের : 'আমি তো কোনোকিছু চাই না, চাচ্ছে আমার মা।' যেন আকাশ থেকে পড়ল জাহেদা।

আকাশ থেকে পড়াও বুঝি ভালো ছিল। কিন্তু না, তা নয়। প্রথমে চলল বকাঝকা, বাপ-মা তুলে গালাগালি। জাহেদা বলল, 'আমাকে যা বলবার বলো, কিন্তু বাবা-মাকে টানো কেন?' এই প্রতিবাদের জবাবে পেল সে প্রেমিক-স্বামীর চড়-থাপ্পড়-লাথি। এভাবে ১৫/১৬ দফায় মার খাওয়া আর শাশুড়ির নিত্যদিনের গঞ্জনার অবসান ঘটল স্বামীর 'তিন তালাক' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। বাবা তো নেই, মায়ের কাছে চলে গেল জাহেদা। এখনও সেখানেই রয়েছে।

যৌতুক পরিশোধ করলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, সবক্ষেত্রে তা নয়। আছিয়ার বাবা রসুল মিয়া তো তার একমাত্র আদরের মেয়ের বিয়েতে অনেক কিছুই দিয়েছিল। 'জামাই' পেয়েছিল নগদ ৭ হাজার টাকা, ৪ ভরি সোনা, টিন, ঘড়ি, আংটি, ১ হাজার টাকার কাপড়চোপড়। তবু সংসার টিকল না। তালাক না দিলেও স্বামী হামিদার রহমান বহুদিন থেকে নিরুদ্দেশ। কিছুদিন আগে লোকমুখে খবর মিলেছে যে, হামিদার ঢাকায় আছে, সেখানে আরেকটি বিয়ে করেছে।

৮ বছর বয়সে আছিয়ার প্রথম বিয়ে হয়। রসুল মিয়া নাকি ভেবেছিলেন স্বামীর বাড়িতে থাকলে তার মেয়েটি তাড়াতড়ি 'গৃহকর্মে সুনিপুণা' হয়ে উঠবে। কিন্তু বাল্য-বিবাহ টেকেনি। মেয়ে কোনোমতেই শ্বশুর বাড়িতে থাকতে নারাজ। স্বামীকে নাকি ভয় লাগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মেয়েটা বেয়াড়া, এর দ্বারা স্বামীর ঘর করা হবে না' এই অভিযোগে তালাকপ্রাপ্তা হলো অবুঝ-অবোধ কিশোরী আছিয়া। থাকল নিজের বাড়িতেই।

বয়স যখন ১৮ বছর অর্থাৎ যৌবনবতী, তখন দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে হলো হামিদারের সাথে। ছেলেটি নাকি চাকরি করে, আয়-উপার্জন ভালো। ৪ একর জমির মালিক রসুল মিয়া বেচে দিল কিছু জমি, বিয়ে পড়ানোর পরপরই মিটিয়ে দিল জামাইয়ের যৌতুকের যাবতীয় দাবি। কিন্তু কিছুদিন বাদে জানা গেল : ছেলে সম্পর্কে ওরা যা জেনেছিল তা সত্য নয়। কোনো চাকরি নেই, সম্পূর্ণ বেকার সে এবং তার স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। নেশা-ভাং করে।

নগদ যে ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল তা উড়িয়ে দিল হামিদার। বিক্রি করল সোনা, টিন, ঘড়ি। আছিয়া প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু খেয়েছে স্বামীর হাতের কিল ঘুসি। গর্ভবতী আছিয়া নির্যাতন সইতে না পেরে পিতৃগৃহে চলে এলো আর ওদিকে গ্রামছাড়া হলো হামিদার। তার পর থেকে আর দেখা নেই।

একদা ৪ একর আবাদি জমির মালিক রসুল মিয়া মেয়ের বিয়ে দিতে জমি হারিয়েছে, এখন সে অতি ক্ষুদ্র এক কৃষক, মজুরিও খাটে। আর আছিয়া পিতৃগৃহে থাকলেও নিজের আয়-উপার্জনে নিজের পেট চালাতে চায়। গ্রামে এর ওর বাড়িতে ঠিকে ভিত্তিতে চাকরানির কাজ করে। পলাতক স্বামীর ঔরসে যে-ছেলেটি জন্ম নিয়েছে, সে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে।

AMARBOI.COM

এই বইটির শুরুতে মাকড়া বুড়োর কাহিনী বলেছি। ৯৪ বছর বয়সের মাকড়া বিয়ে করেছিল ১৪ বছরের মেয়েকে। স্ত্রী নয়, বৃদ্ধের প্রয়োজন ছিল দেখাশোনা করার জন্যে একটি 'কাজের লোক'। আর ঐ মেয়েটির মানসিকতাও ছিল অন্যরকম। বুড়ো স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করলে সওয়াব পাবে, বুড়ো মারা গেলে জমি পাবে।

বাহাদুরপুর গ্রামের হাসনা বানু আর জয়গনের বিয়ের ব্যাপারটি তেমন নয়, যদিও তাদের বিয়ে হয়েছে দুই বৃদ্ধের সাথে। জানা গেল : যৌতুক দেবার সামর্থ্য নেই বলেই ওদের 'কপালে' জুটেছে বুড়ো বর। অন্তত হাসনা আর জয়গন তা-ই মনে করে। ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে তারা নিজেদের ব্যাপার।

বৃদ্ধ দিনমজুর গোলাম মোস্তফার দুই মেয়ে হাসনা আর জয়গন। প্রথমজনের বয়স ১৫ বছর, দ্বিতীয়জনের বয়স ১৩ বছরের কিছু বেশি। নাবালিকা বয়সে দুজনেরই বিয়ে হয়েছিল, স্বামী ছিল যুবক। কিন্তু দুজনের কেউই স্বামীর ঘর করতে পারেনি। যৌতুকের দাবি ছিল প্রথমজনের ১ হাজার টাকা, দ্বিতীয়জনের ৮শ টাকা। দিনমজুর পিতা তা পরিশোধ করতে পারেনি। তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ফিরে এসেছে পিতৃগৃহে।

হাসনা ও জয়গনের বয়স বাড়ল, নাবালিকা থেকে হলো সাবালিকা। আর ঘরে ফেলে রাখা যায় না, ওদের দিকে ইতোমধ্যেই পড়েছে গ্রামের যুবকদের লোভের চোখ। রাতের বেলা ঘরের চালে ঢিল পড়ে, বেড়ার ধারে ফিসফিসানি শোনা যায়, কারা যেন ওদের নাম ধরে ডাকে। মোস্তফা মিয়ার চোখের ঘুম হারাম হয়। মেয়েদের পাহারা দেবার জন্যে সারারাত উঠানে শুয়ে-বসে থাকে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু সবাই যৌতুক চায়। সর্বনিম্ন দাবি ৫শ টাকা। কিন্তু ভূমিহীন মজুর মোস্তফার দৈনিক আয়-উপার্জন যা, তাতে করে একত্রে তো ৫০ টাকাও গুনে দেওয়া সম্ভব নয়। শেষে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে দুই বৃদ্ধ। দুজনের বয়স প্রায় ৬০ বছর। কিছু নাকি জমিজমা আছে, মেয়ে খেয়ে-পরে থাকতে পারবে। তার চেয়েও বড় কথা ওদের যৌতুকের কোনো দাবি নেই। শুধু মেয়ে চায় তারা।

বৃদ্ধ কাসিমউদ্দিনের সাথে বিয়ে হয় হাসনাবানুর। জয়গানের বিয়ে হয় পাপরেজ মিয়ার সাথে। গোলাম মোস্তফার বয়স ৫০ বছর, তার জামাইদ্বয়ের বয়স ৬০ বছর। গ্রামের লোকজন এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করে।

এই অসম বিয়ের ব্যাপারটির বিস্তারিত জানবার জন্যে বাহাদুরপুরে গোলাম মোস্তফার বাড়িতে গেলাম। যৌতুক দিতে অসমর্থ মোস্তফা যে দুই বৃদ্ধের সাথে হাসনা আর জয়গনের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, সে-কথা অকপটে স্বীকার করলেন। তিনি বললেন, 'বাবা, এ ছাড়া আমার তো আর কোনো উপায় ছিল না।'

এখানে এসে শুনলাম, জয়গনের স্বামী পাপরেজ মিয়া দিনকয়েক আগে পেটের অসুখে ভুগে মারা গেছে। অর্থাৎ মেয়েটি হয়েছে বিধবা। সে বাবার ঘরেই রয়েছে। আর হাসনার স্বামী কাসিমউদ্দিন এখন স্ত্রীসহ শ্বশুরবাড়িতেই থাকছে মাসকয়েক ধরে। লোকে ইতোমধ্যেই বলতে শুরু করেছে, 'ঘরজামাই'। গোলাম মোস্তফারও হয়েছে বিপদ। সামান্য জমি বেচে দিয়ে এসে বড় জামাই (কাসিমউদ্দিন) হাসনাসহ এখন তার কাঁধে চেপে বসে আছে। আছে বিধবা মেয়েটি জয়গন। ভরা যুবতী জয়গনের দিকে আবার পড়েছে গ্রামের কারও কারও 'কুদৃষ্টি'। সেই আগের মতো তাদের উৎপাত বেড়েছে আবার। অথচ মেয়ের আবার বিয়ে দেবে সে সামর্থ্য নেই।

আলাপ প্রসঙ্গে যে ব্যাপারটি জানা গেল তাতে আমার আরও অবাক হবার পালা। শুধু গ্রামের বদ ছেলেরা নয়, বিধবা যুবতী জয়গনের দিকে ইদানীং নাকি চোখ পড়েছে তার দুলাভাই কাসিমউদ্দিনের। ৬০ বছর বয়সে হাসনাবানুকে বিয়ে করে তার খায়েশ মেটেনি, এখন চায় জয়গনকে।

কাসিমউদ্দিন গ্রামে 'কাছিমবুড়ো' হিসেবে পরিচিত। পায়রাবন্দে এ ব্যাপারটি লক্ষণীয় যে, যারা বহুবিবাহ করে কিংবা বুড়ো বয়সে ঘরে আনে যুবতী বউ, গ্রামের লোকজন, বিশেষ করে কিশোর-যুবকেরা জীবজন্তুর নামে ডাকে তাদের। যেমন : কাছিম বুড়ো, মাকড়া বুড়ো, শিয়ালু, ছাগলা, শকুনি, এইসব।

কাছিম বুড়োর কাছ থেকে জানা গেল : হাসনা বানু তার পঞ্চম স্ত্রী। ১০/১২ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, সেই প্রথমা স্ত্রীর নাম মনে নেই। পরবর্তীতে সে দিলজাহান, মজিতন, আনজেরা এবং সর্বশেষ হাসনাকে বিয়ে করে। এদের মধ্যে দিলজাহান আর আনজেরা মারা গেছে, মজিতনকে দিয়েছে তালাক। হাসনা বর্তমান। ইতোমধ্যে বুড়োর আবার ভীমরতি ধরেছে বিয়ের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের অভিশাপ যেমন আছে পায়রাবন্দে, তেমনি বহুবিবাহ ও অসম বিবাহের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে এখানে। ইউনিয়নের ২১টি মৌজায় শতাধিক বৃদ্ধের কাহিনী শুনেছি যারা তরুণী বা যুবতী বিয়ে করেছে অথচ তাদের একেকজনের বয়স ৫০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে।

অধিকাংশ অসম বিয়ের কারণ হলো ধর্মসিদ্ধভাবে একটি 'কাজের লোক' ঘরে আনা। বিয়ের কলমা যেহেতু পাঠ করা হয়, সেহেতু চাকরানি না বলে তাদের সামাজিক পরিচয় হয়ে ওঠে 'স্ত্রী'। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত হাজারো কাজের বিনিময়ে তারা পায় শোবার ঘর, তিন বেলা খাবার, কাপড়চোপড়। নিরাপত্তার ব্যাপারটিও আছে। কেউ অন্তত বেড়া কাটতে আসে না, ইশারায় ডাক দেয় না।

আমি আর রাজু আহমেদ শালাইপুর গ্রামে গেলাম। সেখানে ৮০ বছর বয়স্ক তছিমউদ্দিন পঞ্চম বিয়ে করেছেন ২০ বছরের যুবতী মছিরনকে।

প্রায় ১০ বিঘা জমি আছে তছিমউদ্দিনের। আছে নিজস্ব হাল-বলদ। আগের স্ত্রীগণের ৭ ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনির সংখ্যা ২৫। তছিমের সব দাঁত পড়েছে, তবে চোখে এখনও ভালো দেখেন। আমরা যখন তার বাড়িতে পৌঁছুলাম, তিনি তাঁর বাড়ির কাছাকাছি একখণ্ড জমি থেকে মরিচ তুলছিলেন। বৃদ্ধের বড় ছেলে, বয়স যাঁর প্রায় ৪৫ বছর, তিনি আমাদের আদর-যত্নে বসতে দিলেন, ত্বরিত এনে দিলেন গুয়া-পান। তাঁর সাথে কথাবার্তায় বোঝা গেল বৃদ্ধ পিতার বিয়ের ব্যাপারটি তিনি এবং পরিবারের আর সবাই খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন। বিয়ের পর তছিমউদ্দিনের ছেলেমেয়েরা নিজেদের আলাদা সংসার গড়েছে, সেক্ষেত্রে বুড়োকে এখন দেখাশোনা করে কে? কে করে তার রান্নাবান্না আর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা? বুড়োর ছেলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'আমরাই তো আব্বাকে বিয়ে করতে বললাম। মেয়েও খুঁজে এনে দিলাম।'

বৃদ্ধ তছিমউদ্দিন জমি থেকে উঠে এলেন। কর্মক্লান্ত তিনি, হাঁপাচ্ছিলেন, তার ওপর হঠাৎ করে শহুরে লোক দেখে ভড়কে গেছেন। তাঁর সাথে আলাপ জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু যা-ই জিজ্ঞেস করি না কেন, বুড়ো শুধু ভয়ার্তচোখে এর-ওর দিকে তাকান। বুড়োর ছেলে হেসে বলেন, 'আব্বার সাথে এভাবে কথা বললে হবে না, কথা বলতে হবে জোরে। আব্বা কানে কম শোনে।'

চড়া গলায় প্রশ্ন করি। তবু বুড়ো শোনেন না। ছেলেটি বলেন, 'উনার কানের কাছে যান নইলে তিনি কিছু শুনতে পাবেন না।'

আমি হাল ছেড়ে দিই। এভাবে কারও সাক্ষাৎকার নেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলি, 'থাক। কথা বলার দরকার নেই। এখন উনার স্ত্রীকে ডাকুন, দুজনের একটা ছবি তুলি।'

প্রথমে আমার ধারণা ছিল আব্বা আর নতুন মার যুগল ছবি তুলতে দিতে রাজি হবেন না তাঁর ছেলেটি। কিন্তু না, তিনিই বাড়ির ভেতর ছুটে গেলেন মাকে ডাকতে এবং খানিক বাদেই ধরে নিয়ে এলেন প্রায়। মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে বুড়োর বউ মছিরন, বয়স যার ২০ বছর, ভরা যুবতী, আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। শরমে বাঁকা হয়ে গেছে তার শরীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হলো, তোলা হলো কয়েকটা ছবি। লক্ষ করি : ঘোমটার আড়ালে মছিরন মিটিমিটি হাসছে।

তার সাথে কথা বলতে চাই। কিন্তু যে-রকম লজ্জা পাচ্ছে তাতে কথাবার্তা বলবে কি? জানাবে কি তার জীবনবৃত্তান্ত? না, আমার ধারণা ভুল হয়। ভাবভঙ্গিতে যতটা লাজুক মছিরন, কথাবার্তায় তত নয়। বরং বাড়ির বাহির আঙিনায় দাঁড়িয়ে গড়গড় করে অনেক কথাই জানাল সে।

ভূমিহীন পরিবারের মেয়ে মছিরনের এর আগে ৩ বার বিয়ে হয়। প্রথম স্বামী অসুখে ভুগে মারা গেছে আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বামী দিয়েছে তালাক। কারণ যৌতুকের দাবি মেটাতে পারেনি মছিরনের গরিব পিতা। বেশ কিছুদিন পিতৃগৃহে পড়ে থাকবার পর বৃদ্ধ তছিমউদ্দিনের ছেলেটি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেল মছিরনদের বাড়িতে। না, নিজের জন্যে এ প্রস্তাব নয়, বাবার জন্যে। কিন্তু কার সাথে বিয়ে হবে, তার বয়স কত, দেখতে কেমন—এসব বাছবিচারের অবকাশ ছিল না। মছিরনের পিতা যেমন চাচ্ছিল যে তার মেয়েটার একটা গতি হোক, তার কাঁধের ওপর থেকে চাপ কমুক, তেমনি মছিরনও একটা নিরাপদ আশ্রয় আর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা খুঁজছিল। আগের পক্ষের স্বামী, যৌতুকের কারণে যাদের কাছ থেকে হয়েছে বিতাড়িত তারা মছিরনকে একা বিদায় করেনি। তালাক দেওয়ার আগে-আগে দুজনে তার গর্ভে দিয়েছিল দুটি সন্তান। নিজে নাহয় উপোস-কাপাস করা যায়, কিন্তু কোলের সেই সন্তান দুটিকে মছিরন খাওয়ায় কী? বাঁচিয়ে রাখে কীভাবে? পিতার সামান্য আয়ে তো এত বড় সংসার চলে না!

সন্তান দুটির মুখের দিকে চেয়ে ২০ বছর বয়সের মছিরন ৮০ বছরের বৃদ্ধ তছিমউদ্দিনকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। এ বিয়েতে অন্তত যৌতুকের টাকার দাবি তো নেই!

মছিরন জানালো : বুড়োর ঘরে সে ভালোই আছে। নিজের তো বটেই, ছেলেমেয়ে দুটির খাওয়া-পরা নিয়ে আপাতত কোনো চিন্তা নেই। বুড়োর দুধেল গাভী আছে, নিয়মিত দুধ পাচ্ছে ওরা। কিছুদিন আগেও যারা ছিল দারুণভাবে অপুষ্টি-আক্রান্ত, তারা এখন বেশ নাদুস-নুদুস। তবে মছিরনের ভয়ের ভাবনা একটাই। বুড়োর বয়স ৮০ বছর পেরুলো, বাঁচবে আর কতদিন? লোকটা মারা গেলে দুই সন্তান নিয়ে আবার কোথায় দাঁড়াবে সে?

... এই সমাজ এবং সরকার, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত অথচ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না, দিতে পারে না খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা-চিকিৎসার নিশ্চয়তা, তাদের সেই ব্যর্থতাকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। তছিমউদ্দিনের বাড়ির বাহির-আঙিনায় মছিরনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তাই মনে-মনে কামনা করি, অবোধ শিশু দুটির জন্যে একটুখানি ভাত আর একবাটি দুধের নিশ্চয়তা দিতে অন্তত ৮০ বছরের বৃদ্ধ তছিমউদ্দিন আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন।

: এক্‌না ফির কী? এতোয় ঠোকস্ ঠোকস্ করি কি কন্নেন?

মছিরনের সহাস্য এবং কৌতূহলের প্রশ্নে এলোমেলো ভাবনায় ছেদ পড়ে। আমার ক্যামেরাটি দেখিয়ে সে আঞ্চলিক ভাষায় প্রশ্ন করছে যা, তার অর্থ হলো :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটি কী জিনিস? এতোক্ষণ ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে কী করলেন? আসলে ছবি তোলার সময় শার্টারের যে শব্দ হচ্ছিল, তা-ই মেয়েটির কানে বেজেছে 'ঠোকস্ ঠোকস্'।

ছবি তোলার ব্যাপারটি তাকে জানাই। না, এর আগে কখনো ক্যামেরা দেখেনি সে, এভাবে ছবিও তোলেনি কেউ তার। বাড়িতে রেডিওসেট আছে, কিন্তু ২০ বছর বয়সেও সে এখন পর্যন্ত টেলিভিশন দেখেনি। গ্রামে রিকশা দেখেছে কিন্তু প্লেন ট্রেন এমনকি বাস পর্যন্ত দেখেনি। দূর থেকে বিদ্যুতের আলো দেখেছে, একটি দিনের জন্যেও কিন্তু বিদ্যুৎ ভোগ করেনি। আমি যখন ছমিরনকে জানালাম যে, তার জীবনযাপনের 'সংবাদ' পত্রিকায় ছাপা হবে, ছাপা হবে ছবি, তখন সে নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট বাঁকায়। না, এসব সে কিছুই বুঝতে পারে না। তবু সে প্রশ্ন করে, 'কী লাব হইবে বাহে ইগলা করি?' অর্থাৎ সে বলছে, বাপুহে, এসব করে কী লাভ হবে? এবং প্রশ্নের জবাব শোনার অপেক্ষা না করে তক্ষুনি সে ব্যস্ত পায়ে অন্দরে হাঁটা দেয়।

কী লাভ হবে এসব করে? কার কী লাভ হবে? এই দেশের? সমাজের? ছমিরনের? শালাইপুর গ্রাম থেকে ফিরে আসার পথে এইসব ভাবনা পেয়ে বসে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ছমিরনদের সচিত্র সংবাদ লিখে আমি বেশ দুপয়সা করে খাচ্ছি, কিন্তু ভুখা-নাঙ্গা এবং নিরাপত্তাহীন মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে কতটা? সামাজিকভাবে কোথায় কতটা অগ্রসর হয়েছে মছিরন হাসনা, জয়গন, আছিয়া, জাহেদা, রীনা বেগমের দল?

রাজু আহমেদ প্রশ্ন করে : হঠাৎ যে গম্ভীর হয়ে গেলেন? কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে?

আমি বলি, ঠিকই ধরেছেন রাজু। ভাবছি তছিমউদ্দিন আর মছিরনের কাহিনী বেশ জমিয়ে লেখা যাবে। সাথে যদি ঐ ৮০ বছরের বুড়োর পাশে দাঁড়ানো মছিরনের ছবিটা ছাপা হয় তা হলে তো আরও ভালো। না কী বলেন?

রাজু আর কোনো কথা বলে না। প্রচণ্ডরকম রোদ আর ধুলোর ভেতর আমাদের সাইকেল লিকের রাস্তা মাড়িয়ে সামনে এগুচ্ছে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে।

সামনে রাজুর সাইকেল, আমারটি পেছনে। ডানে বাঁয়ে গাঢ় সবুজ বোরোক্ষেত, শ্যালো মেশিনের একটানা ধকধক শব্দ, কামলা-কিষানের ভাঙাচোরা ঘর, জোতদারের পোয়ালের পুঞ্জ, বাঁশঝাড়, কলাগাছের থোপ, কবরখানা, উলঙ্গ-অপুষ্ট শিশুকিশোরের দল, পাণ্ডুর রোগাক্রান্ত মহিলার কোটরাগত চোখের মণিতে একরাজ্য ক্ষুধা, হাঁটুতে হাত বেঁধে বসে থাকা বেকার মজুরের দল। তবু গ্রামে রাজুর পরিচিতির কারণে ঘনঘন সালাম মেলে। ভূস্বামীর জমিতে বোরো ধানের গাছ যখন দ্রুত বাড়ছে, কামলাদের হাতে তখন কোনো কাজকর্ম নেই। নিজের জঠরে অনাহার-অর্ধাহারের জ্বালাযন্ত্রণা নিয়েও ওরা অন্যের জন্যে শান্তি কামনা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ ব্রেক কষে রাজু, ধপ করে নেমে পড়ে সাইকেল থেকে। উচ্চস্বরে সালাম উচ্চারণের সাথে সাথে মাথার উপরে হাত ওঠে তার। আমিও নেমে পড়ি। ক্ষেতের আইল ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে একজন। ঢ্যাঙা শরীর, থুতনিতে একটুকরো দাড়ি, হাঁটু পর্যন্ত তোলা চেকলুঙ্গি আর ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি, একজোড়া রাবারের জুতো ঝুলছে তার হাতে। গলায় লম্বা মাফলার।

আইল থেকে একরকম লাফিয়ে সদর রাস্তায় ওঠে লোকটি, মুখোমুখি হয় আমাদের। রাজু পরিচয় করিয়ে দেয় : 'ইনি আমাদের শিয়ালু চাচা।'

শিয়ালুর গল্প আগেই রাজু করেছিল। এখন এই প্রথম তাকে দেখলাম। লোকে যখন নাম দিয়েছে শিয়ালু। সে কারণে কী জানি কেন ধারণা হয়েছিল লোকটি হবে স্বভাবে শিয়ালের মতো ধূর্ত, দেখতেও হবে সে-রকম কিছু। কিন্তু না, মিলছে না। প্রথম দর্শনেই তাকে ভালো লাগল। মুখে খোলা হাসি, চোখে শিশুর মতো সরলতা, কথা বলার সময় গোটা শরীর কৌতুকে দুলছে।

: ইনি কে? চিনলাম না তো? শিয়ালু চাচা আমাকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন। রাজু পরিচয় দিল। যেন অতি বিস্মিত তিনি : রেপোটার? সেটা আবার কী? কী কাজ করেন? বাড়ি কোথায়? পায়রাবন্দে কেন? বেড়াতে এসেছেন?

প্রশ্ন যেন থামতে চায় না। রাজু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'এসব কথা এখন থাক শিয়ালু চাচা। চলেন আপনার বাড়িতে যাব। চাচীদের সাথে ইনি আপনার একটা ফটো তুলবেন। চলেন—

শিয়ালু চাচা হেঁ হেঁ করে হাসেন। 'আমাদের ফটো আবার কেন বাবা রাজু? কী হবে ওটা তুলে?' তবু, বুঝতে পারি, ছবি তোলার কথায় তিনি বেশ আনন্দিত হয়েছেন। রাজু খুব খোলামেলা বলে দেয়, 'আপনার এতগুলো বিয়ের খবর ইনি পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবেন, বিখ্যাত হয়ে যাবেন আপনি, কত লোকে আপনাকে আর চাচীদের দেখতে আসবে ...'

কৌশলগত কারণে কোনো চরিত্রের সাথে এভাবে সরাসরি কথা আমি বলি না। গ্রামের একজন মানুষ, তাঁর স্ত্রীগণের ছবি তুলতে দেবেন এবং সেটা পত্রিকায় ছাপাও হয়ে যাবে, এমনটি তিনি কি এতই সহজভাবে নেবেন? আমার আশঙ্কা হয় যে ব্যাপারটি কেঁচে না যায়। অনুচ্চকণ্ঠে রাজুকে বলি, 'এসব কথা এখন থাক রাজু, চলেন উনার বাড়িতে আগে যাই।'

রাজু হাত নেড়ে বলে, 'না না, অসুবিধা নাই।'

শিয়ালু চাচা আসলে যাচ্ছিলেন পায়রাবন্দ বাজারের দিকে, কিছু-একটা কেনার জন্যে। কিন্তু রাজু মাঝপথ থেকে তাঁকে বাড়ির দিকে ফেরালো। কাফরিখালের বুজরুক তাজপুর গ্রামে তার বাড়ি। সেদিকে চললাম আমরা। প্রৌঢ় শিয়ালু চাচা বয়সের অনেক ব্যবধানেও রাজুর সাথে অতি অন্তরঙ্গ।

বিরাট এলাকাজুড়ে শিয়ালু চাচার বসতবাড়ি। টিনের ঘর ৪টি, খড়ের ঘর ১০টি। বছর কয়েক আগেও তাঁর ছিল ১১০ বিঘা জমি, এখন বেচতে বেচতে ৩০ বিঘায় এসে ঠেকেছে। নিজের ৩ খানা হাল, ছেলেরা তাতে চাষাবাদ করে, মাঝেমধ্যে শিয়ালু চাচা নিজেও ক্ষেতে নামেন। তবে এখন তিনি প্রধানত ধান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালের ব্যবসা করছেন। ফসল ওঠার সময়ে ধান কেনেন অল্প দামে, চড়া সময়ে বিক্রি করেন, স্বাভাবিকভাবেই মুনাফা থাকে মোটা।

শিয়ালু বললেন, 'আবাদ সুবাদ তো নিজের হাতে অনেকদিন করলাম, এখন আর ভালো লাগে না, ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমি এখন ব্যবসাপাতি নিয়ে থাকতে চাই।' শিয়ালু আমাকে চাষাবাদ আর ব্যবসার পার্থক্যটা বিস্তারিত বোঝান। বর্ণনা করেন একজন কৃষক কী করে আবাদে মার খায় আর ব্যবসায়ীরা ফুলেফেঁপে ওঠে। তিনি বলতে থাকেন, 'এই দেখেন না ধানের ভালো বীজ পাওয়া যায় না, সারের দাম চড়া, শ্যালো চালাবেন তো তেলের দাম ডবল, তার পরেও যখন ধান ওঠে তো তার দাম নাই। আর ব্যবসায়ে দেখুন, ধান উঠলে কিনব এক শ দেড় শ টাকা মণ, কয়েক মাস ঘরে ফেলে রেখে বেচব আড়াই শ তিন শ টাকায় ...।

গড়গড় করে কথা বলে যায় লোকটি। কিন্তু চাষাবাদ আর ব্যবসা সম্পর্কে শুনতে এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে নেই, আমি শিয়ালু চাচার পারিবারিক অবস্থা দেখতে এসেছি।

শিয়ালু চাচা কথার ফাঁকে ফাঁকে ছুটে যাচ্ছেন একবার এ-ঘরে, একবার ও-ঘরে। এক বউকে বলেন, 'তাড়াতাড়ি চা বানা হারামজাদি।' আরেক ঘরে গিয়ে গুয়া-পান সাজানোর তাড়া দেন। উঠোন এবং ঘরে একরকম তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছেন। উঠোনে বসে শুনতে পাই, এক স্ত্রীকে তিনি বলছেন, 'জানিস শালী হামার বাড়িত কাঁয় আচ্চে? খালেদা জিয়ার অপিচার। টপ করি চা চড়াও, নাইলে গুঁড়িয়া আইজ তোর কমোর ভাঙ্গিম' ... রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা যাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় তাঁদের জন্যে বলছি, শিয়ালু চাচা তাঁর এক স্ত্রীকে শালী সম্বোধন করে বলছেন, 'জানিস আমাদের বাড়িতে কে এসেছে? ইনি খালেদা জিয়ার পাঠানো এক অফিসার। তাড়াতাড়ি চায়ের পানি চড়িয়ে দে, নইলে আজ লাথি মেরে তোর কোমর ভেঙে দেব।'

আমি বিব্রতবোধ করি। একেই রোজার দিন, তার মধ্যে কীসব শুরু করল লোকটা। আর রাজু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রিপোর্টার, বাড়ি পর্যন্ত আসতে আসতে তা পরিণত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো অফিসার-এ। আমি রাজুকে বলি, লোকটাকে থামান রাজু। রীতিমতো হৈচৈ বাধিয়ে ফেলল দেখছি!

রাজু মৃদু হাসে, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, 'থাক, যা করে করুক। বুঝতে পারছেন না আপনি আসাতে বুড়ো কী-রকম খুশি হয়েছে?—গ্রামের মানুষ, শহর থেকে আসা কাউকে পেলে এ-রকম একটু বাড়াবাড়ি করেই।'

আসলেই বাড়াবাড়ি এবং তা ক্রমশ চরমে ওঠে। পাটালি গুড়ের চা আর বাটাভরা গুয়া-পান পরিবেশিত হবার পর, একটি ঘর থেকে ভেসে আসে কিলের শব্দ আর 'বাবারে' বলে চাপা গোঙানি। শিয়ালু চাচা তার এক স্ত্রীকে ধমক দিচ্ছেন, 'তোক না একখান ভালো শাড়ি পিন্দবার কইলাম! এ্যালাও খাড়া হয়্যা আচিস ক্যানে? টপ্ করি পৈন্দেক শাড়ি, নাইলে ফির চওড় খাবু।' অর্থাৎ তিনি বলছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোকে না একটা ভালো শাড়ি পরতে বলেছি! এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তাড়াতাড়ি শাড়ি পর, নইলে আবার চড় খাবি।'

মারধর শুরু করায় এ-রকম ভয় হতে থাকে যে কোনোরকম ঝগড়া-ফ্যাশাদ আবার বেধে না যায়। ইতোমধ্যেই শিয়ালুর ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি এবং পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই আমাদের প্রায় ঘিরে ধরেছে। রাজুকে অনেকেই চেনে, কিন্তু আমাকে নিয়ে প্রশ্ন : কে এই লোকটা? রোজার দিনে চা-পান খাওয়া নিয়ে মন্তব্য করছে কেউ, কেউ বলছে, 'দ্যেখেক দ্যেখেক, মানুষটা কী ঢাঙা বাহে!' অর্থাৎ, দ্যাখো দ্যাখো, লোকটা কী লম্বারে বাপু!

শিয়ালু চাচার তিন স্ত্রী তিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। উঠোনের এদিকে-ওদিকে দাঁড়ায় তারা। তাদের হাত ধরে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে আনেন শিয়ালু, আমার সামনে। শিয়ালু জানান, বর্তমানে তাঁর চার স্ত্রী, তার মধ্যে এখানে পাওয়া যাচ্ছে তিন জনকে। চতুর্থ জন, বয়স যার কম, সে নাকি একটু আগে চলে গেছে বাপের বাড়ি। ছবি তুলতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু এদের সাথে একত্রে নয়, আলাদা করে তুলবে ছবি। তার নাম আনজেরা, পাশেই তার বাপের বাড়ি। এখানে ছবি তোলার পর সেখানে যেতে হবে। 'সবচেয়ে ছোট বউ তো, একটু 'আল্লাদী'। এই বুড়ি-সতীনদের সাথে ছবি তুলতে সে নারাজ।'

শিয়ালু চাচার বয়স এখন ৬০ বছর। এ পর্যন্ত বিয়ে করেছেন ১০টি। ৬ জন মারা গেছে, ৪ জন বর্তমান। এরা হলো : জয়নব, আমেনা, কোহিনুর, আনজেরা। এরা সবাই বিধবা কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা।

শিয়ালুর ছেলে ১০টি, এর মধ্যে ৫ জনের বিয়ে হয়েছে। মেয়ে ৩ জন, বিয়ে হয়েছে সবার। নাতিনাতনি ২৪ জন। ... এই বাড়িতে মোট সদস্যসংখ্যা এখন ৩৫, এদের মধ্যে শিয়ালু, চার স্ত্রীসহ মোট ১১ জন একান্নবর্তী। বিয়ের পর ৫ ছেলের আলাদা আলাদা চুলা হয়েছে।

চার স্ত্রীর জন্যে আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে। শিয়ালু অধিকাংশ রাত কাটান 'ছোট বউ' আনজেরার ঘরে। তবে শরীর টেপা ও মাথায় তেল মালিশের জন্যে তিনি মাঝে মাঝে বাকি তিন জনের ঘরেও যান। শিয়ালু অকপটে বলে যান নিজের গোপন কথাটিও। তিন বউ নাকি যৌবন হারিয়েছে, তাদের দিয়ে যৌনকর্ম হয় না, ঘর-গেরস্থালির কাজই করে শুধু ওরা। প্রধানত ওদের কাজ ধান শুকানো, ঝাড়াই করা, বস্তাবন্দী করে ঘরে তোলা। এ ছাড়াও পালা করে রান্না-বান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, কাঁথাকাপড় ধোয়া, গরু-ছাগল পালন, জ্বালানি কাঠ কাটা থেকে শুরু করে স্বামীর হাত-পা পর্যন্ত টিপে দেয়। আনজেরার কাজের চাপ অপেক্ষাকৃত কম।

শিয়ালু চাচার আসল নাম নাসিরুদ্দিন মিয়া। কিন্তু এ নামে গ্রামের কেউ তাকে চেনে না, শিয়ালু নামেই পরিচিত। এ নামটি তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন। অন্তত কথাবার্তায় তা-ই মনে হলো। এ বাড়িতে ছবি তোলার পর আমরা যখন শিয়ালু চাচাসহ আনজেরার বাপের বাড়িতে গেলাম, শুনলাম আনজেরার বাবা আইয়ুব আলী তাঁর জামাইকে শিয়ালু বলেই ডাকছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে শিয়ালু চাচা স্বীকার করেন না যে, বহুবিবাহ করেছেন বলেই লোকে তাঁকে ঠাট্টা করে এ নামে ডাকে। তাঁর ভাষ্য হলো : জন্মানোর পরপর আঁতুরঘরের বেড়া ফাঁক করে শিয়াল নাকি তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মা ব্যাপারটা টের পেয়ে চিৎকার শুরু করে আর বাবা ছুটে এসে সেই শিয়ালের মুখ থেকে তাকে উদ্ধার করে। সেই থেকে পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি বাবা-মা পর্যন্ত 'শিয়ালু' নাম ধরে ডাকে। আকিকার সময় নাসিরুদ্দিন মিয়া নাম দিলেও তা কেউ গ্রহণ করেনি।

শিয়ালু চাচার লেখাপড়া ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত। তবে নিজের নামটি এখনও কোনোরকমে সই করতে পারেন। জিয়াউর রহমানের আমলে নাকি শিখেছিলেন, এখনও ভুলে যাননি। এ প্রসঙ্গে শুনলাম, শিয়ালু চাচা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে গ্রাম সরকারপ্রধান ছিলেন। এখনও তিনি বিএনপির সমর্থক।

শিয়ালু চাচা, রাজু, আমি এবং পেছনে একদঙ্গল শিশু-কিশোর একটুখানি পথ মাড়িয়ে আনজেরার কাছে আসি। একখানা ধোয়া চেকশাড়ি পরে ছবি তোলার জন্যে সে ইতোমধ্যে তৈরি। সে জানত, আমাদের সাথে নিয়ে তার স্বামী এখানে আসবেই।

এতক্ষণ নিজের বাড়িতে শিয়ালু চাচা ছিলেন চঞ্চল, উৎফুল্ল। সেখানে তিন বউকে তিনি গালাগালি করছিলেন, লাথি মেরে কোমর ভেঙে দিতে চাইছিলেন, এমনকি শাড়ি পরতে দেরি করায় একজনকে কিলও মেরেছিলেন। কিন্তু আনজেরার কাছে এসে লক্ষ করি, শিয়ালু চাচা কেন যেন বেশ নরম-শীতল হয়ে গেলেন। ভাবি, এ কি যৌবনের কাছে ৬০ বছর বয়সের এক বৃদ্ধের মানসিক পরাজয়, নাকি অন্য কোনো কারণ লুকিয়ে আছে এর নেপথ্যে?

AMARBOI.COM

ছবি তুলি বেশ কয়েকটা। আনজেরার একার, শিয়ালু চাচার পাশে আনজেরার, শিয়ালু-আনজেরা এবং আনজেরার বাবা আইয়ুব আলীর একত্র ছবি। একপাশে ৬০ বছরের শিয়ালু আরেক ধারে ৫৫ বছরের আইয়ুব। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে যুবতী আনজেরা। গ্রামে আমি অনেক ঘটনা জেনেছি কিংবা দেখেছি। কিন্তু পায়রাবন্দের শিকড় সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে এ-ই প্রথম নিজের চোখে দেখলাম : শ্বশুরের চেয়ে জামাইয়ের বয়স বেশি।

ছবি তোলার পর শিয়ালু চাচার সর্বশেষ স্ত্রী আনজেরার সাথে কথা বলি। ৭ বছর আগে শিয়ালুর সাথে তার বিয়ে হয়।

আনজেরার বাবা আইয়ুব আলী একজন দিনমজুর। ৯ বছর বয়স যখন আনজেরার, তখন তার বিয়ে দেয় পিতা। ছেলেটির নাম সামাদ, পাবনায় বাড়ি। কিন্তু যৌতুক বাবদ নগদ ৫শ টাকা হাতে পাবার পরদিন সামাদ উধাও হয়ে যায় আর ফিরে আসেনি।

'সামাদ ফিরে আসবে' এই অপেক্ষা। ইতোমধ্যে সাবালিকা হয়ে ওঠে আনজেরা। মেয়ে আর ঘরে রাখা যায় না। বিয়ে দেওয়া হয় তার সৈয়দপুরে, নওয়াব আলী মুন্সির সাথে। কিন্তু সেখানেও ঘর করা হলো না। কেননা শ্বশুরবাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে সে দেখল সেখানে রয়েছে নওয়াব মুন্সির আরেক স্ত্রী। সতীনের সাথে প্রথমদিন থেকে শুরু হয় ঝগড়াঝাঁটি আর মারপিট। আসলে মুন্সির যে আরেক স্ত্রী রয়েছে বিয়ের আগে তা জানত না আনজেরা, জানলে কোনোক্রমেই এ বিয়েতে নাকি রাজি হতো না।

'সতীনের জ্বালাতন' সইতে না পেরে আনজেরা কিছুদিন বাদেই নওয়াব মুন্সির ঘর ছেড়ে চলে আসে। আর ফিরে যায়নি। পরে তালাক হয়ে যায়।

পিতৃগৃহে থাকে মেয়েটি। আইয়ুব আলী চেষ্টা চালায় আবার তার বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু তার আগেই অঘটন ঘটে, স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী এক যুবক তাকে ধর্ষণ করে। প্রথমে গ্রাম-শালিস এবং পরে থানা-পুলিশের কাছে গিয়েও ফল লাভ হয়নি, বরং মেয়ে এবং পিতা উভয়ের প্রাণনাশের হুমকি এসেছে। বিচারের বাণী কেঁদে মরেছে নিভৃতে।

অপরাধীর বিচার হয় না, বরং উল্টো আনজেরার নামে রটানো হয় কুৎসা। প্রভাবশালীর পক্ষ বলে বেড়ায় যে এটা কোনো ধর্ষণের ঘটনা নয়, বরং কিছু টাকার লোভে আনজেরাই নিজের ইচ্ছায় ইত্যাদি ইত্যাদি করেছে। গ্রামের সরল মানুষজন তা-ই বিশ্বাস করে।

ধর্ষণের ঘটনার পর কেউ আর আনজেরাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। গ্রামময় তার বিরুদ্ধে কুৎসা, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুলেই নানান কথা শুনতে হয়। দারুণরকম মানসিক পীড়ন চলতে থাকে। এই অবস্থায় আনজেরা যখন ভাবছে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে অন্য কোথাও কিংবা আত্মহননের পথ বেছে নেবে তখন হঠাৎ একদিন শিয়ালুর কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। আনজেরা আর ওর বাবা আইয়ুব আলী দুজনেই এক বাক্যে রাজি হয়ে যায়। বয়সের ব্যবধান অন্তত তখনকার পরিস্থিতিতে কোনো ফ্যাক্টর ছিল না। কেননা তখন আনজেরার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল নিরাপত্তা। বিশেষ করে ধর্ষণের ঘটনার পর পরিবারের সবাই ছিল আতঙ্কগ্রস্ত। যেহেতু ওরা গ্রামের মাতবরের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছিল এবং গিয়েছিল থানা-পুলিশের কাছে, সেই 'অপরাধে' প্রভাবশালী ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে বারংবার হুমকি আসছিল যে, আবার নাকি আনজেরাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

শিয়ালুর সাথে আনজেরার বিয়ে হয়ে গেল। ঘর পেল মেয়েটি, পেল খাদ্য-বস্ত্র, সবচেয়ে বড় কথা পেল নিরাপত্তা। ধর্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও 'চরিত্রহীনা' বলে যার নামে কুৎসা রটেছিল, সে তো তবু এই সমাজে একজনের স্ত্রীর মর্যাদা পেল! হোক না কেন লোকটার বয়স বেশি!

আনজেরার কাহিনী শোনার পর ওদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি। ইতোমধ্যে বিকেল নেমেছে। শিয়ালু, রাজু আর আমি ফিরে চলেছি পায়রাবন্দ বাজারের দিকে। এখানে পথ একটু এবড়োথেবড়ো, কিছুটা জায়গা হেঁটে যাবার পর আমরা সাইকেলে চাপব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজু হাঁটছে সামনে। পেছনে শিয়ালু চাচা আর আমি, পাশাপাশি। তিনি যেন কিছু বলতে চান। বুঝতে পারি উসখুস করছেন।

: কিছু বলবেন?

শিয়ালু চাচা আমার সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রাখেন, প্রশ্ন করেন, 'আনজেরার ঘটনা তো নিজেই শুনলেন! তা বলুন তো আমি কি ওকে বিয়ে করে ঠিক করি নি? বিয়ে না করলে এতদিন কোথায় যেত মেয়েটি? বাঁচত না মরত?'

কী জবাব দেব? আমি বহুবিবাহ সমর্থন করি না, কিন্তু এই বৃদ্ধ যে-ঘটনাটি ঘটিয়েছেন তাতে তো তাঁকে আমার কাছে বিরাট কিছু মনে হচ্ছে। আসলেই তো, ঐ বিপদের মুহূর্তে শিয়ালু এগিয়ে না এলে এতদিনে কেমনতরো ভাগ্যবরণ করত আনজেরা? ভেসে যেত কোথায়!

: কথা বলেন না কেন? শিয়ালু চাচা আবারও প্রশ্ন করেন।

আমি বলি : আপনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন চাচা।

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। নিজের বাড়িতে, যেখানে রয়েছে তার তিন বউ, সেখানে তো খুব হম্বিতম্বি করছিলেন শিয়ালু। গালি দিচ্ছিলেন, কিল মারছিলেন। অথচ আনজেরার কাছে আসবার পর হয়ে উঠলেন তিনি অন্যরকম। গ্রাম কিংবা শহরসমাজে আর সব একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি যে বড় বউয়ের চেয়ে ছোট বউয়ের ওপর টান একটুখানি বেশি, কিন্তু এক্ষেত্রেও কি ব্যাপারটা তা-ই? শিয়ালু চাচা তো আনজেরার কাছে হয়ে উঠেছিলেন বেড়ালের মতো। কথাবার্তা আর আচরণে ছিল মিনমিনে এবং ন্যাওটা ন্যাওটা ভাব।

ব্যাপারটা খোলাসা হতে চাই। প্রশ্ন করি : শিয়ালু চাচা, নিজের বাড়িতে তিন বউয়ের কাছে আপনি ছিলেন যেন বাঘ, কিন্তু আনজেরার সামনে তো তেমন দেখলাম না? যেন একেবারে পানি হয়ে গেলেন!

শিয়ালু চাচা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কথা বললেন না কিছুক্ষণ। ভাবলাম তাঁকে কি আমি আহত করেছি? বললাম, কিছু মনে করবেন না চাচা, ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল, তাই জানতে চাইলাম। আপত্তি থাকলে থাক, বলার দরকার নেই।

শিয়ালু চাচা দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়ালাম আমিও। সাইকেলের হ্যান্ডেলে ভর দিয়ে তিনি সামনে ঝুঁকলেন। যেন কোনো গোপন কথা বলবেন এ-রকম ভঙ্গিতে কাছে টেনে আনলেন মুখ। বললেন ব্যাপারটা আপনি বোঝেননি, না?

আমি মাথা নাড়ি। কালো ভাঙা এবং অসংখ্য ভাঁজপড়া গণ্ডে বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে তিনি ফিসফিসানির মতো করে বললেন, 'বাপুহে, মেয়েটা তো বড় দুঃখী। একটুখানি রাগ করে কথা বললে চোখে পানি এসে যায় ... আমার তখন খুব খারাপ লাগে।'

একটুখানি থামলেন ৬০ বছরের বৃদ্ধ। মুখে-লেপা বিচিত্র হাসিটুকু হঠাৎ উবে গেল। চাপা অথচ কঠোর কণ্ঠস্বরে আবার বলে উঠলেন তিনি, 'রেপোটার সাইব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে করেই তো আমি ওর সাথে নরম ব্যবহার করি। ও যেন কখনো ভাবতে না পারে যে ইজ্জত-হারানো মেয়েটাকে আমি করুণা করছি।'

নাসিরুদ্দিন মিয়া, লোকে যাকে পশুর নামে ডাকে, ছেলে-বুড়ো সবাই যাকে নিয়ে করে কৌতুক, পেছনে কথা বলে বেড়ায় নানানটা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তার মুখে এই ভাষ্য শুনে আমি বিস্মিত, তাকিয়ে থাকি তাঁর মুখের দিকে।

ইতোমধ্যে রাজু অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে। সে উচ্চকণ্ঠে ডাক দেয়, 'দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যেন আপনারা! আসেন, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে ...।'

আনজেরা যেমন গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মোড়ল, মাতবরদের কাছে নির্যাতনের বিচার পায়নি, বরং উল্টো কলঙ্ক রটনা করা হয়েছে তার নামে, তেমনটি ঘটেছে পাখীরনের ক্ষেত্রেও। শুধু গ্রামপ্রধানদের কাছে নয়, থানা-পুলিশের কাছেও গিয়েছিল পাখীরনের স্বামী আব্দুল বারেক। ব্যর্থ হয়েছে। এজাহার দেওয়া সত্ত্বেও ধর্ষণকারী গ্রেফতার হয়নি, পুলিশি তদন্তের নামে হয়েছে প্রহসন।

২৮ বছর বয়সের আব্দুল বারেক একজন ক্ষেতমজুর। নিজস্ব জমি নেই, নেই গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি কিংবা অন্য কোনো সম্পদ। বাড়ি বলতে একখানা বেড়াফুটো খড়ের ঘর, তা-ও অন্যের জমির ওপর তোলা। বারেক ধান রোপণ কিংবা কাটা মাড়াইয়ের মৌসুমে বিভিন্ন গ্রামে কামলা খাটতে যায়, অতি সামান্য উপার্জনে কোনোরকমে চলে যায় 'সংসার'। ওদের একটিমাত্র সন্তান, বয়স এখন প্রায় ৮ মাস।

বছর দুয়েক আগের ঘটনা। রোজার মাস। বারেক গিয়েছিল পাশের গ্রামে মজুরি খাটতে। এক লোক এসে খবর দিল, কাজ করতে করতে বারেক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, পাখীরনকে যেতে বলেছে এক্ষুনি।

তখন ইফতারির সময়। রোজাভঙ্গের জন্যে পাখীরন খুদ ভাজছিল। এই সময়ে স্বামীর দুঃসংবাদ। সব ফেলে রেখে সেই সংবাদবাহকের সাথে ছুট দেয় পাখীরন। কিন্তু আসলে অসুস্থতার খবরটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। পথের ধারে ওত পেতে ছিল ধর্ষণকারী সেই একই ব্যক্তি যে আনজেরারও ইজ্জত লুটেছিল। অথচ প্রভাবশালী। দুষ্কর্মের সঙ্গী তার অনেক। টাকা-পয়সার জোরও রয়েছে।

সারাদিন পরিশ্রম সেরে ঘরে ফিরে আসে বারেক। কিন্তু স্ত্রী নেই। পাশের বাড়ির মহিলা যখন জানালো যে, বারেকের অসুস্থতার খবর পেয়ে পাখীরন ইফতারি ফেলে দৌড় দিয়েছে, তখন বারেক যেন আকাশ থেকে পড়ল।

সর্বনাশের ইঙ্গিত পায় বারেক। ছুটে যায় বাইরে, পথের উপর। পাগলের মতো সে দৌড়াচ্ছে আর পাখীরনের নাম ধরে চিৎকার করছে। ইফতারির পর ক্লান্ত গ্রামের মানুষ, মাগরিবের নামাজ পড়ছে কেউ-কেউ, এ-সময় বারেকের গগনবিদারী চিৎকারে তাদের আত্মাও বুঝি কেঁপে ওঠে।

লণ্ঠন কিংবা কুপিহাতে বেরিয়ে আসে কেউ-কেউ। তারপর খোঁজ আর খোঁজ। কয়েক ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয় পাখীরনকে, অজ্ঞান অবস্থায়। বারেক তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসে ঘরে। স্ত্রীকে সুস্থ করে তোলে নিজের হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেবাযত্নে। তারপর সারারাত, গ্রামের অতি সহজ-সরল এবং অসহায় এক দম্পতি, গলা জড়াজড়ি, হু হু করে কাঁদে। 'আল্লা, তুমি এর বিচার করো আল্লা।'

মোড়ল মাতবরের কাছে বিচার দেয় প্রথমে। কিন্তু দেখা যায়, শালিস বৈঠকে ধর্ষণকারীকে ডাকার সাহস পর্যন্ত তাদের নেই। পরে গ্রামের কয়েকজন যুবকের পরামর্শে বারেক তার স্ত্রীর টিপসই দেওয়া লিখিত অভিযোগ নিয়ে যায় থানায়। সেখানেও ফললাভ হয়নি। পরে প্রভাবশালী-পক্ষ বারেকের বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা দায়ের করে।

পায়রাবন্দ সফরকালে বারেক এবং পাখীরনের সাথে দেখা হলো। বারেক চোখের জলের সাথে বলল, 'এই দুনিয়ার মানুষের কাছে আমরা বিচার পাব না, বিচার দিয়েছি আল্লার কাছে।'

বারেক আর পাখীরন যেমন অসহায়, আল্লাহর বিচারের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি শুক্নীবালা এখন ভগবানের কৃপার জন্যে অপেক্ষা করছে।

পায়রাবন্দের জয়রামপুর গ্রামে তার বাড়ি। শুক্নীবালা নাম, কিন্তু গ্রামের লোকজনদের কাছে সে 'শকুনী' নামে পরিচিতা। সামাজিকভাবে দারুণ নির্যাতিতা মেয়েটি বিচার পায়নি, স্ত্রীর মর্যাদা এবং সম্পত্তির অধিকার পায়নি, বরং 'শকুনী' নাম পেয়েছে। তবে হ্যাঁ, একজন ইউপি মেম্বারের 'অনুগ্রহে' সান্ত্বনা হিসেবে পেয়েছে সে দুস্থ মাতার একখানা কার্ড। অনিয়মিতভাবে কিছু গম পায়। দেবেন মেম্বারের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে।

শুক্নীবালার বয়স এখন প্রায় ৩৫ বছর। যৌবনে তার বিয়ে হয় নিকুঞ্জ বৈরাগীর সাথে, কিন্তু কদিন বাদে অজ্ঞাত রোগে ভুগে মারা যায় স্বামী।

বিধবা শুক্নী, সহায়-সম্বলহীনা, পেট চলে তার কীভাবে? আর, বয়সটাও এমন যে একা ঘরে থাকা যায় না। চারিদিকে লোভের চোখ, তার সর্বনাশের জন্যে যেন একশ্রেণীর যুবক প্রস্তুত। দিনের বেলা শিস, এর-ওর চোখের ইশারা, কেউ পকেট থেকে টাকা বের করে দেখায়। আর রাতের বেলা টোকা পড়ে দুয়ারে, বেড়া কাটতে চায় কেউ। অজস্র শকুন যেন শুকনীকে খাবলে খাবে।

ক্ষুধা এবং নিরাপত্তার কারণে শুকনী আশ্রয় নেয় গ্রামের এক অবস্থাপন্নের বাড়িতে। খাবার পাবে, বছরে একজোড়া শাড়ি পাবে, তার বদলে ঝিয়ের কাজ করবে। আশ্রয়দাতা শুধু অবস্থাপন্ন নয়, প্রভাবশালীও। নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো অন্তত।

কিন্তু রক্ষক হলো ভক্ষক। কিছুদিন বাদে শুক্নী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল। ব্যাপারটি গ্রামে জানাজানি হয়ে যাবার পর চাপের মুখে শুক্নীকে বিয়ে করতে বাধ্য হলো গৃহকর্তা। কিছুদিন বাদে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল মেয়েটি।

মেয়ে জন্মালে হয়তো ঘটনাটি অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু যেহেতু হলো পুত্র সন্তান, প্রশ্ন দাঁড়ালো স্বামীর অবর্তমানে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে। গৃহকর্তার স্ত্রীর ছেলে নেই, তিনটি মেয়ে, সেক্ষেত্রে আইনমতে ভবিষ্যতে সম্পত্তির মালিক হবে শুক্নীর এই ছেলেটি। প্রমাদ গুনল সবাই। বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতন শুরু হলো। শেষে, একদিন পুত্রসন্তানসহ বিতাড়িত হলো সে স্বামীর বাড়ি থেকে।

গ্রামের অনেকেই শুক্নীর পক্ষ নিল। শুক্নী, যদিও নিরক্ষর, লোকজনের পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতায় স্বামীর কাছে উকিল নোটিস পাঠাল। কাজ হলো না। গ্রাম-সালিস বসাল, তা-ও ব্যর্থ হলো। শেষে দায়ের হলো মামলা, মিঠাপুকুর আদালতে। শুক্নী এ-রকম রায় পেল যে : সে প্রতিমাসে ৬শ টাকা করে পাবে। ৫শ টাকা নিজের খোরপোশ বাবদ, বাকি ১শ ছেলেটির জন্যে।

এই রায়ের বিরুদ্ধে অপরপক্ষ আপিল করল। তখন চলছিল এরশাদবিরোধী আন্দোলন। আইনজীবীদের আদালত বর্জন। শুক্নী জানল না মামলার তারিখ। একতরফা রায় পেল আপিলকারী। ফলে ঐ মাসোহারা থেকেও বঞ্চিত হলো শুক্নী।

শুনলাম শুক্নীর মামলা পরিচালনায় সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের স্থানীয় শাখা। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থাৎ আপিলকারী একতরফা রায় পাবার পর, তারা আর কোনো আইন-পদক্ষেপ নেয়নি। শুক্নী এখন দেবেন মেম্বারের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করছে। ছেলেটার বয়স হয়েছে ৪ বছর।

মামলার যা রায় হয়েছে তা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই, থাকার কথাও নয়। বিচারকের রায়-ই চূড়ান্ত। আমি শুক্নীবালার ভাগ্য-বিড়ম্বনার কাহিনী পাঠকদের সমীপে তুলে ধরলাম শুধু গ্রামীণ পরিস্থিতি আর মানুষের অসহায়ত্ব কী-রকম, তা-ই জানাবার জন্যে।

বিশেষ করে একটি ব্যাপার আমাকে খুব ব্যথিত করেছে, তা হলো : আপিলকারী যখন একতরফা রায় পেল, শুক্নীর মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জয়লাভ করল, সে সংবাদ শোনার পর মেয়েটি কাঁদছিল আর ঠিক একই সময়ে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় মাইকযোগে প্রচার করা হচ্ছিল একটি গণভোজের সংবাদ। ঘোষণাকারী বলছিল, মিথ্যা মামলায় অমুকের জয় হয়েছে ... এ উপলক্ষে অমুক দিন অমুকের বাড়িতে গণ খাওয়া-দাওয়া হবে ... ইত্যাদি ... ।

হ্যাঁ, সে গণভোজ হয়েছে। বড় মাছ, খাসি ছাড়াও সেখানে আয়োজন ছিল লুচি, মিষ্টি, দৈ ইত্যাদির। হিন্দু-মুসলমান, দরিদ্র-অবস্থাপন্ন, টাউট-প্রভাবশালী অনেকেই সেই ভূরিভোজে অংশ নেন। এই ঘটনাটি আমার কাছে চরম এক নিষ্ঠুরতা মনে হয়েছে। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এক নারী, নাহয় সে মামলায় হেরেই গেছে, তাই বলে মাইকযোগে প্রচার করে গণভোজের প্রয়োজন ছিল? কারা এর উদ্যোক্তা? প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের মানসিকতা কাজ করেছে এর পেছনে?

এক দুপুরে শুক্নীবালা রাজুর বাড়িতে হাজির। সঙ্গে তার সেই ছেলেটি। শুক্নী যেন কার কাছে শুনেছে যে আমি পায়রাবন্দের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কী সব আলাপ করছি, মানুষের 'দুঃখের কাহিনী' শুনছি আর 'ফটোক্' তুলছি। এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গরমেন্ট'কে জানানো হবে আর সাহায্য পাবে গরিব-দুঃখী মানুষ। না, পত্রিকা বোঝে না সে, জানে না এটা কী জিনিস, কী কাজ হয়, শুক্নী ভেবেছে আমি কোনো সরকারি লোক।

রাজুদের উঠোনে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে শুক্নী, বর্ণনা করে তার জীবন-কাহিনী।

একসময় সে আমার হাত ধরে, ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পায়ের ওপর। বলে সে, 'অপিচার সাইব, তোমরা মোক্ এ্যাক্না কতা দ্যাও। গরমেন্টোক্ যায়া মোর নালিশ জানাইমেন?' অর্থাৎ সে বলছে, 'অফিসার সাহেব, আপনি আমাকে কথা দিন, সরকারকে গিয়ে আমার নালিশ আপনি জানাবেন তো?'

কোন্ দল রাষ্ট্রক্ষমতায়, শুক্নীবালা জানে না। রাষ্ট্রপ্রধান কে, তা-ও সে জানে না। কিন্তু তবু অজ্ঞাত-অদৃশ্য 'গরমেন্ট' (অর্থাৎ সরকার)-এর ওপর বিশ্বাস রয়েছে তার এবং এখনও তার বদ্ধমূল ধারণা : তার কথিত 'গরমেন্ট' সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

কী সাহায্য চায় শুক্নীবালা? জানতে চাই। মাথা এবং হাত দু-ই নাড়ে সে। না, সে কোনো অর্থসাহায্য চায় না, খাদ্য চায় না, বস্ত্র চায় না, সে চায় তার সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার।

AMARBOI.COM

নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা পায়রাবন্দের গ্রামগুলোতে। নোটবুকের পাতা ভরে ওঠে একের পর এক। দুঃখের কাহিনীর বুঝি শেষ নেই। ... বেগম রোকেয়া তো এই গ্রামেই জন্মেছিলেন, শতবর্ষ পেরুনোর পরেও কি অশিক্ষা কুশিক্ষা কুসংস্কার পর্দাপ্রথার যুগ শেষ হবে না? কতদিন নির্যাতিতা হবে এখানকার নারী? আরও কত অপেক্ষা? কার জন্যে অপেক্ষা?

এমন একটি ঘটনার কথা কি আপনারা বলতে পারেন না, যার মুখ থেকে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে? পায়রাবন্দে এমন কেউ নেই? অন্তত একজন? গ্রামের যুবক-বন্ধুদের জিজ্ঞেস করি। তাদের একজন আমাকে আকলিমার কথা জানায়। বিরাহিমপুর গ্রামে তার বাড়ি।

আকলিমার বয়স যখন ১০ বছর, পিতার আর্থিক দৈন্যদশার কারণে রংপুর শহরে এক টেক্সটাইল মিলে শ্রমিকের কাজ জুটিয়ে নেয় সে। বাবা-মা-ভাই-বোন মিলিয়ে পরিবারে মোট সদস্যসংখ্যা ১২, কিন্তু জমিজমা নেই। পিতা দিনমজুরি করে, বলা বাহুল্য সামান্য উপার্জন। শহরে এসে চাকরি নেবার মূল কারণ : বাবাকে সাহায্য করা।

মিলের ম্যানেজারের সাথে আকলিমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লোকটি তাকে প্রথম দিকে 'বেটি বেটি মা মা' ডাকত। পরে আকলিমা সাবালিকা হবার পর সম্পর্ক দাঁড়ায় অন্যরকম।

আকলিমার ভাষ্য অনুসারে : লোকটি একদিন জোরপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। বিয়ের জন্যে চাপ দেয় আকলিমা। প্রথম প্রথম আপত্তি তুললেও পরবর্তীতে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। যৌতুক ধার্য হয় ১৩ হাজার টাকা। আকলিমা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয় থেকে প্রতিমাসে ১শ টাকা করে সঞ্চয় করত, তা থেকে কিছু টাকা স্বামীকে (যৌতুক) দেয়, কিছু থাকে বাকি। মাসে মাসে পরিশোধ করা হবে এ-রকম কথা হয়।

বিয়ের পর সন্তান হয় ১টি, মেয়ে। কিন্তু সংসারে সুখশান্তি ছিল না। কথায় কথায় স্বামী মারধর করত আর ছিল সতীনের অত্যাচার। আকলিমা বলে, 'বিয়ের আগে শুনেছিলাম আমার স্বামীর আরেকটা বিয়ে হয়েছিল, তাকে অনেক আগে নাকি তালাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু না, আমাদের বিয়ে হয়ে যাবার পর দেখলাম, তালাক হয়নি, সে দীর্ঘদিন বাপের বাড়িতে ছিল।'

সতীন ছিল বড্ড বদমেজাজি। অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করত, মেয়েটিকে বলত জারজ। স্বামীটিও চালাতো দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। অবশেষে একদিন তিন তালাক উচ্চারণ করল লোকটি। শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে এলো আকলিমা। এখানেই কিছু একটা কাজ করবে সে।

ন'বছর থেকে পায়রাবন্দেই আছে আকলিমা। আর বিয়ে করেনি। প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু সে রাজি হয়নি। ভাইবোনগুলো পড়ছে, তাদের মানুষ করে তুলতে হবে, এই তার বর্তমানের চিন্তাভাবনা।

দু বছর আগেও 'নিজেরা করি' (এনজিও)-র গ্রুপ সদস্যা ছিল সে। সঞ্চয়ের টাকা তোলা ও গ্রামের মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করত। এখন সে-কাজের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। আকলিমা এখন রংপুরের তাজহাট থেকে বিভিন্ন ভেষজ ওষুধ এনে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে, মাসিক আয় হয় ৮শ থেকে ১ হাজার টাকা। অবসর সময়ে সেলাইয়ের কাজ করে, তাতেও কিছু আয় হয়। বাড়িতে হাঁস-মুরগি পুষছে কিছু।

সামাজিক বিভিন্ন বিষয় ব্যাপার সম্পর্কে সে জানে। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছে, শুনেছে জাতির পিতা শেখ মজিবর, আর তারও পরে 'প্রেসিডেন' জিয়াউর রহমান কীভাবে গুলিতে নিহত হন। নিজগ্রামে বিদ্যুৎ নেই, ঘরে কুপি জ্বলে, কিন্তু মাঝেমধ্যে পায়রাবন্দের কারও বাসাবাড়িতে টেলিভিশন দেখে। আকলিমা জানায়, 'টিবি'র ধারাবাহিক নাটক নাকি তার খুব প্রিয়। কথায় কথায় বলল, সে নাকি 'বিন্‌পি পার্টির' (বিএনপি) সমর্থক, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দৈনিক ৩০/৪০ টাকার বিনিময়ে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে 'এলেক্‌শনের কাজ' করেছে। খালেদা জিয়াকে তার খুব পছন্দ। বলে, 'বাপ্‌রে, কী সুন্দোর ধওলা টকটকা বেটিছাওয়া। খালি দেখি থাইকপার মনায়।' অর্থাৎ 'বাপরে, কী সুন্দোর ফর্সা টকটকে মহিলা! শুধু তাকে দেখতেই ইচ্ছে করে।'

না, এখনও সামনাসামনি দেখেনি, বেগম খালেদা জিয়াকে দেখেছে সে টেলিভিশনের পর্দায়।

আকলিমা চলনে-বলনে চটপটে। 'নিজেরা করি'র কোনো অনুষ্ঠান হলে সেখানে হাজির থাকে, খুব হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতাও করে। কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ। 'নিজেরা করি' আয়োজিত ২৬ মার্চের ('৯২) একটি অনুষ্ঠানে শুনলাম, আকলিমা সমবেত মহিলাদের উদ্দেশে বলছে : 'আর আমরা পুরুষের হাতে মার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাব না, আর আমরা নির্যাতন সহ্য করব না। আসেন বোনেরা, এবার জাগেন, ... বাংলাদেশে এখন নারী-স্বাধীনতা কায়েম হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা ... শেখ হাসিনাও মহিলা' ... ইত্যাদি।

'নিজেরা করি'-র সাথে জড়িত হবার পর থেকে নিরক্ষর আকলিমা এখন বেশ কিছুটা সচেতন। সে সদর্পে পায়রাবন্দের পথে চলে, গ্রামে গ্রামে ঘোরে, কিন্তু এ-রকম চলাফেরা সত্ত্বেও তাকে ঘাঁটায় না কেউ। বিশেষ করে বছর দুয়েক আগে আকলিমা দুটি ঘটনা ঘটায়, তার পর থেকে ধর্মান্ধ কোনো মওলানাও তার চলন-বলন নিয়ে কটু মন্তব্য করতে সাহস পায় না। বরং লক্ষ করি, গ্রামের দুষ্ট যুবকেরা ভয় করে চলে তাকে।

শুনলাম, দু বছর আগের ঘটনা। এক যুবক আকলিমাকে দেখে শিস ছুড়েছিল। ছুটে গিয়ে তার নিতম্বে লাথি কষে মেয়েটি। 'হারামজাদা, তোর বোনের কাছে গিয়ে শিস দে।' তার পর থেকে যুবকটি আকলিমাকে দেখলেই উল্টোপথে হাঁটা দেয়।

আরেকজন যুবক, একদিন সন্ধ্যার পর, আকলিমা যখন বাড়ি ফিরছিল, পথের ধারে পাটক্ষেতে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। আকলিমা প্রথমে পায়ের স্যান্ডেল এবং স্যান্ডেল ছিঁড়ে যাবার পর গাছের ডাল ভেঙে ছেলেটিকে বেদম পেটায়। শেষে টুঁটি চেপে ধরে। প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণ গ্রামে রটে যাবার পর, আকলিমা হয়ে ওঠে 'ডাকাত মেয়ে'।

নিজের শক্তিতে নিজের নিরাপত্তা গড়েছে আকলিমা। পায়রাবন্দের ঘরে ঘরে যেখানে নারীনির্যাতন, যৌতুক-পীড়ন, ধর্ষণ, সম্পত্তির অধিকার-বঞ্চনা তথা নিরাপত্তাহীনতা, সেখানে আকলিমা মুক্ত স্বাধীন।

আমি ভাবি, পায়রাবন্দের শত শত রীনা বেগম, আনজেরা, পাখীরন, শুক্নীবালা—এরা যদি আকলিমার মতো প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারত! ... কিন্তু এজন্যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন, দরকার নারীশিক্ষা সচেতনতা। শুধু তা-ই নয়, বিধবা এবং স্বামী-পরিত্যক্তা, যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারায় যারা স্বামীর বাড়িতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কিংবা বছরের পর বছর ধরে পড়ে আছে পিতৃগৃহে, তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের আয়ে নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত শুধু পায়রাবন্দ কেন বাংলাদেশের কোনো শহর বা গ্রামে নারীদের মুক্তি নেই।

৩

হাওয়া বিবির সাথে ৭ বছর আগে আমার পরিচয়। বিরাহিমপুর গ্রামে তার বাড়ি। এখন বয়স হবে প্রায় ৪৫ বছর।

'গ্রাম সমাজে নারী'-বিষয়ক প্রতিবেদনের জরিপ কাজ চলছিল, আমার সহকারীরা কাজ করছিল, আমিও বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিভিন্ন মহিলার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম, সে সময় হাওয়া বিবির সাথে প্রথম পরিচয়। পরে 'সংবাদ'-এ তার সচিত্র কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র ৬ বছর, অর্থাৎ পুতুল খেলার বয়সে হাওয়ার প্রথম বিয়ে হয়। স্বামীর নাম ছিল মোসলেম। কিন্তু 'ভয়ে' সে স্বামীর বাড়িতে যায়নি। 'বউ ঘরে আসে না', 'বেয়াদপ বেত্তমিজ মেয়ে' এসব কারণে ২২ বছরের যুবক মোসলেম তালাক দেয় তাকে।

এরপর বিয়ে হয় রশিদ মিয়ার সাথে। যৌতুকের দাবি ৫শ টাকা। পরিশোধ করতে না পারায় আবার তালাকপ্রাপ্তা হয় সে। এভাবে একে একে ৪টি বিয়ে হলো, কিন্তু কোথাও সে ঘর করতে পারল না। ঐ একই কারণ। যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে পারে না গরিব পিতা।

শেষে ৭০ বছর বয়সের এক বৃদ্ধের সাথে ওর বিয়ে হলো। এখানে কোনো যৌতুক লাগেনি। অসুস্থ এবং মৃতপ্রায় বৃদ্ধের সেবা করবার জন্যে একজন দাসীর প্রয়োজন ছিল, আলতাফ মিয়া তা-ই পায়। তবে হাওয়ার আশা ছিল স্বামী মারা গেলে পরে কিছু সম্পত্তি অন্তত পাবে। পায়নি, বরং কপালে জুটেছে লাঞ্ছনা। বুড়োর ছেলেরা তাকে গলাধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দেয়।

৭ বছর আগে পায়রাবন্দ সফরকালে একটি বাঁশঝাড়ের ভেতর একটুখানি ফাঁকা জায়গায় হাওয়া বিবিকে প্রথমে দেখি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া চেহারা, একবেলা খায় তো দুবেলা উপোস। কোলে ১ বছর বয়সের একটি মেয়ে, একফোঁটা দুধ পায় না। এই সাক্ষাতের মাত্র কিছুদিন আগে সে মৃত স্বামী আলতাফ মিয়ার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এই সময়টাতে একেই পেটে ক্ষুধার জ্বালা, তার ওপর ছিল পাড়া-প্রতিবেশীর ছড়ানো নানা গঞ্জনা। মেয়েটি কার, সেই প্রশ্ন করে সবাই। আলতাফ ছিল মরার মতো, রোগশয্যাশায়ী, তখন এই মেয়ে হাওয়া বিবির পেটে এলো কী করে? হাওয়া তখন স্বামীর সম্পত্তি-বঞ্চিত—তা নিয়ে কারও উচ্চবাচ্য নেই, হাওয়া তখন অনাহারী অথচ তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই, কোলের শিশু দুধ পাচ্ছে না তাতে কারও কিছু আসে যায় না। অথচ সন্তানধারণের ব্যাপারটি যেন অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সবার কাছে! তাকে (সে-সময়) একরকম একঘরে করে রাখা হয়।

'৯২-এর মার্চে পায়রাবন্দে গিয়ে রাজুকে বললাম, হাওয়া বিবির কথা মনে আছে আপনার? তার সাথে একবার দেখা করতে চাই। সে-সময় অবস্থা যা দেখেছিলাম তাতে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে কি সে? আর তার সেই মেয়েটিরই-বা খবর কী?

রাজু বলল, খোঁজ করে দেখি পাওয়া যায় কি না।

না, মরেনি। হাওয়া বিবি বেঁচে আছে। তার সেই মেয়েটিও। এখন বয়স ৮ বছর। মক্তবে পড়ে। কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করায়নি এখনও।

: কেন? মেয়েকে স্কুলে দেননি কেন?

হাওয়া বিবি কথা বলে না, দাঁড়িয়ে থাকে নতমুখে। দ্বিতীয়বারের মতো প্রশ্নটি করলে মুখ তোলে সে। চোখের কোণে অশ্রু, গড়িয়ে পড়ো-পড়ো। আমি অপ্রস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাই। সরিয়ে নিই চোখ। উপস্থিত একজন প্রশ্নের জবাব দেয় : 'ওর মেয়ে স্কুলে যাবে কী করে? কার জন্য তা-ই নিয়ে প্রশ্ন তোলে, খ্যাপায়।' আমি অনুতপ্ত হই। ব্যাপারটি আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদল করি।

মেয়েটাকে নিয়ে মানসিকভাবে কষ্টে আছে হাওয়া বিবি। মেয়ে বেড়ে উঠছে, কিন্তু পিতৃপরিচয়গত কারণে স্কুলে দেওয়া যাচ্ছে না। এরপর যখন বিয়ে দিতে হবে, তখনই-বা কী হবে? এখন থেকেই উদ্বিগ্ন সে।

তবে হাওয়া বিবির সাথে দেখা হবার পর একটা ব্যাপার ভালো লাগল যে, বেঁচে থাকার প্রশ্নে সে পরাজিত হয়নি। নিজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে। 'নিজেরা করি'-র গ্রুপ-সদস্যা। গ্রামে ২২ জন মহিলা মিলে 'দল' গঠন করেছে, নিয়মিত সঞ্চয় করছে কিছু। হাওয়া বিবি গ্রামের এক অবস্থাপন্ন কৃষকের বাড়িতে এখন ধান ভানা কাপড় কাচাসহ বিভিন্ন কাজ করে, দৈনিক পায় আধসের চাল আর একবেলা খাবার। ঐ আধসের চাল থেকে একটু একটু করে জমায়, তা-ই বিক্রি করে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকা জমা দেয়।

৭ বছর আগে মরো-মরো অবস্থায় দেখেছিলাম হাওয়া বিবিকে। তখন ছিল তার পোড়া কালো চোয়াল-ভাঙা চক্ষু কোটরাগত এবং অনাহারী শরীর, পরনে ছিল ছিন্ন ময়লা শাড়ি। এখন স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, রং বেশ উজ্জ্বল, নতুন শাড়ি পরেছে, মেয়ের প্রসঙ্গ ভুলে যাবার পর এখন তার মুখে হাসি।

বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় হাওয়া বিবির সাথে। ৮/৯ মাইল দূরে রংপুর শহর, অথচ ৪৫ বছরের জীবনে সে কখনো ঐ শহর দেখেনি, এই পায়রাবন্দের কয়েকটি গ্রামের গণ্ডিতে তার জীবন, এটুকুই তার দেশ, এটুকুই তার পৃথিবী। ... প্রাইমারি স্কুলের চৌহদ্দিতে যেতে পারেনি যে-হাওয়া, মাত্র ছ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে যার, কৈশোরে যে পেয়েছে যুবক-স্বামী, আর যৌবনে পেয়েছে ৭০ বছরের বৃদ্ধ, সেই মেয়েটি নীরবে জ্বলল, পুড়ল, হজম করল গরল। সেখানে কোনো আনন্দ নেই, সেখানে কোনো স্বপ্ন নেই, চাওয়া-পাওয়া নেই। কলুর বলদের মতো জীবনের ঘানিটি সে টেনেই চলেছে। ... এবং বেঁচে আছে সেই হাওয়া বিবি।

হাওয়া বিবির মতো বহু বিধবা কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলা 'নিজেরা করি' নামের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার গ্রুপ-সদস্যা হয়েছে। ১১টি গ্রামে মহিলা গ্রুপ রয়েছে ৫৯টি, সদস্যাসংখ্যা ১১৮০, এ ছাড়াও পুরুষ গ্রুপ-সদস্যের সংখ্যা ৩৭০।

বেশ ক-বছর ধরে সংস্থাটি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন-সম্পর্কিত কার্যক্রম চালাচ্ছে, বেগম রোকেয়া স্কুলের পেছন দিকে একটুকরো জমি কিনে নিয়ে সেখানে তুলেছে পাকা এবং প্রাচীরঘেরা অফিসঘর। পুরুষ ও মহিলা মাঠকর্মীদের জন্যে সেখানে আবাসিক সুবিধাও রয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে কাজ করে থাকে ৯ জন পুরুষ ও মহিলাকর্মী। সদস্য-সদস্যাদের কাছে পুরুষেরা 'ভাই' ও মেয়েরা 'বোন' হিসেবে পরিচিত। ভেতর-গ্রামে যাবার জন্যে ভাইদের রয়েছে সাইকেল, কিন্তু বোনেরা রিকশায় কিংবা পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামে যায়। গ্রাম উন্নয়ন-তৎপরতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালানোর কাজে প্রতিবছর বহু অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও 'নিজেরা করি' কী-কারণে যে এখানে মহিলা-কর্মীদের জন্যে দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা করেনি, কে জানে!

মেয়েদের নিয়ে গ্রুপ গঠন আর সঞ্চয় কার্যক্রমটি পায়রাবন্দে বেশ ভালোই চলছে। কিন্তু ইউনিয়নের ২১টি মৌজার সর্বত্র এখনও গ্রুপ তৈরি হয়নি, আর এলাকার সকল দুঃস্থ মহিলা (বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা) গ্রুপের অধীনে আসেনি। মেয়ে বা পুরুষ কারও জন্যেই গণশিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম নেই। 'নিজেরা করি'-র বহু গ্রুপ-সদস্যার সাথে কথা বলে বোঝা গেল : দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটির সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশই বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপারে সচেতন নয়। যেমন কেউ-কেউ তাদের সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকা তুলে নিয়ে যৌতুক হিসেবে তুলে দিয়েছে স্বামীর হাতে, কেউবা বাহুল্য ব্যয় করেছে। পায়রাবন্দের গ্রাম সফরকালে এমন একটি ঘটনাও আমি শুনিনি যেখানে বাল্যবিবাহের মতো একটি মারাত্মক ক্ষতিকর তথা বেআইনি কাজে 'নিজেরা করি'র পক্ষ থেকে কোনো 'ভাই' কিংবা 'বোন' কেউ বাধা দিয়েছে। সরকার যে যৌতুক বিরোধী আইন করেছে, সে মেসেজটি পর্যন্ত অধিকাংশ গ্রুপ-সদস্য-সদস্যার কাছে পৌঁছেনি।

সবচেয়ে অবাক লাগল নিজেরা করি-র স্থানীয় অফিসে পায়রাবন্দের ওপর তেমন কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। ২১টি মৌজায় বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলার মোট সংখ্যা কত, মোট কতটি গ্রুপ গঠন করলে সবাই সংগঠনটির 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে'র আওতায় আসবে, এসব হিসেব করা হয়নি গত ৪/৫ বছরেও। এমনকি পায়রাবন্দের আয়তন, লোকসংখ্যা, পরিবার-সংখ্যা, পুরুষ কত, মহিলা কত, শিশু কত, শিক্ষিতের হার কেমন, এ ধরনের সাধারণ তথ্যগুলোও তাদের হাতে নেই। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, এলাকার চেহারা-সুরত সম্পর্কে অবগত না হয়েই 'উন্নয়নের' কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি।

বইটির দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে শহর থেকে ৯ মাইল দূরের এলাকা হলেও পায়রাবন্দ বিচিত্র একটি জনপদ। এখানে রয়েছে বাল্যবিবাহ, ঘরে ঘরে যৌতুকের আদান-প্রদান, বহুবিবাহ, নারী-নির্যাতন আর ন্যায্য অধিকার-বঞ্চনার হাজারো ঘটনা। অশিক্ষা-কুশিক্ষা কুসংস্কার কুপ্রথা এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে, দেখে-শুনে মনে হয় এখনও যেন সেই বেগম রোকেয়ার যুগে পড়ে আছে এখানকার নারীসমাজ। এই পরিস্থিতিতে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নামে কেবল গ্রুপ গঠন, সঞ্চয় গড়ে তোলা আর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুখের বক্তৃতায় কাজ হবে না। এজন্যে চাই ব্যাপকভিত্তিক কর্মতৎপরতা। অন্তত গণশিক্ষা কার্যক্রম চাই, কর্মসুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে প্রতিটি ঘরে গিয়ে বোঝাতে হবে, প্রয়োজনে আইন-সহায়তা দিতে হবে, বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্যে যেতে হবে ডাইরেক্ট অ্যাকশনে। একই গ্রামের আকলিমা যদি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্যে সচেতন হয়, হাওয়া বিবি গড়ে তোলে সঞ্চয়, কিন্তু এদের পাশে ৬ বছর বয়সের লাকির যদি বিয়ে হয়ে যায়, যৌতুকের কারণে হাসনা বানু বৃদ্ধের ঘর করে, পাখীরন ধর্ষিতা হয় আর শুক্নীবালা হয় অধিকারবঞ্চিত, তা হলে সামগ্রিকভাবে কি 'আর্থ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন' সম্ভব? 'নিজেরা করি' যখন পায়রাবন্দের পথে নেমেই পড়েছে তখন ঘর লেপে দোরগোড়ায় জঞ্জাল রাখা কেন? আধাআধি কাজ করে লাভ কী? সাফল্যই-বা কোথায়?

পায়রাবন্দে গ্রামীণ ব্যাংকের তৎপরতা রয়েছে। গ্রুপগুলো সঞ্চয় করে, দুঃস্থরা ঋণ পায়, পরিশোধও করে। ঋণ আদায় হয় ভালো। বিভিন্ন গ্রামে ঘোরার সময় বেশ কয়েকবার দেখতে পেলাম যে, ছাতা-মাথায় বোরখা-পরা মহিলা মাঠকর্মী বিভিন্ন বাড়ির আঙিনায় বসে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকা আদায় করছেন। কিন্তু সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির তৎপরতা তেমন চোখে পড়ল না। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় আমাকে বলেছিলেন যে, গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য বা সদস্যা যৌতুক আদান-প্রদান করলে সে ঋণ পায় না বরং যৌতুক ছাড়া বিয়ে করলে ঋণপ্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আরসব গ্রামের অবস্থা কী তা আমি শিকড় পর্যায়ে খতিয়ে দেখিনি, কিন্তু পায়রাবন্দে তাঁর বক্তব্যের সাথে প্রকৃত অবস্থার মিল পেলাম না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখেছি, গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়ে তার অংশবিশেষ থেকে 'যৌতুকের দাবি' মেটানো হয়েছে।

আমার মনে হয়েছে, পায়রাবন্দ ইউনিয়ন সদর কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে রোকেয়ার জন্মভিটা, স্কুল, হাটবাজার, সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা অফিস নির্মাণ করলে পর্যবেক্ষণ-কাজ ভালো চলতে পারত। স্থানীয় লোকজন অনেকেই এ-সম্পর্কিত দাবির কথা বললেন। পায়রাবন্দে গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ এখন বেশ খানিকটা দূর থেকে পরিচালিত হয়।

AMARBOI.COM

গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বেশ কয়েকজন রিকশা কিনেছে, ক্ষুদ্র ব্যবসা করছে কেউ, মহিলা-সদস্যরা ধানভানা ও গবাদি পশু পালন করছে। কিন্তু ২১টি মৌজায় মোট যে ভূমিহীন কৃষক ও দুঃস্থ নারী রয়েছে, ব্যাংকের ঋণসুবিধা পাচ্ছে তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

'ব্র্যাক'-এর গণশিক্ষা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন স্থানে সফল হয়েছে বলে শুনি। পায়রাবন্দের মতো অশিক্ষা-কুশিক্ষায় অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি এলাকায় তো গণশিক্ষার বেশি প্রয়োজন ছিল। অথচ এই সংস্থাটি এখানকার কোনো কোনো গ্রামে 'হাঁস-মুরগির উন্নয়ন'-সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাল্যবিবাহ-রোধ এবং যৌতুকবিরোধী মানসিকতা গঠন অর্থাৎ গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এখনও তাদের কোনো ভূমিকা নেই। আমি যখন পায়রাবন্দ পাকা সড়কের ধারে একটি বাড়িতে বসে সাড়ে ৭ মাসের শিশু-কন্যার সাথে কিশোর মুকুল মিয়ার বিয়ের কাহিনী শুনছিলাম আর তুলছিলাম ওদের ছবি; কিংবা যখন ইসলামপুর গ্রামে যৌতুক নিপীড়নের শিকার রীনা বেগমের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম; তখন দেখলাম মাথায় হেলমেট এবং কাঁধে ওড়না জড়ানো স্মার্ট যুবতীর হোন্ডা ফিফটি ধা ধা করে ছুটে যাচ্ছে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে। লোকজন বলল, এরা 'বেরাকের লোক।' অর্থাৎ ব্র্যাক-কর্মী। উন্নতজাতের হাঁস-মুরগি পালন-সম্প্রসারণের কাজ করে এরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়রাবন্দে সরকারের গণশিক্ষা কার্যক্রম নেই। প্রাইমারি স্কুলগুলোর দশা খুব জরাজীর্ণ। শিক্ষক-সংকট, আসবাবপত্র-সংকট। পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টিতেও নানা সমস্যা। সরকারি অনুদান অতি সামান্য।

শুনলাম, ঢাকাস্থ মিঠাপুকুর সমিতি মেধার ভিত্তিতে নবম ও দশম শ্রেণীর বেশ কজন ছাত্রীকে বৃত্তি দিয়ে থাকে। 'মহিলা ও উন্নয়ন কেন্দ্র' বৃত্তি দেয় ১৫ জন ছাত্রীকে। দেয় কিছু বই খাতা কলম চিরুনি সাবান গামছা এবং কিছু শাকসবজির বীজ। মালেকা বেগমের উদ্যোগে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের রংপুর শাখা কয়েক বছর আগে লেখাপড়া চালানোর জন্যে কয়েকজন গরিব ছাত্রীকে অর্থসাহায্য করেছিল, প্রকল্পটি এখন বন্ধ। তবে '৯১-এর মঙ্গা পরিস্থিতির সময় মহিলা পরিষদের রংপুর শাখা পায়রাবন্দের দুঃস্থ মাতাদের জন্যে বেশকিছু খাদ্যসাহায্য বিতরণ করে। মহিলা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো : বেগম রেকেয়ার পিতৃগৃহে ব্যবহৃত বেশকিছু তৈজসপত্র তারা সংগ্রহ করেছে। '৯২-এর মধ্য-অক্টোবরে সেগুলো ঢাকা নিয়ে আসা হয়। তৈজসপত্রগুলো ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে জাতীয় জাদুঘরে। এখানে একটি পৃথক 'রোকেয়ার কক্ষ' খোলার জন্যে মহিলা পরিষদ জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে বলবে।

AMARBOI.COM

গরিব ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্যে অর্থসাহায্যের প্রসঙ্গে রেবার কথা মনে পড়ে। মহিলা পরিষদ এই মেয়েটির জন্যেও মাসিক কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু ওর পড়া শেষ পর্যন্ত হয়নি। গার্লস স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী থাকা অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায়। এখন রংপুর শহরে থাকে।

রেবার বাবা ছিলেন ইয়াকুব আলী চৌধুরী। মারা গেছেন তিনি। শেষজীবনে ভিক্ষে করতেন। তার স্ত্রী মাজেদা সাবের (রেবার মা) খুঁজে-মেঙ্গে খেতেন। এখন চেয়ারম্যানের অনুগ্রহে একখানা ভিজিডি কার্ডের মালিক। অবশ্য গম মেলে না নিয়মিত।

বেগম রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ইয়াকুব আলী চৌধুরী। কর্ম-অক্ষম এই বৃদ্ধ তাঁর বাড়ির সামনে পথের ধারে বসে ভিক্ষে করছেন। সামনে একটি পাত্র, তাতে কিছু খুচরো পয়সা, এমনি একটি ছবি ১৫ বছর আগে 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়েছিল। ছবিটি নিয়ে হুলুস্থুল বেধে যায়। না, বৃদ্ধকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেননি কেউ; বরং আমার কৈফিয়ত তলব করেন তৎকালীন রংপুরের ডেপুটি কমিশনার। রংপুরে যে বেগম রোকেয়া কলেজ আছে তারই অধ্যক্ষার অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ 'শোকজ' নোটিস দেওয়া হয়। নোটিসের জবাব দেওয়া হয়নি, বরং সন্তোষদা (সংবাদ-এর সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ও প্রখ্যাত কলামিস্ট) নিজের লেখা একটি প্রতিবেদন প্রথম পাতায় মোটা বক্স করে ছাপলেন। তখন তিনি ছিলেন সংবাদ-এর বার্তা সম্পাদক।

অত্যন্ত কড়া ভাষায় লেখা প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর ওপর পর্যায় থেকে রংপুরের ডেপুটি কমিশনারের ওপর চাপ আসে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিবাদধ্বনিত করেন সাংবাদিক-বন্ধুগণ। পরবর্তীতে ডিসি সাহেব রংপুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংবাদিকদের চায়ের দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনুষ্ঠানিক শোকজ নোটিস প্রত্যাহার করেন, দুঃখ প্রকাশ করেন ঘটনাটির জন্যে।

বেগম রোকেয়া কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষা কী কারণে যে ডিসির কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, জানি না। বেগম রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ভিক্ষে করছেন এমন ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশে তাঁর কী এসে যায়? শুনেছি ঐ অভিযোগে তিনি নাকি বলেছিলেন যে, ছবি-প্রতিবেদন ছাপিয়ে বেগম রোকেয়ার পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে! অবাক কথা! ইয়াকুব আলী চৌধুরী বেঁচে থাকার তাগিদে পথের ধারে বসে ভিক্ষে করেন তাতে সমাজের কারও লজ্জা হয় না, অথচ প্রকৃত ঘটনা পত্রিকায় ছাপলেই মর্যাদাহানির প্রশ্ন আসে? আমি তো নির্মম অথচ সত্য একটি ঘটনাচিত্রই পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। আর পায়রাবন্দের শেষ জমিদার জহিরউদ্দিন আবু আলী সাহেবের আত্মজ মসিউজ্জামান সাবের তাঁর রচনায় তাঁদের পরিবারের পতনের কাহিনী নিজেই বর্ণনা করেছেন। বিবৃত করেছেন পিতার পরিণতির ইতিকথা। মসিউজ্জামানের তথ্যে দেখা যায়, বিরাট পারিবারিক বিপর্যয়ের মূলে ছিল প্রধানত মামলা-মোকদ্দমার অশুভ পরিণাম এবং অমোঘ নিয়তির প্রভাব। পিতার বহুবিবাহ ও বিলাসপ্রিয়তা সম্পর্কেও তিনি বলেছেন। আফতাবউদ্দিন মুন্সির পুঁথিতেও ভাগ্যাহত জমিদারের করুণ পরিণতির কাহিনী বর্ণনা রয়েছে। দারিদ্র্যপীড়িত জমিদার বাবু আলী জীবনের এক পর্যায়ে সামান্য সাহায্যের আশায় প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে মানুষের কাছে হাত পেতেছিলেন। আবু আলী চৌধুরী নিজের বাড়িঘরের আসবাবপত্র এমনকি দালানের ইটপাথর খুলেও বিক্রি করেছিলেন। জমিদারের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে অন্যত্র নির্মাণ করেছিলেন তিনি খড়ের ঘর।

এই ঘটনার কয়েক বছর পর, ইয়াকুব আলী চৌধুরী তখন মারা গেছেন, অর্থাভাবে রেবার লেখাপড়া বন্ধ হবার উপক্রম, তখন 'সংবাদ'-এ রেবার ছবি ও কাহিনী প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য ছিল : যে বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা ও জাগরণের অগ্রদূত, তাঁরই এক আত্মীয়া আজ অর্থাভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না।

আমার ধারণা ছিল, এই ছবি-কাহিনী পত্রিকায় ছাপা হলে পরে কোনো দানশীল ব্যক্তি হয়তো রেবার লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু না, সেই মুহূর্তে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বেশকিছু পরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম এলেন যখন পায়রাবন্দে, তাঁকে রেবার কথা বললাম। মালেকা বেগম রেবা এবং তার মা মাজেদা সাবেরের সাথে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন, কাহিনী শুনলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে রেবার লেখাপড়ার খরচ চালানো হবে।

সাহায্যের টাকা মাস কয়েক দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কিছুদিন বাদে পায়রাবন্দের এক যুবক-বন্ধু খবর দিল : রেবার বিয়ে হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রেবার মা মাজেদা সাবেরের সাথে '৯২-এর মার্চে দেখা হলো। পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, শরীর ভেঙে গেছে, চোখে দেখেন কম, বয়সের ভারে বেশ নুয়ে পড়েছেন। জানালেন তিনি তাঁর বর্তমান দুরবস্থার কথা। দুঃস্থ মাতার কার্ডে সামান্য যা গম মেলে তা একেই অনিয়মিত, তাতে আবার ওজন কম দেয়। শুধু গমে কুলোয় না বলে এখনও এর-ওর কাছে সাহায্যের হাত পাততে হয়। বড় ছেলে আবু জর্জেজ সাবের চৌধুরী আগে সাইকেল-মেকার ছিল, এখন পানের ব্যবসা করে। পাশাপাশি ঘর থাকলেও তার সংসার আলাদা, মাকে দেখে না। ছোট ছেলে মঞ্জুর সাবের চৌধুরী সেও ছিল সাইকেল-মেকার, মারা গেছে ক বছর আগে। এখন মাজেদা সাবেরের সাথে আছে তার বিধবা স্ত্রী এবং নাবালক তিনটি সন্তান। মাজেদা সাবেরের আরেক মেয়ে মনোয়ারা সাবের, ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার কারণে বছরখানেক আগে মারা গেছে সেও।

১৫ বছর আগে ভিক্ষারত অবস্থায় ইয়াকুব আলী চৌধুরীর ছবিটি যখন তুলি, তখন দুই ভাই আলেকজান্ডার সাবের চৌধুরী আর সোলায়মান সাবের চৌধুরীর সাথে পরিচয় হয়েছিল। এরা আবু আলী সাবেরের চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যার দুই পুত্র। রোকেয়ার আত্মীয়।

ওরা এখন কোথায়?

শুনলাম, পায়রাবন্দেই আছে এবং প্রথমজন সাইকেল মেরামত করে, দ্বিতীয়জন দর্জি। পরে অবশ্য দুজনের সাথেই দেখা হলো।

AMARBOI.COM

বহুদিন বাদে দেখা হলো রঞ্জিনা সাবেরের সাথে। বেগম রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভাই মসিউজ্জামান সাবের চৌধুরীর মেয়ে। বহু বছর আগে, যখন রঞ্জিনা কিশোরী, স্কুল ছাত্রী, প্রথম দেখা হয়েছিল। মসিউজ্জামান সাবের তখন বেঁচে ছিলেন।

মনে পড়ে, বেগম রোকেয়া এবং তাঁর পরিবারের কথা-কাহিনী শোনার জন্যে প্রথম যখন পায়রাবন্দে যাই, বৃদ্ধ মসিউজ্জামানের সাথে পরিচয় ঘটে। সে-সময় বয়স হয়েছিল ৬০-৬৫ বছর, তবু দেখতাম একখানা ভাঙা ঝরঝরে সাইকেলে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটছেন। ... পরিচয়ের পর তিনি আমাকে প্রায় জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে, আপ্যায়ন করেছিলেন এক গ্লাস শরবত দিয়ে। গ্লাস মুখে তুলতেই ঘ্রাণ পাই আতরের। প্রশ্নের চোখ তুললে মসিউজ্জামান জানান, এটা নাকি সাবের পরিবারের দীর্ঘদিনের নিয়ম। কোনো অতিথি এলে তাকে শরবত দেওয়া হয় এবং গ্লাসের মুখে মেখে দেওয়া হয় আতর।

যে-সময়ের কথা বলছি, তখন রঞ্জিনা সাবের ছিল কিশোরী। '৯২-তে বয়স তার ৩৫ বছর হলেও মনের জোর কমেনি। বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। বেগম রোকেয়ার ভাইয়ের মেয়ে রঞ্জিনা নিজ গ্রামের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রাখছে জেনে বেশ ভালো লাগল। পায়রাবন্দের অবস্থা যা তাতে এই মেয়েটির লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারত, হতে পারত বাল্যবিবাহ, কিংবা সে চলে যেতে পারত রংপুর শহরে অথবা অন্য কোথাও। কিন্তু তেমনটি হয়নি। রঞ্জিনা বলল, 'ফুপির স্বপ্ন ছিল বিরাট, আমি কি তার সামান্যটুকুও সার্থক করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারব না? নিশ্চয়ই পারব। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম শিক্ষকতা করব এবং অন্য কোথাও নয়, আমার কর্মক্ষেত্র বেছে নিলাম গ্রাম, আমাদের এই পায়রাবন্দ গ্রাম।'

'৭৪ সালে রঞ্জিনা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পায়। তার মানে ম্যাট্রিক পাস করার পরপর। শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা পায়রাবন্দ সফরে এসে রঞ্জিনার সাথে পরিচিত হন। তিনিই পরবর্তীতে তার চাকরিপ্রাপ্তির ব্যাপারে ভূমিকা রাখেন। অবশ্য রঞ্জিনা পরে কারমাইকেল কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে।

এই রঞ্জিনা সাবের, যেহেতু শিক্ষার আলো পেয়েছে, কিছুটা হলেও সামাজিকভাবে সচেতন, তাই সে যৌতুকপ্রথাটিকে মেনে নেয়নি। এ সম্পর্কে রঞ্জিনা বলে, 'জ্ঞান হবার পর থেকেই যৌতুকপ্রথা আমি ঘৃণা করি। তাই আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যৌতুক যদি কোনো ছেলে চায় তাকে আমি বিয়েই করব না।'

হ্যাঁ, তা-ই হয়েছে। রঞ্জিনার বয়স যখন ১৮ বছর, তখন এক কৃষক-সন্তান নাজমুল হক বুলুর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়েতে কোনোরকম যৌতুক আদান-প্রদান হয়নি। রঞ্জিনার ছোট বোন রেহেনা সাবের, বিয়ে হয়েছে এক কৃষক-যুবকের সাথে। তার বিয়েতেও যৌতুক দিতে হয়নি—টাকা অথবা সামগ্রীর আকারে।

যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করেছেন গ্রামের যুবক রাজু আহমেদ, জাহাঙ্গীর, এ-রকম হাতেগোনা কয়েকজন। রাজু, জাহাঙ্গীর, তাজুল এঁরা কৃষিজীবী, আমার বহু প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকারী। এঁরা আজকের যুবক, সামাজিকভাবে মোটামুটি সচেতন, যৌতুকপ্রথাকে ঘৃণা করে, পোষণ করে যৌতুকবিরোধী মনোভাব। কিন্তু পায়রাবন্দের গ্রামে যৌতুক বন্ধের ব্যাপারে অবদান রাখতে পারছে না। একেই এঁরা নিজ নিজ কাজকর্ম আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে সুসংগঠিত নয়।

AMARBOI.COM

মাজেদা সাবের, রঞ্জিনা সাবের, আলেকজান্ডার, সোলায়মান, এঁরা পায়রাবন্দেই আছেন। আপনি কখনো রোকেয়ার জন্মস্থান পরিদর্শনে গেলে দেখা পাবেন ওদের ঘরে স্কুলে পথে কিংবা বাজারে। এ ছাড়াও রোকেয়ার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় দাবি করেন ৪টি পরিবার। এঁরা স্কুল-শিক্ষক আব্দুল হালিম চৌধুরী, ক্ষুদ্র কৃষক দুলু, দিনমজুর মতিন চৌধুরী ও আকমল হোসেন। এঁরা নাকি রোকেয়ার পিতার ভাই আবু হাশেমের বংশধর। অবশ্য গ্রামের অনেকেই তা স্বীকার করেন না।

আমি বেগম রোকেয়ার জীবনী লিখতে বসিনি। সাবের পরিবারের কাহিনী-বর্ণনাও আমার এই বইটির পরিকল্পনায় ছিল না। যে পায়রাবন্দে রোকেয়া জন্ম নিয়েছিলেন সেই এলাকাটির আজকের অবস্থা কী, মানুষজন কীভাবে জীবনযাপন করছে, বাল্যবিবাহ যৌতুক নারী নির্যাতন কী-রকম, অর্থাৎ গোটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। এ ছাড়াও পায়রাবন্দের বেশকিছু চরিত্র আমার মনে দাগ কাটে, গল্পের আকারে বলতে চেয়েছিলাম তাদের কথা-কাহিনী। কিন্তু এ পাণ্ডুলিপি তৈরির একপর্যায়ে পায়রাবন্দের যুবকদের কেউ-কেউ বললেন, রোকেয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর পরিবার এবং সে-সময়কার কিছু কথা অন্তত বইটিতে থাকা দরকার। আজকের পায়রাবন্দের শিকড়-সংবাদ পড়তে গিয়ে রোকেয়া এবং তাঁর পরিবারের কাহিনী জানার ব্যাপারেও কোনো পাঠক হয়তো কৌতূহলী হবেন।

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, শিক্ষাবিদ মোতাহার হোসেন সুফী, মুহম্মদ শামসুল আলম, হাসিনা জোয়ার্দার-সফিউদ্দিন জোয়ার্দারসহ অনেকে বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বহু আগেই বিস্তারিত লিখেছেন। মোতাহার হোসেন সুফীর 'বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য' (প্রকাশকাল জুলাই '৮৬), মুহম্মদ শামসুল আলমের 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম' (প্রকাশকাল ডিসেম্বর '৮৯) এবং ইংরেজিতে লেখা Begum Rokeya : The Emancipator (প্রকাশকাল নভেম্বর '৮০)—এ বইগুলোতে রোকেয়া এবং তাঁর পরিবারের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মোতাহার হোসেন সুফী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : 'বেগম রোকেয়ার জন্মলগ্ন সে এক অন্ধকার যুগ। নারী সে যুগে ছিল গৃহ প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধা। মুসলিম সমাজ সে সময়ে ছিল নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অশিক্ষা অজ্ঞানতা ও কূপমণ্ডূকতার ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। মেয়েদের অবস্থা ছিল সর্বাধিক শোচনীয়। ন্যূনতম শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। পর্দা প্রথার নামে কঠোর অবরোধ প্রথা চালু ছিল। সে-কালে শুধু পুরুষ মানুষ নয়, মেয়ে মানুষের সামনেও পর্দা করতে হতো।'

AMARBOI.COM

বেগম রোকেয়ার শৈশবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বাড়ির চাকরানি ছাড়া অপরিচিতাদের সামনেও বাড়ির মেয়েদের বের হওয়া নিষেধ ছিল। সে-যুগের অবরোধপ্রথার কঠোরতায় বেগম রোকেয়া নিজেই হয়েছিলেন নির্যাতিতা।

রোকেয়া যুগের সেই পর্দাপ্রথা এখন আর নেই। গৃহস্থবাড়ি ছাড়াও মেয়েরা ক্ষেত-খামারে কাজ করছে, সড়কে মাটি কাটছে, দুঃস্থ মাতারা গমের জন্যে কার্ড এবং চটের ছালা হাতে লাইন ধরে অপেক্ষা করছে। বোরকা খুব কমই চোখে পড়ে। কিন্তু এত যুগ মাড়িয়ে আসার পরেও পায়রাবন্দে যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতন বাল্যবিবাহ সমানে চলছে। দুঃসহ জীবনযাপন করছেন স্বামী-পরিত্যক্তা বহু নারী। কয়েক বছর আগে 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদনে আমি বলেছিলাম, পায়রাবন্দের প্রতি এক শ মেয়ের মধ্যে ৫ জন মাত্র প্রাইমারি শিক্ষার সুযোগ পায় আর প্রতি ১০ জন বিবাহিতা মহিলার মধ্যে ৭ জনই স্বামীর নির্যাতনের শিকার। '৯২-তে এসে দেখলাম, সেই চিত্রের খুব একটা হেরফের হয়নি। মাঠ থেকে ঘরে ফিরেছে স্বামী, ভাত চেয়েছে। সেই ভাত বাড়তে একটুখানি দেরি হওয়ায় চলেছে কিল, চড়, লাথি এবং শেষে উচ্চারিত হয়েছে তিন তালাক। এমন ঘটনার পাশাপাশি নানা কুসংস্কারও আছে ভর করে। শহর থেকে যাওয়া কোনো প্যান্ট-শার্ট পরা লোক দেখলে 'সাঁইত' নষ্ট হয়ে যায় এ-রকম ধারণা ৬/৭ বছর আগেও পোষণ করতেন পায়রাবন্দের দূর-গ্রামের অনেক বয়স্ক নারী-পুরুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৮০ সালে মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়া এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে-সময় পায়রাবন্দ ছিল আধুনিক জীবনের সকল সুযোগ সুবিধাবঞ্চিত। বাঙালি মুসলমানসমাজ তখন 'আশরাফ' ও 'আতরাফ'-এ বিভক্ত ছিল। সেই আশরাফ গোত্রভুক্ত ছিল সাবের পরিবার। পরিবারটিতে ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে সেপথ ছিল রুদ্ধ। তাদের জন্যে শুধু কুরআন শরিফ পাঠ শিক্ষার সুযোগ ছিল। এ কারণে বেগম রোকেয়া কোনো বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে পারেননি। বড় বোন করিমুন্নেসা ও বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের কাছেই তিনি শৈশব-পাঠ নেন।

১৮৯৬ সালে বিহার প্রদেশের ভাগলপুরের অধিবাসী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়। স্বামী ছিলেন অবাঙালি এবং কুসংস্কারমুক্ত, শিক্ষানুরাগী। পরবর্তীতে বেগম রোকেয়া তাঁর স্বামীর প্রচেষ্টায় ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় জ্ঞানার্জন করেছিলেন। এই দুই ভাষায় তাঁর দখল ছিল বলেই তিনি অনুবাদ করতে পেরেছিলেন, এমনকি ইংরেজিতে রচনা করেছিলেন মৌলিক সাহিত্য।

বেগম রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং জানা যায়, বিবাহিত জীবনের অধিকাংশ সময় রোকেয়াকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে স্বামীর সেবা-যত্ন করার কাজে। ১৯০৯ সালের ৩ মে কলকাতায় চিকিৎসাধীন থাকাকালে সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর মূলত বিষয়সম্পত্তির কারণে স্বামীর প্রথমপক্ষের মেয়ে-জামাইয়ের চক্ষুশূলে পরিণত হন বেগম রোকেয়া এবং ভাগলপুর ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন এবং ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। সুদীর্ঘ তেইশটি বছর তিনি বৈধব্য জীবন কাটিয়েছেন। মৃত্যুর বছরখানেক আগে তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে। তিনি সে-সময় পেটের পীড়া ও কিডনির অসুখে ভুগছিলেন।

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার মৃত্যু হয়। কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে সমাহিত হয় তাঁর মরদেহ।

সাখাওয়াত হোসেনের সাথে বেগম রোকেয়ার দাম্পত্য জীবনের মেয়াদ ছিল ১৩ বছর। এই সময়ের মধ্যে রোকেয়া দুবার মা হয়েছিলেন। দুটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন তিনি, কিন্তু প্রথমটি ৫ মাস ও পরেরটি ৪ মাস বয়সে মারা যায়।

অসুস্থ স্বামী, তাঁর সেবাযত্নের জন্যে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম, সন্তান জন্মাবার কয়েক মাস বাদে তাদের মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রথমপক্ষের মেয়ে-জামাইয়ের বিরূপ আচরণ, সব মিলিয়ে বলা যায় রোকেয়ার শেষজীবন সুখের ছিল না। ১৯১১ সালের মধ্য-মার্চে তিনি কলকাতায় ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল চালু করেন। সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল স্কুলটিকে কেন্দ্র করেও তিনি নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়েছিলেন, সহ্য করেছেন অহেতুক নিন্দা।

১৮৯৬ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়। সে-সময় তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। অবশ্য এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কোনো গ্রন্থকার বলেছেন, ১৪ বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরুতে-না-পেরুতেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। আবার কেউ বলেছেন বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সে। তবে এটা সঠিক যে, পায়রাবন্দের জমিদারবাড়িতেই বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁর বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের।

সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন বিপত্নীক। প্রথমা স্ত্রী একটিমাত্র কন্যাসন্তান রেখে মারা যান। আনুমানিক ৪০ বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয় বেগম রোকেয়ার সাথে। মোতাহার হোসেন সুফী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : 'দোজবর ও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণকারী এক ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে পেয়েও রোকেয়া ছিলেন সন্তুষ্ট। কেননা স্বামীর রূপ কিংবা যৌবন নয়, তাঁর গুণেই রোকেয়ার মন ছিল ভরপুর। তিনি ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত, উদার ও শিক্ষানুরাগী।' ... রোকেয়া-জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বামীর সাহায্য সহানুভূতি বেগম রোকেয়ার শিক্ষার পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। তেমনিভাবে সাখাওয়াত হোসেনও যিনি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উড়িষ্যার কণিকা স্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন, তিনিও সরকারি কাজে রোকেয়ার কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেতেন। শুধু তা-ই নয়, স্বামীর আগ্রহের কারণে তাঁকে বাংলা শেখানোর ভার নিয়েছিলেন রোকেয়া।

রোকেয়া-জীবনীতে এ তথ্য পাওয়া যায় : মৃত্যুর কিছুদিন আগে সাখাওয়াত হোসেনের দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে রোকেয়া গভীর অনুরাগে স্বামীর রোগশয্যাপাশে বসে তাঁকে নানা বিষয়ে পড়ে শোনাতেন।

AMARBOI.COM

বেগম রোকেয়ার জীবনী-সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় : তাঁর পূর্বপুরুষ বাবর আলী তাব্রিজী ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। ইরানের তাব্রিজ শহরের অধিবাসী এই ব্যক্তি জীবিকার সন্ধানে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পরিব্রাজকদের সঙ্গে ভারতে আসেন। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, ১৫৮৪ সালের দিকে রংপুরের পায়রাবন্দে আসেন তিনি এবং সে-সময়ে সম্রাট আকবরের স্থানীয় প্রশাসক নরনারায়ণের আশ্রয়লাভ করেন।

বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষগণ মুঘল সরকারের উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন বলে মুহম্মদ শামসুল আলম তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে 'মিরতাস' পদেও নিয়োজিত ছিলেন রোকেয়ার পূর্বপুরুষ। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট মুন্সেফ ও কাজীর পদও লাভ করেছিলেন এঁদের অনেকে।

বাবর আলী তাব্রিজীর ষষ্ঠ পুরুষ জহিরউদ্দিন আবু আলী হায়দর সাবের। ইনি বেগম রোকেয়ার পিতা। বাংলা ১৩২০ সালের ৩১ বৈশাখ অর্থাৎ ১৯১৩ সালের এপ্রিলে তিনি ইন্তেকাল করেন।

রোকেয়ার পিতা জহিরউদ্দিন আবু আলী হায়দর সাবেরের স্ত্রী ছিল ৪ জন। প্রথমা স্ত্রী ঢাকার বুনিয়াদী পরিবারের হোসেনউদ্দিন চৌধুরীর কন্যা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরী। তাঁর গর্ভজাত সন্তান ৫ জন। দুই পুত্র ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের; তিন কন্যা করিমুন্নেসা, রোকেয়া, হোমায়রা। অপর তিন স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ছয় পুত্র ও তিন কন্যা। এঁদেরই একজন মসিউজ্জামান চৌধুরী যাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা আমি এর আগে উল্লেখ করেছি। মরহুম মসিউজ্জামানের মেয়ে আজকের স্কুল-শিক্ষয়িত্রী রঞ্জিনা সাবের।

বেগম রোকেয়ার বোন করিমুন্নেসার দুই পুত্র : স্যার আব্দুল করিম গজনভী ও স্যার আব্দুল হালিম গজনভী। এঁরা দেশবিখ্যাত।

রোকেয়া যদিও বেগম রোকেয়া নামে ব্যাপকতর পরিচিতা, কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন। ইংরেজিতে তিনি সই করতেন Roquiah Khatun. বিয়ের পরে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কিংবা কোথাও সংক্ষেপে মিসেস আর এস হোসেন লিখতেন। মুহম্মদ শামসুল আলম তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : রোকেয়া তাঁর নিজের হাতে নাম সই করে 'মতিচুর' বইখানা 'মুসলমান' সম্পাদক মুজিবর রহমানকে উপহার দেন। সেখানে রোকেয়া R. S. Hossain সই দিয়েছেন। ঐ স্বাক্ষরের ফটোকপি সংগৃহীত রয়েছে গ্রন্থকারের কাছে। এ ছাড়া বেগম রোকেয়া জনৈকা রাবেয়া খাতুনের অভিভাবিকার কাছে একটি চিঠি (পোস্টকার্ড) লেখেন। তাতেও R. S. Hossain সই করেছেন দেখা যায়। বড় বোন করিমুন্নেসা স্নেহের চিহ্নস্বরূপ রোকেয়াকে একবার একখানা আলোকচিত্র উপহার দিয়েছিলেন। ঐ ছবিটির পেছনে রোকেয়ার নাম 'শ্রীমতি রকেয়া খাতুন হোসেন' এভাবে লেখা রয়েছে।

এ থেকে অন্তত একটি তথ্য মেলে যে : বেগম রোকেয়া হিসেবে সবার কাছে পরিচিতা হলেও আসলে তাঁর নাম ছিল রোকেয়া খাতুন। বিয়ের পরে নাম হয় মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কিংবা সংক্ষেপে আর এস হোসেন। অবশ্য নামে কিছু আসে যায় না। বেগম রোকেয়া, রোকেয়া খাতুন কিংবা আর এস হোসেন যা-ই হোক, তিনি মানুষের কল্যাণে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনা ছাড়াও তৎকালীন পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের নারীজাগরণের জন্যে কঠিন যুদ্ধ তিনি করেছেন, সেই কর্মই তাঁর পরিচয়।

তবে প্রশ্ন জাগে, মূল্যবান কর্মময় জীবনের স্বীকৃতি মিললেও আজ পর্যন্ত নারীজাগরণের অগ্রদূত নারী শিক্ষার আলোকবর্তিকাবাহী বেগম রোকেয়ার সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে কি? রোকেয়া যে স্বপ্ন দেখে গিয়েছিলেন, আজও কি তা সার্থক হয়েছে? বাংলাদেশের আর সব গ্রামের কথা বাদই দিলাম, খোদ পায়রাবন্দের গ্রামে আজও কেন বাল্যবিবাহ? কেন যৌতুকপ্রথা? কেন অজস্র নারী নির্যাতনের ঘটনা? আজও কেন অধিকার-বঞ্চনা? প্রতিবছর নয়ই ডিসেম্বরে বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান হয় রাজধানীর আলো-ঝলোমলো মঞ্চে, রংপুর শহর থেকে পায়রাবন্দে অনুষ্ঠান করতে যান কোনো কোনো দল, পত্রপত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হয় আর রেডিও টিভিতে রোকেয়ার জীবনী আলোচিত হয়। সবার ঐ এক কথা : 'রোকেয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হবে।' এই চিত্রের পাশাপাশি, নির্মম বাস্তব সত্য হলো : পায়রাবন্দেই কোলের শিশু ইসমত আরার বিয়ে হচ্ছে, ৬ বছর বয়সের লাকী শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, আনজেরা আর পাখীরন ধর্ষিতা হচ্ছে কিন্তু বিচার পাচ্ছে না, স্বামীর সম্পত্তির অধিকারবঞ্চিত হয়েছে হাওয়া বিবি, নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে আছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুক্‌নীবালা, যৌতুকের কারণে স্বামীর লাঞ্ছনা ভোগ করছে হাজারো নারী। পাশাপাশি রোকেয়ার আঁতুড়ঘরের শেষ থামটিও মিশে যাচ্ছে মাটির সাথে। পায়রাবন্দের মানুষজন বহু বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন এখানে একটি আবাসিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। কখনো দাবি করা হয়েছে মহিলা ক্যাডেট কলেজ নির্মাণের। সরকার এ দাবি কানে তোলেননি। '৯২-এর মার্চে গিয়ে শুনলাম, স্থানীয় উৎসাহী কয়েক ব্যক্তি এখানে একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু অতগুলো টাকা মিলবে কোথায়? অতএব শুরুতেই ঝিমিয়ে পড়েছে সে উৎসাহ।

ঢাকাস্থ মিঠাপুকুর সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি 'স্মরণিকা'য় বেগম রোকেয়ার সঠিক মূল্যায়ন করার জন্যে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে। পায়রাবন্দে একটি মহিলা ক্যাডেট কলেজ ছাড়াও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে তারা। ঐ সমিতি বলেছে, রোকেয়ার পিতৃপুরুষের বসতভিটা যার আয়তন প্রায় সাড়ে ৩শ বিঘা এবং ইতোমধ্যে বেদখল হয়ে গেছে, তা উদ্ধার করতে হবে।

এই স্মরণিকাটিতে সাবের পরিবারের পক্ষে ইব্রাহীম সাবির সাহেবের একটি বাণী পড়লাম। ইব্রাহীম সাহেব বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি। ঐ বাণীর একাংশে তিনি এই মর্মে বলেছেন, 'বেগম রোকেয়ার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। যেমন এই মহীয়সীর অবদান সকল বিতর্কের উর্ধ্বে, তাই জাতি তার বীর মাতার স্বীকৃতির পরিধি আরও বিস্তার আশা করে।'

ইব্রাহীম সাবির সাহেব আরও বলেছেন, 'অতীতে অনেকে আমাদের কাছ থেকে বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্মের ওপর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলেও তা উপস্থাপনায় যথেষ্ট গরমিল লক্ষ করা গেছে।' একই ধরনের বক্তব্য মেলে মিঠাপুকুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মুজাফফর আহম্মদের একটি লেখায়। বেগম রোকেয়ার পিতৃপুরুষ সাবের পরিবারের একটি সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের দাবি জানিয়ে মুজাফফর সাহেব বলেছেন, 'পূর্বের ন্যায় ইদানীং কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর পবিত্র চরিত্র ও কর্মময় জীবনের ওপর কালিমা লেপনের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।'

ভুল তথ্য পরিবেশন কিংবা কর্মময় জীবনের ওপর কালিমা-লেপনের অভিযোগ, যা উত্থাপিত হয়েছে, সত্যি হলে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। সরকার থেকে এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজনবোধে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া দরকার।

বেগম রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভাই মসিউজ্জামান সাবেরের মুখে তাঁর পিতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনেছি সে-কথা আগে বলেছি। আমি 'আজাদ'-এ কর্মরত থাকাকালে সেই কাহিনীর অংশবিশেষ ছাপা হয়েছিল। মসিউজ্জামান বলতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির ভেতর নাকি আবু আলী ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু তাঁর শরীর ভিজত না। কোথাও আগুন লাগলে সেখানে ধুলো ছিটাতেন, আগুন নিভে যেত। একবার গ্রামের এক ব্যক্তির কাঁঠালভরা একটি গাছ উপড়ে পড়ে গেল, গাছের মালিকের ভীষণরকম কান্নাকাটি শুনে আবু আলী বললেন, 'কেঁদো না, কাল সকালে গাছ আবার দাঁড়িয়ে যাবে।' এবং পরদিন প্রভাতে নাকি তা-ই ঘটেছিল, আবার খাড়া হয়েছিল উপড়ে-পড়া কাঁঠালগাছটি।

এসব অলৌকিক কাহিনী পাঠকদের জন্যে সে-সময় পরিবেশন করেছিলাম। পরে দেখলাম, মসিউজ্জামান সাবের প্রদত্ত কিছু বর্ণনা বেগম রোকেয়া-সম্পর্কিত কোনো কোনো গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রন্থে বেগম রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভাই মসিউজ্জামান সাবেরের বিবরণ ও মুন্সি আফতাবউদ্দিনের পুঁথিকাহিনী উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রোকেয়ার পিতার আমলে পায়রাবন্দের জমিদারি শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। এর মূলে ছিল আবু আলীর বিলাসিতা ও অপব্যয়। মোতাহার হোসেন সুফী লিখেছেন, 'তিনি (রোকেয়ার পিতা) সাধারণ্যে আবু আলী নামে পরিচিত ছিলেন। ফার্সি ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং মুখে মুখে ফার্সি বয়েত রচনা করতে পারতেন। উর্দুও ভালো জানতেন তিনি। বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁর কোনোদিনও সুনজর ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল আতরাফ ঘরের ছেলেমেয়েরাই শুধু বাংলা শিখবে এবং আশরাফ মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। বাংলা ভাষার চর্চা তিনি হানিকর বলেই বিবেচনা করতেন। তাই নিজের ছেলে মেয়েদের বাংলা শেখার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।'

'তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, তিনি অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। তুচ্ছ ব্যাপারেও তিনি ভোজের বিরাট আয়োজন করতেন। ফলে অঢেল অর্থের অপচয় হতো। বেহিসেবী খরচের দরুন এক বিরাট অঙ্কের দেনা হয়। এই দেনা পরিশোধ করতে না পারায় পায়রাবন্দের জমিদারী লাটে ওঠে। মূলত অপব্যয়ের জন্যে তিনি দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। শেষ জীবনে অনেকের কাছেই তাঁকে হাত পাততে হয়েছে।'

মুহম্মদ শামসুল আলম রচিত গ্রন্থে আবু আলীর শেষজীবনের দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। তবে একটি প্রসঙ্গে গিয়ে চোখ আটকালো। শামসুল আলম সাহেব লিখেছেন, 'জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান প্রসারের সহজাত প্রেরণা বশেই আবু আলী নানা গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও অর্থানুকূল্যে রচিত একটি ফার্সি গ্রন্থের সন্ধান নিবন্ধকার পেয়েছেন। সমসাময়িককালে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজের বিবরণের সঙ্গে বিশেষভাবে সাবের পরিবারের বিপর্যয়ের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। পায়রাবন্দ জমিদার এস্টেটের ম্যানেজার মুহম্মদ ইউসুফ মোজাফফরপুরী স্টেটের অর্থে মুন্সি আব্দুর রশীদ রামপুরীকে দিয়ে এই পুস্তকটি লিখিয়েছেন। খাজা আকরাম হোসেনের ১৩২ নং হ্যারিসন রোডস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুসরত-উল-ইসলাম প্রেসে মুদ্রিত এই পুস্তকটি অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় চৌধুরী আবু আলী সাবেরকে উৎসর্গ করা হয়েছে।'

'নিজের প্রবল জ্ঞান পিপাসা ছিল বলে পুত্র কন্যাদের লেখাপড়ায় তিনি স্বভাবতই উৎসাহী ছিলেন। শুধু আরবি ফার্সি নয়, পুত্র কন্যাদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষাতেও তিনি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। আত্মীয়-প্রতিবেশীদের আপত্তির মুখে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে না পারলেও দুই পুত্রকে ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্যে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের সুবিধার্থে কলকাতা শহরের তালতলা লেনে বাসা ভাড়া করে দিয়েছিলেন। জহিরউদ্দিন আবু আলী সাবেরের মহান গৌরব ও অক্ষয় খ্যাতির উৎস তাঁর দুই মহীয়সী কন্যা করিমুন্নেসা ও রোকেয়া এবং বিদ্যানুরাগী দুই পুত্র ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের।'

মোতাহার হোসেন সুফী ও মুহম্মদ শামসুল আলম সাহেবের বই দুটিতে দুয়েকটি ক্ষেত্রে তথ্যের হেরফের রয়েছে। যেমন : সুফী সাহেব লিখেছেন, বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি আবু আলী সাবেরের সুনজর ছিল না, নিজের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। আবার আলম সাহেবের গ্রন্থে পাওয়া যায়, শুধু আরবি-ফার্সি নয়, পুত্র-কন্যাদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষাতেও তিনি প্রবল আগ্রহী ছিলেন।

এ ধরনের দুয়েকটা তথ্য-বিভ্রান্তি ছাড়া সাবের পরিবারের শেষ জমিদার আবু আলী সাবেরের পারিবারিক কাহিনী ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের ঘটনা-বর্ণনা দুজনের বইতে প্রায় একই রকম।

AMARBOI.COM

মুন্সি আফতাবউদ্দিনের পুঁথিতে সাবের পরিবারের বিশাল জমিদারির বর্ণনা মেলে। তিনি বয়ান করেছেন :

সেই জমিদার, এত জমি তার খোদাতায়ালা দিয়াছিল
কতক রঙ্গপুরে, আর দিনাজপুরে ময়মনসিংহের পর
ছিল জমিদারী, পাবনাতে ভারী, বগুড়াতে ছিল আর ॥
জলপাইগুড়িতে, বাহারবন্দেতে, কতক ছিল মাটি
যেমন যে মাটি, ছিল পরিপাটি, তেমনি আদায়ের লাঠি ॥

ভাবতে অবাক লাগে এই বিশাল জমিদারি, তারই শেষ মালিক আবু আলী সাবের শেষ-জীবনে এসে সামান্য সাহায্যের আশায় হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে হাত বাড়িয়েছেন! আফতাবউদ্দিন মুন্সির পুঁথিতে পাওয়া যায় :

হুজুর বাড়িতে যায় দুক্ষিত হইয়া রয়
মনে করে নসিবের কথা
দেলেতে সবুরি আনে কোন কথা কার সনে
নাহি বলে নাহি তোলে মাথা
এইরূপে কতদিন থাকিয়া ২ হীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুজুরের শরীর হইল
খাওয়া নাহি জোটে তার কেহ নাহি পোছে আর
কি রূপেতে হুজুর রহিল।
তোরা পূর্ব প্রজা হও কিছু ২ চান্দা দাও
তাহা নিয়া জীবন বাঁচাই
পিতা যদি মরি যায় তাতে পুত্র দান দেয়
আখেরে বুঝিয়া ভালাই।

৪

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, পায়রাবন্দ গ্রামে বেগম রোকেয়ার জন্ম। কিন্তু আসলে পায়রাবন্দ বলে কোনো গ্রাম নেই। পায়রাবন্দ আগে ছিল পরগনা, এখনও মিঠাপুকুর থানাধীন একটি ইউনিয়ন।

ইউনিয়নে মৌজা রয়েছে ২১টি, এরই একটির নাম খোর্দ মুরাদপুর। এখানেই রোকেয়ার জন্মভিটা, স্কুল, বাজার।

প্রতিটি মৌজার অধীনে রয়েছে বেশকিছুসংখ্যক পাড়া মহল্লা। রংপুরের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেশকিছু পরিবার পায়রাবন্দে চলে এসেছে এবং গড়ে তুলেছে বসত। ফলে ছোট ছোট পাড়া ও মহল্লার সংখ্যা বেড়েছে। স্থানীয় অধিবাসী ছাড়াও বগুড়া, ময়মনসিংহ, পাবনা, এমনকি নোয়াখালী এলাকার বেশকিছু পরিবার এখানে বসবাস করছে, তবে বগুড়ার সারিয়াকান্দির লোক বেশি। যমুনা নদী ভাঙনের শিকার হয়ে এরা এখানে এসেছে। এদের অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্র কৃষক, কেউ বর্গাচাষী, ভূমিহীন দিনমজুর।

৬৮২৪ একর জমি রয়েছে পায়রাবন্দ ইউনিয়নে, এর মধ্যে ৫৪৫৯ একরে বিভিন্ন ফসল ফলে, বাকিটা অনাবাদি। প্রধান ফসল আমন, বোরো, তামাক, গম, আলু। হালে বেশকিছু জমিতে তরমুজ, খিরা, কাকরোল, গিলা কলমি শাক উৎপন্ন হচ্ছে। বাজার সুবিধে ভালো। রাস্তা পাকা, রিকশা ও ভ্যানগাড়ি চলে, উৎপাদিত ফসল সহজেই নেওয়া যায় রংপুর শহরের বাজারে, লালবাগ হাটে, বৈরাগীগঞ্জে কিংবা মিঠাপুকুর থানা সদরে।

একসময় এখানে পাট হতো। দাম না পাওয়ায় কৃষকরা আবাদ প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। দেশি জাতের গম, কাউন, ডাল, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন এসবের আবাদ কমে গেছে। অন্যান্য এলাকার মতো এখানকার কৃষকও ঝুঁকেছে বোরো ধান আবাদের দিকে। বোরোর জমির পরিমাণ বছরে বছরে বাড়ছে। বছর তিনেক আগেও ১৮০০ একরে বোরো হতো, এখন তা ২৩০০ একর ছাড়িয়ে গেছে। রোপা আমন আবাদ হচ্ছে ৪২০০ একর জমিতে, কিন্তু আবাদ সম্প্রসারিত হলেও একরপ্রতি উৎপাদন-পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। জ্বালানিসংকট সত্ত্বেও যারা যান্ত্রিক সেচ দিতে পারে, যারা কিনতে পারে চড়া দামের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ, তারা প্রতি একরে ৪২ থেকে ৪৫ মণ বোরো ধান পায়, আমন পায় ৪৫ মণ পর্যন্ত। কিন্তু বেশকিছু কৃষক ধান পায় ২৫-৩০ মণ। গম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপন্ন হয় ৬০০ একরে, পুরোটাই সেচ-সুবিধাপ্রাপ্ত, কিন্তু একরপ্রতি ফলন আগের চেয়ে বেশ কমে গেছে। বছর দশেক আগেও পায়রাবন্দের প্রতি একর জমিতে ৩০-৩২ মণ গম ফলত, এখন তা নেমে এসেছে ২০-২২ মণ-এ।

তবে তামাক এবং আলুর আবাদ যেমন বেড়েছে, তেমনি এসেছে নতুন জাত। ১৮-২০ বছর আগে দেখতাম কেবল মতিহারী জাতের তামাক এ এলাকায় হতো, আলু ফলত স্থানীয় জাতের। এখন দেখি প্রায় ৩০০ একর জমিতে 'ভার্জিনিয়া' তামাক উৎপন্ন হয়। ঝাউ আলুর পরিবর্তে এখন অনেকে 'হল্যান্ডের আলুর' আবাদ করছে। অবশ্য এরা অবস্থাপন্ন কৃষক। উন্নত বীজ সার কিনতে পারে, দিতে পারে যান্ত্রিক সেচ। ... আগে পায়রাবন্দে শ্যালো মেশিন চোখে পড়ত না, এখন বোরো ধান আবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে ১৯০টি শ্যালো। '৭২-'৭৩ সালের দিকে এলাকায় কোনো ডিপ টিউবওয়েল ছিল না, এখন বসেছে ৯টি। এর মধ্যে ২টি অবশ্য অকেজো। আগে পাওয়ার পাম্প ছিল ৮টি, এখন সে সংখ্যা নেমে এসেছে ১টিতে। তা-ও চলে না। পানির উৎস নেই। শুকিয়ে গেছে ঘাঘট। চাষাবাদে লাঙলনির্ভর পায়রাবন্দে ১০ বছর আগে একটিও পাওয়ার টিলার ছিল না, এখন হয়েছে প্রায় ২৫টি।

কৃষিক্ষেত্রের এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত এক দশকে এখানকার চাষাবাদে বেশ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এসেছে পাওয়ার টিলার, শ্যালো, টিউবওয়েল। ধান তামাক আলুর নতুন জাত প্রবর্তিত হয়েছে। এসেছে তরমুজ কিংবা গিলা কলমি কাকরোলের মতো নতুন ফসল। কিন্তু অন্যদিকে খাদ্যশস্যের একরপ্রতি উৎপাদন কমে গেছে। এর অনেকগুলো কারণের একটি হলো : বদলে যাচ্ছে মাটির গুণ। দ্বিতীয়ত রোপা আমন মৌসুমে সময়মতো বৃষ্টি নামছে না, আবহাওয়ায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ ছাড়া অবস্থাপন্ন কৃষকদের পক্ষে সম্ভব হলেও ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীরা অর্থাভাবে উন্নত বীজ সার কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে পারছে না, জমিতে দিতে পারছে না প্রয়োজনীয় পানিসেচ।

AMARBOI.COM

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, সাধ্যবান কৃষকরা শ্যালো কিনে বসাচ্ছে, বোরো আবাদে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করছে। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এই সেচযন্ত্রটির সংখ্যা। কিন্তু পাশাপাশি নদীনালা শুকিয়ে যাওয়ায় পাওয়ার পাম্প দিয়ে পানিসেচ এখন আর সম্ভব হচ্ছে না।

৪০ একরেরও বেশি জমি রয়েছে এমন কৃষকের সংখ্যা পায়রাবন্দে মাত্র ৩ জন। এদের ঘরেও ওঠে মোটা ফসল এবং ফসল বিক্রির অর্থ। মধ্যম কিংবা নিম্ন-মধ্যম কৃষক রয়েছে ১ হাজার। প্রান্তিক চাষী ৮৫০ জন। ৪০ শতক কিংবা এর নিচে জমি আছে এমন পরিবার প্রায় ৫শ। বাদবাকি সম্পূর্ণ ভূমিহীন। এরা মালিকের জমিতে শ্রম দেয়, কেউ অতি স্বল্প পুঁজিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা করছে, অনেকে রিকশা ও ভ্যানগাড়ি চালাচ্ছে। ১০ বছর আগে পায়রাবন্দে ছিল মাত্র ৬টি রিকশা, এখন সে সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এই নতুন রিকশাচালকেরা সবাই ভূমিহীন পরিবারের সদস্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থসংকট বেড়েছে, বেড়েছে খাদ্যাভাব। গত ২০ বছরে ভূমিহীনের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। কিন্তু ঐ কায়িক শ্রমনির্ভর রিকশাচালনা আর স্বল্পপুঁজির ব্যবসা ছাড়া নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয় নি।

জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যর্থ। প্রায় ঘরে ঘরে কোলে কোলে শিশু। অপুষ্টি-আক্রান্ত। খাদ্যসংকটের সময়ে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতিবছরই ডায়রিয়া দেখা দিচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে অনেক। যেমন '৯১-তে পায়রাবন্দের বিভিন্ন গ্রামে মারা গেছে কমপক্ষে ৮০ জন। মূলত অনাহার, অর্ধাহারজনিত অপুষ্টি থেকেই এ ডায়রিয়া।

পায়রাবন্দে বেশকিছু গরুর গাড়ি ছিল। এখন দুয়েকটা চোখে পড়ে। গরু ঘরে রাখা যায় না, চুরি হয়ে যায়, তার ওপর রাস্তায় নেমেছে রিকশা আর ভ্যানগাড়ি। গ্রামের পথে এতে করেই মালামাল আনা-নেওয়া হয়, এমনকি রিকশা বোঝাই হয়ে কৃষকের উঠোনে আসে ধানের আঁটি, তামাকের গাঁট, আলুর বস্তা। গ্রাম থেকে ঢেঁকি উঠে গেছে প্রায়, মানুষ চালকলের ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। ১০/১২টি কলু পরিবার ছিল ২০ বছর আগে, ছিল তাদের সরিষা মাড়াইয়ের ঘানি, এখন আছে মাত্র ১টি। আগে ২টি মাত্র মোটরসাইকেল চোখে পড়ত, রজব আলী আর মোজা মিয়ার। এখন ২৫টির মতো হয়েছে। চেয়ারম্যান, মেম্বার, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী, অবস্থাপন্ন কৃষকসন্তান এমনকি দুয়েকজন চাকরিজীবী মোটরসাইকেল চালিয়ে রংপুর শহরে কিংবা মিঠাপুকুরে যাতায়াত করেন, ধুলো উড়িয়ে যান গ্রাম থেকে গ্রামে। সাইকেলের সংখ্যাও বেশ বেড়েছে। নতুন মুদিখানা, মনোহারি সামগ্রীর দোকান, ওষুধের দোকান, চায়ের দোকান গড়ে উঠেছে বেশকিছু। পায়রাবন্দ ও শালমারা বাজারটি হচ্ছে ক্রমশ সম্প্রসারিত।

'৭২-'৭৩ সালের দিকে পায়রাবন্দে বিদ্যুৎ ছিল না। এখন বাজার এলাকা খোর্দ মুরাদপুর, ইসলামপুর, শালাইমারী, অভিরামপুর, লোহনী, খাঁপুর, দেবীপুর মৌজার কয়েকটি গ্রামে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে। তবে হলে কী হবে, এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ-সুবিধা ভোগ করতে পারছে খুব কমসংখ্যক মানুষ। ২২ হাজার মানুষের মধ্যে খুব বেশি হলে ৫ থেকে ৭শ জন সরাসরি বিদ্যুৎ ভোগ করছে। বলা বাহুল্য, এরা অধিকাংশই সাধ্যবান পরিবারের। বিদ্যুতে চলছে দুটি ডিপ টিউবওয়েল, ২৫টির মতো টেলিভিশন। পায়রাবন্দ বাজারের কোনো কোনো দোকান এখন আলোয় উজ্জ্বল। কিন্তু ভেতর-গ্রামগুলো এখনও সেই আগের মতো অন্ধকারে নিমজ্জিত। দুয়েকটি ঘরে হারিকেন জ্বলে, কিন্তু বাদবাকিগুলোতে কুপিই ভরসা। কুপির টিমটিমে আলোতেই কিশোরদের পড়াশোনা, ক্ষুদ্র কৃষক কিংবা মজুর-পরিবারের রাতের খাওয়াদাওয়া।

শালমারা, জাফরপুর এবং খোর্দ মুরাদপুরের ১শটি কৃষক-মজুর পরিবারে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেল : হারিকেন ব্যবহার করে মাত্র ২টি পরিবার, হারিকেন এবং কুপি উভয়ই ব্যবহার করে ৬টি পরিবার। বাদবাকি ৯২টি পরিবারে শুধু কুপিই জ্বলে। তা-ও আবার নিতান্ত প্রয়োজনের সময়টুকু ছাড়া নিভিয়ে রাখা হয় কুপি। অধিকাংশ পরিবারে সন্ধ্যার পর খুবজোর দুঘণ্টা কুপি জ্বলে, সাঁঝ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘনাবার সাথে সাথে রাতের খাওয়া সেরে মানুষজন ঘরের দরজা দেয়, নিভিয়ে ফেলে আলো। রাত আটটা মানে পায়রাবন্দের গ্রামে নিশুতি রাত। ... তবে যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ গেছে, রয়েছে টেলিভিশন সেট, সেখানে কিছুটা ভিন্ন চিত্র মেলে। টিভির মালিকের বাড়িতে সাপ্তাহিক নাটক, ধারাবাহিক নাটক দেখতে আসে কেউ-কেউ, কারও কাছে আবার দূরদর্শন থেকে প্রচারিত হিন্দি ছায়াছবির নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান 'চিত্রাহার' খুব প্রিয়।

তথ্যপ্রবাহ আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। ২৫টি টিভিসেট ছাড়াও পায়রাবন্দের গ্রামগুলোতে রয়েছে ১ হাজারের বেশি ট্রানজিস্টার। ৬/৭ বছর আগে মাত্র ১ খানা দৈনিক পত্রিকা যেত, এখন যায় ৫ খানা জাতীয় ও ৩ খানা আঞ্চলিক দৈনিক, এ ছাড়াও রংপুর শহর থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকের ২টি কপি অনিয়মিতভাবে যায়। জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় দৈনিকের পাঠকসংখ্যা ৩০, তবে এর অধিকাংশই অনিয়মিত পাঠক।

টেলিভিশন থেকে প্রচারিত রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদ কেউ শোনে না। ৫/৬ জনের বাড়িতে রাত ৮টার বাংলা সংবাদ নিয়মিত দেখা হয়। দূরদর্শন থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ 'সমাচার' দেখে কেউ। রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত জাতীয় সংবাদ খুব কম বাড়িতে শুনতে দেখা যায়। তবে রেডিওর রংপুর কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিকেলবেলার স্থানীয় সংবাদ কেউ-কেউ শোনে। বিবিসির খবরের ওপর শ্রোতাদের আস্থা বেশি। ঢাকায় কোনো জাতীয়ভিত্তিক আন্দোলন পরিচালিত হলে তো কথাই নেই, এ ছাড়া এমনিতেও বিবিসির সান্ধ্যকালীন খবর এবং সংবাদপ্রবাহ শোনার জন্যে খণ্ড খণ্ড ভিড় জমে ওঠে বাজারের দোকানের সামনে, আশপাশে, মোড়ল-মাতবরের বৈঠকখানায় কিংবা আঙিনায়। ভোয়ার খবরও শোনে কিছু যুবক। তবে বিবিসি বা ভোয়া যা-ই শুনুক, ঐ সংবাদ বা সংবাদভাষ্য ছাড়া আর কিছুতে তাদের উৎসাহ নেই। যেমন বিবিসির সংবাদপ্রবাহে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ শেষ হবার সাথে সাথেই শ্রোতাদের ভিড় ভেঙে যায়। ট্রানজিস্টার সেটের মালিকও নব ঘুরান।

রেডিওর রংপুর কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কৃষি ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক অনুষ্ঠান কিছু শ্রোতাকে নিয়মিত শুনতে দেখেছি। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হবার সাথে সাথে জানতে চেয়েছি যে, তারা ঐ অনুষ্ঠান থেকে কী কী মেসেজ পেয়েছেন। অধিকাংশই বলতে পারেননি। কেউ যা বলেছেন তা আবার অসম্পূর্ণ। তবে হ্যাঁ, এক ব্যান্ডের ট্রানজিস্টারে ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম তথা ছায়াছবির গান শোনে অনেকেই। দু-দশক আগে প্রথম যখন পায়রাবন্দে যাই, তখন দেখতাম, পথের ধারে আউশ কিংবা পাটের জমিতে সারিবদ্ধভাবে বসে নিড়ানি দিচ্ছে মজুরের দল : তাদের একজন গল্প বলে যাচ্ছে, শুনছে বাকি সব আর হাত চালিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কোথাওবা গান হচ্ছে। আজকের পায়রাবন্দে সে দৃশ্য অনুপস্থিত। বরং দেখা যাবে, জমির আইলের ওপর বসানো রয়েছে এক ব্যান্ডের ট্রানজিস্টার, খুব হালকা-চটুল গান হচ্ছে সিনেমার এবং তা-ই শুনে শুনে বোরো ধানের চারা রোপণকারী কিষান-মজুরের দল মাথা দোলাচ্ছে। কেউবা বিকৃত সুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কণ্ঠ মেলাচ্ছে রেডিও থেকে প্রচারিত ঐ গানের সাথে। ... গ্রামে আগে জারিগান হতো, পুঁথিপাঠের আসর বসত, গৃহস্থের বাহির-আঙিনার 'টঙ'-এ গল্প বলার আসর হতো রাতের খাওয়াদাওয়ার পর, জুটত সেখানে ছেলে-বুড়ো সবাই। কিন্তু মাত্র দু-দশকের ব্যবধানে কী আশ্চর্য পরিবর্তন! গান-গল্প নেই, জারি-পুঁথি নেই, তার বদলে টিভিতে দূরদর্শনের 'চিত্রাহার' দেখবার জন্যে দুতিন মাইল পথ মাড়িয়েও খোর্দ মুরাদপুরের বিদ্যুৎ-সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকায় এসে হাজির হয় কেউ-কেউ। কেউ আবার বিটিভির ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠানও বেশ পছন্দ করে। নাচ-গান দেখে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে যখন নিজ-বাড়িতে ফিরে যায় দর্শক, দেশি-বিদেশি নায়িকার দেহের বিভিন্ন অংশের মাপজোক হয়, এমনকি শীৎকারধ্বনিও ওঠে, কেউবা লুঙ্গি তুলে ফেলে কোমরের ওপর। এসব আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি একটি কিশোর, স্কুলে যায় না, ক্ষেতমজুরি করে, সে তার বাবা-মায়ের নামটি পর্যন্ত ভালো করে বলতে পারে না, বলতে পারে না পায়রাবন্দ গ্রামটি কোন্ জেলায় অবস্থিত কিংবা কে এখানে জন্ম নিয়েছিলেন; কিন্তু দূরদর্শনের 'চিত্রাহার' সপ্তাহের কোন্ বারে কটার সময় প্রচারিত হয়, বিটিভির 'ছায়াছন্দ' কবে কখন এসব তার ঠোঁটস্থ। ববিতা, শাবানা এমনকি অনেক দূরের রেখা, শ্রীদেবী আর অমিতাভ, মিঠুনের দল তার পরিচিত। পায়রাবন্দের অনেক দর্শক দূরদর্শন থেকে প্রচারিত বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবি নিয়মিত দেখে থাকেন।

পায়রাবন্দে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সম্প্রসারিত হয়েছে কিছুটা হলেও। পত্রপত্রিকার সংখ্যা আগের চেয়ে কিছু বেড়েছে। কিন্তু এর ফল ভোগ করছে মোট জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। রেড়িও, টিভি ও পত্রিকার কল্যাণে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, চাকুরে, কলেজ-পড়ুয়া ছাত্র, যুবক এদের কেউ-কেউ দেশের কিছু খবরাখবর পাচ্ছে, জানতে পারছে কোথায় কী ঘটছে না-ঘটছে, জানতে পারছে রাজনীতির খবরাখবর। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা রয়েছে বিরাট তথ্যশূন্যতায়। কয়েকজন মহিলার সাথে আলাপ করে দেখেছি এই পায়রাবন্দে একদা জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে রোকেয়া, তাঁর সম্পর্কেও জানে না তারা, এমনকি জানে না এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। ... এহেন তথ্যশূন্যতার মূল কারণ হলো শিক্ষা-সচেতনতার অভাব।

অনেক পরিবারে আবার তথ্যবিভ্রান্তি রয়েছে। খোর্দ মুরাদপুর গ্রামের খড়ি-বিক্রেতা ৭০ বছর বয়স্ক কালটু এবং তার স্ত্রী আছিয়া—এদের সাথে '৯২-এর মার্চে আলাপ হয়েছিল। সে-সময় তারা জানত যে 'এশ্শাদ' (এরশাদ) এখনও দেশ চালাচ্ছে। সরকার পরিবর্তন হয়েছে এবং দেশ পরিচালনা করছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার, বেগম খালেদা জিয়া সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী, এসব কথা আমি যখন বললাম তখন ওদের দুজনার চোখেমুখে সারাদিনের ক্লান্তি আর ক্ষুধার বদলে বিস্ময়। অবাক হয়ে থাকে তারা। গত সংসদ নির্বাচনের সময় 'খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ' কিংবা কখনো 'শেখ হাসিনা এগিয়ে চলো' ইত্যাদি ধরনের স্লোগান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালটু শুনেছে বটে পায়রাবন্দ বাজারে খড়ি বেচতে গিয়ে, কিন্তু এরশাদ ক্ষমতায় নেই এ তথ্যটি সে জানত না। জানত না তার স্ত্রী আছিয়া।

কালটুর সম্পদ বলতে একটি ভোঁতা পুরাতন কুড়াল আর খড়িবহনের ভাঙা ভার। সকালে উঠেই সে ঝোপে-জঙ্গলে চলে যায়। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে, কোনোদিন এর-ওর বাঁশঝাড় থেকে তোলে বাঁশের মুড়া, সন্ধ্যার দিকে তা বেচতে আসে পায়রাবন্দ বাজারে। দৈনিক ৮ থেকে ১০ টাকা মেলে, তা-ই দিয়ে কিনে নিয়ে যায় চাল বা আটা। কালটুর সংসারের অবস্থা এমন যে খাদ্যশস্য বহনের মতো ব্যাগ বা থলি পর্যন্ত তার ঘরে নেই। ছেঁড়া-ময়লা লুঙ্গির এক কোণে চাল বা আটা বেঁধে নিয়ে ঘরে ফেরে সে।

নিজের জায়গাজমি নেই কালটুর, কোনোরকমে একটি ছোট্ট ছনের ঘর তুলে বাস করছে অন্যের জমির ওপর, সে ঘরটিও গত বছরের ঝড়ে হেলে পড়েছে, অর্থাভাবে মেরামত করা সম্ভব হয়নি। নেই তার গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, নেই কোনো সঞ্চয়। সকালে একটুখানি পান্তা খেয়ে কাজে বেরোয়, দুপুরে থাকে অভুক্ত, রাতে ফিরে জোটে যদি কয়েকমুঠি ভাত কিংবা দু-তিন টুকরো রুটি, কিন্তু সঙ্গে তরকারি হিসেবে ‘নাবড়া’ বা ‘ভর্তা’ ছাড়া আর কিছু থাকে না। রুটি হলে এক চিমটি গুড়।

নিরক্ষর, ভূমিহীন, অতি দুঃস্থ, স্বল্প উপার্জনকারী বৃদ্ধ কালটু দেশ-দুনিয়ার খবর রাখবে কী, নিজের ভালো নামটি পর্যন্ত বলতে পারে না, সঠিক জানে না তার বয়স। হ্যাঁ, কালটুর পিতা ভালো নাম একটা দিয়েছিল, কিন্তু এখন তা স্মরণ নেই। গায়ের রং কালো বলে একদা কালটু নাম হয়েছে তার এবং এ নামেই এর-ওর কাছে পরিচিত।

AMARBOI.COM

কালটুর নাম ভোটার-তালিকায় রয়েছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লাঙল মার্কায় ভোটও দিয়েছে দু-দফায় ৫০ টাকা পাবার পর। কিন্তু সে জানে না এই ‘ভোটাভুটি’ কিসের জন্যে হয়, জানে না কীভাবে গঠিত হয় সরকার। সে গণতন্ত্র বোঝে না, সংসদ বোঝে না, এমনকি বলতে পারল না লাঙল মার্কা নিয়ে আসলে কে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। দেশ এবং সরকার, নির্বাচন এবং ক্ষমতাকেন্দ্র, এসব প্রশ্নে প্রথমে সে বিস্মিত হয়, ঘন ঘন মাথা নাড়তে থাকে। পরে হয় বিরক্ত। কালটুর স্ত্রী আছিয়া প্রশ্ন শুনে মুখ ঝামটা দেয়। বলে, ‘মানুষট্যা ইগ্‌লা কী কয় কিচুই বোজো না’। অর্থাৎ মানুষটি এসব কী বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কালটু এবং আছিয়া শুধু নয়, রংপুর শহর থেকে ন মাইল দূরের পায়রাবন্দ ইউনিয়ন এলাকায় শত শত নর-নারী তথ্যশূন্যতা কিংবা তথ্যবিভ্রান্তিতে রয়েছে। অন্যদিকে রেডিও ও টেলিভিশনের মতো আধুনিক তথ্যমাধ্যম শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়নি বরং অনেকক্ষেত্রে রুচিবিকৃতি ঘটিয়েছে। নিজের দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ-এ শ্রোতাদের আস্থা নেই, নির্ভর করছে তারা প্রধানত বিবিসি এবং ভোয়ার ওপর।

কী এর কারণ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, রেডিও, পাওয়ার টিলার, শ্যালো, ডিপ টিউবওয়েল— এসব গ্রামে পৌছুলেই যে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয় না, দেশের আর সব এলাকার মতো পায়রাবন্দেও তা দেখা যায়। কৃষিযন্ত্র, তথ্যমাধ্যম এবং বিদ্যুতের মতো আধুনিক সুবিধা কিছু-কিছু এলাকা এবং সাধ্যবানদের ঘরে পৌছুলেও এই জনপদে শিক্ষার হার এখনও খুব কম, অপরদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভূমিহীনের হার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেকারত্ব বাড়ছে। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কুটিরশিল্প তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি।

পায়রাবন্দের বহু মানুষ এখনও পাতকুয়া এবং ইঁদারার পানি পান করে। অধিকাংশ হ্যান্ড টিউবওয়েল অকেজো। গ্রামীণ ব্যাংকের কল্যাণে কয়েকটি লো-কস্ট ল্যাট্রিন বসলেও শিশুরা এখনও সেই আগের মতো খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে, নারী ও পুরুষ ব্যবহার করে ঝোপঝাড়। যেখানে সেই ঝোপঝাড় নেই, কেটে কেটে বের করা হচ্ছে আবাদি জমি, কিংবা গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি, সেখানে মেয়েরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্নের জন্যে রাত্রির অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করে।

ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার ব্যাপারে সাধ্যবান পরিবারগুলো যত্নবান। সপ্তাহে কিংবা পনেরো দিন অন্তর ঘর-উঠোন লেপায় তারা, খুলি (বাহির-আঙিনা) ঝাট দেয়, কাঁথা-কাপড় ধোয় এবং লেপ-তোশক-বালিশ রোদে মেলে দেয়। এরা পৃথক পৃথক ল্যাট্রিন ও ইউরিনাল বানিয়েছে, কেউ ঘেরা দিয়ে নিয়েছে গোসল করবার জায়গাটুকু। কিন্তু দরিদ্র, বিশেষ করে ভূমিহীন মজুর-পরিবারগুলোতে জনস্বাস্থ্য বলতে কিছু নেই। একেই ভাঙাচোরা ঘর, স্যাঁতসেঁতে, আগাছা, নোংরা-আবর্জনা, যেখানে-সেখানে শিশুদের মলত্যাগ, কুয়োর পানি পান, অন্যদিকে দুবেলা ভরপেট তো নয়-ই আধপেটা খাবারও জোটে না। এদের পরিবারের মেয়েরা একমাত্র শাড়িটি পরে গোসল করে, অর্ধেক দেহে পেঁচিয়ে বাকি অর্ধেক রোদে মেলে শুকোয়। এদের সায়া-ব্লাউজ নেই, স্বামীর হাতে নিত্যদিন পিটুনি খায়, কিন্তু মাথায় দেবার তেল, গায়ে মাখার সাবান, চুড়ি-ফিতা, এসব পর্যন্ত পায় না। বছর সাতেক আগে এই বঞ্চনা খুব প্রকটরূপে ছিল, এখন পরিস্থিতির সামান্য কিছু উন্নতি হয়েছে। পায়রাবন্দের বিভিন্ন গ্রামে '৯২-এর মার্চে আমি কয়েকজন বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলাকে দেখলাম, যারা ঘরেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, সাজগোজ করে, মাথায় নিয়মিত তেল দেয়, চুল বাঁধে, এমনকি ঘরের বাইরে বেরুলে মুখে স্নো-পাউডার ঘষে। তোলা শাড়ি পরে। আলাপ করে জানা গেল এরা প্রত্যেকে কিছু-না-কিছু আয়-উপার্জন করে, তা থেকে কিছু জমায়। বাড়তি হিসেবে দুয়েকটা ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন করে তারা, দুধ-ডিম বিক্রি করে কিছু পয়সা পায়। যারা গ্রামের অবস্থাপন্নের বাড়িতে ধান ভানা, কাপড় ধোয়া, ঘরদোর লেপার কাজ করে, তারাও মজুরি হিসেবে প্রাপ্ত চাল থেকে সামান্য কিছু জমায়। গ্রামীণ ব্যাংক কিংবা 'নিজেরা করি'র সঞ্চয়ের টাকা জমা দেবার পরেও স্নো-পাউডারের মতো শৌখিন দ্রব্য কেনে কেউ-কেউ, কেনে চুড়ি-ফিতা-আলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব দেখেশুনে কেউ-কেউ অবশ্য ঈর্ষা করে, করে কটূক্তি। বলে, 'দ্যাখ দ্যোখ বিদুয়া বেটিছাওয়ার ফির ঢক্ বেরাইচে!' অর্থাৎ দ্যাখ, দ্যাখ, বিধবা মেয়ের আবার রূপ বেরিয়েছে! কিন্তু দিনবদলের পালায় আকলিমার মতো দুয়েকজন এখন আর এসব কথার তোয়াক্কা করছে না। আমি নিজে একজন প্রৌঢ়া বিধবার মুখ থেকে শুনেছি 'বিদুয়া হইচি বুলি কি হামার সাদ আল্লাদ নাই?' অর্থাৎ বিধবা হয়েছি বলে কি আমাদের সাধ আহ্লাদ নেই?

নিশ্চয়ই এটা একধরনের জেগে-ওঠা, প্রতিবাদ উচ্চারণ, এককথায় সচেতনতা। পায়রাবন্দের সকল ঘরে যখন মেয়েরা এভাবে একত্রে জেগে উঠবে, সেদিন অবশ্য বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান নিয়ে কেউ লিখবেন অন্যরকম কথা-কাহিনী।

'৭২ সালে পায়রাবন্দ ইউনিয়নে ভোটারসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। এখন তা ১২ হাজার ৬২১। অর্থাৎ দু-দশকের ব্যবধানে ভোটার বেড়েছে ৮ হাজারের কিছু বেশি। কিন্তু ভোটারদের সচেতনতা তেমন বাড়েনি। এখনও অনেকে গ্রামের প্রভাবশালী অর্থাৎ মোড়ল মাতবরের কথামতো নিজের ভোটটি দিয়ে আসে, অনেকে আবার ভোট বেচে দেয়। 'ভোট চাও তো নগদানগদ টাকা ফ্যালো।'

কী কারণে এ মানসিকতা? ৫০ থেকে ১০০ টাকার বিনিময়ে ভোট বেচে দেওয়া?

গ্রামের যুবকগণ বলেন, এর পেছনে আছে মূলত আর্থিক অসচ্ছলতার কারণ। দ্বিতীয়ত, মানুষজন এখনও অতটা সজাগ-সচেতন নয়, নিজের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা কম। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় কারণটি সঠিক মনে হয় আমার কাছে। ভোটাররা এখনও সচেতন নয় এবং তা নিরক্ষরতার কারণেই।

গ্রামের দুয়েকজন যুবক অবশ্য অন্যরকম কথাও বলল। তাদের ভাষ্য এরকম : শুধু ভোটারদের দোষ দিয়ে লাভ কী? নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাদেরও কেউ-কেউ চরিত্রহনন করছে ভোটারদের। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছে না শুধু, হাতে কিছু টাকাও গুঁজে দিয়ে আসছে। বলা হচ্ছে— 'এটা আগাম, ভোটের আগের দিন আরও পাবে।' এইসব বলে যুবক প্রশ্ন করল : একেই মানুষ গরিব, ঘরে ঘরে অভাব, সেই সময় যদি কেউ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে আসে, ভোটার তা ফেলে দেবে? আরেকজন বলল, গতবারের সংসদ নির্বাচনের কথা ধরুন। পায়রাবন্দে একটা হুডখোলা জিপ এসে পাঁচ টাকা দশ টাকার নতুন নোট হরিলুট করে গেল। সেক্ষেত্রে কী বলবেন আপনি? কার দোষে নষ্ট হচ্ছে ভোটারের চরিত্র?

পায়রাবন্দের ভোটার-মানসিকতা বিচিত্র! একেক নির্বাচনে একেক রূপ। গত সংসদ উপনির্বাচনে পায়রাবন্দ ইউনিয়ন থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পায়। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল আওয়ামী লীগ প্রার্থী। তৃতীয় অবস্থান ছিল জামায়াতের, আর চতুর্থ অবস্থানে বিএনপি। কিন্তু, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকালে দেখা গেল, আওয়ামী লীগ সমর্থক লুৎফর রহমান সবচেয়ে বেশি ভোট (৩৪০০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে জয়ী হয়েছেন। ৩০০০ ভোট পেয়ে জাপা সর্মথক আছেন ইয়াকুব আলী দ্বিতীয় অবস্থানে। তৃতীয় স্থানে ছিলেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের স্থানীয় নেতা ফয়জার রহমান, তিনি ভোট পান ২৮০০টি।

স্থানীয় যুবকগণ এ প্রসঙ্গে বললেন যে, সংসদ উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মিজান চৌধুরী বেশি ভোট পেয়েছেন বলে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে পায়রাবন্দে জাতীয় পার্টির খুব জনসমর্থন রয়েছে কিংবা মিজান চৌধুরী খুব জনপ্রিয়। আসলে এরশাদকে নিয়ে রংপুরের আর সব এলাকার মতো এখানেও একটা এলাকাগত সেন্টিমেন্ট রয়েছে। অনেক ভোটারের ধারণা ছিল এ-রকম যে : লাঙল মার্কায় ভোট দিলে এরশাদ জেল থেকে মুক্তি পাবে। অনেককে আবার এমনটি বোঝানোও হয়েছিল। টাকাপয়সাও কম খরচ করা হয়নি। সব মিলিয়ে মিজান চৌধুরী পায়রাবন্দ ইউনিয়ন এলাকা থেকে পেলেন প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ভোট আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আওয়ামী লীগের মতো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রার্থী আসিকুর রহমান পান প্রায় ১৭০০ ভোট। বিএনপির নূরুল হুদা সুলতান পায়রাবন্দের গ্রাম থেকে ৫০০ ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

পায়রাবন্দের গ্রাম-সফরের সময় জানতে পারি বেশ কয়েকটি মজার ব্যাপার। এর মধ্যে একটি হলো একশ্রেণীর ভোটার আছেন যাঁরা তিন প্রার্থীর টাকাই নিয়েছেন, খেয়েছেন, কিন্তু সিল মেরেছেন লাঙলে। দ্বিতীয়ত, বেশকিছু আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামায়াত সমর্থক নিজ দলের প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে 'এরশাদ মুক্তি পাইবে' 'জায়গার ছাওয়া আবার প্রেসিডেন্ট হইবে' এ ধরনের চিন্তা থেকে লাঙলে ভোট দিয়েছেন। এখানে দল নয়, ব্যক্তি এবং তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা 'আবেগ' কাজ করেছে।

নির্বাচন মানসিকতা যাচাইয়ে দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের চেয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পায়রাবন্দের লোকদের উৎসাহ বেশি, ভোটদানের হারও বেশি। এরশাদকে নিয়ে আবেগ থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শতকরা ৬৫ ভাগ ভোটার ভোট দেন, কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ভোট পড়ে।

এখানকার মহিলা-ভোটাররা ইউপি নির্বাচনের সময় ভোটদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখান বেশি। বিশেষ করে দুঃস্থ মাতারা দলে দলে আসেন ভোট দিতে। উৎসাহের সাথে লাইনে দাঁড়ান। এঁদের জন্যে নগদ টাকা দেওয়া হয় না, তবে টোপ দেওয়া হয়ে থাকে ভিজিডি কার্ডের, বিভিন্ন ত্রাণ-সাহায্যের। পুরুষ-ভোটারদের জন্যে বিড়ি সরবরাহ করা হয়, কেউ মজা গুয়া-পানের ব্যবস্থা রাখে। ... দুঃস্থ মাতারা পায়ে হেঁটে ভোট কেন্দ্রে এলেও সচ্ছল পরিবারের সদস্যা এবং আত্মীয়াদের আনা-নেওয়ার জন্যে গরুর গাড়ি ও রিকশার মতো যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয় অনেকক্ষেত্রে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ভোটার সমাগমের কারণ হলো : চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদপ্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুনয়-বিনয় করেন, এমনকি পায়ে পড়েন কেউ-কেউ। অনেকের সাথে আবার আছে আত্মীয়তা সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে ভোট দিতে না গেলে চলে না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেননি অথচ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় ব্যস্ততার মাঝেও ভোটকেন্দ্রে গেছেন এমন কয়েকজন মহিলা-ভোটারের সাথে কথা হলো পায়রাবন্দের পূর্ব সীমানার একটি গ্রামে। মেয়েরা আঞ্চলিক ভাষায় যা জানালেন তার অর্থ হলো : ভোট দিতে যাবার জন্যে একজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এবং তার ভাই এসে 'হুকুম' দিয়ে গেছে। নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট না দিলে ভিটেছাড়া করা হবে। ছাড়িয়ে নেওয়া হবে বর্গার জমি।

: কী-রকম?

: বুঝলেন না! আমরা যে তাদের জমির উপর থাকি। আমাদের স্বামী ঐ প্রার্থীর ভাইয়ের জমি বর্গায় চাষ করে। তাই ভোট দিতে না গিয়ে কি আর উপায় আছে? উচ্ছেদ করবে ওরা, কেড়ে নেবে জমি।

হ্যাঁ, পায়রাবন্দে এ-রকম বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যে, ভূস্বামীর কথামতো ভোট না দেওয়ায় বর্গার জমি ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যকে দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় পেরুনোর আগেই চাপ দিয়ে আদায় করা হয়েছে গৃহীত ঋণ ও সুদের টাকা। এমন ঘটনা ঘটেছে যে, বর্গাদার তার ভূস্বামীর হুকুমমতো একজন মেম্বার পদপ্রার্থীকে ভোটটি দিয়ে এসেছে কিন্তু যেহেতু ঐ প্রার্থী জিততে পারেনি, সে কারণে 'তুই আমার কথামতো ভোট দিসনি' সন্দেহ প্রকাশ করে ভূস্বামী বর্গার জমি ছাড়িয়ে নিয়েছে, এমনকি উচ্ছেদ করেছে তার ভিটে থেকে।

ভোটদানের ব্যাপারে পরিবারের মেয়েদের ওপর প্রভাব খাটানোর ঘটনা দেশের আরসব গ্রামের মতো পায়রাবন্দেও রয়েছে। স্ত্রীটি ব্যালটপেপারে সিল মেরে আসে স্বামীর কথামতো, তাদের নিজস্ব কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। একেই মেয়েরা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নিরক্ষরতার কারণে সামাজিকভাবে অসেচতন, তার ওপর মাথার ওপর শাসক হিসেবে আছে ক্ষমতাবান স্বামী।

সেই স্বামীটি, যে কি না অতি ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, মহাজনের খাতক, সে-ও অনেকক্ষেত্রে গ্রামের প্রভাবশালীর হাতের পুতুল যেন। ভোটপ্রার্থীর কাছ থেকে সে সরাসরি কোনো টাকা পায় না, কিন্তু নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যার ভোট তারই কথামতো দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। 'মাতবর সাইব' মোটা টাকা বাগিয়ে নিয়ে অনেক আগেই নিজ নিজ মহল্লার ভোট বিকিয়ে দিয়ে আসে। এ কারণে পায়রাবন্দে বহুবছর আগে থেকেই দেখা যায় যে, একজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে নমিনেশন পেপার সাবমিট করে এসে প্রথমেই বিভিন্ন এলাকার প্রভাবশালীদের সাথে মিলিত হন। গরু-খাসিভোজের পর এটাই প্রধান আলোচনা হয়ে ওঠে যে, কে তাঁর এলাকার কত ভোট নিয়ে দিতে পারবেন। জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বেশি ঘটে। প্রার্থীগণ ভোটারের দ্বারে যান কম, যান মোড়ল-মাতবরের কাছে।

আর বাস্তব অবস্থা হলো : সামাজিক অসচেতনতার কারণে অনেক নিরক্ষর দুঃস্থ মানুষ ক্ষমতার উৎস বলতে চেয়ারম্যান, মেম্বার, মোড়ল, মাতবরকে বুঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন এখনও। পায়রাবন্দ জরিপকালে একবার আমি বেশকিছু মহিলার কাছে এ-সম্পর্কিত প্রশ্ন রেখেছিলাম। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারটিই তাঁদের অনেকেই বোঝেন না, বোঝেন না সংসদ কী কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের ভূমিকা কী। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী তো দূরের কথা, কোনো সংসদ সদস্যকেও এ পর্যন্ত চোখে দেখেননি এঁদের কেউ।

গ্রামের শিকড় পর্যায়ের এ-রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও, '৯২-এর মার্চে পায়রাবন্দে দেখা গেল : জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারে ২ দশক আগের তুলনায় একটি শ্রেণী বেশ উৎসাহী, অনেকক্ষেত্রে অনেকটা সচেতনও। চায়ের দোকানের আড্ডা আসরে এখন রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়, রাজনৈতিক ঘটনাবলি জানবার ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করে, সন্ধ্যার পর খবর শোনার জন্যে রেডিওর কাছে ভিড় জমায়, শহর থেকে পত্রিকা এসে না পৌঁছুলে অস্বস্তিতে ভোগে কতিপয় যুবক। কোন্ শাসকের আমল ভালো ছিল এমন প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক জমে ওঠে।

তবে কোনো দলের সাথে সরাসরি জড়িত কিংবা রাজনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা পায়রাবন্দের মৌজাগুলোতে এখনও অনেক কম। আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলো : এই বিরাট ইউনিয়নের প্রায় ২২ হাজার মানুষের মধ্যে খুবজোর ১ হাজার জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য কিংবা সমর্থক। এঁদের মধ্যে মহিলার হার হবে প্রতি ২শ জনের মধ্যে ১ জন। অথচ মোট ১২৬২১ জন ভোটারের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হলো মহিলা-ভোটার।

রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থকের মধ্যে অধিকাংশই যুবক যাদের বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, ইউসিএল, গণতন্ত্রী পার্টি এ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দলের তৎপরতা নেই পায়রাবন্দে। প্রথম ৪টি দলের ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি রয়েছে ২ থেকে ৩ বছর আগে থেকে। গণতন্ত্রী পার্টির ইউনিয়ন কমিটি '৯২-এর জানুয়ারিতে গঠিত হয়।

এ এলাকায় গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী বেশি ভোট পেলেও আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের সদস্য-সমর্থক বেশি। জামায়াতের তৎপরতা ভেতর-গ্রামে চলছে। এই দলের সদস্যরা নিয়মিতভাবে বৈঠকে মিলিত হয় এবং কেন্দ্র থেকে পাঠানো জামায়াত শিবিরের বিভিন্ন পোস্টার পায়রাবন্দ ইউনিয়ন সদর থেকে ৪/৫ মাইল দূরের গ্রামের মৌলবি মুন্সিদের বৈঠকখানার দেয়ালে সাঁটানো দেখেছি। নিজের দলের রাজনীতি বিষয়ে মসজিদেও নামাজের আগে-পরে কথা বলেন তাঁরা। ইউসিএল-এর সদস্য-সমর্থক প্রায় সবাই যুবক এবং তাদের অল্পকিছু পড়াশোনাও রয়েছে। এদের নিয়মিত বৈঠক হয়ে থাকে, বৈঠকে উপস্থিতি ভালো। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সদস্য-সমর্থক অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও সাংগঠনিক তৎপরতা ঢিলে। কোনো নির্বাচনের আগে-আগে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠলেও অন্যান্য সময়ে এই দুই দলের স্থানীয় কমিটির বৈঠক নিয়মিত হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সদস্য এবং সমর্থকদের অনেকেরই দলবদলের মানসিকতা লক্ষ করা যায়। যেমন : ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান আগে ছিলেন আওয়ামী লীগে, এখন বিএনপিতে। একজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে আসেন, এখন জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। একজন প্রভাবশালী, অনেকদিন থেকে আওয়ামী লীগ করতেন, গত সংসদ নির্বাচনে বিএনপিতে যোগ দেন, এখন আবার আওয়ামী লীগে ফিরে এসেছেন। তবে দলবদলের ব্যাপারে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার কয়েকজন যুবক ছাড়া অন্যদের মধ্যে তেমন রিঅ্যাকশন নেই। কেউ অমুক দল থেকে তমুক দলে গিয়েছেন শুনলে তা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরে নেন অধিকাংশই।

আমি একটা খতিয়ান নেওয়ার চেষ্টা করলাম। অ্যাডভোকেট নিকুঞ্জ বর্মণ আগে আওয়ামী লীগের পাঁড় সমর্থক ছিলেন, '৮০ সালের পরে ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য হন, এখন তিনি গণতন্ত্রী পার্টির সদস্য। জাহাঙ্গীর কৃষিকাজ ও ব্যবসা করেন, তিনি ছাত্রজীবনে করেছেন ছাত্রলীগ, পরে ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয় পার্টিতে সমর্থন বজায় রাখবার পর এখন বিএনপির সমর্থক হয়েছেন। ব্যাংক-কর্মচারী গোলাম আজম ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে আসবার পর প্রথমে ওয়ার্কার্স পার্টি এবং পরে জামায়াত করেন। এখন তিনি জামায়াতও ছেড়েছেন। কৃষক তাজুল ইসলাম আওয়ামী লীগ করতেন দীর্ঘদিন ধরে, এখন গণতন্ত্রী পার্টির ইউনিয়ন কমিটির সেক্রেটারি হয়েছেন। ব্যবসায়ী রউফ জাতীয় পার্টি থেকে বিএনপি, বিএনপি থেকে জাতীয় পার্টি করে এসে এখন গণতন্ত্রী পার্টির ইউনিয়ন সভাপতি। দুলাল ছিলেন জামায়াত সমর্থক, '৭৭ সালে বিএনপি সমর্থন করতে থাকেন, এখন ইউসিএল-এর সদস্য। হোমিওপ্যাথির ছাত্র সাইফুল ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে ইউসিএল-এ এসেছেন। ব্যবসায়ী ফয়জার রহমান আগে ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির কৃষক ফ্রন্টে এখন ইউসিএল-এর রংপুর জেলা কমিটির নেতা। ইয়াকুব মিয়া আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে আসেন, এখন জাতীয় পার্টিতে। সার-ডিলার হারুন ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন, পরে কর্মজীবনে এসে কয়েক বছর রাজনীতিবিমুখ থাকেন, এখন জাতীয় পার্টির সমর্থক। জালাল একসময় জাসদ করতেন, এখন ইউসিএল-এ। মুকুল ছিলেন জাতীয় পার্টির সমর্থক, এখন বিএনপি সমর্থন করেন।

কে কোন্ দলের সদস্য হবেন কিংবা সমর্থন করবেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু পায়রাবন্দের শিকড় সংবাদ পাঠকদের সামনে পরিবেশনের কারণে রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত কিছু ব্যক্তির সাথে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেছি, জানতে চেয়েছি এক দল থেকে আরেক দলে যাবার কারণটি কী। বিভিন্ন জনে নানা কথা বলেছেন। তবে তাঁদের ভাষ্য থেকে মূল যে বক্তব্যটি বেরিয়ে এসেছে, তা হলো প্রকৃতপক্ষে হতাশা থেকে এমনটি ঘটছে। এক দলের ওপর আস্থা হারিয়ে আরেক দলে সমর্থন দিচ্ছেন তারা।

শহর থেকে বেশি দূরের ইউনিয়ন না হলেও পায়রাবন্দে দেখা যায়, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে কর্ম দিকনির্দেশনা এখানকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতাকর্মীদের কাছে এসে পৌঁছায় না। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতা তো দূরের কথা, এলাকা সফর করেন না রংপুর জেলা বা মিঠাপুকুর থানা পর্যায়ের কোনো নেতা। জাতীয় পর্যায়ের নেতা-নেত্রীদের দেখা মেলা ভার। শেখ হাসিনা একবার এসেছিলেন উপনির্বাচনের আগে, আধঘণ্টার জন্যে, তাও অনেক রাতে। এসেছিলেন ইউসিএল-এর অমল সেন, জামায়াতের মতিউর রহমান নিজামী। এ-ই।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করলাম : আজকাল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের যে কথাটি বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে পায়রাবন্দের অধিকাংশ যুবক অজ্ঞাত।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। দুয়েকজন এ সম্পর্কে দুচার কথা বলতে পারলেও তাতে রয়েছে তথ্যশূন্যতা। আসলে পড়াশোনা কম, মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত পড়া আরও কম। পায়রবন্দের বিভিন্ন গ্রামে শতাধিক যুবকের মধ্যে আমি মাত্র ১ জনকে পেয়েছি যে-ছেলেটি নিয়মিতভাবে রাজনীতিবিষয়ক বই পড়েছে। সে রফিকুল ইসলাম দুলাল, বয়স ২৮ বছর, এসএসসি পাস, এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বই পড়েছে, তার মধ্যে রাজনীতি সমাজনীতির বইও রয়েছে। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে প্রায় ৫শ বই।

দুলাল আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। এর আগে আমার গ্রাম-জরিপের বেশকিছু কাজ করে দিয়েছে। কিন্তু '৯২-এর মার্চে পায়রাবন্দে গিয়ে দেখলাম জ্ঞানী এই ছেলেটির চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিনরাত একটানা এবং হারিকেনের স্বল্প আলোয় পড়তে পড়তে চোখের দ্যুতি হারিয়ে ফেলেছে সে।

দুলাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন, চশমা নিলে কাজ হবে না, অপারেশন করতে হবে। সে অপারেশন আবার এদেশে সম্ভব নয়, যেতে হবে মাদ্রাজে।

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁরাও কখনো কখনো বলে থাকেন যে, রাজনীতিকে আর শহরের গণ্ডিতে ধরে রাখলে চলবে না, গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। গ্রামের মানুষকে করতে হবে রাজনীতিসচেতন। কিন্তু তা মুখের কথাই রয়ে গেছে। পায়রাবন্দের মতো একটি শহর-নিকটবর্তী ইউনিয়নে, ১২৬২১ জন যেখানে ভোটদাতা, সেখানে হাজারখানেক মানুষ মাত্র ৬টি রাজনৈতিক দলের সদস্য কিংবা সমর্থক। এদের মধ্যে আবার মহিলা অংশটি, হাতেগোনা কজন বাদে বলতে গেলে রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন।

না, রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, মানুষের অধিকার, দাবি-আন্দোলন, এসব কথা শোনেনি পায়রাবন্দের গ্রাম-গণ্ডগ্রামের সহস্র মানুষ। এরা নানাভাবে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, লোকগণনার সময় নাম ওঠে, ভোটার-তালিকাভুক্ত, অর্থ কিংবা ব্যক্তিপ্রভাব যে কারণেই হোক ভোটও দেয়, কিন্তু খাদ্যাভাবে যেমন থাকে অভুক্ত তেমনি রাজনীতির আলো থেকেও অনেক দূরে। এদের ১শ জন পুরুষ ও ৫০ জন মহিলার সাথে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কথা বলেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১শ পুরুষের মধ্যে রয়েছে দিনমজুর, অতি ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কলু, নাপিত, ভিক্ষুক, সবজি ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, হাটের চা দোকানদার। এদের মধ্যে ২ জন মাত্র ৪টি রাজনৈতিক দলের নাম বলতে পেরেছেন, ৪ জন বলেছেন ৩টি দলের নাম, ৬৫ জন বলেছেন ২টি দলের নাম, ১০ জন বলেছেন ১টি দলের নাম। বাকি ১৯ জন একটি দলের নাম বলতে পারেননি, কিংবা এ প্রশ্নের জবাব দেননি। ৫০ জন মহিলার মধ্যে ১ জন ৩টি দলের নাম বলতে পেরেছেন, ২ জন ২টি দলের নাম বলেছেন, ১০ জন ১টি দলের নাম বলেছেন, ৩৭ জন কোনো দলের নাম বলতে পারেননি বা এ-সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেননি। তা-ও আবার পুরুষ ও মহিলাদের অধিকাংশই ঐসব রাজনৈতিক দলের নাম উচ্চারণ করছেন অশুদ্ধ ও বিকৃতভাবে। যেমন অনেকে আওয়ামী লীগকে বলেছেন 'মজিবের পাটি, কিংবা 'হাসিনার পাটি', কিংবা 'নৌকা মারকা পার্টি'। বিএনপিকে বলেছেন, 'জিয়ার পার্টি, 'খালেদার পার্টি, কিংবা 'ধানের শীষ মার্কা পাটি'। জাতীয় পার্টিকে বলেছেন 'এশ্‌শাদের পাটি'। হ্যাঁ, 'দল' না বলে পাটি কথাটা বলেছেন প্রায় সবাই। এই 'পাটি' হলো পার্টির আঞ্চলিক উচ্চারণ। একইভাবে ভোটকে বলেন তারা 'এ্যালেকশন' কিংবা 'রিলেকশন', ভোটার-তালিকাকে বলেন, 'ভোটার লিস্টি।' সরকার বললে বোঝেন না অনেকে, বোঝেন গরমেন্ট (গভর্নমেন্ট)। বোঝেন চ্যারমেন, মেম্বর। রাজনীতি নয়, দুয়েকজন আবার বোঝেন, 'পলিটিচ্‌' কথাটা। 'পলিটিচ্‌' মানে পলিটিক্স, কিন্তু ওদের কাছে ব্যবহৃত হয় শঠতা ও ষড়যন্ত্রবোধক একটি শব্দ হিসেবে। যেমন একজন বলেছেন, 'মেম্বর সাইব পলিটিচ্‌ করি মোর ভুঁইখান কিনি নিলে।' অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন এ-রকম মেম্বার সাহেব ষড়যন্ত্র করে আমার জমিটুকু গ্রাস করলেন।

ঐ ১৫০ জন পুরুষ ও মহিলার সাথে কথা বলে বোঝা যায় : 'মজিবর' (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) এখনও এঁদের স্মৃতিতে রয়েছেন, বলতে পারেন 'পেচিডেন্ট জিয়া' (প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান)-র কথা। চোখে দেখেননি, লোকমুখে গল্প শুনেছেন। শুনেছেন গুলি করে ওঁদের দুজনকেই হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কে করেছে, কী কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল, এসব ওঁদের কাছে স্পষ্ট-পরিষ্কার নয়। মজিবরের বেটি হাসিনা, জিয়ার বউ খালেদা, এশ্‌শাদের বউ রওশন এশ্‌শাদ, এঁদের নাম শুনেছেন। 'জিয়ার বউ খালেদা এ্যালা দ্যেশের পেচিডেন্ট, এমন কথাটি বলতে পারলেও তিনি যে আসলে প্রেসিডেন্ট নন প্রধানমন্ত্রী, কিংবা কোন্‌ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসেছেন, সে সম্পর্কে আদৌ কিছু জানা নেই।

: গণতন্ত্র বোঝেন আপনারা?

মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন পায়রাবন্দের দুঃস্থ-দুঃখী মানুষজন।

: জাতীয় সংসদ বোঝেন? যেখানে আপনাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে কথা বলা হয়ে থাকে?

ওঁরা ফ্যালফ্যাল করে তাকান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: মানুষের মৌলিক অধিকারের কথাটি শুনেছেন কখনো? শুনেছেন কি নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার আপনাদের জন্যে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেবে, আশ্রয় শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে?

মাথা নাড়ায়।

না, ওঁরা এসব কথা কখনো শোনেনি। বরং চোখেমুখে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভঙ্গি করে যেন প্রশ্নগুলো নিজের কাছেই মনে হয় হাস্যকর। আমি যেন এক প্রহসনের সংলাপ বলছি।

জবাব মেলে না। তবে পাল্টা প্রশ্ন আসে।

: 'তোমরা কোন্ পার্টির মানুষ বাহে?' অর্থাৎ আপনি বাপু কোন্ রাজনৈতিক দলের লোক?

কেউ বলেন, 'গরমেন্ট হামাক ভাত কাপড়ার ব্যবস্থা করি দিবে, ইগ্‌লা ফির কোন্ পাগলা কতা কন?' অর্থাৎ সরকার আমাদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেবে, এসব আবার কী ধরনের পাগলের প্রলাপ?

আমি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি। ব্যর্থ হই। বেগম রোকেয়ার জন্মভূমিতে যে ঘোর অন্ধকার, সেখানে দাঁড়িয়ে খুব অসহায়বোধ করতে থাকি। দেশময় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে মহীয়সী নারী বহুবছর আগে গত হয়েছেন, তাঁর আঁতুরঘরের চারপাশে মূলত নিরক্ষতার কারণে সৃষ্ট এই যে বিরাট ঘন সামাজিক অসচেতনতা, তা দূর করবার জন্যে এগিয়ে আসবেন কে? পশ্চাৎপদ নর-নারীকে সামনে টেনে নেওয়ার জন্যে রাজধানীর মঞ্চে গালভরা বুলি কপচানোই কি যথেষ্ট? নাকি ...

AMARBOI.COM

বেগম রোকেয়ার যুগেও পায়রাবন্দে কুসংস্কার ছিল, ছিল নানা কুপ্রথা। এত বছর পরেও সেগুলো বেশকিছু রয়ে গেছে। যেমন '৯২-এর মার্চে পায়রাবন্দে নেমেই শুনলাম জয়রামপুর-আনোয়ার গ্রামে কদিন আগে ৫ বছর বয়সের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। না, কোনো পুরুষের সাথে নয়, বিয়ে হয়েছে তার একটি গাছের সাথে। গাছের সাথে বিয়ে? কী-রকম?

জয়রামপুর-আনোয়ার গ্রামে গেলাম। মেয়েটির পিতা নবিরউদ্দিন একজন ক্ষেতমজুর। সে বাড়িতে ছিল না। দেখা মিলল তার স্ত্রী ফাতেমার সাথে।

ভাঙা-প্রায় একখানা কুঁড়েঘর, আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই। ছেঁড়া মাদুর পেতে দিলেন ফাতেমা তাঁর ছোট্ট উঠোনে, পাশের কোনো বাড়ি থেকে চেয়ে আনলেন গুয়াপান। তারপর বললেন তাঁর মেয়ে নুরেজা খাতুনের বিয়ের কাহিনী।

নুরেজা খাতুন ধারেকাছেই কোথাও খেলছিল, ছুটে এলো, মায়ের কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অতি বিস্ময়ের চোখে। পরে ছবি তোলার সময় তার কী কান্না! অনেক ভুলানোর পর উপহার দিল সে একটুকরো চমৎকার হাসি।

ফাতেমা জানালো, না, একবার নয়, এ পর্যন্ত দুবার নুরেজার বিয়ে দেওয়া হয়েছে গাছের সাথে। প্রথমবার একটি জিগাগাছের সাথে বিয়ে হয়, তাতে নাকি উদ্দেশ্য সফল হয়নি, পরে একটি পাকুড় গাছের সাথে ওর বিয়ে হয়। ফাতেমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবরণ এ-রকম : নুরেজার বয়স যখন দু বছর তখন সে জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে। ফাতেমার ভাষায় 'পোড়া বাইগনের শাকান' অর্থাৎ পোড়া বেগুনের মতো হয়ে যায় চেহারা। সন্তান বলতে একটিমাত্র মেয়ে, তার এই দশায় পিতামাতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু কোনো ডাক্তারের কাছে মেয়েকে নিয়ে যায়নি। যায় গ্রামের এক কবিরাজের কাছে। সেই কবিরাজ পরামর্শ দেয়, কোনো ওষুধপত্রে কাজ হবে না। কেননা মেয়েকে ভূতে ধরেছে এবং ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো : মেয়েকে কোনো-একটি গাছের সাথে বিয়ে দিতে হবে।

বিয়ের-আয়োজন চলে। বর হিসেবে নির্বাচন করা হয় একটি জিগাগাছ। জিগা একটি ফলহীন বৃক্ষ যার ডাল দিয়ে গ্রামে ফসলের ক্ষেতে বেড়া দেওয়া হয়। এর কাণ্ড কাটলে একধরনের রস বেরোয় যা ঘন হলে আঠা হয়। জিগাগাছের ছাল থেকে নাকি কবিরাজরা জন্ডিসের ওষুধও বানায়।

যাই হোক, গ্রামের এক মৌলবিকে দিয়ে ঐ জিগাগাছের সাথে বিয়ে পড়ানো হয় নুরেজা খাতুনের। বিয়ের আগে মেয়েকে শাড়ি পরানো হয়, চোখে আঁকা হয় কাজল। কবিরাজ-প্রদত্ত একটি মালা হলুদ-লেপা জিগাগাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে দেওয়া হয় মেয়েটির হাতে। বিয়ে উপলক্ষে মুরগি জবাই করে পাড়া-প্রতিবেশীকে ভাত খাওয়ানো হয়। বিয়ের গীতের আয়োজন ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্যে খাদ্য ছাড়াও সরবরাহ করা হয় বিড়ি এবং গুয়াপান। সবাই মেয়েটির জন্যে দোয়া করে।

AMARBOI.COM

তবু নুরেজা রোগমুক্ত হয় না। আবার সেই কবিরাজের দ্বারস্থ হয় পিতামাতা। কবিরাজ বলে, জিগাগাছ নয়, বট কিংবা পাকুড় গাছের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। ওরা তা-ই করে।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ওদের বাড়ি থেকে দূরে নয়, তবু এতদিন সেখানে যায়নি নবিরউদ্দিন কিংবা ফাতেমা। মেয়ে যখন মরো-মরো তখন প্রতিবেশী এক যুবকের পরামর্শমতো ফাতেমা সেখানে নিয়ে যায় নুরেজাকে। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সেবনের পর নুরেজা কিছুদিনের মধ্যেই যেন নবজন্ম লাভ করে, স্বাস্থ্য ফিরতে থাকে তার।

ফাতেমা এখন খুশি। কিন্তু আলাপ করে বুঝতে পারি, ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দেওয়া ওষুধ খাবার ফলেই নুরেজা সুস্থ হয়ে উঠেছে এটা সে এখনও বিশ্বাস করে না। তার ধারণা এরকম যে, দ্বিতীয়বার ঐ পাকুড় গাছের সাথে বিয়ে পড়ানোর ফলেই কাজ হয়েছে। কবিরাজ নাকি তা-ই বলেছে। কবিরাজ বলেছে, 'আমি স্বপ্ন দেখেছি গাছের সাথে বিয়ে হলে তোমার মেয়ে ভালো হবে। আমার স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না।'

বলা বাহুল্য, কবিরাজটি অত্যন্ত চতুর। সে পাঁচ দফায় ৫০ টাকা খসিয়েছে, বিয়ে পড়ানোর পর ভরপেট খেয়েছে দুবার। আমি তার সাথে দেখা করতে যাই দুবার, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তার বাড়ি থেকে বলা হয়, সে নাকি 'বিদেশে' চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। এই বিদেশ মানে অন্য দেশ নয়, রংপুরেরই অন্য একটি দূরাঞ্চল। কবে ফিরবে তা বলে যায়নি।

বছর দশেক আগে পায়রাবন্দে যেসব কুসংস্কার কুপ্রথা অন্ধধারণা বিদ্যমান ছিল তার মধ্যে দুয়েকটি এখন আর নেই। যেমন ৭ বছর আগে পায়রবন্দে জরিপকাজ করার সময় আমাকে ভেতর-গ্রামে যেতে হয়েছিল লুঙ্গি পরে। কেননা, গ্রামের অনেক মানুষের ধারণা ছিল প্যান্টশার্ট-পরা লোক দেখলে নাকি তাদের 'সাঁইত' নষ্ট (যাত্রা নাস্তি) হয়ে যাবে। সে-সময় শুনেছি, বিয়ের রাতে স্বামীর পায়ের বুড়ো আঙুল-ধোয়া পানি পান করে থাকে নববধূ। '৯২-এর মার্চে শুনলাম এ দুটি প্রথা বা বিশ্বাস এখন প্রায় উঠে গেছে। তবে মাটির সাথে শিকড়ের মতো গেঁথে বসে আছে সেই পুরনো আমলের অনেকগুলো। পুরুষশাসিত পায়রাবন্দের গ্রামের মেয়েরা একেই তো বাড়ির আর সব পুরুষের খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পরে পোড়া-তলানি খেতে বসে, তার ওপর আবার ভাতের গ্রাস তোলার সময় মুখের হাঁ বড় করতে পারে না। হাঁ হাঁ করে ওঠে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি। এভাবে ভাত খেলে নাকি অমঙ্গল হবে সংসারের।

পায়রাবন্দের গ্রামগুলোতে এখনও এমন সব প্রথা চালু আছে শুনলে অবাক হতে হয়। যেমন শুনলাম, গাভী যদি দুধ কম দেয় তা হলে গাভীর মালিক মিঠাপুকুরের পশু হাসপাতালে যায় না, সে 'মনুয়া' জাতের একটি কলা সংগ্রহ করে তা দা কিংবা ছুরি দিয়ে এক কোপ মেরে কেটে ফেলে। এতে নাকি গাভী দুধ বেশি দেবে। গাভীর পায়ে বা খুরে ঘা হলে তাতে ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারে কৃষক উৎসাহী নয়, সে একটুকরো কাগজে লেখে গ্রামের ৪ জন সুদখোরের নাম, তারপর সেই কাগজটি বাঁশের টুকরোর সাথে বেঁধে তাবিজের মতো করে ঝুলিয়ে দেয় গাভীর গলায়। ধারণা এতে ঘা সেরে যাবে। গাভীর বাছুর হলে পরে তার ফুল-নাড়ি কলাপাতায় জড়িয়ে ফেলে দিয়ে আসা হয় নদীতে। ধারণা এতে গাভীটি নদীর পানির মতো অঢেল দুধ দেবে। নতুন গরু কিনে আনবার পর কৃষক লাঙল জুড়ে দেয় কিন্তু তার আগে গড়গড়ি পিঠা বানিয়ে খাওয়ানো হয় হাইলাকে, কয়েকটি পিঠা আবার টিনের ঘরের চালে ছুড়ে দেওয়া হয়। এ-রকম কাজ করার পেছনে কৃষকের ধারণাটি হলো : লাঙল টানার সময় বলদ হাঁটবে তাড়াতাড়ি। শিশুর হাম হলে টিকা দেওয়ার ব্যাপারটি অধিকাংশ পরিবারে অজ্ঞাত। অধিকাংশই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও যায় না ওষুধ নিতে। বরং হাম-আক্রান্ত শিশুকে ৭টি পিঁড়ি একত্র করে তাতে বসিয়ে গোসল করায়। এতেই নাকি রোগমুক্তি ঘটে। কোলের শিশুর পেটের পীড়া হলে কালোবরন ছাগলের দুধ এবং সরেয়া গাছের আঠা একত্র করে খাওয়ানো হয়। ছেলেমেয়েদের প্রস্রাবের গোলমাল হলে পরে কোনো-একটি কুয়ো থেকে কাদা তুলে তা একটি হাঁড়িতে ভরানো হয়, তারপর সেই হাঁড়িটি বসিয়ে দেওয়া হয় সন্তানের নাভিতে। পেটের গোলমাল দেখা দিলে একটি চটের থলিতে কাদা ভরানো হয়, তাতে পোঁতা হয় একটি বাঁশের কাঠি। সেই কাঠিতে ন্যাকড়া পেঁচিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। পোড়া ন্যাকড়ার ছাই মালিশ করা হয় পেটে। ...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেটের অসুখ এমনকি ডায়রিয়া হলেও মনে করা হয়, শিশুর ওপর কারও 'কুদৃষ্টি' পড়েছে এবং তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কয়েক মুঠো ছাই বাড়ির চারিদিকে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

এসব কেন করে, অধিকাংশই তা জানে না। বলে, 'আমাদের বাপ-দাদারা করেছে, আমরাও করি।'

পায়রাবন্দে শুনলাম, ফসলের ক্ষেতে পোকার আক্রমণ হলে কীটনাশক ওষুধ ছিটানোর চেয়ে এখনও সেই বাপ-দাদার আমলের পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক কৃষক। গর্ভধারণের পর ৭ থেকে ৯ মাসের মধ্যে প্রসব হয়েছে এমন একটি কিশোর বেছে নেয়া হয়। সেই ছেলেটিকে প্রথমে খাওয়ানো হয় চালভাজা, তারপর তার পরনের লুঙ্গি খুলে মাথায় বেঁধে দেওয়া হয়। ছেলেটি পোকা-আক্রান্ত জমির চারধারে ঘুরতে থাকে। এতে নাকি ধ্বংস হবে পোকা। লাউয়ে যদি পোকা লাগে, একের পর এক পচে যেতে থাকে, তা হলে একটি পচা লাউতে তিনটি কাঠি গেঁথে দেওয়া হয় এবং তা রেখে আসা হয় গ্রামের কোনো তেমাথায়। কলা পাকতে দেরি হলে প্রথমবারের মতো দুধ দিচ্ছে এমন গাভীর দুধ ছিটিয়ে দেওয়া হয় কলার ছড়ার ওপর। কলা কেটে ঘরে নিয়ে আসার আগে নিচের দিকের একটি কলা দু টুকরো করে কেটে তা জঙ্গলে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সুপারি পেড়ে আনার পর দেখা যায়, সুপারির ছড়াটি কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। এতে করে নাকি পরবর্তী বছর আরও বেশি করে সুপারি ধরবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই এ-রকম প্রথা-প্রচলন রয়েছে, রয়েছে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু পায়রাবন্দের শিকড়-সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মনে হয়েছে এখানে এগুলো ঘটছে বেশি। জন্ম থেকে মৃত্যু, চাষাবাদ, ঘর-গেরস্থালির কাজ, প্রতিটি ক্ষেত্রে বহাল রয়েছে অহেতুক হাজারো প্রথা-পদ্ধতি। নবজাতক কন্যাসন্তানের চুল কামিয়ে কলাপাতায় মুড়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এ-কারণেই যে, মেয়েটির চুল তাড়াতাড়ি লম্বা হবে। নিতান্তই অন্ধবিশ্বাসের ব্যাপার, তবু এর মূলে রয়েছে কন্যার মঙ্গলকামনা। কিন্তু, সেই মেয়েটি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তো তাকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় না বরং বিয়ে দেওয়া হয় গাছের সাথে! কিংবা পাঠশালার বদলে পাঠানো হয় শ্বশুরবাড়ি! মনে করা হয়, অল্প বয়সে বিয়ে দিলে মেয়েটি তাড়াতাড়ি গৃহকর্মে সুনিপুণা হয়ে উঠবে।

কী কারণে মানুষের মাথায় ভর করে আছে এইসব অজস্র প্রথা-পদ্ধতি তা যাচাই করে দেখবার জন্যে সমাজ-গবেষকের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই তত্ত্বকথার। বেগম রোকেয়ার আত্মার শান্তির জন্যে অন্তত অবিলম্বে এখানে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা-সচেতনতার কাজ শুরু করতে হবে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাকে। প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বরে রোকেয়ার জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন আর লম্বা বক্তৃতা করে শুধু লাভ নেই।

অন্যান্য এলাকার মতো পায়রাবন্দের গ্রামগুলোতে মুখের কথায় তালাক যেমন হয়ে যায়, তেমনি আছে 'হিল্লা' প্রথা। হিল্লা মানে মুখে তালাক উচ্চারণের পর স্বামীটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি আবার সেই মেয়েটিকে (স্ত্রী) বিয়ে করতে চায়, তা হলে আরেকজন পুরুষের সাথে তার বিয়ে দিতে হবে, 'ঘর' করতে হবে অন্তত একরাতের জন্যে। তারপর আবার মেয়েটি এই 'একরাতের স্বামীর' কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্ত হবে, আবার নতুন করে বিয়ে পড়ানো হবে পূর্বস্বামীর সাথে। রাগের বশে তালাক উচ্চারণ এবং পরবর্তীতে 'হিল্লা' করে বিয়ের শতাধিক ঘটনা রয়েছে পায়রাবন্দের বিভিন্ন মৌজায়। নারীর ওপর বিভিন্ন যে সামাজিক নির্যাতন এটা তারই একটা অংশ। তবু তা মুখ বুজে সহ্য করে মেয়েরা। তবে 'নিজেরা করি' নামের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটি পায়রাবন্দের গ্রামে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টির কাজে আসবার পর, কিছুসংখ্যক মহিলা যখন সংগঠিত হয়েছে, তখন হিল্লার ব্যাপারে এসেছে অন্তত একটি স্পষ্ট প্রতিবাদ। ঘটনাটি নাড়া দিয়েছে গ্রাম-সমাজের বিভিন্ন স্তরে।

ইসলামপুর গ্রামের আজিফা হিল্লার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটি 'নিজেরা করি'র ১ নম্বর দলের সদস্য। পরের বাড়িতে শ্রম দিয়ে যা উপার্জন করে তা থেকে সঞ্চয়ও করে কিছু-কিছু।

আজিফার স্বামী দুদু মিয়া তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার স্ত্রীকে মৌখিক তালাক দেয়। পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে আজিফাকে বিয়ে করতে চায় আবার। কিন্তু বিয়ে হবে কী করে? প্রয়োজন হিল্লার। গ্রামের মোড়ল মাতবর মৌলবি মুন্সি এ-রকম ফতোয়াই দিয়েছেন।

কিন্তু আজিফা, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যে-মেয়েটি আগের চেয়ে অনেকটা সচেতন, সে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্বামীর কাছে ফিরে যেতে তার আপত্তি নেই কেননা লোকটা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু হিল্লার নামে আরেকজন পুরুষের সাথে রাত্রিযাপন সে করবে না। সে পরিষ্কার বলে দিল : 'আমি কোনো দোষ করিনি তবু স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে আবার বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সেজন্যে আমি কেন আরেকজনকে বিয়ে করব? না, তা হতে পারে না।'

আজিফা ব্যাপারটি তার দলের অন্য সদস্যাদের জানায়। তারা সমর্থন করে আজিফাকে। সমবেত সিদ্ধান্ত হয়, যদি হিল্লা ছাড়াই বিয়ে হয়, হবে, তা ছাড়া উপায় নেই। তালাকপ্রাপ্তা আজিফা এখন অসহায় নয়, নিজে কাজ করে খায় ...।

ফতোয়ার তোয়াক্কা না করে দুদু মিয়া আবার বিয়ে করে আজিফাকে। তবে হিল্লার মাধ্যমে নয়। বিয়ের আগে শুধু তওবা উচ্চারণ করে সে। আসলে বিয়ের ব্যাপারে দুদুর গরজ ছিল। রাগের মাথায় তালাক উচ্চারণ করলেও স্ত্রীকে সে ভালোবাসত। আর সে নিজেও চাইছিল না যে তার স্ত্রী একরাতের জন্যে আরেকজন পুরুষের ঘর করুক।

এই দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে গ্রামে দ্বিমত রয়েছে। অনেকেই বলে হিল্লা ছাড়া বিয়ে শরিয়ত মোতাবেক হয়নি। কিন্তু কারও কথার তোয়াক্কা না করে সংসার জীবনযাপন করছে দুদু-আজিফা দম্পতি।

এই ঘটনাটি কারও কাছে বিচ্ছিন্ন মনে হতে পারে। তবুও আমি তা তুলে ধরলাম। এর আগে আকলিমার জেগে ওঠার কথা বলেছি, তার নিজের নিরাপত্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেই গড়ে তোলার কাহিনী লিখেছি, বলেছি হাওয়া বিবির স্বনির্ভরতার কথা। এখন আরও শিকড়ে এসে দেখতে পাচ্ছি, অন্তত দু-চারটি ক্ষেত্রে হাওয়া বদল হচ্ছে। হিল্লা প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে একটি মেয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। পায়রাবন্দের শিকড়-সংবাদ লেখার এই পর্যায়ে এসে অনেক দূরে হলেও আমি একটুখানি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি পায়রাবন্দের তাবৎ নির্যাতিতা নারী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে একদিন ঘোষণা করেছে একত্র এবং সুসংগঠিত বিদ্রোহ।

পায়রাবন্দে কোনো কোনো এলাকায় রয়েছে 'সমাজ'। কেউ বলে 'জামাত', কেউ বলে 'দল'। এগুলো সাধারণত মসজিদ কিংবা মহল্লাভিত্তিক, তবে রাজনীতি থেকে দূরে। এই 'সমাজ'-এ ছোটখাটো বিচার অনুষ্ঠিত হয়, হয় ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা। কেউ ধর্মবিরোধী কাজ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বহুযুগ আগে থেকে এই 'সমাজ', 'জামাত' বা 'দল' চালু রয়েছে। বেগম রোকেয়ার জন্ম-গ্রাম খোর্দ মুরাদপুরে একটি 'সমাজ' রয়েছে। এটি উত্তরপাড়া মসজিদভিত্তিক এবং এর পরিচালনক হলেন মসজিদটির মোতয়াল্লি দৌলতুজ্জামান। ইনি একজন মিল ব্যবসায়ী।

এই 'সমাজ'-এ অপরাধীকে দোররা মারার বিধান রয়েছে। তবে আসল দোররা নয়, এখন মারা হয় বাঁশের কঞ্চি। সমাজ-প্রধান নিজের হাতেই মারেন। 'সমাজ'-এর রায়ের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে ঘা মারার আদেশ দেওয়া হয় বেজোড়া। হয় ৫১টা, নতুবা ১০১টা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো : মার দেওয়া হয় কৌশলে। যেমন ১০টি কঞ্চি একত্র করে ৯ বার এবং পরে ১১টি কঞ্চি একত্র করে ১ বার ঘা দেওয়া হয়। এতে করে কঞ্চির চামড়া-কাটা সপাং সপাং আঘাত নেই, গা ফেটে রক্তও বেরোয় না, তবে ১০১টি দোররার বদলে ১০ বার মোটা মার খেয়ে অপরাধীর গা ফুলে যায়। ১০/১১টি কঞ্চি একত্র করে মারার কৌশলটি খোর্দ মুরাদপুরের 'সমাজ' নাকি নিজেরাই আবিষ্কার করেছে। একজন বললেন, অপরাধী শরীরে কতটা আঘাত পাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, আসলে মানুষকে দেখানো হয় যে বিচারের রায়ে তাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। আরেকজন বললেন, কঞ্চির মার সে দারুণ ব্যাপার। ১০১টা ঘা খেলে অপরাধী মারাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কঞ্চি একত্র করে ৯/১০ বার মারা হয়। তা-ও খুব জোরে নয়, আস্তে আস্তে।

অবশ্য অনেকক্ষেত্রে দোররা মারলেও সমস্যার সমাধান হয় না। ব্যাপারটি আরও সামনে গড়ায়। যেমন কিছুদিন আগের কথা, পরস্ত্রীকে ধর্ষণের সময় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ল এক বদমাশ যুবক। মেয়েটি বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, ঐ যুবক জোর করে তার ঘরে প্রবেশ করে এবং ধর্ষণ করে তাকে।

'সমাজ' এই ঘটনার বিচার করে। যুবকটি তার অপরাধ স্বীকার করলে বিচারের রায় অনুসারে তাকে ঐ ১০১টি দোররা মারা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এতে করে মেয়েটির সমস্যার সমাধান হয় না, বরং বাড়ে। ঘটনার খবর পাবার পর মেয়েটির স্বামী তাকে নিতে আসে না, বরং তালাকের খবর পাঠিয়ে দেয়।

মেয়ের বাবা আবার বিচার প্রার্থনা করে। 'সমাজ'-এর কাছে নয়, ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে। চেয়ারম্যান শালিস বৈঠক বসায় এবং এখানকার রায়ে ঐ যুবকের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জরিমানার নগদ টাকা অপরাধী যুবকটি দিতে পারেনি, বদলে মেয়েকে লিখে দিয়েছে ১০ কাঠা জমি। এই জমি এখন মেয়ের বাবা ভোগ করছে। মেয়েটি রয়েছে পিতৃগৃহে। স্বামী তাকে আর নেয়নি।

'সমাজ'-এর বিচার না মানলে অপরাধীকে একঘরে করার ব্যবস্থা রয়েছে। বন্ধ হয় কথাবার্তা, কেউ তাকে কোনো অনুষ্ঠানে ডাকে না। ধর্মীয় ব্যাপারে চাঁদা নিতে যায় না, দেয় না টাকাপয়সা ঋণ, খাদ্যশস্য সাহায্য করে না। তবে হ্যাঁ, এই 'একঘরে' কাটানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। অপরাধীকে এসে 'সমাজ'-এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সমাজ-প্রধান তখন ৩ বার তওবা পড়াবেন। অপরাধীকে উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে 'আমি আর কখনো এ ভুল করব না।'

এবং এভাবেই আবার তাকে 'সমাজ'-এ তুলে নেওয়া হয়। অপরাধী ব্যক্তিটি সাধ্যবান হলে দাওয়াত করে সমাজ-সদস্যদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করেন।

AMARBOI.COM

আগে 'সমাজ'-এর বিচার খুব কড়া ছিল। এখন বেশ খানিকটা হালকা হয়ে এসেছে। তবে '৯২-এর মার্চে দেখলাম, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুব প্রতাপ-প্রতিপত্তির সাথে কিছু অপরাধ ঘটনার বিচার করছেন। গ্রাম সফরকালে খবর পেলাম জাফরপুরে এক যুবক ধরা পড়েছে। একটি মেয়েকে ধর্ষণ করার জন্যে সে ছুরি দিয়ে ঘরের বেড়া কেটে ঘরের ভেতর ঢুকেছিল। মেয়েটির মুখে কাপড় পেঁচিয়ে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে, কিন্তু গোঙানিতে টের পেয়ে যায় মেয়ের পিতা। ছুরি হানার আগেই জাপটে ধরে তাকে। যুবকটি অনেক ধস্তাধস্তি করেও মুক্ত হতে পারেনি।

সকালবেলা আমরা ঘটনাস্থলে হাজির। দেখি গোটা গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে। ধৃত যুবকটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে মেয়েটির বাড়ির ধারে একটি গাছের সাথে। ইতোমধ্যে গণপিটুনিতে দাঁত ভেঙে গেছে তার, ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। জামা লুঙ্গি ছিন্নভিন্ন, মার খেতে খেতে দুগালে গভীর কালো দাগ পড়ে গেছে। একজন চৌকিদার তবুও অব্যাহত রেখেছে লাঠির মার। যুবকটি আর্তচিৎকার করছে আর অন্যদিকে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ লোকজন বলছে, 'শালাকে খতম করে ফ্যালো। মারো হারামজাদাকে।'

শত শত নর-নারী শিশু। ঘরে যেন কেউ নেই, দেখতে এসেছে যুবকের সাজা। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দেখি একদিকে বেঞ্চ পাতা, সেখানে বসে আছেন মেম্বার এবং গ্রামের মোড়ল মাতবর। একটি চেয়ারে বসা চেয়ারম্যান সাহেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনলাম, বিচারকাজ শুরু হয়েছে। 'জনগণের অনুরোধে' এখন একটু মারপিট করা হচ্ছে, তারপর আলাপ-আলোচনার পর ঘোষিত হবে রায়। চেয়ারম্যান জানালেন, তিনি গ্রামে গ্রামে এ-রকম গণআদালত গড়ে তুলতে চান। নইলে 'ব্যাটারা' শায়েস্তা হবে না।

ধর্ষণের মতো গুরু অপরাধের দায়ে ছেলেটিকে থানায় পাঠাচ্ছেন না কেন? ওকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া দরকার ...।

কথা শেষ হয় না। উপস্থিত লোকজনের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একজন চিৎকার করে বলে ওঠে : 'ওকে আমরা পুলিশের কাছে দেব না, নিজেরাই বিচার করব।' আরেকজন বলল, 'থানায় পাঠিয়ে কী হবে? ওখানে পয়সা খেয়ে হারামজাদাটাকে ছেড়ে দেবে! তার চেয়ে মারুক, আরও মারুক, মারতে মারতে মেরে ফেলুক ...।'

পরিস্থিতি আমার কাজের প্রতিকূলে চলে যেতে পারে, এই ভেবে চুপ করে থাকি। বুঝতে পারি এখানকার অনেকেরই স্থানীয় থানা-পুলিশের ওপর বিশ্বাস নেই। কী কারণে জানি না তাদের ধারণা জন্ম নিয়েছে, তারা পয়সা খেয়ে অপরাধীকে ছেড়ে দেবে।

ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ আর কিছু ছবি তুলে পায়রাবন্দের বাজারে ফিরে আসি। ঘণ্টা-কয়েক বাদে বিচারের রায় এসে পৌঁছায়। ছেলেটির মাত্র ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে টাকা তুলে দিতে হবে মেয়ের বাবার হাতে, নইলে আবার বিচার বসবে।

AMARBOI.COM

মাত্র ৩ হাজার টাকা জরিমানার কারণ হিসেবে পরে চেয়ারম্যান সাহেব জানালেন, 'আসলে রেপ তো করতে পারেনি, কেবল ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সে কারণে তিন হাজার টাকা 'ফাইন' সাব্যস্ত হলো। রেপ করলে তো দশ-বারো হাজারের নিচে ছাড়তাম না।'

আমি আর কী বলি! পরে অনেকেই অভিযোগ করলেন যে, এই যুবকটির বিচারের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নাকি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা যেত, কিন্তু তাঁর নির্দেশেই 'বিচারকমণ্ডলী' তা কমিয়ে দিয়েছেন।

জানা গেল : আমরা ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসবার পর অনেকেই বিশেষ করে সচেতন কিছু যুবক নাকি ছেলেটিকে মিঠাপুকুর থানায় সোপর্দ করতে বলে। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব তাতে রাজি হননি।

আমার একজন জরিপসহকারী বলল, থানায় যে দেওয়া হবে না, তা আমরা জানতাম। আর ঐ জরিমানার টাকা মেয়ের বাবা যে পাবে না, তাও জানি।

: কী-রকম?

সহকারী বলল, 'ঐ ছেলেটা, যার বিচার হলো, সে তো এক প্রভাবশালী মেম্বারের ভাই। ইলেকশনের সময় সে চেয়ারম্যানের পক্ষে কাজ করেছে। সেক্ষেত্রে থানায় পাঠাবে না। থানায় গেলে তো বহু টাকা খসে যাবে। এদিকে মেম্বারও চেয়ারম্যানের বিপক্ষে চলে যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকজন বলল, 'আসলে ঐ যেটুকু পিটুনি খেল, সেটাই ওর শাস্তি। কিন্তু জরিমানার টাকা কোনোক্রমেই দেবে না।

তা-ই হয়েছে। মেয়েটির বাবা আজও ঐ ৩ হাজার টাকা পায়নি।

পায়রাবন্দের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার চিত্রটি কী-রকম? পুরো অবস্থাটা জানা সম্ভব নয়, তবু চলুন না, রোকেয়ার জন্মভিটার পাশে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে সেখান থেকে একটুখানি ঘুরে আসা যাক!

১০ দশমিক ৬৬ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট ইউনিয়ন পায়রাবন্দ, লোকসংখ্যা এখন ২২ হাজারের কিছু বেশি। কিন্তু এদের অসুখে-বিসুখে চিকিৎসা করবার জন্যে একজন এমবিবিএস ডাক্তারও ২১টি মৌজার কোথাও কর্মরত নেই। পায়রাবন্দ এলাকার তিন জন এমবিবিএস-এর মধ্যে একজন থাকেন ঢাকায়, একজন রংপুরে, একজন কাজ করেন মিঠাপুকুরের পাশের থানা পীরগঞ্জে।

২১টি মৌজার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ১৪ জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ২০ জন হাতুড়ে ডাক্তার আর ১০ জন কবিরাজ-ফকির কাজ করে যাচ্ছেন। এঁদের আয়-উপার্জন খুব একটা মন্দ নয়।

পায়রাবন্দের মতো বিরাট এবং বিখ্যাত ইউনিয়নে একজন এমবিবিএস ডাক্তারও কর্মরত নেই শুনে বিস্মিত হই। নাটক-নভেলে দেখি, আদর্শবান যুবক ডাক্তার দুঃস্থ-গরিব মানুষের সেবার জন্যে গ্রামে চলে যাচ্ছেন, আমাদের দেশের অনেক তরুণ-তরুণী গ্রামের মানুষের সেবা করবার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নাকি মেডিকেলে পড়েছেন কিংবা পড়ছেন এমন কথা শুনতে পাই। তা আমি কি তাদের মধ্যে একজনকেও অনুরোধ করতে পারি যে, তিনি পায়রাবন্দ এলাকায় এসে একটা ডিসপেন্সারি খুলবেন? নাকি ব্যাপারটি একেবারেই অসম্ভব?

বহু নর-নারী-শিশু অসুস্থ এই জনপদে। শিশুরা ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগাক্রান্ত, এ ছাড়াও আছে রাতকানা। কৃমি-আক্রান্ত শিশু ঘরে ঘরে। মেয়েদের মধ্যে রক্তশূন্যতা বেশি। অনেক পুরুষ সাধারণ রোগ-বালাই ছাড়াও মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। রয়েছে হাঁপানি ও যক্ষ্মা রোগী এবং এদের অধিকাংশই যেহেতু অতি অভাবী, তাতে আবার অসচেতন, সে কারণে নির্ভর করে আছে হাতুড়ে ডাক্তার কিংবা কবিরাজের ওপর। পানিপড়া, তাবিজ তুম্বা, ঝাড়ফুঁক, এই হচ্ছে চিকিৎসা। কোনো কোনো গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পসারও ভালো।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে দৈনিক ২০ থেকে ২৫ জন রোগী আসে বিভিন্ন রোগ নিয়ে। মেডিকেল স্কুল পাস-করা একজন 'চিকিৎসা সহকারী' এদের রোগ-বিবরণ শোনেন এবং ওষুধ দেন। কিন্তু সব অসুখের ওষুধ মেলে কই? আমাদের সর্বশেষ সফরকালে (২৪ মার্চ '৯২) দেখলাম : এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে আমাশয়ের ওষুধ রয়েছে কিন্তু পাতলা পায়খানা নিরাময়ের মতো কোনোকিছু নেই। এমনকি মজুত নেই খাবার স্যালাইন পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, সবক্ষেত্রে সঠিক ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। রোগনির্ণয়ের মতো আধুনিক কোনো সরঞ্জাম নেই, মুখের বর্ণনা শুনে ব্যবস্থাপত্র লিখতে হয় চিকিৎসা সহকারীকে। তার উন্নত প্রশিক্ষণেরও অভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। প্রতিমাসে ৬০০ থেকে ৭৫০ জন রোগী আসে এখানে, কিন্তু সরকার থেকে বরাদ্দ বছরে মাত্র ৮ হাজার টাকার ওষুধ। সে হিসেবে (প্রত্যেককে ওষুধ দিলে) একেকজনের ভাগে পড়ে বছরে এক টাকার কিছু কম কিংবা সামান্য বেশি।

কী ধরনের রোগ নিয়ে আসে মানুষজন? স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগত ৬৫ জন রোগীর তথ্য নিয়ে দেখা গেল : এদের মধ্যে শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৩৫। বাকি ৩০ জনের মধ্যে ২৯ জনই মহিলা, ১ জন পুরুষ।

৩৫ জন শিশু-কিশোরের মধ্যে কৃমি-আক্রান্ত রোগী বেশি, ১১ জন। রাতকানা ৪ জন। কানে ঘা ২ জনের। পাতলা পায়খানা ও আমাশয়-আক্রান্ত ১৪ জন। বাদবাকি ৪ জন এসেছে জ্বর ও সর্দি-কাশি নিয়ে। ২৯ জন মহিলার মধ্যে রক্তশূন্যতায় ভুগছেন ১৪ জন। দাদ, ফোঁড়া, চোখের অসুখ, পেটের পীড়া, বাত ও মহিলাগত অসুখ ১৫ জনের। ১ জন পুরুষ, তার হয়েছে হাঁপানি। দীর্ঘ বছর ধরে কবিরাজি চিকিৎসার পর এই প্রথমবারের মতো সে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছে ওষুধ নিতে। কিন্তু ইতোমধ্যে রোগটি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যখন আর গ্রামে চিকিৎসা সম্ভব নয়, যেতে হবে রংপুর কিংবা মিঠাপুকুরের হাসপাতাল। কিন্তু সপ্তাহে ২/৩ দিন কাজ পাওয়া প্রৌঢ় ক্ষেতমজুরটির পক্ষে তা সম্ভব নয়। 'টাউনের দাক্তোরের কাছে যাবার মতোন পাইসা আছে হামার?' হতাশার কণ্ঠে বলল সে। অর্থাৎ শহরের ডাক্তারের কাছে যাবার মতো আমাদের কি টাকাপয়সা আছে?

দু বছর আগের পরিসংখ্যান হিসেবে পায়রাবন্দে সক্ষম দম্পতি, অর্থাৎ যারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম, এদের সংখ্যা ৪১৮৭। এখন আরও বেড়েছে এবং সক্ষম দম্পতির মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫০০। এদের মধ্যে মাত্র ১০ জন (মহিলা) সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি নিয়ে যায়। কনডম ব্যবহার করতে পুরুষেরা তেমন উৎসাহী নয়, নিতেও আসে না। অবশ্য আমাদের পরিদর্শন সময়ে জানা গেল ৬/৭ মাস থেকে এখানে কনডমের সাপ্লাই ছিল না, কেবলই এসেছে। শুনলাম জনাপঞ্চাশেক মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন 'ডিপোপ্রভেরা' নিয়েছে, কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে নানা দেহগত অসুবিধা ভোগ করছে।

পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ কাজে ৬ জন মাঠকর্মী পায়রাবন্দের বিভিন্ন এলাকায় 'কর্তব্যরত'। কিন্তু বিরাট একটি ইউনিয়নে, মৌজাসংখ্যা যেখানে ২১টি, রয়েছে বহু পাড়া-মহল্লা, সেখানে মাত্র ৬ জন মাঠকর্মীর পক্ষে কীভাবে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন সম্ভব? তার মানে সক্ষম দম্পতিদের ঘরে ঘরে গিয়ে মোটিভেশন ওয়ার্ক কিংবা ফলো-আপ হচ্ছে না। হাতেগোনা যে-কজন মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি নিয়ে যান, তা তাঁরা নিয়মিত খান না।

পায়রাবন্দের বেশ কয়েকটি ভেতর-গ্রামে গিয়ে আমি পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। অনেকে মাঠকর্মীকে চেনে না, চোখেও দেখেনি। দেবীপুর গ্রামে কয়েকজন মহিলা জানালো, এ এলাকায় নাকি অনেকদিন পরপর মাঠকর্মী এসে ঘুরে যায়। সদরপুরে শুনলাম, মাঠকর্মী আসে তবে দুঃস্থ গরিবদের ঘরে নয়, আসে গ্রামের অবস্থাপন্নদের বাড়িতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়রাবন্দ, যেখানে রয়েছে বাল্যবিবাহ যৌতুকপীড়ন তালাক তথা বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন, সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষদের মাথাব্যথা কম, বরং মেয়েরাই এ ব্যাপারে উৎসাহী বেশি। এ কারণেই ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রটিতে পুরুষদের আগমন তেমন ঘটে না, বড়ি এবং ইনজেকশন মেয়েরাই অনেক দূরের পথ হেঁটে সংগ্রহ করতে আসে। একজন মহিলা আলাপকালে বলল, সে নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে বড়ি খায়, কেননা স্বামী তা পছন্দ করে না, বরং মনে করে এসব না-জায়েজ কাজ। ... হ্যাঁ, পায়রাবন্দের গ্রামে বেশকিছু পুরুষের মধ্যে এখনও এমন ধারণা রয়েছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি ধর্মবিধিসম্মত নয়। দৈনিক আয় ১০ থেকে ১২ টাকা অথচ ঘরে ৪/৫টি অপুষ্টি-আক্রান্ত সন্তান রয়েছে এমন দরিদ্র একজন ক্ষেতমজুর আমাকে বলেছে, 'খোদার উপর খোদকারি করা মানুষের ঠিক নয়। জান দিবেন তিনি, খাওয়া দিবেন তিনি।'

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার চিত্র যেমন করুণ, তেমনি আবার সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম হয়েছে ব্যর্থ। পায়রাবন্দের সাড়ে ৪ হাজার সক্ষম দম্পতির মধ্যে একটি মোটা অংশ বছর বছর সন্তান প্রসব করছে জনসংখ্যার চাপে ভারী বাংলাদেশে।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে সচেতন করে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উদ্বুদ্ধকরণ কাজ। সেটি হচ্ছে না। সরকারি প্রতিষ্ঠান-নিয়োগকৃত মাত্র ৬ জন মাঠকর্মীর কাজ সন্তোষজনক নয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মোড়ল মাতবর, মসজিদের ইমাম, মৌলবি মুনশী, স্কুল-শিক্ষক—এঁরা তাঁদের ভূমিকা পালন করছেন না। কিছু যুবক, যারা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন, কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে লজ্জা পায় তারা। পাড়া-প্রতিবেশী প্রায় সবাই সম্পর্কে চাচা-চাচী, খালু-খালা, ফুফা-ফুফু; তাদের ঘরে গিয়ে সন্তান-উৎপাদন কমানোর কথাটি বলা যুবকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

AMARBOI.COM

'৭১-'৭২ সালের দিকে পায়রাবন্দের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৬ হাজার। এখন ২২ হাজারের বেশি। অর্থাৎ ২০ বছরের ব্যবধানে এলাকার জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৬ হাজার।

২০ বছর আগে লোকবসতি ছিল পাতলা, জমি ছিল সস্তা। দেড় থেকে দু হাজার টাকায় ১ বিঘা আবাদি জমি পাওয়া যেত। এখন সেই জমির দাম ৩০-৩৫ হাজার টাকা।

এ এলাকায় জমি যেমন সস্তা ছিল তেমনি বর্গা পাওয়া যেত সহজে, এন্তার। মূলত এ কারণে বগুড়া ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভূমিহীন মানুষ এখানে এসে বসতি গড়েছে, জমি কিনেছে কিংবা বর্গা নিয়ে চাষাবাদ শুরু করেছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। বাইরের এলাকা থেকে মানুষের আগমন প্রায় বন্ধ হয়েছে, বরং হালে দেখা যাচ্ছে এখানকার ভূমিহীনরা চলে যাচ্ছে কেউ সিলেটে, কেউ ঢাকায়। শুনলাম গত দেড়-দু বছরে কমপক্ষে দু শ যুবক চলে গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেট ও ঢাকা অঞ্চলে। সেখানে তাদের অধিকাংশই রিকশাচালনার কাজ নিয়েছে। কেউবা শহরের আশপাশের গ্রামে গিয়ে করছে ক্ষেতমজুরি।

বাইরে থেকে যারা এসেছে একসময়, তারা পায়রাবন্দের স্থানীয় লোকজনের ভাষায় 'বিদেশি'। তেমনিভাবে এখন যারা গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন জেলা এলাকায় চলে যাচ্ছে, তারা যাচ্ছে 'বিদেশ'-এ।

দু দশকের ব্যবধানে কী অবাক অবস্থান বদল! '৭১-'৭২ সালে বিরাহিমপুর জোতষষ্টী ইসলামপুর গ্রামে যারা এসেছে 'বিদেশ' থেকে, সস্তায় জমি কিনে কিংবা বর্গা নিয়ে শুরু করেছে আবাদ-সুবাদ, তাদেরই সন্তানরা আজ জীবিকার প্রয়োজনে চলে যাচ্ছে বিদেশে। এদেরই একজন শফি মিয়া। পায়রাবন্দ গ্রামে ক্ষেতমজুরি করত, দৈনিক খুবজোর পেত ১২ টাকা, সিলেটে এখন সে রিকশা চালায়, দৈনিক ৬০-৭০ টাকা আয় করে। সম্প্রতি সে 'দেশের বাড়িতে' (পায়রাবন্দে) বেড়াতে এসেছে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। তার পরনে পুরাতন বিদেশি প্যান্ট-শার্ট, কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি, পায়ে স্যান্ডেল, পকেটে আছে বেশকিছু টাকাও। ... শফি মিয়ার দেখাদেখি অনেক অশিক্ষিত বেকার যুবক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওর মতো তারাও চলে যাবে বিদেশে।

বাংলাদেশের বহু যুবক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজ নিয়ে চলে গেছে, এখনও সে প্রবণতা অব্যাহত। পায়রাবন্দের অশিক্ষিত ভূমিহীন এবং বেকার যুবক সে খবর রাখে না। ভালো আয়-উপার্জন এবং অবস্থা ফেরানোর জন্যে শফি মিয়ার মতো তারা সিলেট কিংবা ঢাকা শহরে যেতে চায়। যেতে চায় দেশ থেকে বিদেশে।

AMARBOI.COM

আর বিদেশে না গিয়ে এখানে করবেই-বা কী? জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে বর্গাচাষীর সংখ্যা, কিন্তু জমি মিলছে না। বেড়েছে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা, কিন্তু কাজ মিলছে না। মজুরির হারও তো খুব কম!

পায়রাবন্দে দেখলাম, দেশের অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতো এখানকার ক্ষেতমজুররাও বিরাট তথ্যশূন্যতায় রয়েছে। সরকার যে বহুদিন আগে তাদের মজুরির হার বেঁধে দিয়েছে, তা তারা জানে না, জানে না সরকার-নির্ধারিত মজুরির হার এখন কত! ভূস্বামীর বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা গতর খাটুনি দিয়ে মেয়েরা পায় আধা সের চাল আর একবেলা খাবার। একজন পুরুষ মজুর, দৈনিক ৮ থেকে ১২ টাকা পায়। এতেই তারা খুশি।

পায়রাবন্দে মজাগুয়া আর পানের প্রচলন রয়েছে। খুব গরিব ঘরে গেলেও ঐ মজাগুয়া আর পান এনে হাজির করবে আপনার সামনে। নিজের ঘরে হয়তো নেই, চেয়ে-মেঙ্গে আনবে পাড়া-প্রতিবেশীর ঘর থেকে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নের বাড়িতে চা-পানের প্রচলন বেড়েছে। আগে সকালে নাস্তা খেত পান্তা, এখন অনেক পরিবারে মুড়ি খৈ-এর সাথে সাথে এক পেয়ালা চা।

রংপুর অঞ্চলের বাইরের পাঠক যাঁরা, তাঁদের জন্যে ঐ মজাগুয়া সম্পর্কে বলা দরকার। এ এলাকায় প্রচুর সুপারি গাছ আছে, গৃহস্থরা গাছ থেকে পাকা সুপারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রহ করে একটি হাঁড়িতে ভরায়। হাঁড়িতে দেওয়া হয় পানি। তারপর সেই হাঁড়ির মুখ ভালো করে বন্ধ করে তা ৬/৭ মাস পুঁতে রাখে মাটিতে। সেই সুপারি হয়ে যায় 'মজাগুয়া'। উগ্র কটু পচা পচা গন্ধ, তবু তা খুব জনপ্রিয়। অভ্যাস না থাকলে এই গুয়ার একটুকরো আপনি যদি চিবোন, মাথা ঘুরবে, শীতের দিনেও ঝরবে ঘাম।

মজাগুয়ার দাম বেশি। ১০টি গুয়ায় হয় ১ গা, তার দাম এখন ১০ টাকা। 'সাধারণ কাঁচাগুয়া ৫ টাকা গা।

এই গা, হালি, তোলা, পোন; এ ধরনের গণনা কিংবা ওজনের হিসেব এখনও পায়রাবন্দে চালু। কেজির হিসেব এখনও তেমন চালু হয়নি, আছে সেই সের পোয়া। আছে ৮০-র ওজন, ৯০-র ওজন। আপনি যদি এক হালি আম কিনতে যান, দেবে ৪টি নয় ৬টি . এক শ পান চাইলে ১২০টি গুনে দেবে। ধান চাল ৯০ তোলার ওজনে বেচাকেনা হয়, কিন্তু পাট, গম, সরিষা, কলাই, আলুর বেচা-কেনা ৮০ তোলার ওজনে। মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যাপারে এখানকার ব্যবসায়ী-ক্রেতা কেউ-ই উৎসাহী নয় এখনও। বলে, 'উগলা টাউনের হিসাব, টাউনোতে চালান, হামরা বুজিসুজি না। অর্থাৎ ঐসব শহুরে হিসেব, শহরে চলুক, আমরা বুঝি না।'

বৃহত্তর রংপুরের অন্যান্য এলাকার মতো সোলকা, প্যালকা, গিড়া, সিদোল, এসব খাবার পায়রাবন্দে এখনও খুব জনপ্রিয়। পাটপাতা কুচি কুচি করে কেটে সামান্য সোডা দিয়ে সোলকা রান্না হয়। কাঁঠালের বিচি, আবার কেউ-কেউ চালের গুঁড়ো মেশায় এতে। প্যালকা তৈরি হয় লাপা শাকপাতা দিয়ে। এ দুটি তরকারি বেশ পিচ্ছল, ভাতের সাথে মেখে মুখে দিলে চিবুনোর অবকাশ থাকে না, এমন পিচ্ছল যে আপনাআপনি পেটে চলে যায়। ... পুরোট পাট পাতা হাতে পাকিয়ে গিঁট দেওয়া হয়, একে বলে গিড়া। আলু, কাঁঠালের বিচি, আবার কেউ ছোট মাছের শুঁটকি দিয়ে গিড়া রান্না করে। কেউ গিড়ার চচ্চড়ি খায়, কেউ খায় ঝোল। ... সিদোল তো ধনী-দরিদ্র প্রায় ঘরে। পুঁটি মাছের শুঁটকি বেটে নেওয়া হয়, তার সাথে মেশানো হয় কালোকচুর ডাঁটা বাটা। দেওয়া হয় সামান্য হলুদ। শুঁটকি ও কচুর ডাঁটা বাটা ঘন হয়ে উঠলে হাতের তালুর সাহায্যে দলা পাকানো হয়. তারপর তা হাঁড়ি-ভর্তি ছাইয়ের ভেতর রেখে দেওয়া হয় কয়েক মাস। সিদোল একেই দুর্গন্ধযুক্ত, তাতে আবার রান্না করা হয় অতিমাত্রায় মরিচ ও রসুন দিয়ে। সে এমনই ঝাল যে, এক চিমটি সিদোল খেলে চাঁদি গরম হয়ে উঠবে আপনার। কিন্তু গ্রামের লোকজনের কাছে তা খুবই প্রিয়। একটুখানি সিদোল পাতে পড়লে আধ সের চালের ভাত নিমিষে উদরস্থ করে ফেলে এক কিষান মজুর।

দিনবদলের পালায় আজকাল পায়রাবন্দের অবস্থাপন্নদের ঘরে বিরিয়ানি রান্না হয়, বাড়িতে বানানো পটেটো চিপস্ চালু হয়েছে, কিন্তু এর পাশাপাশি সেই পুরাতন আমলের খাবারও চালু রয়েছে। চলছে বক্‌নী, মলিদা, বৌখুদা, খুদের পিঠা, গড়গড়ি পিঠা। মরা-পচা মাছ অতিমাত্রায় মরিচ পিঁয়াজ আদা রসুন দিয়ে রান্না করা হয়, একে বলে 'নাকড়ীসানা'। খাদ্যসংকটের দিনে এখনও অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবী পরিবারে আধাপাকা বিচি-কলা সেদ্ধ, মিষ্টি কুমড়ো ভাজি—এসব প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ভাতের বিকল্প হিসেবে গম, আলু, মিষ্টিআলু চলছে। পান্তার প্রচলন অনেক পরিবার থেকে উঠে গেছে, এখন সকালের নাস্তা হিসেবে খাওয়া হয় গমের ভাত, আলু সিদ্ধ। গম আধাভাঙা করে রান্না হয়। কেউ তাতে দেয় গুড় কেউবা লবণ-মরিচ। এটাই 'গমের ভাত'। আলু সিদ্ধ করে গমের আটা দিয়ে চটকানো হয়, তারপর তা গোল করে পাকিয়ে জ্বাল দেওয়া হয় গুড়ের সিরায়। একইভাবে বিচিকলা আটা মিশিয়ে চিতুই পিঠের মতো ভাজা হয় তেলহীন।

কাপড় ধোয়ার জন্যে ১০/১২ বছর আগেও 'হইড্ডা'র ব্যবহার ছিল, এখন আর হইড্ডা গাছ খুঁজে পাওয়া যায় না। সস্তা সাবান গ্রামে ঢুকলেও অভাবী পরিবারগুলোতে বানানো হয় 'ছ্যাকা'। ছ্যাকা মানে কলাগাছের শুকনো বাকল পুড়িয়ে তার ছাই রাখা হয় একটি বাঁশের ডালিতে, তাতে দেওয়া হয় পানি। নিচে বালতি থাকে। চুয়ে-পড়া ক্ষারমিশ্রিত পানিতে বালতি ভরে উঠলে তা দিয়ে কাঁথা-কাপড় ধোয়া হয়। অনেকে সোডা ব্যবহার করে, তবে শিমুল ফুল পুড়িয়ে তার ছাই পানিতে মিশিয়ে তা দিয়ে কাপড় ধোয় কেউ-কেউ।

মাথা পরিষ্কারের জন্যে সাবান ছাড়াও অনেক পরিবারে খৈল, চিটকা মাটি, এমনকি গোবরও ব্যবহার করে। চুলোর ছাই দিয়ে দাঁত মাজা তো হচ্ছেই, আজকাল অনেকে তামাকের পাতা-পোড়া ব্যবহার করছে। পোড়ানো তামাক পাতার গুঁড়ো, চুলোর পোড়া মাটি, লবণ, সামান্য সরিষার তেল মিশিয়ে লেই মতো তৈরি করা হয়, এটা দাঁতের মাজন। অনেকে বলে 'পেস্'। মনে হয় পেস্ট থেকে পেস্ কথাটা এসেছে।

AMARBOI.COM

বিয়েশাদির বড় খাওয়াদাওয়ার আয়োজন এখন উঠেই গেছে। মুখে ভাত, খাত্না, জোরমানা, সাগাই মিলানী, কেউ মারা গেলে চল্লিশার সময় 'ফতেয়া খাওয়া'—এসব খুব একটা হতে দেখা যায় না। নবান্ন এখন বুড়োদের অতীত-স্মৃতি মাত্র। দু দশক আগেও দেখেছি খাত্নার জন্যে বিরাট ধুমধাম হতো। নতুন লুঙ্গি-জামা পরিয়ে ছেলেকে ঘোরানো হতো গ্রামের রাস্তায়, সে সালাম দিত সবাইকে। গ্রামের লোকজনদের জন্যে ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা না করলে খাতনা শুদ্ধি হতো না। এখন তা আর নেই। তবে গায়ে-হলুদের নিয়মটি সাধ্যবান পরিবারগুলোতে এখনও রয়েছে। তাদের পরিবারে 'সাইটোর' বসে। কোনো নববধূ প্রথম সন্তান প্রসব করলে মেয়েরা গীত করে, গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়, একে বলে সাইটোর। মেয়ের পেটে প্রথম বাচ্চা এলে মেয়ের বাড়ি থেকে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হতো ক্ষীর, খৈ, নাড়ু, দুধ, দৈ ইত্যাদি। এখন এ প্রথাটি আর নেই। চল্লিশার দিন বিরাট করে গণভোজনের ব্যবস্থা হয় না, শুধু খাওয়ানো হয় কিছু ভিক্ষুক ডেকে।

কৃষক যেদিন প্রথম আমন ধানের চারা রোপণ করত তার ক্ষেতে, সেদিন নিজস্ব নিয়োগকৃত মজুর ছাড়াও গ্রামের অন্য মজুরদের ডেকে মাছ, ভাত এবং ক্ষীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়ানো হতো, একে বলত 'গোসল পানা'। এই প্রথা এখন উঠে গেছে। তবে সেই পুরাতন আমলের 'বেগারী' প্রথাটি আজও চালু। বেগারী মানে ভূস্বামী গ্রামের মজুরদের ডেকে এনে জমিতে কাজ করাতো কিন্তু নগদ অর্থে কোনো মজুরি দিত না, দেওয়া হতো দুবেলা ভরপেট খাবার। তরকারি থাকত মাছ কিংবা মাংস, ডাল কিংবা লাবড়া। এ ধরনের বিনা-পারিশ্রমিকের কাজ করানো হতো প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে। আজ এতদিন পর এসে সেই বেগারী প্রথা চালু, তবে পার্থক্য এটাই যে, প্রকট কর্মসংকটের কালে মজুররাই ভূস্বামীর বাড়িতে 'বেগারী' খাটুনির জন্যে ধরনা দেয়। 'টাকা থাক, শুধু খাওয়াটাই দিন।'

বেগারীতে আগে দুবেলা খাওয়ানো হতো, এখন একবেলা। আগের মতো মাছ মাংস দেওয়া হয় না। তরকারি হিসেবে থাকে শুধু লাবড়া। আলু বেগুন অথবা মুলা বেগুনের ঘাঁটি।

এর আগে গ্রাম-সমাজের বিচার এবং দোররা মারা কৌশলের কথা বলেছি। বলেছি হিল্লা প্রথা এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে আজিফার বিদ্রোহের কথা। এই বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় রাজু আহমদের মুখে হিল্লার ব্যাপারে এক কৌশলের কথা শুনলাম।

আগে হিল্লার নিয়ম ছিল : যে স্বামী তালাক দিয়েছে তার সাথে আবার বিয়ে হতে গেলে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর একটি বিয়ে প্রয়োজন হবে এবং তাকে ঐ স্বামীর সাথে ঘর করতে হবে এক রাতের জন্যে। শুধু তা-ই নয়, ঐ এক রাতের দম্পতির মধ্যে যৌনমিলনও হতে হবে। আসলেই যৌনমিলন হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্যে আড়ি পেতে থাকবে কমপক্ষে একজন সাক্ষী। সাক্ষীকে রাতভর ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং বেড়ার ফুটো দিয়ে মাঝে মাঝে সে ভেতরে নজর ফেলবে। গ্রামের মোড়ল মৌলবিরা নিয়োগ করবেন সাক্ষী।

এখন অনেকক্ষেত্রে এমনটি হচ্ছে যে, রীতিমতো টাকাপয়সা দিয়ে একজন লোককে ভাড়া করে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিয়ের আগেই শর্ত হচ্ছে যে, বিয়ে পড়ানো হলেও তারা (একরাতের স্বামী-স্ত্রী) একই ঘরে রাত্রিযাপন করতে পারবে না, পারবে না যৌনমিলন ঘটাতে। ভাড়া-করা লোকটি, যেহেতু টাকাপয়সা পাচ্ছে, সে তাতেই রাজি।

কিন্তু মোড়ল-মৌলবি নিয়োগকৃত যে সাক্ষী, সেই লোকটি কী সাক্ষ্য দেবে? সে ক্ষেত্রে সাক্ষীকে দেওয়া হচ্ছে কিছু অর্থ। বিনিময়ে সে মোড়ল-মৌলবির কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। বলছে, 'হ্যাঁ, আমি তাদের মিলন হতে দেখেছি।'

এ প্রসঙ্গটি এজন্যেই উল্লেখ করলাম যে, গ্রামে আজকাল হিল্লা বিয়ের জন্যে লোক ভাড়া পাওয়া যায়, সাক্ষীকে টাকাপয়সা দিয়ে যায় কেনা এবং মোড়ল-মৌলবির কাছে গিয়ে কী চমৎকার মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করে সে পরদিন!

রাজু আরেকটি কৌশলের কথা বলল। তা হলো তালাক দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে গ্রামে বউ তালাক দেওয়ার হিড়িক ছিল। স্ত্রীর সামান্য ত্রুটি পেলে উচ্চারণ করা হতো তিন তালাক। এটা এখনও রয়েছে কিন্তু হার আগের চাইতে কিছুটা কম। তালাক দিলে খোরপোশের দাবি ওঠে, অনেক ক্ষেত্রে শালিস বৈঠক বসে। এ কারণে আজকাল অনেকে স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের পর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। কিংবা কেউ বউ ফেলে রেখে চলে যায় অন্য ইউনিয়নের গ্রামে। তারপর আরেকটি বিয়ে করে।

পায়রাবন্দের বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায়, যৌতুকের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় বহু স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে পিতৃগৃহে পড়ে রয়েছে। এদের তালাক না দেওয়ায় মেয়েটি দ্বিতীয় বিয়ে করবে তাও পারছে না।

আইন রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারটি সম্পর্কে শতকরা ৯৯ ভাগ মহিলাই অজ্ঞাত। আমি সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি : প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে এমন ঘটনা পায়রাবন্দে খুবই কম।

৫

AMARBOI.COM

পায়রাবন্দের শিকড় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশকিছু মানুষের সাথে আমি পরিচিত হয়েছি যারা আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। তাদের আমি ভুলতে পারি না।

মাকড়া বুড়ো, শিয়ালু চাচা, শুকনীবালা, রঞ্জিনা, হাওয়া বিবি, আকলিমা, রীনা বেগম, আজিফা, পাখীরন, বারেক, আনজেরা, কালটু, এদের কথা আমি এর আগেই লিখেছি। বলেছি সুরমা, দুলাল, হাসনা-জয়গন, তছিমউদ্দিন ও মছিরনের কথা-কাহিনী। কিন্তু এ বর্ণনা কেবল কিছু স্কেচ। এই মুহূর্তে খুব অসহায় বোধ করছি। আমি যদি উপন্যাস-লিখিয়ে কিংবা গল্পকার হতে পারতাম, তা হলে একেকটি চরিত্র নিয়ে হতে পারত বড় গল্প-উপন্যাস। কিন্তু আমার সে মেধা-দক্ষতা নেই, সুখপাঠ্য বর্ণনা-ভঙ্গি, ভাষা ব্যবহার এবং চরিত্র বিশ্লেষণ সাধ্যের বাইরে।

তবু আমি মুক্তিযোদ্ধা রমজানের কথা বলতে চাই। আমি জীবনযোদ্ধা পোড়াখাটিয়ার কথা বলতে চাই। ইসফ্ সাক্ষীর কথা বলতে চাই। আব্দুল মালেক এবং আম্বিয়ার কথা বলতে চাই।

'৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে-যুবকটি ছিল রাজাকার, আজ সে পায়রাবন্দের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। জমিজমা করেছে, বাড়ি তুলেছে, বিয়েশাদি করে সংসার পেতেছে। গ্রামের পথে মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায়। কেউ ব্যবসা করছে। কেউ জামায়াত করছে। আবার কেউবা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলে ভিড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু রমজানের খবর কী? সেই যে মুক্তিযোদ্ধা রমজান, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিল, টকটকে চেহারা, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পরপর বীরদর্পে ঢুকেছিল নিজের গ্রামে, মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে, কোথায় এখন সে?

না, এখন আর তাকে চেনা যায় না। শরীর ভেঙে পড়েছে। কপালে শত কুঞ্চন, গালভরা খোঁচা দাড়ি, পরনে ছেঁড়া প্যান্টশার্ট, খালি পা, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় রমজান, মানুষের জটলা দেখলে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় নীরবে। দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ করে। আবার সে পথ হাঁটে। তার কপালের ভাঁজে ভাঁজে হাজারো প্রশ্ন, চোখে ঝরে পড়ে একরাশ বিরক্তি, ভাবভঙ্গিতে প্রকাশিত একটা ঘৃণাবোধ। মাঝে মাঝে চোখের মণি যেন ঠিকরে পড়ে বিদ্বেষে, কিন্তু তা কার প্রতি, বোঝা যায় না।

অসুস্থ হয়ে পড়েছে রমজান। লোকে বলে 'মাথা খারাপ' হয়ে গেছে তার। কোথায় রাত কাটায়, কী খায়, কেউ বলতে পারে না।

জানা যায় : মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রমজান একটি দোকানে চাকরি নেয়। কিন্তু দোকানের মালিক ছিল অসৎ। সে জিনিসপত্রের দাম বেশি নিত, ওজনে ঠকাতো। রমজান এর প্রতিবাদ করে, কিন্তু উল্টো লাঞ্ছিত হয়, হয় বিতাড়িত।

গ্রামের এক অবস্থাপন্নের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সে। থাকত, খেত, বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের পড়াতো। কিন্তু একদিন সে-বাড়িতেও কিছু অন্যায় ঘটতে দেখল, প্রতিবাদ করল। আবার মার খেল সে এবং আশ্রয় হারালো।

প্রতিবাদী চেতনা পোষণ করত রমজান। মানুষের অসাধুতার বিরুদ্ধে কথা বলত, দুঃস্থ গরিব মানুষের প্রতি অন্যায় হতে দেখলে ছুটে যেত সেখানে। কিন্তু জনসমর্থন পায়নি। বরং বার বার জুটেছে লাঞ্ছনা। '৭৫-এর পর থেকে তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতে থাকে তার।

আরেক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক। শালাইপুর গ্রামে বাড়ি। মুজিববাহিনীর সদস্য ছিল সে।

সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল মালেক, কিন্তু দীর্ঘবছর পরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি, বরং স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি গ্রামে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারাই এখন প্রভাবশালী, সমাজের নেতৃত্ব দেয়। এইসব দেখেশুনে হতাশ মালেক এখন নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়েছে। নিজের সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। নিজের বাড়ি থেকে জমি-জিরাত, খুবজোর হাটবাজার করা এই নিয়ে আছে সে। এখন পায়রাবন্দ বাজারের আড্ডায় তাকে আর দেখা যায় না। দশ জনের সাথে খুব একটা মেলামেশাও করে না। অথচ গ্র্যাজুয়েট মালেক, রক্ত-টগবগে যুবকটি, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে গোটা পায়রাবন্দ যেন চষে বেড়াতো। এলাকার বহু সামাজিক কর্মকাণ্ডে ছিল তার নেতৃত্ব। শালাইপুর প্রাইমারি স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান রয়েছে তার, '৭৫-এর পটপরিবর্তনের আগে পর্যন্ত সে গ্রামে ত্রাণ বিতরণ তদারকি এবং বিচার শালিস করে বেড়াত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নম্র বিনয়ী মালেক একসময় আওয়ামী লীগ করত, এখন নিজেকে সমাজ থেকে গুটিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে রাজনীতি থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শুনলাম আগে সে সহযোদ্ধাদের খোঁজখবর নিত, কারও কারও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছে। এখন সেসবে আর উৎসাহ নেই।

আলাপ করে মনে হলো : মূলত হতাশা থেকে মালেকের এই লুকিয়ে থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

পায়রাবন্দের পথ চলতে গিয়ে এক বৃদ্ধের সাথে প্রায়ই দেখা হয়। আমার দিকে কী জানি কেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তিনি। পায়রাবন্দ বাজারের চায়ের দোকানে, যেখানে যুবকদের আড্ডায় গ্রামের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলি, সেখানেও দেখি লোকটা হাজির। কোনার দিকের একটি বেঞ্চে বসে চুপচাপ শোনেন আমাদের কথাবার্তা। মুখভর্তি পাকা দাড়ি, কাঁচাপাকা চুল, মলিন চেকলুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। পথের ধার দিয়ে খুব ধীরগতিতে হাঁটেন, এমনই ভঙ্গি যেন শাকের পোকা ডালপাতা বেয়ে বেড়াচ্ছে।

: কে লোকটা?

: ওর নাম সাক্ষী। ইসফ্ সাক্ষী। পায়রাবন্দে বয়স্ক যারা, এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন। বয়স এখন প্রায় ৭০ বছর, কিন্তু দেখে তা মনে হয় না, কেননা শরীরের বাঁধুনি এখনও বেশ শক্ত রয়েছে। সিধে হয়ে হাঁটেন, যেন বয়স তাঁর পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর বেশি নয়।

আসল নাম ইউসুফ উদ্দিন। আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণে প্রথমে হয়েছেন ইসফ্উদ্দি কিংবা ইসুফুদ্দি, পরে উদ্দিন খসে পড়ে শুধু মাত্র ইসফ্। কিন্তু এখন পায়রাবন্দের অধিকাংশ লোকজন তাঁকে চেনে সাক্ষী নামে। ইউসুফ উদ্দিনের সাথে কথা বলে জানলাম, কিশোর বয়সে তিনি এলাকার কমিউনিস্ট নেতা ধীরেন ডাক্তার, নন্দলাল ভট্টাচার্য এঁদের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতেন। এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় চিঠিপত্র আদান-প্রদান, গোপন মিটিং চলতে থাকলে ঘরের বাইরে পাহারা দেওয়া, বহিরাগতদের পথ চিনিয়ে দেওয়া—এ ধরনের বিভিন্ন কাজ করতেন তিনি। সে-সময়ই কোড হিসেবে নাকি সাক্ষী নামটি দেন কমিউনিস্ট নেতারা।

যুবক বয়সে এই সাক্ষী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে। জেল খাটেন ১৮ বার। জানালেন, বহু বছর তাঁর কেটেছে রংপুর কারাগারের প্রকোষ্ঠে। নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে।

৭০ বছর বয়স্ক ইউসুফ উদ্দিন, পরে যিনি ইস্ফ এবং সাক্ষী নামে পরিচিত, শরীরের গঠন বেশ শক্ত থাকলেও বেশ খানিকটা স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন। তবু তাঁর জবানি থেকে জানা গেল : কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে কৈশোর ও যৌবনে কাজ করা সত্ত্বেও পরবর্তীতে তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র বদলে যায়। '৪৭-এর দেশ বিভাগের পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে মুসলিম লীগ সমর্থন করতে থাকেন। পরবর্তীতে আবারও দলবদল করেছেন তিনি। মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, আবার আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন আনেন। গত ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময় তিনি ফয়জার রহমানকে সমর্থন দেন, যিনি ইউসিএল-এর একজন নেতা।

নিরক্ষর ইউসুফ উদ্দিন ওরফে সাক্ষী কী কারণে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির 'গ্রাউন্ড লেভেল ওয়ার্ক' ছেড়ে মুসলিম লীগের কর্মী হলেন, পরবর্তীতে কেন ঘনঘন দল থেকে দলে সমর্থন বদল করলেন, এসব আমি পরিষ্কারভাবে জানতে পারিনি। আমি এ প্রসঙ্গে যতবার প্রশ্ন করেছি, সাক্ষী শুধু এটুকুই জবাব দিয়েছেন, 'আমার মন চায়নি।'

মন চায়নি! না, শুধু এটুকু জবাব হতে পারে না। এর পেছনে নিশ্চয়ই রয়েছে বিরাট কোনো কারণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আমার অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। শিকড় পর্যায়ের এক রাজনৈতিক কর্মী কী কারণে বারংবার তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন, সে-রহস্য জানতে পারিনি। আমি চেষ্টা করেছি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি, বিভিন্ন কৌশলে প্রশ্ন করেছি, কিন্তু না, সাক্ষী শুধু বলেন, 'বললাম তো এটা আমার মনের ইচ্ছা। মনের ওপর কি আর কোনো কথা আছে?'

তারপর একসময় বিরক্তও হয়েছেন। বলেছেন, 'বার বার শুধু ঐ এক কথা জিজ্ঞাস করেন ক্যান? আমি কোন্ দল সমর্থন করব না-করব, সেটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। একেই তো তাঁর জীবনের রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতায় আমি বিস্মিত, তার ওপর ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে সচেতনতা দেখে অবাক লাগে। যে-লোকটি স্কুলে পড়েনি, যে-লোকটি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে বহুবার জেল খেটেছে এবং নির্যাতন ভোগ করেছে, যে-লোকটি এক দল থেকে আরেক দলে সমর্থন করেছে, যে-লোকটি আজ সহায়-সম্পদে বলতে গেলে নিঃস্ব-রিক্ত, কিন্তু নিজের রাজনৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে দারুণ সচেতন। নাকি এই গোপনীয়তার পেছনে লুকিয়ে আছে কোনো রহস্য!

সাক্ষীর জমি আছে মাত্র দেড় বিঘা। দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে, গ্রামের ভূস্বামীদের জমিতে শ্রম দেয়, দুজনে দৈনিক আয় করে ৩০-৩৫ টাকা। উপার্জনহীন সাক্ষীর দিন চলে যাচ্ছে তাদেরই আয়ের ওপর নির্ভর করে। দেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এ-রকম কথা তিনি জানেন না, শোনেননি কখনো। তবে বললেন, কিশোর সন্তানের কামাই খেতে নাকি তাঁর শরম লাগে। কিন্তু উপায় কী? এই ৭০ বছর বয়সে নিজে শ্রম দেওয়ার মতো শক্তি পান না। 'কাজে মন ওঠে না আমার'—বলেন তিনি।

স্বাধীনতার পরপর, সাক্ষীর বয়স যখন ৫০ বছরের মতো, বিয়ে করেন তিনি। এতদিন কেন বিয়ে করেননি, সে কারণটি পরিষ্কার বলতে চাননি। শুধু জানান, বিপদে পড়েই নাকি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। দীর্ঘদিন ভাই-ভাবীর সংসারে থাকবার পর তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায়, তারপর প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে এসে এতদিন পর নিজে ঘর তোলেন, ১২/১৩ বছর বয়সের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতেন। পরবর্তীতে সেই স্ত্রীর গর্ভে এসেছে ৪ ছেলে ১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে। এদের মধ্যে প্রথম ২ ছেলে মজুরি করে, অপর ছেলেদ্বয় এখনও সাক্ষীর ভাষায় 'নাবালক'। ৭ বছর বয়সের মেয়ে, নাম তার একতারা বেগম, ক্লাস ওয়ান-এ পড়ছে। সাক্ষীর ইচ্ছে যতদিন সম্ভব মেয়েটির লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন। সাক্ষী জানালেন, না, বিয়েতে তিনি মেয়ের পিতার কাছ থেকে কোনোরকম যৌতুক নেননি। অবশ্য ওরা কিছু নগদ টাকা দিতে চেয়েছিল। সাক্ষী জানালেন, 'যৌতুক আমি নেইনি, কেননা এটা আমি ঘৃণা করি।'

আগেই বলেছি, সাক্ষীর জমি আছে দেড় বিঘা, তার মধ্যে বাড়ি ভিটে বাদে আবাদি জমির পরিমাণ ৪৫ শতক। জমিটুকু বন্ধক রেখেছেন ৫ হাজার টাকায়। বন্ধক ছাড়িয়ে নিতে পারবেন কি না, তা অনিশ্চিত। 'একসাথে অতগুলো টাকা পাব কোথায়?' স্বগতোক্তি করলেন তিনি।

ছেলে দুটোর কামাই খাচ্ছেন, জমি বন্ধক রাখলেন কেন? আমার তো মনে হচ্ছে ঐ জমি আপনি ছাড়িয়ে নিতে পারবেন না। বাংলাদেশের অনেক কৃষকের মতো সম্পূর্ণ ভূমিহীনে পরিণত হয়ে যাবেন! সাক্ষী বলেন, 'কী করব বলেন, উপায় তো ছিল না। ছেলে দুটো ৩০-৩৫ টাকা আয় করে, তা-ও প্রতিদিন কাজ পায় না। আর ঐ সামান্য কটা টাকায় ৭ জনের সংসার চলে? তবে না, ঐ ৫ হাজার টাকায় ভাত কিনে খাইনি, কিছু ধারদেনা ছিল শোধ করেছি, ঘর মেরামত করেছি, দুয়েকটা কাপড়চোপড় কিনেছি।' আলাপে জানা গেল, সাক্ষীর জমিটুকু যিনি বন্ধক নিয়েছেন ৫ হাজার টাকায়, তিনি হঠাৎ-পাওয়া কিছু কাঁচা টাকার মালিক। বলদীপুকুরে হাউজি খেলে ২০ হাজার টাকা পান, সেই টাকায় গ্রামে বিভিন্নজনের জমি বন্ধক নিয়েছেন। এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, ভাগ্যগুণে গজিয়ে-উঠা কাঁচা টাকার মালিক আজ জমির মালিক হয়েছেন আর আবাদি জমির মালিক ইউসুফ উদ্দিন পরিণত হয়েছেন ভূমিহীনে!

বয়সের ব্যবধান থাকলেও সাক্ষী-দম্পতি সুখী। তাঁর বউ খুব সংসারী, সে-ই ধরে আছে সংসারের হাল। নিজে গরু, ছাগল, মুরগি 'আদি' নিয়ে পুষছে। এই আদি মানে মালিক আর প্রতিপালকের মধ্যে ভাগাভাগি। যেমন ছাগলের দুটি বাচ্চা হলে একটি পাবে মূল মালিক, অপরটি পাবে সাক্ষীর স্ত্রী।

আলাপে-আলাপে সাক্ষীর জীবনের নানা কথা ও কাহিনী জানা গেল। এর মধ্যে একটি ঘটনা আবেগ সৃষ্টি করল আমার মনে। শুনলাম, কমিউনিস্ট নেতাদের দেওয়া সাক্ষী নামের লোকটি সত্যি সত্যি একবার আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। সে বছর-চল্লিশেক আগের কথা, নিজের বওনাইর (দুলাভাই) বিরুদ্ধে তিনি দিয়েছিলেন সাক্ষ্য।

তাঁর দুলাভাই ছিলেন একটি খুনের মামলার আসামি। প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ উদ্দিন ওরফে সাক্ষী। সেক্ষেত্রে সাক্ষীর সাক্ষ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একবার 'না' বললে মামলার রায় অন্যরকম হয়ে যায়।

সবাই এসে সাক্ষীকে ধরে বসল। আদালতে বলতে হবে, না তুমি খুন করতে দেখনি তোমার দুলাভাইকে। কিন্তু সাক্ষী টললেন না। বোন এসে হাতে ধরল, তবু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল-অনড়। তিনি যা দেখেছেন, আদালতে তা-ই বলবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হোক আমার দুলাভাই। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের ঘটনা ঘটে, আমি নিজের চোখে তা দেখি। আর আদালতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলব? না, তা হয় না। আমি জজ সায়েবের সামনে সত্য কথা বললাম। দুলাভাইয়ের ফাঁসি হয়নি, তবে যাবজ্জীবন হয়ে গেল।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার শীর্ণ দীর্ঘ হাত আমার নোটবুকের উপর রাখলেন সাক্ষী প্রশ্ন করলেন, 'বলেন তো সাইব, আমি কি ঠিক করি নাই?'

সাক্ষীর হাতখানা কাঁপছে। আমি চুপ করে থাকি। আবার তিনি প্রশ্নটি ছুড়ে মারেন। বলেন, আমি সত্য সাক্ষী দিয়া ঠিক করছি, না অন্যায় করছি? বলেন!

মুখ তুলে তাকাই। উত্তেজনায়, নাকি আবেগে, ইউসুফ উদ্দিনের ঠোঁট কাঁপছে। ঘোলাটে চোখ দুটি ভিজে উঠেছে জলে, চিকচিক করছে।

আমি তাঁর শীর্ণহাতে হাত রেখে বলি, সাক্ষী, আপনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন।

এর আগে বলেছি পায়রাবন্দের গ্রামে বেশকিছু কবিরাজ এবং ফকির আছে।

ফকিরেরা ঝাড়ফুঁক করে, তাবিজ দেয়, মন্ত্রতন্ত্র করে। এদের কেউ-কেউ মাথার খুলি সংগ্রহের জন্যে কবর থেকে লাশ পর্যন্ত চুরি করে।

শনিবার এবং মঙ্গলবার যারা মারা যায়, তাদের মাথার খুলি নাকি জাদুটোনা করার জন্যে প্রয়োজন ফকিরদের। সে কারণে শনি ও মঙ্গলবারে মৃতব্যক্তির কবর পাহারা দেবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয় গৃহস্থ। লোক ভাড়া করে সাত দিন দিনরাত কবরের পাশে বসিয়ে রাখে।

গ্রামের অনেকে জানালেন, এ-রকম একজন ফকির হলেন আব্দুল মালেক। জয়রামপুর গ্রামে বাড়ি। আগে তিনি ছিলেন চোর, বারকয়েক ধরা পড়ে গণপিটুনি খাবার পর চুরি ছেড়েছেন, চোর থেকে হয়েছেন ফকির। অবশ্য মাঝখানে কিছুদিন তিনি কসাই-এর কাজ করেছেন।

এই সমাজে সাধু থেকে শয়তান কিংবা শয়তান থেকে সাধু হয়েছেন এমন অনেকেই আছেন। এমনকি অনেকের মধ্যে সাধু এবং শয়তান উভয়ই বাস করে। আব্দুল মালেকের চোর থেকে ফকির হবার কাহিনীটি অস্বাভাবিক মনে হয় না। তবে লোকটিকে দেখতে ইচ্ছে করে, তার সাথে কথা বলতে চাই।

জয়রামপুর গ্রামে গেলাম। সবাই মালেকের বাড়ি চেনে। উঠোনে হাজির হয়ে দেখি, তার বউ আম্বিয়া, বয়স ২৭/২৮ বছর, আবর্জনা-ভরা উঠোনের এককোণে চুলোর ধারে বসে রুটি বানাচ্ছে এবং সেঁকছে। উনোনের একধারে একটি বানর, গলায় পাতলা শিকল, খুঁটির সাথে বাঁধা। গা এলিয়ে বসে আছে চারটি ছাগল, আম্বিয়ার প্রায় কোলের কাছে একটি বিড়াল। গ্রামে বা শহরের বস্তিতে এমনটি দৃশ্য দেখা যায় : দুঃখিনী মা খাবার তৈরি করছে আর ছেলেমেয়েরা অধীর অপেক্ষায় উনোনের চারদিকে বসে রয়েছে কখন তাদের পাতে পড়বে খাবার। আম্বিয়ার ধারেকাছে কোনো মানবসন্তান নেই, আছে ঐ বানর ছাগল বিড়াল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গি দেখে কেন জানি সে মুহূর্তে মনে হলো মাকে ঘিরে বসে আছে একপাল সন্তান।

আব্দুল মালেক বাড়িতে ছিলেন না। গিয়েছিলেন প্রতিবেশীর ঘরে, রোগী দেখতে। খবর পেয়ে প্রায় ছুটে চলে এলেন তিনি। প্রায় ৪০ বছর বয়স, দেখে মনে হয় আরও বেশি, পরনে ছেঁড়া-ফাটা লুঙ্গি, হাঁটু পর্যন্ত তোলা। আছে রোদ-জ্বলা বিবর্ণ মলিন শার্ট।

আমরা বসি পিঁড়িতে। রাজু আমার পরিচয় দেয়, কিন্তু আদৌ বোঝেন না মালেক। খবরের কাগজ আবার কী জিনিস! রিপোর্টার আবার কী! তাঁর চোখে ভীষণ বিস্ময় এবং এই বিস্ময় চোখেমুখে নিয়ে তিনি পাশের বাড়িতে ছুটে যান চেয়ার জোগাড় করবার জন্যে। আম্বিয়াকে বলেন, তাড়াতাড়ি গুয়া পান সাজাও শালী।

ভাঙা-পুরাতন চেয়ার আসে একখানা। কিন্তু আমরা পিঁড়িতেই বসি। রুটি বানানো ছেড়ে আম্বিয়া গুয়াপান সাজিয়ে দিয়ে যায়।

পান খেতে খেতে আলাপ। মালেকের বাড়ি ছিল বগুড়ায়, ৬/৭ বছর আগে পায়রাবন্দের এই গ্রামে এসে এই ঘরখানা তোলেন। প্রথমে ২০ শতক আবাদি জমি কিনে বাড়ি তোলেন তিনি, পরে, পসার ভালো হওয়ায় কেনেন আরও ২৭ শতক আবাদি জমি।

আগে চুরি করতেন একথা কোনোক্রমেই স্বীকার করলেন না মালেক। মৃতব্যক্তির মাথার খুলি সংগ্রহের কথায় উড়িয়ে দিলেন যেন আমাদের। দূর! ওসব বাজে কথা। অন্য ওঝা-ফকির আমাকে সহ্য করতে পারে না, তারাই এসব মিথ্যা কথা ছড়ায়। তবে হ্যাঁ, আগে কসাই ছিলেন। কাজটি ভালো লাগেনি। ছেড়ে দিয়ে এই 'ফকিরালি' ব্যবসা শুরু করেছেন। এই লাইনে তাঁর গুরু রাজশাহীর শ্রীরামপুর নিবাসী এক ফকির, তিনিই মালেককে ঝাড়ফুঁক দেওয়া শিখিয়েছেন। এতে দৈনিক ৩০-৪০ টাকা আয় হয়। কখনো-সখনো বানরের খেলা দেখান গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে। এতে বাড়তি কিছু মেলে। একটি ডুগডুগিও আছে তাঁর। আছে একটি অতিপুরাতন মাথার খুলি, একখণ্ড হাড়। পরে এসব দেখালেন আমাদের। মালেক বলেন, এই মাথার খুলি আর হাড়—এসব কিছু না। ঝাড়ফুঁক দেই দোয়া-দরুদ পড়ে, কিন্তু লোকজনে তাতে সন্তুষ্ট নয়। বলে, কী শুধু বিড়বিড় করেন। তখন আমি এই খুলির চারিদিকে হাড়খানা ঘোরাই, বানিয়ে বানিয়ে এটা-ওটা বলি, রোগীর গায়ে লম্বা করে ফুঁ দেই, তারা খুব খুশি হয়। ভেক না ধরলে ভিখ্ মেলে না যে!

মালেক বলেন, গ্রামের গরিব লোকজনই তাঁর রোগী। কিন্তু না, তাদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকাপয়সা আদায় করেন না। দশ টাকা দিলেও নেন, এক টাকা দিলেও নেন। মালেক বলেন, 'কী করবে বলুন! টাকাপয়সা বেশি থাকলে তো তারা বড় ডাক্তারের কাছে যাবে! সে সাধ্য কই?'

আম্বিয়া তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। ইসলামপুরে বাড়ি। প্রথম বউকে তালাক দিয়েছেন মালেক। তার নাকি চরিত্রের দোষ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

এই প্রশ্নে হঠাৎ বিচলিত হয়ে ওঠেন মালেক। এদের ঘরে কি সন্তান নেই? আমি কি কোথাও আঘাত করে বসেছি? মালেক বিমর্ষ, আম্বিয়া মাথা নিচু করে রুটি বানিয়েই চলেছে। উনোনের জ্বাল ঠেলে দেয় সে। উল্টানো লোহার কড়াইয়ের পিঠে ফুস্ করে ফুলে ওঠে রুটি।

আম্বিয়ার সন্তান নেই। তবে প্রথম স্ত্রীর রয়েছে দুটি মেয়ে। মাজেদা আর মর্জিনা। দুজনেই এখন ঢাকায় থাকে। চাকরানির কাজ করে এক সাহেবের বাসায়। মেয়েদের প্রসঙ্গে মালেক উদাস হয়ে যান। বানরটির মাথায় পিঠে হাত বুলোতে থাকেন মাথা নিচু করে। আমার খুব কষ্ট হতে থাকে। আমি আলাপের প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিতে চাই। যে লোকটি ফকিরালি করে ৩০-৪০ টাকা আয় করেন, বানরের খেলা দেখিয়ে পান বাড়তি কিছু, পায়রাবন্দে নিজের ঘর তুলেছেন, ২৭ শতক আবাদি জমি কিনেছেন, তিনি কী কারণে মেয়ে দুটিকে ঢাকায় পাঠিয়েছেন ঝিয়ের কাজ করবার জন্যে?

এসব প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। মেয়ে দুটির কথা মনে পড়ায় মালেক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। এই মুহূর্তে আমি তাঁর চোখ দেখতে পাচ্ছি না, মুখটাও ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, তবু কেন জানি মনে হচ্ছে ভীষণরকম এক যন্ত্রণায় ছটফট করছেন ফকির।

আমি বানরের প্রসঙ্গ তুলি। এটা কোত্থেকে পেলেন? এই ছাগলগুলো কি আপনার? ঐ বিড়ালটা ...।

মুখ তোলেন মালেক। ছাগল চারটি আম্বিয়ার। নিজের জমানো টাকায় একটি কিনেছিল, তা থেকে এখন চারটি হয়েছে। বানরটির নাম সুমি। বছর তিনেক আগে ৪০ টাকা দিয়ে কিনে এনেছেন সিলেট থেকে। পরে খেলা শিখিয়ে 'পাকা' করে তোলেন। তবে, বেশ কিছুদিন থেকে সুমি অসুস্থ। রংপুর শহরে যাবার পথে এক বাস দুর্ঘটনায় মরতে মরতেও বেঁচে যায় সে। মালেক কোমরে আঘাত পেয়েছেন, সুমির লেগেছে মাথায়। শহরে এক পশু-ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়েছেন ওর জন্যে। এখন খেলা দেখায় না, বিশ্রাম নিচ্ছে ...

কথাবার্তা প্রায় শেষ। নোটবুক বন্ধ করে উঠে দাঁড়াই। জয়রামপুর থেকে পায়রাবন্দ বাজারে ফিরে যাব আমরা। সেখানে আমার যুবক-বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।

মালেকের উঠোন থেকে নেমে পড়ি। পেছনে পড়ে থাকে ফকির আর তাঁর স্ত্রী।

: সালামালেকুম মালেক মিয়া ... আসি ... আবার দেখা হবে ...

কিন্তু মুখের কথা অসমাপ্তই থেকে যায়। পেছন ফিরে তাকাতেই যে-দৃশ্যটি দেখি তাতে বিস্ময় এবং আবেগে আমি হতবাক। আমার পা দুখানা কে যেন সেঁটে ধরেছে মাটির সাথে। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। সদর রাস্তায় রাজু যখন মোটরসাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে, তখন আমি একটি খুঁটিতে ভর দিয়ে বিচিত্র এক দৃশ্য অবলোকন করতে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দেখি : আম্বিয়া, মালেকের স্ত্রী, একটা করে রুটি হাতে তুলে নিচ্ছে কুলো থেকে, ছিঁড়ে টুকরো করছে এবং ছুড়ে দিচ্ছে ছাগলগুলোর মুখের সামনে। মালেকের হাতেও একখণ্ড রুটি, পরম আদরে তুলে দিচ্ছেন সুমির মুখে ...

নিঃসন্তান আম্বিয়া, মাজেদা আর মর্জিনার জনক আব্দুল মালেক, নিজেদের প্রাতরাশ সারবার আগে ওদের একপাল সন্তানের মুখে তুলে দিচ্ছেন খাবার।

মোটরসাইকেলের যান্ত্রিক শব্দ ছাপিয়ে রাজু আহমেদের হাঁক শোনা যায় : কী হলো! ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন না!

আম্বিয়া তখন স্বামীকে জিজ্ঞেস করছে : মানুষগুলো কাঁয়? উগ্‌লা কতা ক্যানে বা পুচ কল্লে! ফির কী কী বা লেখিও নিলে!

আব্দুল মালেক জবাবে বলছে : কাঁয় জানে! মুই তো কিচুই বুজ্‌নু না!

অর্থাৎ ওরা কারা? ওসব কথা জিগ্যেস করল কেন? আবার কী কী যেন লিখেও নিল!

মালেক বলল, কী জানি। আমি তো কিছুই বুঝলাম না!

আমি মনে-মনে বলি, আব্দুল মালেক, আম্বিয়া। শহর সভ্যতা এবং আমার মতো পেশার মানুষদের সম্পর্কে অজ্ঞাতই থাকো তোমরা। আমি তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করি, আমি তোমাদের পণ্য করি, আমি তোমাদের এইসব অসহায়ত্ব কিংবা মানবিক গুণাবলির গল্প-কাহিনী লিখে খাই।

WWW.AMARBOI.COM

পায়রাবন্দের অনেক নির্যাতিতা মহিলার একজন কাদেরী বেগম। বাড়ি তার সিংগীকুড়া গ্রামে। বাবা ভূমিহীন মজুর, মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ।

কাদেরীর স্বামী লতিফ, বছর দুয়েক হলো বিদেশে চলে গেছে কাদেরীকে পিতৃগৃহে ফেলে রেখে। বিদেশ মানে দেশের বাইরে নয়, গ্রামের বাইরে এবং সেখানে লতিফ আরেকটি বিয়েও করেছে, বলা বাহুল্য কাদেরীর অনুমতি না নিয়েই। দ্বিতীয় বিয়ের আগে কাদেরীকে তালাকও দেওয়া হয়নি।

দুটি কারণে কাদেরীকে ছেড়ে চলে যায় লতিফ। প্রথম কারণ হলো : বিয়ের সময় ২ হাজার টাকা যৌতুক ধার্য হয়েছিল, কিন্তু প্রায়শই বেকার মজুর-পিতার পক্ষে ১৩শ টাকা দেওয়া সম্ভব হয়, বাকি ছিল ৭শ টাকা। বলেছিল কাজকামের সময় এলেই বাকি টাকাটা পরিশোধ করে দেবে।

কিন্তু লতিফ রাজি হয়নি। সে বলে, 'বাকির নাম ফাঁকি। এক্ষুনি টাকা চাই। নইলে ...' এই বলে চলত গালাগাল, মারপিট। তারপর একদিন পাঠিয়ে দেয় বাপের বাড়িতে। দ্বিতীয় কারণ হলো : লতিফ নাকি কামনা করেছিল পুত্রসন্তান, অথচ কাদেরীর কোলে আসে কন্যা। এই নিয়ে লতিফের মনে অশান্তি ছিল। সে নাকি প্রায়ই বলত, 'এ মেয়ে জারজ। আমার হলে সে ছেলে হতো।'

প্রথমে কন্যাসন্তান প্রসব হলে তাকে জারজ বলা, স্ত্রীর চরিত্রের দোষ ধরা, এ ব্যাপারটি শুধু কাদেরীর বেলায় নয়, পায়রাবন্দের আরও কয়েকজনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এখানকার বেশকিছু নিরক্ষর অসচেতন 'পুরুষ' এখনও মনে করে যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সন্তানটি মেয়ে হলে তা হয় অশুভ, অকল্যাণের। তাই লতিফের মতো অনেকে পিতৃত্ব স্বীকার করে না।

অন্ধকার যুগে মেয়ে জন্মালে তাকে পুঁতে ফেলা হতো। পায়রাবন্দে, এই সভ্যতার যুগে পুঁতে ফেলা হয় না, কিন্তু বলা হয় জারজ। চরিত্রের দোষ ধরে স্ত্রীকে ফেলে রাখা হয় বাপের বাড়িতে।

পায়রাবন্দের শিকড় সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে দেখি, কন্যাসন্তান প্রসবের কারণে স্ত্রীকে ফেলে বিদেশে যাবার ঘটনা শুধু নয়, বউবদল, বউবিক্রির কটি ঘটনা রয়েছে এখানে, রয়েছে একাধিক বিয়ে-ব্যবসায়ী।

বিয়ে-ব্যবসায়ী মানে, টাকার লোভে এরা একটার পর একটা বিয়ে করে, মেয়েটির জমি কিংবা সঞ্চিত টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে তালাক দেয়, কিংবা এক গ্রাম ছেড়ে আরেক গ্রামে চলে যায়। বিয়ে-ব্যবসায়ী ব্যক্তির অধীনে 'দালাল' কাজ করে, তারা গ্রামের আনাচে-কানাচে খবর রাখে কোন্ মেয়েটি সদ্য বিধবা হলো, কোন্ মেয়েটি ক্ষেতমজুরি কিংবা মানুষের বাড়িতে ঝি-চাকরানির কাজ করে দুপয়সা জমিয়েছে। দালালরা প্রথমে মেয়েটির বাবা-মার সাথে ভাব জমায়, যৌতুক ছাড়াই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে এরকম প্রলোভন দেখায়, প্রস্তাবিত ছেলের গুণকীর্তন করে। মেয়েটিকে সহজে মেলে, কেননা, একেই সে পিতৃগৃহে পড়ে থাকতে চায় না। দ্বিতীয়ত, সে বিয়ে করে আর দশ জনের মতো সংসার করতে চায়।

কিন্তু এ ধরনের বিয়ে-ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যায় মেয়েটির। একদিন সে দেখতে পায়, অনেকদিন ধরে অনেক কষ্টে জমানো টাকা হাতিয়ে নিয়ে স্বামীটি নিরুদ্দেশ, কিংবা পাওয়া গেছে তালাকের খবর।

এ-রকম একজন বিয়ে-ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলবার জন্যে দেবীপুর গ্রামে গেলাম। কিন্তু না, লোকটি তখন গ্রামে নেই, অষ্টম এবং এ পর্যন্ত সর্বশেষ বিয়েটি করবার পর এই কিছুদিন হলো বিদেশে পালিয়ে গেছে। শুনলাম সে এক প্রভাবশালীর ভাই, আগে দিনমজুরি করত, বিয়ে-ব্যবসা শুরু করার পর অবস্থা পাল্টেছে তার হালে, এখন নিয়েজিত এক দালালের মাধ্যমে তাড়ির ব্যবসাও করে। ৮ জন স্ত্রীর মধ্যে ২ জনকে এখনও সে তালাক দেয়নি, এরা ১ নম্বর ও ৫ নম্বর বউ বলে পরিচিত। স্বামীর বাড়িতে থাকলেও লোকটি এদের ভাত-কাপড় দেয় না, নিজেদের সামান্য আয়-উপার্জনে চলে। বাকি ৬ জন স্ত্রীর সামান্য জমি, জমানো টাকা, সবই হজম করেছে বিয়ে-ব্যবসায়ী লোকটি। তবে কিছুটা ঝামেলায় পড়েছিল ৪ নম্বর মেয়েটিকে বিয়ে করার পর। সঞ্চয়ের টাকা হাতড়ে নিচ্ছে দেখে মেয়েটি প্রতিবাদ করেছিল, শালিস ডেকে প্রার্থনা করেছিল বিচার। তবে শাস্তি হয়নি বিয়ে-ব্যবসায়ীর। সালিসের প্রধান যিনি ছিলেন, এলাকার একজন প্রভাবশালী, তিনি বিচার করতে এসে মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হন এবং বিয়ে-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে তাকে নিজেই বিয়ে করে ফেলেন। সেক্ষেত্রে অসুবিধা এটুকুই হয়েছে যে, ঠগবাজ লোকটি মেয়েটির সঞ্চয়ের পুরো টাকা হজম করতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবীপুর গ্রামেই শুনলাম বউ অদলবদলের ঘটনা। একজন রিকশাচালক, অপর জন দিনমজুর, উভয়ে বন্ধু। এদের ২টি করে সন্তান রয়েছে। এই অবস্থায় 'শখের বশে' দুজনে নিজেদের বউ অদলবদল করে। অবশ্য বিয়ের আগে তালাক হয়েছিল দুটি মেয়েরই এবং নিজেরাই অভিভাবক সেজে প্রথামতো একজন অন্যজনকে ৫শ করে নগদ টাকা, লুঙ্গি জামা জুতো যৌতুক দেয়।

বন্ধুত্বের খেয়ালখুশি মেটাতে গিয়ে যে ঘটনাটি তারা ঘটায়, তা ঐ মহিলা দুজন কীভাবে নিয়েছে? খুব সহজে মেনে নিয়েছে কি? না, জানতে পারিনি। কেননা পরিবার দুটি এখন গ্রামে নেই। একজন ঢাকায়, অপরজন রংপুরের অপর একটি থানা পীরগঞ্জের গ্রামে।

তবে বউ-বিক্রেতা মোফা মিয়ার দেখা মিলল জয়রামপুর আনোয়ার গ্রামে। ১৬/১৭ বছর বয়সের যুবতী স্ত্রীকে সে মাত্র ১২ হাজার টাকায় অপর এক যুবকের কাছে বিক্রি করে দেয়। কথা ছিল নগদ টাকা ছাড়াও একটি রিকশা কিনে দেবে তাকে বউ-ক্রেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিকশা তো পায়নি, নগদ ১২ হাজার টাকার মধ্যে ৬ হাজার টাকা, যা বাকি ছিল বলা হয়েছিল দুয়েকদিনের মধ্যে শোধ করে দিচ্ছি, তা-ও পরে পাওয়া যায়নি।

মোফা মিয়ার স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিল। গৃহকর্মেও ছিল সনিপুণা। তবু তাকে অভাবে পড়ে বিক্রি করে দেয় লোকটা। তবে গ্রামের লোকজন ঐ অভাবের কারণটি মেনে নেয়নি। তারা বলে, লোকটা খুব অর্থলোভী ছিল। একসাথে ১২ হাজার টাকা আর রিকশা পাবে বলে নিজের অত সুন্দরী বউকে পর্যন্ত অন্যের হাতে তুলে দিল।

AMARBOI.COM

মেয়েটি, মোফা মিয়ার সেই বউ, এখন কোথায় আছে, সঠিক জানে না কেউ। একজন বলল তাকে নাকি ঢাকা শহরে ঘুরতে দেখেছে। মেয়েটি খুব সাজগোজ করে বেড়াচ্ছিল। আরেকজন জানালো, মেয়েটিকে যখন পায়রাবন্দ থেকে নিয়ে গিয়ে ঢাকাগামী বাসে তোলা হয়, তখন সে দেখেছে। কাঁদছিল সে।

অনেকের ধারণা, নগদ ৬ হাজার টাকায় কেনা মেয়েটিকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে 'অসৎ কাজে' লাগানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে মোফা মিয়ার খুব একটা প্রতিক্রিয়া নেই। বাকি ৬ হাজার টাকা এবং রিকশাখানা পায়নি সেজন্যে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ নেই তার। বউ বিক্রি করবার পর সে ৫শ টাকা যৌতুক নিয়ে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করে, কিন্তু কদিন পর তাকেও তালাক দেয়।

লোকটি এখন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছে।

সদরপুরে মগা বুড়োর বাড়ি। ৬৫ বছর বয়স্ক এই বৃদ্ধের জমি ছিল প্রায় ৬০-৬৫ বিঘা। বহুবিবাহ, নারী অপহরণজনিত মামলা, ফসল উৎপাদন কমতি, সংসারের খরচ পরিচালনা, ইত্যাকার কারণে সমস্ত সম্পত্তি একে একে বিক্রি করে দেন তিনি। এখন আছে শুধু পৈতৃক ভিটেবাড়িটুকু। সন্তানেরা মজুরি খেটে খায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগা বুড়ো জমি হারিয়েছেন, এর আগে শিয়ালু চাচার কাহিনী-বর্ণনায় পাঠক হয়তো লক্ষ করেছেন যে, জমির পরিমাণ কীভাবে কমে গেছে তাঁর এবং শুধু মোটা পরিমাণ জমির মালিকদের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ঘটেনি, যারা ছিলেন মধ্যম কৃষক তারা আজ জমি হারিয়ে ক্ষুদ্র কৃষকে পরিণত হয়েছেন, ক্ষুদ্র কৃষক হয়েছেন বর্গাচাষী কিংবা সম্পূর্ণ ভূমিহীন।

কিন্তু এই জমিগুলো যাচ্ছে কোথায়? কারা কিনছেন? কার মালিকানায় রয়েছে?

হ্যাঁ, মগা বুড়ো, শিয়ালু চাচা, এঁরা একদিকে যেমন জমি খুইয়েছেন, আরেকদিকে কিছু লোক নতুন জমির মালিক হয়েছেন। পায়রাবন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় : বড় কৃষক তো আরও জমি কিনেছেন, কিন্তু কয়েক বছর আগে একেবারেই নিঃস্ব ছিলেন এমন লোকও হালে হয়েছেন আবাদি জমির মালিক। জয়রামপুর-আনোয়ার গ্রামে এ-রকম একজনের সাথে পরিচয় হলো। বছর দুয়েক আগেও অপরের জমিতে কামলা খাটতে তিনি, হাটের ধারে বসে বিক্রি করতেন দুধ, তাঁর আজ বেশ টাকাপয়সা। কেউ জমি বেচবে শুনলে সেখানে ছুটে যান।

ব্যাপারটা কী? গ্রামের লোকজন অনেকেই মনে করেন, লোকটি নাকি মাটির নিচে থেকে টাকার হাঁড়ি পেয়েছেন। একথা বিশ্বাসও করেন কেউ-কেউ। কিন্তু আসলে তা নয়। মজুরি ছেড়ে লোকটি গরু ও পাটের দালালি শুরু করেন এবং তাতেই কপাল ফিরেছে তাঁর। এ-রকম আরেকজনের সাথে দেবীপুর গ্রামে দেখা হলো। কাঁধের ভারে করে চাল-আটা বিক্রি করেছেন মাত্র ক বছর আগেও, এখন নিজেই চাতালের মালিক। যে-লোকটি মুদির দোকান করতেন, তিনি ২/৩টি দোকানঘর তুলেছেন এবং চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। ফটকাবাজি করে ১৮-২০ একর জমির মালিক হয়েছেন অপর একজন। খোর্দ মুরাদপুরের এক গাড়োয়ান, যিনি বিভিন্ন হাটে মুদিখানা খুলে বসতেন, তিনি ৬ একর জমি কিনেছেন, পাওয়ার টিলার কিনেছেন, হালে টিভি কিনেছেন। 'কেয়ার'-এর 'গমের কাজ' নিয়ে পায়রাবন্দ এলাকায় হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি এবং গম বিক্রির টাকায় নিজের অবস্থা ফিরিয়েছেন কেউ-কেউ। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের নামে উপজেলা পদ্ধতি চালু হবার পর নানাভাবে সুবিধে লুটেছেন অনেকে। মিঠাপুকুর কিংবা বলদীপুকুরে হাউজি খেলে কেউ ফতুর হয়েছেন, আবার হাজার হাজার টাকা জিতে সেই টাকায় জমি বন্ধক নিয়েছেন কেউ।

পায়রাবন্দের গ্রামগুলোতে রয়েছে নানা ধরন এবং বহু পেশার মানুষ। আছে মুক্তিযোদ্ধা, আছে রাজাকার। আছে চোর, আছে পুলিশ। আছে মৌলবি, মুন্সি, ইমাম, মুয়াজ্জিন, কাজী; আছে ফটকা-ব্যবসায়ী, অতি মুনাফালোভী মজুতদার, সুদখোর মহাজন। আছে সেনাবাহিনীর সদস্য, সরকারি চাকুরে, স্কুল-শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি। হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজ, ফকির, জেলে, কলু, কামার, নাপিত, দর্জি, মেকার, ঘাট-পারাপারের মাঝি। আছে গরু চোর, সিঁধেল চোর, ছিঁচকে চোর, তাড়ি ব্যবসায়ী, গাঁজা ব্যবসায়ী। আছে ভিক্ষুক, দালাল, ফড়িয়া, ছোটবড় ব্যবসায়ী, এমনকি বিয়ে-ব্যবসায়ী পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আছে কামলা-কিষান। আছে খাদ্যশস্য উৎপাদনের কর্মী। আছে পোড়া খাটিয়া।

পোড়া খাটিয়া।

একজন মানুষের নাম। আপনি যদি পায়রাবন্দের গ্রামে গিয়ে সবেদ আলী প্রামাণিককে খোঁজেন, পাবেন না। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবার কাছে তিনি পোড়া খাটিয়া নামে পরিচিত।

শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে তাঁর বয়স। ন্যুব্জ দেহ, বহু বছরের রোদ-জ্বলা কালো-পোড়া চেহারা। বসে থাকলে মনে হয়, মাটির খুব কাছাকাছি হেলে পড়েছে তাঁর মাথা। যেন সেজদা করছেন, যেন প্রণাম জানাচ্ছেন কাউকে।

বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষ বহু শতাব্দী পূর্বে যেমন ইরানের তিব্রেজী শহর থেকে এসে পড়েছিলেন এই পায়রাবন্দে, তেমনি সবেদ আলী প্রামাণিক ওরফে পোড়া খাটিয়া প্রায় এক শ বছর আগে জীবিকার সন্ধানে বগুড়া থেকে এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। কিন্তু বগুড়ার কোথায় কোন্ গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল, বলতে পারেন না। বলতে পারেন না নিজের জন্ম-সাল। শুধু বিড়বিড় করে বলেন, জন্মের কতা কন? সে তো বাবা পাঁচ-কুড়ি বছর পারে হয়্যা গেইচে ... অর্থাৎ তিনি বলছেন, জন্মের কথা জিজ্ঞেস করেন? সে তো এক শ বছর পেরিয়ে গেছে।

এক স্ত্রী পোড়া খাটিয়ার। সূর্যভান। ছেলেমেয়ে ৮ জন, নাতিপুতি ৫০ জন। নিজস্ব জমি প্রায় ১০ একর, ছেলেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন ইতোমধ্যেই। জয়রামপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। গত দু-দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে আমি দেখি। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, এমনকি চাঁদনি রাতেও তিনি জমিতে কাজ করছেন। হয় লাঙল ঠেলেন, ধান রোপণ কিংবা বপন করেন, নিড়ানি দেন, ফসল কাটেন ...

'৯২-এর মার্চে আবার তাঁর সাথে দেখা। সে-সময় তিনি জমি নিড়ানি দিচ্ছিলেন।

ভোরবেলা কাজে বেরিয়েছি, দেখি পোড়া খাটিয়া জমিতে। দুপুরে পায়রাবন্দে ফিরেছি, দেখি পোড়া খাটিয়া জমিতে। সন্ধ্যায় গ্রাম থেকে গ্রামে গিয়েছি, দেখি পোড়া খাটিয়া তাঁর ঐ জমিতে। জমি-জিরাতের সমস্ত আগাছা-আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পোড়া খাটিয়া যেন পায়রাবন্দের ভুঁই ছেড়ে উঠবেন না।

তাঁর ছেলেরা জানালেন, 'বাবা আমাদের কারও কোনো কথা শোনেন না। তাঁকে ঘরের ভেতর বন্ধ করে রেখেছি, কিন্তু কান্নাকাটি করেন, দরজা ধাক্কা দেন, আমরা খুলে দিতে বাধ্য হই। তিনি খুরপি হাতে নেমে পড়েন জমিতে।'

খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগেন পোড়া খাটিয়া। ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন হাঁটে তেমনি ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হন, সোজা চলে যান জমিতে। জমি নিড়াতে থাকেন। সকালের নাস্তা জমিতেই নিয়ে যাওয়া হয়, দুপুরের খাওয়াটাও। সন্ধ্যা ঘনাবার পর তিনি বাড়িতে ফেরেন, এই বয়সেও নিয়মিত গোসল সারেন এবং রাতে সামান্য আহারের পর শুয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে পড়েন অল্পক্ষণের মধ্যেই। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-ই তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন-বাঁধা জীবন। কারও সাথে খুব একটা কথা বলেন না। ... বৃদ্ধের এক নাতি জানালেন, 'দাদা আমাদের বহুদিন পর আপনার সাথে দুয়েকটা কথা বললেন। আমাদের সাথেও কথা বলেন না তিনি। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।' নাতিটির ধারণা, কাজ করতে করতে তার পিতামহের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অশিক্ষিত নাতিটির দোষ কী! আমাদের সমাজে যারা বেশি কাজ করেন, অনেক শিক্ষিত মানুষও পাগলের সাথে তুলনা করে তাঁকে বলেন 'কাজ-পাগলা'। সমাজ-মানসিকতাটাই আমাদের এ-রকম।

পোড়া খাটিয়া। নামটি যেন কেমন কেমন লাগে। আর একদার সবেদ আলী প্রামাণিক এই বিচিত্র নামে পরিচিত হলেন কীভাবে? কে দিয়েছে তাঁর এই নাম? কী এর অর্থ? রাজু আহমেদ এর ব্যাখ্যা-বর্ণনা করল। পোড়া খুঁটি যেমন আগুনের তাপে কালো হয়ে যায়, তবু থাকে শক্ত-খাড়া, সবেদ আলী প্রামাণিক ঠিক তেমনি। রোদে পুড়ে শরীর ঝামার মতো হয়ে গেছে, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, তবু কাজ ছাড়তে পারছেন না। এজন্যেই গ্রামের লোকে তাঁর নাম দিয়েছে পোড়া খাটিয়া। অর্থাৎ একটি পোড়া খুঁটি।

কাজই মানুষের পরিচয়। কাজই মানুষের জীবন। সেই জীবনের একজন, শতবর্ষ পূর্বের এক মানুষ, পায়রাবন্দের জমি থেকে আগাছা-আবর্জনা পরিষ্কার করে চলেছেন। কিন্তু আজকের মানুষ, যারা যুবক, অন্ধকার গ্রাম পায়রাবন্দের নির্যাতিত নিপীড়িত নরনারীর মুক্তির জন্যে কী করছে? বাল্যবিবাহ বন্ধের ব্যাপারে হালে কিছুটা উদ্যোগ তারা নিয়েছে; কিন্তু যৌতুক, বহুবিবাহ, নারী-ব্যবসা, নির্যাতন, তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার, সেগুলো দূর করবার জন্যে কী তাদের ভূমিকা?

এক রোদজ্বলা দুপুরে পায়রাবন্দ থেকে শহরে ফিরে আসি। আমার নোটবুকে অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী, ক্যামেরায় বন্দি অনেক ছবি। এগুলো আমি বেচে খাব। এই আমার গ্রাম! এই আমার দেশ। এই আমার পেশা।

পথের ধারে একখণ্ড জমিতে, প্রচণ্ড রৌদ্রের ভেতর, পোড়া খাটিয়া তখন ধানক্ষেত নিড়ানি দিচ্ছেন। তাঁর হাতের যত্নে এই চারাগাছ বেড়ে উঠবে, থোড় আসবে, শিষ আসবে, ধান পাকবে, যাবে রংপুর শহরের বাজারে।

এবং পোড়া খাটিয়াদের কথা-কাহিনী বিক্রির টাকায় আমি সেই ধান থেকে পাওয়া চাল কিনব, ধোঁয়া-ওঠা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে বলব, বাহ্, চালটা তো বেশ ভালো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~